জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'পরিষদ ভবন'

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন : 55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—1972

—(নারকেল চাষে নারকেল ছোবড়ার ব্যবহার 292 মে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে [illegible] চীনাবাদামের বীজ রোগ প্রতিরোধক, পটাশ প্রয়োগে তামাকের ভাল ফলন, উচ্চ ফলনশীল [illegible]ন্তের রেড়ী, পোকামাকড়ের হাত থেকে আলু সংরক্ষণ) 358 জুন

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিবিধ

প্রধান সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

'পরিষদ ভবন'

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-6

ফোন :—55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1972

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1972

চিত্র-সূচী

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিবিধ

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী, 1972 ১৲

নববর্ষের নিবেদন

নববর্ষের প্রাক্কালে পাকিস্তানের নাগপাশ হইতে বাংলাদেশের সর্বাত্মক মুক্তির মধ্য দিয়া বাঙালীজাতির যে নব-অভ্যুত্থানের সূচনা হইয়াছে, আমরা তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। যাঁহাদের আত্ম-বলিতে মুক্তি-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছে, বাংলা দেশ ও ভারতের সেই বীর শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

বর্তমান বর্ষ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা তথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষ।

সুদীর্ঘ 24 বৎসর অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আজ যে পঞ্চবিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রায় 25 বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কক্ষে কয়েকজন বিজ্ঞানী সমবেত হইয়া আচার্য বসুর প্রেরণায় বাংলাভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

1948 সালের জানুয়ারী মাসে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। ঐ সময় বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহার পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে।

তখন বিজ্ঞান পরিষদের বিশেষ কোন আশ্রয়স্থল ছিল না—বিজ্ঞান কলেজে আচার্য বসুর কক্ষেই মাঝে মাঝে সমবেত হইয়া পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইত। অনেকেই তখন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের একটি প্রশস্ত কক্ষ বিজ্ঞান পরিষদের কার্যাদি চালাইবার জন্য ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর 1956 সালে বিজ্ঞান পরিষদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ ফেডারেশন হলে ভাড়াটিয়া কক্ষে উঠিয়া আসে। 1969 সালে বিজ্ঞান পরিষদ তাহার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানেই বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ রজত জয়ন্তী বর্ষের প্রারম্ভে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠকবৃন্দ, লেখকমণ্ডলী ও পৃষ্ঠপোষকগণকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিগত 24 বৎসরে অনেক রকমের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পত্রিকাটিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে; আরও অনেক বাধাবিঘ্ন আসিতে পারে—তাহাও অতিক্রম করিতে হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকলের সাহায্যে ও ঔদার্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র অগ্রগতি অব্যাহত গতিতেই চলিতে থাকিবে।

সাহায্য ও সহযোগিতা আমরা অনেকই পাইয়াছি, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রচার সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এই প্রচার সংখ্যা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রচার সংখ্যার বৃদ্ধির মূলে আছে পাঠক সাধারণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের আনুকূল্য। তাঁহাদিগকে জানাই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিদেশী বিজ্ঞান পত্রিকার পিছনে যে আর্থিক সাহায্য বিদ্যমান, আমাদের ক্ষেত্রে তাহার নিতান্ত অভাব। এই আর্থিক সমস্যা যতই দূরীভূত হইবে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ততই নূতন নূতন পথের সন্ধান অবশ্যই করিতে পারিবে—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়।

তাপতড়িতীয় ঘটনা ও হিমায়ন

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

সূচনা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও অগ্রগতি হয়েছে। যুগে যুগে নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের আবিষ্কার হয়েছে। এই সমস্ত আবিষ্কার মানবজাতিকে করেছে সমৃদ্ধ। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, কোনও আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যবহারিক উপযোগিতা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই অনুভূত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী কালে তা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এমনই একটি আবিষ্কার হলো তাপতড়িতীয় ঘটনা (Thermoelectric effect)। এপর্যন্ত তিন প্রকার তাপতড়িতীয় ঘটনার কথা জানা গেছে। প্রথমটি আবিষ্কৃত হয় 1821 খৃষ্টাব্দে। আবিষ্কার করেন টমাস জন সিবেক। তিনি দেখেন দুটি পৃথক ধাতব তার দুই প্রান্তে পরস্পর সংযুক্ত করে (যার নাম থার্মোকাপল) সংযোগ বিন্দু (Junction) দুটির একটিকে উত্তপ্ত করলে অর্থাৎ দুই সংযোগ বিন্দুর মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য সৃষ্টি করলে সংযোগ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটি বিভব প্রভেদের সৃষ্টি হয়। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এটি সিবেক ঘটনা (Seebeck effect) নামে পরিচিত। সৃষ্ট সিবেক বিভব প্রভেদের পরিমাণ খুবই কম, কয়েক মাইক্রোভোল্ট মাত্র। তাই এই ঘটনার ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায় না। তবে এর সাহায্যে সাফল্যের সঙ্গে তাপমাত্রার পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

1834 খৃষ্টাব্দে পেলটিয়ার সিবেক ঘটনার বিপরীত একটি ঘটনা আবিষ্কার করেন। দুটি পৃথক পরিবাহী তারকে দুই প্রান্তে সংযুক্ত করে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হলে সংযোগ বিন্দুদ্বয়ে তাপমাত্রার পার্থক্যের সৃষ্টি হয়—একটি সংযোগ বিন্দু উত্তপ্ত ও অপরটি শীতল হয়ে পড়ে। এই ঘটনা পেলটিয়ার ঘটনা (Peltier effect) নামে পরিচিত এবং এটি জুল তাপায়ন (Joule heating) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে পরিবাহিতা রোধের জন্যে তা উত্তপ্ত হয় এবং উৎপন্ন তাপের পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের বর্গের সমানুপাতিক। এটিই হলো জুল তাপায়ন। পেলটিয়ার ঘটনায় উৎপন্ন তাপ প্রবাহিত তড়িতের সমানুপাতিক।

পেলটিয়ার ঘটনার প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয় 1838 খৃষ্টাব্দে। এই ঘটনার প্রয়োগে জলকে বরফে পরিণত করা হয়। বিসমাথ ও অ্যান্টিমনি ধাতুর তারের দ্বারা এক্ষেত্রে থার্মোকাপল তৈরি করা হয়। থার্মোকাপলের মধ্য দিয়ে বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত করে সেই বরফকে তিনি আবার জলে পরিণত করেন। এভাবে তাপতড়িতীয় ঘটনা হিমায়নের কাজে ব্যবহারের দ্বার উন্মুক্ত করলো। অবশ্য কেবলমাত্র গত দশক থেকে পেলটিয়ার ঘটনার প্রয়োগে হিমায়ন বা Refrigeration-এর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। এর আগে দীর্ঘ এক শতাব্দী বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবেই পেলটিয়ার ঘটনার সাহায্যে হিমায়নের গুরুত্ব ছিল।

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আচার্য বি. এন. শীল কলেজ, কোচবিহার।

সিবেক ও পেলটিয়ার গুণাঙ্ক

সিবেক ও পেলটিয়ার ঘটনার ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্যে পদার্থের সিবেক ও পেলটিয়ার গুণাঙ্ক সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। সিবেক গুণাঙ্ককে আমরা গাণিতিক উপায়ে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করতে পারি।

$\alpha = \frac{dE}{dT}$······(1), যেখানে α হলো সিবেক গুণাঙ্ক এবং dE হলো দুটি বিভিন্ন ধাতুর দুই সংযোগ বিন্দুর মধ্যে dT তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যে সৃষ্ট বিভব প্রভেদ। সুতরাং কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রার প্রভেদের জন্যে উৎপন্ন বিভব প্রভেদ বেশী হতে হলে সিবেক গুণাঙ্ককে বেশী হতে হবে। কিন্তু ধাতু ও সঙ্কর ধাতুর ক্ষেত্রে সিবেক গুণাঙ্কের মান 49 মাইক্রোভোল্ট/0 সে-এর বেশী হয় না। কোনও কোনও অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে এই মান 1 মিলিভোল্ট/0 সে. হতে দেখা গেছে। সাধারণতঃ অর্ধপরিবাহীর সিবেক গুণাঙ্কের মান 200 মাইক্রোভোল্ট/0 সে-এর মত হয়।

যদি 1 পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে থার্মোকাপলের দুই সংযোগ বিন্দুতে Q পরিমাণ তাপ সৃষ্ট বা শোষিত হয়, তবে পেলটিয়ার গুণাঙ্ককে এরূপে প্রকাশ করা যায়—$\pi = Q/1$···(2)

যদিও সিবেক ও পেলটিয়ার ঘটনার মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা জানা ছিল না, তথাপি 1857 খৃষ্টাব্দে লর্ড কেলভিন thermodynamical consideration থেকে দুই গুণাঙ্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেটি হলো $\pi = \alpha T$, যেখানে T চরম স্কেলে তাপমাত্রার মান। এই সম্পর্কটি নতুন একটি তাপতড়িতীয় ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত করলো। এটি টমসন ঘটনা রূপে পরিচিত। ঘটনাটি হলো এই যে, কোনও সমসত্ত্ব পরিবাহীর বিভিন্ন বিন্দুতে যদি তাপমাত্রার পার্থক্য থাকে, তবে পরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ প্রবাহিত করলে তা ঠাণ্ডা বা গরম হয়ে উঠবে।

সিবেক ঘটনা ও অর্ধপরিবাহী

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে সিবেক গুণাঙ্কের মান ধাতুর ক্ষেত্রে মানের অপেক্ষা অনেক বেশী। এর কারণ সিবেক ঘটনার কারণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কোনও পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহীর (Charge carrier) ধর্ম গ্যাসের ধর্মের অনুরূপ। তাই পদার্থের মধ্যে তড়িদ্বাহীর ঘনত্ব পদার্থের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন পদার্থে তড়িদ্বাহীর সংখ্যাও বিভিন্ন। তাই দুটি বিভিন্ন ধাতুর তারের দুই সংযোগ বিন্দুর একটিকে উত্তপ্ত করলে তারের উত্তপ্ত অংশ থেকে ইলেকট্রন (ধাতুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রনই তড়িদ্বাহী) ঠাণ্ডা অংশের দিকে চলে যাবে এবং সে অংশে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে। ঠাণ্ডা সংযোগ বিন্দুর কাছে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, যখন এই সমস্ত ইলেকট্রনের বিকর্ষণের ফলে নতুন আর কোনও ইলেকট্রনের পক্ষে এই অংশে আসা সম্ভব হবে না; অর্থাৎ একটি স্থিতিশীল অবস্থার (Equilibrium condition) সৃষ্টি হবে। দুই সংযোগ বিন্দুতে ইলেকট্রনের ঘনত্বের পার্থক্যের জন্যে বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে একটি বিভব প্রভেদের সৃষ্টি হবে। এটিই সিবেক বিভব প্রভেদ। স্পষ্টতঃই এই সিবেক বিভব তড়িদ্বাহীর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। যদি পদার্থের তড়িদ্বাহীর সংখ্যা কম হয়, তবে সৃষ্ট সিবেক বিভবের মান বেশী হবে। ধাতুতে তড়িদ্বাহীর সংখ্যার ($\sim 10^{22}$ / ঘন সেমি) তুলনায় অর্ধপরিবাহীতে তড়িদ্বাহীর সংখ্যা অনেক কম ($\sim 10^{14} - 10^{18}$ / ঘনসেমি)। তাই একই তাপমাত্রা পার্থক্যের জন্যে অর্ধপরিবাহিতে সৃষ্ট সিবেক বিভবের পরিমাণ ধাতুতে

সৃষ্ট সিবেক বিভবের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

পেলটিয়ার ঘটনা ও অর্ধপরিবাহী

থার্মোকাপলে পেলটিয়ার ঘটনার অস্তিত্ব থেকে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, থার্মোকাপলের দুই সংযোগ-বিন্দুতেই একটি তড়িৎ-চালক বলের অস্তিত্ব আছে এবং এই তড়িৎ-চালক বল এক ধাতু থেকে অন্য ধাতুর দিকে ক্রিয়া করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তামা ও লোহার দ্বারা গঠিত থার্মোকাপলে তড়িৎ-চালক বল তামা থেকে লোহার দিকে ক্রিয়া করে। দুই ধাতুতে মুক্ত তড়িদ্বাহীর (ইলেকট্রন) সংখ্যার পার্থক্য থাকায় সংযোগ-বিন্দুতে তড়িদ্বাহীর চলাচলের ফলেই এই তড়িৎ-চালক বলের সৃষ্টি হয়। এর ফলে যখন থার্মোকাপলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন তড়িৎ একটি সংযোগ-বিন্দুতে তড়িৎ-চালক বলের দিকে প্রবাহিত হয় এবং অপর সংযোগ বিন্দুতে তড়িৎ-চালক বলের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। যে সংযোগ-বিন্দুতে তড়িৎ তড়িৎ-চালক বলের দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে তড়িৎ-চালক বল কাজ করে। এই কাজ সংযোগ-বিন্দুর তাপশক্তির ব্যয়েই সাধিত হয়। তাই সেখানকার তাপমাত্রা হ্রাস পায়। অপর সংযোগ-বিন্দুতে যেখানে তড়িৎ তড়িৎ-চালক বলের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়, সেখানে তড়িৎ কাজ করে এবং এই কাজ তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ায় সংযোগ-বিন্দু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং একটি থার্মোকাপলকে আমরা একটি তাপইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যা এক সংযোগ-বিন্দু থেকে তাপ গ্রহণ করে এর কিছু পরিমাণকে তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং অবশিষ্ট তাপ অপর সংযোগ-বিন্দুতে ত্যাগ করে।

দুটি বিভিন্ন ধাতুর সংযোগের ক্ষেত্রে যে তাপতড়িতীয় ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, একটি ধাতু ও একটি অর্ধপরিবাহীর সংযোগের ক্ষেত্রেও তা দেখা যায় এবং উভয়ের মূল তত্ত্ব একই। হ্যাঁ-ধর্মী (p-type) বা না-ধর্মী (n-type)—উভয় প্রকার অর্ধপরিবাহী এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহীতে ধনাত্মক হোল (Hole) এবং না-ধর্মী অর্ধপরিবাহীতে ঋণাত্মক ইলেকট্রন প্রধান তড়িদ্বাহী। যদি একটি না-ধর্মী অর্ধপরিবাহী পদার্থের উভয় পার্শ্বে দুটি ধাতব পাত সংযুক্ত করে ধাতব-পাত দুটিকে একটি তড়িৎকোষের দুই মেরুর (অর্থাৎ একটি D. C. বিভব উৎসের) সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তবে যে সংযোগস্থলে বিভব উৎসের ধনাত্মক মেরু সংযুক্ত আছে (অর্থাৎ সংযোগস্থলে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবিষ্ট হচ্ছে), সেটি উত্তপ্ত হবে এবং অপর সংযোগস্থল শীতল হবে—ঠিক থার্মোকাপলের মতই (1নং চিত্র)। যদি না-ধর্মীর পরিবর্তে হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহী লওয়া হয়, তবে বিপরীত ঘটনা লক্ষ্য করা যাবে (2নং চিত্র), অর্থাৎ প্রথম

1নং চিত্র 2নং চিত্র
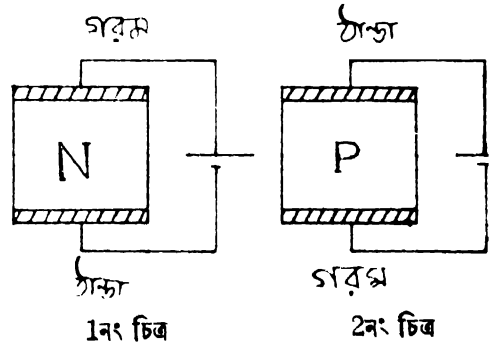
ক্ষেত্রে যে সংযোগস্থল উত্তপ্ত হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শীতল হবে এবং পূর্বে যে সংযোগস্থল শীতল হয়েছিল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা উত্তপ্ত হবে। এর কারণ উভয় ক্ষেত্রের তড়িদ্বাহীর আধানের বৈপরীত্য। যদি হ্যাঁ ও না-ধর্মী দুটি অর্ধপরিবাহী পদার্থ নিয়ে উভয়েরই এক পার্শ্ব একটিমাত্র ধাতব পাতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় এবং উভয়ের অপর

প্রান্ত দুটিকে পৃথক পৃথকভাবে দুটি ধাতব পাতের সঙ্গে সংযুক্ত করে শেষোক্ত ধাতব পাত দুটিকে D. C. বিদ্যুৎ উৎসের দুই মেরুর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তবে শীতলতার পরিমাণ অনেকটাই বৃদ্ধি করা যাবে (3নং চিত্র)। যদি উত্তপ্ত প্রান্ত থেকে
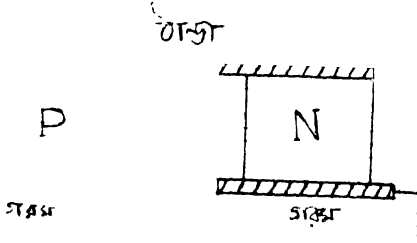
3নং চিত্র

কোন উপায়ে অবিরত তাপ নিষ্কাশন করা হয়, তবে শীতল প্রান্তে শীতলতার সৃষ্টি হতে হতে সেখানকার তাপমাত্রা ঘরের তাপমাত্রা অপেক্ষা কম হয়ে পড়বে। এটাই হলো অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে পেলটিয়ার ঘটনার সাহায্যে তাপতড়িতীয় হিমায়নের পদ্ধতি।

উপযুক্ত পদার্থের সন্ধানে

তাপতড়িতীয় হিমায়নের মূল তত্ত্বটি জটিল না হলেও এর ব্যবহারিক উপযোগিতার জন্যে একটি জিনিষের উপর গুরুত্ব দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। তা হলো এই যে, তাপতড়িতীয় হিমায়ন সফলভাবে করতে গেলে উপযুক্ত অর্ধপরিবাহীর খোঁজ করতে হবে। এই কাজে কোন্ অর্ধপরিবাহী কতটা সাফল্য অর্জন করবে, তা তার তাপপরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। কারণ পদার্থের তাপপরিবাহিতার ফলে উত্তপ্ত সংযোগস্থল থেকে তাপ শীতল সংযোগস্থলের দিকে প্রবাহিত হয়ে সেটিকেও কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত করে তুলবে। ফলে সেখানকার শীতলতা হ্রাস পাবে এবং যন্ত্রের কার্যকারিতা (Efficiency) কম হবে। সুতরাং যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্যে কম তাপ পরিবাহিতাবিশিষ্ট পদার্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের জন্যে জুল তাপায়নের ফলে শীতল সংযোগস্থল কিছু পরিমাণে উত্তপ্ত হয়ে যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস করবে। জুল তাপায়নের জন্যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ হ্রাস করতে হলে—হয় পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধ আর না হয় প্রবাহমাত্রা হ্রাস করতে হবে। তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা হ্রাস করলে পেলটিয়ার হিমায়নও কম হবে। সমীকরণ (2) থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। সুতরাং তড়িৎ-প্রবাহমাত্রা কমানো যাবে না। তাই জুল তাপায়ন কমানোর জন্যে পদার্থের বৈদ্যুতিক রোধের মান কম করাই একমাত্র উপায়; অর্থাৎ পদার্থের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতাঙ্ক (σ) বেশী হতে হবে। কিন্তু কোন পদার্থের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বেশী হলে তার তাপ পরিবাহিতাও (K) বেশী হয়। ফলে একটু আগের আলোচনা অনুযায়ী কম রোধবিশিষ্ট পদার্থ নিলে জুল তাপায়ন কখনো সম্ভব হলেও প্রথম কারণে যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাসের মূল কারণ দুটি দূর করতে হলে দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সুতরাং এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেই উপযুক্ত পদার্থ নির্বাচন করতে হবে। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে অর্ধপরিবাহীর জন্যে একটি নতুন পরিবর্তনীয় ধ্রুবকের (Parameter) -Z- সাহায্য নেওয়া হয়। ধ্রুবকটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$Z = \alpha^2\sigma/K$$

-Z- এর মান যত বেশী হবে, পেলটিয়ার ঘটনার জন্যে সৃষ্ট হিমায়নের পরিমাণও তত বেশী হবে। বিভিন্ন পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহীর ঘনত্বের উপর α, σ, K তিনটিই নির্ভর করে। সুতরাং -Z- ও মুক্ত তড়িদ্বাহী ঘনত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তাই

পদার্থে মুক্ত তড়িদ্বাহী ঘনত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ৶, σ, K, ও -Z- এই চারটিরই পরিবর্তন একটি ছক কাগজে আঁকা হয়। দেখা যায় যে, সিবেক গুণাঙ্ক ৶ তড়িদ্বাহী ঘনত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। অপরিবাহী পদার্থের ৶-এর মান সর্বোচ্চ অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম এবং ধাতুর ক্ষেত্রে আরও কম। K ও σ উভয়েই তড়িদ্বাহী ঘনত্বের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে, অর্ধপরিবাহীর ক্ষেত্রে -Z- -এর মান পারবাহী ও অপরিবাহী উভয়ের তুলনায় বেশী এবং পদার্থে তড়িদ্বাহী ঘনত্ব যখন 10^{18-19}/ঘন সেমি, তখন -Z- এর মান সর্বোচ্চ। সুতরাং তাপতড়িতীয় হিমায়ন ভালভাবে করবার জন্যে এই তড়িদ্বাহী ঘনত্বের কাছাকাছি তড়িদ্বাহী ঘনত্ববিশিষ্ট অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ যে সব অর্ধপরিবাহী বর্তমানে এই কাজে ব্যবহার করা হয়, তা হলো বিসমাথ টেলুরাইড (Bi_2Te_3) এবং Bi_2Te_3-এর সঙ্গে অ্যান্টিমনি টেলুরাইডের (Sb_2Te_3) কঠিন দ্রবণ (Solid solution)। না-ধর্মী করবার জন্যে Bi_2Te_3-তে কপার আয়োডাইড, সিলভার আয়োডাইড প্রভৃতি অবিশুদ্ধি যোগ করা হয়। হ্যাঁ-ধর্মী অর্ধপরিবাহী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বিশুদ্ধ বিসমাথ। এছাড়া কয়েকটি ত্রয়ী সঙ্করও (Ternary alloys), যথা $Bi_2Te_3-Sb_2Te_3-Sb_2Se_3$ ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত যৌগগুলির অধিকাংশের -Z- এর মান 3×10^{-3}/°সে অপেক্ষা কম। উষ্ণ ও শীতল সংযোগস্থলের মধ্যে সর্বোচ্চ কত তাপমাত্রার পার্থক্য হতে পারে, তা নিম্নের সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়—

$$\Delta T_{max} = -Z\text{-}Te^2/2,$$

যেখানে Te শীতল সংযোগস্থলের তাপমাত্রা।

-Z- এর মান প্রায় $2{\cdot}6\times10^{-3}$ /°সে হলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্য 70° সেন্টিগ্রেডের মত হতে পারে। কঠিন পদার্থে পরিবহন সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি -Z- এর মান 10×10^{-3}/°সে অপেক্ষা বেশী হবার সম্ভাবনা কম। Cd_3As_2 প্রভৃতি কয়েকটি যৌগে ৶²σ-এর মান Bi_2Te_3-এর ৶²σ-এর মান অপেক্ষা বেশী। আবার $AgSbTe_2$-এর তাপপরিবাহিতা Bi_2Te_3 প্রভৃতি যৌগের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং একথা আশা করা অযৌক্তিক হবে না যে, এই সব যৌগের বিভিন্ন ধর্মের সমবায়ে এমন কোন যৌগ পাওয়া ভবিষ্যতে সম্ভব হবে, যাতে তাপতড়িতীয় হিমায়নের কাজ আরও ভালভাবে হতে পারে।

ব্যবহার ও উপযোগিতা

পেলটিয়ার ঘটনার প্রধান ব্যবহার তাপতড়িতীয় হিমায়নে। এর কয়েকটি সুবিধা আছে, যেগুলি সাধারণ রেফ্রিজারেটারে পাওয়া যায় না; যথা—এই যন্ত্র আকারে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট হতে পারে এবং এতে কোনও ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহার করতে হয় না। কোন সচল যন্ত্রাংশ না থাকায় এটিতে কোন শব্দ হয় না এবং এটি দীর্ঘকাল কাজ করতে সক্ষম। এর আর একটি প্রধান সুবিধা হলো এই যে, পেলটিয়ার হিমায়ন তাপ-তড়িতীয় রেফ্রিজারেটারের আকারের উপর কোনভাবেই নির্ভরশীল নয়।

সাধারণতঃ গৃহস্থালীতে ব্যবহারের জন্যে রেফ্রিজারেটারের 50 ওয়াটের মত হিমায়ন ক্ষমতা থাকা দরকার। তত্ত্বগতভাবে একটি মাত্র থার্মোকাপলেই এটা পাওয়া সম্ভব। অবশ্য এর জন্যে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রা খুবই বেশী হওয়া (হাজার অ্যাম্পিয়ারের মত) প্রয়োজন, যদি D.C. বিভবের পরিমাণ খুব কম (~0·1 ভোল্ট) হয়। তাই ব্যবহারিক সুবিধার জন্যে বিভবের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয় এবং তাতে তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রাও অতিরিক্ত হয় না

পেলটিয়ার হিমায়ন ঘর বাতানুকূল (Air-conditioned) করবার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধুমাত্র তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে একই যন্ত্রের সাহায্যে শীতকালে ঘর গরম করাও সম্ভব। সচরাচর ব্যবহৃত বাতানুকূল যন্ত্রের এই সুবিধা নেই।

তাছাড়া নানা বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী কাজেও তাপতড়িতীয় হিমায়ন সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এর আরও কত বিভিন্নমুখী প্রয়োগ হতে পারে, তা হয়তো এখনই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাপতড়িতীয় হিমায়ন যে, এক বিরাট সম্ভাবনার বার্তা বহন করে এনেছে—একথা অনস্বীকার্য।

গ্রহ-সৃষ্টির রহস্য

গিরিজাচরণ ঘোষ*

কোন রহস্যোপন্যাসের বিশেষত্ব হলো সেখানে এমন কতকগুলি সূত্র পড়ে থাকে, যা ধরে অগ্রসর হলে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। গ্রহ-সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেও সেই ধরণের কিছু সূত্র পড়ে রয়েছে, যা ধরে এগিয়ে গেলে আমরা সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে পারি।

সূর্য আপন অক্ষের চারপাশে ছাব্বিশ দিনে একবার আবর্তিত হচ্ছে এবং সেই অক্ষ সব গ্রহগুলির কক্ষপথের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত। এটাকেই আমরা গ্রহ-সৃষ্টির রহস্যের প্রথম সোপান হিসেবে ধরে নিতে পারি। কারণ রহস্যোদ্ঘাটনের প্রথম সোপানস্বরূপ এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে সূর্য ছাব্বিশ দিনে একবার আবর্তিত হচ্ছে কেন? সূর্য তো আরো দ্রুত ঘুরতে পারতো! মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এই ঘুরপাক খাওয়ার কাজটা সে তো অনায়াসেই শেষ করতে পারতো!

এখানে স্বভাবতঃই মনের মধ্যে যে প্রশ্ন জেগে ওঠে, তা হলো—সূর্যের এই দ্রুত আবর্তনের স্বপক্ষে যুক্তিটা কোথায়? এর জবাব দিতে হলে একটা দূরবীন বা বাইনোকুলার নিয়ে আমাদের তাকাতে হবে কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। সেখানে দেখা যাবে কালপুরুষ নীহারিকা (Orion Nebula)। ঐ নীহারিকা থেকে গ্যাসের মেঘপুঞ্জ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র সৃষ্টি হতে চলেছে। ঐ গ্যাসপিণ্ডের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় আয়তন এক বিরাট আকার ধারণ করে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সূর্যের মধ্যে যে ভরের উপাদান রয়েছে, তা যদি ঐ কালপুরুষ নীহারিকার অন্তর্বর্তী গ্যাসীয় পিণ্ডগোলকের থাকে, তবে তার ব্যাস হবে দশ-লক্ষ কোটি মাইল, যেখানে সূর্যের ব্যাস হলো দশ লক্ষ মাইলের মত। সুতরাং ঐ মেঘপুঞ্জ থেকে সূর্যের মত নক্ষত্র হতে তার সঙ্কোচন ঘটবে দশ লক্ষ কোটি মাইল থেকে মাত্র দশ লক্ষ মাইল অর্থাৎ তার সঙ্কোচনের পরিমাণটা দাঁড়াবে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

এখন গতিবিদ্যার নিয়ম অনুসারে জানা আছে যে, বাইরে থেকে কোন বল প্রযুক্ত না হলে ওর সঙ্কোচনের সঙ্গে আবর্তনগতি বাড়তে থাকবে,

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

কারণ সঙ্কোচনের সঙ্গে ঐ আবর্তন গতি ব্যস্তানুপাতে (Inverse proportion) পরিবর্তিত হয়ে চলবে; অর্থাৎ সঙ্কোচন দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ হলে তার গতিবেগ দশ লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যদি প্রাথমিক গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার হয়, তবে তার চরম গতিবেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে দশ লক্ষ সেন্টিমিটার বা এক-শ' কিলোমিটার। কিন্তু সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চলে গতিবেগ হলো প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র দুই কিলোমিটার। সূর্য যদি প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হতো, তবে তার একবার আবর্তন শেষ করতে ছাব্বিশ দিনের পরিবর্তে মাত্র অর্ধদিন লাগতো।

মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে ওঠে—তবে কি ঐ বিশাল গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটারেরও কম ছিল? না, তা নয়। কারণ কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত নীহারিকা থেকে যা ফল পাওয়া গেছে, তাতে প্রতি সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার প্রাথমিক বেগটা নিতান্তই কম। কারণ উক্ত নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ প্রতি সেকেণ্ডে দশ সেন্টিমিটার, এমন কি প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' সেন্টিমিটারও হতে পারে। যদি গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে দশ সেন্টিমিটার, তার চূড়ান্ত বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার। যদি গ্যাসপিণ্ডের প্রাথমিক বেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে এক-শ' সেন্টিমিটার, তবে তার চূড়ান্ত বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার কিলোমিটার। সূর্যের মত কোন নক্ষত্র যদি এই প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হতে থাকে, তবে তা ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন কোন নক্ষত্রের স্থায়িত্ব কল্পনা করা যায় না। অধিকাংশ নক্ষত্রের আবর্তন গতি পরিমাপ করে দেখা গেছে, তাদের বেগ সূর্যের আবর্তন বেগের মতই মন্থর।

তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে সূর্য বা নক্ষত্রের আবর্তন গতি মন্থর হয়ে যাওয়ার কারণটা কি? বিপুল আয়তনবিশিষ্ট গ্যাসপিণ্ড যতই সঙ্কুচিত হতে থাকে, তার আবর্তন গতিও ততই বাড়তে থাকে। আর গ্যাসপিণ্ডের আবর্তন গতি যতই বাড়তে থাকে, তার মেরুর দিক ততই চ্যাপ্টা হতে থাকে। আবর্তন গতি যতই তার চূড়ান্ত বেগের দিকে এগিয়ে যাবে, গ্যাসপিণ্ডের বিষুবরেখা অঞ্চল ততই চ্যাপ্টা থালার মত হতে থাকবে। গ্রহ-সৃষ্টির প্রাক্কালে আমাদের সূর্যেরও বিষুবরেখা অঞ্চলে এইরূপ চ্যাপ্টা থালার সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐ চ্যাপ্টা থালা থেকে গ্রহের সৃষ্টি কি ভাবে হলো, তা বলবার আগে মনে করা যাক সৌরজগতের সব গ্রহগুলি তুলে এনে সূর্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। এতে সূর্যের ভর নিঃসন্দেহে বেড়ে যাবে এবং সেই কারণে তার আবর্তন গতিও বাড়বে। হিসাব অনুযায়ী তখন বিষুবরেখা অঞ্চলে গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে দুই কিলোমিটারের পরিবর্তে এক-শ' কিলোমিটার হয়ে যাবে। এই গতিবেগের জন্যে সূর্যের মেরুপ্রান্ত কিছুটা চ্যাপ্টা হবে সত্য কথা, কিন্তু এই গতিবেগের জন্যে সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চল কখনই চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হবে না। গ্যাসপিণ্ডের ঘনীভবনের সময় ঐ চ্যাপ্টা থালা থেকেই যদি গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ঐ গ্রহগুলি আত্মসাৎ করে সূর্যের নিশ্চয়ই সেই গতিবেগ অর্জন করা উচিৎ ছিল, যাতে তার বিষুবরেখা অঞ্চল চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হয়। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেছে, সৌর জগতের গ্রহগুলি ছাড়া পৃথিবীর ভরের তিন হাজার গুণ অতিরিক্ত বস্তু যদি সূর্যে নিক্ষেপ করা হয়, তবে তার আবর্তন বেগ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার এবং তখনই সূর্যের বিষুবরেখা অঞ্চল চ্যাপ্টা থালায় পরিণত হবে। তাই যদি হয়,

তবে গ্রহের সৃষ্টির সময় পৃথিবীর ভরের তিন হাজার গুণ অতিরিক্ত বস্তুপরিমাণ নিশ্চয় সূর্যে ছিল। কিন্তু তা গেল কোথায়? এর উত্তর হলো ইউরেনাস এবং নেপচুনের যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস থাকবার কথা, তা আদৌ ঐ ছুটি গ্রহে নেই। গ্রহের সৃষ্টির সময় ঐ ছুটি গ্রহ থেকে বিপুল পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস নিশ্চয়ই সৌর জগতের সীমানা ছেড়ে চলে গেছে। তা ছাড়া প্লুটোর পরে অনাবিষ্কৃত গ্রহ থাকবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েকটি ধূমকেতুর চলবার রহস্য থেকে বা বোড-টিটিয়াসের প্রগতি অনুসারে সূর্য থেকে সাত-শ' কোটি মাইল দূরে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহ হয়তো রয়েছে। ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহের চলবার পথে যে সামান্য বিচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা যদি ঐ অনাবিষ্কৃত গ্রহের প্রভাবে হয়ে থাকে, তবে তার ভর বৃহস্পতির ভরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃহস্পতির ভর পৃথিবীর ভরের তিন-শ' সতেরো গুণ। তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সৌর জগৎ থেকে পলাতক হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অনাবিষ্কৃত গ্রহের সম্মিলিত ভরের বস্তু যদি সূর্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে তার আবর্তন বেগ প্রচণ্ড বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সে চ্যাপ্টা হয়ে পড়বে এবং গ্রহ সৃষ্টির দশা প্রাপ্ত হবে।

ঘনীভবনের সময় গ্যাসপিণ্ড চ্যাপ্টা হয়ে আসে এবং তার বিষুবরেখা অঞ্চল প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হতে থাকে, তখন তার বহিঃস্থ গ্যাসের তুলনায় মধ্যবর্তী গ্যাসপিণ্ডের আরও অধিক সঙ্কোচনের ফলে তার মধ্যবর্তী অংশ তার বহিঃস্থ থালার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় তার চেহারা হয়ে পড়ে শনিগ্রহের মত। শনির বলয়ের মত গ্যাসপিণ্ডের চ্যাপ্টা থালাটা-তার কেন্দ্রস্থিত ঘনীভূত গ্যাসপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে চলে। এই সময় তাদের উভয় অংশের আবর্তন গতি কিছুটা মন্দীভূত হয়ে আসে।

তবে সূর্যের গতি আরও মন্দীভূত হয়ে গেল কি ভাবে, এবার সে কথায় আসা যাক। গ্রহ-সৃষ্টির প্রাক্কালে সূর্যরূপী প্রকাণ্ড গ্যাসপিণ্ডের চারপাশে গ্যাসীয় বলয়টি যখন প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছিল, তখন আদিম সূর্যের চৌম্বক শক্তির প্রভাব পড়লো ঐ গ্যাসীয় বলয়ের উপর। একটা চাকার ধুরার সঙ্গে চাকার বেষ্টনীটা যেমন কতকগুলি অরা বা স্পোকের সাহায্যে যুক্ত থাকে, তেমনি কেন্দ্রস্থিত গ্যাস-পিণ্ডের সঙ্গে গ্যাসীয় বলয়টি কতকগুলি চৌম্বক বলরেখার দ্বারা যুক্ত থাকে। এখন চাকার অরা বা স্পোকগুলি যদি খুব শক্ত হয়, তবে ধুরার সঙ্গে চাকার বেষ্টনী এক সঙ্গে ঘুরতে থাকবে। কিন্তু অরাগুলি যদি স্থিতিস্থাপক বস্তুতে গঠিত হয়, তবে চাকার বেষ্টনীটা ধুরার ঘূর্ণনের সঙ্গে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে থাকবে এবং বেষ্টনীর পিছনটানে ধুরার গতি মন্দীভূত হতে থাকবে। গ্যাসীয় বলয়ের পিছনটানে সূর্যরূপী গ্যাসপিণ্ডের আবর্তন গতিও ঐ চৌম্বক বলরেখারূপী স্থিতি-স্থাপক অরাগুলির সাহায্যে মন্দীভূত হয়ে এল।

এবার আর একটি প্রশ্নে আসা যাক। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি; অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল এই চারিটি হলো প্রস্তর ও লৌহ প্রধান এবং দূরবর্তী গ্রহগুলি অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই চারিটি হলো গ্যাসীয়প্রধান। যদি একই গ্যাসীয় বলয় থেকে সব গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে ওদের উপাদানের এরকম তারতম্য ঘটলো কেন? এর উত্তর হলো গ্রহের সৃষ্টির পূর্বে গ্যাসীয় বলয়টি যখন ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে চলেছিল, তখন উচ্চ স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থ, যেমন সিলিকন, লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থগুলি তরল ও কঠিন কণায় পরিণত হয়ে দানা বাঁধতে সুরু করলো।

ফলে নিম্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থগুলি তখনও গ্যাসীয় অবস্থায় থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে চললো, কিন্তু দানাবাঁধা পদার্থগুলি সূর্যের আকর্ষণে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারলো না। এই কারণেই সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলিতে সিলিকন, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পদার্থের আধিক্য দেখা দিল, আর দূরবর্তী গ্রহগুলিতে দেখা দিল অ্যামোনিয়া, জল, মিথেন প্রভৃতি পদার্থের আধিক্য।

গ্রহগুলির আর একটি ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রতিটি গ্রহ তাদের কক্ষতলের সঙ্গে বিভিন্ন কোণে আনত রয়েছে। যেমন বুধ গ্রহের আনত কোণ হলো সাতাশি ডিগ্রী, শুক্রের আশী ডিগ্রী, পৃথিবীর সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রী, মঙ্গলের পঁয়ষট্টি ডিগ্রী, বৃহস্পতির উননব্বই ডিগ্রী, শনির বাষট্টি ডিগ্রী, ইউরেনাসের সাত ডিগ্রী (ঋণাত্মক) এবং নেপচুনের সত্তর ডিগ্রী। এখানে দেখা যাচ্ছে, বৃহস্পতি, বুধ এবং শুক্র তিনটি গ্রহের আবর্তন-অক্ষ তাদের কক্ষতলের উপর প্রায় লম্বভাবে অবস্থান করছে। কিন্তু তার তুলনায় অন্য গ্রহের অক্ষগুলি কিছুটা হেলানো অবস্থায় রয়েছে। সবচেয়ে বেশী হেলানো অবস্থায় রয়েছে ইউরেনাস্। এর কারণ ঘূর্ণায়মান গ্যাসীয় বলয়টি যখন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে জেলীর মত হয়ে এল, তখন তা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং প্রত্যেক খণ্ডতেই মহাকর্ষ শক্তি ক্রিয়া সুরু করে দিল। তখন তাদের পরস্পরের আকর্ষণে কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বা ততোধিক খণ্ড একত্রিত হয়ে একটি খণ্ডে পরিণত হলো। এই ভাবে দুই বা ততোধিক খণ্ড একত্রিত হওয়ায় ওদের আবর্তনের অক্ষরেখা পরিবর্তিত হলো। ইউরেনাসের ক্ষেত্রে খুব সম্ভবতঃ একই ভরের দুটি খণ্ডের মিলন সংঘটিত হওয়ায় ওদের আবর্তনের অক্ষরেখা অত অধিক পরিবর্তিত হয়েছে।

গ্রহ-সৃষ্টির এই যে পরিণতি, এর মধ্যে কোন আকস্মিক ঘটনা নেই। হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় আমাদের পৃথিবীর জন্ম হয় নি। ব্রহ্মাণ্ডের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সৃষ্ট হয়েছে গ্রহগুলি। এই কারণে বহু নক্ষত্রেরই গ্রহ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তবে অসুবিধা হলো—ঐ সব নক্ষত্র এত দূরে রয়েছে যে, তাদের গ্রহ-অবস্থানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করবার কোন উপায় নেই। ভবিষ্যতে যেদিন ঐ সুদূরের নক্ষত্রগুলির আয়ত্তাধীন গ্রহগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধির কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে, সেদিন নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে গ্রহ-সৃষ্টির এই নতুন তত্ত্ব।

ট্র্যান্সডিউসার

অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

ট্র্যান্সডিউসার বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক যন্ত্রা-বলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ব্যবহারিক জগতে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালিত বহু প্রকার যন্ত্র আমরা দেখতে পাই। বিদ্যুৎসম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার পরিমাপ আজকাল খুব সহজ-সাধ্য। অ-বৈদ্যুতিক কোন পরিমাপকে যদি কোন প্রকারে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে পরিণত করা যায়, তবে যে যন্ত্রের দরকার, তাকে ট্র্যান্সডিউসার বলা হয়। যেমন—মনে করা যাক, শব্দ-তরঙ্গ। শব্দ-তরঙ্গকে মাইক্রোফোনের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করা যায়। এক্ষেত্রে মাইক্রোফোন হলো একটা ট্র্যান্সডিউসার। আবার মাইক্রোফোন থেকে নির্গত তড়িৎ-তরঙ্গ পরিবর্ধিত করবার পর লাউডস্পীকারের সাহায্যে শব্দে পরিণত করা যায়। এখানে লাউডস্পীকারও একটি ট্র্যান্সডিউসার। বিভিন্ন ধরণের ট্র্যান্সডিউসারকে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায় :—

(ক) থারম্যাল বা তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার

(খ) যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার

(গ) রেডিয়েশন বা বিকিরণ ট্র্যান্সডিউসার

(ঘ) অ্যাকাউস্টিক বা শব্দসম্বন্ধীয় ট্র্যান্সডিউসার

(ঙ) চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার

(ক) তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার—তাপমাত্রা মাপ-বার জন্যে ব্যবহৃত থার্মোকাপল একটি সরল তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। দুটি ভিন্নজাতীয় ধাতু, যেমন তামা ও লোহার সংযোগকারী একটি প্রান্ত ঠাণ্ডা রেখে অপর সংযোগপ্রান্তে তাপ প্রয়োগ করলে যে তাপ-বৈষম্য হয়, তার ফলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটে। সৃষ্ট বিদ্যুৎ-বিভবের সঙ্গে উষ্ণ ও শীতল প্রান্ত দুটির তাপমাত্রার একটা গাণিতিক সম্বন্ধ আছে। সুতরাং মিটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-বিভব মেপে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অ-বৈদ্যুতিক পরিমাপক তাপ-মাত্রাকে থার্মোকাপলের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র বিভবের ডি. সি. বিদ্যুৎ-সঙ্কেতে পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এটা তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। এই ট্র্যান্স-ডিউসারের সাহায্যে অতি নিম্ন তাপমাত্রা, যেমন—200° সেন্টিগ্রেড থেকে উচ্চ তাপমাত্রা 1450° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত মাপা যায়। তবে এটা নির্ভর করে থার্মোকাপলের সংশ্লিষ্ট দুটি ধাতুর উপর।

রেজিস্ট্যান্স তাপমান যন্ত্র ও থার্মিষ্টর বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত আরো দুটি তাপীয় ট্র্যান্সডিউসার। তাপমাত্রার পরিবর্তনে পদার্থের বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তিত হয়। এই ধর্মের উপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত ট্র্যান্সডিউসার দুটি প্রস্তুত করা হয়। রেজিষ্ট্যান্স তাপমানযন্ত্রে ধাতু (সাধারণতঃ প্ল্যাটিনাম) থাকে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বর্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধক বর্ধিত হয়। থার্মিষ্টর সাধারণতঃ সেমিকণ্ডাক্টরের দ্বারা নির্মিত। সেমিকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বর্ধিত হলে বৈদ্যুতিক প্রতি-বন্ধকতা হ্রাস পায়। তাছাড়া অল্প তাপমাত্রার বৈষম্যে বেশী প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন হয়। এর ফলে অত্যল্প তাপমাত্রা নির্ণয়ে থার্মিষ্টর বিশেষ উপযোগী। তাছাড়া থার্মিষ্টর আকারে ছোট ও বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ও আকারের পাওয়া যায়। তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ কার্যে এর ব্যবহার সুবিধাজনক।

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, ঢেঙ্কানল কলেজ, ঢেঙ্কানল, উড়িশ্যা।

(খ) যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার—যান্ত্রিক উপায়ে নির্ণীত কোন পরিমাপক, যেমন—দৈর্ঘ্য, বল, চাপ ও ওজন ইত্যাদিকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করে মাপা যায় যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসারের দ্বারা।

ষ্ট্রেন গেজ এই ধরণের একটি ট্র্যান্সডিউসার। এক্ষেত্রে একটা সরু তার আগে পিছনে বাঁকিয়ে অপরিবাহী কাগজের উপর স্থাপন করা হয়। তারপর কোন তলের টান বা চাপ মাপবার জন্যে উপরিউক্ত জিনিষটি সিমেন্ট দিয়ে তলের সঙ্গে সাবধানে লাগানো হয়। চাপের পরিবর্তনে বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে যে বৈদ্যুতিক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়, তার পরিমাপ করে বল, চাপ ইত্যাদি বের করা যায়। এই ষ্ট্রেন গেজ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কোন যন্ত্র, রেলওয়ে লাইন, উড়োজাহাজ ইত্যাদির ষ্ট্রেন পরিমাপ করবার জন্যে বৈদ্যুতিক ষ্ট্রেন গেজ ব্যবহার করা হয়।

Linear Variable Differential Transformer (সংক্ষেপে L. V. D. T.) ষ্ট্রেন গেজের মত দৈর্ঘ্য, চাপ, বল, ওজন ইত্যাদি মাপবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে যে, ট্র্যান্সফরমারের মুখ্য বা প্রাইমারী ও গৌণ বা সেকণ্ডারী কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী স্থানের নরম লোহার (Iron-core) অতি ক্ষুদ্র স্থান পরিবর্তনে গৌণ অংশে প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক বিভবের পরিবর্তন হয়। স্থানচ্যুতির সঙ্গে এই বিভব পরিবর্তন সমানুপাতী। এই মূল তত্ত্বকে ভিত্তি করে এই যান্ত্রিক ট্র্যান্সডিউসার L. V. D. T. ব্যবহার করা হয়।

(গ) রেডিয়েশন বা বিকিরণ ট্র্যান্সডিউসার—এই জাতীয় ট্র্যান্সডিউসার আলোকবিকিরণ বা আয়ন বিকিরণের দ্বারা কার্যকরী হতে পারে। আলোকরশ্মি কতকগুলি অ্যালকালী ধাতু, যেমন—সিজিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদির উপর পড়লে ইলেকট্রন নির্গত হয়। একে বলা হয় ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট। বায়ুনিষ্কাশিত কাচের আধারে উপরিউক্ত ধাতুনির্মিত একটি ইলেকট্রোড থাকে এবং তার সামনে আর একটি সাধারণ ধাতুর ইলেকট্রোড রাখা হয়। বর্তমানে প্রথমটিকে বাইরে রাখা ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তে এবং দ্বিতীয়টিকে পজিটিভ প্রান্তে সংযোগ করে তীব্র আলোকরশ্মি যথাস্থানে নিক্ষেপ করলে প্রচুর সংখ্যক ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইলেকট্রনগুলি পজিটিভ ইলেকট্রোডের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই ধরণের ট্র্যান্সডিউসারকে বলা হয় ফটোসেল, বা আলোকসক্রিয় সুইচের মত কাজ করে। আরো দুটি স্বতন্ত্র ধরণের আলোকবিকিরক ট্র্যান্সডিউসার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। একটি হচ্ছে ফটোকণ্ডাক্টর আর একটি হচ্ছে ফটোভোলটেইক সেল। এর মধ্যে ফটোকণ্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আলোকশক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন ঘটে এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আলোকশক্তির দ্বারা বৈদ্যুতিক বিভবের উদ্ভব ঘটে। ফটোসেল, ফটোকণ্ডাক্টিং সেল এবং ফটোভোলটেইক সেলের যে কোনটিকে সাধারণভাবে ফটোটিউব বলা হয়। টেলিভিশন, মোশন পিকচার, ফটোমিটার, স্পেকট্রোফটোমিটার ছাড়াও ফটোটিউব আলোর স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, মাছের ঝাঁক বা কোন গতিশীল বস্তুর গণনা ইত্যাদি অসংখ্য কার্যে ব্যবহার করা হয়। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অনেক ব্যবস্থাপনার পিছনে ফটোটিউবের অবদান অনেকখানি।

আয়নবিকিরণ ট্র্যান্সডিউসারের মধ্যে গাইগার-মুলার কাউন্টার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপক হিসাবে সুপরিচিত। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বৈদ্যুতিক কণা নির্গত হয়, তা কাউন্টারের অভ্যন্তর আয়নিত করে বিচ্ছিন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে। কাউন্টারসংশ্লিষ্ট জটিল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে জানা যায়।

(ঘ) অ্যাকাউস্টিক বা শব্দসম্বন্ধীয় ট্র্যান্স-

টিউসার—সর্বজনপরিচিত মাইক্রোফোন ও লাউড-স্পীকার এই ধরণের দুটি ট্র্যান্সডিউসার। তাছাড়া আছে শ্রবণোত্তর ট্র্যান্সডিউসার। কম্পনসংখ্যা বিশ হাজার বা তার উপরে (প্রতি সেকেণ্ডে) হলে আমাদের শ্রবণচেতনায় সাড়া জাগায় না। কোয়ার্টজ, টুর্মেলিন ইত্যাদি কেলাসিত পদার্থের দুই প্রান্তে একটা নির্দিষ্ট উচ্চ কম্পন-সংখ্যার এ. সি (বিদ্যুৎ) প্রয়োগ করলে কেলাসিত বস্তুটির তীব্র কম্পনের দ্বারা শ্রবণোত্তর শব্দের সৃষ্টি হয়। কেলাসিত বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা এবং এ. সি. বিদ্যুতের কম্পন-সংখ্যা সমান হলে এই তীব্র কম্পনের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারকে বলা হয় পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট। শ্রবণোত্তর ট্র্যান্স-ডিউসারের দ্বারা সমুদ্রের গভীরতা বা অন্যান্য সামুদ্রিক পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া শিল্পক্ষেত্রে শ্রবণোত্তর ট্র্যান্সডিউসারের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির খুঁৎ বের করা যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও এর বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার আছে।

(ঙ) চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার—চুম্বকীয় ট্র্যান্স-ডিউসার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তবে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি পরিমাপ করাই এর কাজ। চৌম্বক ক্ষেত্র ও তারের কুণ্ডলীর আপেক্ষিক গতি বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা কোন কোন পদার্থ, যেমন—বিস্‌মাথ-এর বৈদ্যুতিক প্রতিবন্ধকের পরিবর্তন বা 'হল এফেক্ট' প্রয়োগ করে—চুম্বকীয় ট্র্যান্সডিউসার নির্মাণ করা হয়। অবশ্য এছাড়া আরো কয়েকটি মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেও এই জাতীয় ট্র্যান্সডিউসার প্রস্তুত করা হয়।

আজকাল বৈদ্যুতিক টেক্‌নিকের ব্যাপক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় শিল্প নিয়ন্ত্রণকার্যে এবং বিজ্ঞানাগারে গবেষণাকার্যে। পরীক্ষাধীন কোন পরিমাপককে প্রথমে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে ঐ সঙ্কেতকে পরিবর্ধিত প্রসেসিং (Processing), রেকর্ডিং করে সর্বশেষে প্রকাশন (Detect) করা হয়। এ সব কাজ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনায় সহজে করা যায় বলে ট্র্যান্সডিউসারের ব্যবহার অতি ব্যাপক।

অঙ্কুরোদ্গমের রহস্য

মনোজকুমার সাধু*

কি ভাবে একটি বীজ অঙ্কুরিত ও পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়—এই বিষয়ে অতি সাম্প্রতিক-কাল পর্যন্ত আমাদের কোন সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু বিগত কয়েক দশকের ব্যাপক গবেষণায় কয়েকটি উদ্ভিদ-হর্মোনের আবিষ্কারের ফলে এই রহস্যের মোটামুটি কিনারা করা সম্ভব হয়েছে।

দানাজাতীয় শস্য, যেমন—ধান, গম, যব ইত্যাদি উদ্ভিদের বীজে প্রধানতঃ দুটি অংশ দেখা যায়; যথা—(1) ভ্রূণ (Embryo)—যা কালক্রমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়; (2) শস্য (Endosperm)—যা অঙ্কুরোদ্গমের সময় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ভ্রূণকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করে, যতদিন ছোট চারাটি স্বয়ং খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম না হয় (1নং চিত্র)। শস্যের মধ্যে কঠিন অদ্রবণীয় অবস্থায় উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে এবং ভ্রূণ ব্যতিরেকে ঐ খাদ্য সহজ গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে না। ভ্রূণটিকে শস্য থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সঞ্চিত খাদ্য তরলীকৃত হয় না এবং অগ্রহণীয় কঠিন অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—ভ্রূণের মধ্যে কি এমন চাবিকাঠি আছে, যা শস্যের মধ্যস্থিত জটিল খাদ্যকে উদ্ভিদের সহজ গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আনে? এই বিষয়ে কতকগুলি উদ্ভিদ-হর্মোনের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য এবং তাদের বিষয় যথাস্থানে আলোচনা করবো।

সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে—বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হবার সময় একাধিক উদ্ভিদ-হর্মোন বিভিন্ন ভৌতিক ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। ঐ সকল উদ্ভিদ-হর্মোনের মধ্যে ডরমিন, জিবারেলিন, সাইটোকাইনিন ও অক্সিন প্রধান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বীজটি জলের সংস্পর্শে এলে যথারীতি অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু কিছু কিছু বীজ, যেমন—বন্য যব, বীট ইত্যাদি অনুরূপ অবস্থায় অঙ্কুরিত হয় না। ঐ সকল বীজের মধ্যে এক ধরণের বৃদ্ধি-নিবারক পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পর্যাপ্ত

1নং চিত্র

* কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃষ্টি বা সেচের জলে ঐ বৃদ্ধি-নিবারক পদার্থটি অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম সম্ভব হয় না। সম্প্রতি অঙ্কুরোদ্গম রোধকারী পদার্থটির রাসায়নিক প্রকৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের মিল্টেড রিসার্চ লেবরেটরীর কর্নফোর্থ ও ক্যালিফোর্নিয়ার সেল ডেভেলপমেণ্ট রিসার্চ লেবরেটরীর অ্যাডিকট স্বতন্ত্রভাবে প্রায় একই সময়ে পদার্থটির রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণয় করেন এবং গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করতেও সক্ষম হন। পদার্থটির নাম দেওয়া হয় ডরমিন বা অ্যাবসেসিক অ্যাসিড। ডরমিনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে এপর্যন্ত যা কিছু জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে, এর উপস্থিতিতে কোষের রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, বিশেষ করে নিউক্লিক অ্যাসিডের সংশ্লেষণ বন্ধ থাকে এবং ডরমিন অপসারিত হলেই কোষের স্বাভাবিক জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া সুরু হয়। এক কথায়—ডরমিন যেন একটা সুইচের মত কাজ করে। সুপ্ত বীজের অঙ্কুরোদ্গম রোধ করতে ডরমিনের ভূমিকা অন্যতম হলেও অন্যান্য ধরণের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন—বিভিন্ন ফেনোলিক অ্যাসিডের ভূমিকাও নগণ্য নয়। প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধিসহায়ক ও বৃদ্ধি-নিবারক—এই দুই পদার্থের ভারসাম্যের উপরই কোষের যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

ডরমিন অপসারিত হবার সময় বীজটি যথেষ্ট জল শোষণ করে এবং ভ্রূণের মধ্যে জিবারেলিন নামে একটি উদ্ভিদ-হর্মোনের উৎপাদন সুরু হয় এবং ক্রমে অ্যালুরিয়ন কোষস্তরে এসে জমা হয়। অ্যালুরিয়ন কোষস্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এই কোষগুলির স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চললেও এগুলির বিভাজন ক্ষমতা নেই এবং এই কোষস্তর জীবিত ভ্রূণকে মৃত শস্য থেকে পৃথক করে রাখে।

জিবারেলিনের প্রভাবে আলফা অ্যামাইলেজ নামে একটি এনজাইমের উৎপাদন সুরু হয়। এই এনজাইম শস্যের মধ্যে সঞ্চিত অদ্রবণীয় শ্বেতসারকে দ্রবণীয় শর্করায় পরিণত করে। আলফা অ্যামাইলেজ ছাড়া আরও নানান ধরণের এনজাইম, যেমন—প্রোটিন বিশ্লেষক এনজাইম, নিউক্লিক অ্যাসিড বিশ্লেষক এনজাইম ইত্যাদির উৎপাদনও সুরু হয়। এই সব এনজাইমের প্রভাবে কোষের সঞ্চিত খাদ্য ক্রমাগত ভেঙ্গে গিয়ে সরল খাদ্যে রূপান্তরিত হয়; ফলে ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির সরবরাহ অব্যাহত থাকে। আবার কোষের ক্রমাগত বিভাজন ও আয়তনে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই কাজে যথাক্রমে সাইটোকাইনিন ও অক্সিন নামে দুটি হর্মোন বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে। নিউক্লিয়েজ নামে একটি এনজাইমের সহায়তায় নিউক্লিক অ্যাসিড ভেঙ্গে সাইটোকাইনিন তৈরি হয়। সাইটোকাইনিন কি ভাবে কোষ-বিভাজনে সহায়তা করে, তা সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নি। তবে বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এটি DNA উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। ভ্রূণের কোষ তখন যথারীতি বিভাজিত হচ্ছে, কিন্তু কেবলমাত্র কোষ-বিভাজনই ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্যে যথেষ্ট নয়, নতুন কোষগুলির আয়তনে বৃদ্ধি পাওয়াও দরকার। অক্সিনের প্রভাবে কোষ-প্রাচীর কোমল বা দুর্বল হয় এবং জিবারেলিনের প্রভাবে কোষে দ্রবণীয় শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অসমোসিস প্রক্রিয়ায় কোষটি প্রচুর জল শোষণ করে আয়তনে সহজেই বৃদ্ধি পায়। ঠিক কি প্রক্রিয়ায় এটি সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, অক্সিনের প্রভাবে extensin নামে hydroxy proline-সমৃদ্ধ একটি প্রোটিনের সংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায় এবং কোষ-প্রাচীরে extensin-এর উপস্থিতিই এর নমনীয়তার প্রধান কারণ।

অক্সিনের (Indole acetic acid) উৎস সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে। শস্যের মধ্যে প্রোটিয়েজ নামে একটি এনজাইম প্রোটিনকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে বিশ্লিষ্ট করে, যার মধ্যে tryptophan অন্যতম। এই tryptophan আবার কতকগুলি এনজাইমের প্রভাবে ইণ্ডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

অক্সিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী লক্ষ্য করা যায়। ফলে কোলিয়োপটাইলের নীচের কোষগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধি পেলেও শিকড়ের নীচের কোষগুলি অপেক্ষা উপরের কোষ বেশী বাড়ে। কারণ একই পরিমাণ অক্সিনে এই দুই ধরণের কোষের বৃদ্ধি সমান নয়। এই প্রক্রিয়ায় অক্সিনের ভূমিকা ও বিভিন্ন কোষে এর

2নং চিত্র
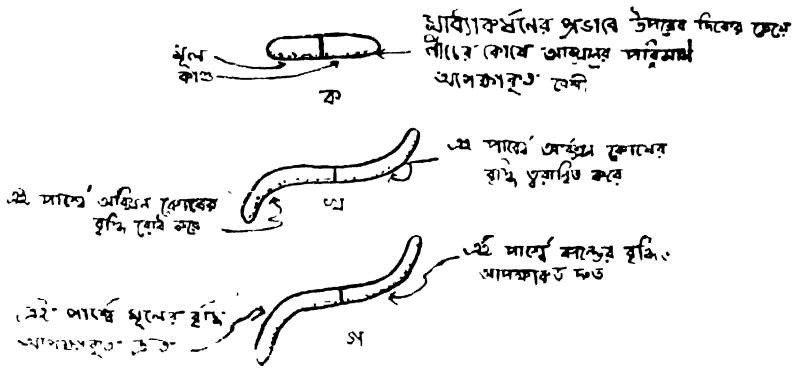
ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে, এর একটি অংশ (কোলিয়োপটাইল) মাটির উপরে উঠে আসে, অন্য অংশটি (মূল বা শিকড়) মাটির মধ্যে প্রবেশ করে (2নং চিত্র)। এখানেও অক্সিনের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণটি যখন মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, তখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে উপরের কোষ থেকে নীচের কোষে

পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

চারার পরবর্তী বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ, ফল ও বীজের পরিপক্কতা ইত্যাদি প্রক্রিয়াও বিভিন্ন উদ্ভিদ-হর্মোন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই বিষয়ে দেশে ও বিদেশে বহু গবেষণা হলেও উক্ত প্রক্রিয়াগুলির সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করা এখনও সম্ভব হয় নি।

পরমাণু-বিভাজন ও পারমাণবিক শক্তি

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

টমসন, রাদারফোর্ড এবং বোরের পারমাণবিক তত্ত্বের পর পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গেল এবং পরমাণুর বিষয়ে গবেষণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সজ্জা, নিউট্রনের আবিষ্কার ইত্যাদির ফলে পরমাণুর মৌলিক কণিকাগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়েও গবেষণা চলতে থাকল। রাদারফোর্ডের পারমাণবিক তত্ত্ব এবং নিউট্রন-প্রোটন তত্ত্বের পর আমরা জানতে পারলাম পরমাণুর কেন্দ্রীনে (Nucleus) প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে। পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রোটনের সংখ্যা -Z- ধরলে নিউট্রনের সংখ্যা হয় (A— -Z-), যেখানে A ঐ পরমাণুর পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight)। ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান থাকে, আর তাই জন্যে ঋণাত্মক আধান (Negative charge) ও ধনাত্মক আধান (Positive charge) পরস্পরকে প্রশমিত (Electrically nutral) করে পরমাণুকে নিস্তড়িৎ অবস্থায় রাখে। ইলেকট্রনগুলি প্রোটন ও নিউট্রনের আবাসের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষে (Orbit) ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের পারস্পরিক আকর্ষণ বল এবং ইলেকট্রনের গতিবেগের জন্যে উদ্ভূত অপকেন্দ্র বল (Centrifugal force) ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরতে সহায়তা করে। ধনাত্মক আধান-বিশিষ্ট প্রোটনসমূহ কেন্দ্রীনে থাকায় সমধর্মী আধানের বিকর্ষণ বলের জন্যে পরমাণুর সুস্থিরতা (Stability) কিরূপে বজায় থাকে, সে বিষয় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

আমরা কুলম্বের (Coulomb) সূত্র থেকে জানি যে, দুই আধানের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল* আধানদ্বয়ের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতে বেড়ে যায় আর তাদের পারস্পরিক দূরত্বের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতে কমে যায়। কিন্তু আধানদ্বয়ের দূরত্ব যদি খুব কম হয়, তখন কুলম্বের এই সূত্র খাটছে না, বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো (George Gammow) এই অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, সে সময় সমআধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে। আর সত্য সত্যই প্রোটনগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব খুবই কম—বলা যেতে পারে তা এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি ভাগেরও (10^{-12}cm) কম পরিমাণ। উপরন্তু নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে এমন একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে যে, আর একটি ক্ষণস্থায়ী মৌল কণা সর্বদাই প্রোটন ও নিউট্রনকে বেঁধে রাখতে সহায়তা করে। এই কথা বললেন জাপানী বিজ্ঞানী য়ুকাওয়া (Yukawa)। ইলেকট্রন আর প্রোটনের মাঝামাঝি ভর বলে এই কণিকাটির নাম দিলেন মেসন (Meson)†। এইভাবে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিস্তড়িৎ পরমাণুর কেন্দ্রীন সুস্থির থাকে।

জানা গেছে, প্রোটন ও নিউট্রনের আবাস ঐ খোলসটির ব্যাস এক সেন্টিমিটারের এক লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ (10^{-12}cm) আর নিকটতম ইলেকট্রন কক্ষের ব্যাস এক সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ (10^{-6}cm)। সুতরাং

---

* সম আধানের মধ্যে বিকর্ষণ এবং বিপরীত আধানের মধ্যে আকর্ষণ হয়।

† জাপানী ভাষায় মেসন কথার অর্থ মাঝামাঝি।

প্রতিটি পরমাণুর বিরাট অংশ থাকে ফাঁকা। এই স্থান দিয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন ইত্যাদি অতি সহজেই যাতায়াত করতে পারে। তবে ইলেকট্রন বা প্রোটন ইত্যাদি কোন আহিত কণাকে (Charged particle) যেতে হলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল অতিক্রম করে যেতে হয়, কিন্তু অনাহিত কণার (Uncharged particle) সেই বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই নিউট্রন দিয়ে কোন পরমাণুকে আঘাত করা অধিকতর সহজ হয়।

আলফা কণিকার* সাহায্যে পরমাণুকে আঘাত করে পরমাণু-বিভাজনে রাদারফোর্ডের পরীক্ষা বিজ্ঞানে নতুন যুগ এনে দিল। 1919 সাল সেই কারণে নিউক্লিয়ার যুগের সূচনাকাল। বায়ুতে আলফা কণিকার বিস্তার (Range) 7cm-এর অধিক নয়, বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তা আগে থেকেই জানা ছিল। কিন্তু রাদার-ফোর্ডের পরীক্ষায় মনে হলো বুঝি এই তথ্য ভুল। তবুও সুপ্রতিষ্ঠিত ঐ তথ্যকে রাদারফোর্ড ভুল ভাবতে পারলেন না, তাই তিনি অন্য ভাবে চিন্তা করতে থাকলেন। এখন রাদারফোর্ডের পরীক্ষাটা সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া যাক।

তাঁর পরীক্ষায় একটি প্রবেশ ও একটি নির্গমন পথবিশিষ্ট কক্ষের ভিতর একটি কাচদণ্ডে কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ† (Radioactive substance) রাখা ছিল। নির্গমন পথ দিয়ে বায়ু বের করে নিয়ে প্রবেশ পথ দিয়ে নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস ভর্তি করে নেওয়া হতো। যে দিক দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণিকা বেরিয়ে আসত, তার বিপরীত পার্শ্বে ছিল একটি প্রতিপ্রভ পর্দা (Fluorescent screen), আর প্রতিপ্রভ পর্দা লক্ষ্য করবার জন্যে ছিল একটি মাইক্রোস্কোপ। প্রতিপ্রভ পর্দা আর আলফা কণিকার উৎসের মধ্যে দূরত্ব ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যেত। অনুরূপ অবস্থায় এই দূরত্ব 7cm থেকে বাড়িয়ে নিয়েও দেখা গেল যে, উৎস থেকে আগত আলফা কণিকা প্রতি-প্রভ পর্দা ঝিকমিক করে তুলছে। তাই তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, অবশ্যই আগত আলফা কণিকা নাইট্রোজেনকে ভেঙে ফেলেছে এবং তা থেকেই কোন কণিকা এসে প্রতিপ্রভ পর্দায় ঝিকমিক সৃষ্টি করছে। প্রকৃতপক্ষে নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীন ভেঙে দূর পাল্লার প্রোটন বেরিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা সহজ করে বুঝবার জন্যে আমরা কিছুটা গাণিতিক আলোচনা করতে পারি। আপেক্ষিকতা তত্ত্বে (Theory of relativity) আইনষ্টাইন ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র প্রতিষ্ঠা করে বললেন, এক গ্রাম পদার্থকে ধ্বংস (Annihilation) করে মোট 9×10^{20} আর্গ বা 9320 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পেতে পারি। ভর ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্র থেকে প্রতি এক গ্রাম ভরে প্রাপ্ত শক্তি

$E = m$ (ভর) $\times c^2$ (শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগের বর্গ)

$= 1\times(3\times10^{10})^2$ আর্গ

$= 9\times10^{20}$ আর্গ।*

রাদারফোর্ডের পরীক্ষার সমীকরণটি—

$${}^{4}_{2}He + {}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$$
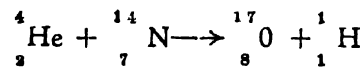
4 একক ভরযুক্ত এবং 2 পরমাণু ক্রমাঙ্কের (অর্থাৎ

* দুই একক আধানযুক্ত কণা ; দ্বি-আয়নিত হিলিয়াম মৌলিক পদার্থও ধরা যেতে পারে।

† এই পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছিল রেডিয়াম C′

* তাপ শক্তিতে প্রকাশ করলে পাওয়া যাবে 227 কি. গ্রা. বিশুদ্ধ জলকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে যে তাপ প্রয়োজন, তার এক লক্ষ কোটি গুণ (227×10^{15} Calories) পরিমাণ শক্তি।

ধনাত্মক আধান প্রোটনের সংখ্যা 2 এবং ঋণাত্মক আধান ইলেকট্রনের সংখ্যা 2) হিলিয়াম দ্বি-আয়নিত কণার (অর্থাৎ আলফা কণিকা) দ্বারা 14 একক ভরযুক্ত 7 পরমাণু ক্রমাঙ্কের নাইট্রোজেনকে আঘাত করায় 17 একক ভরযুক্ত 8 পরমাণু ক্রমাঙ্কের অক্সিজেন এবং প্রোটন উৎপন্ন হয়েছে। আগত আলফা কণিকার শক্তি ছিল 77 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট, এক্ষণে 77 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট $=\frac{77}{9320}$ পরমাণু-ভর একক (atomic mass unit বা সংক্ষেপে a.m.u)।

$= \cdot 0083$ a.m.u.

সুতরাং সমীকরণের বাম দিকে মোট যে তুল্যাঙ্ক ভর পাওয়া যাচ্ছে, তার পরিমাণ

$= (4{\cdot}0040 + 14{\cdot}0075 + {\cdot}0083)$ a.m.u.

$= 18{\cdot}0198$ a.m.u.

এবং উৎপন্ন অক্সিজেন ও প্রোটনের যুগ্ম ভর

$=(17{\cdot}0045 + 1{\cdot}0081)$ a.m.u.

$= 18{\cdot}0126$ a.m.u.

এই দুই ভরের পার্থক্য

$= (18{\cdot}0198 - 18{\cdot}0126)$ a.m.u.

$= {\cdot}0072$ a.m.u.

$= 67$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

ভরের সঙ্গে শক্তি ব্যস্তানুপাতে ভাগাভাগি করে নেয় অর্থাৎ অক্সিজেন পায় 3·7 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট আর প্রোটন পায় প্রায় 17 গুণ, অর্থাৎ 63·3 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। অধুনা রাদারফোর্ডের পরীক্ষার উন্নততর ব্যবস্থায় প্রোটনের বিস্তার 48cm এবং মোট শক্তি 60 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট পাওয়া গেছে। তাই গণনা ও পরীক্ষা লব্ধ ফলের যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেল।

চ্যাড্উইকের (Chadwick) নিউট্রন আবিষ্কারের বিখ্যাত সমীকরণটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। পলোনিয়াম উৎস থেকে আগত আলফা কণিকার দ্বারা বেরিলিয়াম (Be) পরমাণুকে আঘাত করা হয়। এর ফলে কার্বন (C) এবং নিউট্রনের (n) উৎপত্তি হয়—

$${}^{4}_{2}He + {}^{9}_{4}Be + E_1 \longrightarrow {}^{12}_{6}C + {}^{1}_{0}n + E_2$$
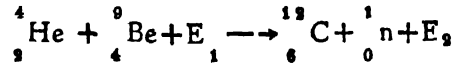
এখানে আলফা কণিকার বায়ুতে বিস্তার ছিল 3·8cm এবং শক্তি 53 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট (E_1)। এই শক্তির তুল্যাঙ্ক ভর ·0057 a.m.u. সুতরাং বামদিকের ভর

$= (4{\cdot}0040 + 9{\cdot}0150 + {\cdot}0057)$ a.m.u.

$= 13{\cdot}0247$ a.m.u.

কার্বন ও নিউট্রনের ভর

$= (12{\cdot}0040 + 1{\cdot}0090)$ a.m.u.

$= 13{\cdot}0130$ a.m.u.

$\therefore E_2 = (13{\cdot}0247 - 13{\cdot}0130)$ a.m.u.

$= {\cdot}0117$ a.m.u.

$= {\cdot}0117 \times 9320$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

$= 109$ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট।

এই শক্তি ভাগাভাগি করলে দাঁড়ায় পুনরায় কুণ্ডলীপ্রাপ্ত (Recoiled) কার্বনের শক্তি 8 লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট এবং নিউট্রনের এক কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট।

এইভাবে পরমাণু-বিভাজনের পরীক্ষা থেকে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত ভর শক্তির পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রের সত্যতা প্রকটভাবে প্রতীয়মান হলো। তবে কেন্দ্রীনকে ভেঙ্গে ফেলবার জন্যে বিশেষ বিশেষ পরমাণুর ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটা শক্তির আবশ্যক। এই শক্তির কম শক্তিতে পরমাণুর বিভাজন সম্ভব নয়। সবচেয়ে দ্রুতগামী আলফা কণিকার সাহায্যেও অনেক পরমাণুকে ভাঙ্গা সম্ভব হয় না। অধুনা পরমাণু সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণার বিষয় জেনে পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠন-জটিলতা সম্বন্ধে কিছু জানবার ফলে অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে—কেন তা সম্ভব নয়। কিন্তু একবার পরমাণু ভাঙ্গতে পারলে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায়, সেই শক্তি আবার পরবর্তী পরমাণুকে ভাঙ্গতে সক্ষম ; এই ভাবে নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে।

নিরবচ্ছিন্ন এই প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে শৃঙ্খল বিক্রিয়া (Chain reaction)। এই প্রক্রিয়াটিকে ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়াও (Divergent chain reaction) বলা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ প্রক্রিয়ায় যদি আমরা বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি—যাতে করে একটি নিউট্রন আবার পরমাণু ভেঙ্গে একটি মাত্র নিউট্রনই বের করতে পারে, তবে একটি সুস্থির প্রক্রিয়ায় শক্তি পাওয়া সম্ভব। এক্ষণে প্রথম প্রক্রিয়াটি পরমাণু-বোমায় সংঘটিত হয় আর দ্বিতীয়টি সংঘটিত হয় পরমাণু-রিয়্যাক্টরে। প্রথম ক্ষেত্রে যা মানবজাতির চূড়ান্ত অকল্যাণে ব্যবহৃত হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই কাজ করে মানবজাতির পরম কল্যাণে।

1939 সালে প্রথম দু-জন জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান (Otto Hahn) এবং ফ্রিৎস ষ্ট্রাস্‌মান (Fritz Strassmann) [অবশ্য মূল পরীক্ষা 1938 সালের ডিসেম্বরে করে থাকেন] আবিষ্কার করলেন যে, ইউরেনিয়াম-235 ($^{235}_{92}U$) বা প্লুটোনিয়াম-239 ($^{239}_{94}Pu$)-এর মত ভারী পরমাণুকে তেজী নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা যায়, তবে পরমাণুটি ভেঙ্গে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন নিউট্রন বেরিয়ে আসে—

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{148}_{57}La + ^{88}_{35}Br + 3\,^{1}_{0}n$$
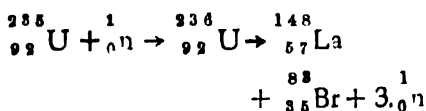
প্রতি ইউরেনিয়াম -235 পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে তিনটি করে নিউট্রন। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এই নিউট্রনগুলি আরও ইউরেনিয়াম-235কে ভেঙ্গে ফেলে এবং এই প্রক্রিয়াটি গুণোত্তর হারে বেড়ে চলে। ক্রমবর্ধমান শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় মুহূর্তের মধ্যে 20 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের সমতুল্য শক্তি বেরিয়ে আসে। অবশ্য পরমাণু-বোমায় সাধারণতঃ প্লুটোনিয়াম-239 ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এইরকম প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়াম-238-এর সঙ্গে নিউট্রন যুক্ত করে পাওয়া যায়। ভারতের ট্রম্বেতে আমাদের বিজ্ঞানীরা এরকম প্লুটোনিয়াম তৈরি করতে পারেন এবং বছরে প্রায় দুটি পরমাণু-বোমার পরিমাণ প্লুটোনিয়াম-239 তৈরি করা যায়; কিন্তু আরোপিত সর্তে সে সব মানব কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হবার জন্যে; সে সব দিয়ে পরমাণু বোমা তৈরি করা হয় না।

নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (Controlled chain reaction) ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদির বিভাজনের মাধ্যমে স্থির শক্তি পাওয়া সম্ভব। বেরিয়েআসা প্রতি তিনটি নিউট্রনের দুটিকে ক্যাডমিয়াম শোষক দিয়ে শোষণ করে যদি একটিকে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়, তবেই প্রতি ক্ষেত্রে একটি করে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি ভাঙতে থাকবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি স্থিরভাবে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই শক্তিকে তেল, কয়লা ইত্যাদির পরিবর্তে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। চীন গণ-প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মত দেশে ইতিমধ্যেই এই পারমাণবিক শক্তি মানবকল্যাণেও নিয়োজিত হচ্ছে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনে এর প্রচলন বেশ বেড়েছে। বোম্বাই থেকে কুড়ি মাইল দূরে তারাপুরে 380 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় কেন্দ্র 400 মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন এবং এটি স্থাপিত হয়েছে রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগরে। তৃতীয় একটি কেন্দ্রও শীঘ্রই মাদ্রাজের কালপাক্কামে তৈরি হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের সাধনায় প্রাপ্ত এই অপরিমিত শক্তি মানবকল্যাণে নিয়োজিত হলে মানবজাতির অগ্রগতি কে রোধ করতে পারে?

সমুদ্র-গর্ভে খনিজ পদার্থের সন্ধান

শ্রীকমল নন্দী

মানুষের অনুসন্ধানের আর শেষ নেই। পৃথিবীপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এবার তারা নেমেছে সাগরের গভীরে।

যুক্তরাজ্যে পরমাণু শক্তি কমিশনের আইসোটোপ উন্নয়ন বিভাগের গবেষণার ফলে সম্প্রতি নতুন নিউক্লিয়ার সন্ধানী-শলাকা (Nuclear probe) আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে সমুদ্র-গর্ভে খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। শলাকাটি এতই অনুভূতিসম্পন্ন যে, কয়েক টন খনিজ পদার্থের মধ্যে কোনও বিশেষ মৌল, যেমন—সোনা, রূপা, তামা বা ম্যাঙ্গানিজ যদি কয়েক আউন্সও থাকে, তাহলেও তার উপস্থিতি ধরা পড়বে। বিজ্ঞানীরা এই শলাকাটিকে ব্যাপকভাবে সমুদ্রের গভীরে খনিজ পদার্থের সন্ধানে কাজে লাগবার কথা চিন্তা করছেন। এমন কি, চলমান জাহাজ বা ডুবোজাহাজ থেকে এই শলাকাটির সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে সমুদ্র-গর্ভের ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক (Geophysical) মানচিত্র তৈরি করবার ব্যাপারও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই করা সম্ভব।

আগেও এই ধরণের অনুসন্ধান চলতো। সমুদ্রের তলদেশ থেকে শিলা সংগ্রহ করে এনে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা হতো। কিন্তু এখন এই শলাকাটির সাহায্যে খনিজ পদার্থগুলিকে স্থানচ্যুত না করে স্বস্থানেই (In situ) বিশ্লেষণ করে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ কি পরিমাণে আছে, তা নির্ণয় করা যায়। এদিক থেকে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। শুধু সামান্য কয়েকটা মৌলই নয়, খনিজের মধ্যে কম পক্ষেও 20 থেকে 30টি মৌলিক পদার্থের পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

শলাকাটির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রায় 100 কিলোগ্রাম ওজনের একটা কৃত্রিম খনিজস্তূপ সমুদ্রের তলদেশে ফেলে দেওয়া হয়। তাতে ছিল সোনা, রূপা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ। পরে শলাকাটির সাহায্যে প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণগত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রকৃত পরিমাণের সঙ্গে নির্ধারিত পরিমাণের কার্যতঃ বিশেষ কোনও তফাৎ নেই।

শলাকাটির কাজের কথা তো কিছু বলা হলো। এবার এর কার্যপ্রণালীর তত্ত্বগত দিকটা আলোচনা করবো।

এই শলাকাটিতে থাকে 0·2 মিলিগ্রাম (প্রায় 0·00001 আউন্স) ক্যালিফোর্নিয়াম-252 এবং উচ্চ অনুভূতিসম্পন্ন গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্র (Gamma-ray detector)।

এটা আসলে খুব নিম্নশক্তিসম্পন্ন neutron activation analysis। ক্যালিফোর্নিয়াম-252 উৎস থেকে খুবই অল্প সংখ্যক নিউট্রন নির্গত হয়। এই ধীরগতি নিউট্রনগুলিকে (Slow neutrons)—তারপর যে খনিজ পদার্থগুলিকে পরীক্ষা করতে হবে—তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। খনিজ পদার্থগুলি এই সব ধীরগতি নিউট্রনকে শোষণ করে এবং একটি নতুন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন হয়।

$$_{Z}X^{A} + {}_{0}n^{1} \longrightarrow {}_{Z}X^{A+1} + \gamma$$
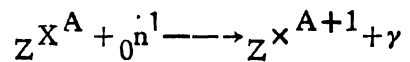
অর্থাৎ X নামে একটি মৌল, যার ভরসংখ্যা A ও পারমাণবিক সংখ্যা Z, যখন নিউট্রন ($_0n^1$) কণার দ্বারা বিকিরিত হওয়ার ফলে মৌলটি একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে পরিণত হয়, যার

ভরসংখ্যা (A+1) ও পারমাণবিক সংখ্যা Z এবং গামারশ্মি (γ) নির্গত হয়। এই নির্গত গামারশ্মি জার্মেনিয়াম-লিথিয়াম গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্র দিয়ে বিশ্লেষণ করে খনিজটির মৌলিক উপাদান নির্ণয় করা সম্ভব।

সমুদ্র-গর্ভে কয়েক ইঞ্চি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট ক্ষেত্রফলের উপর 2/1 মিনিট ধরে ক্যালিফোর্নিয়াম-252-এর উৎস থেকে নির্গত ধীরগতি নিউট্রন রশ্মির বিকিরণ হয়; তারপর নির্গত গামারশ্মি—গামারশ্মি নির্দেশক যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে কি কি মৌলিক পদার্থ কত পরিমাণ আছে, তা 4/5 মিনিটের মধ্যে নিরূপণ করা মোটেই শক্ত কাজ না। এই বিকিরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয়তার সৃষ্টি হয়, তার জন্যে তেজস্ক্রিয়তাজনিত কোনও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা মোটেই নেই, কারণ সেই তেজস্ক্রিয়তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খুব ক্ষীণ হয়ে যায়—ঐ স্থানের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার প্রায় $\frac{1}{100}$ ভাগ কমে যায়।

দু-মুখ বন্ধ $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট 3 ইঞ্চি দীর্ঘ ষ্টেনলেশ ষ্টীলের কৌটার মধ্যে থাকে ক্যালিফোর্নিয়াম-252। সন্ধানী-শলাকার এক প্রান্তে থাকে এই কৌটাটি আর অপর প্রান্তে 5 ফুট দূরে থাকে 2 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট জার্মেনিয়াম-লিথিয়াম ডিটেক্টর।

এই যন্ত্রের বহুল প্রচারের জন্যে এখন জোর চেষ্টা চলছে, যাতে সমুদ্র-গর্ভের খনিজ পদার্থের মানচিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয়। এখন বিশ্বের কয়েকটি প্রখ্যাত গবেষণাগারে এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সঞ্চয়ন

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চান্দ্র উপাদান পর্যালোচনা

বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্ট্যাল রিসার্চে চান্দ্র শিলা নিয়ে গবেষণার ফলে নূতন অনেক কিছু জানা গেছে, চাঁদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের সীমা অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সকল তথ্য চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি-রহস্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

অ্যাপোলো-11 এবং অ্যাপোলো-12-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে সকল মৃত্তিকা ও প্রস্তর পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের কতকাংশ বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটকে দেওয়া হয় এবং ডক্টর দেবেন্দ্রলাল সাতজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নিয়ে এই সকল উপাদানের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। 1971 সালের প্রথম দিকে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার উদ্যোগে চান্দ্র বিজ্ঞান বিষয়ে যে দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁদের গবেষণার কিছুটা ফলাফল উপস্থাপিত করা হয়।

ইনস্টিটিউটের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর লাল এই গবেষণার ফলাফল খুবই চমকপ্রদ বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন—উল্কাকণা সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা বর্তমান পর্যালোচনায় সুসমর্থিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের মহাজাগতিক ঘটনার ইতিহাস চান্দ্র শিলায় যে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তা আমরা এই অনুসন্ধানের ফলে জানতে পেরেছি।

এই গবেষণার ফলে প্রধানত: নিম্নলিখিত তথ্য-সমূহ সংগৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণা ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পক্ষে এই সকল তথ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা চান্দ্র উপাদানের মধ্যে খুব ভারী রাসায়নিক মৌলিক উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন। গবেষণাগারে অথবা প্রকৃতিতে এই ধরণের উপাদানের সন্ধান এর আগে পাওয়া যায় নি। ভবিষ্যতে নক্ষত্রের বিবর্তন, মৌলিক উপাদানের সংশ্লেষণ এবং সৌরমণ্ডলীর বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি-রহস্য উন্মোচনে এই সকল তথ্য খুবই সহায়ক হতে পারে।

নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় মৌলিক পদার্থের ভরের তালিকা প্রসারিত হবে, 300 ভরের পদার্থও সেই তালিকায় স্থান পাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। বর্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার গবেষণাগারে সবচেয়ে ভারী যে সকল মৌলিক উপাদান কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বা সংশ্লিষিত হয়েছে, এই সকল চান্দ্র উপাদান তার চেয়েও ভারী। আদি সূর্যের উষাকালে কি রকম তাপমাত্রা ও ঘনত্বের কোন্ পরিবেশে যে এই সকল অতিরিক্ত ভারী মৌলিক উপাদানের জন্ম হয়েছিল, সে বিষয়েও এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

চান্দ্র ধূলির মধ্যে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারী, যেমন প্লুটোনিয়াম-244 নামক মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই মৌলিক উপাদান প্রচুর পরিমাণে চান্দ্র ধূলিতে রয়েছে। ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই উপাদানের সন্ধান তিনি চান্দ্র মৃত্তিকায় পেয়েছেন, চান্দ্র শিলায় নয়। এতে চাঁদের অংশবিশেষ যে খুবই প্রাচীন, এই কথাই প্রমাণিত হয়। সৌর-মণ্ডলীর সৃষ্টির পূর্বেই চাঁদ যখন কঠিন আকার ধারণ করছিল, সেই সময়ের উপাদান রয়েছে চাঁদের কোন কোন অংশে।

ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে আরও বলেন—এর মধ্যে কেবলমাত্র চান্দ্র ধূলির প্রাচীনত্বের প্রমাণই নয়, পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানের দিক থেকেও এই তথ্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সৌর-মণ্ডলীর সৃষ্টির আদি পর্বে অতিরিক্ত ভারী মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের সন্ধান করতে গিয়ে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই সকল পদার্থের অস্তিত্ব কোটি কোটি বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রয়েছে, আর যথেষ্ট পরিমাণে এই ধরণের ভারী পদার্থের সংশ্লেষণের অনুকূল পরিবেশও রয়েছে।

চান্দ্র ধূলিতে প্লুটোনিয়ামের অস্তিত্ব চাঁদের সৃষ্টির রহস্যের উপরও আলোকপাত করে। ডক্টর নরেন্দ্র ভাণ্ডারী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,—কেন্দ্রীন-সংশ্লেষণের বা নিউক্লিয়ার সিন্থেসিসের সমাপ্তি এবং চাঁদের স্বতন্ত্র গ্রহ হিসাবে রূপ গ্রহণের মধ্যে কয়েক কোটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্নোলোজীর বিজ্ঞানী-দের পর্যালোচনায়ও এই মত সমর্থিত হয়েছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়েও ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়েছিলেন। অ্যাপোলো-12 যে চান্দ্র শিলা পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল, সেই শিলার মাধ্যমেই তাঁরা এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মহাজাগতিক রশ্মির প্রধান উৎস যে সূর্য, তা সর্বজনবিদিত। তাঁরা বলেছেন যে, গত এক কোটি বছরের মধ্যে এই সকল রশ্মির শক্তির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

চান্দ্র মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর নিয়েও ঐ সকল বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁরা এই সম্পর্কে বলেছেন যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে বর্তমানে যে সকল প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়, সে সকল বিশ লক্ষ বছর পূর্বে চন্দ্রগর্ভের 20 সেন্টিমিটার নীচু থেকে উপরে উঠে এসেছে। চান্দ্র ধূলি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, চন্দ্রে নানা গহ্বর রয়েছে। যে স্থান থেকে ঐ ধূলি সংগৃহীত হয়েছে, সেখানে 1 থেকে 10 কোটি বছরের মধ্যে বিভিন্ন গহ্বর থেকে ঐ

উপাদান এসে জমা হয়েছিল। চাঁদ সৃষ্টি হয়েছে 450 কোটি বছর পূর্বে, সুতরাং সেই তুলনায় এই সময়টা এমন কিছু বেশী সময় নয়।

ফসিল ট্র্যাক টেক্‌নিক বা যে প্রক্রিয়ায় কোন বস্তু প্রস্তরীভূত হয়, সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যে উল্কাকণা নিয়ে এখানে গবেষণা হচ্ছে। এই গবেষণার স্বীকৃতি হিসাবেই এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার জন্যে চান্দ্র উপাদান উপহার দিয়েছেন। অ্যাপোলো-14 র মহাকাশচারীরা যে সকল চান্দ্র শিলা ও ধূলি পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, সে সকলও তাদের দেওয়া হয়েছে।

ফসিল ট্র্যাক টেক্‌নিক সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, ভারী বিদ্যুতাহিত কণাসমূহ যখন প্রস্তরের সিলিকেট মিনারেল বা ধূলির মধ্যে যে ধাতব পদার্থ রয়েছে, তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই সকল কণা সেই প্রস্তরের কাঠিন্যের দরুণ পরিণতি লাভ করতে পারে না। জীবাশ্মের মধ্যেই সেই কণাপ্রবাহের অবস্থান্তর ঘটে। এদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্ভব, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও এই সকল কণার সন্ধান পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতিতেই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা চান্দ্র শিলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ডক্টর লাল এই প্রসঙ্গে বলেছেন—বিদ্যুতাহিত এক মিলি-গ্র্যামের এবং তার চেয়েও কম চান্দ্র উপকরণের উপর আমরা এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখেছি। মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টির সুরু থেকেই ঐ চান্দ্র শিলা ও ধূলি ঐ রশ্মির তেজস্ক্রিয়ার মধ্যে ছিল। এই তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই তেজস্ক্রিয়ার ইতিহাস নূতন করে রচনা করতে হচ্ছে। যে সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের অস্তিত্বের সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রস্তরসমূহ ঘনীভূত হবার সময়ে পাওয়া যেত, এই পদ্ধতিতে সেই সকল আইসোটোপ সম্পর্কেও তথ্যানুসন্ধান করা যেতে পারে।

চাঁদ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ডক্টর লাল আরও বলেন—আমাদের উত্তর পুরুষেরা চাঁদকে নানা-ভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেখানে তারা বসবাস করতে পারে, চাঁদকে ভিত্তি করে তারা অন্য গ্রহে যেতে পারে, রসায়ন-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা চালাতে পারে। মহাজাগতিক রশ্মির তেজস্ক্রিয়া, উল্কাকণা, সৌরঝঞ্ঝা এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আজ আর মাত্র পুঁথিগত বিষয় নয়—এই সকল বিষয়ের সঙ্গে এই পৃথিবীর মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রশ্নও জড়িত।

কীট-পতঙ্গের সমাজ

শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু*

প্রজাপতি, মথ, পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি হলো সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত জীব। অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ এককভাবে বাস করলেও কয়েক রকম কীট-পতঙ্গের মধ্যে বিচিত্র ধরণের সামাজিক জীবন দেখা যায়। সামাজিক পতঙ্গেরা বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ তৈরি করে বাস করে। একটি উপনিবেশে সামাজিক রীতি অনুযায়ী একই প্রজাতির পতঙ্গদের মধ্যে কার্য অনুসারে শ্রেণীভেদ থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গেরা তাদের নিজ নিজ কার্যের দ্বারা সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী বা উপনিবেশকে বাঁচিয়ে রাখে।

পিপীলিকা

পিপীলিকা পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত পরিচিত সামাজিক পতঙ্গ। বিখ্যাত কীট-পতঙ্গবিদ্ Imms একটি পিপীলিকা গোষ্ঠীতে 29 রকমের শ্রেণীভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। সচরাচর একটি পিপীলিকার উপনিবেশে 4 রকমের শ্রেণীভেদ দেখা যায়।

রাণী—একটি উপনিবেশে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে রাণীই একমাত্র রাজকীয় সম্মান পেয়ে থাকে। দৈহিক আকৃতিতে রাণীই হলো সবচেয়ে বড়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় রাণীর দেহে একজোড়া ডানা গজায়। আবার পরিণত বয়সে ঐ ডানা ঝরে যায়। এদের একমাত্র কাজ হলো ডিম পাড়া। পিপীলিকার একটি উপনিবেশে কতকগুলি রাণী বাস করে। এদের পরিচর্যার ভার থাকে শ্রমিকদের হাতে। একমাত্র বংশবৃদ্ধি ছাড়া এরা সমাজের জন্যে অন্য কোন কাজ করে না। এদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ।

2. পুরুষ—রাণীদের অপেক্ষা দৈহিক আকৃতিতে এরা বেশ ছোট হয়। পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির সময় এদের দেহেও একজোড়া ডানা গজায়। সামনের শুঁড় দুটি অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। এদের একমাত্র কাজ মিলনের সময় শুক্রাণুর দ্বারা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা ; কিন্তু জন্মসূত্রে এরা রাণীর অনিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট হয়।

3. শ্রমিক—প্রকৃতপক্ষে এরা প্রজনন ক্ষমতাহীন স্ত্রীপতঙ্গ। নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে এদের জন্ম হয়। কিন্তু খাদ্য-বৈষম্যের জন্যে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এরা প্রজনন-ক্ষমতারহিত শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। এদের ডানা গজায় না। প্রকৃতপক্ষে এরাই শ্রম দিয়ে উপনিবেশকে বাঁচিয়ে

পিপীলিকা

পুরুষ রাণী সৈনিক শ্রমিক

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ, বাঁকুড়া।

রাখে। খাদ্য সংগ্রহ, বাসা তৈরি, রাণী ও পুরুষের পরিচর্যা প্রভৃতি এদের কাজ।

4. সৈনিক—রূপান্তরিত শ্রমিক থেকেই এদের জন্ম হয়। এদেরও ডানা থাকে না। এরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও কঠোর সংগ্রামী। উপনিবেশকে শত্রুমুক্ত করা এবং কঠিন খাদ্যকে গুঁড়া করা এদের কাজ।

বিভিন্ন প্রজাতির পিপীলিকা নিজ নিজ উপনিবেশের জন্যে বিভিন্ন ধরণের বাসা বাঁধে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মাটির নীচে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসা তৈরি করে। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বিশেষ কক্ষে রাণী ডিম পাড়ে। শ্রমিক ডিমগুলি তুলে এনে নার্সারীতে রাখে এবং বড় না হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ ভাঁড়ার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে খাদ্য জমা করা থাকে। ভারতীয় লালপিঁপড়ে বা নালসো পাতার সাহায্যে বাসা তৈরি করে। একটি উপনিবেশে 500,000 পর্যন্ত পিপীলিকা বাস করে। কোন কোন প্রজাতির পিপীলিকা অন্য প্রজাতির উপনিবেশকে আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত উপনিবেশের শ্রমিক, পুরুষ—এমন কি, রাণীকেও বন্দী করে এনে ক্রীতদাসরূপে নিয়োগ করে। তাদের দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ, বাচ্চা লালন-পালন প্রভৃতি কাজ করিয়ে নেয়।

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকাদেরই ডানা গজায়। প্রজননের পূর্বে একঝাঁক স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকা আকাশে উড়তে থাকে। একই সময়ে হয়তো অন্যান্য উপনিবেশ থেকেও এক এক ঝাঁক পিপীলিকা আকাশে উড়ে আসে। এর ফলে গোষ্ঠীবহির্ভূত পিপীলিকার পারস্পরিক মিলনের সম্ভাবনা থাকে। তারপর এক সময়ে অনেক উঁচু আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-মিলন ঘটে। যৌন-মিলনের পর অধিকাংশ পুরুষই মৃত্যুবরণ করে। রাণী আবার মাটিতে ফিরে আসে। গাছের অজস্র পাতা মুড়ে তার মধ্যে সে ডিম পেড়ে নূতন উপনিবেশ তৈরি করে, অথবা পুরনো উপনিবেশে গিয়ে পিপীলিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

মৌমাছি

মৌমাছিও সামাজিক পতঙ্গ। এরা মৌচাক গঠনের মাধ্যমে উপনিবেশ তৈরি করে। সাধারণতঃ একটি বড় মৌচাকে 50,000 থেকে 80,000 মৌমাছি বাস করে এবং ছোট মৌচাকে 4000 থেকে 5000 মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যেও কার্য অনুযায়ী শ্রেণীভেদ আছে।

1. রাণী—একটি মৌচাকে মৌমাছির সংখ্যা যতই হোক না কেন, এদের ক্ষেত্রে রাণীর সংখ্যা একটি। সময়ে সময়ে একাধিক রাণীও দেখা যায়। রাণীর দেহ লম্বা এবং তার একমাত্র কাজ বংশবৃদ্ধি করা। পরিণত বয়সে রাণী প্রত্যহ প্রায় 200টি ডিম পাড়ে এবং সারা জীবন 1,500,000 ডিম পাড়তে পারে। রাণী কখনও মৌচাক তৈরি অথবা মধু সংগ্রহ প্রভৃতি শ্রমের কাজ করে না।

2. পুরুষ—একটি মৌচাকে পুরুষের সংখ্যা কয়েকটি থেকে 200 পর্যন্ত দেখা যায়। এদের দেহের গঠন মাঝামাঝি, দুটি ডানা আছে এবং চোখ দুটি অত্যন্ত বড়। এরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। এদের একমাত্র কাজ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করা।

3. শ্রমিক—সমগ্র উপনিবেশে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আকৃতিতে রাণী ও পুরুষের চেয়ে এরা ছোট। শক্তিশালী ডানার ভর করে এরা দীর্ঘপথ উড়ে যেতে সক্ষম। দেহ থেকে মোম নির্গত করে তার সাহায্যে মৌচাক তৈরি করে, তাছাড়া এরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ, রাণী ও পুরুষের সেবা এবং বাচ্চা লালন-পালন করে। এদের দেহে এক ধরণের বিষ গ্রন্থি থাকে এবং হুলের সাহায্যে দংশন করে ঐ বিষ শত্রুর দেহে ঢেলে দেয়।

কেবলমাত্র ডিম পাড়বার জন্তেই মৌমাছিরা আকাশে ওড়ে না। গ্রীষ্মকালে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একই স্থানে সংখ্যাবৃদ্ধির চাপ কমাবার জন্তে অনেক মৌমাছি নূতন উপনিবেশ সৃষ্টির আশায় অন্ত স্থানে উড়ে যায়। স্থান পরিবর্তনের আগে শ্রমিকেরা মৌচাকের মধ্যে বিশেষ ধরণের কিছু প্রকোষ্ঠ তৈরি করে, যার মধ্যে নূতন রাণী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নতুন রাণী পূর্ণাঙ্গ আকৃতি প্রাপ্তির আগেই পুরাতন রাণী কিছু সংখ্যক শ্রমিক ও পুরুষকে নিয়ে অন্ত স্থানে চলে যায়। ফেলে যাওয়া মৌচাকটি থেকে প্রথম যে স্ত্রীবাচ্চা বেড়িয়ে আসে, সেই হয় কুমারী রাণী এবং পরে যে সমস্ত বাচ্চা বেরিয়ে আসে, তাদেরকে হত্যা করে কুমারী রাণী সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। কারণ ভাবী রাণী কখনও অন্ত স্ত্রী মৌমাছির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করে না। কোন কোন সময় খাদ্যের অভাবের জন্তে পুরনো মৌচাক ফেলে সকলে উড়ে যায়।

মৌমাছিরা ডিম পাড়বার জন্তে যে আকাশে ওড়ে, তা পূর্বোক্ত আকাশে ওড়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এক্ষেত্রে একমাত্র কুমারী রাণীই আকাশে ওড়ায় অংশগ্রহণ করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বেড়িয়ে আসবার এক সপ্তাহের মধ্যে ভাবী রাণী এক ঝাঁক পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে ওড়ে। উন্মুক্ত আকাশে স্ত্রী ও পুরুষদের যৌন-মিলন হয়। স্ত্রী মৌমাছি দেহমধ্যস্থিত থলিতে অজস্র শুক্রাণু জমা করে নেয়। ফলে রাণী জীবদ্দশায় যত ডিম পাড়ে, সেই সব ডিমকে নিষিক্ত করতে পারে। সাধারণতঃ একবার যৌন-মিলনের পর দ্বিতীয়বার মিলনের দরকার হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিলনের শেষে আহত পুরুষের মৃত্যু ঘটে। রাণী মৌচাকে ফিরে আসে এবং বৃদ্ধ বয়সে স্থান পরিবর্তনের কাজে আর কখনও মৌচাকের বাইরে যায় না।

রাণী মৌমাছি যে ডিমগুলি পাড়ে, তার মধ্যে নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রীমৌমাছি এবং অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ মৌমাছি জন্মায়। বাচ্চা স্ত্রী মৌমাছিকে শুশ্রূষারত শ্রমিক যদি মুখের লালামিশ্রিত এক ধরণের বিশেষ মধু পান করায়, তবেই বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি পরিণত রূপ ধারণ করে। এরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুমারী রাণীতে রূপান্তরিত হয়। আর যদি শ্রমিকেরা কেবল বাঁচিয়ে রাখবার জন্তে সাধারণ মধু পান করায়, তবে বাচ্চার প্রজনন যন্ত্রগুলি বর্ধিত হয় না এবং জন্মসূত্রে স্ত্রী মৌমাছি বন্ধ্যা স্ত্রীতে পরিণত হয়।

মৌমাছি

শ্রমিক রাণী পুরুষ

গ্রেলিং প্রজাপতি

এরা সামাজিক পতঙ্গ নয়। বর্ষাকালে সাধারণতঃ এরা একা একা ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতি অত্যন্ত গন্ধসচেতন। ঘুরতে ঘুরতে কোন এক সময় পুরুষ প্রজাপতি মাটির উপরে অথবা গাছের ডালে অত্যন্ত সজাগ হয়ে চুপ করে বসে থাকে। যখনই অন্ত কোন প্রজা-

পতি এদের পাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখনই ঐ সজাগ পুরুষ প্রজাপতি তার পিছু ধাওয়া করে। উড়ন্ত প্রজাপতি যদি স্ত্রীজাতের হয়, তাহলে সেও এক সময় মাটিতে বসে পড়ে। পুরুষ প্রজাপতিটি তখন অগ্রসর হয়ে তার মুখোমুখি বসে। যদি স্ত্রীপ্রজাপতিটি সঙ্গে সঙ্গে ডানা তুলে সম্মতি

পুরুষ গ্রেলিং প্রজাপতির নৃত্য

জানায়, তাহলে উভয়ের যৌন-মিলন সংঘটিত হয়। আর যদি চুপ করে বসে থাকে, তাহলে পুরুষ প্রজাপতিটি তার মানভঞ্জনের জন্যে নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সুরু করে। প্রথমে ডানায় একটু ঝাঁকা দেয়। পরে এমনভাবে ডানা দুটি মেলে ধরে, যাতে সাদার উপরে চমৎকার কালো দাগ-গুলি স্ত্রীপ্রজাপতিকে আকৃষ্ট করে। এর পর সম্মুখভাগের পাখা দুটি তুলে স্ত্রীপ্রজাপতির সামনে এমনভাবে মাথা নেড়ে বশ্যতা স্বীকার করে, যাতে সহজেই স্ত্রীপ্রজাপতি সাড়া দেয়। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে সামনের শুঁড় দুটি ধরে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাকে এবং সর্বশেষে পেটের তলায় আস্তে আস্তে নাড়া দেয়। এই ভাবে মনোরঞ্জনের পালা শেষ হলে স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়। এরপর অবশিষ্ট জীবনে গ্রেলিং প্রজাপতি একা একা বিচরণ করে এবং আর কখনও উভয়ে মিলিত হয় না।

সাইকিড মথ

স্ত্রীসাইকিড মথেরা উড়তে পারে না। কারণ তারা সাধারণতঃ ডানাবিহীন। স্ত্রীমথেরা গুটি থেকে বেরিয়ে কাছেপিঠেই আশ্রয় নেয় এবং আশ্রয়স্থল থেকে তারা মোটেই অগ্রসর হতে পারে না। পুরুষ মথেরা উড়তে পারে। তাদের শক্ত ডানা আছে। পুরুষ মথের শুঁড়

সাইকিড মথের গন্ধসচেতনশীল শুঁড়

দুটি পালকের মত এবং অত্যন্ত গন্ধ-সচেতন। গুটি থেকে বেরিয়েই তারা খুঁজে বেড়ায় স্ত্রীমথকে। স্ত্রীমথের দেহ থেকে এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ বের হয়, যা পুরুষ মথকে আকর্ষণ করে। পুরুষ মথ শুঁড়ের সাহায্যে বহু দূর থেকে—এমন কি, দু-তিন মাইল দূর থেকেও স্ত্রীমথকে খুঁজে বের করে পরস্পরে মিলিত হয় এবং তারপর স্ত্রীমথ ডিম পাড়ে।

কাঁকড়াবিছা

কাঁকড়াবিছা প্রকৃতপক্ষে পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নয়, কিন্তু সন্ধিপদ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের স্ত্রী-পুরুষের মিলন সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানী Fabre
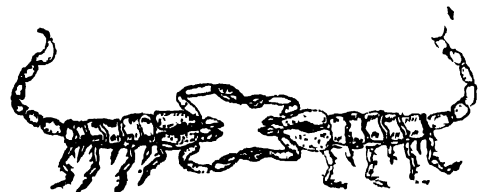
নৃত্যরত কাঁকড়াবিছা

অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছেন। যৌন-মিলনের পূর্বে তারা মুখোমুখি হয় এবং লেজের দিকটি উপরের দিকে তুলে অবস্থান করে। তারপর পুরুষটি তার

সামনের বড় দাঁড়াটি দিয়ে স্ত্রীবিছার বড় দাঁড়াটি ধরে এবং তাকে ঘিরে 30 মিনিট থেকে 120 মিনিট পর্যন্ত সে নাচতে থাকে। এই সময় সোঁ সোঁ করে এমন শব্দ করে, যা বেশ দূর থেকেও শোনা যায়। এই নাচের পর স্ত্রীবিছা পুরুষ বিছার সঙ্গে মিলিত হতে রাজী হয়। পুরুষ বিছাটি তখন মিলন স্থলের জন্যে গর্ত খুঁজতে বেরিয়ে যায় এবং স্ত্রীবিছা তাকে পিছু পিছু অনুসরণ করে। অবশেষে নির্দিষ্ট গর্তে তারা মিলিত হয় এবং মিলনের শেষে স্ত্রীবিছা পুরুষ বিছাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

মাকড়সা

এরা কাঁকড়াবিছার সমগোত্রীয় প্রাণী। পুরুষ মাকড়সা স্ত্রীমাকড়সার চেয়ে অনেক ছোট। যৌন-মিলনের আগে পুরুষ মাকড়সা একটি ছোট সুন্দর জাল বোনে। এরপর পুরুষ মাকড়সাটি তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্ত্রীমাকড়সার খোঁজে তার জালে এসে উপস্থিত হয়। এখানে এসে নানারকম ভঙ্গীমার সাহায্যে সে স্ত্রীমাকড়সার
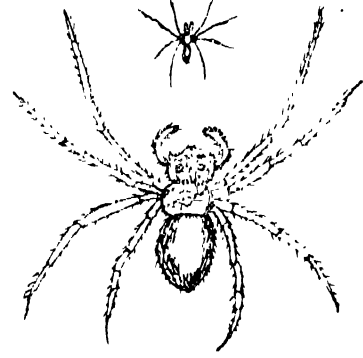
উপরে পুরুষ মাকড়সা, নীচে স্ত্রী মাকড়সা

চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করে। অবশেষে সম্মতি পেলে উভয়ে মিলিত হয়। মিলনের পর অধিকাংশ স্ত্রীমাকড়সাই পুরুষকে হত্যা করে খেয়ে ফেলে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল

অরবিন্দ দাশ*

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌল (Trans-uranic elements) বলতে ইউরেনিয়াম থেকে ভারী মৌলগুলিকেই বুঝায়। এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এরা প্রত্যেকেই তেজস্ক্রিয় এবং এদের প্রত্যেককেই লেবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভব। কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত মৌল-গুলির কথা উঠলে প্রথমেই বলা যায়, নিরুদ্দিষ্ট মৌল (Missing element) টেকনিসিয়ামের (মৌল-43) কথা—একে 1937 সালে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটাই প্রথম কৃত্রিম মৌল, এরপর থেকে লেবরেটরীতে বাকী নিরুদ্দিষ্ট মৌল ও অন্যান্য মৌল প্রস্তুতের জন্যে চেষ্টা চলে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলি সুরু হয়েছে মৌল 93-কে দিয়ে। 1940 সালে ই. ম্যাক-মিলান ও পি. এবেলসন দেখিয়েছেন যে, ইউ-রেনিয়ামের সমস্থানিক (Isotope), ($^{238}_{92}U$)[1] কে মন্থর নিউট্রন (Slow neutron) দিয়ে আঘাত

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, পোঃ নরেন্দ্রপুর, 24 পরগণা।

1. এখানে উর্ধ্বলিপি (Superscript) মৌলের ভর সংখ্যা (Mass number) এবং অধঃলিপি (Subscript) পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক নির্দেশ করছে। আধুনিক নিয়ম অনুযায়ী তেজস্ক্রিয় মৌলের একই পার্শ্বে ভর সংখ্যা ও পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক লেখা হলো।

করলে প্রথম পর্যায়ে পাওয়া যায় গামা (γ)-রশ্মি ও অস্থায়ী U-239। এটি স্বতঃই বিটা (β)-রশ্মি বিচ্ছুরিত করে এর অপেক্ষা এক অধিক পারমাণবিক ক্রমাঙ্কবিশিষ্ট (Atomic number) মৌল গঠিত হয়। ইউরেনাসের পরবর্তী গ্রহ নেপচুনের নামানুসারে এর নাম হলো নেপচুনিয়াম (Np)[2]

$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{239}_{92}U + \gamma$$

$$^{239}_{92}U \longrightarrow ^{239}_{93}Np + \beta$$
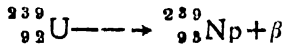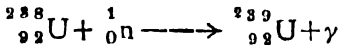
ঐ বছরই ম্যাকমিলান, সীবোর্গ প্রমুখ দেখালেন, নেপচুনিয়ামের ঐ সমস্থানিকটি আবার একটি বিটা কণা হারিয়ে মৌল-94-এ পরিবর্তিত হয়। নবম গ্রহ প্লুটোর নামানুসারে এই মৌলকে বলা হলো প্লুটোনিয়াম (Pu); কিন্তু এই সমস্থানিক আলফা (α)-রশ্মি বিচ্ছুরক, তাই তা আবার ইউরেনিয়ামের সমস্থানিকে পরিবর্তিত হয়।

$$^{239}_{93}Np \longrightarrow ^{239}_{94}Pu + \beta;$$

$$^{239}_{94}Pu \longrightarrow ^{235}_{92}U + \alpha$$
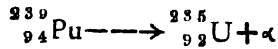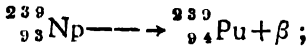
নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়ামের অন্যান্য সমস্থানিকগুলিও জানা গেছে। যেমন, নেপচুনিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক $^{237}_{93}Np$ (অর্ধজীবনকাল—$2{\cdot}25 \times 10^6$ বছর) পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম 237-এর বিটাবিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায়।

$$^{237}_{92}U \longrightarrow ^{237}_{93}Np + \beta$$
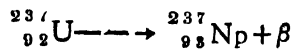
আর প্লুটোনিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক $^{242}_{94}Pu$ (অর্ধজীবনকাল—$5{\cdot}00 \times 10^5$ বছর) পাওয়া যায় প্লুটোনিয়াম-241-এর উপর নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করে।

$$^{241}_{94}Pu + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{242}_{94}Pu + \gamma$$
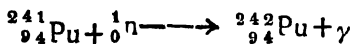
প্লুটোনিয়াম-242-এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়। এর অর্ধজীবনকাল বলা হয়েছে 5×10^5 বছর। আবার তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়স হিসাব করে দেখা গেছে, তা হলো—এ সময়ের হাজার গুণেরও বেশী। তাই বলা যেতে পারে, পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে কিছু প্লুটোনিয়াম থাকলেও আজ আর তা থাকা উচিত নয়। ইউরেনিয়ামের খনিতে প্লুটোনিয়ামের সমস্থানিক পাওয়া যায়, অর্থাৎ বলা যায় নিশ্চয়ই প্রকৃতিতে এই প্লুটোনিয়াম আবিষ্ট তেজস্ক্রিয়তা (Induced radioactivity) প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে।

সীবোর্গ ও তাঁর সহকর্মীরা 1944 সালে দেখালেন ইউরেনিয়াম-238-এর উপর আলফা রশ্মির বিক্রিয়ায় প্লুটোনিয়াম-241 গঠিত হয়। এই সমস্থানিকটি আলফা বা বিটা উভয়ই বিচ্ছুরণে সক্ষম; যখন বিটা কণা বেরোয়, তখন এক পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক অধিকবিশিষ্ট মৌল পাওয়া যায়—এরই নাম অ্যামেরিসিয়াম (Am)

$$^{238}_{92}U + \alpha \longrightarrow ^{241}_{94}Pu + ^{1}_{0}n$$

$$^{241}_{94}Pu \longrightarrow ^{241}_{95}Am + \beta$$
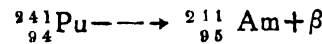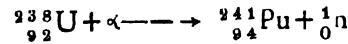
Am-241-কে সোজাসুজিই Np-239 ও আলফা কণার বিক্রিয়ায় পাওয়া যায়।

$$^{239}_{93}Np + \alpha \longrightarrow ^{241}_{95}Am + 2^{1}_{0}n$$
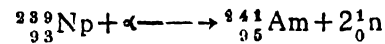
অ্যামেরিসিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিকটি (অর্ধজীবনকাল 1×10^4 বছর) প্লুটোনিয়াম-243 থেকেই পাওয়া যায়।

$$^{243}_{94}Pu \longrightarrow ^{243}_{95}Am + \beta$$
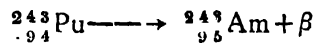
সীবোর্গ, ঘিয়ারসো এবং তাঁদের সহকর্মীরা 1944 সালেই প্লুটোনিয়াম-239 ও আলফা কণার বিক্রিয়ায় যে মৌল পেলেন, তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 96 এবং কুরী দম্পতীর সম্মানার্থে নাম দিলেন কুরিয়াম (Cm)

$$^{239}_{94}Pu + \alpha \longrightarrow ^{242}_{96}Cm + ^{1}_{0}n$$
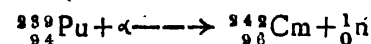
সীবোর্গ, ঘিয়ারসো, টমসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়

---

2. ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলির নামের পার্শ্বে প্রথম বন্ধনীতে তাদের সঙ্কেতগুলি লেখা হলো।

1949 সালে অ্যামেরিসিয়াম-241-এর উপর আলফা কণার আঘাতে যে মৌল সংশ্লেষিত হলো, বার্কলে শহরের নামানুসারে তার নাম হলো বার্কেলিয়াম (Bk)

$$^{241}_{95}Am+\alpha \longrightarrow {}^{243}_{97}Bk+2^{1}_{0}n$$
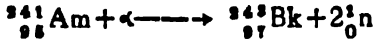
একমাত্র বার্কেলিয়াম-249 (অর্ধজীবনকাল প্রায় 1 বছর) ছাড়া এর কোনও সমস্থানিক বেশী স্থায়ী নয়। তা কুরিয়াম-249 থেকে সোজাসুজি পাওয়া যায়।

$$^{249}_{96}Cm \longrightarrow {}^{249}_{97}Bk+\beta$$
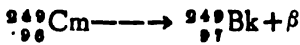
বার্কেলিয়াম-245, যা কুরিয়াম-244 ও ভারী হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন—তার বিশেষত্ব এই যে, তা K-কক্ষের ইলেকট্রন অধিকার করে (K-electron capture) এবং কুরিয়াম-245 দেয়। সেটাই কুরিয়ামের দীর্ঘতমস্থায়ী সমস্থানিক এবং অর্ধজীবনকাল মোটামুটি 2×10^4 বছর।

$$^{244}_{96}Cm+{}^{2}_{1}D \longrightarrow {}^{245}_{97}Bk+{}^{1}_{0}n$$

$$^{245}_{97}Bk \xrightarrow[\text{দখল করে}]{\text{K-ইলেকট্রন}} {}^{245}_{96}Cm$$
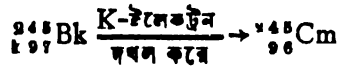
উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিকমহল 1950 সালে যে মৌলটি কুরিয়াম-242 থেকে তৈরি করলেন, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নামানুসারে তার নাম হলো ক্যালিফোর্নিয়াম (Cf)

$$^{242}_{96}Cm+\alpha \longrightarrow {}^{244}_{98}Cf+2^{1}_{0}n$$
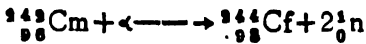
ক্যালিফোর্নিয়ামের দীর্ঘস্থায়ী সমস্থানিক (যার অর্ধজীবন প্রায় 400 বছর) পাওয়া গেছে বার্কেলিয়াম-249 থেকে।

$$^{249}_{97}Bk \longrightarrow {}^{249}_{98}Cf+\beta$$
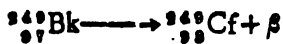
ক্যালিফোর্নিয়াম থেকে ভারী মৌলগুলি প্রস্তুত করবার জন্যে খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের লেবরেটরীতে অনেক চেষ্টা চালিয়েছেন। এই ভাবে সীবোর্গ ও তাঁর সহকর্মীরা মৌল-99 ও মৌল-100 সংশ্লেষণ করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন। মৌল-101-এর জন্যে যাঁদের অবদান খুব বেশী, তাঁরা হলেন—অ্যালবার্ট ঘিয়ারসো, জি. হারভে, জি. কোপিন, এস. টমসন, জি. টি. সীবোর্গ প্রভৃতি। এই মৌলগুলি প্রস্তুতের বিশেষত্ব এই যে—এদের জন্যে হাল্কা প্রাথমিক কণা (নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি) লক্ষ্যবস্তুর উপর সোজাসুজি আঘাত না করে, সাইক্লোট্রোন দিয়ে ত্বরিত (Accelerated by cyclotron) অপেক্ষাকৃত ভারী কণা, যেমন কোন হাল্কা মৌলের (বোরন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি) সমস্থানিক দিয়ে আঘাত করা হয়। নীচের মৌলগুলির প্রস্তুতের কেন্দ্রীন-বিক্রিয়াগুলি (Nuclear reactions) দেখলেই বোঝা যাবে।

মৌল-99 ও মৌল-100 তৈরি করা হয়েছে প্রায় একই সময়ে 1952 সালে। ইউরেনিয়াম -238-কে নাইট্রোজেন-14 দিয়ে আঘাত করে মৌল-99-কে পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে আইনষ্টানিয়াম (Es)।

$$^{238}_{92}U+{}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{247}_{99}Es+5^{1}_{0}n$$

নাইট্রোজেন-14-এর পরিবর্তে অক্সিজেন-16 ব্যবহার করলেই শততম মৌল পাওয়া যায়। পদার্থবিদ্ এনরিকো ফের্মির নামানুসারে এর নাম হয়েছে ফের্মিয়াম (Fm)।

$$^{238}_{92}U+{}^{16}_{8}O \longrightarrow {}^{250}_{100}Fm+4^{1}_{0}n$$
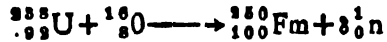
উল্লিখিত মৌল দুটির সবগুলি সমস্থানিকই ক্ষণস্থায়ী। আইনষ্টানিয়ামের অধিকতর স্থায়ী কণা, Es-255 (অর্ধজীবন কাল প্রায় 30 দিন) বিটা কণা দিয়ে ফের্মিয়ামের অধিকতর স্থায়ী কণায় (Fm-255, অর্ধজীবনকাল প্রায় 15 দিন) পরিবর্তিত হয়। Es-255, Fm-255—উভয়কেই ক্যালিফোর্নিয়াম-253 থেকে কয়েকটা ধাপে পাওয়া যায়।

$$^{253}_{98}Cf \longrightarrow {}^{253}_{99}Es+\beta$$

$$^{253}_{99}Es \xrightarrow[\text{আঘাত করে}]{\text{নিউট্রন কণা দিয়ে}} {}^{254}_{99}Es+\gamma$$

$$^{254}_{99}Es \xrightarrow[\text{আঘাত করে}]{\text{আবার নিউট্রন কণা দিয়ে}} {}^{255}_{99}Es + \gamma$$

$$^{255}_{99}Es \longrightarrow {}^{255}_{100}Fm + \beta$$
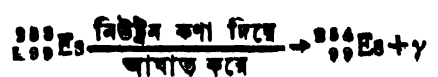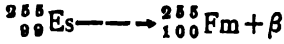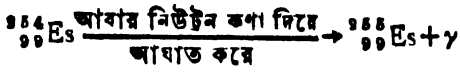
1955 সালে আইনষ্টাইনিয়াম-255-এর উপর আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে মাত্র আধ ঘণ্টা অর্ধজীবনবিশিষ্ট যে মৌল পাওয়া গেছে, তার পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 101 ; দামিত্রি মেণ্ডেলিভের স্মরণে এই মৌলকে বলা হলো মেণ্ডেলিভিয়াম (Md)

$$^{253}_{99}Es + \alpha \longrightarrow {}^{256}_{101}Md + {}^{1}_{0}n$$
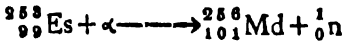
255-তম সংখ্যাবিশিষ্ট সমস্থানিকটির অর্ধজীবন একটু বেশী (দেড় ঘণ্টার কাছাকাছি); তাকেও একইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব।

$$^{253}_{99}Es + \alpha \longrightarrow {}^{255}_{101}Md + 2{}^{1}_{0}n$$
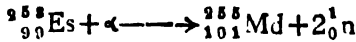
1957 সালে ষ্টকহোমের নোবেল ইন্‌স্টিটিউট অব ফিজিক্স কুরিয়াম-244-এর উপর কার্বন-13-এর বিক্রিয়ায় নোবেলিয়াম (No) প্রস্তুতের কথা ঘোষণা করেছেন। মৌলটি কিন্তু কয়েকটি লেবরেটরীর সহায়তায় প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন কুরিয়াম-244 দিয়েছিলেন ইউ. এস. এ.-র অ্যারাগোন ন্যাশানাল লেবরেটরী অব সায়েন্স আর কার্বন-13 নেওয়া হয়েছিল বৃটেনের হারওয়েল লেবরেটরী থেকে।

$$^{244}_{96}Cm + {}^{13}_{6}C \longrightarrow {}^{251}_{102}No + 6{}^{1}_{0}n$$

অথবা $^{244}_{96}Cm + {}^{13}_{6}C \longrightarrow {}^{253}_{102}No + 4{}^{1}_{0}n$

অন্যান্য সমস্থানিক অপেক্ষা নোবেলিয়াম-253-এর অর্ধজীবনকাল বেশী হলেও মাত্র 10 মিনিট। 1958 সালে বৈজ্ঞানিক ঘিয়রসো, সীবোর্গ প্রভৃতি কার্বন-12 ব্যবহার করেও নোবেলিয়াম-254 পেয়েছিলন, কিন্তু তা এত ক্ষণস্থায়ী (অর্ধজীবন কাল 3 সেকেণ্ড) যে, সহজেই ফের্মিয়াম-250-এ পরিবর্তিত হয়।

$$^{246}_{96}Cm + {}^{12}_{6}C \longrightarrow {}^{254}_{102}No + 4{}^{1}_{0}n$$

$$^{254}_{102}No \longrightarrow {}^{250}_{100}Fm + \alpha$$
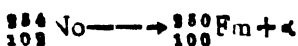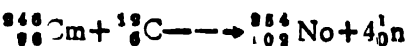
প্রধানতঃ উপরিক্ত বিজ্ঞানীরাই 1961 সালে মৌল-103-এর কথা ঘোষণা করেন এবং সাইক্লোট্রোনের আবিষ্কর্তা আর্নেষ্ট লরেন্স-এর সম্মানার্থে এই মৌলের নামকরণ হয় লরেন্সিয়াম (Lw)। ক্যালিফোর্নিয়ামের উপর বোরন-10 বা বোরন-11-এর বিক্রিয়ায় Lw-257 পাওয়া গেছে। মৌলটির অর্ধজীবনকাল মাত্র 8 সেকেণ্ড।

$$^{252}_{98}Cf + {}^{11}_{5}B \longrightarrow {}^{257}_{103}Lw + 6{}^{1}_{0}n$$

$$^{252}_{98}Cf + {}^{10}_{5}B \longrightarrow {}^{257}_{103}Lw + 5{}^{1}_{0}n$$
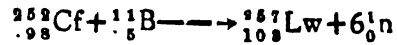
এই লরেন্সিয়ামকে দিয়ে পর্যায়-সারণীর (Periodic table) অ্যাক্টিনাইড শ্রেণী (Actinide series) সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় অ্যাকটিনাইড শ্রেণীর মৌলগুলির সঙ্গে ল্যান্থানাইড শ্রেণীর (Lanthanide series) মৌলগুলির ধর্মের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেমন ল্যান্থানামের (La) সঙ্গে অ্যাক্টিনিয়ামের (Ac), সিরিয়ামের (Ce) সঙ্গে থোরিয়ামের (Th) ইত্যাদি। সুতরাং প্রশ্ন থাকে—এর পরের মৌলগুলির স্থান কোথায় হবে?

1967 সালে রুশ বিজ্ঞানীরা 104তম মৌলের কথা বলেছেন এবং প্লুটোনিয়াম-242-কে নিয়ন-22 কণা দিয়ে আঘাত করে একে সংশ্লেষিত করেছেন। বিজ্ঞানী ইগোর কুর্চা-টোভের নামানুসারে এর নাম হয়েছে কুর্চা-টোভিয়াম (Kurchatovium, সঙ্কেত সঠিক ভাবে জানা যায় নি)। এই মৌল এত দুঃস্থ যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়েই এটি ভেঙে ইটারবিয়াম ($^{174}_{70}Yb$) ও সেলেনিয়াম ($^{80}_{34}Se$)-এ রূপান্তরিত হয়।

105-তম মৌলের কথা জানিয়েছেন ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লরেন্স রেডিয়েশান লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা 1970 সালের আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে। মৌলটি প্রস্তুত করেছেন অ্যালবার্ট ঘিয়রসো এবং তাঁর সহকর্মীরা। বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অটো হানের নামানুসারে এই মৌলের নাম হয়েছে হানিয়াম

(Hahnium-Ha), ক্যালিফোর্নিয়াম-249-এর উপর নাইট্রোজেন-15 দিয়ে আঘাত করে হানিয়ামের-260 সমস্থানিককে প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্থানিকটির অর্ধজীবনকাল 1·60 সেকেণ্ডের কাছাকাছি। আলফা কণা দিয়ে মৌলটি লরেন্সিয়ামে পরিবর্তিত হয়; এই লরেন্সিয়াম আবার আলফা কণা দিয়ে মেণ্ডেলিভিয়াম 252 দেয়।

$$^{249}_{98}Cf + ^{15}_{7}N \longrightarrow ^{260}_{105}Ha + 4^{1}_{0}n$$

$$^{260}_{105}Ha \longrightarrow ^{256}_{103}Lw + \alpha$$

$$^{256}_{103}Lw \longrightarrow ^{252}_{101}Md + \alpha$$
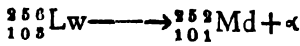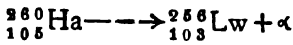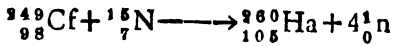
এর আগেও 1967 সালে রুশ বিজ্ঞানীরা মৌল-105-কে তৈরি করবার কথা জানান এবং তাঁরা বলেছিলেন অ্যামেরিসিয়াম-243-কে নিয়ন কণা দিয়ে আঘাত করে এই মৌল পাওয়া সম্ভব।

অ্যাক্টিনাইড শ্রেণী সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়-সারণীর সপ্তম পর্যায়েই রাখবার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লিখিত সর্বশেষ মৌল দুটিকে যথাক্রমে হাফনিয়াম (Hf) ও ট্যান্টালামের (Ta) নীচে নীচে অর্থাৎ 5(a) ও 6(a) গ্রুপে পর পর রাখা হয়েছে।

ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলির অর্ধজীবনকাল দেখে এই ধারণা হতে পারে যে, পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্থায়িত্বও কমে যায়। তাহলে তো অতি ভারী মৌলের (Super heavy element) অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। কিন্তু অতি ভারী মৌলগুলি অর্থাৎ যাদের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক 110-এর উপরে, তাদের অবস্থিতির কথা জানা গেছে। পারমাণবিক গঠনের উপর নির্ভর করে তাত্ত্বিক গণনা (Theoretical calculation) থেকে 114-র কাছাকাছি পারমাণবিক ক্রমাঙ্কের মৌলগুলির ক্ষেত্রে 'বিশেষ স্থিরতার' (Island of stability) কথা বলেছেন টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, বোম্বে। সম্প্রতি মৃত উল্কা ও চান্দ্র ধূলার অতি ভারী মৌলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নিউক্লীয় তত্ত্ব (Nuclear theory) লেবরেটরীতেই 106-তম মৌলের প্রস্তুতির প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিজ্ঞানীরাও 118-তম মৌল পর্যন্ত সংশ্লেষণের আশা করছেন। এই সমস্ত মৌলের স্থান হবে পর্যায়-সারণীতে সপ্তম পর্যায়ে—যথাক্রমে মৌল 73 থেকে মৌল 86-এর নীচে নীচে এবং নীতিগতভাবে এরা গ্রুপ ধর্ম মেনে চলবে। আজ তাই ইউরেনিয়ামোত্তর মৌলগুলি পর্যায়-সারণীতে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দাবী রাখে।

বহু সন্তান জন্মের রহস্য

স্বপনকুমার রায়চৌধুরী

ছোট পরিবার সুখী পরিবার—দুটি কিংবা তিনটি সন্তানই যথেষ্ট। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কল্যাণে এই ধরণের বিজ্ঞাপন এখন আর নূতন নয়। বুদ্ধিমান মা-বাবা বেশী সন্তানের আগমন সম্পর্কে দিন দিন বেশী সজাগ হচ্ছেন। কিন্তু যখন কোন মা একসঙ্গে একাধিক সন্তান প্রসব করেন, তখন কি পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কিছু বলবার থাকতে পারে? যমজ সন্তান জন্মের কথা সকলের জানা আছে। কিন্তু একসঙ্গে দুটির বেশী সন্তান জন্মের ঘটনা যথেষ্ট সংখ্যায় না ঘটলেও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পৌরাণিক যুগে গান্ধারী এক সঙ্গে একশতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, সগর রাজা তো ষাট হাজার সন্তানের জনক ছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগের ওসব ঘটনার কথা আপাততঃ থাক। আধুনিক যুগের কয়েকটি ঘটনার কথা বলি। 1960 সালের 9ই জানুয়ারী জার্মেনীতে একসঙ্গে সাতটি সন্তান জন্মের একটি ঘটনা ঘটে। 1967 সালের মার্চ মাসে মারিয়া টেরেসা নামে 21 বছর বয়স্কা এক মহিলা মেক্সিকো সিটি হাসপাতালে এক সঙ্গে আটটি সন্তানের জন্ম দেন। মিশরের রাজধানী ঈজিপ্ট শহরে সাম্প্রতিক কালে এক-সঙ্গে ছয়টি সন্তানের জন্মের কথাও বিজ্ঞানীরা নথিভুক্ত করেছেন।

প্রতিটি সন্তানের জন্মদানের জন্য মা-বাবা যৌথভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। পুরুষের শুক্রাণুর সঙ্গে স্ত্রীর ডিম্বাণুর মিলনের ফলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শুক্রাণু দুই রকমের। এক ধরণের শুক্রাণু বহন করে ওয়াই-ক্রোমোসোম এবং অপর ধরণের শুক্রাণু বহন করে এক্স-ক্রমোসোম। ডিম্বাণু সব সময়েই এক্স-ক্রোমো-সোম বহন করে। যদি এক্স-ক্রোমোসোম বহনকারী কোন শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণু মিলিত হয়, তবে স্ত্রী-সন্তান সৃষ্টিকারী ভ্রূণের জন্ম হয়। অপর পক্ষে ওয়াই ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জন্ম হয় পুরুষ সন্তান সৃষ্টিকারী ভ্রূণের। 1নং চিত্র থেকে সহজেই বোঝা যাবে, কেমন করে স্ত্রী এবং পুরুষ সন্তানের জন্ম হয়।

সাধারণতঃ প্রতিটি সুস্থ এবং পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী-লোকের ডিম্বাশয় থেকে প্রতি আঠাশ দিন অন্তর একটি করে পরিপক্ক ডিম্বাণু বেরিয়ে এসে জরায়ুর মধ্যে আশ্রয় নেয়। এই সময়ে শরীরে কতকগুলি গ্রন্থি থেকে (বিশেষ করে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে) বিশেষ ধরণের হর্মোন নিঃসৃত হতে থাকে এবং এদের সাহায্যে জরায়ুর মধ্যস্থিত একটি স্থান ভ্রূণধারণের উপযোগী হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে যদি কোন শুক্রাণু জরায়ুর মধ্যে ঢুকে ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তবেই দেখা দেয় সন্তান জন্মের সম্ভাবনা।

এ তো গেল স্বাভাবিকভাবে ভ্রূণ সৃষ্টির কথা। কিন্তু অঘটন অনেক ঘটে। এমনও হতে পারে, একটির জায়গায় দুটি কিম্বা আরো বেশী ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে এসে প্রত্যেকেই তারা শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হতে সক্ষম হয়, তবে ঠিক ততগুলি সন্তান জন্মের সম্ভাবনা থাকে।

আবার অন্য রকম ঘটনাও ঘটতে পারে। এমনও হতে পারে, স্বাভাবিকভাবে একটি মাত্র ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে বেরিয়ে এসে একটি মাত্র

ভ্রূণেরই সৃষ্টি করে। এই ভ্রূণটি যদি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার আগেই কোন কারণে ভেঙে গিয়ে দুটি বা তারও বেশী খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে ভ্রূণটি যতগুলি খণ্ডে বিভক্ত হয়, জরায়ুর মধ্যে ততগুলি সন্তানই পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে সৃষ্ট সন্তানের সকলেই যমজ সন্তানদের চেহারাতেই শুধু মিল থাকে না, অনেক ক্ষেত্রে তাদের অনুভূতি এবং চিন্তাধারার মধ্যেও যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। এর কারণ প্রথম উপায়ে সৃষ্ট একই ভ্রূণ থেকে যখন একাধিক সন্তানের জন্ম হয়, তখন ঐ সব সন্তানের জিনের গঠন একই রকমের হয়ে থাকে এবং
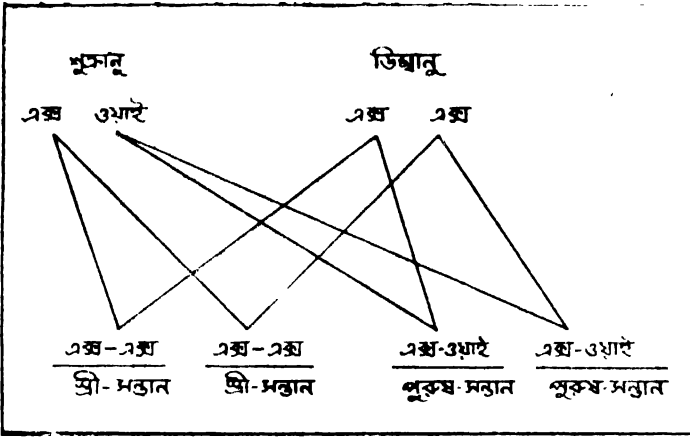
1নং চিত্র

সমলিঙ্গের হবে। কিন্তু বহু সন্তান জন্মের প্রথম যে পদ্ধতির কথা বলেছি, তাতে কয়টি স্ত্রী এবং পুরুষ সন্তান জন্মাবে, তার কোন ঠিক নেই। কেন না, ভ্রূণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী সন্তানের লিঙ্গ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কাজেই যখন প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট একটি ভ্রূণ থেকে বহু সন্তানের জন্ম হয়, তখন তারা প্রত্যেকে একই লিঙ্গের হয়। অপর পক্ষে বিভিন্ন ভ্রূণ থেকে সৃষ্ট সন্তানের লিঙ্গ একও হতে পারে বা ভিন্নও হতে পারে।

প্রাথমিকভাবে সৃষ্ট একই ভ্রূণ থেকে যখন একাধিক সন্তানের জন্ম হয়, তখন সেই সন্তানেরা কেবল সমলিঙ্গেরই হয় না, আরো অনেক রকমের বৈশিষ্ট্যও তাদের একই রকমের হয়ে থাকে। একথা আজ সকলেরই জানা আছে যে, কেবল মানুষই নয়, প্রতিটি প্রাণীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তার জিনের গঠনের উপর।

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ীদের, যেমন—কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণীর মধ্যে একসঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। এদের শারীরিক গঠন এবং প্রক্রিয়াও এই ঘটনার অনুকূল। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এক সঙ্গে বহু সন্তানের জন্ম আকস্মিক ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসার অন্ত নেই। তবে আজ পর্যন্ত এই সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তার চেয়ে—না-জানা তথ্যের পরিমাণ অনেক বেশী।

উড়িষ্যায় সাম্প্রতিক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়

নেপালচন্দ্র রায়সরকার*

গত অক্টোবর মাসের শেষে উড়িষ্যার উপকূলে যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেল, তার বিবরণ আপনারা সকলেই খবরের কাগজে পড়েছেন। এই দুর্যোগে দশ হাজারের মত লোকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বহু কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে।

এ ধরণের ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন আমাদের এ অঞ্চলে খুব নতুন কিছু নয়। 1970 সালের নভেম্বর মাসে আর এক প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের ভোলা, হাতিয়া, সন্দীপ প্রভৃতি স্থানের কয়েক লক্ষ অধিবাসী জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল। স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—এ ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কেন হয়? ঘূর্ণিঝড়ের সাইক্লোন নামকরণ 1848 সালে ক্যাপ্টেন হেন্‌রী পেডিংটন করেছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতার তৎকালীন মেরিন কোর্টের প্রেসিডেন্ট। তিনি সাপের কুণ্ডলীর সঙ্গে সাইক্লোনকে তুলনা করেছিলেন।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের উপর সাধারণতঃ ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দেশে তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়; যেমন—অ্যাটলাণ্টিকে বলা হয় হারিকেন, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বলা হয় টাইফুন, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলে বলা হয় উইলি উইলি, আর আমাদের দেশে বলা হয় সাইক্লোন।

সাইক্লোন যখন প্রবল হয়, তখন তা বায়ুমণ্ডলে একটা বিরাট ঘূর্ণির সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণির প্রভাব 150 কিঃ মিঃ থেকে 1000 কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকার উপর সাধারণতঃ থাকে এবং ঊর্ধ্বাকাশে এর প্রভাব 10 থেকে 17 কিঃ মিঃ পর্যন্ত হয়। এই বিশাল ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব একটা গতি থাকে। সেই গতিতে সে দিনে 300 থেকে 500 কিঃ মিঃ পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের চারধারে ঘন্টায় 150 থেকে 250 কিঃ মিঃ জোরে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড়ের দরুণ যে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, তা জীবননাশ ও সম্পত্তিহানির জন্যে দায়ী। কখনো কখনো ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে সমুদ্র থেকে জলোচ্ছ্বাস উঠে এসে তীরবর্তী অঞ্চলকে ভাসিয়ে দেয়। এই জলোচ্ছ্বাসের ফলেই প্রাণনাশ হয় সবচেয়ে বেশী। প্রবল বর্ষণের ফলে বড় বড় গাছের গুঁড়ির কাছে মাটি আলগা হয়ে যায়, তখন ঝড়ের মুখে সেগুলি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। সমুদ্রের দিক থেকে প্রবল বাতাস প্রবাহিত হয়ে তীরবর্তী জলরাশিকে উত্তোলিত করে এবং বন্যার সৃষ্টি করে।

আগেই বলেছি সাইক্লোন সৃষ্টি হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে। উত্তর গোলার্ধে সাধারণতঃ 5° থেকে 15° অক্ষরেখার মধ্যে সাইক্লোনের উৎপত্তি হয়। বঙ্গোপসাগরে শরৎকালীন সাইক্লোনগুলি বেশীর ভাগ সময় প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। তবে গ্রীষ্মকালেও এই অঞ্চলে সাইক্লোনের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বায়ুতে নিম্নচাপ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হলেই সেখানে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই নিম্নচাপ ক্ষেত্রটি ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে অবশেষে সাইক্লোনে পরিণত হতে পারে। একটি পূর্ণ গঠিত সাইক্লোনের কেন্দ্রস্থলে প্রায় 20 কি. মি. ব্যাসযুক্ত একটি এলাকা মেঘমুক্ত থাকে।

---

* আঞ্চলিক আবহ কেন্দ্র, আলিপুর, কলিকাতা 27

একে সাইক্লোনের কেন্দ্র বা eye বলা হয়। সেখানে মৃদু বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু কেন্দ্র বিন্দু থেকে 30 থেকে 50 কি. মি. দূরে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি হতে থাকে। প্রবল বৃষ্টিধারায় নিকটে এলে ঝড় সাময়িকভাবে কমে যায়; আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়ে যায়, মনে হয় দুর্যোগ বুঝি কেটে গেল। কিন্তু অচিরেই সে ভুল ভেঙ্গে যায়। ক্ষণকাল পরেই উল্টোদিক
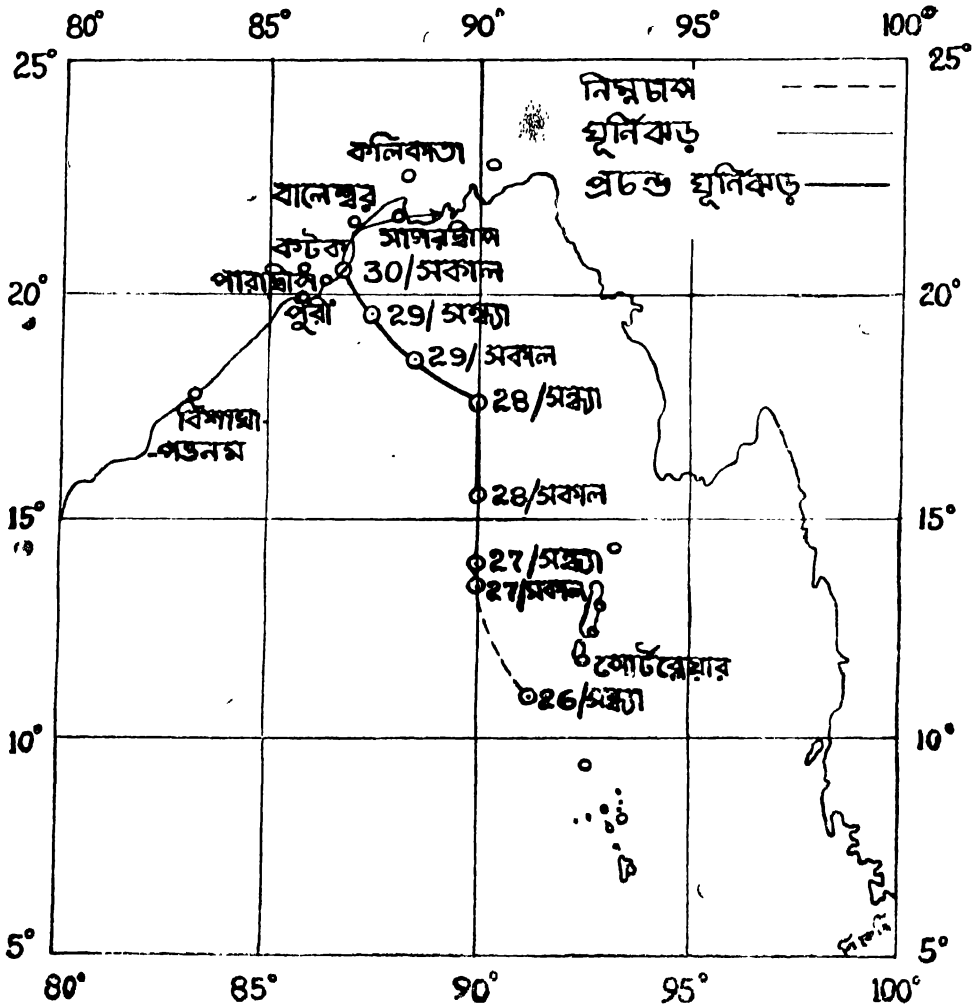
1নং চিত্র
উড়িষ্যার ঘূর্ণিঝড়, অক্টোবর, 1971

সম্পৃক্ত মেঘরাশি কুণ্ডলীর আকারে এই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। সাইক্লোন যখন তীরভূমিতে আঘাত হানে, তখন সেই এলাকায় বায়ুর গতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু ঝড়ের কেন্দ্র (Eye) থেকে আবার প্রচণ্ড ঝড় সুরু হয় এবং তার সঙ্গে নেমে আসে মুষলধারায় বৃষ্টি। যে বাড়ী ও গাছগুলি ঝড়ের প্রথম চোটে বেঁচে গিয়েছিল, এবার তার মধ্যে অনেকগুলিই ভূমিসাৎ

হতে পারে। সাধারণ মানুষ, যারা দুর্যোগ কেটে গেছে বলে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিল, তারাও অনেকে এই ঝড়ের দ্বিতীয় চোটে প্রাণ হারাতে পারে। উড়িষ্যার সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়েও এই মেঘমুক্ত কেন্দ্র (Eye) 229/30শে অক্টোবর রাত্রি 2টা থেকে 4টার মধ্যে পারাদ্বীপের উপর দিয়ে চলে যায়। কাছাকাছি একটি জাপানী পারাদ্বীপের কাছ থেকে ঝড়ের প্রকোপ কমতে থাকে এবং তার গতিপথে পরিবর্তন দেখা যায়। ঝড়টি কিছুক্ষণ উত্তরমুখে ধাবিত হয়ে পরে বালেশ্বরের কাছাকাছি এসে উত্তর-পূর্ব দিকে সুন্দর বনের মধ্যে প্রবেশ করে। ঝড়ের আয়ু এখানেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই ঝড় বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত হয়ে যে গতিপথ ধরে এসে

2নং চিত্র

জাহাজ ছিল, তার নাম হেলিও মারু। এই জাহাজটি ঘন্টায় 175 কি. মি. বেগে ঝড় এবং 2·8 থেকে 3 মিটার (9 থেকে 11 ফুট) উচু জোয়ারের জল মেপেছিল। বালেশ্বরের নিকট এক উপকূলবর্তী স্থানে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা 6 মিটারের (20 ফুট) কাছাকাছি উঠেছিল। উড়িষ্যা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতিসাধন করেছে, সেই গতিপথ 1নং চিত্রে দেখানো হলো।

আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের মেঘের ছবি তোলা হচ্ছে এবং সেই ছবিগুলি বেতার-তরঙ্গ মারফৎ পাঠানো হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরে এই ছবিগুলির একটি গ্রাহক-

যন্ত্র আছে। এই ছবি থেকে সাইক্লোনের কেন্দ্রস্থলের সঠিক অবস্থান ও তার প্রবলতা বোঝা যায়। 29শে অক্টোবর সকালে যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছিল, তাতে এই ঘূর্ণিঝড়টিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই চিত্রের একটি প্রতিলিপি (2নং চিত্র) দেওয়া হলো। এই চিত্রে সাইক্লোনের কেন্দ্র (Eye) সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 20° ডিগ্রী অক্ষরেখা ও 87° ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশের নিকট যে কালো বিন্দুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেটাই সাইক্লোনের কেন্দ্র (Eye)।

ঘূর্ণিঝড়ের এই প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসলীলা দেখে আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, বিজ্ঞানে এমনকি কোন উপায় নেই, যা দিয়ে এই ঝড়গুলিকে সমুদ্রবক্ষেই প্রশমিত করা যায়। জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত মেঘের উপর silver iodide গুঁড়া প্রয়োগ করে অ্যাটলান্টিকের হারিকেন নামক ভীষণ ঘূর্ণিঝড়কে আংশিকভাবে কিছু ক্ষণের জন্যে প্রশমিত করা গেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা এতই ব্যয়সাধ্য যে, ভারতের পক্ষে এরূপ প্রচেষ্টা চালানো প্রায় অসম্ভব। আমাদের চাই এমন একটি ব্যবস্থা, যার দ্বারা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো যে, ঝড় অমুক জায়গায় আঘাত করবে। তখন সেই জায়গায় ও তার আশেপাশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে লোক অপসারণ করলেই অন্ততঃ প্রাণহানির সংখ্যাটা আমরা অনেক কমিয়ে ফেলতে পারবো। সেই ব্যবস্থাই আমাদের দেশে হতে চলেছে। সমুদ্র তীরে শক্তিশালী রেডার যন্ত্র বসিয়ে ঝড়ের আঘাত হানার সঠিক খবর দেওয়া সম্ভব। বিশাখাপত্তনে এই ধরণের রেডার যন্ত্র একটি ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে এবং শীঘ্রই কলকাতা ও পারাদ্বীপ বন্দরে বসানো হবে। এই সব ব্যবস্থা সম্পন্ন হলে আশা করা যায় যে, এই ধরণের ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা যে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়, তার পরিমাণ অনেকটা কমানো সম্ভব হবে।

জীবন-মরণ সমস্যা

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হবার সুরু থেকেই জীবের জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, কোন না কোন সময়ে সকল প্রাণীরই সজীব দেহখানি নির্জীব হয়ে যায় এবং তার জীবনাবস্থার অবসান ঘটে। সৃষ্টির সুরু থেকে আজ অবধি এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

আদিম কাল থেকেই মৃত্যু সম্বন্ধে দেশ ও জাতিভেদে নানা জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান প্রচলিত আছে। দার্শনিকেরা সূক্ষ্ম যুক্তিবিচারের দ্বারা মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা সম্বন্ধে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। জীবজগৎকে ঈশ্বরের সৃষ্টি অনুমান করে নিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতে মৃত্যুকে নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করা হয়। এসব হলো অনুমান ও কল্পনার কথা।

অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য এই মৃত্যু সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নানা গবেষণা করে চলেছেন। মৃত্যুর নিগূঢ় কি, মৃত্যুকে কিভাবে নিবারণ বা বিলম্বিত করা যায়, সে বিষয়ে আবহমান কাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমরা বলি প্রাণ বেরিয়ে গেল। প্রাণ যে কি বস্তু, তা কিন্তু সঠিক জানা নেই। প্রাণ বেরিয়ে যাবার পর যে অবস্থা, তাকেই মৃত্যু বলা হয়। যে ভাবেই হোক, এটা কঠোর সত্য যে, এই অবস্থার পর ব্যক্তির হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাস-ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং দেহটি একটি জড় বস্তুতে পরিণত হয়। এরপর ঐ দেহের উপর কোন উদ্দীপকই (Stimulus) আর সাড়া জাগাতে পারে না এবং কোন প্রকারেই ব্যক্তিটির দেহে পূর্বের কর্মক্ষমতা ও চেতনা অর্থাৎ প্রাণের লক্ষণগুলির পুনরুদ্ভব করানো সম্ভব হয় না। এই অবস্থাই হলো মৃত্যু।

তাহলে মৃত্যু কি? শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াই কি মৃত্যু? কিন্তু শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার পর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। অনতি-বিলম্বে যদি কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া (Artificial respiration) বা যন্ত্রের (Respirator) সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া পুনঃপ্রবর্তিত করা যায়, তাহলে ব্যক্তি জীবিত হয়ে ওঠে। তাহলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াই কি মৃত্যু? দেখা গেছে, হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে যাবার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্ষাস্থির (Sternum) উপর চাপ দিয়ে (External cardiac massage) অথবা অস্ত্রো-পচার করে হৃদ্‌যন্ত্রকে মর্দিত করে (Internal cardiac massage) উত্তেজিত করা যায়, তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে হৃদ্‌যন্ত্র পুনরায় স্বাভাবিকভাবে কর্মক্ষম হয়ে ওঠে।

এই সব কারণে মৃত্যুর সঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণতঃ কোন অসুখের পর চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে যখন রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, তখন সকলে সেই সিদ্ধান্তকেই মেনে চলেন। অনেক অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও মৃত্যুর লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। সাধারণতঃ এই ধরণের সিদ্ধান্ত ভুল হবার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল। বহুক্ষণ যাবৎ মৃত ব্যক্তির বিষয়ে কোন ভুলের অবকাশই থাকে না।

চিকিৎসকেরা হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়ার আন্দোলন থেকেই জীবিত কি মৃত স্থির করেন। তিন মিনিটের অধিককাল শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ থাকলে সেই ব্যক্তিকে মৃত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগুলি অবশ্য রোগ ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিকে ঔষধ এবং নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা বাঁচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা উচিত। যেমন—জলে ডোবা ব্যক্তির কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। আকস্মিক দুর্ঘটনার আতঙ্কে (Shock) মৃত ব্যক্তিকে একই সঙ্গে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌যন্ত্রের মর্দন (Cardiac massage) করে বাঁচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে মৃত বলে ঘোষণা করা সঙ্গত।

দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বাসক্রিয়া ও হৃদ্‌স্পন্দন উভয় কার্য বন্ধ হবার পরেও ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। তাহলে মৃত ব্যক্তিটি কি মরণের পর আবার পুনর্জীবন লাভ করলো? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। শ্বাস ও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলেও শরীরের অন্যান্য অংশ ও কোষতন্তু (Tissues) তৎক্ষণাৎ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি কোষগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তাহলে সেগুলি পূর্বের মতই সক্রিয় হয়ে থাকে। কোষের খাদ্য হলো অক্সিজেন, হৃদ্‌যন্ত্রই ধমনী মারফৎ সকল কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে। জীবনধারণের পক্ষে হৃদ্‌যন্ত্র যদিও প্রধান অঙ্গ এবং অপরিহার্য, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হলেই তৎক্ষণাৎ কোন ব্যক্তিকে অপরিবর্তনীয়ভাবে মৃত বলে স্বীকার করা বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে গবেষণার দ্বারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছেন।

দেহের সকল যন্ত্র ও কোষতন্ত্র নির্দিষ্ট কার্য (Function) সাধন করে স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) আয়ত্তাধীনে। স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের কোষগুলি যদি অক্সিজেনের অভাবে অকর্মণ্য হয়ে যায়, তাহলে ঐ কোষগুলির দ্বারা পরিচালিত দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা কোষগুলিও অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। কোনও উপায়েই তাকে আর কর্মক্ষম করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ অন্যান্য অংশের কোষগুলিরও অপরিবর্তনীয় মৃত্যু হয়।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মস্তিষ্কের কোষগুলিতে যদি অক্সিজেন সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেষ 45 সেকেণ্ডের মধ্যে অচেতন হয়ে পড়বে। অক্সিজেন সরবরাহ যদি 1 মিনিটের অধিককাল বন্ধ থাকে, তাহলে মস্তিষ্কের আংশিকভাবে অপূরণীয় ক্ষতি হবে। যদি 5 মিনিটের অধিককাল বন্ধ থাকে, তাহলে গুরুমস্তিষ্কের আবরণের (Cerebral cortex) সকল কোষের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। মস্তিষ্কের কোষের কর্মক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়াই বৈজ্ঞানিক মতে প্রকৃত অপরিবর্তনীয় মৃত্যু। মস্তিষ্কের এই মৃত্যু একমাত্র যন্ত্রের সাহায্যেই প্রমাণ করা সম্ভব।

চিকিৎসকেরা বাহ্যিক লক্ষণ দেখে যে মৃত্যু ঘোষণা করেন, তাকে বলা যেতে পারে আধিভৌতিক মৃত্যু (Somatic death)। এর পর দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও কোষতন্ত্রর ধারাবাহিক ভাবে মৃত্যু ঘটে—একে কোষগত মৃত্যু বলা হয় (Cellular death)। সাধারণের কাছে বাস্তব স্বার্থের দিক থেকে আধিভৌতিক মৃত্যুকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করার কোন ক্ষতি নেই।

অপরিবর্তনীয় মৃত্যু এবং শেষের মুহূর্তটি নির্ধারিত করবার বৈজ্ঞানিক আবশ্যকতা ব্যতীত আর একটি দিক বিবেচনা করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

অধুনা মৃত ব্যক্তির শরীরের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে জীবিত অসুস্থ ব্যক্তির দেহে অন্তর্বাসন (Transplantation) করে তাকে সুস্থ করবার রীতি প্রচলিত হয়েছে।

একটু আগেই বলা হয়েছে, ব্যক্তির আধিভৌতিক মৃত্যুর পরেও কিছু সময় শরীরের নানা অংশের কোষতন্ত্রর ক্রমাগত কার্যকারিতা বজায় থাকে। যেমন মূত্রাশয় (Kidney) আরও এক ঘণ্টার মত, মাংসপেশীর কোষতন্ত্র আরও কয়েক ঘণ্টার মত কর্মক্ষমতা বজায় রাখে। এই আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির অংশবিশেষ অপর ব্যক্তির দেহে অন্তর্বাসন করানো হয়। এই প্রসঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্র বদলের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হৃদ্‌যন্ত্র অন্তর্বাসনের চমকপ্রদ সংবাদ সকল পাঠকই অবগত আছেন। এখন প্রশ্ন ওঠে, যে হৃদ্‌যন্ত্রটি অন্য ব্যক্তিকে কর্মক্ষম করে তুলতে পারে, সে যন্ত্রটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার পূর্বে তার অপরিবর্তনীয় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কিনা। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আইনগত সমস্যাও দেখা দেয়।

এই সব কারণে ব্যক্তির জীবনাবস্থার শেষের মুহূর্তটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে অবিসংবাদিতভাবে নির্ধারিত করবার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W. H. O.) থেকে অপরিবর্তনীয় মৃত্যুর একটা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। নানা দেশে এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আইন প্রণয়নেরও চেষ্টা চলছে।

আলিগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অধ্যাপক ডাব্লিউ. ডি. ওয়েষ্ট
মূল সভাপতি

অধ্যাপক ওয়েষ্ট 1901 সালে ইংল্যাণ্ডের বোর্নমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর শৈশবের তিন বছর উত্তর বোর্নিওতে অতিবাহিত করেন। এখানে তাঁর বাবা প্রথম রেলপথ নির্মাণ করেন। তিনি ক্যান্টারবারির কিংস্ স্কুল এবং কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন্স কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ন্যাচারাল সায়েন্সেস ট্রাইপস-এর উভয় অংশে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উইনচেষ্টার পুরস্কার এবং হার্কনেস বৃত্তি (ই. আর. গি-এর সঙ্গে যৌথভাবে) লাভ করেন। 1923 সালে তিনি ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় যোগদান করেন এবং 1946 সাল থেকে 1951 সাল পর্যন্ত এই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পরেই সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হন।

ভারতবর্ষে অধ্যাপক ওয়েষ্টের কাজের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ এবং সিমলা হিমালয়। ভারতীয় ভূতত্ত্বে সুপরিচিত মধ্যপ্রদেশের প্রাচীন পার্বত্যাঞ্চলে দেওলাপার শিলাস্তর, হিমালয় অঞ্চলের সিমলা ক্লিপ ইত্যাদি বিশেষ ধরণের শিলাস্তরের অস্তিত্বের বিষয় তিনি প্রমাণ করেন। 1935 সালের কোয়েটা ভূমিকম্প ও তজ্জনিত ক্ষতির কারণ সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করেন। আগ্নেয়শিলায় অবস্থিত সৌরাষ্ট্রের ডেকান ট্রাপের মধ্যে খনিত কয়েকটি গভীর গর্ত সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান চালান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিন্দুকুশের উত্তরে জুরাসিক সাইথানে কয়লা আবিষ্কারের জন্যে অধ্যাপক ওয়েষ্ট একদল খননকারী ও সমীক্ষককে নিয়ে উত্তর আফগানিস্থানে যান। এই কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আফগান সরকার তাঁকে ষ্টার অব আফগানিস্থান উপাধি প্রদান করেন। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও ভূতাত্ত্বিক শিক্ষার উন্নতিতে অধ্যাপক ওয়েষ্টের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1932 সাল থেকে 1938 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 1933 সালে অধ্যাপক জে. এন. মুখার্জীর সহযোগিতায় তিনি কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের ব্যবস্থাপনা করেন। 1937 সালে তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ছিলেন এবং 'ভারতবর্ষে ভূমিকম্প' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করবার পর তিনি এই সংস্থার প্রসারণের প্রথম পর্যায়ের পরিকল্পনা করেন এবং 1951 সালে এই সংস্থার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, দি মাইনিং জিওলজিক্যাল অ্যাণ্ড মেটালার্জিক্যাল ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন অব জিওহাইড্রোলজিষ্ট-এর সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফাউণ্ডেশন ফেলো। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির পি. এন. বোস স্মৃতি পদক এবং লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটির লিয়েল পদক লাভ করেন। 1947 সালে ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই উপাধি প্রদান করেন। বর্তমানে তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে কর্মরত আছেন।

ডক্টর এ. পি. মিত্র
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা শাখা

ডক্টর এ. পি. মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সি-এস-আই-আর-ও-এর রেডিও-ফিজিক্স বিভাগে কলোম্বো প্ল্যানের ফেলো (1951), 1952-53 সালে পেনসিলভ্যানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চে ভিজিটিং সহকারী অধ্যাপক, 1953-54 সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং 1957-68 সালে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন।

তিনি 1954 সালে ভারতের সি-এস-আই-আর-এ রেডিও রিসার্চ কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করেন। 1958 সাল থেকে ন্যাশানাল লেবরেটরীর রেডিও প্রোপেগেশন ইউনিটের প্রধান হিসাবে আছেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি এন. পি. এল.-এর ডেপুটি ডিরেক্টর।

তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে—অ্যাটমোস্ফেরিক ফিজিক্স এবং অ্যারোনমি, আয়নোস্ফেরিক ফিজিক্স, আয়নোস্ফেরিক রেডিও-অ্যাষ্ট্রোনমি, অ্যাটমোস্ফেরিক আয়ন কাইনেটিক্স এবং স্পেশ রিসার্চ। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সি. এ. মেইনের সহযোগিতায় রিয়োমিটার টেকনিক আবিষ্কারের অগ্রনায়ক। এই টেকনিক সোলার এফেক্ট, পোলার ক্যাপ অ্যাবসরপশন ইভেন্ট ও অ্যাটমোস্ফেরিক নিউক্লিয়ার ডিটোনেশন ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বিষয় অনুশীলনে এখন ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'স্যাটেলাইট ড্র্যাগ ডেটা'র উপর ভিত্তি করে একেবারে প্রাথমিক একটি অ্যাটমোস্ফেরিক ডেনসিটি মডেলের উন্নতি বিধান করে স্পুটনিক উৎক্ষেপণের কিছুদিন বাদে তিনি ভারতে মহাকাশ গবেষণার প্রবর্তন করেন।

ডক্টর মিত্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কমিটি ফর দি আই-জি-ওয়াই, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কমিটি ফর আই-কিউ-এস-ওয়াই-র সেক্রেটারী ছিলেন এবং বর্তমানে রেডিও এবং টেলিকমিউনিকেশন রিসার্চ কমিটি এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কমিটি ফর দি ইউ-আর-এস-আই-এর (ইণ্টারন্যাশানাল সায়েণ্টিফিক রেডিও ইউনিয়ন) সেক্রেটারী। সম্প্রতি তিনি নিউ কোসপার (COSPAR) প্যানেল অন স্পেশ এডুকেশন অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন।

ডক্টর মিত্র স্পেশ সায়েন্স রিভিউ (হল্যাণ্ড), জার্নাল অব অ্যাটমোস্ফেরিক অ্যাণ্ড টেরেষ্ট্রীয়াল ফিজিক্স (ইউ. কে.), ইলেকট্রনিক্স লেটারস অব আই. ই. ই (ইউ. কে), জার্নাল অব পিওর অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স (ভারত), জার্নাল অব দি ইনষ্টিটিউট অব টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারস (ভারত) প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য।

1955 সালে ডক্টর মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এবং মৌয়াট স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি 1961 সালে ন্যাশানাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া এবং আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়নের ফেলো এবং 1963 সালে ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব অ্যাষ্ট্রোনটিক্স-এর করেসপণ্ডিং সদস্য নির্বাচিত হন।

ডক্টর মিত্র আয়নোস্ফিয়ার এবং অ্যারোনমি, রেডিও-অ্যাষ্ট্রোনমি, স্পেশ সায়েন্স প্রভৃতি বিষয়ে 90টিরও বেশী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ডক্টর জি. এস. সাহারিয়া
সভাপতি—রসায়ন শাখা

ডক্টর গোবিন্দস্বরূপ সাহারিয়া 1913 সালে 8ই নভেম্বর উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলার পিলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আলিগড়ের ধর্মসমাজ হাই স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে 1933 সালে আগ্রা কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। ছোটবেলায় তিনি হিন্দী, উর্দু পার্শী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করেন। 1935 সালে তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে মাস্টার ডিগ্রী লাভ করেন। অধ্যাপক আর. ডি. দেশাইয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে তিনি 1938 সালে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1940 সালের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তারপর তিনি কুনুরে নিউট্রিশন রিসার্চ লেবরে-টরীতে রিসার্চ স্কলার হিসাবে যোগদান করেন।

তিনি সাইক্লোহেক্সেন রিং-এর বাহ্যিক গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে অনুশীলন করেন। তাঁর গবেষণা এবং তৎকালীন প্রচলিত এই বিষয় সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে সাইক্লোহেক্সেনের বোট এবং চেয়ার ফর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম রাসায়নিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গবেষণার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে 1954 সালে চার্লস সি. প্রাইস এবং তাঁর সহকর্মীরা সমালোচনা করেন। কিন্তু সাহারিয়া এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা এই কাজের পুনরাবৃত্তির ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, 4 এবং 3 মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন-1 : 1 ডাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিডের দুটি আইসোমেরিক ফর্মের প্রস্তুতি ও পৃথকীকরণের জন্যে উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি ত্রুটিহীন।

1945 সাল থেকে ডক্টর সাহারিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন। এর মধ্যে কিছুদিন তিনি রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন।

1951 সালে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজীতে স্যার রেজিনাল্ড প্যাট্রিক লিনস্টেড এবং অধ্যাপক এল. এন. আওয়েনের সঙ্গে সাইক্লোহেপটেন-1 ও 2-ডায়োলস সম্বন্ধে গবেষণা করেন।

1961 সালে ডক্টর সাহারিয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব রসায়নে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রায় 75টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি রয়্যাল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি ও কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েসনের আজীবন সদস্য। হিন্দীতে তিনি "ভোজন ও স্বাস্থ্য" শীর্ষক একটি পুস্তক লিখেছেন।

ডক্টর সাহারিয়া হিন্দী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে হিন্দী-পুস্তক প্রকাশন কমিটির সদস্য। 1954 সাল থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন বিভাগীয় কমিটির সদস্য এবং 1965 ও 1966 সালে যথাক্রমে কলিকাতা ও চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান অধিবেশনের বিভাগীয় রেকর্ডার ছিলেন।

অধ্যাপক টি. পাতি
সভাপতি—গণিত শাখা

অধ্যাপক ত্রিবিক্রম পাতি 1929 সালের 23শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজ থেকে শিক্ষালাভ করেন। 1948 সালে তিনি গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1950 সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক পাতি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1953 সালে ডি. ফিল. এবং 1956 সালে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন পুরস্কার, পদক, বৃত্তি ও ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো এবং গণিতে প্রথম ন্যাশন্যাল রিসার্চ ফেলো। জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ-দানের পূর্বে তিনি হীরাকুঁদ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান এবং এলাহাবাদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

ফোরিয়ার অ্যানালিসিস ও অ্যাবসোলিউট সামেবিলিটি (Absolute Summability) সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সুবিদিত। তাঁর গবেষণা-পত্র আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে অনেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব ম্যাথামেটিক্স-এর প্রথম সম্পাদক এবং ম্যাথামেটিক্স ষ্টুডেন্ট-এর সহযোগী সম্পাদক। তিনি ম্যাথামেটিক্যাল রিভিউস-এর পর্যালোচক। তিনি টরোন্টোয় ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি 'ফাংকশনস অব এ কমপ্লেক্স ভ্যারিয়েবল', 'ম্যাট্রিক্স থিওরী' ও 'ফাংকশনাল অ্যানালিসিস'—এই তিনটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। বর্তমানে অধ্যাপক পাতি 'মনোগ্রাফ অন অ্যাবসোলিউট সামেবিলিটি' সম্পর্কে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক আর. পি. রায়
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার গঙ্গাপুর গ্রামে 1921 সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি 1950 সালের অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার আর. এ. ফিসারের সঙ্গে জেনেটিক্স এবং ডক্টর ডি. জি. ক্যাটচেসাইডের সঙ্গে সাইটোজেনেটিক্সের বিষয় অনুশীলন করেন। 1953 সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1953 সালের মার্চ মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগদান করেন।

এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অল্প কিছুদিন বাদে 1945 সালের মে মাসে ডক্টর রায় সাবুরের বিহার কৃষি কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার লেক্চারারের পদে যোগদান করেন। সাবুরে দু-বছর কাজ করবার পর তিনি পাটনা বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং এখান থেকেই সরকারী বৃত্তি নিয়ে 1950 সালে কেম্ব্রিজে যান।

তাঁরই প্রচেষ্টায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্ল্যান্ট সাইটোজেনেটিক্সে বর্তমানে কৃতী গবেষক সম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। যদিও জেনোম অ্যানালিসিস এবং গমোৎপাদনে জেনেটিক্স সম্পর্কিত গবেষণা সুরু করেছিলেন, কিন্তু পাটনায় তিনি ব্যাপক আকারে সঙ্কর গমের উৎপাদন সম্পর্কিত গবেষণা করবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সুবিধা পান নি। সেই জন্যে তিনি ফার্নের সাইটোজেনেটিক ও সঙ্করোৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। পরে তিনি Dipterocarpaceae, Lecythidaceae, Myrtaceae প্রভৃতি পরিবারের অর্থকরী উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। এর মধ্যে ভারতে কতকগুলি সাইটোজেনেটিক অনুসন্ধান-কার্যের তিনিই সূত্রপাত করেন।

অধ্যাপক রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর গবেষণাগার থেকে 100টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর রায় ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড, জার্মেনী ও সুইডেনের জেনেটিক্স সম্বন্ধীয় গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন।

তিনি গত ছয় বছর যাবৎ ভারতীয় উদ্ভিদ-তাত্ত্বিক সমিতির কর্মসচিব, সোসাইটি অব সাইটোলজিষ্ট অ্যাণ্ড জেনেটিসিষ্ট (ইণ্ডিয়া)-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য এবং এই সোসাইটির মুখপত্র 'দি জার্নাল অব সাইটোলোজি অ্যাণ্ড জেনেটিক্স'-এর প্রধান সম্পাদক। তিনি লণ্ডনের লিনিয়াস সোসাইটি, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, বোটানিক্যাল

সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমির (এফ. এন. এ) ফেলো।

ডক্টর (কুমারী) এ. জর্জ
সভানেত্রী—পরিসংখ্যান শাখা

ডক্টর (কুমারী) আলিআম্মা জর্জ কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইউ. এস. এ-র চ্যাপেল হিল-এর নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

1945 সালে তিনি কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে যোগদান করে এবং 1957 সাল থেকে এপর্যন্ত ঐ বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপিকা হিসাবে নিয়োজিত আছেন।

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস অ্যাণ্ড পপুলেশন মডেল। এই বিষয়ে তাঁর অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অন্যের সঙ্গে যৌথভাবে 'Tables of the distribution of Inter-birth Intervals" শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন।

প্রধানত: তাঁরই প্রচেষ্টায় 1963 সালে কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে দু-বছরের একটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্স চালু হয়েছে। ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে এম. এস-সি ও পি-এইচ. ডি ডিগ্রী প্রদান ভারতবর্ষে প্রথম কেরল বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সুরু হয়। তিনি বায়োমেট্রিক সোসাইটি, ইণ্টারন্যাশানাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েন্টিফিক ষ্টাডি অব পপুলেশন, দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন, দি পপুলেশন অ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়া, দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব এগ্রিকালচারাল ষ্ট্যাটিস্টিক্স, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট এবং ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা।

তিনি তিন বছর কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এবং প্রায় বারো বছর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক সংস্থার সদস্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা কমিটির সদস্যা হিসাবেও কাজ করেছেন। ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত সেণ্ট্রাল ফ্যামিলি প্লানিং ইনস্টিটিউটের ইভ্যালুয়েশন কমিটির তিনি সদস্যা।

অধ্যাপিকা জর্জ জার্মেনীর মুনষ্টার-এ ও মিউনিকে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে ইণ্টার ফোনেটিক সায়েন্স এবং জার্মান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন এবং যুগোশ্লাভিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলন ও ইণ্টারন্যাশানাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দি সায়েন্টিফিক ষ্টাডি অব পপুলেশন-এর বার্ষিক সম্মেলন ও ইণ্টারন্যাশানাল ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি ইউ. কে, ইউরোপ, ইউ. এস. এ, ক্যানাডা, জাপান, ফরমোসা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ডেমোগ্রাফি ও জনসংখ্যা অনুশীলন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপক কমল এন. শর্মা
সভাপতি—শারীরতত্ত্ব শাখা

অধ্যাপক শর্মা ব্যাঙ্গালোরের সেণ্ট জন্স মেডিক্যাল কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিহেভিয়ার ও নিউরোফিজিওলোজি শাখার প্রধান। তিনি ইউ. এস. এ-র ম্যাসাচুসেট্‌স্থিত ইউ. এস. আর্মি ন্যাটিক লেবরেটরীর পায়োনিয়ারিং রিসার্চ ডিভিশনের ভিজিটিং কনসালট্যাণ্ট।

অধ্যাপক শর্মা উত্তর প্রদেশের মুসৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লক্ষ্ণৌর কিং জর্জেস মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম. বি. বি. এস এবং এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং 1955 সালে ঐ কলেজের শারীরতত্ত্ব বিভাগে যোগদান

করেন। 1956 সালে তিনি নতুন দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ যোগদান করেন। 1964 সালে সেন্ট জন মেডিক্যাল কলেজে যোগদানের পূর্বে তিনি ইউ. এস. এ-র ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব রচেষ্টার মেডিক্যাল স্কুল-এ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

অধ্যাপক শর্মার 70টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ দেশ-বিদেশের বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত 'হ্যাণ্ডবুক অব ফিজিওলজির' লেখকদের মধ্যে তিনিও অন্যতম। সম্প্রতি তিনি ডক্টর শ্রীমতী এস. ভুয়া-শর্মা ও ডক্টর জেকবের সঙ্গে যৌথভাবে "The Canine Brain in Stereotaxic Coordinates" মনোগ্রাফটি লিখেছেন। তিনি কয়েকটি বিখ্যাত শারীরতত্ত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

অধ্যাপক শর্মার গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে—নিউরো ফিজিওলোজি ও বায়োকন্ট্রোল সিস্টেম। পেরিফেরাল নার্ভে দীর্ঘস্থায়ী ইলেকেট্রোড প্রোথিতকরণের পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন এবং আন্ত্রিক ব্যবস্থার বহিঃসঞ্চালক নিয়ন্ত্রণের বিষয় প্রতিপাদন করেন। বর্তমানে তিনি অপুষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা, স্থূলতার বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থায় খাদ্য গ্রহণে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ নির্ণয়ীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

তিনি ফুলব্রাইট বৃত্তি, যুক্তরাষ্ট্রের পাব্লিক হেলথ পোষ্ট ডক্টরাল বৃত্তি, শকুন্তলা আমিরচাঁদ গবেষণা বৃত্তি (আই-সি-এম-আর) এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ইউ. এস. এ, ইউ. কে. ইউরোপ এবং জাপানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সিম্পোসিয়াম ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আনওয়ার আন্সারী

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষামূলক বিজ্ঞান শাখা

1922 সালের 10ই জুলাই অধ্যাপক আন্সারী লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। 1937 সালে আরবী ভাষায় ডিষ্টিংশনসহ লক্ষ্ণৌর সরকারী হুসেনাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1943 সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনস্তত্ত্বসহ দর্শনে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ঐ সালেই তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্গীয় অধ্যাপক এন. এন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। 1946 সালে তিনি উর্দু সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। 1948 সালে তিনি স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেন। 1949 সালের শেষভাগে তিনি যুক্তরাজ্যে যান। 1954 সালে তিনি পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1954 সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের লেকচারার এবং 1959 সালে মনস্তত্ত্বের রীডার নিযুক্ত হন। 1961 সালে তিনি ক্যানাডা কাউন্সিল কর্তৃক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো নির্বাচিত হন এবং 1961-'62 সালে ক্যানাডার ডালহৌসী বিশ্ববিদ্যালয়ে (হ্যালিফাক্স) গবেষণা করেন। 1964 সালে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

তিনি দেশ-বিদেশের বহু সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। তিনি আই-এস-সি-এ-র মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক শাখায় বিভাগীয় কমিটির সদস্য, 1967 ও 1:68 সালে ঐ বিভাগের রেকর্ডার ছিলেন। তিনি 1964 ও 19 6 সালে যথাক্রমে ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব সাইকোলজিষ্ট (ইউ. এস. এ) এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর হিউম্যানিষ্টিক সাইকোলজির

(ইউ. এস. এ) ফেলো ছিলেন। শিক্ষকতা ও গবেষণার তত্ত্বাবধান করা ছাড়াও তিনি মনস্তত্ত্ব বিষয়ক নিজস্ব কয়েকটি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেন। তিনি কয়েকটি মৌলিক গবেষণা-পত্রও প্রকাশ করেছেন। তাঁর বর্তমান গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে—নন্দন বিজ্ঞানের সামাজিক মনস্তত্ত্ব, উচ্চাকাঙ্খার স্তর প্রভৃতি।

অধ্যাপক এস. এন. ঘোষ

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু-বিজ্ঞান শাখা

অধ্যাপক ঘোষ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স-এর প্রাক্তন ডীন এবং ফলিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান। 1918 সালের 1লা ফেব্রুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 1948 সালে তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। 1950 সালে অধ্যাপক ডাব্লিউ. গর্ডির তত্ত্বাবধানে মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তারপর অধ্যাপক আর. ভি. পাউণ্ডের তত্ত্বাবধানে গবেষণার জন্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এরপর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেম্ব্রিজ রিসার্চ লেবরেটরীতে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের সমস্যা সম্বন্ধে গবেষণা চালান।

1956 সালে বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন এবং তদবধি সেখানে আছেন। অধ্যাপক ঘোষ উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশ পদার্থবিদ্যা, মাইক্রোওয়েভ এবং আণবিক পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ঐ সব বিষয়ে তিনি প্রায় 100টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন।

তিনি ভিজিটিং প্রোফেসর, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত ও রিসার্চ স্কলার হিসাবে বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেছেন। তিনি দেশ-বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য ও ফেলো। অধ্যাপক ঘোষ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সহ-সভাপতি। তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

ডক্টর হরিনারায়ণ

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

1922 সালে সেপ্টেম্বর মাসে হরিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1946 সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সেখান থেকেই গবেষণা করে ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। 1950 সালে UNESCO ফেলোশিপ পেয়ে তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় যান। 1952 সালে সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বিভাগে যোগদান করেন। ডক্টর হরিনারায়ণ ব্যাপকভাবে অষ্ট্রেলিয়ায় অভিকর্ষ ও চৌম্বক সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং পূর্ব ও মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় তাঁর এই অনুসন্ধানের ফলে ভূত্বকের গঠন-বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে নতুন তথ্য জানা গেছে। 1954 সালে তিনি সিড্‌নী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1956 সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে ডক্টর নারায়ণ ও. এন. জি. সি-তে যোগদান করেন এবং রিসার্চ ও ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের প্রথম ডিরেক্টর হন (1962-64)। 1964 সালে তিনি হায়দরাবাদের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি vibration spectra of molecules and crystals, gravity and magnetic surveys,

susceptibility of rocks, palaeomagnetism, heat flow and seismology প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর পরিচালিত সমীক্ষার ফলেই মধ্যপ্রদেশ ও মহীশূরে নতুন খনিজের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ডক্টর হরিনারায়ণ নানা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তিনি বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 1972 সালে ক্যানাডার অটোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য 24শ আন্তর্জাতিক ভূতাত্ত্বিক কংগ্রেসের 'ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক' অনুসন্ধান' শীর্ষক অধিবেশনের কো-চেয়ারম্যান হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

ডক্টর টি. রামচন্দ্র রাও

সভাপতি—প্রাণী ও কীটতত্ত্ব শাখা

ডক্টর রাও 1907 সালে মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর এবং কলিকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। তিনি 1945-46 সালে লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিন-এ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলো ছিলেন এবং অধ্যাপক পি. এ. বাক্সটনের তত্ত্বধানে গবেষণা করেন।

মহীশূর বিশ্ববিস্থালয়ে তিনি ফড়িং-এর ক্রোমোসোম নিয়ে গবেষণা করেন। পরে তিনি বিখ্যাত ম্যালেরিয়ারোগ-বিশেষজ্ঞ ডক্টর পল এফ. রাসেলের তত্ত্বাবধানে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের ম্যালেরিয়া অনুসন্ধান কমিটির কাজে যোগ দেন এবং ম্যালেরিয়া মহামারীর কারণ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। 1942 সালে তিনি বোম্বাই জনস্বাস্থ্য বিভাগের নবগঠিত ম্যালেরিয়া সংস্থায় কীটতত্ত্ববিদ্ হিসাবে যোগদান করেন। ক্রমে তিনি মহারাষ্ট্র সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর হন। আধুনিক ম্যালেরিয়া নিবারক কর্মসূচীর উন্নতি সাধনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জাতীয় কর্মসূচীর মূল্যায়নের জন্যে 1970 সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে গঠিত আন্তর্জাতিক দলের তিনি নেতা ছিলেন। Kyasanur Forest Disease-এর (ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত একটি নূতন ভাইরাস-রোগ) প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। 1970 সালের অগাষ্ট মাস থেকে তিনি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের সদর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট আছেন। এখানে তিনি মশার প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ও ভাইরাস গবেষণার প্রসার সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন। তিনি বিভিন্ন দেশও পরিদর্শন করেছেন।

ডক্টর শচীন রায়

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখা

ডক্টর শচীন রায় বাংলা দেশের রংপুর জেলায় 1920 সালের 10ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয় থেকে তিনি নৃতত্ত্বে এম. এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন (1945)। তিনি দিল্লী বিশ্ববিস্থালয় থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর আদিবাসীদের সম্বন্ধে থিসিস দাখিল করে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। 1945-'46 সালে ডক্টর রায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের রিসার্চ স্কলার হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। তারপর তিনি গুজরাট রিসার্চ সোসাইটির রিসার্চ স্কলার ও 1946-'48 সালে ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার রিসার্চ কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। 1948-'56 সাল পর্যন্ত তিনি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় সহকারী নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করেন। 1956 সাল থেকে 1960 সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর কালচারাল রিসার্চ অফিসার (ডেপুটেশনে) হিসাবে কাজ করেন। 1960 সালে তিনি সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব কমিশনের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার নিযুক্ত হন।

1960 সালে ডক্টর রায় স্থাশানাল মিউজিয়মের কীপার ও নৃতত্ত্ববিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। ডক্টর রায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী, আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, কেরল, মধ্য প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

ডক্টর রায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন এবং নানা আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। Wenner-Gren ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ পরিকল্পনায় তিনি বিভিন্ন দেশে বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত হন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ এস. ভি. ভাদুড়ী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

ডাঃ ভাদুড়ী 1929 সালে এম. বি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি 1930 সালে কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডাঃ পি. এ. ম্যাপ্‌লিষ্টোনের অধীনে হুকওয়ার্ম গবেষণা বিভাগে সহকারী রিসার্চ ওয়ার্কার হিসাবে যোগদান করেন। তিনি মানুষের কৃমি ও কৃমিনাশক পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 1940 সালে তিনি এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1943 সালে কিছুদিন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ভেটারিনারী রিসার্চ-এ কাজ করেন। তিনি মানুষের ফাইলেরিয়াসিস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহী হন এবং ফাইলেরিয়াসিস গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন। মানুষ ও প্রাণিদেহের পরজীবী, schistosomiasis-এর সম্ভাব্য বিস্তার, ফাইলেরিয়াসিস-এর নিদানতত্ত্ব এবং এর কেমোথিরাপী, ফাইলেরিয়াসংক্রান্ত সংক্রমণে লিম্ফ্যাটিক-এর অনুশীলন ও বিভিন্ন কৃমিনাশক পদার্থ সম্পর্কে গবেষণায় তাঁর মূল্যবান দান আছে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্‌থ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যার স্নাতকোত্তর শাখার ছাত্রদের তিনি কৃমিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করতেন।

ডাঃ ভাদুড়ী ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর ফাইলেরিয়াসিস গবেষণার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফাইলেরিয়াসিস নিয়ন্ত্রণের জন্যে গঠিত সাউথ প্যাসিফিক কমিশনের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি 1961 সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ-এর উদ্যোগে গঠিত জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর (ভারত) অ্যাসেসমেণ্ট কমিটির সদস্য ছিলেন।

ডক্টর এস. কে. মুখার্জী

সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

1914 সালে ডক্টর মুখার্জী জন্মগ্রহণ করেন। 1945 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। 1943-'46 সালে ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে তিনি সহকারী মৃত্তিকা-সমীক্ষা আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন।

1947 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রীডার নিযুক্ত হন। 1957-'60 সালে তিনি

ইন্দোনেশিয়ার ইউনেস্কো কনসালট্যাণ্ট হিসাবে নিয়োজিত হন। তারপর তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের ম্যাক্রোমলিকিউল বিভাগে রসায়নের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি কল্যাণী বিশ্ববিত্থালয়ে রসায়নের অধ্যাপক ও ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন হিসাবে যোগদান করেন (1961)। 1965 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিত্থালয়ের কৃষিবিষয়ক রসায়নের পি. সি. রায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1968 সালে তিনি কল্যাণী বিশ্ববিত্থালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন।

তিনি কমিটি অন সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্নোলজি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কাউন্সিল, ন্যাশনাল কমিশন অন এগ্রিকালচারের (ভারত সরকার) সদস্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের সভাপতি।

তিনি মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা-খনিজের ভৌত-রাসায়নিক ধর্মাবলী, আয়ন বিনিময়, ক্লে মেম্ব্রেন ইলেক্‌ট্রোড ও সয়েল অরগ্যানিক ম্যাটার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা প্রায় 60টি মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

"অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্প-কলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার অণুতে কোটি বৎসর পূর্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, প্রতি জীবের সম্মুখেও বংশপরম্পরাগত অনন্ত জীবন প্রসারিত। সুতরাং বর্তমানকালের জীব অনন্তের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাতে যুগযুগান্তরব্যাপী ইতিহাস ও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ — প্রথম সংখ্যা
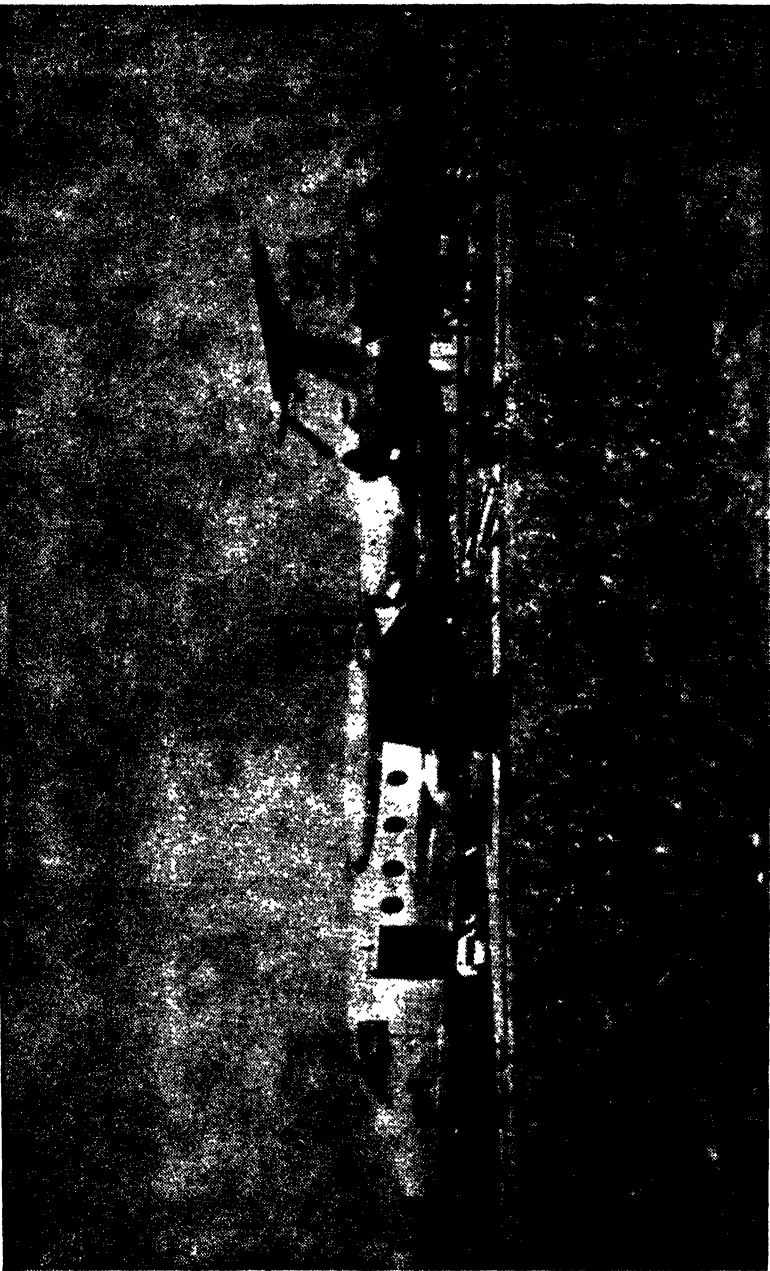
বিমান-নিঃসৃত প্রচণ্ড শব্দ মন্দীভূত করবার অভিনব ব্যবস্থা

ছবির ডান দিকে অবস্থিত চাকার উপর স্থাপিত যে নলাকার একটি যন্ত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওটা শব্দের তীব্রতা হ্রাস করবার যন্ত্র। পশ্চিম জার্মেনীর এইচ. এফ. বি.—এর ইঞ্জিনিয়ারদের নির্মিত এই যন্ত্রটি বিমান-নিঃসৃত শব্দের তীব্রতা হ্রাস করবে। এটি জেট বিমানের ইঞ্জিনের সঙ্গে লাগালে ইঞ্জিন থেকে নিঃসৃত শব্দ সাধারণ গাড়ীর শব্দের চেয়ে বেশী হবে না।

অঙ্কের ম্যাজিক

একটা ম্যাজিক দেখিয়ে তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সহজেই অবাক করে দিতে পার। বন্ধুদের মধ্যে একজনকে তুমি বলবে তোমাকে না দেখিয়ে একটা কাগজে 3 অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে এবং ঐ সংখ্যার ঠিক পিছনে আবার ঐ সংখ্যাটি বসাতে। এখন তাহলে 6 অঙ্কের একটি সংখ্যা (যেমন 358358) তৈরি হলো। এইবার তুমি তোমার বন্ধুকে সংখ্যাটিকে 13 দিয়ে ভাগ করতে বলবে এবং সকলকে জানিয়ে দেবে যে, ভাগশেষ যত থাকবে, তত পয়সা তুমি তোমার বন্ধুটিকে দান করবে। দেখো, তোমার ঐ বন্ধু বেচারী ঠিকই বলবে, ভাগশেষ কিছুই থাকছে না। তখন তুমি মন্তব্য করবে, 13 সংখ্যাটা 'অলুক্ষুণে' বলেই বোধহয় সে কিছু পেল না।

অতঃপর ভাগফল যা হয়েছে, তোমাকে না জানিয়ে দ্বিতীয় একজন বন্ধুকে তা জানিয়ে দিতে বলবে। দ্বিতীয় বন্ধুটিকে তুমি বলবে ঐ ভাগফলকে 11 দিয়ে ভাগ করতে এবং ঘোষণা করে দেবে যে, এবার যত ভাগশেষ থাকবে, তত টাকা তুমি তোমার এই বন্ধুটিকে দেবে। দেখবে, তোমার এই হতভাগ্য বন্ধুকেও বলতে হচ্ছে, ভাগশেষ একেবারে শূন্য হয়েছে। এক্ষেত্রে তোমার মন্তব্য হবে, 11 সংখ্যাটা 13-এর বড় কাছাকাছি বলেই বোধহয় তার ভাগ্যে কিছু জুটলো না।

এইবার ভাগফল যা হয়েছে, তোমাকে না জানিয়ে তৃতীয় একজন বন্ধুকে জানাতে বলবে। এই বন্ধুটিকে তুমি বলবে সংখ্যাটিকে 7 দিয়ে ভাগ করতে এবং ঘোষণা করবে যে, যত ভাগশেষ থাকবে, ততগুলি দশ টাকার নোট তুমি এ বন্ধুকে দেবে। সবাই অবাক হবে এই শুনে যে, তোমার তৃতীয় বন্ধুও বলছে, ভাগশেষ কিছুই নেই। তুমি তখন মন্তব্য করবে, তোমার দান করবার খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দান নেবার মত লোক পাওয়া গেল না।

অতঃপর তোমার তৃতীয় বন্ধুকে তুমি বলবে ভাগফলটি তোমায় জানিয়ে দিতে। সে যে সংখ্যাটি জানাবে, তারই পুনরাবৃত্তি করে তুমি তোমার প্রথম বন্ধুকে বলবে এই 3 অঙ্কের সংখ্যাটি সে তার কাগজে প্রথমে লিখেছিল। সে নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবে। তখন তুমি কিছু না বলে কেবল ঐন্দ্রজালিকসুলভ একটুখানি মুচকি হাসি হাসবে।

জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

পলিথিন

আজকাল পলিথিনের বালতি, গেলাস, মগ, প্যান, ডেকচি প্রভৃতি জিনিষ ধাতুনির্মিত জিনিষকেও টেক্কা দিচ্ছে। এর কারণ হলো—এগুলি হাল্কা, শক্ত, ক্ষয়-রোধক এবং দামেও সস্তা।

পলিথিন কথাটি এসেছে পলি (অর্থাৎ বহু) ও ঈথিলিন কথা দুটির যোগাযোগের ফলে; অর্থাৎ বহু সংখ্যক ঈথিলিন অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে যে বহুগুণক যৌগ প্রস্তুত করে, তাই পলিথিন। ঈথিলিন একটি গ্যাসীয় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন, কিন্তু যখন উচ্চচাপ ও উচ্চতাপে অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাজার হাজার ঈথিলিন অণু যুক্ত হয়ে উচ্চতর আণবিক ওজনের পলিথিন অণু গঠন করে, তখন আণবিক ওজন বৃদ্ধির ফলে সেটি শক্ত ও তাপসহ এক ধরণের প্লাষ্টিকজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই ধরণের পদার্থকে বহুযৌগ বলে এবং যে বিক্রিয়ায় এটি প্রস্তুত হয়, তাকে বহু-সংযোজন (পলিমেরিজেশন) বলে।

$$n\,CH_2=CH_2 \xrightarrow[\text{অক্সিজেন}]{\text{2000 বায়ুচাপে ও } 200^\circ C} -(CH_2-CH_2)_n-$$
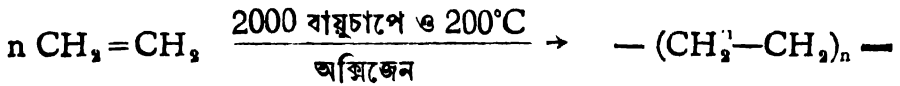
পলিথিন প্রস্তুতের সমীকরণ দেখতে সহজ। কিন্তু এটা তৈরি করা বেশ কঠিন। এক্স-রশ্মির পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এই বহুযৌগের সব অণুগুলি সরাসরি সরল রেখায় যুক্ত থাকে না। প্রতি 50টি সংযোজনের পর একটি করে আড়াআড়ি সংযোজন হয়ে থাকে। বোধ হয় অক্সিজেনের উপস্থিতি এই আড়াআড়ি সংযোজনে সাহায্য করে।

বর্তমানে পলিথিন প্রস্তুতের দুটি শিল্প-পদ্ধতি রয়েছে—(1) উচ্চচাপ পদ্ধতি, (2) নিম্নচাপ পদ্ধতি।

উচ্চচাপ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ গ্যাসীয় ঈথিলিনকে অল্প পরিমাণ অনুঘটকের (অক্সিজেন বা পারক্সাইড) উপস্থিতিতে 200°C-এ উত্তপ্ত একটি টিউবের মধ্য দিয়ে 1000 থেকে 2000 বায়ুচাপে চালনা করা হয়। প্রতিবার চালনা করবার ফলে প্রায় 15% থেকে 25% ঈথিলিন পলিথিনে পরিণত হয়। এই পলিথিনকে উপ-যুক্ত চাপে দ্রবীভূত করা হয় এবং অব্যবহৃত ঈথিলিন গ্যাসকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এরপর উপযুক্ত তাপ ও চাপের প্রভাবে এই দ্রবণ থেকে পলিথিনের নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করা হয়।

নিম্নচাপ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিটি প্রথম জার্মেনীর কার্ল জাইগলার উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে সাধারণ বায়ুচাপে একটি ধাতব অ্যালকিল অনুঘটকের (যেমন

ট্রাইঈথিলিন অ্যালুমিনিয়াম) উপস্থিতিতে 60° থেকে 70°-তে ঈথিলিন গ্যাসকে উত্তপ্ত করে পলিথিন প্রস্তুত করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত পলিথিনের উৎপাদন খরচ পড়ে পূর্বের পদ্ধতির অর্ধেক। এই পদ্ধতিতে অনুঘটকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পলিথিনের কতকগুলি বিশেষ গুণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এছাড়া এর অদ্ভুত তড়িদ্ধর্ম এবং জলশোষণ ক্ষমতা না থাকবার জন্যে এটি সমুদ্রের নিম্নেকার টেলিগ্রাফের তার সংযোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নিম্ন ঘনত্বের নমনীয় অথচ শক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিরোধক বলে ফিল্ম প্রস্তুতিতে এবং রাসায়নিক পদার্থ রাখবার শিশি-বোতল তৈরি করবার জন্যে এটি ব্যবহৃত হয়। পলিথিনের এতগুলি গুণ থাকায় এটিকে শ্রেষ্ঠ প্লাষ্টিক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীসুকুমার শেঠ

জেনে রাখ

আটলাণ্টিক মহাসাগর থেকে একটি জীবন্ত ঝিনুক নিয়ে প্রায় 1500 কিলোমিটার দূরবর্তী দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত এক গবেষণাগারে স্বাভাবিক পরিবেশে রাখা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই দেখা যায়—
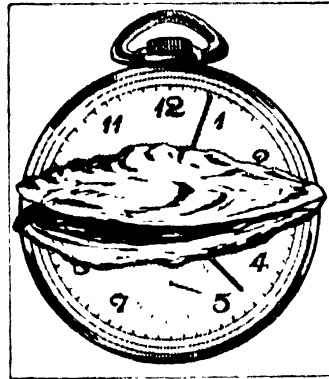
আটলাণ্টিকের স্রোতের ঠিক নির্দিষ্ট সময়ানুযায়ী খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ঝিনুকটি মুখ খুলে রাখে। কিছুদিন পরে অবশ্য দেখা যায়, স্থানীয় স্রোতজলের জোয়ারের সময়ানুসারেই সে মুখ হাঁ করবার সময় পরিবর্তন করেছে। নিম্নস্তরের প্রাণীদের সময়-জ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে জীব-বিজ্ঞানীরা মনে করেন—ঝিনুকজাতীয় প্রাণীরা পৃথিবীর স্রোত-জলের জোয়ার-ভাটা উৎপত্তির চন্দ্রের অভিকর্ষজ টান অনুভব করতে পারে।

পারদর্শিতার পরীক্ষা

বুদ্ধির সমস্যা সমাধানে তোমাদের মধ্যে কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 6টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 6 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে যার সঠিক উত্তরের সংখ্যা 6, 5, 4, 3, 2, 1 বা 0 হবে, তার পারদর্শিতা যথাক্রমে খুব বেশী, বেশী, একটু বেশী, চলনসই, একটু কম, কম বা খুব কম; অন্যভাবে বলতে গেলে সে হচ্ছে যথাক্রমে খুব চালাক, চালাক, একটু চালাক, না-চালাক না-বোকা, একটু বোকা, বোকা বা খুব বোকা।

1. ছবির ফাঁকা ঘরটিতে কোন্ অক্ষর বসবে?
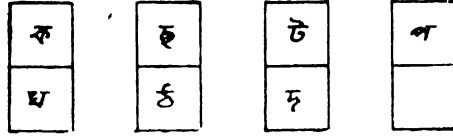
2. ছবির ?-চিহ্নিত স্থানে কোন্ সংখ্যা লেখা সঙ্গত হবে?
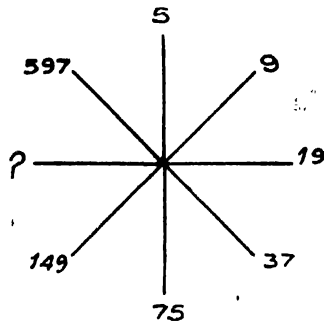
3. মোটামুটি হিসাবে জানা গেছে যে, মানুষের মাথায় গড়ে 1,50,000 চুল থাকে। যদি প্রতি মাসে 3,000 পুরনো চুল পড়ে গিয়ে নতুন চুল গজায়, তাহলে এক একটি চুল গড়ে কত সময় মানুষের মাথায় থাকে?

4. 1 থেকে 5 নম্বর দেওয়া ছবিগুলির মধ্যে কোন্‌টির জুড়ি নেই?
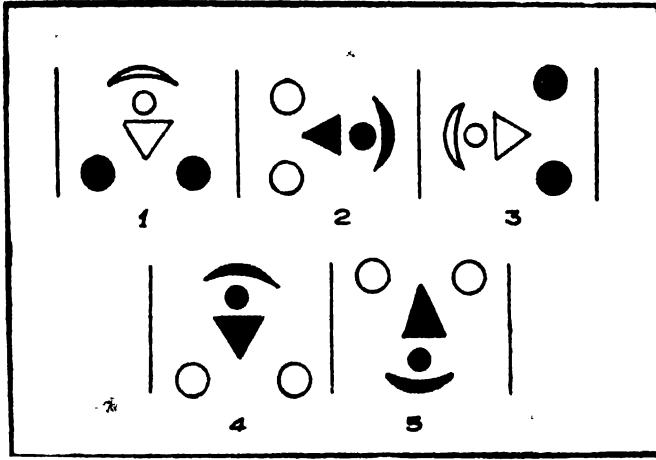
5. 1 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্কের এক একটিকে ছবির এক একটি গোল ঘরের মধ্যে এমনভাবে বসাও যাতে যে কোন ব্যাসের তিনটি ঘরের অঙ্কগুলির যোগফল 15 হয়।

(একাধিক সমাধান সম্ভব হলে যে কোন একটি দিতে পারলেই যথেষ্ট হবে।)
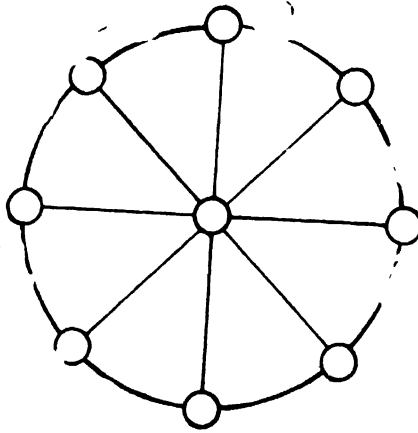
6. 8-কে 8 বার ব্যবহার করে কিভাবে 1,000 পাওয়া যেতে পারে?

(উত্তর 59নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

প্রজ্ঞানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা—9

সমাজ-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তি

পারমাণবিক শক্তি শুধু ধ্বংসাত্মক কাজেই ব্যবহৃত হয় না—সমাজের কল্যাণ সাধনেও এর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তিন হাজার টন উৎকৃষ্ট কোন জ্বালানী যে শক্তি উৎপাদন করে থাকে, এক কিলোগ্রাম পারমাণবিক ইন্ধন তাই করবে। গবেষণার দ্বারা আজ পর্যন্ত বহু রকম হিতকর কার্যে এর প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পারমাণবিক শক্তি উদ্ভাবিত হবার পর সুদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে কয়লা, তেলের অনটনের যে আশঙ্কা এতদিন ছিল, তা কমেছে। এবার রসায়নের এক নবশাখা—রেডিও-কেমিস্ট্রি গঠিত হয়েছে। এই রেডিও শব্দটির অর্থ তেজস্ক্রিয়তা—পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে প্রতিনিয়ত অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরিত হয়।

অনেক পদার্থ স্বভাবতঃই তেজস্ক্রিয়। অপর নিস্তেজ পদার্থের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রক্ষেপ করলে তাও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়ে থাকে। এগুলির নাম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। মূল পদার্থের নামের সঙ্গে সংখ্যা যোগ করে এদের নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন—আয়োডিন—তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-131 ; কোবাল্ট—কোবাল্ট-60 প্রভৃতি আইসোটোপ করা হয়েছে। এর জন্যে প্রয়োজন পারমাণবিক চুল্লীর। এর মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। ফলে তৈরি হয়—(1) ষ্টীম ও তড়িৎ শক্তি এবং (2) তেজস্ক্রিয় কৃত্রিম আইসোটোপ। এই চুল্লীর জ্বালানী ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। এই কাজের একটি বড় সমস্যা হলো চুল্লীর ভস্ম দূরীকরণ। এর তেজস্ক্রিয়াও অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে এর দ্বারা জমির সার তৈরি, প্লাষ্টিক তৈরির কাজ হচ্ছে বলে সমস্যার সমাধান হয়েছে। জনকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব করেছে এই সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ।

কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। এজন্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্য প্রকার শক্তির অনুপাতে তা এখন 3% হলেও, কয়েক বছরে তা 15% হবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে একটি জলযান সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে মাত্র একবার জ্বালানী নিয়ে। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়ামের সাহায্যে মহাকাশযান চললে বিশ্বের জ্বালানীর সাশ্রয় হবে এবং যানে বেশী স্থান পাওয়া যাবে। বরফির মত আকারের এক খণ্ড পারমাণবিক জ্বালানীর সাহায্যে বৃহৎ অট্টালিকায় আলো-পাখা-পাম্প প্রভৃতি সব কাজ চলবে বহুকাল ধরে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতির সঙ্গে পারমাণবিক শক্তির সরঞ্জামাদি রেখে উন্নত দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব। নিখুঁৎ ঢালাইয়ের কাজে, সঠিক বেধযুক্ত ধাতুর পাত তৈরি করতে, সূক্ষ্মভাবে বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপে, সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি গঠনে পারমাণবিক

শক্তির দরকার হয়ে থাকে। ঘর্ষণে যন্ত্রাদির কতটা ক্ষয় হয় এবং রং কতদিন চলতে পারে, তা নির্ণয়েও এর প্রয়োজন হয়।

আজকাল কৃষিক্ষেত্রে মাটির উর্বরতা, উপযুক্ত সার নির্ণয়ের ব্যাপার, কীটের কবল থেকে ক্ষেতে এবং গুদামে শস্যাদি সংরক্ষণে পারমাণবিক শক্তির খুবই প্রয়োজন। সমুদ্রজল লবণমুক্ত করা এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা প্রভৃতি কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এতে খরচও বেশী নয়।

চিকিৎসায় নতুন অস্ত্র তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। থাইরয়েডঘটিত রোগ, গলগণ্ড, মাথার ভিতরের টিউমার পরীক্ষায়, ক্যান্সারের কেন্দ্র নির্ণয়ে আয়োডিন-131 ভাল কাজ করে। চক্ষুঃপীড়ায় ষ্ট্রন্সিয়াম-90, ক্যান্সারে কোবাল্ট-60 সুফল প্রদান করে। ফস্‌ফরাস আইসোটোপের সাহায্যে রক্তের লাল কণিকার হিসাব করা চলে। দেহের বহির্দিকের বিকৃতির প্রতিকারে ষ্ট্রন্সিয়াম আইসোটোপ কার্যকরী হয়ে থাকে। লিউকেমিয়া, বহুমুত্র, শোথ, হৃদ্‌রোগের গবেষণায় আইসোটোপসমূহ অনেক কাজে আসবে বলে মনে হয়।

পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত আইন 1948 সালে আমাদের লোকসভায় গৃহীত হয়েছে। গঠিত হয়েছে পারমাণবিক শক্তি পরিষদ। 1955 সালে বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে পারমাণবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে। এর জ্বালানীর জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। ত্রিবাঙ্কুরে মোনাজাইট বালুকায় থোরিয়াম আছে। আমাদের দেশে পরমাণু-শক্তির অনুশীলন হয় শান্তির জন্যে, মারণাস্ত্র তৈরির জন্যে নয়।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাপ্ত এই নূতন পারমাণবিক শক্তিকে সুনিঃন্ত্রিত করতে পারলে বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রুবিকা কর

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. শ

[ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা অনুযায়ী ক ও ঘ-এর মধ্যে বাদ পড়েছে 2টি অক্ষর (খ, গ), ছ ও ঠ-এর মধ্যে 4টি অক্ষর এবং ট ও দ-এর মধ্যে 6টি অক্ষর ; অর্থাৎ বাদ-পড়া অক্ষরগুলির সংখ্যা যথাক্রমে 2, 4 ও 6। সুতরাং প-এর পর 8টি অক্ষর বাদ দিয়ে শ বসাতে হবে।]

2. 299

[5 থেকে সুরু করে ডান দিক দিয়ে পর পর সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, আগের সংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে তা থেকে যথাক্রমে 1 বিয়োগ বা যোগ করলে পরের সংখ্যাটি পাওয়া

যাচ্ছে; $5\times2-1=9$, $9\times2+1=19$, $19\times2-1=37$, $37\times2+1=75$, $75\times2-1=149$। সুতরাং ঈপ্সিত সংখ্যাটি হবে $149\times2+1=299$। আবার সংখ্যাটি যে 299, তার অন্য প্রমাণ হলো, পরবর্তী সংখ্যা হচ্ছে $597=299\times2-1$]

3. 4 বছর 2 মাস

[ধরা যাক, এখন একটি নতুন চুল গজালো। মাথার অন্য চুলগুলি অপেক্ষাকৃত পুরনো। সুতরাং গড়পড়তা হিসাব অনুযায়ী সেগুলি আগে পড়ে গেলে তারপর এটি পড়বে অর্থাৎ এখন থেকে যতগুলি চুল পড়বে, তাদের মধ্যে 1,50,000 তম হবে এটি। যেহেতু প্রতি মাসে 3,000 চুল পড়ে যায়, অতএব 1,50,000 চুল পড়তে সময় লাগবে 50 মাস বা 4 বছর 2 মাস। সুতরাং চুলটি ঐ সময় মাথায় থাকবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এক একটি চুল পড়ে 4 বছর 2 মাস মানুষের মাথায় থাকে।]

4. 4 নম্বর ছবি।

[1 নম্বর হচ্ছে 5 নম্বরের এবং 2 নম্বর হচ্ছে 3 নম্বরের জুড়ি। যে কোন জুড়ির প্রথমটিকে 180° ঘোরালে এবং সাদা চিহ্নগুলিকে কালো ও কালো চিহ্নগুলিকে সাদা করলে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়।]

5.
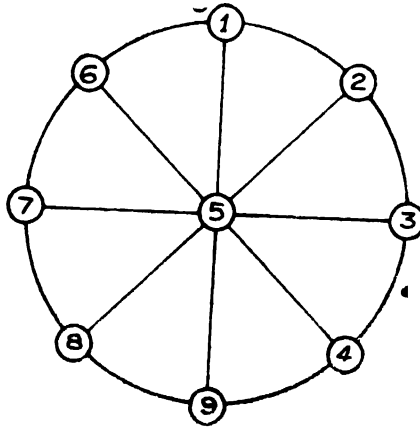
একটি সমাধান

[5-কে কেন্দ্রের ঘরটিতে রেখে 1, 2, 3 ও 4-কে যথাক্রমে 9, 8, 7 ও 6-এর বিপরীত ঘরে বসাতে হবে। উদাহরণ হিসাবে একটি সমাধান উপরে দেওয়া হলো।]

6. $888+88+8+8+8$

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : নাইট্রোগ্লিসারিন, টি. এন. টি. এবং অ্যামোনিয়াম পিকরেট কি ?

জীবন ঘোষ, জলপাইগুড়ি,

প্রশ্ন 2. : হিমোগ্লোবিন সাধারণতঃ কি উপাদানে তৈরি এবং হিমোগ্লোবিন প্রধানতঃ কি কাজে লাগে ?

শঙ্করলাল কুণ্ডু, খানাকুল,

উত্তর 1. : নাইট্রোগ্লিসারিন, টি. এন. টি. এবং অ্যামোনিয়াম পিকরেট—এই তিনটিই হচ্ছে বিস্ফোরক পদার্থ।

নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে গ্লিসারিনের বিক্রিয়ায় নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরি হয়। নাইট্রোগ্লিসারিন খুব সহজেই বিস্ফোরিত হয়। এমন কি, তৈরি হবার সময় যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাই বিস্ফোরিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই উপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে এটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। অতি সহজে বিস্ফোরিত হয় বলে একে অ্যাসিটোনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়—যা সহজে বিস্ফোরিত হয় না। বিশুদ্ধ নাইট্রোগ্লিসারিন পেতে হলে এই মিশ্রণে গরম বাতাস প্রয়োগ করা হয়, ফলে অ্যাসিটোন বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং বিশুদ্ধ নাইট্রোগ্লিসারিন পড়ে থাকে। প্রধানতঃ অন্যান্য বিস্ফোরকের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ টারজাতীয় পদার্থের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় টি. এন. টি. বা ট্রাইনাইট্রোটলুইন প্রস্তুত করা হয়। এর বিস্ফোরক ক্ষমতা খুবই বেশী। যুদ্ধে এই বিস্ফোরক অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

গরম জলে পিকরিক অ্যাসিডের দ্রবণের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম পিকরেট তৈরি হয়। অন্যান্য বিস্ফোরকের মত অ্যামোনিয়াম স্পর্শকাতর নয়। এই জন্যে গোলা-গুলি তৈরির কাজে এই বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়।

উত্তর 2. : লোহা, গ্লোবিন এবং প্রোটোপরফাইরিন—এই তিনটি পদার্থই হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের উপাদান; অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন হচ্ছে একটি মিশ্র প্রোটিন। হিমোগ্লোবিনের—হিম এবং গ্লোবিন—এই দুই অংশ আছে। হিম অংশের পরিমাণ খুবই কম। হিম হচ্ছে একটা ধাতব যৌগ—এর জন্যেই রক্তকে লাল দেখায়। আর রংবিহীন গ্লোবিনে আছে দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল—যাদের মধ্যে আছে বহু ধরণের অ্যামিনো-অ্যাসিড।

ইদানীং বিভিন্ন প্রকার হিমোগ্লোবিনের সন্ধান পাওয়া গেছে—এমন কি, একই দেহে বিভিন্ন প্রকার হিমোগ্লোবিনেরও অস্তিত্ব ধরা পড়েছে।

হিমোগ্লোবিন বাতাসের অক্সিজেনকে দেহের সমস্ত কোষে এবং তন্তুতে প্রয়োজনমত সরবরাহ করে এবং দেহের অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড সংগ্রহ করে ফুস্‌ফুসের সাহায্যে দেহ থেকে বের করতে সাহায্য করে; অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন শ্বাসকার্য পরিচালনা করে।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে ডক্টর বশী সেন

বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর বশী (বশীশ্বর) সেন গত 31শে অগাষ্ট '71 পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় 85 বছর এবং তিনি তাঁর পত্নী শ্রীমতী গারট্রুড এমারসেনকে রেখে গেছেন। সেন দম্পতি নিঃসন্তান।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে 1887 সালে বশী সেনের জন্ম। 1911 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস-সি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং এম. এস-সি পড়তে পড়তে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংস্পর্শে এসে বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন এবং তাঁরই প্রেরণায় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে গবেষণা সুরু করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি প্রায় 12 বছর সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান পরিভ্রমণ করেন।

1924 সালে বন্ধুদের এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে তিনি বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে ভাড়াটিয়া বাড়িতে বিবেকানন্দ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীব ও উদ্ভিদ কোষের অন্তর্বর্তী অংশগুলির (Protoplasmic colloids) ভৌত প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তাঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গবেষণার কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় ডক্টর সেন 1936 সালে তাঁর বিবেকানন্দ গবেষণাগার উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায় স্থানান্তরিত করেন। গবেষণাগারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্যে 1959 সালে এটিকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ডক্টর বশী সেন আমৃত্যু ঐ গবেষণাগারের অবৈতনিক অধ্যক্ষরূপে কাজ করে গেছেন। এই গবেষণাগার এখন ভারতের কৃষি গবেষণাগারগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

1948 সালে এই গবেষণাগার থেকেই আমাদের দেশে সর্বপ্রথম সঙ্কর ভুট্টার জন্ম হয়। আমাদের দুটি প্রধান খাদ্য—ধান ও গম উৎপাদনের উন্নতিতে এই গবেষণাগারের বিশেষ অবদান আছে। V. L-8 ধান এবং V. L-404 গমের প্রচুর ফলন এখানেই উদ্ভাবিত হয়। এখানে যে সঙ্কর

পিঁয়াজ উদ্ভাবিত হয়েছে, তার এক-একটির ওজন দেড় কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্যে 1957 সালে ডক্টর বশী সেনকে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। 1962 সালে তিনি ওয়াটুমল

ডক্টর বশী সেন

(Watumull) পুরস্কার লাভ করেন। 1971 সালের মার্চ মাসে উত্তর প্রদেশের পন্থনগর কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

অধুনা মেক্সিকোর বিভিন্ন বামনজাতীয় গম প্রচুর ফলনের জন্যে ভারতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু 1965 সালেরও আগে আমাদের দেশে বামনজাতীয় গমের উদ্ভব হয়েছিল বিবেকানন্দ গবেষণাগারে। উন্নত জাতীয় বজরা, জোয়ার, যব, ওট, মিষ্টি আলু ও বহু শাক-সব্জী সৃষ্টির জন্যে এই গবেষণাগার প্রসিদ্ধ। ডক্টর বশী সেন এই দেশে প্রয়োজনীয় পশুখাদ্যেরও প্রবর্তন করেন। Giant Star grass, Love Grass এবং Kudzu-র প্রয়োজনীয়তা তিনি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। এই গবেষণাগারে লম্বা আঁশযুক্ত কার্পাস, রেমি তন্তু এবং নানারকম বিদেশী ফলের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হয়েছে। এই গবেষণাগারের আর একটি কৃষিবিষয়ক বিশিষ্ট অবদান হচ্ছে মূল্যবান আহারযোগ্য ছত্রাকের (Edible mushroom) চাষ করবার সহজ প্রণালী।

ডক্টর সেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কৃষিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের Physiological Society of Great Britain এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Botanical Society of America-র সদস্য ছিলেন এবং বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগদান করেন। দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর দেড়-শ'রও বেশী গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মানুষ হিসাবে ডক্টর বশী সেন ছিলেন নিরহঙ্কার, পরোপকারী ও সহৃদয়। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর তিনি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

পরলোকে ডক্টর বিক্রম এ. সরাভাই

পারমাণবিক শক্তি কমিশন ও ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর বিক্রম এ. সরাভাই 30শে ডিসেম্বর ভোরে ত্রিবান্দ্রমের সরকারী পর্যটন হোটেল কোভালাম প্যালেসে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 52 বছর।

ডক্টর বিক্রম আম্বালাল সরাভাই 1919 সালের 12ই অগাষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমেদাবাদের গুজরাট কলেজে শিক্ষা গ্রহণের পর কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। এরপর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সে পরলোকগত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার সি. ভি. রামনের তত্ত্বাবধানে

মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন (1940-'45)।

1946 সালে ডক্টর সরাভাই ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্পর্কে গবেষণা করেন। এখান থেকেই তিনি পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

1948 সালে আমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী স্থাপনাবধি ডক্টর সরাভাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 1958 ও 1961 সালে তিনি ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নিউক্লিয়ার সায়েন্স লেবরেটরীর ভিজিটর ছিলেন। 1953 সালে ফ্রান্সে, 1955 সালে মেক্সিকোয়, 1956 সালে ষ্টকহোমে, 1957 সালে ইটালীতে, 1959 সালে মস্কোয়, 1960 সালে ফিনল্যাণ্ডে এবং 1961 সালে জাপানে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং তথ্যাদি উপস্থাপিত করেন।

আমেদাবাদ বয়নশিল্পের গবেষণা সংস্থা স্থাপনায় ডক্টর সরাভাই সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 1947 সাল থেকে 1955 সাল পর্যন্ত এই সংস্থায় আংশিক সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতের রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি সাধনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন এবং 1956 সালে জাপানে উৎপাদক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করেন। তিনি 1965 সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের অবৈতনিক অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডক্টর সরাভাই বিশুদ্ধ ও ফলিত পদার্থবিদ্যার আন্তর্জাতিক ইউনিয়নের মহাজাগতিক রশ্মি কমিশনের সদস্য ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স, লণ্ডন ফিজিক্যাল সোসাইটি ও কেম্ব্রিজ ফিলোসফিক্যাল সোসাইটির ফেলো এবং আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিটি ও সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

1962 সালের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মহাকাশসম্বন্ধীয় গবেষণার দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেন এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের উদ্যোগে মহাকাশ গবেষণার জন্যে গঠিত ভারতীয় জাতীয় কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ভারতের মহাকাশ গবেষণায় ডক্টর সরাভাইয়ের অবদান চিরস্মরণীয়। থুম্বা বিষুবরৈখিক রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও আমেদাবাদে পরীক্ষামূলক কৃত্রিম উপগ্রহ সংযোগ কেন্দ্র স্থাপনায় তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়।

1966 সালে ডক্টর সরাভাই পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানপদে আসীন হন। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে ভারতের পরিকল্পনাকে ডক্টর সরাভাই নতুন উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যান এবং ভারতের পারমাণবিক নীতিকে কার্যকরী করতে সাহায্য করেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ ফেব্রুয়ারী, 1972 দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বাস্থ্য ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত*

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজকাল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা সমস্থানিকের ব্যবহার সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমবর্ধমান। তাছাড়া মহাকাশে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ আমাদের বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করেছে। বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ বেড়ে গেছে এই সব বোমার বিস্ফোরণে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে পারমাণবিক বোমা জাপানের উপর ফেলা হয়েছিল, মানুষের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জের আজও চলেছে। বোমার বিস্ফোরণের ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শুধু তখনকার বোমাকবলিত লোকদেরই ক্ষতি করে নি, তাদের বংশধরদেরও ক্ষতি করেছে। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও স্বাস্থ্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা দেশে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোন্ কোন্ ধরণের বিকিরণ মানুষের কোনও ক্ষতি করে না, আর কাদের ক্ষতি করবার ক্ষমতা বেশী, কি ধরণের ক্ষতি তারা করে, তার প্রতিষেধকই বা কি প্রভৃতি তাঁদের গবেষণার বিষয়। বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবার চেষ্টা করবো।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে যে বিকিরণ হয়, তা দেহের পেশী, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষকে আয়নিত করে। এই দেহাংশগুলি বেশী পরিমাণে আয়নিত হলেই দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে—এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। আয়নিত হবার ফলে দেহকোষের গঠন পরিবর্তিত হতে পারে এবং সুস্থ দেহকোষগুলির বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে অনেক জটিল অসুখ দেখা দিতে

* পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ, কোচবিহার

পারে, যার প্রকাশ খুব ধীরে ধীরে আমাদের অগোচরেই ঘটতে থাকে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলতে আমরা প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ বুঝি—আলফা কণা, বিটা কণা ও গামা রশ্মি। তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিয়োজনে (Disintegration) এই তিন রকম কণা পাওয়া যায়; অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিয়োজিত হবার সময় তাথেকে এই তিন রকম কণার সব কয়টি বা কোন কোনটি বেরিয়ে আসে। তাকেই আমরা বলি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। এদের মধ্যে আলফা কণাকে সহজেই কাচ কিংবা রবারের আবরণের সাহায্যে আট্‌কে দেওয়া যায়। ফলে সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করেই তাদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বিটা কণা হলো উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-স্রোত। এরা 2 মিলিমিটার পুরু কাচের প্লেট ভেদ করে চলে যেতে সক্ষম। তাই চামড়ার উপর এদের প্রভাব কয়েক মিলিমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিটা কণার প্রভাবে চামড়া বড় জোর পুড়ে যেতে পারে। এর চেয়ে বেশী ক্ষতি করবার ক্ষমতা বিটা কণার নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলফা ও বিটা কণার ভেদশক্তি খুব কম হবার ফলে মানুষের ক্ষতি করবার ক্ষমতা এদের খুব বেশী নেই। কিন্তু সমস্যা গামা রশ্মিকে নিয়ে—এদের ভেদশক্তি খুবই বেশী। ফলে এরাই মানুষের দেহের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করতে পারে। ভেদশক্তি বেশী হওয়ায় চামড়া ছাড়িয়েও এদের ক্ষতিকর প্রভাব দেহের অভ্যন্তরে হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সীসা ও কংক্রীটের দেয়ালের সাহায্যে গামা রশ্মিকে বাধা দিয়ে এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। উল্লিখিত তিন রকম কণা ছাড়া নিউট্রন, মহাজাগতিক রশ্মি এবং রঞ্জেন রশ্মিও মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ মূলতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(1) শোষিত শক্তির পরিমাণ, (2) শক্তি শোষণের হার এবং (3) শোষণের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ দেহের কোথায় কেমনভাবে বিকিরণ এসে পড়ছে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শক্তির পরিমাপের জন্যে বিভিন্ন একক আছে। এদের মধ্যে কুরী রঞ্জেন, রঞ্জেন ইকুইভ্যালেন্ট ফিজিকাল (Roentgen equivalent physical) বা সংক্ষেপে rep এবং রঞ্জেন ইকুইভ্যালেন্ট ম্যান বা rem প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে কোনও তেজস্ক্রিয় পদার্থের 3.7×10^{10} সংখ্যক বিয়োজনের ফলে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়, তা হলো এক কুরী। রঞ্জেন হলো এমন পরিমাণ বিকিরণ, যা স্বাভাবিক চাপ ও তাপে 1 ঘনসেন্টিমিটার বা 0.001293 গ্রাম বাতাসকে এমনভাবে আয়নিত করে, যাতে আয়নিত বায়ুতে মোট আয়নের পরিমাণ হয় 1 e.s.u.। রঞ্জেন কেবলমাত্র রঞ্জেন রশ্মি এবং গামা রশ্মির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সব রকম বিকিরণের ক্ষেত্রে যে এককটি ব্যবহার করা হয়, তা হলো rep (রেপ)। যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে নরম তন্তুর প্রতি গ্রাম 93 আর্গ শক্তি শোষণ করে, তা হলো 1 রেপ। rem (রেম) হলো বিকিরণের জৈব (Biological) একক। এক রঞ্জেন গামা রশ্মির কোনও জৈব বস্তুর উপর ক্রিয়াকে rem দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যে সব ক্ষতি করতে পারে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—(1) লিউকেমিয়া, হাইপোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া (Hypoplastic anaemia) প্রভৃতি অসুখ, যা দেহের রক্তের ক্ষতিকারক এবং আয়ু হ্রাসকারী, (2) রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস, (3) অবাঞ্ছিত সোমাটিক এবং জেনেটিক প্রতিক্রিয়া (Somatic & Genetic effect), (4) ম্যালিগন্যান্ট টিউমার (Malignant tumour), যা মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়

(5) চর্মের ক্যান্সার, (6) ক্রমবিকাশমান ভ্রূণের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি। এই সব অঘটন সঙ্গে সঙ্গে নাও ঘটতে পারে। অনেক পরে—এমন কি, দশ বছর পরেও বিকিরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলের প্রকাশ দেখা দিতে পারে।

নিরাপদে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহে গ্রহণ করা যেতে পারে, তার একটা সীমা আছে। যে পরিমাণ বিকিরণের ফলে দেহের ক্ষতি হতে পারে, তার এক-দশমাংশ পর্যন্ত বিকিরণ শরীরের পক্ষে নিরাপদ। তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission on Radioloigcal Protection) নিরাপদে গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ নির্দেশ করেছেন। 18 বছরের বেশী বয়স্ক মানুষের গোনাড (Gonads) বা দেহের রক্ত উৎপাদনকারী ইন্দ্রিয়সমূহ এবং চোখের লেন্স বাঁচাবার জন্যে গ্রহণযোগ্য বিকিরণের যে সর্বোচ্চ সীমা তাঁরা নির্দেশ করেছেন, তা $D=5(N-18)$ সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখানে D হলো rem-এ বিকিরণের সর্বোচ্চ সীমা এবং N হলো বয়স (বছরে)।

18 বছর বয়সের পর যাদের সব সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে কাজ করতে হয়, তাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে গ্রহণযোগ্য বিকিরণের নিরাপদ সীমা হলো 100m rems। অবশ্য প্রথম সপ্তাহে 300m rems পর্যন্ত নিরাপদ। তাছাড়া পর পর 13 সপ্তাহের মধ্যে সে আরও 3 rems বিকিরণ অতিরিক্ত গ্রহণ করলেও তা ক্ষতিকর হবে না। 13 সপ্তাহের শেষে এই পরিমাণ বিকিরণ সে একবারেই নিতে পারে। তবে একবারে সমস্তটা না নেওয়াই ভাল। 18 বছরের কম বয়স্কদের জন্যে বছরে 5 rem এবং 30 বছর বয়স্কদের জন্যে বছরে 60 rem পর্যন্ত বিকিরণের নিরাপদ সীমা।

চোখ ও রক্ত উৎপাদনকারী ইন্দ্রিয় ছাড়া দেহের অপরাপর অংশের জন্যে বিকিরণের পরিমান $D=5(N-18)$ অপেক্ষা সামান্য বেশী হলেও তা নিরাপত্তার সীমা অতিক্রম করে না। উল্লিখিত ইন্দ্রিয়দ্বয় ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশের জন্যে যে অতিরিক্ত পরিমাণ বিকিরণ-নিরাপদে গ্রহণযোগ্য, তা হলো হাত ও পায়ের জন্যে সপ্তাহে গড়ে 1·5 rem এবং এছাড়া অন্যান্য অংশের জন্যে সপ্তাহে গড়ে 0·6 rem। বিভিন্ন পরিমাণ বিকিরণের ফল নীচের তালিকায় দেওয়া হলো।

বিকিরণের মাত্রা (রঞ্জেনে)	সম্ভাব্য ফল
0 3	
2·5	বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।
25-50	রক্তে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে, তবে তা মারাত্মক কিছু নয়।
50-100	ক্ষতিকারক। রক্তকোষের পরিবর্তন হয়। তবে মানুষকে অক্ষম করে না।
100-200	ক্ষতিকর। মানুষকে অক্ষম করে দিতে পারে। শতকরা 10 জনের মৃত্যু পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।
400	শতকরা 50 জনের মৃত্যু।
600	„ 75 „ „
800	„ 90 „ „
1000	„ 95 „ „

প্রতিকার—শরীরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অবাঞ্ছিত ফল দূর করা খুব সহজ নয় বরং প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। কারণ বিকিরণের ফলে দেহের যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তাকে আর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবুও ভিটামিন বি-6 বা পাইরাইডক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড প্রয়োগ করে নৌ-পীড়া, গা-বমি ভাব, লিউকেমিয়া, ডারমাটাইটিস প্রভৃতি রোগ উপশম করা হয়। ভিটামিন বি-12 বা সাইনোকোবালেমিনও তেজস্ক্রিয় ক্ষতির কিছু প্রতিকার করতে পারে।

ট্রান্সফিউসন থিরাপি (Transfusion therapy) তেজস্ক্রিয় অসুস্থতায় চিকিৎসায় ফলপ্রসূ। এর সাহায্যে অবাঞ্ছিত এবং নষ্ট কোষগুলিকে দেহ থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব হয়। 4-ডাইমিথাইল-5 সালফানিলামাইড-এর মত সালফোনামাইড চোখের ক্ষতি দূর করবার ক্ষমতা রাখে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সিজিয়াম-137 এবং 134 থেকে নির্গত বিকিরণ দেহের পেশীকে আক্রমণ করে। ফলে পেশীর মধ্যে জ্বালা ভাব, ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। উপরিউক্ত বিকিরণের ফলে মিউকাস মেমব্রেনও আক্রান্ত হয়। এই সব রোগের প্রতিকারের জন্যে ইথোহেপ্টাজিন সাইট্রেট, অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিডসহ মেপ্রোবামেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

ইংরেজী প্রবাদবাক্য "Prevention is better than cure" তেজস্ক্রিয় বিকিরণজাত রোগ এবং তার প্রতিকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বিকিরণের ফলে রোগ হবার পর তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা ছাড়াও আরও যেটা জরুরী বেশী, তা হলো বিকিরণের প্রতিষেধক ব্যবস্থা। বিকিরণের পরিমাণ, তার ক্ষতি করবার ক্ষমতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে প্রতিষেধক ব্যবস্থাও বিভিন্ন হয়। আইসোটোপ থেকে বেশ কিছু দূরে থেকে কাজ করলে বিকিরণ ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র (Inverse square law) মেনে চলায় তার প্রাবল্য কমে যায় এবং ফলে বিকিরণের ক্ষতি করবার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। দূর থেকে চালনা করবার জন্যে দূরনিয়ন্ত্রিত চিমটা (Remote control tongs), টুইজার (Tweezers), যান্ত্রিক হাত (Mechanical hands), দূরনিয়ন্ত্রিত পিপেটার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া দস্তানা ও গাউন ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজন। বিকিরণের পরিমাণ নিরাপদ সীমা অতিক্রম যাতে না করে, সেটাও সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ নিয়ে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের উচিত মাঝে মাঝে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং কোনও রকম অস্বস্তি বোধ করলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

কোপার্নিকাস ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব

বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়*

সভ্যজগতের মানুষ যেমন বর্তমান যুগের অসামান্য ব্যক্তিদের বিশেষভাবে সম্মানিত করে এবং তাঁদের অবদান সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে, তেমনি অতীতের অসামান্য ব্যক্তি বা মহাপুরুষদের কীর্তি সম্বন্ধেও তারা আলোচনা করে বা তাঁদের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। ভবিষ্যতকে যথার্থভাবে বোঝবার জন্যে আমরা যেমন বর্তমান কালের বিশিষ্ট মনীষী বা বিজ্ঞানীদের ষাট বা সত্তর বছর পূর্তির দিনে তাঁদের কাজের গুরুত্ব গভীরভাবে বিবেচনা করি, ঠিক তেমনি বর্তমানকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে অতীতের মনীষীদের কীর্তি আলোচনা ও সমীক্ষণেরও দরকার আছে।

প্রায় সোয়া-চার-শ' বছর আগে যে বিজ্ঞানী একটি বিরাট বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এনেছিলেন, তাঁর পঞ্চশত বার্ষিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করবে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগৎ 1973 সালের 19শে ফেব্রুয়ারী। এই বিজ্ঞানীর নাম কোপার্নিকাস (Copernicus)। তিনি পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন, জাতে হয়তো জার্মান, কিন্তু তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার উপর অধিকাংশ প্রভাবটাই ছিল ইটালীর। ইটালীতে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে অধ্যয়ন করেন। তাঁর প্রধান পেশা ছিল ডাক্তারী কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনায় প্রাধান্য পায় জ্যোতির্বিদ্যা।

কোপার্নিকাসের অবদানের কথা বলবার আগে একটি ভূমিকার প্রয়োজন। খৃষ্টীয় 2য় শতকের বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ প্তলেমাইয়স বা টলেমি (Ptolemy) চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহাদির চলাচলের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে যে অ্যারিস্টোটলীয় তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাতে কল্পনা করা হয়েছিল যে, পৃথিবী সব জ্যোতিষ্কের গতিপথের কেন্দ্রে নিশ্চল এবং তাকে সূর্য বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করছে এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ শুধু যে বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে—তাই নয়, তারা তাদের কক্ষপথের সীমানায় আবার ছোট ছোট বৃত্তাকার পথে পাক খাচ্ছে। তাদের চলার পথ যেন অনেক ফাঁসের (Loops) প্যাঁচ দেওয়া বৃত্তাকার পথ (Epicycles)। গ্রীক বিজ্ঞানে জ্যামিতি পেয়েছিল সর্বোচ্চ স্থান, তাই জ্যোতিষ্কসমূহের আকাশবিহার বর্ণনা করতে গিয়ে টলেমি কখনও পদার্থতাত্ত্বিক কারণ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন নি। কেন গ্রহগুলি এই রকম পাক খেতে খেতে চলে আর বৃত্তাকার পথে কেন চন্দ্র-সূর্য ঘোরে, তা ব্যাখ্যা করবার কোনও দরকারই বোধ করেন নি—যেহেতু গ্রীক জ্যামিতিবিদের চোখে বৃত্ত একটি উৎকৃষ্ট জ্যামিতিক সত্তা; অতএব জ্যোতিষ্কেরা তো স্বাভাবিকভাবেই বৃত্তাকার পথে ঘুরবে! যদিও প্রাচীন গ্রীক জ্যামিতিবিদ্ আপোলোনিয়াস (Apollonius) উপবৃত্ত, পরাবৃত্ত, অধিবৃত্ত (Ellipse, Hyperbola, Parabola) প্রভৃতি জ্যামিতিক সত্তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তবুও 17 শতক পর্যন্ত কারোর মনে হয় নি যে, গ্রহ-উপগ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকারও হতে পারে—কারণ বৃত্তের মহিমায় সবাই ছিল অভিভূত।

টলেমির মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি সুষ্ঠু ও সংহত

* ডিপার্টমেন্ট অব হিউম্যানিটিজ, আই. আই. টি. খড়্গপুর।

জ্যামিতিক চিত্রবিন্যাস সৃষ্টি করা, যা দিয়ে নিখুঁৎ ও নির্ভরযোগ্যভাবে জ্যোতিষ্কগুলির চলাফেরার বর্ণনা ও হিসাব করা যায়। তাদের গতিবিধির পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে টলেমি মাথা ঘামান নি। কিন্তু এই সুষ্ঠু জ্যামিতিক জ্যোতির্বিদ্যা এমন একটা জটিল চিত্র সৃষ্টি করেছিল যে, প্রায় আশীখানা বৃত্ত ও এপিসাইকেলের বিচিত্র সমাবেশ ছাড়া সেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হতো না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই গ্রীক বিজ্ঞান-সাধকেরা বিশ্বাস করতে সুরু করেন যে, প্রকৃতি (Nature) সরল ও মিতব্যয়ী অথচ টলেমির জটিল চিত্রের সঙ্গে এই মূল বিশ্বাসের একটা গরমিল দেখা দিল। টলেমি শান্তি পেলেন না, কিন্তু মনকে বোঝালেন—আমার বর্ণনা যখন সব জ্যোতিষিক গতিবিধির সঠিক হিসাব দিতে পারছে, তখন জটিলতায় কি আসে যায়। যাহোক, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভর করেই আরবীয় বিজ্ঞানীরা বহু শতক ধরে তাঁদের নানা প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক হিসাব মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করেছেন।

প্রায় দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টীয় পণ্ডিতরা স্পেনীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্পর্শে এসে টলেমিকে যথার্থভাবে চিনলেন এবং 16 শতক পর্যন্ত টলেমির জ্যোতির্বিদ্যাকেই আঁকড়ে রইলেন, যদিও তার আগে থেকেই কোনও কোনও পণ্ডিতমহল পৃথিবীর নিশ্চলতার বিশ্বাসকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছিলেন।

16 শতকের গোড়ার দিকেই কোপার্নিকাস অনুভব করেছিলেন যে, টলেমির জটিল চিত্র কখনও সরল ও মিতব্যয়ী প্রকৃতির বাস্তব সত্তার বর্ণনা হতে পারে না। তিনি বুঝলেন যে, গ্রহসমূহের নানা রকম গতিবিধি বর্ণনা করতে গিয়ে টলেমি যে সংখ্যক বৃত্তের ও এপিসাইকেলের বিন্যাস সৃষ্টি করেছিলেন, তা একান্ত অনাবশ্যক। কোপার্নিকাসের মূল উদ্দেশ্য হলো টলেমির জ্যামিতিক চিত্রের এমন একটা বদল করা, যাতে গ্রহগুলির বিভিন্ন গতিবিধিকে যতটা সম্ভব কম সংখ্যক বৃত্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। বৃত্তের সংখ্যা কমাতে হলে কল্পনা করা দরকার যে, সূর্য বিশ্বের কেন্দ্রে নিশ্চল এবং পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগুলির মতই সূর্য প্রদক্ষিণ করছে এবং নিজের অক্ষে ঘুরছে। এই তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রয়োজন কোপার্নিকাস নিজের যুক্তি-বোধ থেকেই অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া পুরনো গ্রীক পুঁথির সংস্পর্শে এসে তিনি জানতে পারেন যে, পিথাগোরাস, আরিস্তার্খস প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা প্রদক্ষিণরত পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন এবং পৃথিবী নিজে রোজ এক পাক খায়, তাও বলেছিলেন। এতে কোপার্নিকাসের সুবিধা হল আরিস্টোটলীয় ও টলেমীয় অতি প্রভাবশালী প্রাচীন তত্ত্বকে প্রাচীন যুগেরই একটি বিস্মৃত তত্ত্বের নজির দেখিয়ে আঘাত করা। সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্বে পৌঁছাবার জন্যে কোপার্নিকাসকে নূতন নূতন আরো নিখুঁৎ পর্যবেক্ষণ এবং তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয় নি, পূর্বের পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভিত্তিতেই কি করে তাত্ত্বিক জটিলতা কমানো যায়, সেটাই ছিল কোপার্নিকাসের চিন্তা। একটা উন্নততর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পৌঁছাতে গেলে কল্পনাশক্তির ভূমিকা যে কত বড়, তার একটি দৃষ্টান্ত কোপার্নিকাসের নূতন তত্ত্ব। তিনি দেখালেন যে, সূর্যকে কেন্দ্রে নিশ্চলভাবে রাখলে এবং পৃথিবীকে চলমান করলে, অন্যান্য গ্রহগুলির অদ্ভুত ফাঁস-খাওয়া কক্ষপথগুলি (Epicycles) লুপ্ত হয় এবং মাত্র ত্রিশটি বৃত্তাকার কক্ষপথের সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের গতিবিধিকে অনেক সরল ও আরো সুষ্ঠুভাবে বর্ণনা করা যায়।

কোপার্নিকাস টলেমীয় তত্ত্বের যে সংস্কার করলেন, সেটাও অবশ্য জ্যামিতিক সংস্কার, অর্থাৎ তিনিও ব্যাখ্যা করেন নি—কেন গ্রহগুলি

বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এই পদার্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গ্রীকদের জ্যামিতি-সর্বস্ব দৃষ্টিতে যতটা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়েছিল, কোপার্নিকাসের চোখেও ততটাই। তবে তাঁর নিছক জ্যামিতিক সংশোধনই ভবিষ্যতের জ্যোতির্বিদ্যাকে নিরর্থক জটিলতা থেকে মুক্ত করেছিল। তাঁর জ্যামিতিক চিত্রেও যেটুকু জটিলতা থেকে গিয়েছিল, তাও তিনি ঘোচাতে পারতেন, যদি উপলব্ধি করতেন যে, গ্রহগুলি ঘোরে উপবৃত্তাকার পথে, নিটোল বৃত্তাকার পথে নয়। তাঁর মৃত্যুর (1543) প্রায় অর্ধশতক পরে জার্মান জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লার অনেক তথ্য বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারেন যে, মঙ্গল বা বৃহস্পতির কক্ষপথকে উপবৃত্ত হিসাবে দেখলে জ্যোতির্বিক বর্ণনা আরো অনেক সহজ ও সুষ্ঠু হয়। কেন গ্রহ-উপগ্রহগুলি বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, তার যথার্থ পদার্থ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন নিউটন 17 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

কোপার্নিকাস তাঁর নূতন তত্ত্বের বই (De Revolutionibus Orbium Coelestium অর্থাৎ জ্যোতিষ্কদের পরিক্রমণ বিষয়ে) পোপকে উৎসর্গ করে লেখেন যে, বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রচার করা তিনি কর্তব্য মনে করেন। কিন্তু যাঁর উপর বইটি প্রকাশনের ভার পড়ে, তিনি গির্জার কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্যে ভূমিকায় মন্তব্য করেন যে, এই নূতন তত্ত্বটি সরল, বোধগম্য ও সুবিধাজনক গাণিতিক তত্ত্ব মাত্র, এই তত্ত্ব প্রকৃতির আসল সত্তা বর্ণনার দাবী করে না। এই আপোষের আশ্রয় নিয়ে লেখক নিশ্চয় পোপকে খুশী করতে চান নি। কিন্তু তাঁর হাতে মুদ্রিত বইটি যখন পৌঁছায়, শোনা যায়, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, প্রতিবাদ জানাবার উপায় তখন নেই। 1543 সালে তাঁর মৃত্যুর পর সেই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রোমান ক্যাথলিক গীর্জা তাঁর মতবাদকে আক্রমণ করবার কোনও দরকার বোধ করেন নি, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতেরাই নূতন তত্ত্বটির ব্যবহারিক সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সেটিকে প্রকৃতির বাস্তব বর্ণনা হিসাবে স্বীকৃতি দেন নি, ঠিক যেমন গত শতাব্দীর কোনও কোনও বিশিষ্ট রসায়নবিদ্‌ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী নানা ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সুবিধার জন্যে পরমাণুবাদকে (Atomism) ব্যবহার করেছেন, অথচ বর্তমান শতকের গোড়া পর্যন্তও পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব মানতে চান নি।

16 শতকের শেষে যখন ইটালীর নির্ভীক দার্শনিক ব্রুনো (Bruno) এবং তারপরে গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর হলেন, তখন থেকেই গীর্জা এই ধর্মদ্রোহী মতবাদটিকে দমন করতে উদ্যত হলো। ব্রুনো সূর্য-কেন্দ্রিক-তত্ত্বের যে সমর্থন জানালেন, তার ভিত্তি ছিল দার্শনিক যুক্তিবাদের উপর। আর, গ্যালিলিও যে সমর্থন জানালেন, তার ভিত্তি দূরবীক্ষণের অকাট্য পর্যবেক্ষণ। যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণ— এই দুটি জিনিষই ছিল গীর্জার পরম শত্রু। ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয় (1600) এবং গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করা হয় (1633)। কিন্তু 17 শতকের মধ্যেই বিজ্ঞান-জগৎ এই তত্ত্বকে বরণ করে নেয় এবং তাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে নিউটনের যুগান্তকারী জ্যোতির্বিদ্যা। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক গীর্জার ঘুম ভাঙলো অনেক পরে, মাত্র গত শতকের প্রথমার্ধে সূর্য-কেন্দ্রিক তত্ত্ব গীর্জার স্বীকৃতি পেল।

গোয়েন্দা-সহায়ক রঞ্জেন রশ্মি

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শহরতলীর একটি মাঝারী আকারের দোতলা বাড়ীতে মালিক সপরিবারে বাস করতেন। একদিন দুপুর রাতে ঐ বাড়ীতে আগুন লেগে যায়—আশেপাশের লোকজন এবং দমকলের চেষ্টার ফলেও কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হলো না. সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাসীন্দারা সবাই নিরাপদে আছেন, কিন্তু বাড়ীর কর্তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ছাইগাদার মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে আগুনে পোড়া সম্পূর্ণ বিকৃত একটা মৃতদেহ পাওয়া গেল। কিন্তু বিকৃত দেহটা কি বাড়ীর মালিকের, না অন্য কারোর—তা বোঝবার কোন উপায় ছিল না। পুলিসের তদন্তেও মৃতদেহের সঠিক পরিচয় নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। অবশেষে তাদের রঞ্জেন রশ্মির পরীক্ষার শরণ নিতে হলো। বিকৃত দেহের একটা এক্স-রে ফটো নেওয়া হলো। কিছুকাল আগে তার বুকের একটা এক্স-রে ছবি তোলা হয়েছিল। সেই ছবিতে বুকে একটি জখমের দাগ ছিল। এবার অগ্নিদগ্ধ বিকৃত দেহের এক্স-রে ফটোতেও ঠিক একই জায়গায় সে রকম একটা দাগের সন্ধান পাওয়ার ফলে দগ্ধ, বিকৃত দেহটি যে গৃহকর্তার, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ রইলো না। এই সূত্র ধরে অগ্রসর হবার ফলে অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ ও গৃহকর্তার মৃত্যুর রহস্যও উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

উপরের ঘটনাটি হচ্ছে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে অপরাধ তদন্তের একটি দৃষ্টান্ত। এমনি বহু কাজে আজ রঞ্জেন রশ্মি পুলিশ, তথা গোয়েন্দাদের এক অমূল্য সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেখা যাক, এই রঞ্জেন রশ্মি কিভাবে তদন্তের কার্যে সাহায্য করতে পারে।

পরিচয়

অনেকেই হয়তো জানেন, রঞ্জেন রশ্মি হচ্ছে এমন এক তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, যা সাধারণ আলোক রশ্মি বা বিকিরণের মতই চরিত্রবিশিষ্ট। কিন্তু তফাৎ এই যে, এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট—দৃষ্টিগোচর আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এক হাজার ভাগের এক ভাগের মত। তাই এই রশ্মির ভিতরে প্রবেশ করবার বা বাধা ভেদ করবার যথেষ্ট শক্তি আছে। যে সব কঠিন বস্তু—যেমন কাঠ, শরীরের মাংস সাধারণ আলোর প্রবেশে বাধা দেয়, তারাও রঞ্জেন রশ্মির প্রবেশপথে কোন প্রতিবন্ধক নয়, রঞ্জেন রশ্মি তাদের ভেদ করে অপর পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে।

রঞ্জেন রশ্মির ভেদ করবার ক্ষমতা নির্ভর করে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। যে রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশী, তাদের বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা কম। একে বলা হয় নরম বা মৃদু রঞ্জেন রশ্মি। আবার যে রঞ্জেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট, তাদের বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা বেশী। এদের বলা হয় প্রখর রঞ্জেন রশ্মি। কোন কোন অপরাধসংক্রান্ত ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে শুধুমাত্র প্রখর রঞ্জেন রশ্মির দরকার হয়, সে ক্ষেত্রে মৃদু রঞ্জেন রশ্মি কোন কাজেই আসে না। তেমনি এর বিপরীত দৃষ্টান্তও আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, অপরাধ তদন্তে মৃদু ও প্রখর উভয় প্রকার রশ্মিরই উপযোগিতা রয়েছে। তাই উভয়েই স্থান পেয়েছে আধুনিক ফরেনসিক গবেষণাগারে।

রেডিওগ্রাফি পদ্ধতি

অপরাধ তদন্তে রঞ্জেন রশ্মিকে কাজে লাগানো হয় রেডিয়োগ্রাফি পদ্ধতিতে। রেডিওগ্রাফি হচ্ছে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে বস্তুবিশেষের আলো-ছায়াচিত্র গ্রহণ। এই চিত্র গৃহীত হয় রঞ্জেন রশ্মিসচেতন ফিল্ম বা স্বচ্ছ পাত্‌লা পাতে। সোজা কথায়, রেডিওগ্রাফির মর্ম হচ্ছে—অদৃশ্য রঞ্জেন রশ্মিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন রকম; যেমন—কোন ভারী বস্তুর এই রশ্মিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা হাল্কা জিনিষের চেয়ে বেশী। এই কারণেই রঞ্জেন রশ্মি সহজেই কাগজ, মাংস বা কাঠ ভেদ করে যেতে পারে, কিন্তু হাড়, লোহার পাত্‌, সীসা প্রভৃতি ভেদ করে যেতে পারে না। ফলে রঞ্জেন রশ্মির গতিপথে এসব পড়লে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়।

রঞ্জেন রশ্মির প্রয়োগ

রোগ নির্ণয় ও দাঁত পরীক্ষার কাজে রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। এই রশ্মি একাধারে যেমন যন্ত্রশিল্প সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তেমনি সম্প্রতি অপরাধ তদন্তের কাজেও এর প্রচলন হয়েছে।

অপরাধ তদন্তের কাজে যে সব ক্ষেত্রে রঞ্জেন রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছে, তার কয়েকটির কথা বলছি। এর আগে প্রবন্ধের সুরুতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম রঞ্জেন রশ্মির ব্যবহার হয়, গোপন ও বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের কাজে অথবা গৃহের আসবাবপত্র ও দেয়াল ইত্যাদি তল্লাসীর কাজে।

রঞ্জেন রশ্মির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার একটি হচ্ছে—সন্দেহজনক পার্সেল ও প্যাকেট প্রভৃতির গোপন তল্লাসীর কাজে। আজকের দিনে নানা ব্যাপারে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ খুব বেড়ে যাবার ফলে সতর্কতার প্রয়োজনও বেশী করে দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তার জন্যে দরকার লুকানো বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ খুঁজে বের করা এবং সেই সঙ্গে দুষ্কৃতকারীর সন্ধান করা। এই ভাবে অনুসন্ধানের ফলে বিস্ফোরণ ঘটবার আগেই বোমা বা বিস্ফোরক থেকে সাবধান হওয়া যায়।

রঞ্জেন রশ্মি ধাতুনির্মিত কোন যান্ত্রিক কাঠামোতে ত্রুটি বা খুঁৎ প্রভৃতি থাকলে তার সঠিক প্রকৃতি নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। এই ভাবে নাশকতা ও দুর্ঘটনা নিবারণ করা সম্ভব হয়।

পরিচয়হীন মৃতদেহ রঞ্জেন রশ্মিতে পরীক্ষা করে সেই দেহের দাঁত ও হাড়ের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও তা নিখোঁজ লোকের দৈহিক বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে মৃতের সঠিক পরিচয় নির্ধারণ করা চলে। মৃতদেহের অস্থি রঞ্জেন রশ্মিতে পরীক্ষা করে তার বয়স ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব। ভেঙ্গে-যাওয়া হাড় শরীরের কোন্‌ অংশ থেকে এসেছে, তা বলা চলে।

অনেক সময়েই দেখা গেছে, চোর ও চোরা-চালানকারীরা ক্ষুদ্রাকৃতির মূল্যবান বস্তু তাদের শরীরের গোপন অংশে লুকিয়ে রাখে। কখনও বা গলার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় অথবা একেবারে গিলেই ফেলে। এরূপ ক্ষেত্রে রঞ্জেন রশ্মি সেই লুক্কায়িত বস্তুর অস্তিত্বের অব্যর্থ সন্ধান দিতে পারে। এই অদৃশ্য চোখকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। এছাড়া রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তালাবদ্ধ কাঠ বা চামড়ার বাক্স না খুলেও তাতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু লুকোনো আছে কিনা, তা সহজেই ধরা যেতে পারে। এই কারণে শুল্ক বিভাগের কাজেও রঞ্জেন রশ্মি খুবই সহায়ক।

খেলার ঘুঁটির মধ্যে সোনা লুকোনো থাকলে রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে তা ধরা সম্ভব। কোন

পয়সা মেকি, না আসল তা অনায়াসেই বোঝা যায় রঞ্জেন রশ্মির পরীক্ষায়, বিশেষ করে মেকি পয়সায় যদি সীসা থাকে।

মৃদু রঞ্জেন রশ্মিও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নামকরা চিত্রকলা জাল, না আসল—তা ধরা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। প্রাচীন চিত্রকলার ধাতব অংশ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রকলার ধাতব অংশের মধ্যে পার্থক্য থাকায় সহজেই তা রঞ্জেন রশ্মিতে ধরা পড়ে।

দামী বা কম দামী পাথর, আসল ও নকল হীরা চেনা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। ঝিনুকের বুকে মুক্তার অস্তিত্বও আবিষ্কার করা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে।

নকল ও আসল চামড়ার তারতম্যও বোঝা যায় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে অতি সহজেই। ফলে কতকগুলি ক্ষেত্রে তদন্তের কাজে সূত্র অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হয়।

অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, নিখোঁজ, বা গুপ্তচরসংক্রান্ত কাজ বা অন্য ব্যাপারে ধরাপড়া পদাতিক, নৌ বা বিমান বাহিনীর লোকের সঠিক পরিচয় উদ্ধারের জন্যে তাদের নাম, পরিচয়জ্ঞাপক ক্রমিক নম্বর এবং অন্যান্য বিবরণ সংগ্রহ করবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাদের পরিধেয় বস্ত্রের গোপন ও অপ্রকাশ্য অংশে, যেমন—কলারের ভাঁজের তলায় বা প্যান্টের পকেটের ভিতরে ছাপানো থাকে এই সব বিবরণ। প্রায়ই পোষাকের গায়ে ছাপানো এই সব বিবরণ অনেক দিন একটানা ব্যবহারে অথবা ধোলাইয়ের দরুণ ধেবড়ে অথবা ঝাপ্সা ও অস্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে। ছাপার রঙে যদি সীসা বা অন্য ভারী ধাতু থাকে, তবে রঞ্জেন রশ্মি এই কাজে খুবই সাহায্য করতে পারে।

খাঁটি দলিল ও জাল দলিল প্রভৃতির পার্থক্য বিচারেও রঞ্জেন রশ্মি প্রভূত সাহায্য করতে পারে। কালি কতটা শুষে গেছে কাগজে অথবা কাগজের গঠন কি রকম—তাই দিয়ে রঞ্জেন রশ্মি নির্ণয় করে দলিল আসল, কি জাল। জাল ও আসল টাকার নোটের পার্থক্য বিচারেও মৃদু রঞ্জেন রশ্মি নোটের জলছাপ, নিরাপত্তা সূত্র ও কাগজের গঠন পরীক্ষা করতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ব্যবহার

বস্তুর স্বকীয়তা ও পরিচয় নির্ণয়, তথা সনাক্তকরণেও রঞ্জেন রশ্মি অনেক সাহায্য করতে পারে। যে বস্তুকে রঞ্জেন রশ্মিতে বিশ্লেষণ করতে হবে, তার খানিক সূক্ষ্ম চূর্ণের নমুনা একটা সরু পরীক্ষা-নলে নেওয়া হয়। পরে একটি মাত্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঞ্জেন রশ্মি সেই নলের উপর প্রক্ষেপ করা হয়। রঞ্জেন রশ্মি এই নলের বস্তুর উপর কতটা প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হবে, তা নির্ভর করছে বস্তুটির আসল স্বরূপের উপর; অর্থাৎ বস্তুটি কি জিনিষ, তার উপর। কারণ দেখা গেছে, প্রতিটি বস্তুরই বিকিরণ-ধর্ম অন্যের চেয়ে আলাদা—এক বস্তুর বিকিরণের ধরণের সঙ্গে কখনই অন্যের মিল হবে না। এবারে তুলনাধীন বিভিন্ন বস্তুর বিকিরণের নমুনার চিত্র তুলে রাখা হয়। এর ফলে যদি দেখা যায় দুটি বস্তুর চিত্রে বিকিরণের ছবি অবিকল এক রকম উঠেছে, তবে নিঃসন্দেহে উভয় বস্তু এক ও অভিন্ন। এদের সঙ্গে অন্য কোন বস্তুরই বিকিরণের ছবি মিলবে না। এর দ্বারাই রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে দুটি বস্তু এক না আলাদা এবং কোন বস্তুর আসল পরিচয় নির্ণয় করা যায়।

রঞ্জেন রশ্মি কোন রাসায়নিক মিশ্রণের ভিতর থেকেও মিশ্রিত বস্তুগুলিকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দিতে পারে। রঞ্জেন রশ্মির বিচ্ছুরণ ছবিতে দেখা যায় কতকগুলি বাঁকা বাঁকা রেখা। প্রতিটি বাঁকা রেখাই সাধারণতঃ কোন যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব বোঝায়। অবশ্য অনেকগুলি বাঁকা রেখা একই বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন পরীক্ষাধীন রঙের মধ্যে পরীক্ষার ফলে হয়তো পাওয়া গেল বেরিয়াম উপাদান। এক্স-রে ক্যামেরার সাহায্যে প্রমাণিত হবে, এই বেরিয়াম কি আকারে রয়েছে—কার্বোনেট না সালফেটরূপে।

দুটি জিনিষের নমুনার তুলনামূলক পরীক্ষার জন্যে ফটোর বিচ্ছুরণ-ছবি, তথা নক্সা দুটিকে পাশাপাশি রাখা হয়। যদি আরও বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়, তবে বাঁকগুলির মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব ও তাদের ঘনত্ব বিচারের দ্বারাও পদার্থটিতে বিদ্যমান অন্য বস্তু সম্পর্কে তাদের আপেক্ষিক পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

সুবিধা

এই পদ্ধতিতে বস্তুর বিচারে অনেক সুবিধা থাকায় গত কয়েক বছর যাবৎ অপরাধ তদন্ত ও আদালত সংক্রান্ত গবেষণাগারে এর বহুল প্রচলন হয়েছে। অন্যান্য সুবিধার মধ্যে এতে থাকে পরীক্ষার জন্যে অতি সামান্য পরিমাণ (মাত্র কয়েক মিলিগ্রাম) নমুনা। অথচ পরীক্ষার ফল স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায় ফটোগ্রাফির ফিল্মে। তাছাড়া দামী পাথর, মণিমুক্তা পরীক্ষায়ও রঞ্জেন রশ্মির ফলাফল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মের বস্তুর নমুনা, যেমন—কাদামাটি, সূক্ষ্ম চূর্ণ, শুক্‌নো ও ভিজে রং, মাদক দ্রব্য, রবার, কাচ, কাপাস তুলা, রেয়ন ও পশমের আঁশ পরীক্ষা করে তাদের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত নির্ভরযোগ্য উপায়ে অভ্রান্ত রায় দেওয়া সম্ভব।

এই পদ্ধতিতে মাটির তৈরি জিনিষেরও সুষ্ঠুভাবে তুলনামূলক পরীক্ষা করা যায়। সিমেন্টের গুণাগুণ এবং রাসায়নিক উপাদানও বিশ্লেষণ করা চলে। তাছাড়া এতে বাড়্‌তি সুবিধা এই যে, পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত নমুনায় যদি কোন বাজে বা দূষিত জিনিষও থাকে, তাতেও পরীক্ষণে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না বা বিশ্লেষণের পর নমুনাটি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে না।

বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে রঞ্জেন রশ্মির সর্বাধুনিক প্রয়োগ হচ্ছে স্পেক্‌ট্রোস্কোপি বা বর্ণালীবীক্ষণে একে কাজে লাগানো। রাসায়নিক বিশ্লেষণের অনেক বাস্তব উপায়ের চেয়ে এটা কম কার্যকরী নয়। এই পদ্ধতির দ্রুত ও বহুল প্রসার ঘটবার ফলে এটা প্রায় বর্ণালীচিত্র বিশ্লেষণ ও অবলোহিত রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণের সমপর্যায়ে উঠেছে।

যে হারে যান্ত্রিক ও কলা-কৌশলগত উন্নতি হয়ে চলছে, তাতে রঞ্জেন রশ্মি বর্ণালীবীক্ষণ যে বস্তু বা বস্তুর অবলেপ বিশ্লেষণে এক মূল্যবান হাতিয়ারে পরিণত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। রঞ্জেন রশ্মি মারফৎ অনুবিশ্লেষণ ও ইলেকট্রন অনুসন্ধান সম্প্রতি সারা বিশ্বের অপরাধ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ক্যামেরার বদলে অতি সচেতন কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরণ রেখার বাঁকের (Diffraction curve) তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টায় সময়ের অনেক সাশ্রয় হবে। এই উপায়ে মুহূর্তের মধ্যে কোন বস্তু বিশ্লেষণ করে ফেলা যায়।

তাই বিশেষ করে অপরাধ তদন্তে তথা গোয়েন্দার কাজের সহায়করূপে রঞ্জেন রশ্মির উপযোগিতা দিনের পর দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

প্রাণের ক্রিয়াকলাপ

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রাণ কি শুধু শক্তিমাত্র ?

শক্তি বলিতে কাজ করিবার সামর্থ্য বুঝায়। অনেকের মতে, প্রাণ হইল শক্তি প্রয়োগের এক প্রকার প্রণালী বা ব্যাপারবিশেষ। সুইচ্ টিপিলে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া পাখা চালায়, ঘূর্ণায়মান পাখা হাওয়া ঠেলিয়া দিয়া কাজ করে—তাই বলিয়া পাখার প্রাণ আছে বলা চলে না। মোটরের ইঞ্জিনে পেট্রোল পোড়াইলে গাড়ী চলিয়া লোকজন ও মালপত্র বহনের কাজ করে বলিয়া ইঞ্জিনে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে মনে করা হাস্যকর। রেডিওর চাবি ঘুরাইয়া দিলে বিভিন্ন ভাষাভাষী কত মানুষের কত কথা, কত গান এবং কত পাখীর কুজন ও জন্তু-জানোয়ারের গর্জন শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া তড়িৎ-শক্তি চালিত রেডিওকে প্রাণবন্ত ভাবিলে কেমন হয় ? কম্পিউটর ইলেক্ট্রনিক কৌশলে অতি দ্রুত গতিতে অঙ্কের জটিল সমস্যা সমাধান করিয়া দেয় বলিয়া উহাকে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীব বলা যাইবে কি ? সুতরাং প্রাণ শক্তি প্রয়োগের একপ্রকার প্রণালী বা ব্যাপারবিশেষ বলিলে প্রাণ কি তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না।

তাই বলিয়া প্রাণ ও শক্তির মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, তাহা বলা চলে না বরং শক্তি ও প্রাণের মধ্যে নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন যে, ছোট ছোট ইট দিয়া যেমন পাকা বাড়ীর কাঠামো গঠিত হয়, অনেকটা সেই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সাহায্যে জীবন্ত প্রাণীদেহ বা উদ্ভিদদেহ নির্মিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রত্যেকটি কোষের ভিতর প্রাণের ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে বলিয়া জীবদেহে প্রাণের সঞ্চার সম্ভব হয়। এই সকল কোষ যে উপাদানে গঠিত, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm)। গ্রীক ভাষার প্রোটো অর্থে আদি ও প্লাজম অর্থে রূপ—এই দুইটি শব্দ হইতে প্রোটোপ্লাজম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রোটোপ্লাজম বলিতে প্রাণের আদি রূপের আভাস মিলে অথচ প্রোটোপ্লাজম বলিলে কোন বস্তু বা অনেক বস্তু এবং বহু ঘটনা, যাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় নাই—এই সমস্ত বিষয়কে বুঝিবার এক অসম্পূর্ণ চেষ্টা মাত্র অথবা অজ্ঞতার বদলে এক পরিপাটি ভাবারূপ বুঝায় মাত্র। জীবন্ত পদার্থ ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না বলিয়া প্রোটোপ্লাজম জৈব পদার্থবিশেষ। জৈব পদার্থ মাত্রেই কার্বন নামক মৌলিক পদার্থ বর্তমান এবং কার্বনঘটিত জৈব পদার্থ বৃহৎ কলেবরের অণুর সমাহারে রচিত। এই সকল বৃহৎ কলেবর কার্বন-ঘটিত অণু সাধারণতঃ অজৈব বা জড় পদার্থ, যেমন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে রচিত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে কার্বন মৌল আহরণ করিতে ও আহৃত কার্বন মৌলকে জৈব পদার্থের রূপদান করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। অতএব প্রাণ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক কত নিবিড়, তাহা বুঝিতে আর অসুবিধা হয় না। কিন্তু শক্তি মাত্রেই প্রাণ তাহা যেমন ঠিক নহে, আবার শক্তি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব, ইহাও ভাবা যায় না। প্রাণ বলিতে শক্তি এবং ততোধিক কিছু একটা ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইবার ফলে প্রাণের রহস্য বহুলাংশে ঢাকা পড়িয়া আছে।

প্রাণের আধার—কোষ

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দুইটি স্বতন্ত্র মৌল ও গ্যাস। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বর্তমান বলিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বস্তু দুইটি ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ হইতে তরল পদার্থ জলের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রকৃতিতে এমন ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে সচরাচর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না, অথচ সেই পরমাণুগুলির মধ্যে বলপ্রয়োগে আকর্ষণ ঘটাইলে হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণু অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সহিত মিলিয়া জোটবদ্ধ হয় এবং নিজ নিজ গ্যাসীয় সত্তা হারাইয়া জলের একটি অণুতে পরিণত হয়। জলের অণুর গঠন অত্যন্ত সরল এবং ইহাতে মাত্র তিনটি পরমাণু বর্তমান। কিন্তু যে সকল জৈব পদার্থের সাহায্যে প্রোটো-প্লাজম গঠিত, তাহারা একাধিক হইতে শত সহস্রাধিক পরমাণুর সাহায্যে গঠিত হয়। এইরূপ বৃহৎদাকৃতির জৈব অণুর ধর্ম যে কত স্বতন্ত্র ও বিচিত্র হইতে পারে, জলের অণুর গঠন হইতে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ ক্ষুদ্রকায় একটিমাত্র কোষের সাহায্যে একটি জীবদেহ রচিত হয়; যেমন—অ্যামিবা নামক আদি জীব। তবে অধিকাংশ জীবই বহুসংখ্যক কোষের সাহায্যে নির্মিত; যেমন—প্রাপ্তবয়স্ক কোন মানুষের দেহে 60,000,000,000,000, বা ষাট শত সহস্র কোটি কোষ বর্তমান থাকিতে পারে। কোষ যে কত ক্ষুদ্র, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যায়। ইহাদের এক-একটির পরিমাপ 0·5 হইতে 5 মাইক্রন পর্যন্ত—এক মাইক্রন হইল 0·001 মিলিমিটার। এক মাইক্রন পরিমিত কোন কোষের এক লক্ষটি পর পর সাজাইতে পারিলে উহারা মাত্র এক মিটার স্থান জুড়িয়া থাকিবে। মানুষের দেহকোষের পরিমাপও এইরূপ 0·5 হইতে 5 মাইক্রনের মধ্যে হইয়া থাকে। কোষ কোনটি গোলাকার ও কোনটি আয়তাকার ইত্যাদি হইতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত কোষ অত্যন্ত দীর্ঘাকার ও সূক্ষ্ম; উহারা টেলিগ্রাফের তারের মত কাজ করিয়া থাকে। আবার কোন কোন কোষের কোনরূপ নির্দিষ্ট আকার থাকে না, যেমন—অ্যামিবার কোষের আকার সর্বদা পরিবর্তনশীল।

ব্যাক্টিরিয়া ও উদ্ভিদদেহের অন্তর্গত কোষের বহির্দেশের চতুর্দিক ঘিরিয়া একটি দৃঢ় ও কঠিন প্রাচীর বা আবরণ থাকে। অন্যান্য শ্রেণীর কোষের চতুর্দিকে তেমন প্রাচীর বা আবরণ না থাকিলেও একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লীর আবরণ বর্তমান। উদ্ভিদ ও ব্যাক্টিরিয়ার কোষ-প্রাচীরের ঠিক ভিতরের দিকে এইরূপ সূক্ষ্ম ঝিল্লী থাকে।

কোষের প্রায় সমূহ বস্তু উহার কেন্দ্রস্থলে ঘনভাবে জড় হইয়া থাকে। ইহারা নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রীন নামে পরিচিত। যেমন স্পর্শমণির সংস্পর্শে যাহা কিছু আসে, তাহা স্বর্ণে পরিণত হয় বলিয়া কথিত, তেমনি নিউ-ক্লিয়াসের অন্তর্গত কয়েকটি উপকরণের আশ্রয়ে প্রাণের যাদুপ্রভাব নিহিত এবং উহাদের সংস্পর্শ ও আচরণে প্রাণের ক্রিয়াকলাপ চালনা সম্ভব হয়।

কোষের অভ্যন্তর ভাগে কত বিচিত্র ধরণের সূক্ষ্ম সাজসজ্জা আছে তাহা ভাবা শক্ত। প্রকৃত পক্ষে জীবদেহ যে নিউক্লিয়াসসমন্বিত কোষের মিলনের ফলে নির্মিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পক্ষে ধারণা করা এক কঠিন ব্যাপার।

কোষের মূল উপকরণ

অধিকাংশ কোষের শতকরা 75 ভাগ জলে

পূর্ণ এবং জলই জীবদেহের প্রধান উপকরণ, যাহা ছাড়া প্রাণ সম্ভব হয় না। অবশিষ্ট স্থান প্রধানতঃ প্রোটিন, ডিঅক্সি-রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে D.N.A.), রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে RNA), লিপিড এবং কার্বো-হাইড্রেট নামক জৈব পদার্থে পূর্ণ থাকে। ইহারা বৃহৎ আকৃতির বিশেষ বিশেষ জৈব পদার্থের অণু এবং এই সকল উপকরণের সমবায়ে কোষের নানা ধরণের সাজসজ্জা ও কাঠামো গঠিত হইয়া থাকে।

প্রোটিন অতিকায় বৃহৎ বৃহৎ অণুর সাহায্যে রচিত। ইহার এক-একটি অণুতে ন্যূনাধিক 5000 পরমাণু বর্তমান থাকিতে পারে। মূলতঃ নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন সালফার, ফস্ফরাস ইত্যাদি মৌলের পরমাণু প্রোটিনের অণুতে থাকিতে পারে। জলের পরই প্রোটিনের অণু কোষের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকে। অ্যামিনো অ্যাসিড নামক কতক-গুলি জৈব অ্যাসিড আছে, যাহাদের সম্মিলনে প্রোটিন অণু রচিত হয়। প্রায় 400 অ্যামিনো অ্যাসিড শৃঙ্খলের মত পরস্পর সংলগ্ন হইয়া জট পাকাইয়া গোলাকার, চ্যাপ্টা চাকৃতি অথবা দীর্ঘাকার প্রোটিন অণুর রূপ ধারণ করে। কোষের মধ্যে একপ্রকার স্বতন্ত্র প্রোটিন বর্তমান। এইগুলিকে বলা হয় জৈব অনুঘটক বা এনজাইম (Enzyme), যাহার সংস্পর্শে প্রাণের প্রভাবে পদার্থের যাবতীয় রূপান্তরণ-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়।

DNA কোষের মধ্যে বর্তমান অণুগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম এবং উহাদের এক-একটি অণুতে দশ লক্ষ পর্যন্ত পরমাণু থাকিতে পারে। ইহারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতির অণু। ইহাদের মধ্যে জীবের বংশধারার স্বাতন্ত্র্য এবং কোষের ভিতরকার ক্রিয়াকলাপে নক্সা ও পরিকল্পনা নিহিত থাকে। নিউক্লিওটাইড নামক একপ্রকার পদার্থের সম্মিলনে DNA অণু রচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে তিন সহ নিউক্লিওটাইড অণু পরস্পর সংলগ্ন হইয়া এক-একটি DNA অণু রচনা করে। মোটের উপর চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং উহারা শৃঙ্খলিত হইয়া যে DNA অণু রচনা করে, তাহা এক-একটি স্বতন্ত্র ধরণের কুণ্ডলী (Helix) পাকাইয়া থাকে। এই চারি প্রকার নিউক্লিওটাইড যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমপর্যায়ে সজ্জিত থাকে, তদনুসারে বংশধারার স্বাতন্ত্র্যমূলক তথ্য সঙ্কেতে নির্দেশিত হয়। এইরূপ সাঙ্কেতিক নির্দেশকে প্রাণের ভাষা (Language of life) বলা হইয়াছে।

রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA অণু দেখিতে DNA অণুর মত। এই সকল অণুও নিউক্লিওটাইড নামক পদার্থের সমবায়ে রচিত। তবে DNA অণুতে বর্তমান নিউক্লিওটাইড হইতে এই সকল নিউক্লিওটাইড কিছু স্বতন্ত্র ও পৃথক। RNA অণু কোষের নানা কাজ করিয়া থাকে এবং DNA অণুতে নিহিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকলাপের নক্সা ও পরিকল্পনানুযায়ী সংবাদ ও নির্দেশ কোষের অবশিষ্ট অংশ, তথা জীবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কোষগুলির কার কি কাজ এবং কিভাবে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার নির্দেশ বহন করিয়া নেয়। স্মরণীয় যে, DNA ও RNA নিউক্লিয়াস হইতে উৎপন্ন হয়।

লিপিড বলিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ (মাখন, চর্বি ইত্যাদি), মোম, কোলেষ্টেরল প্রভৃতি অন্যান্য ষ্টেরলজাতীয় পদার্থ এবং অপরাপর চর্বি-সদৃশ পদার্থকে বুঝায়। কোষের ঝিল্লী নির্মাণে ইহাদের প্রয়োজন হয়। কোষের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ঝিল্লী বর্তমান, সুতরাং লিপিডের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্বোহাইড্রেট শর্করাজাতীয় পদার্থ। সহস্র সহস্র গ্লুকোজ অণু পরস্পর সংলগ্ন হইয়া সম্মিলিত অবস্থায় এক এক ধরণের কার্বোহাইড্রেট

রচনা করে। কোষের প্রাচীর নির্মাণ করিতে একপ্রকার কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজন এবং উহাকে বলা হয় সেলুলোজ। কার্পাস তুলায় সেলুলোজ থাকে। কার্পাস বস্ত্র চিবাইলে মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায় এই জন্য যে উহার অণু বিদীর্ণ হইলে টুক্‌রা টুক্‌রা গ্লুকোজ অণুতে পরিণত হয়। শক্তির মূল উৎস হইল গ্লুকোজ এবং কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে জীবের প্রয়োজনীয় শক্তি ইন্ধনরূপে সঞ্চিত থাকে।

প্রাণের ক্রিয়াকলাপ

আহার—যে কোন প্রকার জীব, তা সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অ্যামিবাই হউক, কি মানুষই হউক, তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে প্রাণের কতকগুলি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ সকল জীবের মধ্যেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আহার এই প্রকার একটি ক্রিয়া। বাহিরের পরিবেশ হইতে সাধারণ অজৈব বা জড় পদার্থ অথবা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আহরণ করা জীবমাত্রের অপরিহার্য কাজ। উহাকে আহারক্রিয়া বলে। আহার না করিলে জীব বাঁচিয়া থাকিতে, বৃদ্ধি পাইতে বা বংশবিস্তার করিতে পারে না। ঝিল্লীর ভিতর দিয়া কোষের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য অনুপ্রবেশ করে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ কখনও কখনও উক্ত খাদ্যদ্রব্য জড়াইয়া ধরিয়া নিজেদের মধ্যে টানিয়া লয়। দ্বিতীয় প্রণালী একটি বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন—অ্যামিবা এইভাবে পরিবেশ হইতে খাদ্য আহরণ করে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকল জীবের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ঝিল্লী পথে আহার্য কোষের মধ্যে আনীত হয়।

পাক-বিপাক—আহৃত খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইলে খণ্ডে খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে পরিণত হয় এবং ঐ সকল পদার্থ হইতে কোষের চাহিদামত উহার নানা ধরণের সাজসজ্জা ও কাঠামোর উপযোগী উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ রকমারী পদার্থ রচিত হইয়া থাকে। এইরূপে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইবার সময়ে উহা হইতে শক্তি মুক্ত হয় এবং উক্ত মুক্ত শক্তির প্রভাবে রকমারী উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ রচিত হয়। খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইলে কিভাবে শক্তি মুক্ত হইয়া থাকে, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নাই। যাই হউক, কোষের অন্তর্দেশে খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ হইবার ফলে যে সকল রূপান্তর সাধিত ও শক্তি নির্গত হয়, সেই সকল ব্যাপারকে বিপাক ক্রিয়া বা বৈজ্ঞানিক ভাষায় মেটাবলিজম (Metabolism) বলা হয়। কোন পদার্থ জীর্ণ বা ধ্বংস হইয়া সরল-প্রকৃতির নূতন পদার্থের উদ্ভব, যাহা বিশ্লেষণ এবং জীর্ণ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থ হইতে জটিল প্রকৃতির নূতন পদার্থের উদ্ভব, যাহা সংশ্লেষণ নামে পরিচিত, ধ্বংসাত্মক ও রচনাত্মক এই উভয়বিধ রূপান্তর সাধন বিপাকক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যাগ বিপাকক্রিয়ার ফলে এমন কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রাণের কার্যের উপযোগী হয় না, বরং সেইগুলি থাকিলে প্রাণের সহায়তা না হইয়া বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, উহাদিগকে বলা হয় বর্জনীয় পদার্থ। এই সকল পদার্থ পরিত্যাগ করা কোষের একটি সাধারণ ধর্ম। যেমনভাবে ঝিল্লীপথে খাদ্যদ্রব্য অনুপ্রবেশ করে, অনুরূপভাবে বর্জনীয় পদার্থ উহার ভিতর দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন কোষের স্থানে স্থানে বর্জনীয় পদার্থ বিশেষভাবে সঞ্চিত হয়। সেই সকল স্থান ভ্যাকুওল (Vacuole) নামে পরিচিত এবং বর্জনীয় পদার্থে ভর্তি হইয়া গেলে কোষ উহাদিগকে যথাসময়ে ঠেলিয়া বাহিরে দূর করিয়া দেয়।

বৃদ্ধি ও পুষ্টি—বিপাকক্রিয়ার পরিণামে রকমারী পদার্থ উৎপন্ন হয়। উহাদের ভিতর হইতে DNA অণুর উপাদান তৈয়ারি হয় এবং উহাদের সকলকে সাজাইয়া কোষের

ভিতর রচনাত্মক অন্যান্য উপাদান বা উপাদানের অংশসমূহ গড়িয়া উঠিতে থাকে। ক্রমে ক্রমে কোষ নিজ চাহিদা অনুযায়ী আপন সাজসজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। উহা আকারে বড় হইতে থাকে এবং ওজনে বাড়িতে থাকে। এইভাবে ক্রমশঃ জীবের বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ হয়।

বংশবিস্তার—বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জীবের মধ্যে আপনার মত আর একটি জীব রচনা করিবার তাগিদ দেখা দেয়। অপর আর একটি কোষের উপযোগী যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইলে উহারা মূল কোষ হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্য উন্মুখ হয় এবং যথাসময়ে অপর একটি পৃথক কোষে পরিণত হয়। ইহাই জীবের সহজ ও সরল বংশবিস্তারের উপায়। ইহা ছাড়া বহু কোষ নানাবিধ জটিল প্রণালীর সাহায্যে নিজের মত ভিন্ন আর একটি কোষ নির্মাণ করিয়া থাকে। বংশবিস্তার বিশেষ এক ধরণের বৃদ্ধি ও পুষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়।

উত্তেজনা—যে পরিবেশে কোষ বিরাজ করে, সেখান হইতে উহা নানারূপ উত্তেজনা পাইতে পারে। আলোক, তাপ, বৈদ্যুতিক আঘাত, কোন রাসায়নিক পদার্থ বা আরও নানারূপে উত্তেজনা আসিতে পারে। উত্তেজনার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বা উহা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কোষ সাড়া দিতে পারে। কোষের আকার বদল বা উহার ভিতর নানাবিধ রাসায়নিক রূপান্তর সাধনের মধ্য দিয়াও সাড়া মিলিয়া থাকে। উত্তেজনায় সাড়া দিবার নাম স্পর্শ-কাতরতা।

আহার, বিপাক, বর্জনীয় পদার্থ পরিত্যাগ, বৃদ্ধি ও পুষ্টি, বংশবিস্তার এবং উত্তেজনা এই ছয়টি সাধারণ কর্ম ভিন্ন কোষের বিশেষ বিশেষ কাজ আছে। স্নায়ু-কোষ (Nerve Cell) জীব-দেহের একস্থান হইতে অন্য স্থানে উত্তেজনা (Impulse) বহন করিয়া লইয়া যায়। পেশীতে অবস্থিত কোষ সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বল ও গতিবিধি উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের সবুজ পাতায় অবস্থিত কোষ সূর্যালোকের তেজ সংগ্রহ করিয়া উহার সাহায্যে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হইতে গ্লুকোজ সংশ্লেষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গত হয়। প্রাণীদেহে রক্তের কোষ (Blood cell) অক্সিজেন গ্যাস এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বহন করিয়া নিয়া যায় এবং দেহের মধ্যে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাহির করিয়া আনে।

প্রাণ ও মন—কোষের অভ্যন্তরে বিপাক ক্রিয়াজনিত রূপান্তরসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা কোষে কিভাবে শক্তি নির্গত হয়, কিভাবে বিভিন্ন কোষনির্গত শক্তির ব্যবহার হয় ইত্যাদি বহু বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বহু বিষয়ে এখনও আরও অনেক কিছু জানিবার আছে। মানুষের মন বলিয়া যে ব্যাপারটি আছে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন বলা যায় না। মন কি কেবলমাত্র মানুষের কোষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না উহা অন্যান্য সকল জীবের কোষের মধ্যেও তৎপর?—সেই প্রশ্নের উত্তর মিলিয়াছে কি না, জানা নাই। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, মানুষ জানিব বলিয়া মনে করিলেই চেষ্টা হয় ও চেষ্টা হইতে পরিণামে জানা যায়। সুতরাং এত কিছু জ্ঞান আহরণের মূলে মনের বলই তৎপর হয় বেশী। মনের সহিত প্রাণের কিরূপ সম্পর্ক কিংবা প্রাণ ও মন স্বতন্ত্র কি না—এই সকল বিষয় রহস্যে ঢাকা পড়িয়া আছে। তাহা ভেদ করিব বলিয়া মানুষ মনে করিলে অবশ্যই একদিন তাহা সম্ভব হইবে।

জ্বালানী ও শক্তি

মনমোহন ঘোষ

সাধারণ অর্থে জ্বালানী বলতে তাকেই বোঝায়, যার প্রজ্বলনে আগুন তথা তাপ সৃষ্টি হয়; যেমন—কাঠ, কয়লা, বিভিন্ন তেল ইত্যাদি। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এগুলি সবই কার্বনবহুল। প্রধানতঃ বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এই কার্বনের দহনের ফলে এদের প্রজ্বলনে তাপের সৃষ্টি হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জ্বালানী পুড়িয়ে আমরা পাচ্ছি তাপ, যা এক প্রকার শক্তি। আমরা জ্বালানী ব্যবহার করি কোন কাজ করবার উদ্দেশ্যে। এই কাজ করবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলে থাকি। তাহলে জ্বালানী থেকে আমরা নিশ্চয়ই শক্তি পেয়ে থাকি। জ্বালানীর ভিতরকার এই শক্তিকে জানতে হলে কার্বনের দহন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা দরকার। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনস্টাইন প্রমাণ করেন, পদার্থমাত্রেই শক্তির একটি ভাণ্ডার এবং এই পদার্থের বিলোপ সাধনে ঐ সুপ্ত শক্তির বিকাশ সম্ভব। এই জ্বালানীর দহন তার এক বড় প্রমাণ। বস্তুতঃ জ্বালানী দহনে উদ্ভূত তাপ—তার দাহ্য পদার্থের রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত শক্তির একটি বিশেষ রূপ। এই শক্তি ক্ষেত্রবিশেষে আলোক শক্তি রূপেও দেখা দেয়। পদার্থ হিসাবে জ্বালানীর বিশেষ গুণ হচ্ছে এই যে, এর ভিতরকার সুপ্ত শক্তিকে আমরা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিতরূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে পারি। শক্তির নিয়ন্ত্রিত উৎসকেই জ্বালানীরূপে ধরলে আমাদের সম্মুখে বহু জিনিষই জ্বালানী বলে মনে হবে। যেমন—খাদ্য, যা খেয়ে আমরা জীবনী শক্তি পাই, তা নিশ্চয়ই আমাদের জীবনী শক্তির জ্বালানী। এরকম সকল জ্বালানীকে একগোত্রে ফেলা সম্ভব নয়। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যাদের জ্বালানী বলে থাকি, প্রথমে তাদের কথায় আসা যাক। এরা প্রধানতঃ তিন প্রকার—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়।

কঠিন জ্বালানী—যেমন কাঠ ও কয়লা আমাদের অতি পরিচিত ও বহুল প্রচলিত জ্বালানী। জ্বালানী হিসাবে অবশ্য কাঠের চেয়ে কয়লার ব্যবহারই উৎকৃষ্ট। কারণ এদের দাহ্য পদার্থ হচ্ছে কার্বন এবং কয়লাতে কাঠের চেয়ে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকায় এর জ্বালানী গুণ কাঠের চেয়ে বেশী। এই কয়লা পাওয়া যায় খনি থেকে। কিন্তু সদ্যঃপ্রাপ্ত খনিজ কয়লাকেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিকর। তাছাড়া এর প্রজ্বলনে এত ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় যে, ঘনবসতি-পূর্ণ নাগরিক জীবন এর ব্যবহারে অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। সদ্যঃপ্রাপ্ত এই খনিজ কয়লাকে কেন্দ্র করে আজ গড়ে উঠেছে এক বিরাট রাসায়নিক শিল্প—যেখানে কয়লাকে বায়ুশূন্য অবস্থায় পাতিত করে এর জ্বালানী-মূল্যের চেয়ে আরও অধিক মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থসমূহ উৎপাদন করা হয়। এই পাতিত কয়লার জ্বালানী গুণ কিন্তু নষ্ট হয় না এবং জ্বালানী হিসাবে এর ব্যবহারে কম ধোঁয়া হয়। কয়লাতে কার্বনের পরিমাণ হিসাবে একে চার ভাগে ভাগ করা হয়—(1) পিট—কার্বন 60%; (2) লিগ্‌নাইট—কার্বন 67%; (3) বিটুমিনাস—কার্বন 88·5%; (4) অ্যানথ্রাসাইট—কার্বন 74%। কার্বনের তারতম্যে এদের জ্বালানী গুণও বিভিন্ন। কয়লার নিজস্ব এই জ্বালানী গুণ ছাড়াও এই

কয়লা থেকেই আমরা আরও নানারকম তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী পেতে পারি। স্টীম ইঞ্জিন চালনায়, বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন চুল্লীতে এবং গৃহস্থালীর কাজে তাপোৎপাদক হিসাবে কয়লা আজও অপরিহার্য ও উৎকৃষ্ট।

তরল জ্বালানী—তরল জ্বালানী বলতে আমরা প্রধানতঃ পেট্রোলিয়ামের কথাই আলোচনা করব। কয়লার মত পেট্রোলিয়ামও আমরা খনি থেকে পাই। বহু আগেই যদিও এই পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ছিল, তথাপি 1859 সালে প্রথম পেনসিলভেনিয়াতে কূপ খনন করে পেট্রোলিয়াম তোলা হয়। পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদনে এই পেট্রোলিয়াম গড়ে তুলেছে এক বিরাট শিল্প-রসায়ন। এই খনিজ তেলটি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন যৌগের একটি সংমিশ্রণ মাত্র। এদের মধ্যে প্রধান দাহ্য উপাদান হচ্ছে প্যারাফিন ও গন্ধবহ (Aromatic) হাইড্রোকার্বন যৌগ। কার্বন ও হাইড্রোজেন সংযোগে গঠিত এই হাইড্রোকার্বনগুলির মধ্যেই মূলতঃ পেট্রোলিয়ামের দাহ্যতা প্রচ্ছন্ন। বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট এই হাইড্রোকার্বন যৌগের মিশ্রণ তথা খনিজ পেট্রোলিয়ামকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করলে আমরা বিভিন্ন গুণের অনেক রকম তরল জ্বালানী পেতে পারি। যেমন 70°—100°C-এর মধ্যে পাতিত অংশকে গ্যাসোলিন বা পেট্রল বলা হয়। বিমান চালনায় ও বিভিন্ন মোটর ইঞ্জিনের জ্বালানীরূপে এটি ব্যবহৃত হয়। 150°—300°C-এর মধ্যে পাতিত অংশ হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত জ্বালানী কেরোসিন। 350°C-এর উপরের তাপমাত্রায় পাতিত অংশকে ডিজেল তেল বলা হয়। ডিজেল ইঞ্জিন চালাতেই এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

যে সব দেশে খনিজ পেট্রোলিয়ামের অভাব, সেখানে কয়লার হাইড্রোজেনেশন প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম উপায়ে পেট্রল তৈরি করা হয়। রাসায়নিক বিচারে এই প্রক্রিয়ায় কার্বনের সঙ্গে (কয়লা) প্রায় 400—450°C তাপমাত্রায় 200 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে হাইড্রোজেন মিশিয়ে হাইড্রোকার্বন যৌগ পেট্রল তৈরি হয়। একে বার্জিয়াস (Berzius) পদ্ধতি বলে। অপর একটি প্রক্রিয়া যেখানে কার্বন-মনোক্সাইডের (CO) সঙ্গে 200°C তাপমাত্রায় হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোকার্বন যৌগ পেট্রল তৈরি হয়, তাকে ফিসার-ট্রপাস পদ্ধতি বলে। তরল জ্বালানীতে সাধারণতঃ এর ভিতরকার স্থিতিশক্তি বিভিন্ন যান্ত্রিক কৌশলে বিভিন্ন যানবাহনে গতিশক্তিতে এবং অনেক ক্ষেত্রে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসীয় জ্বালানী—রাশিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ভূগর্ভ থেকে এক রকম গ্যাস নির্গত হতে দেখা যায়। আগুনের সংস্পর্শে এই গ্যাসটি জ্বলে ওঠে। বহুদিন আগে থেকেই গ্যাসটির এই প্রজ্বলন ক্ষমতা ওদেশের মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা গ্যাসটির এই প্রজ্বলন ক্ষমতাকে জানবার জন্যে একে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এর প্রধান দাহ্য উপাদান হচ্ছে হাইড্রোকার্বন যৌগ মিথেন। তাছাড়া এতে রয়েছে আরও অনেক শিল্পজাত রাসায়নিক দ্রব্য। উপযুক্ত পদ্ধতিতে গ্যাসটির দাহ্য উপাদান থেকে অবাঞ্ছিত দ্রব্য আলাদা করে গ্যাসটিকে ঐসব দেশে আলোকদায়ী ও তাপোৎপাদক জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আরও যে সব কৃত্রিম গ্যাসীয় জ্বালানী ব্যবহার করা হয়, সেগুলি প্রধানতঃ দাহ্য গ্যাস—হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, অ্যাসিটিলিন—প্রভৃতির বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণ। কিছু অদাহ্য গ্যাস, যেমন—নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইডও কিছু মাত্রায় মিশ্রিত থাকে। এই গ্যাসীয় জ্বালানীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কোল গ্যাস, ওয়াটার গ্যাস ও প্রডিউসার গ্যাস।

কোল গ্যাস—কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) সময় যে গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, তার দহনক্ষমতা প্রথম আবিষ্কার করেন 1668 সালে জন ক্লেটন নামে ইংল্যাণ্ডের একজন বিজ্ঞানী। বিটুমিনাস কয়লার অন্তর্ধূম পাতনে যে গ্যাসীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাথেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিশ্রুত করে অবাঞ্ছিত দ্রব্য বিতাড়িত করবার পর যে গ্যাস পাওয়া যায়, সেটাই কোল গ্যাস নামে পরিচিত। এর ভিতর দাহ্য গ্যাসগুলি হচ্ছে—হাইড্রোজেন, মিথেন, অ্যাসিটিলিন, ও কার্বন মনোক্সাইড।

ওয়াটার গ্যাস—কয়লাকে প্রায় 1000°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে তার উপর দিয়ে জলীয়-বাষ্প পাঠিয়ে এই গ্যাসটি তৈরি করা হয়। এটি প্রায় সম-আয়তনের কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ।

বিক্রিয়া :—কয়লা—(C)—জলীয় বাষ্প $(H_2O) \rightarrow CO + H_2$.

এছাড়াও এতে রয়েছে 1% মিথেন, 6% নাইট্রোজেন ও 3% কার্বন ডাইঅক্সাইড। উপরের বিক্রিয়াটি তাপহারক, তাই ঐ বিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলবার পর কয়লার তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং তার ফলে কার্বন মনোক্সাইডের সঙ্গে অদাহ্য কার্বন ডাইঅক্সাইডও তৈরি হতে থাকে [$C+2H_2O \rightarrow CO_2+2H_2$]। তাই পুনরায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্যে বিক্রিয়া-কক্ষে জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে কিছুক্ষণ শুষ্ক বায়ু পাঠানো হয়। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির দ্বারাই একটানা ওয়াটার গ্যাস তৈরি হয়।

প্রডিউসার গ্যাস—এই গ্যাসটি অপেক্ষাকৃত কম তাপোৎপাদক। কারণ এর ভিতর বেশীর ভাগই থাকে অদাহ্য গ্যাস নাইট্রোজেন (64%)। এই গ্যাসটি তৈরি করা হয় প্রায় 1000°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কয়লার উপর পরিমিত শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ চালিয়ে।

কয়লা $2(C)$ + বায়ু $(O_2) \rightarrow 2CO$

গ্যাসটির দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড 20%, হাইড্রোজেন 10%, মিথেন 8%, অদাহ্য গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড 4%। উপরিউক্ত গ্যাসগুলি ছাড়াও কিছু কিছু গ্যাসীয় মিশ্রণ, যেমন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন যথাক্রমে অক্সিহাইড্রোজেন ও অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখা নামে অতি উচ্চ তাপোৎপাদক হিসাবে ওয়েল্ডিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

যন্ত্রযুগের মানুষ হয়ে আমরা দৈহিক শক্তি ছেড়ে বিভিন্ন কাজকর্মে আজকাল যন্ত্র-শক্তির উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। হিসাব করে দেখা গেছে, গত দুই শতাব্দীতে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার বেড়ে গেছে দু-হাজার গুণ। শক্তির এই ব্যবহার ও তার সঙ্গে পৃথিবীর লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। কিন্তু এতক্ষণ যন্ত্রশক্তির উৎস হিসাবে যে সব জ্বালানীর কথা আমরা আলোচনা করলাম, সেই সব খনিজ জ্বালানী অদূর ভবিষ্যতে একদিন ভূগর্ভ থেকে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। তাহলে সে দিন বর্তমান যন্ত্রনির্ভরশীল মানুষের অবস্থা কি হবে?

বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সেই বিপদের সমাধানের চেষ্টা সুরু করেছেন এবং সাফল্যলাভের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁরা আজ পৌঁছে গেছেন বৃহৎ শক্তির উৎস পারমাণবিক জ্বালানীর দ্বারে। আরও যে শক্তির ব্যবহার মানুষ জ্বালানীর পরিবর্তে করবার চেষ্টা করেছে ও করবে—সেটি হলো সৌরশক্তি।

পূর্বে আলোচিত জ্বালানীসমূহের যে বিক্রিয়ায় পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেই বিক্রিয়ায় জ্বালানী পদার্থের পরমাণুর বহির্ভাগের ইলেকট্রন-সমূহই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রীন এই বিক্রিয়ায় অবিকৃত থাকে। পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, পর-

মাণুর প্রায় সমগ্র ভরবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটন কণার এক অতি উচ্চ বন্ধন শক্তি বর্তমান। কোন বিক্রিয়ায় যদি এই পরমাণুর কেন্দ্রীনকে অংশগ্রহণ করিয়ে তার ভিতরে বর্তমান ঐ উচ্চশক্তিকে কিছু অংশে বিমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে পৃথিবীর সমগ্র জ্বালানী-সম্পদ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেলেও মানুষের শক্তির অভাব ঘটবে না। তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমূহ থেকে এই শক্তি স্বতঃই নির্গত হচ্ছে, কিন্তু তা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। 1939 সালে অটো হান এবং স্ট্র্যাসম্যান প্রথম পরমাণু-কেন্দ্রীনের এই প্রচণ্ড শক্তির নিয়ন্ত্রিত বিমুক্তি ঘটান। এই প্রক্রিয়াতে আপাতশক্তিহীন ইউরেনিয়াম পরমাণু-কেন্দ্রীনকে বিশেষ কৌশলে নিউট্রনের আঘাতে বিভাজিত করে এক নিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ ঘটানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় এক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তা প্রায় 20 টন গ্যাসোলিনের দহনে উদ্ভূত শক্তির সমান।

বিজ্ঞানীরা সৌরবিকিরণকেও শক্তির উৎসরূপে ব্যবহারের চেষ্টা বহু আগে থেকেই করে আসছেন। কিন্তু সরাসরি এই বিকিরণকে শক্তির উৎসরূপে ব্যবহার করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, পৃথিবীতে যেখান থেকে যতটুকু শক্তিই আমরা পাই না কেন, তা কিন্তু পরোক্ষভাবে ঐ সূর্যেরই অবদান। সরাসরি সৌরবিকিরণকে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে 1932 সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি সৌরচুল্লী নির্মিত হয়। এই চুল্লীতে বক্রতল আয়না ব্যবহার করে সৌরতাপ কেন্দ্রীভূত করে 3500°C পর্যন্ত তাপমাত্রা পাওয়া গেছে। বহু দেশে আজ-কাল রান্নার কাজে সৌর কুকারেরও ব্যবহার সুরু হয়েছে। আমেরিকায় ঘর গরম করবার জন্যে সৌর-বিকিরণকে সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য

শ্রীমুকুট ঘোষাল

দিগন্তপ্রসারী সাগরজলের মাঝে জেগে থাকা প্রবাল দ্বীপ তার রহস্যময় সৌন্দর্যে যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র তাঁর সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়ে থাকেন নি, তাঁরা প্রবাল দ্বীপকে বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, চেষ্টা করেছেন তার জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যার। উনবিংশ শতকের মাঝা-মাঝি থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা প্রান্তে অসংখ্য ভূতত্ত্ববিদ্ আর সমুদ্র-বিজ্ঞানী প্রবাল দ্বীপকে আরও ভালভাবে জানবার এবং তার জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। এই যুগের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আর প্রযুক্তিবিদ্যা সেই গবেষণার পথ অনেক প্রশস্ত করেছে। কিন্তু প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য আজও প্রশ্নাতীত ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

প্রবাল দ্বীপের বৈশিষ্ট্য

অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী প্রবাল কীট তাদের দেহপঞ্জর দিয়ে গড়ে তোলে প্রবাল দ্বীপ। অগণিত মৃত আর জীবিত প্রবালের দেহাবশেষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে স্তরীভূত হতে থাকে সাগরতলে। তাদের এই সাধনা পূর্ণতা পায় প্রবাল দ্বীপের

জন্মে। ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, প্রবালের সঙ্গে ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদি শক্ত আবরণযুক্ত নানা ধরণের সামুদ্রিক প্রাণী একত্রে স্তরীভূত হয়। সেই কারণে প্রবাল দ্বীপকে জৈবিক স্তূপ (Organic mound) বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রবাল দ্বীপ সাধারণতঃ উষ্ণমণ্ডলে 25° উঃ এবং 25° দঃ অক্ষাংশের মধ্যে অগভীর সমুদ্রে দেখা যায়। তার কারণ, একমাত্র এই অঞ্চলের সাগরই প্রবালের জীবনধারণ ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল।

প্রবাল দ্বীপসমূহকে তাদের গঠন-বৈচিত্র্য অনুযায়ী মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন—

1. প্রবাল-বেলা—এগুলি সরাসরি পাথুরে তটভূমির গায়ে গড়ে ওঠে ও তটভূমির অনুরূপে বৃদ্ধি পায় (1নং ক চিত্র)।
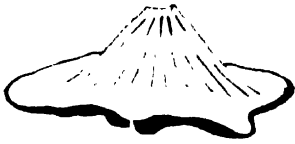
1নং ক চিত্র—প্রবাল-বেলা

2. প্রবাল-প্রাচীর—এই প্রাচীর তটভূমি থেকে দূরে সৃষ্টি হয় এবং তটভূমি থেকে একটি গভীর লেগুনের (সমুদ্রজাত অগভীর উপহ্রদ) দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে (1নং খ চিত্র)।
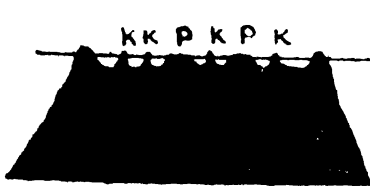
3. প্রবাল-বলয়—এই ধরণের প্রবাল দ্বীপ একটি লেগুনকে কেন্দ্র করে বলয়াকারে গড়ে ওঠে (1নং গ চিত্র)।

1নং খ চিত্র—প্রবাল-প্রাচীর

1নং গ চিত্র—প্রবাল-বলয়

4. ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপ—এগুলি সাধারণতঃ কোন বড় লেগুনের ভিতরে উৎপন্ন হয়। এগুলি দুই রকমের হয়ে থাকে; যেমন—দণ্ডাকার বা Pinnacles বা Knolls এবং ক্ষুদ্র প্রবাল বসতি বা প্যাচ রিফ (Patch reef) (1নং ঘ চিত্র)।

5. টেবিলসদৃশ প্রবাল দ্বীপ—(Table reef)—এই বৃহৎ প্রবাল দ্বীপগুলির কোন লেগুন থাকে না (1নং ঙ চিত্র)

1নং ঘ চিত্র
K—দণ্ডাকার, P—প্যাচ রিফ
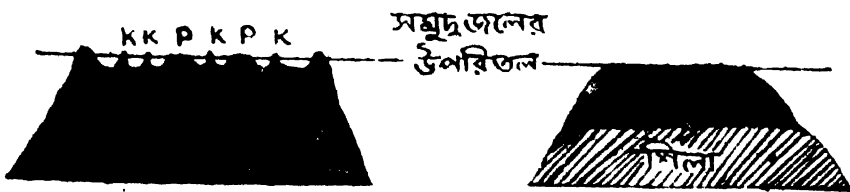
1নং ঙ চিত্র
টেবিল রিফ

6. ফারোস (Faros)—এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাল-বলয় ও দ্বীপের সমষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে

1নং চ চিত্র—ফারোস

কোন বড় প্রবাল-বলয় বা প্রাচীরের অংশ (1নং চ চিত্র)।

প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য

গত দেড় শত বছর ধরে বিজ্ঞানীরা প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্যের একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেবার জন্যে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু তাঁদের সেই অক্লান্ত সাধনা আজও পূর্ণতা লাভ করে নি। নানা রকম মতবাদ গড়ে উঠেছে দিনে দিনে, আবার বদ্‌লে গেছে—বাতিল হয়েছে সেই সব বেলা সৃষ্টি করে (2নং ক চিত্র)। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ দ্বীপের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল-বসতি ক্রমশঃ গভীর জলে নেমে যায়। কিন্তু প্রবাল মতবাদ। এই সব মতবাদকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। একদল বিজ্ঞানীর মতে, প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির পিছনে প্রভাব বিস্তার করেছিল সমুদ্রজলের উপরিতলের পরিবর্তন। আর একদল কিন্তু এই মতবাদে বিশ্বাসী নন।

বিভিন্ন যুগে যে সব মতবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে তিনটি মতবাদকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী সমর্থন করেন। ঐ মতবাদগুলির সারাংশ নীচে দেওয়া হলো—

(ক) ভূপৃষ্ঠের অধোগমন মতবাদ—1837 সালে বিখ্যাত মনীষী চার্লস ডারউইন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথম প্রবাল দ্বীপের জন্ম রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ভূপৃষ্ঠের অধোগমনই প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির কারণ। তিনি বলেন, প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাল কীট কোন পাথুরে দ্বীপের গায়ে বাসা বাঁধে এবং প্রবাল-

2নং ক চিত্র—প্রাথমিক পর্যায়

কীট গভীর জলে বাঁচতে পারে না। তাই অগভীর জলের পরিবেশ রক্ষা করবার জন্যে তারা ক্রমাগত উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর

2নং খ চিত্র—দ্বিতীয় পর্যায়

ফলে প্রবাল-প্রাচীর গড়ে ওঠে (2নং খ চিত্র)। শেষ পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠের ক্রমাগত অধোগমনের ফলে পাথুরে দ্বীপটি সম্পূর্ণ ডুবে যায়, কিন্তু তার চার-

2নং গ চিত্র—শেষ পর্যায়

ধারের প্রবাল-প্রাচীর সমুদ্রজলের উপরিতলের উপর প্রবাল-বলয়রূপে জেগে থাকে (2নং গ চিত্র)।

ডারউইনের এই ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল ও যুক্তিপূর্ণ হলেও প্রশ্নাতীত নয়। বিজ্ঞানীরা এর বিরুদ্ধে নানা রকম প্রশ্ন তুলেছেন। ডারউইনের মতবাদে প্রবাল-বেলা, প্রাচীর ও বলয়কে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির তিনটি পর্যায় বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক

ক্ষেত্রেই এই তিনটি পর্যায়ের সহাবস্থান দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রবাল কীট গভীর জলেও বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের অধোগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাল-বসতি উপর দিকে বৃদ্ধি না পেতেও পারে। আবার বহু প্রবাল-বলয় কোন পাথুরে দ্বীপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি। সুতরাং ডারউইনের মতবাদ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়।

বর্তমান যুগের অনেক বিজ্ঞানী অবশ্য এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অনেকেই এই মতবাদকে আংশিক পরিবর্তন করে মেনে নিয়েছেন।

(খ) নিমজ্জিত উচ্চভূমি মতবাদ—1880 সালে জে. জে. মারে একটি নূতন মতবাদের প্রচলন করেন। তিনি ভূপৃষ্ঠের অধোগমনকে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গরূপে মেনে নেন নি। তাঁর মতে, সাগরতলের কোন নিমজ্জিত উচ্চভূমির উপর প্রবাল কীট তাদের বসতি স্থাপন করে এবং উপর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তারা প্রবাল দ্বীপের জন্ম দেয়। পরে সাগর জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রবাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে লেগুনের সৃষ্টি হয়।

এই ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানীদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তাঁরা বলেছেন, সাগর জলের রাসায়নিক ক্রিয়ায় লেগুন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় এবং লেগুনের তলদেশ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সেখানে ক্ষয়কার্যের বদলে অধঃক্ষেপই (Deposition) প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক যুগে গার্ডিনার এবং অ্যাগাসিজ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা মারের তত্ত্বকে কিছু পরিবর্তন করে কার্যোপযোগী করবার চেষ্টা করেন।

(গ) সমুদ্রজলের উপরিতল পরিবর্তন মতবাদ—1910 সালে আর ও. ড্যালি এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি পৃথিবীর অধিকাংশ লেগুনের গভীরতার একটা সমতা লক্ষ্য করে তাদের জন্মকে পৃথিবীব্যাপী সংঘটিত কোন ঘটনার ফল বলে ধরে নেন। তাঁর মতে, এই ঘটনা ছিল প্লিস্টোসিন (Pliestocene) হিমযুগের সমুদ্রজলের উপরিতল পরিবর্তন। এই হিমযুগের আগমনে সাগরজলের একটা বড় অংশ জমে গিয়ে বরফে পরিণত হয়, ফলে সমুদ্রজলের উপরিতলের পতন ঘটে। এই সময় সাগরজলের তাপমাত্রাও অনেক কমে যায়। এই পরিবেশে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তটভূমিসংলগ্ন প্রবাল-বসতি বিনষ্ট হয়ে যায় ও তটভূমিগুলি সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাতের সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সামুদ্রিক ঢেউয়ের আঘাত

3নং ক চিত্র

হিমযুগের পূর্বে হিমযুগে

এই সব তট ভূমি ও তৎসংলগ্ন প্রবাল-বসতি ক্ষয়-প্রাপ্ত চাতালের (Truncated bench) রূপ নেয় (3নং ক চিত্র)। হিমযুগের অবসানে সাগর জলের তাপমাত্রা এবং সমুদ্রজলের উপরিতল বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন যে সব প্রবাল কীট জীবিত ছিল, তারা সেই ক্ষয়প্রাপ্ত চাতালের বাইরের সকলেই ঢেউয়ের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট চাতালের অংশ নয়।

সুতরাং বিভিন্ন মতবাদ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, এদের কোনটিই সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নয়। 1923 সালে ডাব্লিউ. এম. ডেভিস প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন
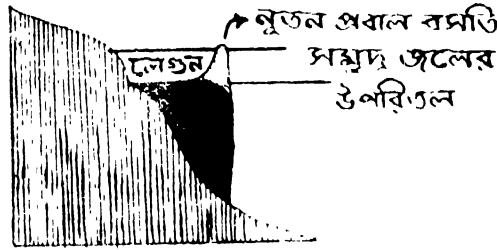
3নং খ চিত্র—হিমযুগের শেষে

কানায় নূতন বসতি স্থাপন করে ও সমুদ্রজলের উপরিতল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে বাড়তে থাকে। এভাবে এক নূতন প্রবাল-প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। পুরনো তটভূমি ও নূতন প্রবাল-প্রাচীরের মাঝের ক্ষয়প্রাপ্ত চাতালের অংশ লেগুনের রূপ নেয় (3নং খ চিত্র)।

এই মতবাদটি বহুলাংশে যুক্তিপূর্ণ হলেও প্রশ্নাতীত নয়। এর বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সব লেগুনের গভীরতা সমান নয়। সুতরাং তাদের সবাইকে একই সমুদ্রজলের উপরিতলের পতনের ফলে সৃষ্ট বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ হিমযুগের শীতল সাগরজলে প্রবাল কীটের মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন লেগুনের তলদেশ পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, তারা মতবাদ আলোচনা করে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'The Coral Reef Problem' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে ডারউইনের মতবাদকে কিছুটা পরিমার্জিত আকারে গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য অন্যান্য কয়েকটি মতবাদের অংশবিশেষও কাজে লাগান। তাঁর এই বিশ্লেষণ এক নূতন মতবাদের সৃষ্টি করে। এই মতবাদকে বিমিশ্র মতবাদ বলা যেতে পারে। তবুও অতি সাম্প্রতিক কালে ডেভিসের মতবাদ সর্বজনস্বীকৃত হতে পারে নি। তাঁর ব্যাখ্যার ত্রুটিও বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ছে। সুতরাং প্রবাল দ্বীপের জন্ম-রহস্য আজও সম্পূর্ণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। আশা করা যায়, অদূরভবিষ্যতে এই তর্কের সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব হবে।

সঞ্চয়ন

মানুষের তৈরি হৃৎপিণ্ড কার্যকরী হতে বিলম্ব নেই

ওয়াশিংটন শহরের 20 মাইল উত্তরে একটি পশুপালন প্রতিষ্ঠানে সাদা ও কালোয় মিশ্রিত রঙের একটি বাছুর স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তৃপ্তির সঙ্গে ঘাস খাচ্ছে।

সাধারণ দর্শকের পক্ষে আন্দাজ করা সম্ভব নয় যে, প্রাণীটিকে একটি যন্ত্রের সাহায্যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। যন্ত্রটি এর দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডকে চালু রেখে রক্ত চলাচলে সাহায্য করছে। গবেষকেরা যন্ত্রটির নাম দিয়েছেন কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড-সহায়ক ব্যবস্থা। যন্ত্রটি প্রাণীর পেটে ও বুকের মধ্যে বসানো থাকে। এই যন্ত্রটি মানুষের তৈরি সম্পূর্ণ একটি হৃৎপিণ্ডের পূর্বাভাস।

যন্ত্রটির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে এই বাছুটির মত কয়েকটি প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, অসুস্থ হৃৎপিণ্ডের বদলে এই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দেওয়া, যাতে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার 1964 সালে প্রকল্পটি চালু করেছিলেন। বিরাট যে সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রকল্প রয়েছে, সেগুলির তুলনায় এই কার্যসূচী সামান্য মাত্র, কিন্তু এর ফল ব্যাপক হতে পারে।

কার্যসূচীর অস্থায়ী প্রধান ডক্টর লাওয়েল টি. হারমিসন 18জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক 90 লক্ষ ডলার ব্যয়ে এর কাজ চালান। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লেবরেটরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত গবেষণার কাজেই বেশীর ভাগ অর্থ ব্যয়িত হয়। এই রকম 60টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমানে 80টি গবেষণার চুক্তি চালু আছে।

প্রকৃত হৃৎপিণ্ডের মতই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড মূলতঃ একটি পাম্প বিশেষ। কিন্তু এর নির্মাণ তত সহজ নয়। দেহে ঠিক মত বসে যাবার জন্যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডটিকে ছোট করা দরকার। এমনভাবে এটি তৈরি করতে হবে, যাতে এথেকে মানুষের দেহের কোন ক্ষতি না হয়। এর মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্ভরযোগ্য হওয়া চাই, কারণ সেগুলির উপর মানুষের জীবন নির্ভর করছে।

পাম্পটির যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেহের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হবে পাম্পটিকে।

শীঘ্রই এরূপ একটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক মডেল প্রাণীর দেহে পরীক্ষা করা হবে বলে আশা করা যায়।

অনবরত তালে তালে সম্প্রসারিত হবার মত উপাদানের অভাবই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড নির্মাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। আবার রক্ত-প্রবাহ প্রবাহ জমাট না বেঁধে অব্যাহত থাকবে অথচ কোষ প্রভৃতির কোন ক্ষতি হবে না, এরকম সম্পূর্ণ উপযোগী উপাদানও পাওয়া যায় না। বর্তমানে কার্যসূচীর অর্থভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হচ্ছে রক্তের অনুকূল উপাদানের সন্ধানেই।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডে রোগীর নিজের দেহের কোষ লাগিয়ে এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে পরীক্ষা করা হচ্ছে। জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রোগীর পায়ের অভ্যন্তরস্থ রক্তনালিকা থেকে কোষ চেঁচে নিয়ে যদি কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডে

লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেখানে কোষ বৃদ্ধি পেয়ে নলাকৃতি একটি আস্তরণের সৃষ্টি করে। সেই আস্তরণের ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হবে।

এদিকে ডক্টর হারমিসন ও তাঁর সহকর্মীরা হৃৎপিণ্ডের সহায়ক যন্ত্রপাতি উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম পর্যায়ের এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স ও হাসপাতালে ব্যবহারযোগ্য জরুরী যন্ত্র। এগুলির সাহায্যে চিকিৎসা সুরু হবার সময় পর্যন্ত রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতিগুলি অস্ত্রোপচার বা অসুস্থতার পর হৃৎপিণ্ডকে বিশ্রাম দেবার জন্যে উদ্ভাবিত সাময়িক ব্যবস্থা।

তৃতীয় পর্যায়ের যন্ত্রপাতি দিয়ে স্থায়ী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। অসুখে হৃৎপিণ্ডের ক্ষতি যদি নিরাময়ের যোগ্য না থাকে, তখনই এই সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়।

এই কর্মসূচীর লক্ষ্য হলো, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হৃৎপিণ্ডের বদলে স্থায়ী যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড স্থাপন করা। রোগীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনমাফিক এই যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড তৈরি করা যাবে, আবার বিভিন্ন আকারের কৃত্রিম যন্ত্র তৈরি করে সঞ্চয় করে রাখা যাবে।

কিন্তু তথাপি মানুষের দেহে মানুষের হৃৎপিণ্ড বসাবার ব্যবস্থা একেবারে অচল হবে না। যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড বদল করতে হবে। এই সমস্যার চেয়ে শিশুদের দেহে যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে মানুষের হৃৎপিণ্ড বসানোই শ্রেয়ঃ। কারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকারে বাড়ে।

অসম্ভব মনে হলেও আশা করা যাচ্ছে, আগামী দশ বছরের মধ্যে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড ব্যাপক-ভাবে ব্যবহারের জন্যে নির্মিত হবে। তবে এজন্যে জনসাধারণের সমর্থন প্রয়োজন।

শুক্রগ্রহ

শুক্রগ্রহ সম্পর্কে মিখাইল মারোভ লিখেছেন—শুক্রগ্রহ সূর্য থেকে দ্বিতীয় গ্রহ। পৃথিবী থেকে এর ন্যূনতম দূরত্ব হলো 40 কোটি কিলোমিটার। এই গ্রহটি প্রায় বৃত্তাকারে সূর্য থেকে 1080 লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘোরে। শুক্রগ্রহে এক বছর পৃথিবীতে 224·7 দিনের সমান। এই গ্রহের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ থেকে 620 কিলোমিটার কম। এখানকার ভর পৃথিবীর ভরের চেয়ে 80 শতাংশের একটু বেশী। সূর্যের নিকটতর বলে শুক্রগ্রহ দ্বিগুণ সূর্যতেজ পায়। কিন্তু জমাট-বাঁধা যে মেঘের স্তর সর্বদা তাকে ঘিরে থাকে, তার প্রতিবিম্বও দ্বিগুণ এবং তার ফলে দুই গ্রহে যে সূর্যরশ্মি বিকিরিত হয়, তার পরিমাণ প্রায় সমান সমান।

বিগত দশকে বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উন্নতি এবং মহাকাশ অভি-যানের ফলে বিজ্ঞানীরা কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন, যা শুক্রগ্রহ ও পৃথিবী যমজ—এই তথ্যকে নাকচ করে।

কক্ষপথে আবর্তন করতে শুক্রগ্রহ যে সময় নেয়, তা পৃথিবীর একটি দিনের চেয়ে 243 গুণ বেশী দীর্ঘ। আর এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ যেদিক দিয়ে ঘোরে, শুক্রগ্রহ তার উল্টো দিক দিয়ে ঘোরে। শুক্র-গ্রহে এক বছরে দু-বার সূর্য ওঠে এবং দু-বার অস্ত যায়। আর শুক্রগ্রহের একদিন পৃথিবীর 116·8 দিনের সমান। ঐ গ্রহে কোন ঋতু পরিবর্তনের ব্যাপার নেই। শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর নিকট-বর্তী হয়, তখনই তার একটা দিক আমরা দেখতে পাই।

অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম বেতার-তরঙ্গ মারফৎ পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। এই গ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ্য। অবলোহিত বিকিরণের বৈশিষ্ট্যের ফলে শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডলের কিছু রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় সঠিকভাবে মেঘস্তরের তাপ এবং চাপ নিরূপণ করাও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য চাক্ষুষ পরিমাপণ মেঘস্তরের বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের অসাধারণ উচ্চ বেতার উজ্জ্বলতার তাপ আবিষ্কার করেন—300—400 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। তার ফলে গ্রহের আয়নমণ্ডলের অতিঘনতা, বায়ুমণ্ডলে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, ইলেকট্রনের গতির ফলে চুম্বক প্রান্তরে রশ্মিবিচ্ছুরণ এবং বেতার প্রবাহ সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মায়। যাহোক অসাধারণ উচ্চ বেতার উজ্জ্বলতার তাপের কারণ এবং শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল এবং তার পৃষ্ঠদেশের তাপ সম্পর্কিত প্রশ্নের কোন উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

ভেনেরা 4, 5 এবং 6-এর অনুসন্ধানের ফলে শুক্রগ্রহের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে তথ্য জানা গেল। আগে মনে হয়েছিল, এই গ্রহের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু নাইট্রোজেন নেই। শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেনও একেবারেই নেই। মেঘস্তরের কাছে এক শতাংশেরও কম জলীয়বাষ্প আছে।

ভেনেরা-7 মহাকাশযান স্বয়ংক্রিয় অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছে। এই প্রথম একটি মহাকাশযান এই গ্রহে অবতরণ করলো। আমরা বলতে পারি যে, এই মহাকাশযানটিকে ভীষণ উত্তাপ সহ্য করতে হয়েছিল। যে উত্তাপে তামা, সীসা গলে যায়, তার চেয়েও বেশী উত্তাপ। এই উত্তাপ সহ্য করেই পৃথিবীতে খবর পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি, শুক্রগ্রহে অবতরণ কত কঠিন ব্যাপার। সে সমস্যার এখন সমাধান হয়েছে।

ভেনেরা-7 নির্মাণও সোভিয়েট মহাকাশ বিজ্ঞানের আর এক সাফল্য। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরে স্বয়ংক্রিয় এই মহাকাশযানের সাফল্যপূর্ণ এই অভিযান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই অভিযানের ফলে অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। শুক্রগ্রহের আবহাওয়া অত্যন্ত ঘন ও উত্তপ্ত।

পৃথিবী এবং শুক্র—এই দুটি গ্রহের ভূতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য উপাদানের কি কি অমিল আছে, যার ফলে এই দুই প্রতিবেশী গ্রহের আবহাওয়ায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছে? স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের অভিযানের ফলে গ্রহলোকের এরকম অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর হয়তো মিলবে।

আমরা এটা জানি যে, বিরাট মেঘমণ্ডল থেকে জন্ম নেবার সময় গ্রহগুলির আবহাওয়া প্রায় একই রকম ছিল এবং তাদের রাসায়নিক উপাদানও ছিল অনেকটা সূর্যের রাসায়নিক উপাদানের মত। যাহোক বিবর্তনের ধারায় ক্রমশঃ অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, মঙ্গলগ্রহে একটুও অক্সিজেন নেই এবং চাঁদের অগভীর আবহাওয়ার কোন গ্যাসীয় পদার্থ নেই।

পৃথিবীর আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন আছে। কিন্তু শুক্রগ্রহে কিছুমাত্র অক্সিজেনও নেই। তদুপরি শুক্রগ্রহের মেঘস্তরের উপরের তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রার চেয়ে বেশী।

কিন্তু শুক্রগ্রহ এখনো প্রহেলিকাময়—যেমন বলা যায় শুক্রগ্রহের মেঘপুঞ্জের গঠন এবং উপাদানের কথা। তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে। আমরা মনে করি, এই মেঘের উপাদান হলো এক মাইক্রন পরিমাণ হিম স্ফটিকবিন্দু। শুক্রগ্রহের আবহাওয়ার উপরিভাগে কিভাবে কি ঘটছে, সেই বিষয়ে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। শুক্রগ্রহের আবর্তন পদ্ধতি

কেন অস্বাভাবিক, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশ সম্ভবতঃ তপ্ত লাল নিষ্প্রাণ এক মরুভূমি। পৃষ্ঠদেশের ভীষণ তাপের ফলে পৃথিবীর মত কোন প্রাণের জন্ম এখানে সম্ভব নয়। অবশ্য আমরা একথা বলতে পারি না যে, মেঘপুঞ্জে সাধারণ প্রাণের জন্ম অসম্ভব—কেন না, এখানকার পরিবেশ প্রাণধারণের উপযোগী, প্রায় পৃথিবীর মত।

স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের অভিযানের ভিতর দিয়ে শুক্রগ্রহের আবহাওয়া ও তার পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে গবেষণার যে সূচনা হয়েছে, অদূর ভবিষ্যতেই তার ফলে শুক্রগ্রহের রহস্য উন্মোচিত হবে বলে মনে হয়।

ভৌত জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক যোহানেস কেপ্‌লার

(1571-1630)

(400তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শ্রীবৈদ্যনাথ বসু*

যোহানেস কেপ্‌লার (Johannes Kepler) জার্মেনীর ভেইল (Weil) নগরে 1571 সালে 27শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সেই কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার যুগে কেপ্‌লার ছিলেন এক বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। একাধারে তিনি ছিলেন গণিতবিদ্‌, পদার্থ-বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যদিও গ্রহমণ্ডলীর গতিসূত্রের আবিষ্কারই তাঁর প্রধানতম কীর্তি। সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহমণ্ডলীর (ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো তখনও আবিষ্কৃত হয়নি) গতি ও অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-যোগ্য ঘটনাবলীর একটা সুষ্ঠু ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম আসে ক্লডিয়াস টলেমীর (Claudius Ptolemy) কাছ থেকে। এই ব্যাখ্যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ Almagest-এ। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে টলেমীর আবির্ভাব হয় আলেকজান্দ্রিয়া মহানগরীতে। তাঁর বিখ্যাত সৃষ্টি Almagest-এর একটা বিরাট অংশই জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনায় সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থে টলেমী চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহাদির গতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছেন, যদিও পরবর্তী কালে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সেই ব্যাখ্যা কোপার্নিকাসের (Copernicus, 1473-1543) আমল পর্যন্ত অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। কোন ভুল মতবাদকে এত দীর্ঘকাল যাবৎ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করবার মত নজীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গ্রহের গতি ও অবস্থান সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য করলে যে দুটি জিনিষ প্রথমেই নজরে আসে, তা হলো এই যে, স্থির নক্ষত্রনিচয় এবং পরস্পরের সাপেক্ষে গ্রহগুলির অবস্থান ক্রমাগত বদ্‌লায় এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে তাদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব বদ্‌লায়। অপর পরিলক্ষিত বিষয়

* গণিত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

হলো, পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহগুলির গতি কখনও পৃথিবীর সঙ্গে একই দিকে অর্থাৎ সম্মুখ গতি (Direct motion) আবার কখনও বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিপরীত গতি (Retrograde motion)। এই ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করবার জন্যে টলেমী বলেছেন যে, বিশ্বের স্থির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে পৃথিবী। চন্দ্র, সূর্য এবং গ্রহগুলি পৃথিবীর চার- মতে, প্রত্যেকটি গ্রহ একটি অনুবৃত্তাকার (Epicycle) পথ পরিক্রমা করে, আর অনু-বৃত্তটির কেন্দ্রবিন্দু বৃত্তাকার পথে (Deferent) পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে। পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দেখলে অনুবৃত্তে গ্রহের গতি এবং তার কেন্দ্রের পৃথিবী পরিক্রমার গতি—দুই-ই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ সম্মুখদিকে।

যোহানেস কেপ্‌লার

দিকে বৃত্তাকার পথে আবর্তন করে এবং নক্ষত্র খচিত আকাশ গোলকটি (Celestial sphere) 24 ঘণ্টায় একবার করে ঘুরে আসে। কিন্তু কোন গ্রহ যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘোরে, তাহলে গ্রহটির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হওয়া উচিত নয় অথচ কার্যক্ষেত্রে সুস্পষ্ট তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে টলেমী প্রত্যেক গ্রহের গতিকে দুটি বৃত্তীয় গতির মোট ফলরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর

1নং চিত্রে পৃথিবীর সাপেক্ষে গ্রহের এই গতি বোঝানো হয়েছে। P কোন একটি প্রধান গ্রহ (Superior planet), এটি C কেন্দ্রিক অনুবৃত্তে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে গতিশীল, অনুবৃত্তটির কেন্দ্র C আবার বৃত্তপথে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে। এই দুটি গতির যোগফল সম্মুখদিকে হলে গ্রহটির সম্মুখগতি হবে; যোগফল বিপরীতমুখী হলে গ্রহটির বিপরীত গতি দেখা যাবে। এভাবে

টলেমী গ্রহের সম্মুখ ও বিপরীত গতির ব্যাখ্যা করেছেন।

আবার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বছরের কোন সময়েই সূর্য থেকে বুধ এবং শুক্রের কৌণিক দূরত্ব যথাক্রমে 28 এবং 48 ডিগ্রীর বেশী হয় না। টলেমীর মতে এটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, যদি আমরা ধরে নিই যে, বুধ বা শুক্রের অনুবৃত্তের কেন্দ্র C´ সর্বদা পৃথিবী ও সূর্যকে যুক্তকারী সরলরেখার উপরে থাকে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় ঐ দুটি গ্রহের দেখা যায় যে, টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বের মতবাদ পর্যবেক্ষিত বহু ঘটনার মোটামুটি সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়। এই ব্যাখ্যা তৎকালীন লোকের ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তৎকালীন লোকের দুটি বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রথমতঃ, বিশ্বের স্থির কেন্দ্র হচ্ছে পৃথিবী। দ্বিতীয়তঃ চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ প্রভৃতি যেহেতু স্বর্গীয় পবিত্র বস্তু, সেহেতু তাদের গতিপথ হবে নিখুঁৎ এবং বৃত্তপথই হলো একমাত্র নিখুঁৎ পথ। টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক গ্রহমণ্ডলের মতবাদ
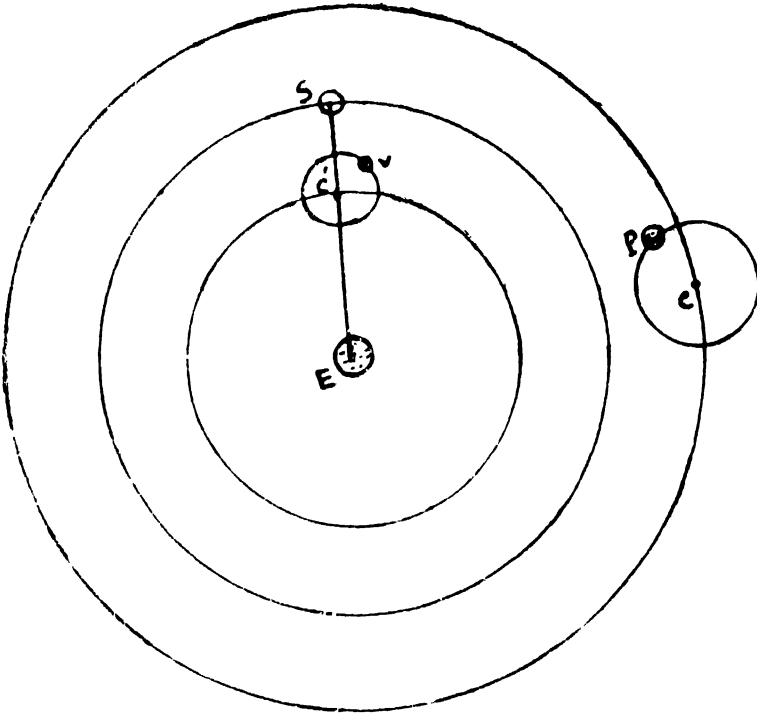
1নং চিত্র
E—পৃথিবী (স্থির), S—সূর্য, P একটি প্রধান গ্রহ এবং V একটি অপ্রধান গ্রহ ; C এবং C´ যথাক্রমে এদের অনুবৃত্তের কেন্দ্র। C এবং C´ বিন্দুদ্বয় পৃথিবীর চারদিকে বৃত্তপথে আবর্তন করে।

অবস্থান কখনই সূর্য থেকে খুব বেশী দূরে হওয়া সম্ভব নয়। আবার প্রত্যেক গ্রহের অনুবৃত্তে পরিক্রমার ফলে পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব বদলায়, ফলে গ্রহটির ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়। অতএব উক্ত বিষয় দুটির সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মতবাদ প্রাচীন এবং মধ্যযুগের লোকের কাছে এত সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছিল যে, প্রায় দেড়হাজার বছর ধরে এর সত্যতা সম্বন্ধে কেউ

প্রশ্ন করেন নি বা কোন বিকল্প ব্যাখ্যার কথা ভাবেন নি। প্রথম বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন কোপার্নিকাস, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

গ্রহমণ্ডলীর গতিবিধি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে কোপার্নিকাস দেখলেন যে, যদি সূর্যকে কেন্দ্রবিন্দু এবং পৃথিবীসমেত অন্যান্য গ্রহগুলিকে সূর্যের চারদিকে আবর্তনশীল ধরা যায়, তাহলেও গ্রহগুলির সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাবলীর বেশ সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা যায় এবং সে ব্যাখ্যা টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার চেয়ে আরও ভাল হয়। অবশ্য কোপার্নিকাসের মতেও গ্রহগুলির গতিপথ এক-একটি বৃত্ত এবং ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি অনুবৃত্তেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গ্রহমণ্ডলীর আবর্তন, তাদের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য, সম্মুখ ও বিপরীত গতি প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 2নং চিত্রে মঙ্গলগ্রহের সম্মুখ ও একটি সরলরেখা ধরে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। কিন্তু উক্ত কক্ষদ্বয় ভিন্ন সমতলে অবস্থিত হওয়ায় মঙ্গলগ্রহের যাতায়াতের পথে একটি ফাঁস (Loop) তৈরি হয়।

কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক পদ্ধতি টলেমীর ভূ-কেন্দ্রিক পদ্ধতির চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে হলেও তিনি কিন্তু এই পদ্ধতির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করতে পারেন নি। তিনি প্রমাণ করে দেখাতে পারেন নি যে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি সত্যই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তাঁর মতবাদ গড়ে উঠেছিল একটা সুস্থ বিকল্প চিন্তাধারা অবলম্বন করে, কোন গাণিতিক ভিত্তির উপর তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। পৃথিবী যদি সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তবে কোন জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোর গতির সাপেক্ষে পৃথিবীর নিজস্ব গতির দরুণ উক্ত জ্যোতিষ্কের অপেরণজনিত (Aberration) কিছুটা স্থানচ্যুতি
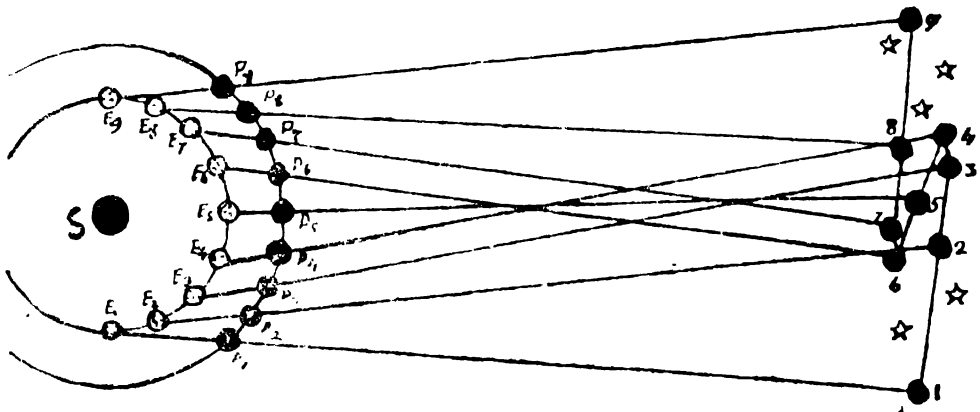
2নং চিত্র

পৃথিবী (E) এবং মঙ্গলের (P) কক্ষপথে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান এবং আকাশের গায়ে তাদের অভিক্ষেপ দেখানো হয়েছে। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ অবস্থান পর্যন্ত মঙ্গলের গতি বিপরীত।

বিপরীত গতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পৃথিবী এবং মঙ্গলের কক্ষপথ যদি একই সমতলে অবস্থিত হতো, তাহলে মনে হতো, মঙ্গলগ্রহ এই সময়ে আকাশে ঘটবে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে এই স্থানচ্যুতি ধরা যায়। আবার বছরের বিভিন্ন সময়ে কক্ষপথে পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানের জন্যে দূর নক্ষত্রের

অবস্থানের লম্বনজনিত (Parallax) পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু এই পরিবর্তন এত কম হয় যে, কোপার্নিকাসের সময়ের যন্ত্রপাতির দ্বারা তা নির্ণয় করা হয়তো সম্ভব ছিল না। নক্ষত্রের অবস্থানের অপেরণজনিত পরিবর্তন ব্র্যাড্‌লী (Bradley) আবিষ্কার করেন 1727 সালে; আর বিখ্যাত গণিতবিদ্‌ বেসেল (Bessel) 1838 সালে নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত পরিবর্তন আবিষ্কার করেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ যেহেতু গীর্জার পুরোহিতদের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল, সেহেতু তারা প্রবল চাপে কোপার্নিকাসকে তাঁর মতবাদ তুলে নিতে বাধ্য করেছিলেন। কোপার্নিকাস সাময়িকভাবে এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁর এই মতবাদ তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গিয়েছিলেন।

কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রকাশিত হবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহমণ্ডলীর গতি-প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন বিশেষভাবে গবেষণা করেন টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe)। টাইকো ছিলেন ডেনমার্কের অধিবাসী। তথাকার রাজার আনুকূল্যে তিনি প্রাগের (Prague) অদূরে একটি অতি আধুনিক সুসজ্জিত মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রায় 28 বছর ধরে গ্রহের গতিবিধি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দূরবীক্ষণযন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু টাইকো অন্যান্য যে সব যন্ত্রপাতি তাঁর মানমন্দিরে সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলি তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও নিখুঁৎ ধরণের ছিল। এরূপ উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু টাইকো নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত কোন পরিবর্তন ধরতে পারেন নি। এর একমাত্র কারণ যদিও নক্ষত্রের অতি দূরত্ব, কিন্তু টাইকোর সময়ে নক্ষত্রের এই বিপুল দূরত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সব দেখে-শুনে টাইকো সিদ্ধান্ত করলেন যে, পৃথিবী নিশ্চয়ই স্থির এবং কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ ভুল। তিনি সৌরজগৎ সম্বন্ধে এক নতুন মতবাদ উপস্থাপিত করলেন। তাঁর মতে, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য ও চন্দ্র বৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ বৃত্তাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে। টাইকোর এই মতবাদ যদিও কখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি, তথাপি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, তাঁর মতবাদের পেছনে ছিল একটি যথার্থ বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতি। তিনি নক্ষত্রের অবস্থানের লম্বনজনিত পরিবর্তন যন্ত্র দিয়ে মেপে বের করবার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তা সত্ত্বেও যখন কিছু খুঁজে পান নি, তখনই কেবল তিনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। শুধুমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন নি।

টাইকো যদিও তাঁর দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফলকে যথাযথ কাজে লাগাতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর উন্নত ধরণের পর্যবেক্ষণ ছিল তখনকার তুলনায় মোটামুটি নির্ভুল এবং তিনি সেগুলি সবই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। টাইকোর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মী যোহানেস কেপ্‌লার সেগুলি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেন। কেপ্‌লার প্রথম থেকেই কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এবারে এই মতবাদকে গাণিতিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করবার জন্যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন। এখানেই কেপ্‌লারের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উৎকর্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেপ্‌লার বুঝলেন যে, কোপার্নিকাসের মতবাদ যদি ঠিক হয়, তাহলে প্রতিটি গ্রহের কক্ষপথের আকার জ্যামিতিক নিয়মে নির্ণয় করা যায়। এটা কিভাবে করা যায়, দেখা যাক।

মঙ্গলগ্রহের কথাই ধরা যাক। মঙ্গলগ্রহ প্রতি 780 দিন পর পর সূর্যের বিপরীত দিকে পৃথিবী ও সূর্যের সঙ্গে একই সরলরেখায় আসে (Opposition)। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবী সূর্যকে দু-বার সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে আরও প্রায় 50 ডিগ্রী এগিয়ে এসেছে। যেহেতু ঐ সময়ে মঙ্গল ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থিত, অতএব মঙ্গল এই 780 দিনে (360+50) ডিগ্রী গিয়েছে। তাহলে মঙ্গলের সূর্য পরিক্রমার কাল দাঁড়ালো 687 দিন। অতএব 687 দিন পর পর মঙ্গল তার কক্ষপথের একই বিন্দুতে ফিরে আসে। এই তথ্য জানবার পর সূর্য থেকে পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের দূরত্ব সহজ জ্যামিতিক উপায়েই নির্ণয় করা যায় (3নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

3নং চিত্র
কেপ্‌লার কর্তৃক সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব নির্ণয়।

ধরা যাক, কোন একদিন এবং তার 687 দিন পরে মঙ্গলের অবস্থান M; ঐ দিনগুলিতে পৃথিবীর অবস্থান যথাক্রমে A এবং B। উভয় দিনেই দূর নক্ষত্রগুলির সাপেক্ষে মঙ্গলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। আবার ঐ নক্ষত্রগুলির এবং সূর্যের মধ্যরেখা অতিক্রমের সময় (Time of transit) এবং সূর্যের অবনমন (Declination) দেখে ঐ নক্ষত্রগুলির সাপেক্ষে সূর্যের অবস্থানও নির্ণয় করা যায়। এভাবে SAM এবং SBM কোণদ্বয় জানা যায়। এখন যদি পৃথিবীর কক্ষপথকে একটি বৃত্ত ধরা হয় (আসলে ঠিক বৃত্ত নয়, সামান্য উৎকেন্দ্রতা আছে, মঙ্গলের কক্ষপথের উৎকেন্দ্রতা থেকে অনেক কম), তাহলে SA=SB, এরা প্রত্যেকেরই জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক দূরত্বের সমান (Astronomical unit of distance) এবং এই দূরত্বের মাপকাঠিতে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে AB এবং শেষ পর্যন্ত সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব SM নির্ণয় করা যায়। এভাবে কেপ্‌লার কক্ষপথের বিভিন্ন অবস্থানে সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর কাজের অধিকাংশ উপকরণই

তিনি পেয়েছিলেন টাইকোর লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে। কিন্তু এই উপকরণকে সফলভাবে কাজে লাগাতে তিনি দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং এই পরিশ্রমের ফল তিনি যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, তাথেকেই তাঁর নির্ভীক অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

টলেমী থেকে কোপার্নিকাস এবং টাইকো, সব বৈজ্ঞানিকেরাই একটি বিষয়ে একমত ছিলেন যে, জ্যোতিষ্কগুলি সবাই বৃত্তপথে চলে। তাদের নিখুঁত বৃত্তপথ ছাড়া অন্য কোনরূপ পথে চলবার কল্পনা ছিল তখনকার দিনের ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী। সৌরকেন্দ্রিক বা ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের প্রবক্তারা কেউই এর ব্যতিক্রম কখনও কল্পনা করেন নি। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থানে মঙ্গলের দূরত্বের একটি সম্পূর্ণ নক্সা তৈরি করবার পর কেপ্‌লার এক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে, মঙ্গলের কক্ষপথ বৃত্ত নয়, একটি উপবৃত্ত, যার একটি নাভি (Focus) সূর্যে অবস্থিত। অনেক হিসাবনিকাশ করে কেপ্‌লার আরও দেখলেন যে, মঙ্গলের কক্ষপথের যে অংশ সূর্যের নিকটবর্তী তথায় গ্রহটির গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত; সূর্য থেকে দূরবর্তী অংশে গতি ধীর। কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ের আরম্ভে ও শেষে গ্রহটির অবস্থান বিন্দুকে সূর্যের সঙ্গে যোগ করলে উপবৃত্তের যে অংশ ছেদ করে, তার ক্ষেত্রফল কক্ষপথের সব জায়গায় সমান। অতএব কেপ্‌লার গ্রহের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম দুটি সূত্র আবিষ্কার করলেন এবং তা 1609 সালে Astronomia Nova (New Astronomy) গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। সূত্র দুটি এই—

প্রথম সূত্র: প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের চারদিকে একটি উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে, এই উপবৃত্তের একটি নাভি সূর্যে অবস্থিত।

দ্বিতীয় সূত্র: সূর্য ও গ্রহের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ সমান সময়ের ব্যবধানে উপবৃত্তের সমান অংশ ছেদ করে।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কেপ্‌লার শুধু সৌরকেন্দ্রিক মতবাদের সত্যতাই প্রমাণ করেন নি, গ্রহগুলির যে নিখুঁৎ (বৃত্ত) পথে চলে না, তাও প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই ধর্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাসের যুগে এই তথ্য প্রকাশ করা এক দুঃসাহসিক কাজ ছিল। যাজকদের নির্দেশে কোপার্নিকাসের লাঞ্ছনার কথা তিনি ভোলেন নি, যদিও তারপর প্রায় এক শতাব্দী কেটে গেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে কেপ্‌লারের ছিল প্রচণ্ড সাহস ও আত্মপ্রত্যয়। তাই তিনি আবিষ্কৃত সত্য নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। দুটি কারণ হয়তো কেপ্‌লারের অনুকূল ছিল, যার ফলে তিনি যাজকদের কোপদৃষ্টি এড়াতে পেরেছিলেন। প্রথমতঃ, কোপার্নিকাসের পরবর্তী প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষের স্বাধীন চিন্তা অনেক বেশী প্রসারলাভ করেছিল। বর্তমান যুগ অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছিল, যার ফলে পুরোহিতদের সাম্রাজ্যের ভিৎ অনেকটাই ধ্বসে পড়েছিল। এর চেয়েও বড় কারণ সম্ভবতঃ এই যে, কেপ্‌লার তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছিলেন সহজ গাণিতিক হিসাবের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে ভুল দেখানো কারও পক্ষে সহজ ছিল না। অপরপক্ষে, তাঁর পূর্বসূরীদের মতবাদের পেছনে এমন কোন গাণিতিক তথ্য ছিল না, যার সত্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়।

কেপ্‌লারের পরবর্তী 10 বছরের ব্যাপক গবেষণার আংশিক ফল তাঁর গ্রহের গতি সম্বন্ধীয় তৃতীয় সূত্রের আবিষ্কার। 1619 সালে প্রকাশিত De Harmonice Mundi (Harmony in Nature) গ্রন্থে লিখিত এই সূত্রটি হলো: কোন গ্রহের আবর্তনকালের বর্গফল তার সূর্য থেকে গড় দূরত্বের ঘনফলের সঙ্গে সমানুপাতিক; অর্থাৎ, P_1, P_2 যদি দুটি গ্রহের আবর্তনকাল

এবং A_1, A_2 তাদের সূর্য থেকে গড় দূরত্ব হয়, তাহলে $P_1^2 : P_2^2 = A_1^3 : A_2^3$। বছরকে সময়ের একক এবং জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একককে দূরত্বের একক ধরে যে কোন গ্রহের আবর্তনকাল পর্যবেক্ষণ করে এই সূত্রের সাহায্যে তার সূর্য থেকে গড় দূরত্ব নির্ণয় করা যায়।

গ্রহের গতিসূত্রগুলি আবিষ্কার করতে কেপ্‌লার যে আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা বিস্ময়কর। উপকরণসমূহের সার্থক বিশ্লেষণই ছিল তাঁর আবিষ্কারের গোড়ার কথা। অবশ্য, কোন্ ভৌত নিয়মে গ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়, তা কিন্তু ছিল কেপ্‌লারের অজানা। সে নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন স্যার আইজাক নিউটন, কেপ্‌লারের গতিসূত্র আবিষ্কারের প্রায় 50 বছর পরে। নিউটন দেখিয়েছেন যে, তাঁর মহাকর্ষীয় সূত্রানুযায়ী সূর্যের আকর্ষণের ফলে প্রত্যেক গ্রহ একটি সৌরমাভ উপবৃত্তে সূর্যকে আবর্তন করবে এবং সূর্য ও গ্রহের সংযোগকারী ব্যাসার্ধ সমান সময়ের ব্যবধানে এই উপবৃত্তের সমান অংশ ছেদ করবে। অতএব কেপ্‌লারের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের ভৌত নিয়মানুযায়ী ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। নিউটন আরও দেখালেন যে, কেপ্‌লারের তৃতীয় সূত্রটি পুরাপুরি ঠিক নয়। ঐ সূত্রে সূর্য এবং গ্রহের ভরও বিবেচনা করতে হবে এবং সঠিক সূত্রটি হবে — $(M+m_1)P_1^2 : (M+m_2)P_2^2 = A_1^3 : A_2^3$। এখানে M সূর্যের এবং m_1, m_2 সংশ্লিষ্ট গ্রহদ্বয়ের ভর। লক্ষ্য করা দরকার যে, গ্রহগুলির ভর সূর্যের ভরের তুলনায় এত কম যে $(M+m_1)$ এবং $(M+m_2)$-এর মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। এই সামান্য পার্থক্য যে কেপ্‌লারের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং এই পার্থক্যকে উপেক্ষা করলেই উপরের সূত্রটি থেকে কেপ্‌লারের আদি সূত্রটি পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে দেখা গেছে যে, উপরের সূত্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। কারণ যুগ্ম-নক্ষত্রের (Binary stars) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই সূত্রটির সাহায্যে ঐ সব নক্ষত্রের ভর নির্ণয় করা যায়। নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ের ব্যাপারটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাভেরিয়ার রেটিস্‌বন শহরে 1630 খৃষ্টাব্দের 15ই নভেম্বর এই মহামনীষী দেহত্যাগ করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

ফটোন—সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ উজ্জ্বল

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পদার্থবিদ্‌দের তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালিয়ে ফটোন সৃষ্টি করেছে। ফটোন হলো 10 লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আলোর উৎস। এই আলোর ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বেশী।

এই আলো বিচ্ছুরণের কাজ এভাবে চলে—একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন প্রবাহ ৯টি ব্যাটারীতে শক্তি সঞ্চার করে। তাদের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল, তা বিশেষ পদ্ধতিতে শক্ত অ্যালুমিনিয়ামের তারে জ্বলে ওঠে এবং তার ফলে একটা আলোক বিস্ফোরণের শব্দ হয়। এই শব্দ একটা বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার শব্দের মত। তার স্থায়িত্ব হলো এক সেকেণ্ডের 2 হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই জন্তেই এরকম বিপুল পরিমাণ আলোক-শক্তি নির্গত হয়।

এই আলোক বিচ্ছুরণের সময় ফটোমিটার কাজ করে এবং বিচ্ছুরণের ঘটনাকে ধরে রাখে। এই ঘটনা এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র স্থায়ী হয়। একটি স্পেক্টোমিটার বিচ্ছুরণের তাপ নির্ণয় করে। কার্যসূচী অনুযায়ী সমস্ত যন্ত্রপাতিই যুগপৎ কাজ করে।

গবেষকদের যে দলটি ফটোন সৃষ্টি করেছে, তাঁদের নেতৃত্ব করছেন সহযোগী অধ্যাপক আন্দ্রেই আলেকজান্দ্রোভ। তিনি বলেছেন যে, এপর্যন্ত যা চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় নি এবং লেসার ব্যবহারের যে সম্ভাবনার ক্ষেত্র এখনও অজ্ঞাত রয়েছে, সে সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার জন্যে এই আলোর উৎস সন্ধানের প্রয়োজন। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণ আলোর বিকিরণ অত্যন্ত জরুরী। বিজ্ঞানী বলেছেন যে, ফটোনের দ্বারা গবেষণা চালালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের সন্ধান

অ্যাকাডেমিশিয়ান গিওর্গি পেত্রোভ বলেছেন, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা—প্রধানতঃ সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে মার্স-2 এবং মার্স-3 স্টেশনকে মঙ্গলগ্রহে পাঠানো হয়েছে।

এটি একটি কেন্দ্রীয় ও প্রধান সমস্যা হলেও এর সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপারও জড়িত। তার মধ্যে আছে গ্রহের পরিবেশ সম্পর্কে গবেষণা চালানো। মার্স-2 এবং মার্স-3 জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিষয়ক যে গবেষণা চালিয়েছিল, তার চূড়ান্ত তালিকা দেওয়া হলো—অবলোহিত রশ্মি নির্গমনের দ্বারা ভূমির উত্তাপ নিরূপণ, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ সারণীতে আবহমণ্ডলের দৃষ্টিগ্রাহ্য গভীরতা নির্ণয়ের দ্বারা এই গ্রহের জমির উচ্চতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো, গ্রহের জমি এবং আবহাওয়ার গুণাবলী সম্পর্কে ফটোমেট্রিক গবেষণা চালানো, আবহাওয়ার জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বের পরিমাণ নিরূপণ, গ্রহের রশ্মি-বিকিরণ থেকে ভূমির তাপ নিরূপণ এবং আবহাওয়ার অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণা চালানো।

মঙ্গলগ্রহে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে মার্স স্টেশনগুলিতে যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাতে অবলোহিত রেডিওমিটারে দুটি ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে, তার একটিকে গ্রহে কাজের উপযোগী আর অপরটিকে মহাকাশে কাজের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। সমগ্র রেডিওমিটারটি হাতের তালুর উপর রাখা যায়। তার ওজন এক কিলোগ্র্যামের একটু বেশী। এটি শূন্যাঙ্কের 100 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচের শীতল বস্তুর নির্গমন মাপতে পারে।

মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা খুবই কম। যে পথ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করেছে, সেই পথে অগ্রসর হয়ে মার্স 3 মঙ্গলগ্রহের তাপ নির্ণয়ের প্রথম যে চেষ্টা চালায়, তাতে দেখা যায় যে, মঙ্গলগ্রহের তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের 15 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে।

একটি বিশেষ ধরণের দৃষ্টিগ্রাহ্য যন্ত্রের সাহায্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাপ নেওয়া হয়। খুব সহজেই এই যন্ত্রটি এক মিটার পথে সামান্য জলীয় বাষ্পও আবিষ্কার করতে পারে। মোটামুটি একই পরিমাণ জলীয় বাষ্প মঙ্গলগ্রহের সেই পথের আবহাওয়ার ঘনত্বের মধ্যে আছে। মার্স-2 এবং মার্স-3-তে একটি করে রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো আছে। এগুলি গ্রহের বেতার-তরঙ্গ এবং তাদের তীব্রতার ও মেরুকরণের মাপ গ্রহণ করে। এই মাপ নির্ণয় থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তার ফলে গভীরতায় তাপ নিরূপণ এবং ভূমির গঠনের ঘনত্ব নিরূপণ করাও সম্ভব হয়। মঙ্গলগ্রহগামী

মহাকাশযানে যে স্বয়ংক্রিয় রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানো থাকে, তা আকারে খুব বড় নয়। এর সাহায্যে 100 থেকে 150 ব্যাসার্ধযুক্ত পরিধির রশ্মি বিকিরণ মাপাও সম্ভব।

মার্স-2 ও মার্স-3-এ একটি বহুমুখী অতি-বেগুনী রশ্মির ফটোমিটার আছে। এর সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগের আবহাওয়ার উজ্জ্বলতা মাপা যায়।

রেখাঙ্কন ও বর্ণালীভাষ্য

একপর্ণা দাশ

রেখাঙ্কন ও বর্ণালীভাষ্য সহজ বোধগম্য করবার জন্যে কয়েকটি কথা সুরুতে বলা প্রয়োজন। মানুষের মনের ভাব প্রকাশ পায় ভাষার মাধ্যমে—কিন্তু শিশুমনে যেমন প্রকাশনার ভঙ্গী ভাষার অভাবে সম্পূর্ণ নয়, প্রাপ্তবয়স্কের তেমনই মনের কথা সর্বত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

যে কথাটি মুখে বলা যায় না লেখনী বা রেখাঙ্কনের মধ্যে সে কথাটি ফুটে ওঠে বিশেষজ্ঞের কাছে। ধরুন যে লোকটির হস্তলিপির সঙ্গে আপনি পরিচিত, মানসিক উত্তেজনাবশে সেই লিখনভঙ্গীও পাল্টে যায়। সহজ লেখা ও উত্তেজনা বা নিস্তেজনাবশে লেখার পার্থক্য একটু অনুধাবন করলেই বোঝা সম্ভব।

ছবি অঙ্কনের ব্যাপারেও সেই একই প্রক্রিয়া প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ রেখাচিত্রের যে ধরণ সুস্থ মানসিকতার প্রতিচ্ছবি, মানসিক অস্থিরতায় তারই অন্য রূপ ফুটে ওঠে।

আবার ছবিতে রং ফলাবার ব্যাপারে যে রঙের ব্যবহার হয়, তার মধ্যেও এই ধরণের প্রকাশ দেখা যায়।

মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ রঙের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের নির্দেশক, বিভিন্ন অবস্থাভেদে বহু সংখ্যক ব্যক্তি-চরিত্রের বিশেষত্ব লক্ষ্য করলে সাধারণভাবে এই বিষয়ে আলোকপাত সম্ভব।

ভিন্ন মানসিক অবস্থায় অর্থহীন হিজিবিজি রেখাঙ্কনও মানসিক অবস্থা নিরূপণের সহায়ক। যেমন—শান্ত পরিবেশে যে ছেলেটি হাতে খড়ি পেলে স্বাভাবিক রেখা টানবে, সে-ই আবার উত্তেজিত অবস্থায় ঐ খড়ি দিয়েই অস্বাভাবিক হিজিবিজি রেখা টেনে যাবে।

পৃথিবী জোড়া আনন্দ মেলায় রঙের বিচিত্র সমারোহ কি অর্থহীন? এই বৈচিত্র্য মনে কি সাড়া জাগায় না? গাছের পাতার সবুজ রং চোখ জুড়িয়ে দেয়, পাকা ফসলের সোনালী রং জাগায় আনন্দ—জাগায় আশা। প্রজাপতির ডানায় ও পাখীর পালকের অপরূপ বর্ণ সমাবেশ অন্তরকে পুলকিত করে তোলে। আকাশের ঘনকৃষ্ণ মেঘ মনে জাগায় ভয়। চাঁদে প্রথম মানুষ তার অপরূপ বর্ণালীতে অভিভূত হয়ে বলে উঠেছিল—সুন্দর! সুন্দর! মরণের আশংকা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। রোরুদ্যমান ছোট্ট শিশুটি লাল খেলনাটি দেখে কান্না ভুলে যায়। মানুষের মনের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বিভিন্ন রং।

দেশে দেশে ধর্ম ও সংস্কার রঙের প্রভাব মুক্ত নয়। ভয়ঙ্করী কালীমূর্তির রং কালো, আবার

তার পূজার ব্যবস্থা উগ্র উত্তেজক লাল ফুলে, সিঁদুরে। বৈষ্ণবের শান্তির ধর্ম, গৌরাঙ্গ সাদা উত্তরীয়ে আবৃত শ্বেতচন্দন ও সাদা ফুলের পূজারী। যীশু খৃষ্টের শিরশোভা জরদ রঙের, ইসলামের পতাকা সবুজ।

প্রাপ্তবয়স্কেরা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তাই কোন্ রঙের শাড়ী কাকে মানায় আর তার সঙ্গে কোন্ রঙের জামা মানানসই হবে কিংবা কোন্ রঙের ওষ্ঠ বা নখরঞ্জনী কার উপযোগী, এই বিচার-বিবেচনা কাল ও সমাজ ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। এমন কি, ঘর-বাড়ীর রং পর্যন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী করণীয়।

বিভিন্ন বর্ণ সমাবেশে মানসিক প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ নির্ধারণ পন্থাগুলি দোষমুক্ত না হলেও প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের সহায়ক নিশ্চয়ই।

রোগ নির্ণয়ে বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ প্রভূত আশার সঞ্চার করেছে। আধুনিক মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে রঙের পরিপ্রেক্ষিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখবার সে সুযোগ আছে। আমাদের দেশে তার প্রচলন হয় নি, তাই এই বিষয়ে প্রায় সবটুকু জ্ঞান বৈদেশিক হাসপাতাল বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চয় করতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতার ফল স্বীকার করা কিঞ্চিৎ দুরূহ বলে মনে হলেও এই বিষয়ে চিন্তা করা ও দৃষ্টি দেবার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করি।

কীট-পতঙ্গ ফুলের রঙে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু এরা পছন্দমত রং দেখলেই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সব রং সকল কীট-পতঙ্গের কাছে সমান আকর্ষণীয় নয় অর্থাৎ বিভিন্ন রং এদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরাবর্তের সৃষ্টি করে। উজ্জ্বল আলোর টানে কেউ বা জীবন তুচ্ছ করে ছুটে যায় আবার কারোর প্রিয় নিভৃত অন্ধকার।

আবার লাল রং বৃষের মনে যে ভাব জাগায়, কালো বা সবুজ রং সে ভাব জাগাতে পারে না, অথচ সেই লাল টুক্‌টুকে ফল একটা পাখীর কাছে আকর্ষণীয়—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রং ভিন্ন ভিন্ন জীবে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

মানুষের বেলায় এই রঙের প্রতিক্রিয়া জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিদৃশ্যমান। ছোট ছেলে রঙের খেলায় মেতে ওঠে, বয়স্কেরা রঙের মনোনয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আবার উদ্দাম আনন্দের হোলি খেলায় রঙের বাহুল্য ও অদ্ভুত সংমিশ্রণে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

শিশুর মনে পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে শক্তিশালী। এই পরিবেশের প্রভাবে গড়ে-ওঠা মনের বিকাশ নানাভাবে হয়ে থাকে। তার মধ্যে রেখাঙ্কন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। যা সে দেখছে—পৃথিবীর কাছে সে যা পেয়েছে, তারই পরিস্ফুরণ হয় অঙ্কনের মাধ্যমে।

শৈশবের প্রকাশনভঙ্গীতে কৃত্রিমতার স্থান অতি অল্প, তাই শিশু মনস্তত্ত্বের যে প্রকাশ প্রাথমিক অঙ্কনের মধ্যে দেখা যায়, তা শিল্প-চাতুর্যের মূল্যায়নে যতই সামান্য হোক, মনস্তত্ত্বের প্রকাশনায় তা অমূল্য। শিশু তার সৃজনী শক্তির সাহায্যে প্রকাশ করে তার অন্তরের উপলব্ধি ও চেতনা, যার উৎস তার পরিবেশ।

বিশেষজ্ঞের গবেষণা থেকে জানা যায়, আট বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশু পরিবেশের চিত্র আঁকে নিজের মানসিক চিত্রের আদর্শে, বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক বিরল। আট বছরের ঊর্ধ্বে শিশু-মানসিকতার পূর্ণতা বিকশিত হতে থাকে এবং সে পরিবেশের চিত্র নিপুণ হাতে যথাযথ প্রতিকৃতি আঁকবার চেষ্টা করে। দৃশ্যমান জগতের নির্ভুল প্রতিকৃতি চিত্রিত করবার মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। প্রকৃত জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে এই প্রচেষ্টা জড়িত বটে, কিন্তু জ্ঞানের মাপকাঠি হিসাবে এই তথ্য নির্ভুল নয়।

পরবর্তী কালে শিশু পরিবেশের সঙ্গে আপন-মানসিক অবস্থার অভিযোজনের চেষ্টা করে তাই সে যা দেখে, সেটা আপন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা বজায় রেখে চিত্রে প্রতিফলিত করে। কিন্তু মানসিক আবেগের প্রভাবে এই সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হতে পারে। এই ভাবাবেগের বিশেষ প্রবণতা ও অঙ্কনভঙ্গী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। দুটিই গতিশীল প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য নির্ভুল, কিন্তু যে কোনও একটির সামান্যতম ব্যতিক্রম অঙ্কনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়।

অভাব, অভিযোগ বা অনাদর সুস্থ মনো-বিকাশের পরিপন্থী, এর প্রভাবে এদের অঙ্কিত চিত্র নিষ্প্রাণ ও সাংসারিক বিষয়বস্তুর উপর আস্থাহীন। সমবয়স্ক এবং সমান বুদ্ধ্যঙ্কবিশিষ্ট (I. Q.) দুটি শিশুর ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন প্রকাশনভঙ্গী দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নিজের বা আপন পরিবারের চিত্র অঙ্কন শিশুমনের পরিচয় প্রদানে সবচেয়ে উপযোগী। নিজের মনের ভাব যেমন আপন মুখালেখ্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনই সংসারে আসক্তি এবং পরিবারবর্গের স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার প্রকৃত সত্য এই চিত্রে বিশেষরূপে ধরা পড়ে। যে শিশু সংসারে অনাদৃত বা অবাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে রইলো, যার মনের সকল সুকুমার বৃত্তি ফুটতে পেল না, তার চিত্র হবে খাপছাড়া—ব্যঞ্জনাহীন।

প্রাপ্তবয়স্কেরা রং প্রয়োজন হিসাবে ব্যবহার করে। তাই মানসিক ও সামাজিক সম্পর্কের দর্পণ হিসাবে শিশুর রং পছন্দ বৈশিষ্ট্য ও অর্থপূর্ণ। শিশু যা দেখে বা আঁকে, তাকে প্রাণবন্ত করতে চেষ্টা করে রঙের সাহায্যে। রঙের সম্মোহিনী শক্তি শিশুকে অভিভূত করে। শিশু-মনের আবেগ, প্রাকৃতিক জ্ঞান আর রঙের উদ্দীপনা বিচিত্র ছন্দের সামঞ্জস্যে প্রকাশিত হয়। এই ক্ষেত্রে রঙের প্রতি-ফলন বিষয়বস্তু থেকে মানসিক চেতনার দ্যোতক। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রঙের যাদু শিশুমন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন আসে অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সম্মিলন, কল্পনার সমাধি—বাস্তবের সৃষ্টি।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রকাশনও ভিন্ন। আদিম জাতিপুঞ্জের মধ্যে বর্ণালী-বৈচিত্র্যের সমাদর সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক জৈবিক রঙের প্রচলন ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক রং তৈরি হচ্ছে কলকারখানায়। প্রাকৃতিক রঙের বিচিত্র সংমিশ্রণ আদিম যুগের মানুষের যে উদ্দেশ্য সাধন করতো, সে এখন কয়েকটি কৃত্রিম রং ও তার সংমিশ্রণে সীমাবদ্ধ হয়েছে।

সব আদিম অধিবাসীর রঙের জ্ঞান সমান নয়। মাওরি সম্প্রদায় গাছের পাতায় সবুজ রঙেরই অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিভাগ বোঝে—সেই তুলনায় অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা রঙের উপলব্ধিতে দরিদ্র—মাত্র লাল, সাদা ও কালো রংই চেনে। এস্কিমোরা বরফের সাদার নানারকম নামকরণ করে। এথেকে সম্প্রদায় বিশেষের কৃষ্টি সূচিত করা সম্ভব।

পাশ্চাত্ত্য জগতে রঙের ব্যবহার এখন প্রায় যান্ত্রিক পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে—বাহ্য চাকচিক্যের প্রকাশ এতে বেশী, সূক্ষ্মানুভূতি কম।

শিশুদের রঙের নির্বাচনে প্রকাশন-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব দেখা যায়। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিপালিত ছয় থেকে দশ বছরের শিশুদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন বয়সে রং নির্বাচনে তারতম্যও দেখা গেছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তিবিদ্যার উপযোগিতা নির্বাচনে এই গবেষণা সহায়ক হতে পারে।

বয়স	বিশিষ্ট রং	অন্যান্য রং
6 বছর	লাল	নীল, সবুজ, বাদামী।
7 বছর	বাদামী	লাল, সবুজ, বাদামী, ধূসর।
9 বছর (85% শিশু নিজস্ব রং পছন্দ করতে শেখে)	লাল, নীল, সবুজ ও বাদামী	গোলাপী ও ফিকে লাল (Mauve)
10 বছর (81% শিশু মিশ্র রং ও ছায়ার (Shade) ব্যবহার ও গোলাপীতে বীতস্পৃহা)।	সবুজ	নীল ও বাদামী।

এপর্যন্ত যা বলা হলো, সেটা স্বাভাবিক সুস্থ সমাজে প্রতিপালিত শিশুদের পক্ষে সত্য। অস্বাভাবিক পরিবেশে প্রতিপালিত শিশুদের মানসিক বিকাশের সুযোগ কম এবং এদের রঙের প্রতি আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য নেই। এরা প্রায়ই একটা রং, যা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে ভিন্ন—বাছাই করে। সুস্থ মানসিক বিকাশের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঔজ্জ্বল্যহীন, নিষ্প্রাণ রঙের ব্যবহার দেখা যায়, উপরন্তু এদের অঙ্কিত চিত্র প্রায়ই খাপছাড়া।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণালী :—

(1) বয়স

(2) পারিবারিক ইতিহাস

(3) সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা

(4) উপসর্গ

(5) মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা

(ক) বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)

বাচনিক (কথিত ভাষা ও অবধারণ শক্তি)

শিল্পনৈপুণ্য

(6) রং ফলানোর বিশেষত্ব।

এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে উপসংহারে আসা যায় যে, চিত্রের মাধ্যমে শিশুমনের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। তাদের জগৎ, অভাব, অভিযোগ ও অভিলাষ, ভয়-ভাবনা এবং পরিবেশের সঙ্গে আপন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গতি সে প্রকাশ করে তার সৃষ্টির মাধ্যমে—যে সৃষ্টি তার নিজস্ব, তার অন্তরের রহস্য জগতের সত্য দর্শন।

পাশ্চাত্যে কম্পিউটারের সাহায্যে এখন হাজার হাজার রঙের প্রতিক্রিয়ার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে আর তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে চিকিৎসক, কর্ম-নিয়োগকর্তা প্রভৃতি। এমন কি, বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনেও এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সব রকম রঙের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, তাই কয়েকটি রঙের পরিসংখ্যানভিত্তিক উপসর্গ ও নিদান পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণালব্ধ ফলের আলোচনা করা হচ্ছে।

লাল—বিশুদ্ধ লাল রং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে 4500 মিশ্র লাল রঙের নিখুঁৎ জৈবিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়েছে। লাল রঙের সঙ্গে হলুদ বর্ণ মিশিয়ে জরদ লাল (রক্তিমাভ জরদ) করে ক্যানাডার অধ্যাপক Wolfarth তাঁর ছাত্রদের কয়েক মিনিট দেখতে বলেন। পরে তাদের নাড়ির গতি, রক্তচাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, তাদের জৈবিক প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। আবার এদের গাঢ় নীল বর্ণের দিকে দেখতে বলেন ও বিপরীত ফল পান অর্থাৎ জৈবিক প্রক্রিয়া শান্ত হয়ে আসে, নাড়ির গতি, রক্তচাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে আসে।

ক্যানাডার এই ছাত্রদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সর্বদেশে সর্বজাতিতে ও সকল সামাজিক স্তরে এক—এমন কি, প্রাণী-জগতেও এর তারতম্য দেখা যায় না।

আলজিরিয়ার গবেষক Benoit হাঁসের চোখ কালো কাপড়ে বেঁধে দেখলেন যে, তাদের মিলন-স্পৃহা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু লাল বা জরদ রং 120 ঘণ্টা ব্যবহার করে দেখেন যে, তাদের মুষ্কের পরিমাপ ও যৌন-প্রক্রিয়া প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন রঙের পরিবেশে বহু প্রাণী আপন রং বদল করে পরিবেশের সামঞ্জস্য-ভুক্ত হয়। কয়েক জাতীয় মৎস্য জলের গভীরতা অনুযায়ী রঙের সঙ্গে আপন রং খাপ খাইয়ে নেয়। চিংড়ি, এমন কি ব্যাংও খুব দ্রুত আপন রং বদ্‌লাতে পারে। কৃকলাসের রং বদল অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। Benoit-এর মতে, চোখ থেকে মস্তিষ্কে উত্তেজনাবাহী তন্তুর পরাবর্তে হাইপোফিসিস ও স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রবাহিত হয়। শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী লাল রংকে বলা হয় ergotropism আর নীল রঙের নিস্তেজনা সৃষ্টিকে বলা হয় trophotropism। হৃদ্‌রোগীরা উত্তেজক লাল রং সহ্য করে না। তাদের কাছে শান্ত গাঢ় নীল রং বেশী প্রিয়।

জরদ—লাল রঙের উত্তেজক যেমন মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার প্রেরণা জোগায়, তেমনই হলুদ মেশাতে মেশাতে শেষে তার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হয়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

জরদাভ লাল—জরদের সঙ্গে ঘোর লালের সংমিশ্রণে এই রং অস্থিরতা থেকে শান্তির অবস্থা সৃষ্টি করে। এই দুই মিশ্র রঙের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মনে হয় মিশ্রণের ফলে আদি রঙের মানসিক প্রভাব বিনষ্ট হয়। লাল রং উত্তেজনা ও আক্রমণাত্মক প্রভাববিশিষ্ট হলেও জরদাভ লাল শান্তি ও অসীম উল্লাসের দ্যোতক। সুতরাং রঙের বিচিত্র আকর্ষণ থেকে রোগীর মানসিক অবস্থা নির্ধারণ করা সম্ভব; অর্থাৎ যে জরদাভ লাল পছন্দ করে, সে উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এই ধারণা অস্বাভাবিক নয়।

নীলাভ লাল (বেগুনী)—বেগুনী রং লালের প্রভাবমুক্ত নয়। বেগুনীতে লালের উত্তেজনা সংযত হয়। এতে আসে জমক ও আভিজাত্য—আসে সম্মানিত আত্মতুষ্টি।

গোলাপী লাল—লালের সঙ্গে সাদা রঙের সংমিশ্রণের ফল। সাদা মুক্তির প্রতীক—লালের উত্তেজনা শক্তিকে নিষ্প্রভ করে মুক্ত শান্ত পরিবেশের সৃষ্টিকারী।

নীল -দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক শান্তির প্রতীক। মহাকবি কালিদাসের "তমাল তাল বনরাজি নীলা"—স্বভাবকবি গ্যেটের "Attractive Nothingness" অনন্ত নীল আকাশ, মহাসমুদ্রের গাঢ় নীল মনে উদাস ভাব জাগায়, নিরাসক্ত নির্বাচনের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

গাঢ় নীল—পরিপূর্ণ শান্তিতে দেহমন আচ্ছন্ন করে। নাড়ির গতি, রক্তচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস শ্লথ করে নিদ্রার আবেশ আনে। গাঢ় নীল শারীরিক বিশ্রাম আর মানসিক তুষ্টির নিয়ামক, মানসিক তুষ্টি, সুখ ও আনন্দের পরিবাহক। সুখ ও শান্তি পার্থিব সকল চিন্তা ভাবনার রক্ষাকবচ। গাঢ় নীল বিশ্বাস আনে—সকল ভাবনা চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সাংসারিক বিষয়বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটায়।

জার্মেনীতে চিনির মোড়ক তৈরি করে নীল কাগজে—নীল মিষ্টতার প্রতীক—মধুর পরিবেশের সহায়ক। পালি ভাষায় নীলা আর জার্মান ভাষায় Gemut—সৌহার্দ, সদ্ভাব ও সমাহিত অবস্থার দ্যোতক।

সরস্বতীর নীল বসন, মাতা মেরীর নীল পোষাক, আভিজাত্যের নীল রক্ত (Blue blood of nobility), প্রেম-ভালবাসার প্রতীক নীল পুষ্পদল সর্বকালে সর্বদেশে সমাদৃত।

স্থূলদেহীর প্রিয় নীল—এতে তাদের আত্ম-তুষ্টি আসে—অন্যের নজর এড়াবার প্রচেষ্টা বোঝায়। নীল রং বর্জনকারীদের শান্তি ও

স্নেহের অভাব বোঝায়। সহকর্মী বা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনাস্থা, ঘৃণা ও তার জীবনের উন্নতির বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে। সে প্রায়ই চপলমতি ও অস্থির। শিশুদের পাঠে অনীহা প্রকাশ করে। শান্ত নীলবর্জিত রঙের পরিবেশে প্রাপ্তবয়স্কের হৃদ্‌রোগ ও রক্ত পরিবহনের বৈকল্য সূচনা সম্ভব। শিশুদের পক্ষে অমনোযোগিতা, শিক্ষায় অনগ্রসরতা প্রভৃতি দেখা যায়।

সবুজ—সবুজ একটি মিশ্র রং—হলুদ ও নীল রঙের সংমিশ্রণ। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছুটি রঙের পরস্পর বিরোধী প্রবণতা সংঘর্ষে আপন বৈশিষ্ট্য হারায়—ফলে হয় পূর্ণ শান্তি ও স্থিতিস্থাপকতা। যাবতীয় রঙের মধ্যে সবুজ সবচেয়ে শান্ত রং। এই রং নেতিবাচক। আনন্দ, বিশ্বাস, ব্যথা কোন কিছুরই প্রকাশনা এতে নেই, কোন অর্থব্যঞ্জক ধর্মবিহীন, "এ যেন এক পরিপুষ্ট গাভী যে উদাস নেত্রে রোমন্থন করে চলে"—বলেছেন Kandinsky।

গ্যেটে তাঁর "Discourse on colours"-এ বলেছেন এই রং চোখে আনে শান্তি। দুটি মিশ্র রং এক হয়ে ধরা দেয় এবং আদি রং দুটি বৈশিষ্ট্য হারায়—এর বেশী কিছু নয়—না আশা, না আকাঙ্ক্ষা। হলুদের উত্তেজক ও আক্রমণাত্মক শক্তি, নীলের শান্ত সমাহিত ধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিপরীত ধর্ম বজায় রাখে সবুজের মধ্যে। সবুজ স্থিতিশীল—সবুজের শক্তি প্রচ্ছন্ন, এর গতি শক্তি নেই।

Kandinsky আরও বলেন, সবুজ নির্ভরশীল, কিন্তু অনেকে মনে করেন সবুজ নির্ভরশীল নয়, স্থিতিশীল। অণু যেমন বিভাজনশীল, তেমনই সবুজকেও ভাগ করে এর ধর্ম নিরূপণ করা সম্ভব, যদিও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা ও প্রবণতা খুব স্পষ্ট। সবুজে বেশী নীল মেশালে মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এর দৃঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শান্ত ভাবও বেড়ে যায়। আবার বেশী হলুদ মিশ্রণের ফলে আরও বেশী কোমল, ভদ্র, আবেগময়, অলস ও সৌহার্দের আবেশ আনে।

সবুজাভ নীল (Turquoise) নীলকান্ত মণি—সবচেয়ে মনোমত তাজা রং। গ্রীষ্মপ্রধান বদ্ধ হাওয়ায়, শ্বাসরোধকারী উত্তপ্ত ও ক্লান্ত চোখে স্নেহের স্পর্শ আনে। তাই বাসগৃহ, শীতল পানীয়, প্রসাধনদ্রব্যের মোড়ক, দাঁতের মাজন ইত্যাদিতে এর প্রচলন এত বেশী। এর পরিশোধন গুণ লক্ষণীয় এবং জীবাণু ধ্বংসকারী শক্তিও এই রঙের আছে।

সবুজের মনোবিশ্লেষণ—Ego—অহংভাবের প্রতীক। Kandinsky বিশুদ্ধ সবুজকে মধ্যবিত্তের সঙ্গে তুলনা করেন। বিশুদ্ধ সবুজ নীলাভ সবুজের মত আরোহী নয়, আবার অবরোহীও নয়—কেন্দ্রীভূত নিরাপত্তার নিরাপদ আশ্রয়। ছোট ছোট কর্মধারায় পৃথিবীর প্রতিটি লোকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে সক্ষম। সবুজ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার প্রতীক। বিশিষ্ট করিতকর্মা ও পাগলেরা সবুজ সহ্য করতে পারে না।

নীলাভ সবুজের ভক্তদের মানসিক বা জৈবিক আবেগপ্রবণতা যদি তারা কোনক্রমে জয় করতে পারে, তবে তারা ঐ রঙের আসক্তি সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করে ঐ রঙকেই কঠিন, নিষ্ঠুর ও বিষাক্ত জ্ঞান করতে থাকে। হাসপাতালে এই সব রোগী রেখে রঙের প্রভাব অনুধাবনের ফলে যদি দেখা যায় যে, এদের নীলাভ সবুজের প্রতি আসক্তি ও আস্থা ফিরে আসছে, তবে সেটা তাদের মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত সূচিত করে। হৃদ্‌রোগীরা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধের ফলে মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই নীলাভ সবুজের উপর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ প্রকাশ করে, যা দেখে চিকিৎসকের সাবধান হওয়া উচিত।

হলুদ—সবুজ ও জরদ বা লালের সংমিশ্রণে হলুদ বর্ণ হয়। লালের উত্তেজনা ও সবুজের

আবেগ এই রঙের বিশেষত্ব, কিন্তু যেমন লাল ও সবুজের সংমিশ্রণে তৃতীয় রঙের উৎপত্তি হয়, তেমনই এর মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতিতে অন্য বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

হলুদ রঙের মানস ভিত্তিক অর্থ—প্রকাশনা। উন্নয়ন ও প্রসারধর্মিতা, আশা ও আনন্দের সম্ভবনায় সমুজ্জল। অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানকামী মুক্তির পথ নির্দেশক। অবসাদ ও হতাশায় নিমজ্জমান ব্যক্তি মুক্তির আশ্বাস পায় এই রঙে। গার্হস্থ্য ধর্মে বঞ্চিত বা বীতরাগবিশিষ্ট সুদূর প্রবাসীর প্রিয় এই রং। আধ্যাত্মবাদী জ্ঞান-যোগীরা এই রং পছন্দ করে। সন্ন্যাসীদের গৈরিক বসন, শিবাজীর গৈরিক পতাকা, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের গৈরিক বেশবাস, যীশু খৃষ্টের মূর্তির মাথার উপর হলুদ জ্যোতির্মণ্ডল, পীতবসন বনমালীর প্রতি আকৃষ্ট ভক্তমণ্ডলী এর সাক্ষ্য বহন করে। কখনও বাসনা-কামনার চরম আশায় বঞ্চিতের ক্ষোভ ও হিংসার প্রকাশ পায় হলুদ-প্রীতিতে—' The yellow of envy."

আশাবাদীর পছন্দ হলুদ বর্ণ, আশাহতের কাছে বা বর্জনীয়। দুই শত পুরাতন মস্তপের কাছে হলুদ বর্ণ অপ্রীতিকর বিবেচিত হয়েছিল। এদের পছন্দ বেগুনী রং। হলুদ বর্ণ বর্জনকারী আশাহতেরা হতাশাকে মেনে নেয় না বরং সঞ্চিত ক্ষোভের প্রভাবে অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। রং নির্বাচনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই বিষয় অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, চরম হতাশার মুহূর্তে শেষ অবলম্বন হিসাবে হলুদ রং বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হয়েছে। 1890 খৃষ্টাব্দে ভ্যানগঘের শেষ চিত্র 'সোনালী গমের ক্ষেতের উপর বিদ্যুদ্দাম বিকশিত কালো মেঘের নীচে উড্ডীয়মান কাকের ছবি'—অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করছে। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের অলক্ষ সম্ভাবনার প্রতীকও হলুদ বর্ণ।

মৌলিক বা মিশ্রিত রঙের সংখ্যাতিরিক্তের জন্যে সব রকম রঙের মানসিক প্রতিফলন বর্ণনা প্রায় অসম্ভব, তবে মিশ্র রঙের মধ্যে মৌলিক রং আপন আপন বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত। যতদূর জানি, রং নিয়ে কোন মৌলিক গবেষণা এপর্যন্ত আমাদের দেশে হয় নি।

পুস্তক-পরিচয়

1. অপরাধ-জগতের ভাষা—শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ; মূল্য—পাঁচ টাকা।

2. অপরাধ-জগতের শব্দকোষ—শ্রীভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ; মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রকাশক—নবভারত পাবলিশার্স, 72, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

কলিকাতা সরকারী সংস্কৃত-মহাবিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্রভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক প্রীতিভাজন ডক্টর শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক সম্প্রতি (আশ্বিন 1378) দুইখানি অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বই দুইখানি হইতেছে (1) "অপরাধ-জগতের ভাষা", এবং (2) "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ"। দুইখানি বইই কলিকাতা 72 মহাত্মা গান্ধী রোড হইতে "নবভারত প্রকাশকমণ্ডলী" কর্তৃক প্রকাশিত, এবং মুদ্রণের পারিপাট্যে ও সজ্জার সৌন্দর্য্যে বিশেষ লক্ষণীয়—বিশেষতঃ "অপরাধ-জগতের শব্দকোষ" বইখানি সুন্দর পকেট-বইয়ের আকারে সুদৃশ্য বাঁধাইয়ে প্রকাশিত হইয়া দর্শন-মাত্রেই আমাদের আকৃষ্ট করে, এবং অভিধানের মত বই যাহার রস বিশেষজ্ঞগণেরই পক্ষে গ্রহণীয় তাহাকেও যেন সকলের নিকট সুখপাঠ্য করিয়া তোলে। বই দুইখানি বিষয়-বস্তুতে বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণরূপে নূতন। অপরাধ-জগতের মানুষ, চোর-ছেঁচড় 'ডাকাত খুনে' পকেট-মার, ছেলে-ধরা, মেয়ে-ধরা সমাজে ঘৃণ্য হইলেও, ইহাদের জীবন-যাত্রা চাল-চলন, রীতি-নীতি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইবার আগ্রহ নিরীহ নাগরিক সজ্জনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়—এই আগ্রহ কেন দেখা দেয় তাহা অবশ্য মনস্তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই আগ্রহ হইতেই সাধারণ্যে প্রচলিত Crime fiction, Detective stories ইত্যাদির উৎপত্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ধরণের সাহিত্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে। লোকে পড়ে খুব, অনেকে পড়িতেও ভালবাসে। কিন্তু এইরূপ সাহিত্য বিশেষরূপে প্রচলিত, এমন কি, জনপ্রিয় হইলেও, "সৎসাহিত্য" বলিতে যাহা আমরা বুঝি, সেই পর্যায়ে ইহা কখনও উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্ভুত প্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টির ফলে ইংরেজ লেখক Conan Doyle-এর মত সাহিত্যকার যে-সমস্ত চমকপ্রদ ঘটনা যে সমস্ত রহস্য বা ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, Sherlock Holmes-এর মত যেসমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির আধার বা পরিবেশ হইতেছে সমাজ-বিরোধী অপরাধ, সন্দেহ নাই ; কিন্তু এগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে—"দশম রস" যাহাকে বলিতে পারা যায় সেই "রহস্য রস" যেন এইসব রচনায় আবির্ভূত হইয়াছে। এই "রহস্য-রস" বা "রহস্য-বোধ" কেবল sense of mystery অজানার জন্য আকূতি নহে, ইহা হইতেছে sense of the uncanny and mysterious, ভুতুড়ে রহস্য,—ইহা ভীতি, ঘৃণা, জুগুপ্সা ও কৌতূহল মিশ্র এক অভিনব সাহিত্য-রস। লোকে যে জন্য ভূতের গল্প শুনিতে চাহে, গোয়েন্দার গল্প, চোর-ডাকাতের গল্প শুনিবার আগ্রহও সেই প্রকারের। ইহা নিছক্ চিত্ত-বিনোদনের জন্য। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান—Criminology—কেন মানুষ অন্যায় অপরাধ, অনুচিত ব্যবহার, সমাজবিরোধী কাজ করে, তাহার আলোচনা, অপরাধ-প্রবণতার উদ্ভব

এবং নিরোধ—ইহা মানব মন এবং মানব প্রচেষ্টার সম্বন্ধে তত্ত্ব-নির্ধারণের একটি বৈজ্ঞানিক পন্থা। এবিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কিছু অভিজ্ঞতার আধারে স্থাপিত বিচার ও গবেষণা হইয়াছে। বিখ্যাত পুলিস-কর্মচারী, কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার ডক্টর পঞ্চানন ঘোষালের গ্রন্থ ও নিবন্ধাবলীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁহার ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান লইয়া অপরাধ-জগতের লোকেদের চিন্তা ও কর্মের পরিচায়ক তাহাদের নিজেদের মধ্যে বাহিরের লোকের কাছ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত "ঠার" বা বিশেষ শব্দের সংগ্রহ, আলোচনা ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমার জ্ঞান-গোচর মত, শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদের পূর্বে এই কার্যে আর কেহ অবতীর্ণ হন নাই। ইনি কয়েক বৎসর যাবৎ এই গবেষণায় ও শব্দ সংগ্রহে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছেন। পশ্চিম বাঙ্গালায় সমাজ-বিরোধী নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিয়া তাহাদের ভাষা আয়ত্ত করিবার সার্থক প্রয়াস করিয়াছেন, জেল-খানার ভিতরে গিয়া কলিকাতায় ও অন্যত্র ইহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। কোথাও, কোথাও ইহাদের মধ্যে বিরূপ ভাব পাইলেও সাধারণতঃ ইঁহার সংগ্রহ-কার্য্য ভালই হইয়াছে বলিতে হয়। ইহা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অপরিহার্য্য অঙ্গ বা আধার—Field work বা খোলা মাঠে খোঁজ করা, কেবল কেদারায় বসিয়া পুস্তকাগারের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া পিষ্ট পেষণ করিয়া গবেষণা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া নহে। বই দুইখানি দেখিয়া আমি সত্যসত্যই খুব আনন্দ লাভ করিয়াছি, এবং শ্রীমান্ ভক্তি প্রসাদকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভি-নন্দন জানাইতেছি। সাধারণ মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙ্গালী পাঠক "শব্দকোষ" খানি হইতে প্রচুর তথ্য ও অভিজ্ঞতা—কি করিয়া ভাষাকে বাঁকাইয়া মুচড়াইয়া সমাজ-বিরোধী মানব-শ্রেণী নিজের গুপ্ত উদ্দেশ্যের পক্ষে কার্য্যকর করিয়া লয়—তাহা লাভ করিবেন। কোথাও-কোথাও বা এই সমস্ত শব্দ ও সেগুলির অর্থের প্রসার বা সঙ্কোচ বা বিকাশ দেখিয়াও চমৎকৃত হইবেন। "শব্দকোষ" বইখানিতে যে-সব শব্দ স্থান পাইয়াছে, সংগ্রহকার তাহার পরিধির সম্বন্ধে ঠিকভাবেই আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন—এগুলি মুখ্যতঃ পশ্চিম বঙ্গের (ও কলিকাতা শহরের বিশেষ করিয়া) সমাজ-বিরোধী জনগণের মধ্যে প্রচলিত শব্দ। বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা এই দলে যথেষ্ট পরিমাণে তাহারা থাকিলেও, বিহারী হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষাভাষীরাই দলে ভারী, এবং প্রভাবশীল। সংগৃহীত শব্দাবলীর সংখ্যা, বিভিন্ন শ্রেণীর অপরাধীদের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দের আপেক্ষিক অনুপাত-সংখ্যাও সংগ্রাহক অঙ্ক করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। প্রায় 3000 শব্দ এই শব্দকোষের মধ্যে স্থান পাইয়াছে—সংখ্যায় নগণ্য নহে। শব্দগুলি অ-কারাদি ক্রমে সাজানো হইয়াছে, এবং সবচেয়ে মূল্যবান কথা এই—সংগ্রাহক যথাশক্তি প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি জানাইবার প্রয়াস করিয়াছেন। উপরন্তু বিভিন্ন অর্থে একটি শব্দ প্রযুক্ত হইলে, সেইসব বিভিন্ন অর্থ প্রয়োগ হইতে দেখাইয়াছেন—ইহাতে

অপরাধ-জগতের ভাষায় একটি বিশিষ্ট ছাপ বা ধাঁচ পাওয়া যাইবে। একটি গ্রন্থপঞ্জী এবং সাংকেতিক চিহ্নাদির ব্যাখ্যা এই শব্দকোষের মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

"অপরাধ-জগতের ভাষা" শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের নিজ মৌলিক ভাষাতত্ত্ব-মূলক গবেষণার ফল। এই বইও বাঙ্গালায় একবারে নূতন। ইহার আবেদন বা আকর্ষণ অবশ্য প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব-রসিকদের জন্য, বাঙ্গালা বাক্‌তত্ত্বের অনুশীলকদের জন্য। কিন্তু সাধারণ পাঠকও উহা হইতে প্রচুর কৌতুক ও আনন্দের উপাদান পাইবেন। এই বইয়ের প্রথমে যে "সূচনা", "পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ", "নিষেধ ও কুসংস্কার", "ইঙ্গিত" ও "ভাষার কারিকুরি" শীর্ষক প্রসঙ্গগুলি আছে, সেগুলি অতি উপাদেয়—ভাব ও তথ্য উভয়েই সমৃদ্ধ—বিশেষতঃ প্রথম দুইটি প্রসঙ্গকে অপরাধ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন উপাদান আনিয়া দিয়াছে বলা যায়। শেষ প্রসঙ্গটিতে বহু শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে চিত্তাকর্ষক আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরেকার প্রসঙ্গ—"ধ্বনিতত্ত্ব" (Phonetics and Phonology), "রূপতত্ত্ব" (Morphology) এবং "শব্দার্থতত্ত্ব" (Semantics বা Semasiology)। বাক্‌তত্ত্বের শাস্ত্র মতে, অপরাধ-জগতের ভাষার বিশ্লেষণ ও আলোচনা যুক্তিযুক্তভাবে করা হইয়াছে। এই বইখানিতে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদ যে একাধারে মানব-প্রেমী, সমাজের সবদিকের প্রতি যে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও হিতৈষণা-মূলক আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ইহার গ্রন্থ-পঞ্জীও উল্লেখনীয়।

দুইখানি বই পরস্পরের পরিপূরক। বই দুইখানি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়াছি। পাঠ করিয়া নূতন তথ্য পাইয়াছি এবং মনে মনে শ্রীমান্ ভক্তিপ্রসাদকে সাধুবাদ দিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইকে বাঙ্গালী পাঠক সাদরে গ্রহণ করিবে। বাঙ্গালা ভাষার একটি অবহেলিত অঙ্গের প্রতি ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ ইহার মাধ্যমে স্বীকৃত হইবে, এবং দেশবাসীর নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া গ্রন্থকার তাঁহার আরব্ধ সংগ্রহ, বিচার ও গবেষণার ক্ষেত্রে আরও নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্ব চয়ন ও দর্শন করিয়া মাতৃভাষার তথা ভারতীয় মানবিকী বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইতি 9 পৌষ 1378, 25 ডিসেম্বর 1971 (যীশুর জন্মদিন—"বড়দিন")॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা
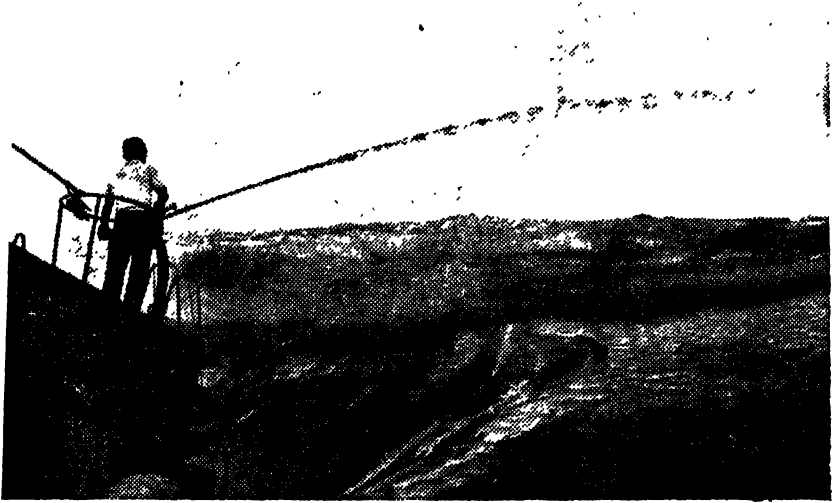
মরুভূমির আক্রমণ থেকে উর্বরা জমি রক্ষা করবার অভিনব ব্যবস্থা

মরুভূমি সংলগ্ন উর্বরা জমি ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে থাকে। মরু অঞ্চলের এরূপ বিস্তৃতি প্রতিরোধ করবার জন্যে অনেক দিন থেকেই নানা রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। সম্প্রতি লিবিয়ার জেফারা অঞ্চলের 400 একর জমিকে নমনীয় একপ্রকার কৃত্রিম রবারের আস্তরণ দিয়ে সাহারা মরুভূমির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এখন সেখানে 60,000 ইউক্যালিপ্টাস গাছ জন্মানো হয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে—সংশ্লেষিত রবারের রসের সঙ্গে একরকম খনিজ তেলের মিশ্রণে তৈরি Unisol নামক একপ্রকার তরল পদার্থ জমিতে স্প্রে করা হচ্ছে। এর ফলে খনিজ পদার্থমিশ্রিত জলীয় অংশ বালির বন্ধনশক্তি বাড়িয়ে তোলে এবং ঝরা পাতাগুলি ক্রমশঃ বালির সঙ্গে মিশে গিয়ে উদ্ভিদগুলির পুষ্টির জন্যে উদ্ভিজ্জ সার তৈরি করে।

আকাশের দিকে কিছুক্ষণ

সবার মাথার উপরেই আকাশ আছে। কিন্তু বড় বড় বিজ্ঞানীরা এমন সব কঠিন কঠিন ব্যাপার আকাশ সম্বন্ধে বলেন—মাঝে মাঝে মনে হয়, তারা-ভর্তি আকাশটা বুঝি আমাদের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যাদের আকাশ দেখবার সুযোগ নেই, কেউ তাদের পাত্তা দিতে চায় না। তাই এবার আমরা যদি ঠিক করি, ওই আকাশটা কারও একচেটে হতে দেব না, তবে আকাশ-পাগল বিজ্ঞানীরা ছাড়া বোধ হয় অনেকেই তোমরা এগিয়ে আসবে। তথাপি তোমরা, যারা এখনও বড় হবার ছাড়পত্র পাও নি, ইচ্ছা করলে অনেকেই রাতের আকাশের দিকে খালি চোখে তাকিয়েই গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অবস্থান ও তাদের পরিচয় পেয়ে প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করতে পারবে।
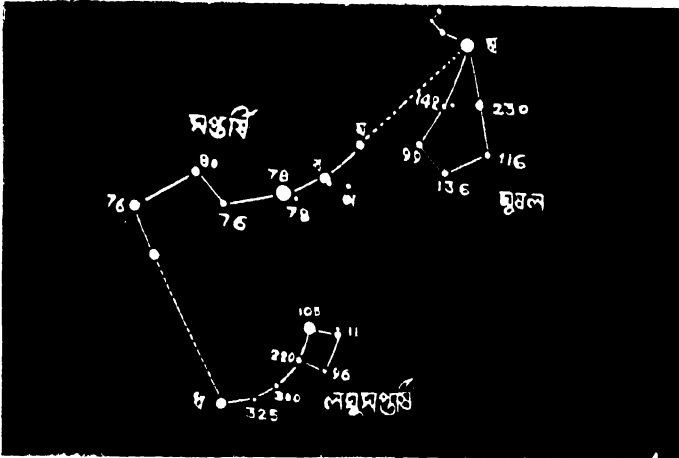
নক্ষত্রমণ্ডলের চিত্র

ধরা যাক, ঠিক উত্তর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। মনে হবে—সমস্ত আকাশটা একটা কালো রঙের গোলক, আর তার গায়ে বিভিন্ন নক্ষত্রগুলি ছবির মত সাজানো রয়েছে। রাত যত বাড়বে, সমস্ত ছবিটা সরতে থাকবে। যে নক্ষত্রটি ছিল মাথার উপর আরও পরে সেটা হেলে পড়বে পশ্চিম দিকে। এটা হয় পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্যে। ঠিক উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে, সবাই নড়লো—সব ছবি সরে গেল, শুধু একটি নক্ষত্র যেমন-কে-তেমন রয়ে গেল। এটিই ধ্রুবতারা বা Polaris। প্রাচীন কাল থেকেই নাবিককে, গ্রামের মানুষকে রাতে পথ দেখিয়েছে ধ্রুবতারা

(চিত্রে ধ)। কারণ ধ্রুবতারা মিলিয়ে যায় দিনের আলোতে, কিন্তু কখনো অস্ত যায় না—এক জায়গা থেকে নড়ে না। কার্যক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, এটি পৃথিবীর কাল্পনিক অক্ষরেখার ঠিক উত্তর প্রান্তে আছে (যদিও সঠিক গাণিতিক হিসাবে ধ্রুবতারা ঠিক উত্তর মেরু বিন্দু থেকে 1° সরে আছে)। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সাজানো ছবিটা দেখতে হলে তাই ধ্রুবতারা দিয়ে সুরু করাই ভাল।

এই ধ্রুবতারাকে নির্দেশ করছে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের (?) মত নক্ষত্রমণ্ডলের দুটি নক্ষত্র (এদের নির্দেশক বা Pointers বলে)। এই নক্ষত্রমণ্ডলটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত সপ্তর্ষিমণ্ডল। এখানে যে নক্ষত্রের মানচিত্র দেওয়া হয়েছে, এবার যদি তোমরা উত্তর দিকের আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ—তাহলে তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল ছবির মতই ফুটে উঠবে। সপ্তর্ষিমণ্ডল, লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল ও মুষল বা মুদ্গরমণ্ডল। প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ছাড়াও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় যাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বলা হয়, প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যায় বর্ণিত Ursa Major বা Great Bear বা বড় ভালুকের তা একটি খণ্ডাংশ মাত্র। ইংরেজীতে আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডলকে Plough বা Big Dipper বলে। সাতজন প্রাচীন ঋষির নামে সাতটি নক্ষত্র—অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরিচি-কে নিয়ে এই নক্ষত্রমণ্ডলটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের (?) আকারে গঠিত। আরও কয়েকটি নক্ষত্র সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটিকে নিয়ে একটি বিরাট ভালুকের আকার কল্পনা করা হয় Ursa Major বা Great Bear নক্ষত্রমণ্ডলটিকে। এই চিত্রে শুধু Plough দেখানো হয়েছে। গ্রীসের প্রাচীন ধর্মোপকথার ক্যালিস্তোর সঙ্গে মূল নক্ষত্রমণ্ডলটির সম্পর্ক আছে। বড় ভালুক-এর কয়েকটি নক্ষত্র নিয়ে একটি গতিশীল তারকাপুঞ্জ (Moving star cluster) গঠিত হয়েছে; অর্থাৎ সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আজ যেমন দেখাচ্ছে, কয়েক লক্ষ বছর পরে তেমন দেখাবে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নক্ষত্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটির একটি আপেক্ষিক গতিবেগ আছে। কাজেই ভবিষ্যতের সপ্তর্ষিমণ্ডল জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত দেখাবে না।

বড় ভালুক-এ একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ হলো, পেচক নীহারিকা নামে একটি গ্রহ-নীহারিকা (Planetary nebula)। অবশ্য পেচক নীহারিকা বা Owl nebula এত ক্ষীণ যে, ভাল দূরবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। তবে খালি চোখে আমরা যা দেখতে পাই, তা হলো বশিষ্ঠ নক্ষত্রের (চিত্রে ব) বর্ণালীয়-যুগ্ম (Spectroscopic doubles)। সাধারণভাবে বশিষ্ঠ (ব) একটি মাত্র নক্ষত্র মনে হয় এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় একে আলাদা করা হয় নি। চিত্রে যেমন আছে (প্রতি নক্ষত্রের পাশের সংখ্যাটি পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব আলোক বর্ষে। এক আলোক বর্ষ $=9{\cdot}46\times10^{12}$

কিলোমিটার বা 6-এর পিঠে 12টি শূন্য মাইল।), তার বড়টি Mizar নামে বিখ্যাত। 1889 সালে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব জানা যায়, আর তারও পরে তৃতীয় আরও একটির অস্তিত্ব জানা সম্ভব হয়। এই যুগ্ম নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে 78 থেকে 80 আলোক বর্ষ দূরে আছে। বশিষ্ঠের (ব) ক্ষুদ্র নক্ষত্রটির নাম Alcor বা সওয়ার। Mizar থেকে এটি 11·5 মিনিট বৃত্তচাপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন (তুলনা করা যায়, চন্দ্রের ব্যাস হলো 31 মিনিট বৃত্তচাপ) আর পৃথিবী থেকে 80 আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। খুব নিবিষ্টভাবে দেখলে খালি চোখেই এদের আলাদা করা যায়। 1908 সালে জানা যায়, সওয়ার নক্ষত্রটি নিজেই একটি বর্ণালীয় যুগ্ম। সমগ্র আকাশের উত্তর গোলার্ধে বশিষ্ঠই (ব) একমাত্র জটিল বর্ণালীয় যুগ্ম, যা খালি চোখে দেখা সম্ভব। বশিষ্ঠের একটু দূরেই ছোট্ট নক্ষত্রটির নাম অরুন্ধতী (অ), প্রাচীন উপাখ্যানে ঋষি বশিষ্ঠের স্ত্রী। এঁরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি থেকেও কোন দিন মিলিত হতে পারবে না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ নক্ষত্রটি মরিচি (ম) পৃথিবী থেকে 163 আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। বশিষ্ঠ (ব) ও মরিচি (ম)-কে একটি কাল্পনিক সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে রেখাটিকে আরও কিছুটা বর্ধিত করলে অতি উজ্জ্বল ঈষৎ হলুদ রঙের স্বাতীনক্ষত্র (স্ব) বা Arcturus-এর ঠিকানা মিলবে। স্বাতী নক্ষত্রের (স্ব) ব্যাস সূর্যের ব্যাসের চেয়ে প্রায় 23 গুণ বড়। পৃথিবী থেকে স্বাতীর দূরত্ব 35 আলোক বর্ষ, আপেক্ষিকভাবে আমাদের বেশ কাছেই বলতে হবে। স্বাতীর (স্ব) মূল নক্ষত্রমণ্ডলটি হলো মুষলমণ্ডল, অনেকটা গদার মত দেখতে। কয়েকটি বাড়্তি ক্ষীণ নক্ষত্র নিয়ে ল্যাটিন Bootes (বুটিস) নক্ষত্রমণ্ডলের চেহারা হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার মুষল বা মুদ্গর থেকে সামান্য ভিন্ন (চিত্রে মুষলকেই দেখানো হয়েছে)। স্বাতীই (স্ব) মুষল বা Bootes-এর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। শুধু চোখে না দেখা গেলে জেনে রাখা ভাল, মুষলে যুগ্ম-তারার ছড়াছড়ি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পৃথিবী থেকে 230 আলোক বর্ষ দূরের নক্ষত্র, আরবী নাম Izar। হলুদ রঙের Izar আসলে নক্ষত্র-ত্রয়ী। বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এর যুগ্মটিকে এত সুন্দর দেখায় যে, যুগ্মটিকে পুলচেররিমা (দারুণ সুন্দর) বলা হয়।

ধ্রুবতারা (ধ) ও আরও ছয়টি ক্ষীণ নক্ষত্র নিয়ে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল গঠিত। মণ্ডলটির অপর নাম Ursa Minor ও Little Bear বা ছোট ভালুক। সাতটি তারার মধ্যে ধ্রুবতারা বা Polaris সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নক্ষত্রটির অপর নাম গ্রীক ভাষায় সাইনোসুরা (Cynosura), যার অর্থ কুকুরের লেজ। ধ্রুবতারা (ধ) পৃথিবা থেকে 470 আলোক বর্ষ দূরে ও এটি একটি চল-নক্ষত্র (Variable Star)। 31·97 দিনে বা প্রায় এক মাসে এর উজ্জ্বলতা 2·1 থেকে 2·2 তফাৎ হয়। আরও মজার জিনিষ হলো, আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ধ্রুবতারায় একটি নক্ষত্র-যুগ্ম, এমন কি—তৃতীয় একটি যুগ্মাংশও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নাবিকদের

সমুদ্রযাত্রার দিক নির্দেশক হিসাবে ধ্রুবতারার গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমির কোনও বিন্দু ও ধ্রুবতারার সংযোজক সরলরেখা ভূমির সঙ্গে যত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে, ভূমির সেই বিন্দু বা স্থানের অক্ষাংশও তত ডিগ্রী। লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডলের ষষ্ঠ নক্ষত্রটি Pherkad পৃথিবী থেকে 180 আলোক বর্ষ দূরে আরও একটি নক্ষত্র ক্ষীণভাবে—কিন্তু মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে প্রথমটির সঙ্গে, যেটি নিজে পৃথিবী থেকে মাত্র 11 আলোক বর্ষ দূরে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

প্রাথমিকভাবে এই তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল দিয়ে আকাশে কিছুক্ষণ তাকানো সুরু করা যায়। বলে রাখা প্রয়োজন, এর চেয়ে আরও বিস্তৃতভাবে অনেক কিছুই জানবার আছে।

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

স্মৃতি-কণিকা

কারো মেধা ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হলে আমরা সবাই তাকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলে থাকি। অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন লোক পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মেছেন। অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদেরও অনেক সময় দেখা গেছে, তাদের স্মরণশক্তি প্রখর নয়। প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। প্রতিভার ব্যাপারটা অবশ্য এখনও অনেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করলেও স্মরণশক্তিকে তাঁরা সেরূপ কিছু মনে করেন না।

কোনও কিছু স্মরণ করবার আগে সুস্পষ্ট তিনটি ঘটনা ঘটে। প্রথমে মস্তিষ্কে তথ্যটা ঢোকে, সেখানে সেটা জমা হয় এবং পরে সেটা মনে পড়ে। এই ঘটনাগুলি পর পর ঘটে যায়, যদিও কেমন করে ঘটে, তা সুস্পষ্ট নয়। মাত্র কিছুদিন আগেও ধারণা ছিল, স্মরণের তথ্যগুলি বৈদ্যুতিক উপায়ে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়।

মানুষের মস্তিষ্ককে অনেকটা কম্পিউটার মেসিনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হিসেব করে দেখা গেছে, একটা মানুষের স্মরণশক্তিকে কম্পিউটারে ধরে রাখতে গেলে যতটা ম্যাগ্‌নেটিক টেপ লাগবে, তার পরিমাপ সারা পৃথিবীর পরিমাপের সমান।

মস্তিষ্কের এই স্মরণশক্তিকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে তামাম দুনিয়ায় বড় বড় মস্তিষ্ক কাজ করে চলছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, স্মৃতিশক্তির ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে একটি রাসায়নিক ঘটনা এবং এর স্বপক্ষে তাদের যথেষ্ট যুক্তিও আছে। প্রজনন-ক্ষমতা যদি কোষের কিছু অণুর ভিতরের নিউক্লিয়াসে থাকতে পারে, তবে সাধারণ স্মরণ শক্তিই বা মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে জমা থাকবে না কেন?

স্মৃতিশক্তিকে ধরে রাখে যে সব রাসায়নিক পদার্থ, তাদের আশ্চর্য উপায়ে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক থেকে কেবল পৃথকই করেন নি—কৃত্রিম উপায়ে এদের গবেষণাগারে উৎপাদন করতেও সক্ষম হয়েছেন। কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন, স্মরণশক্তি আর. এন. এ. (R. N. A) অণুর মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। এই R. N. A অণু আবার প্রজননকার্যে D. N. A নিউক্লিক অ্যাসিডের মাধ্যমে তাদের দরকারী কাজগুলি সম্পন্ন করে। স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়েছে, এরূপ কিছু লোককে R. N. A রাসায়নিকের সাহায্যে চিকিৎসা করে সুফল পাওয়া গেছে। শুধুমাত্র R. N. A-ই নয়—বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিভিন্ন স্মরণশক্তি বিভিন্ন রাসায়নিকের মধ্যে নিহিত থাকে। তাই যদি হয় ও তাদের যদি পৃথক করা সম্ভব হয় এবং কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে প্রস্তুত করা যায়, তবে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

স্কেলের সাহায্যে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়

পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের অনেক রকম পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই সকল পরিচিত পদ্ধতিতে আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে উদস্থৈতিক তুলাযন্ত্র, আপেক্ষিক গুরুত্ব বোতল, হাইড্রোমিটার, হেয়ার যন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফলে এই সকল যন্ত্রপাতির অভাবে আমরা পরীক্ষাগার ছাড়া অন্যত্র পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। কিন্তু নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন রকম যন্ত্রপাতি বা বাটখারার সাহায্য না লইয়া কেবল একটি স্কেলের সাহায্যে অতি সহজে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। নিম্নে কেবল জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ এবং তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব কিভাবে স্কেলের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইল।

স্কেলের সাহায্যে জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ এবং তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হইল—(1) একটি স্কেল, (2) সুতা, (3) একটি জলপূর্ণ পাত্র, (4) একটি পরীক্ষাধীন তরল পদার্থে পূর্ণ পাত্র, (5) পরীক্ষাধীন কঠিন পদার্থ, (6) একটি ভারী পদার্থ (পরীক্ষাধীন পদার্থের ওজনের কাছাকাছি ওজনের যে কোন কঠিন পদার্থ), (7) স্ট্যাণ্ড, (8) একটি দণ্ড (বড় স্কেলের অভাবে)।

সমআয়তনের একটি প্রামাণিক পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থ যতগুণ ভারী বা হাল্কা, তাহাকে ঐ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে 4^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বিশুদ্ধ জলকে প্রামাণিক পদার্থ ধরা হয়। সুতরাং কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রে

$$\text{আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{পদার্থের ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় সমআয়তন জলের ভর}}$$

মনে করা হইল বায়ুতে পদার্থের ভর $= m_1$ gm.

জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পদার্থের ভর $= m_2$ gm.

তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় পদার্থের ভর $= m_3$ gm.

$\therefore$ বস্তু কর্তৃক অপসারিত সমআয়তন জলের ভর $= (m_1 - m_2)$ gm.

এবং বস্তু কর্তৃক অপসারিত সমআয়তন তরলের ভর $= (m_1 - m_3)$ gm.

$$\therefore \text{ কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{বস্তুর ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সমআয়তন জলের ভর}}$$

$$= \frac{m_1}{m_1 - m_2}$$

$$\text{ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = \frac{\text{তরলের ভর}}{4^0 \text{ সেন্টিগ্রেড তারমাত্রায় তরলের সমআয়তন জলের ভর}}$$

$$= \frac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2}$$

এইবার প্রথমে জল অপেক্ষা ভারী ও জলে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হইবে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। স্ট্যাণ্ডের C বিন্দু হইতে CO সূতার দ্বারা AB স্কেল (বড় স্কেল সম্ভব না হইলে সরল দণ্ড) অনুভূমিকভাবে ঝুলিতেছে। B বিন্দুতে পরীক্ষাধীন বস্তুকে সুতার দ্বারা ঝুলানো হইল। এখন স্কেলকে অনুভূমিক করিবার জন্য পরীক্ষাধীন ওজনের কাছাকাছি ওজনের কঠিন পদার্থটি A বিন্দু হইতে সূতার দ্বারা ঝুলানো হইল। এখন পরীক্ষাধীন বস্তুকে একটি জলপূর্ণ পাত্রে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করা হইল। ফলে পরীক্ষাধীন বস্তুর উপর একটি ঊর্ধ্বচাপ পড়িবে এবং স্কেল আর অনুভূমিক থাকিবে না। A বিন্দুতে ঝুলানো বস্তুকে A_1-তে সরাইলে যেন পুনরায় স্কেল অনুভূমিক হইল। স্কেলের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে AO, A_1O ও BO পাঠ করা হইল।

গণনা—মনে করিলাম $AO = l_1$cm, $A_1O = l'_1$cm, $OB = l$cm,

ধরা যাক, A হইতে ঝুলানো পদার্থটির ভর = W gm,
বায়ুতে পরীক্ষাধীন কঠিন পদার্থটির ভর = m_1 gm.
ও জলে নিমজ্জিত অবস্থায় কঠিন পদার্থটির ভর = m_2 gm.
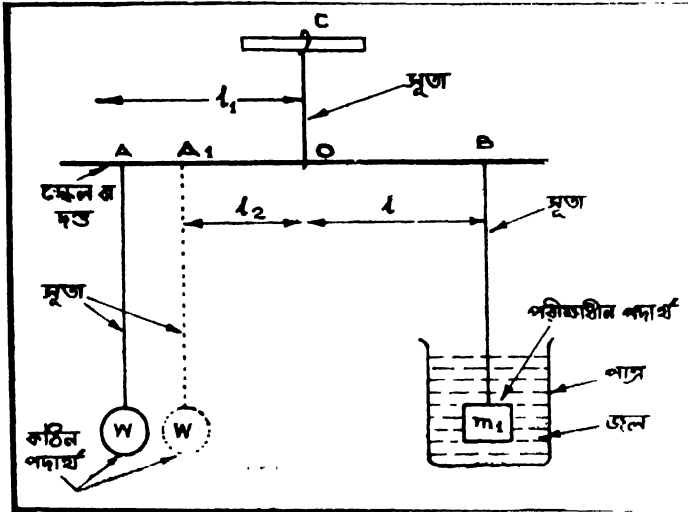
1নং চিত্র

এখন সাম্যাবস্থায় O বিন্দুর চারিদিকে ভ্রামক লইয়া

প্রথম ক্ষেত্রে, $W \times l_1 = m_1 \times l \cdots\cdots\cdots(1)$

ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, $W \times l_2 = m_2 \times l \cdots\cdots\cdots(2)$

(1) ÷ (2) করিয়া পাই, $\dfrac{l_1}{l_2} = \dfrac{m_1}{m_2}$

$$\therefore \quad \frac{l_1}{l_1 - l_2} = \frac{m_1}{m_1 - m_2}$$

∴ কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব $\left(= \dfrac{m_1}{m_1 - m_2}\right) = \dfrac{l_1}{l_1 - l_2}$

এক্ষণে স্কেল হইতে সহজে l_1 ও l_2-র মান অর্থাৎ AO ও A_1O-র মান নির্ণয় করিয়া অতি সহজে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হইবে।

এক্ষণে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। পূর্বের মত m_1 ভরবিশিষ্ট বস্তুকে জলে নিমজ্জিত করিয়া স্কেলকে অনুভূমিক করিবার পর বস্তুটিকে পরীক্ষাধীন তরল পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করা হইল। স্কেলটিকে অনুভূমিক করিবার জন্য ভারটিকে A'_1 বিন্দুতে সরানো হইল। A'_1O-এর পাঠ লওয়া হইল।

এক্ষেত্রে মনে করিলাম, $A_1'O = l_3$cm ও তরল পদার্থে নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুটির ভর $= m_3$ gm। এস্থলেও সাম্যাবস্থার জন্য O বিন্দুর চারিদিকে ভ্রামক লইলে,
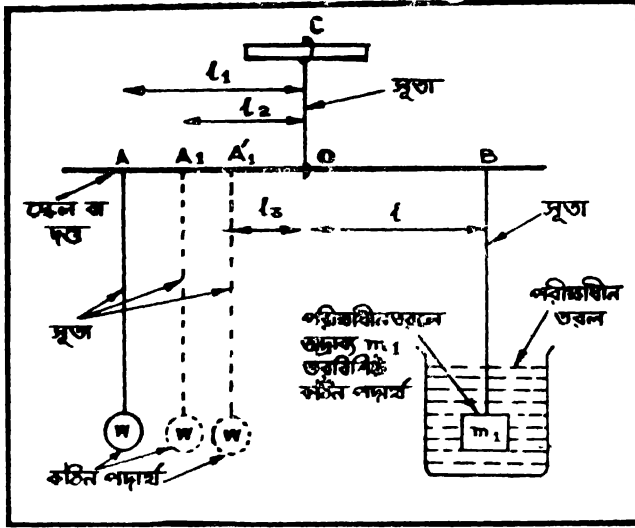
2নং চিত্র

$$W \times l_1 = m_1 \times l \cdots\cdots\cdots(3)$$

$$W \times l_2 = m_2 \times l \ldots\ldots\ldots(4)$$

ও $$W \times l_3 = m_3 \times l \cdots\cdots\cdots(5)$$

(3) – (5) করিয়া পাই, $(l_1 - l_3)W = (m_1 - m_3) \times l \ldots\ldots(6)$

(3) – (4) করিয়া পাই, $(l_1 - l_2)W = (m_1 - m_2) \times l \cdots\cdots(7)$

(6) ÷ (7) করিয়া পাই, $\dfrac{l_1 - l_3}{l_1 - l_2} = \dfrac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2}$

∴ তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব $\left(= \dfrac{m_1 - m_3}{m_1 - m_2} \right) = \dfrac{l_1 - l_3}{l_1 - l_2}$

কিন্তু l_1, l_2 ও l_3-এর মান স্কেল হইতে পাওয়া যাইবে। ফলে অতি সহজে তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

পদার্থবিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর 20। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 2 মিনিট। চেষ্টা করে দেখোদিকিনি, মোট 100-এর মধ্যে তুমি কত নম্বর পাও।

1. কোন্‌টি ঠিক বলো—
   সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে প্রায়
   (ক) 8 সেকেণ্ড
   (খ) 1 মিনিট
   (গ) 8 মিনিট
2. কোন্‌ মাধ্যমটিতে আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী ?—
   (ক) জল
   (খ) কাচ
   (গ) হীরা
3. কোন্‌ পদার্থটির বৈদ্যুতিক রোধ সবচেয়ে কম (অর্থাৎ বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশী) ?—
   (ক) রূপা
   (খ) তামা
   (গ) অ্যালুমিনিয়াম
4. কোন্‌টির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম ?—
   (ক) আলো
   (খ) বেতার-তরঙ্গ
   (গ) এক্স্‌-রশ্মি
5. কোন্‌টি ঠিক বলো—
   (ক) নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে বেশী
   (খ) নিউট্রনের ভর প্রোটনের ভরের চেয়ে কম
   (গ) নিউট্রনের ভর ও প্রোটনের ভর সমান

(উত্তরের জন্যে 122নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কৃত্রিম রক্ত

কৃত্রিম রক্ত শুনে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হচ্ছ, তাই না? মানুষের দেহে অসংখ্য শিরা, উপশিরার মধ্য দিয়ে যে লোহিতবর্ণের তরল পদার্থটি সর্বদা প্রবাহিত হয়ে প্রাণের স্পন্দনকে সজীব করে রেখেছে, তা যদি কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, তাহলে অবাক হবার কথা বৈকি।

রক্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, যা গুরুতর পরিস্থিতিতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে মানুষের জীবনাশঙ্কার সৃষ্টি করে। হাসপাতালে দুর্ঘটনা-কবলিত ও বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের রোগীর জন্যে রক্তের বিপুল চাহিদা অনেক সময় চিকিৎসকদের কাছেও সমস্যা রূপে দেখা দেয়। যদিও বিভিন্ন ব্লাড-ব্যাঙ্কে মানুষের রক্ত সংরক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত সুব্যবস্থা রয়েছে, তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই নগণ্য। মানুষের দেহাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতিকে সক্রিয় রাখবার জন্যে 240 থেকে 300 আউন্স রক্তের প্রয়োজন। এই সব কারণে দীর্ঘদিন ধরে সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম রক্ত উদ্ভাবনের অর্থাৎ রক্তের সকল গুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ সংশ্লেষণের জন্যে গবেষণা করে আসছেন।

বেশ কয়েক বছর আগে কার্বন এবং ফ্লোরিনের যৌগ ফ্লোরোকার্বনকে রক্তের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের কথা ভাবা হয়েছিল। এই ফ্লোরোকার্বন যৌগটি রাসায়নিক ধর্মের বিচারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং দ্রবীভূত গ্যাস প্রচুর পরিমাণে শোষণ করতে সক্ষম। রক্তের হিমোগ্লোবিন অণুর মতই এগুলি দেহের বিভিন্ন টিস্যু বা তন্তুতে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারে।

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটি মেডিক্যাল সেন্টারের খ্যাতনামা গবেষক অধ্যাপক লেল্যাণ্ড সি, ক্লার্ক ফ্লোরোকার্বন নিয়ে ব্যাপকতর গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক ক্লার্ক একটি কুকুরকে নিয়ে এক অভূতপূর্ব পরীক্ষায় সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। তিনি কুকুরটির দেহের পঞ্চাশ শতাংশ রক্ত নিষ্কাশন করে নিয়ে তাঁর গবেষণালব্ধ কৃত্রিম রক্ত তার দেহে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়ে প্রায় এক বছর কাল তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এই এক বছরের মধ্যে কৃত্রিম রক্তের প্রভাবে কুকুরটির দেহে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। অধ্যাপক ক্লার্ক প্রথমে ফ্লোরোকার্বনের সঙ্গে বিশুদ্ধ লবণজল ও গ্লুকোজ নির্ধারিত পরিমাণে মিশিয়ে এক অসমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত করেন। অতঃপর এই মিশ্রণটির সঙ্গে কোন পরিশোধক রাসায়নিক মিশ্রিত করে আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গের উপস্থিতিতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করা হয়, যার ফলে তৈরি

হয় দুধের মত সাদা তৈলাক্ত একটি তরল পদার্থ। এই তরল পদার্থের মধ্যে ভেসে বেড়ায় লক্ষ লক্ষ ফ্লোরোকার্বন অণু। এই সব ফ্লোরোকার্বন অণুর এক-একটির আকার রক্তের লোহিত কণিকার (RBC) এক-দশমাংশ মাত্র।

এই কৃত্রিম রক্ত দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার ঠিক পূর্বে মিশ্রণটির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ অক্সিজেন গ্যাস চালনা করা হয়, যার ফলে ফ্লোরোকার্বন অণুগুলি প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ করে নেয়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো—ফ্লোরো-কার্বন অণুগুলি সাধারণ রক্তকণিকা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে অক্সিজেন শোষণ ও সরবরাহ করতে পারে।

কৃত্রিম রক্ত নিয়ে প্রথম দিকের গবেষণায় এই কৃত্রিম রক্ত প্রাণিদেহে মাত্র এক ঘণ্টাকাল অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারতো। কিন্তু বর্তমান গবেষক-বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই সময়কালকে অনেক বেশী দীর্ঘায়িত করা সম্ভব হয়েছে। রক্তস্রোত থেকে ফ্লোরোকার্বন অণু দু-দিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়—খুব সামান্য সংখ্যক অণু দেহের বিভিন্ন অংশে থেকে যায়, কিন্তু তারা কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।

ফ্লোরোকার্বন নিয়ে গবেষণা এখনো শেষ হয় নি বরং বলা চলে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এবার সুরু হয়েছে। এই গবেষণার ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করছে রক্তের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিস্থাপক কৃত্রিম কোন রাসায়নিক সত্যই একদিন পাওয়া যাবে কিনা। প্রকৃত-পক্ষে যদি কোন দিন এই গবেষণায় পরিপূর্ণ সাফল্য আসে, তাহলে এই কৃত্রিম রক্ত ব্লাড-ব্যাঙ্কে সংরক্ষিত মানুষের দেহ থেকে নিষ্কাশিত রক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করবে। এর প্রথম কারণ হলো—এই কৃত্রিম রক্তকণিকাগুলি আসল রক্ত কণিকার চেয়ে আয়তনে অনেক ছোট হওয়ায় কোন কারণে সঙ্কুচিত অতি সূক্ষ্ম কৈশিক রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে এগুলি অনায়াসে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে, যার ফলে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টির নিদারুণ জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ সংশ্লেষিত রক্ত উৎপাদনের ব্যয়ও অনেক কম হবে। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের দেহ থেকে নিষ্কাশিত রক্ত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যয়ের এক-চতুর্থাংশ হবে কৃত্রিম রক্ত সংশ্লেষণের ব্যয়। সঙ্কটের মুহূর্তে অর্থাৎ যখন রোগীর দেহে বাইরে থেকে রক্ত সরবরাহের জরুরী প্রয়োজন, সে সময় রক্ত পাওয়া গেলেও তার সঠিক শ্রেণী-বিভাগ করা এবং সঠিক শ্রেণী বা গ্রুপের রক্ত পাওয়া এক সমস্যা। এই কৃত্রিম রক্তের ক্ষেত্রে কোনরূপ শ্রেণী-বিভাগের প্রয়োজন হবে না এবং গবেষক-বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই কৃত্রিম রক্ত প্রস্তুতির পর সহজ পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখা সম্ভব হবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (গ)

[পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব মোটামুটিভাবে 15 কোটি কিলোমিটার এবং শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার। সুতরাং সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে $15 \times 10^7 / 3 \times 10^5 = 500$ সেকেণ্ড অর্থাৎ 8 মিনিট 20 সেকেণ্ড। মোটামুটি হিসাবে এটাকে 8 মিনিট বলে ধরা হয়।]

2. (ক)

[কোন মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক (Refractive index)

$$= \frac{\text{শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ}}{\text{মাধ্যমটিতে আলোর গতিবেগ}}$$

সুতরাং যে মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক কম, তাতে আলোর গতিবেগ বেশী। জল, কাচ ও হীরার প্রতিসরণাঙ্ক হচ্ছে যথাক্রমে 1.3, 1.5–2.0 ও 2·4। তিনটি মাধ্যমের মধ্যে জলের প্রতিসরণাঙ্ক সবচেয়ে কম হওয়ায় জলেই আলোর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী।]

3. (ক)

[এক ঘন সেন্টিমিটারের হিসাবে রূপা, তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বৈদ্যুতিক রোধ হচ্ছে যথাক্রমে 1.7×10^{-6} ওহ্‌ম্, 1.8×10^{-6} ওহ্‌ম্ ও 2.9×10^{-6} ওহ্‌ম্।]

4. (গ)

[বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শত মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো কয়েক হাজার অ্যাংস্ট্রম (এক অ্যাংস্ট্রম $= 10^{-8}$ সেন্টিমিটার)। এক্‌স্‌-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক অ্যাংস্ট্রমের ভগ্নাংশ থেকে কয়েক অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত হতে পারে।]

5. (ক)

[নিউট্রনের ভর $= 1.674 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম ও প্রোটনের ভর $= 1{\cdot}672 \times 10^{-24}$ গ্র্যাম। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মুক্ত নিউট্রন স্থায়ী কণা নয়; কালক্রমে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে গিয়ে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন ও একটি অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর সৃষ্টি হয়।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড কিভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কাজে লাগে ?

কবিতা চৌধুরী, বহরমপুর,

প্রশ্ন 2. : শনিগ্রহের বলয় সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

শ্যামলকুমার দত্ত, ঢাকা,

প্রশ্ন 3. : ফল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের স্বাদ ও রঙের পরিবর্তন এবং সুমিষ্ট গন্ধের উৎপত্তির কারণ কি ?

দীপঙ্কর দত্ত, কলিকাতা-12

উত্তর 1. : চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক্স-রে ও রেডিও আইসোটোপের ব্যবহার বর্তমানে সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু বর্তমানে এগুলি ছাড়াও বিজ্ঞানীরা চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ বা আলট্রাসাউণ্ড কাজে লাগাচ্ছেন। এই আলট্রাসনিক শব্দ-তরঙ্গকে শরীরের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। বিজ্ঞানীরা এমন সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যাদের সাহায্যে এই প্রেরিত শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলিত সঙ্কেতকে চিত্রাকার দেওয়া যায়। চিত্রাকার সঙ্কেতগুলি পর্যবেক্ষণ করে শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসকেরা অনেক সময় এক্স-রে অথবা রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার নিরাপদ মনে করেন না। কারণ এক্স-রে অথবা রেডিও আইসোটোপের বিচ্ছুরণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন করে। গর্ভাবস্থায় ও শিশুদের ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা আলট্রাসাউণ্ড ব্যবহার করেন। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলট্রাসনিকের ব্যবহার চলছে। রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করে শরীরের ক্যান্সারগ্রস্ত অংশের কোষগুলিকে ধ্বংস করা হয়ে থাকে। বর্তমানে আলট্রাসাউণ্ড প্রয়োগ করে চিকিৎসকেরা ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া মূত্রাশয় ও পিত্তকোষে জমা হওয়া পাথর উচ্চ কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগে গুঁড়া করা অনেক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে। মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগে মস্তিষ্কের বিশেষ কতকগুলি স্নায়ুকে নষ্ট করে উপকার পাওয়া গেছে।

উত্তর 2, : সৌরমণ্ডলে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্য থেকে শনিগ্রহকে সহজেই আলাদা করে চেনা যায়, তার বলয়ের উপস্থিতির জন্যে। কারণ, শুধুমাত্র শনিগ্রহ ছাড়া অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের বলয় নেই। এই বলয় হচ্ছে শনিগ্রহের বিষুবতলের সমান্তরালে অবস্থিত তিনটি বলয়ের সমষ্টি, যেগুলি ঐ গ্রহের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে।

বলয়গুলির প্রস্থ এদের বেধের তুলনায় অনেক বড়। তিনটি বলয়ের প্রস্থের যোগফল প্রায় 42 হাজার মাইলের মত। এদের বেধ মোটামুটিভাবে 20 মাইলের কাছাকাছি।

বিজ্ঞানীমহলে এই বলয়গুলির গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ অনুসারে বলয়গুলি হচ্ছে একটানা কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং দ্বিতীয় মতবাদ অনুযায়ী এগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কণার ঘনিষ্ঠ সমাবেশ। বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তত্ত্বের সাহায্যে জানা যায়, যদি বলয়গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কণার সমাবেশে তৈরি হয়ে থাকে, তবে বলয়ের ভিতর দিকের কণাগুলির গতিবেগ বলয়ের বাইরের দিকের কণাগুলির গতিবেগের চেয়ে বেশী হবে। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালী-রেখার সরণ পরিমাপ করে পৃথিবী থেকেই শনির বলয়ের বাইরের ও ভিতরের অংশের গতিবেগ নিধারণ করা যায়। 1895 সালে বিজ্ঞানী কীলার ও পরে বিজ্ঞানী ডেস্‌লাণ্ডারস্ বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বলয়ের ভিতরের ও বাইরের অংশের বেগ নির্ণয় করে দেখান যে, ভিতরের অংশের বেগ বাইরের অংশের বেগের তুলনায় বেশী। অতএব কীলার ইত্যাদির পরীক্ষায় এই ধারণাই হয় যে, বলয়গুলি কণিকাসমষ্টির দ্বারা গঠিত।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, বলয়গুলি হচ্ছে উপগ্রহ সৃষ্টির প্রথম অবস্থা, অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহই প্রাথমিক অবস্থায় বলয় ছিল এবং পরে এই বলয়ের কণাগুলি একত্রিত হয়ে গ্রহ বা উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার অনেকের ধারণা অনুযায়ী এই বলয় হচ্ছে, অধিক আকর্ষণের প্রভাবে গুঁড়িয়ে যাওয়া শনির নিকটতম উপগ্রহের ধ্বংসাবশেষ। তবে বলয়গুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন্ ধারণা ঠিক, তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

উত্তর 3. : কাঁচা থেকে পাকা অবস্থায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফলের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ও ফলের পরিপাকক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রাসায়নিক পরিবর্তনই মূলতঃ কাঁচা ও পাকা ফলের স্বাদের তারতম্যের জন্যে দায়ী। আপেল, ন্যাসপাতি ইত্যাদি ফলের মিষ্টতা এদের ফ্রুক্টোজ শর্করার উপস্থিতিরই জন্যে। দেখা গেছে যে, আপেল, ন্যাসপাতি ইত্যাদি পাকবার সঙ্গে সঙ্গে এদের শর্করার পরিমাণ বাড়ে ও শ্বেতসারের পরিমাণ কমে। কাজেই ফলের মিষ্টতাও বৃদ্ধি পায়। পাকা কলাতেও গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রভৃতি শর্করার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়।

অধিকাংশ ফলের পাকবার সময় শ্বাসক্রিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। ফলের শ্বাসকার্যের জন্যে শর্করার ক্ষয় হয়। এই কারণে ফলের মিষ্টতাও কমে যায়। সেই জন্যে দেখা যায় বেশী পাকা কলা বা আমের মিষ্টতা অপেক্ষাকৃত কম। টক্‌জাতীয় ফলে অম্লের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় এগুলি পাকা হলেও টক্ লাগে। এই কারণে কাঁচা পাতিলেবুর চেয়ে পাকা পাতিলেবু বেশী টক্।

ফল পাকবার সময় কোনও কোনও ফলে ক্যারোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়

আবার কোন কোনও ফলে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমে যায়। ক্লোরোফিল কমে যাবার ফলে কাঁচা ফলের সবুজ রং নষ্ট হতে থাকে এবং ক্যারোটিন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ফলের রং হলুদে ভাব ধারণ করে। তবে সব ফলের ক্ষেত্রেই যে ক্লোরোফিলের পরিমাণ কমবে বা ক্যারোটিনের পরিমাণ বাড়বে, তা নয়। এছাড়াও ফলের রঙের জন্যে নানা প্রকার ফেনোলিক যৌগ, অ্যান্থোফিল, ফ্লোভোনয়েড, অ্যান্থোসায়ানিন ইত্যাদি পদার্থগুলি দায়ী। বিশেষ রঙের প্রভাব ফলের গায়ে আপতিত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, তীব্রতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

পাকা ফলের সুমিষ্ট গন্ধের জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দায়ী। বিভিন্ন ফলের যে গন্ধ আমরা পাই, তা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এই রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, এস্টার, ইথিলিন, টারপিন ইত্যাদি।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র

বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত খ্যাতনামা রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র গত 31শে ডিসেম্বর 84 বছর বয়সে পরলোক-গমন করেছেন।

বীরেন্দ্রনাথ 1888 সালে 17ই সেপ্টেম্বর রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ-এ পরীক্ষা পাশ করবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন এবং ঐ কলেজ থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম. এস-সি কোর্সের প্রথম ছাত্রদলের অন্যতম রূপে 1910 সালে রসায়নশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বি. এস-সি ক্লাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং এম. এস-সি ক্লাশে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। এম. এস-সি পরীক্ষা পাশ করবার পর তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে রসায়নশাস্ত্রের লেক্চারার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বীরেন্দ্রনাথ অপর দু-জন সহযোগী শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দাশ ও অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে মিলে মাত্র 9000 টাকা মূলধন নিয়ে 1916 সালে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানীর গোড়াপত্তন করেন। আজ তা এক বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এই কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্য-গুলির বিক্রয়ের মোট পরিমাণ প্রায় 4 কোটি টাকা। বীরেন্দ্রনাথের দুই সহযোগীর মধ্যে অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন পরলোকগমন করেন

1936 সালে এবং খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ 1965 সালে। বীরেন্দ্রনাথ 1967 সাল পর্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর-রূপে কোম্পানীর কার্য পরিচালনা করেছিলেন

বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র

এবং তারপর কোম্পানীর উপদেষ্টারূপে কাজ করেন ও 1971 সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

কোম্পানীর কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করলেও বীরেন্দ্রনাথ বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি জাপান ও দূরপ্রাচ্য ভ্রমণ করেন। অল ইণ্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান সোপ অ্যাণ্ড টয়লেটরিজ মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন, এসেন্সিয়াল অয়েল অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া এবং ইনস্টিটিউশন অফ কেমিস্টস্-এর তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির ফেলো, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং রোটারী ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তা ছাড়া রাসায়নিক শিল্পসংক্রান্ত বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল এবং 1961 সালে পরিষদের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকীতে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে তিনি গৃহ-নির্মাণ তহবিলে দেড় হাজার টাকা দান করেন।

র. ব.

বিবিধ

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে 20শে হইতে 23শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন রবীন্দ্র সদন, বিজ্ঞান কলেজ এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রাহ্মণ্যম।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা

পুণার কাছে আরভিতে প্রথম ভূকেন্দ্রটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। গত 26শে ফেব্রুয়ারী ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

বিগত কয়েক মাসে 30টি চ্যানেল বসানো হয়েছে। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও সিস্টেমের মাধ্যমে আগে যে সব তার, টেলিফোন ও টেলেক্স সার্ভিস চালু ছিল, তার মধ্যে অনেকগুলিই এখন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে চলছে।

ভারতের সঙ্গে এখন অষ্ট্রেলিয়া, বাহেরিন, জাপান, কেনিয়া, কুয়ায়েত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যাণ্ড, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মেনীর কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলিফোন সংযোগ রয়েছে। টেলেক্স এবং টেলিগ্রাম ব্যবস্থা অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মেনী, ইটালী এবং অষ্ট্রিয়ার সম্প্রসারিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিস হাই-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিওর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলি-যোগাযোগের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আয়ন-মণ্ডলের গণ্ডগোলের দরুণ টেলিসংযোগে ব্যাঘাত ঘটতো। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে টেলি-যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি দূর করবে এবং এদেশে দিবারাত্র সর্বাধুনিক উচ্চ মানের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

আরভির ভূকেন্দ্রটি স্থাপনের ব্যয় হয়েছে 8 কোটি টাকা। এর মধ্যে সাজসরঞ্জাম আমদানী বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হয়েছে প্রায় 3 কোটি টাকা। আরভি ভূকেন্দ্রটির সঙ্গে বোম্বাইয়ের বিদেশ সঞ্চার ভবনের আন্তর্জাতিক এক্সচেঞ্জের মাইক্রো-ওয়েভ সংযোগ রয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এই কেন্দ্রের তিনটি উপকেন্দ্র (রিপিটার ষ্টেশন) রয়েছে। এই সংযোগটি প্রায় 140 কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমান বছরের প্রথম দিকে বিদেশ সঞ্চার ভবনের আধা-স্বয়ংক্রিয় আন্তর্জাতিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জটি বসাবার কাজ শেষ হলে বোম্বাইয়ের একজন টেলিফোন অপারেটর বিদেশের অনেক দেশের সঙ্গে সরাসরি ডায়াল করে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করতে পারবে।

দ্বিতীয় ভূকেন্দ্রটি উত্তরাঞ্চলে স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। 1974-75 সাল থেকে টেলি-সংযোগ বৃদ্ধির আনুমানিক হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই দ্বিতীয় ভূকেন্দ্রটি অতিরিক্ত আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগের প্রয়োজন মেটাবে এবং প্রয়োজনমত আরভি ভূকেন্দ্রের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। পারমাণবিক শক্তি দপ্তর মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে এই ভূকেন্দ্রের মাধ্যমে অপারেশনাল টেলিভিসন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবে।

এই ব্যাপারে বিভাগীয় কারিগরী কমিটির সুপারিশক্রমে দেরাদুনের কাছে একটি জায়গা ঠিক করা হয়েছে। ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিসের প্রকল্প রিপোর্ট অনুযায়ী এই ভূ-কেন্দ্রের প্রধান কেন্দ্রটি স্থাপিত হবে দেরাদুনের কাছে এবং টার্মিনাল ভবনটি গড়ে উঠবে নয়া দিল্লীতে। এই ভবনেই আন্তর্জাতিক টেলেক্স, টেলিফোন এবং মূলকেন্দ্র ও টার্মিনাল ভবনের সঙ্গে একটি মাইক্রোওয়েভ সংযোগ থাকবে। প্রকল্পটি বাবদ আনুমানিক ব্যয় হবে 6 কোটি 78 লক্ষ টাকা। 1947 সালের শেষ নাগাদ এই কেন্দ্রটি চালু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতে এক স্থায়ী ও উচ্চ মানের আন্তর্জাতিক টেলিসংযোগ গড়ে উঠবে। পরবর্তী কালে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আধা-স্বয়ংক্রিয় ভিত্তিতে আন্ত-র্জাতিক ট্রাঙ্ক-ডায়ালিং-এর সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার

1971 সালের জন্যে বিজ্ঞানে কলিঙ্গ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে বিশিষ্ট মার্কিন নৃ-বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখিকা ডক্টর মার্গারেট মীডকে। ভারতের শিল্পপতি শ্রীবিজু পট্টনায়েকের প্রদত্ত অর্থে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা

প্রতি বছর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক বা লেখিকাকে লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় কৃতিত্বের জন্যে এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

ডক্টর মীড একাধিক লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে Coming of Age in Samoa' গ্রন্থটির 2 বছরের মধ্যে পাচটি সংস্করণ হয়েছে ও দু-বার তা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'Growing up in New Guinea', 'Sex and Temperament in Three Primitive Societies', 'And Keep your Powder Dry'। তিনি 1926 সাল থেকে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং বহু নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন।

যোহানেস কেপ্‌লারের চার-শততম জন্মশতবার্ষিকী

ষষ্ঠ শতকে বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক কাল থেকে প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিষীর মধ্যে যে অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব অপরিসীম। সেদিনের মানুষ বিশ্বাস করতো, দূর নক্ষত্র অথবা গ্রহের স্থান এবং কাল, মানুষ এবং তার জগতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজ থেকে চার-শ' বছর আগে যোহানেস কেপ্‌লারের জন্মমুহূর্তেও ওই একই সুর ইউরোপের জনমানসেও বিরাজ করতো। গত 17 জানুয়ারী কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক কেপ্‌লারের চার-শততম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে একথা বলেন ফেডারেল রিপাব্লিক অব জার্মেনীর কনসাল জেনারেল ডক্টর এইচ. এফ. লিনজ। উল্লেখ্য, যোহানেস কেপ্‌লারের জন্ম ভ্যুটেনবার্গের ভেইল-এ, 27শে ডিসেম্বর 1571। প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু কেপ্‌লার এবং টাইকো ব্রাহীর কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, এই সময়ে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাসকে অতিক্রম করে কেপ্‌লারই জ্যোতির্বিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটান। তাঁর গ্রহগতির তিনটি সূত্র আজও পথিকৃৎ-এর মত কাজ করছে। তিনিই দু-হাজার বছরের পুরনো বিশ্বাসকে দূর করে প্রমাণ করেন, গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তীয় পথ পরিক্রমণ করে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীআর সুব্রহ্মনিয়াম এবং প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতিঃ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর জি. স্বরূপ। ম্যাক্সমুলার ভবনের পরিচালক ডক্টর জে. ইউ. ওহলাউ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জানান। মূল অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, বিড়লা শিল্প এবং প্রযুক্তিবিষয়ক সংগ্রহশালা, ম্যাক্সমুলার ভবন এবং পশ্চিম জার্মেনীর সরকারের কনসাল জেনারেল।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | মার্চ, 1972 | তৃতীয় সংখ্যা

নৃ-বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি

রেবতীমোহন সরকার*

সমাজ-বিজ্ঞানসমূহের (Social Sciences) মধ্যে নৃ-বিজ্ঞান আজ এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। মানুষের জীবনের সার্বিক আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সুধীসমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে আমাদের দেশের সাধারণ্যে এর প্রচার সীমিত হলেও বিদ্বজ্জনসমাজে নৃ-বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হতে চলেছে। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব থেকে সুরু করে বিভিন্ন দেশের মানুষের আকৃতি, প্রকারভেদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-শৈলী, সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য—এক কথায় সামগ্রিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায় নৃ-বিজ্ঞান নিজেকে নিয়োজিত করেছে। নৃ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু আলোচনা পৃথিবীর মানুষকে প্রকৃতভাবে আবিষ্কার করেছে। কেবলমাত্র জ্ঞানের জন্যেই জ্ঞানার্জন করে নৃ-বিজ্ঞান ক্ষান্ত হয় নি, এর ব্যবহারিক দিকটিও প্রণিধানযোগ্য। মানব-সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের দিকগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশে নৃ-বিজ্ঞানের সবগুলি শাখাই যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করেছে। নৃ-বিজ্ঞান ক্ষেত্র-বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত এবং এর অধিকাংশ তথ্য প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা-9

ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়। অপর দিকে লোকসংস্কৃতি মানুষের ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা, উৎসব-পার্বণ ও বিভিন্ন সামাজিক আচার-ব্যবহারের ছন্দোবদ্ধ রূপ উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত। নৃ-বিজ্ঞানের মত লোকসংস্কৃতিও একটি ক্ষেত্র-বিজ্ঞান এবং বহু বিষয়ে এই দুটি শাখা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান প্রবন্ধে নৃ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ব্যবহার-প্রণালীর মূল্যায়নের উপর আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি নিঃসন্দেহে একটি ইতিহাসভিত্তিক বিজ্ঞান; কারণ মানুষের অতীত জীবনের গভীরে প্রবেশলাভে লোকসংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞান পর্যায়ভুক্ত হবার বিশেষ যুক্তি হলো এই যে, এর লক্ষ্যে পৌঁছাবার মূলধন একমাত্র আরোহ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্গেই লোকসংস্কৃতির আত্মিক যোগসূত্র। সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানীর মানুষের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার প্রতি আলোকসম্পাতের কালে সেগুলিকে অতি অবশ্যই ঐ জনগোষ্ঠীর লোককথা, কাহিনী, ধাঁধা, প্রবচন, ছড়া প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে; তা না হলে সেই জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী লোকসংস্কৃতি কোন এক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। পৃথিবীর প্রতিটি জন-গোষ্ঠীর, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী যতই আদিম ও সরল হোক না কেন, নিজস্ব লোক-কথা ও কাহিনী বিদ্যমান। লোকসংস্কৃতির এই সব উপাদান আদিম ও সমসাময়িক কালের সমাজব্যবস্থার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে মানুষের জীবনধারার বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনায় লোকসংস্কৃতির ব্যবহার অপরিহার্য। বর্তমান কালে নৃ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত করতে দেখা যায় না। সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানীর নানাবিধ আলোচনায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বর্তমান কালে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া হয় না এবং খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ই লোকসংস্কৃতিকে নৃ-বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ এক অংশ হিসেবে স্বীকৃতিদান করেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, লোকসংস্কৃতির চর্চার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করলে নৃ-বিজ্ঞান, বিশেষ করে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান অঙ্গহীন হয়ে পড়বে। সংস্কৃতি (Culture) হলো নৃ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি। যদিও এই সংস্কৃতির সংজ্ঞা নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, তবুও একথা সর্বজন-স্বীকৃত যে, সংস্কৃতি হলো সামাজিক উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পরিবেশের মনুষ্যনির্মিত অংশবিশেষ। এর মধ্যে রয়েছে মানবজীবনের রীতি-নীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, বিভিন্ন সংস্থা এবং তার সঙ্গে নানাধরণের উৎপাদন ও উৎপাদনের বিভিন্ন কলাকৌশল। কোন লোকগাথা অথবা প্রবচন তাই সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গস্বরূপ।

কালচার অথবা সংস্কৃতি কথাটি বিখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) সর্বপ্রথম 1865 খৃষ্টাব্দে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই কথাটি 1871 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Primitive culture' নামক পুস্তকে নৃ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছিল। টাইলরের মতানুযায়ী সংস্কৃতি হলো একটি জটিল বিষয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, নীতিজ্ঞান, অনুশাসন এবং অন্যান্য কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস—যেগুলি সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অর্জন করে থাকে। টাইলরের সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ক্রমের

(Klemon) বিখ্যাত ও বৃহদাকার রচনার মধ্যে অন্তর্নিহিত। সংস্কৃতির সংজ্ঞায় ক্লেম বলেছেন যে, এটি হলো রীতি-নীতি, সংবাদ এবং দক্ষতা, শান্তি এবং যুদ্ধকালীন গার্হস্থ্য ও প্রকাশ্য জীবন; ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্পের এক সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি। অপর দিকে উইলিয়াম জন টমস (William John Thoms) 1846 খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম Folklore কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এবং এর স্থলে ব্যবহৃত Popular antiquities (জনপ্রিয় পুরাতনী) কথাটিকে বাতিল করেছিলেন। তাঁর মতে, ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি পুরাকালের আচার-ব্যবহার, রীতি-পদ্ধতি, অবলোকন, কু-সংস্কার, ছড়া, প্রবচন প্রভৃতির সুসমঞ্জস বিকাশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নৃ-বিজ্ঞানীদের আলোচিত সংস্কৃতি বা কালচারের সঙ্গে লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোরের যথেষ্ট মিল রয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট লোকসংস্কৃতি, সংস্কৃতি বা কালচারের অংশবিশেষ। সে জন্যেই প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে মানুষের সমাজ ব্যবস্থার নানাদিকে আলোকসম্পাতের সময় লোকসংস্কৃতির উপাদানের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে টাইলর এবং অ্যাণ্ড্র ল্যাং (Andrew Lang) লোকসংস্কৃতির মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিলেন। সার জেম্‌স্‌ ফ্রেজার (Sir James Frazer) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠীর লোকাচার ও রীতিপদ্ধতি সংগ্রহ এবং সেগুলির নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক বিচারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Golden Bough' পৃথিবীর পণ্ডিতমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আজও সেই পুস্তক বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্কের অবতারণায় অদ্বিতীয়। ফ্র্যান্জ বোয়া (Franz Boas) তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লোককথা ও কাহিনীর মাধ্যমে তাদের উৎপত্তি, জীবনাদর্শ ও সামাজিক ধ্যান-ধারণার গতিপ্রকৃতির এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এস্কিমো লোককথায় তিনি ঐ জাতির সঙ্গে পরিবেশ ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন সম্পর্ক এবং এস্কিমো চিন্তাধারার মধ্যে অন্যান্য জাতি-উপজাতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ, যেমন—লোককথা, পৌরাণিক ঘটনা বিচিত্রা, রমন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে উপজাতির জীবনযাত্রার নানা দিকের প্রতি নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোকসম্পাত করা হয়েছিল। পৌরাণিকী কথাসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোয়াকিউটল উপজাতির সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। হার্সকোভিট্‌স্‌ (Herskovits) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Man and his works'-এর মধ্যে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন যে, লোককথা ও কাহিনীর আলোচনার মাধ্যমে কোন এক জনগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত রূপটি বিকশিত হয়। প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ম্যালিনস্কি (Malinowski) তাঁর রচনা 'Myth in primitive psychology'-তে সংস্কৃতির সঙ্গে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের এক নিকটতম সম্পর্কের বিষয় প্রমাণিত করেছেন। ট্রবিয়্যাণ্ড দ্বীপবাসীদের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তাদের সংস্কৃতি নিম্নবর্ণিত তিনটি বিশেষ রকমের উপাদানে গঠিত।

1. রূপকথা—এগুলি কাল্পনিক এবং নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়। সাধারণতঃ নভেম্বর মাসে শস্য সংগ্রহ এবং মৎস্য শিকারের মধ্যবর্তী সময়ে এগুলি আলোচিত হয়। এই রূপকথায় আলোচনা ক্ষেতের শস্যের উপর হিতকারী প্রভাব-বিস্তার করে বলে একটা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে।

2. লৌকিক উপাখ্যান—এগুলি প্রকৃত অর্থপূর্ণ ও সত্য বলে বিশ্বাস করা হয়। জাতীয় সম্পত্তি-হিসেবে বিবেচিত এসব উপাদানসমূহ ছকে বাঁধা অপরিবর্তিত অবস্থায় বর্ণিত হয়ে থাকে।

3. পৌরাণিকী কথা—এগুলি যে কেবলমাত্র সত্য বলে বিবেচিত হয় তা নয়, পরম শ্রদ্ধাস্পদ এবং পবিত্র বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের সময় সংশ্লিষ্ট কথাগুলি আলোচিত হয়।

লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের অসম্বদ্ধ সংগ্রহ কখনই তার প্রকৃত রূপের উন্মোচন করতে পারে না। লোকসংস্কৃতির প্রতিটি উপাদান সংশ্লিষ্ট জাতি-উপজাতির জীবনধারা ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে হবে। সুতরাং লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচন প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট জাতি-উপজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর আলোকসম্পাত অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং লোকসংস্কৃতির সুসমঞ্জস গবেষণায় নৃ-বিজ্ঞানের প্রয়োজন অপরিহার্য। অপর দিকে মানুষের সংস্কৃতির সুচারু ব্যাখ্যার জন্যেও লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচনের বিন্যাসভিত্তিক আলোচনা অত্যাবশ্যক। নৃ-বিজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতি তাই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিলে অপরটি অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন নৃ-বিজ্ঞানী সে জন্যে বোধকরি লোকসংস্কৃতির উপাদানের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লোকসংস্কৃতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় ফোকলোর সোসাইটি অব লণ্ডন এবং আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি-র অবদান অতুলনীয়। দেশ-বিদেশের লোকজীবনের উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার জন্যে এসব সংস্থা দিনের পর দিন যথেষ্ট অনুপ্রেরণা দান করে চলেছে।

নৃ-বিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতি চর্চার ধারা কিন্তু অন্যান্য গবেষকদের আলোচনা থেকে ভিন্ন পর্যায়ের। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের উৎস অথবা এদের সঞ্চালন পদ্ধতির প্রতি নৃ-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ খুবই সীমিত। জনজীবনের বিভিন্ন ধারায় লোকসংস্কৃতি কিভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী—নৃ-বিজ্ঞানীদের আলোচনায় সেগুলি প্রাধান্য লাভ করে। লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচন কোন এক জাতির প্রকৃত শিক্ষা-দীক্ষার কাজ করে থাকে—জাতির নীতি ও আদর্শের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয় এসব ছড়া-প্রবচনের মাধ্যমে। সে জন্যে বিশেষ লোককথা, প্রবচন অথবা ছড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক লেনদেন ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কথা প্রতিফলিত হয়। বহু যুগ পূর্বের কোন জনগোষ্ঠীর বিস্মৃত ইতিহাসের পুনর্গঠনের সময় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দিক থেকে কোন প্রত্যক্ষ সাহায্যের অভাব ঘটলে লোকসংস্কৃতির আলোচনাই একমাত্র সহায়কের কাজ করতে পারে। লোকসংস্কৃতিকে সে জন্যেই বলা হয়েছে—A living fossil which refuses to die অর্থাৎ এক জীবন্ত ও অবিনশ্বর জীবাশ্ম।

ভারতীয় সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিভিন্ন লৌকিক আচার-ব্যবহার ও বিধি-নিষেধের প্রভাবে প্রভাবিত। নানা জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এই দেশে সামাজিক রূপরেখা বড়ই বিচিত্রধর্মী। মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সংস্কারের জটাজালে আবদ্ধ। কোন জাতিগোষ্ঠীর জীবনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কার দেশের বৃহত্তর জীবনকে প্রভাবিত করে। এই সকল লোকবিশ্বাসের প্রতিটি উপাদান সংশ্লিষ্ট জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পশ্চাৎপটে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। অন্যথায় লোকসংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় লাভ ঘটবে না। লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার প্রতিটি গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। এই সকল লৌকিক দেবদেবীর বিস্তারিত বিবরণী, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এবং বৃহত্তর হিন্দুধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে এদের অবস্থান নির্ণয়ের বিষয় নানাভাবে দেওয়া হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। কিন্তু এই সকল বিবরণ-

মূলক রচনা তখনই বৈশিষ্ট্য লাভ করবে, যখন জনমানসের জীবনধারার গতি-প্রকৃতির পটভূমিকায় এগুলির বিচার করা হবে। ভারতে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণায় জাতি-উপজাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতের সময় লোক-সংস্কৃতি উপাদানের বিশ্লেষণ এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অখণ্ডতা, সদৃশীকরণ এবং পারস্পরিক ক্রিয়ার এক সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কনে দৃষ্টিপাত অতীব প্রয়োজনীয়। ভাষাতাত্ত্বিক নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও লোককথা, কাহিনী, ছড়া, প্রবচনের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষের মানসিকতার গতি-প্রকৃতির প্রতিফলনের স্বরূপ তার ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। এই লোকসাহিত্য ভারতের লোকজীবন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এগুলির সুষ্ঠু সংগ্রহ কিছু কিছু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ধ্যানধারণার পটভূমিকায় এদের বিচার এখনও অসম্পূর্ণ। সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানী লোক-সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদকে মানুষের সমাজ, ধর্ম, ভাষা, শিল্প ও নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাকালে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন। কোন্ বিশেষ পরিবেশে এসব লোকসাহিত্যের সৃষ্টি এবং অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর প্রভেদ অনুযায়ী কিভাবে এগুলি পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে, সেগুলি অনুসন্ধানযোগ্য। এদের মধ্যে দেশ, কাল ও জনমানসের মনস্তত্ত্বের এক মূর্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণায় ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন রকমের প্রয়োগকৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে সমাজ-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাতের একটি সুযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে অবলীলাক্রমেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আমেরিকান ফোকলোর সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত এবং রবার্ট রেডফিল্ড (R bert Redfield) ও মিলটন সিঙ্গার (Milton Singer) প্রমুখ প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত 'ভারতীয় ঐতিহ্যের রূপ ও তার পরিবর্তনের ধারা' শীর্ষক আলোচনার আসরে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা আসরে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত ও সুষ্ঠু মূল্যায়নের এটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামলীলা উৎসব, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য, ভারতীয় বণিক, রাজপুত ও জাট জাতির ঐতিহ্য, টোডা উপজাতির বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ধারা সন্ধানে এই আলোচনা এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের লোকসংস্কৃতির এই সকল অজস্র উপাদানের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সমাজের প্রকৃত অনুসন্ধানমূলক গবেষণার প্রতি সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই বর্তমান ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের গবেষকদের টাইলর, ফ্রেজার, বোয়া-ম্যালিনস্কি প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানী প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে লৌকিক সংস্কার ও আচার-ব্যবহারের সুপ্রচুর উপাদান বিশ্লেষণে দৃষ্টিপাত করা অবশ্য কর্তব্য। ভারতীয় ভিত্তিভূমিতে ভারতীয় চিন্তাধারার পটভূমিকায় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির সদ্ব্যবহার এক সুসম্বদ্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা প্রণালীর প্রত্যাশাপূর্ণ পথের নির্দেশ দান করবে এবং কালক্রমে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির চর্চা বিজ্ঞানাশ্রয়ী হয়ে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনার এক অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রতিভাত হবে।

সৌরজগতের নবম গ্রহ—প্লুটো

সমীরকুমার ঘোষ*

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সৌরজগতের অষ্টম গ্রহ নেপচুন আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকেই জ্যোতির্বিদ্‌মহলে এক চিন্তার উদয় হয়েছিল যে, নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে নতুন আর কোন গ্রহ থাকা সম্ভব কিনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সব অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীরা এই কাজে উৎসাহিত বোধ করেন, তাঁদের মধ্যে উত্তর আমেরিকার ফ্ল্যাগষ্টাফ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর পার্সিভ্যাল লাওয়েলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1906 খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর লাওয়েল এই ব্যাপারে প্রথম কাজ সুরু করেন এই যুক্তি নিয়ে যে, সেই সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসাব করেও সূর্যকে প্রদক্ষিণকালে সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের গতির যে অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তা ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, নেপচুনের বাইরে অন্য কোন গ্রহ থাকলে তবেই ইউরেনাসের গতির ঐ অসামঞ্জস্যের সমাধান হতে পারে। এই প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্‌ স্লিফার (Slipher) ও উইলিয়ামস (Williams)-এর নেওয়া প্রায় দুই শতাধিক ছবি পরীক্ষা করেও ডক্টর লাওয়েল নতুন গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে তখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। এর পর আরো দুই-একবার সামান্য প্রচেষ্টার পর ডক্টর লাওয়েল 1914 খ্রীষ্টাব্দে আবার পূর্ণোদ্যমে সম্ভাব্য কোন নতুন গ্রহের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু 9 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অজস্র ছবি তুলেও তিনি নতুন কোন গ্রহের সঠিক নিশানা স্থির করতে পারলেন না। এই ঘটনা ডক্টর লাওয়েলের মনে আনলো এক বিরাট হতাশা। লাওয়েলের এই ব্যর্থতার কারণ পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল। 1914 থেকে 1916 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সময়ে লাওয়েল তাঁর অনুসন্ধান-কার্য চালিয়েছিলেন, সেই সময়ে সম্ভাব্য ঐ নতুন গ্রহ তার কক্ষপথে পৃথিবী থেকে দূরতম প্রান্তে অত্যন্ত ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল—যার ফলে পৃথিবী থেকে তার প্রভা প্রকৃত প্রভার প্রায় অর্ধেক বলে মনে হয়েছিল। এজন্যেই ঐ গ্রহের পক্ষে ডক্টর লাওয়েলের মত অনুসন্ধানীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু 1916 খ্রীষ্টাব্দে ঘটলো এক বিপর্যয়। সম্ভাব্য নতুন কোন গ্রহের অস্তিত্ব বাস্তব কিনা, এই পর্যবেক্ষণ-কার্য শেষ হবার আগেই পার্সিভ্যাল লাওয়েল ঐ বছর 16ই নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। অবশ্য মৃত্যুর ঠিক আগে 1915 খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ একশত পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী এক গবেষণা-পত্রে ডক্টর লাওয়েল 'Planet X' নামক এক অজানা গ্রহের অবস্থান যে এক বাস্তব ঘটনা, সে সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেই গবেষণা-পত্রে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ঐ অজানা গ্রহের ভর হবে, পৃথিবীর ভরের প্রায় সাত-দশমাংশ এবং সূর্য থেকে এর দূরত্ব হবে প্রায় 360 কোটি মাইল। লাওয়েলের মৃত্যুর পর 1919 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী পিকারিংও ঐরূপ একটি গ্রহের অবস্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনিও এই অজানা গ্রহটির ঔজ্জ্বল্য, ওজন এবং দূরত্ব সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করেন।

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন

পার্সিভ্যালের আরব্ধ কিন্তু অসম্পূর্ণ এই কাজ তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন আর অগ্রসর হতে পারে নি। শেষে 1925 খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গতঃ লাওয়েলের ভ্রাতা ডক্টর লরেন্স লাওয়েলের আর্থিক আনুকূল্যে লাওয়েল মানমন্দিরে 13 ইঞ্চি ব্যাসের একটি নতুন দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপিত হলো। নবপ্রতিষ্ঠিত এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 1929 সালে লাওয়েল মানমন্দিরে আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হলো নূতন গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ। এই কাজের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয় সেই মানমন্দিরেরই C. W. Tombaugh নামক এক তরুণ গবেষকের উপর। সুরু হলো আকাশে এই নতুন গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ। 1929 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে একনাগাড়ে আকাশের বিভিন্ন অঞ্চলের ছবি তুলে টমবাউ বিচক্ষণতা সহকারে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েও লাওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী-করা গ্রহের কোন সন্ধানই পেলেন না। অবশেষে 1930 সালের 21, 23 ও 29শে জানুয়ারী, টমবাউ মহাকাশে অসংখ্য তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এমন একটি বিশেষ ধরণের জিনিষের ছবি পেলেন, যার উপর তাঁর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো। 18ই ফেব্রুয়ারী ঐ জিনিষটির ছবি আরো স্পষ্ট, আরো উজ্জ্বল ও নিশ্চিত হয়ে দেখা দিল। 20শে ফেব্রুয়ারী রাতে এই উজ্জ্বল বস্তুটিকে টমবাউ বেশ পরিষ্কার-ভাবে ছবির মধ্যে পৃথক করতে সক্ষম হলেন। এর ফলে পার্সিভ্যালের ভবিষ্যদ্বাণী-করা গ্রহের বাস্তব অস্তিত্বের সম্ভাবনা তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। টমবাউ-এর এই সাফল্যের সম্ভাবনা আরো দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হলো, যখন ঐ একই সময়ে ডক্টর ল্যাম্পল্যাণ্ড নামে এক বিজ্ঞানীও ঐ মানমন্দিরে স্বাধীনভাবে 42 ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক ঐ একই রকম উজ্জ্বল এক বস্তুর ছবি পেলেন। ঐ বস্তুটির গতিবেগ ও অন্যান্য ধর্ম লক্ষ্য করে ডক্টর ল্যাম্পল্যাণ্ডও এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ঐ বস্তুটি নেপচুনের সীমা ছাড়িয়ে নূতন এক গ্রহ ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। টমবাউ এই গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো নিশ্চিন্ত হয়ে ঐ বছরে (1930) 13ই মার্চ সকালে হার্ভার্ড কলেজ মানমন্দিরে টেলিগ্রাম করে এই নতুন গ্রহের অস্তিত্ব সরকারীভাবে ঘোষণা করলেন এবং সেই মানমন্দির থেকেই সারা বিশ্বে এই আনন্দ সংবাদ প্রচারিত হলো।

আবিষ্কৃত এই গ্রহটির নামকরণ সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। কারো কারো মতে, যেহেতু এই গ্রহটি সৌরজগতের শেষ সীমায় গভীর তমসাবৃত অঞ্চলে প্রদক্ষিণ করে, সেহেতু প্রাচীন গ্রীক পুরাণে আলোচিত পাতালপুরীর দেবতা প্লুটোর নামানুসারেই এই গ্রহটির নামকরণ করা হয়েছে। আবার অন্য এক মতে, জ্যোতির্বিদ্ পার্সিভ্যাল লাওয়েলের প্রচেষ্টাতেই এই গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণের কাজ প্রথম সুরু হয়, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে এই গ্রহ আবিষ্কারের কাজ সম্পূর্ণ হয় বলে এই বিজ্ঞানীকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্যে তাঁর নামের আদ্যাক্ষরদ্বয় (P ও L) প্রথমে দিয়েই এই গ্রহের নামকরণ হয়েছে PLUTO। শেষের এই যুক্তিকে সমর্থন করলে এই গ্রহটির নামকরণ যে যথার্থ ও সার্থক হয়েছে, তা মনে করা যেতে পারে।

প্লুটো সম্বন্ধে অনেক তথ্যই এখন আমাদের জানা। সূর্য থেকে এর নিকটতম অবস্থায় দূরত্ব 275 কোটি মাইল এবং নিজ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে প্লুটো যখন দূরতম স্থানে চলে যায়, তখন সূর্য থেকে এর দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় 460 কোটি মাইল। সুতরাং সূর্য থেকে এর গড়-দূরত্ব হলো প্রায় 367 কোটি মাইল (সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল)। এই গ্রহটির আয়তন খুবই ছোট, কারণ এর ব্যাস আমাদের

পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকেরও কম (3600 মাইল)। এর প্রভা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে পঞ্চদশ শ্রেণীর এবং সে জন্যে প্লুটোকে আকাশে উজ্জ্বল গ্রহের আকারের পরিবর্তে ছোট্ট এক ম্লান আলোকবিন্দুর মত দেখায়। প্লুটোর কক্ষপথ উপবৃত্তীয় (Elliptic) ধরণের। যার উৎকেন্দ্রতা (Eccentricity) 0·25 এবং সূর্যকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আসতে এর সময় লাগে প্রায় 248 বছর। নিজ কক্ষপথে প্লুটো আবর্তন করতে সময় নেয় প্রায় সাড়ে ছয় দিন। সূর্যকে প্রতিবার পরিক্রমণকালে প্লুটো একবার করে নেপচুনের অপেক্ষাও সূর্যের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে, কারণ সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব প্রায় 280 কোটি মাইল। সুতরাং প্লুটো আবিষ্কৃত হবার পরেই জ্যোতির্বিদ্‌দের মনে এক আশঙ্কা হয়েছিল যে, নেপচুনের এত নিকটে আসবার ফলে তাদের মধ্যে হয়তো সংঘর্ষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখা গেছে যে, সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নেই—যেহেতু প্লুটোর কক্ষতল নেপচুনের কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় 17 ডিগ্রীর মত কোণ সৃষ্টি করে রয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন অবস্থাতেই সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা নেই। প্লুটোর কক্ষপথ পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীদের চোখে যে বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে, তা হলো এই যে, এই কক্ষপথের সঙ্গে অন্যান্য গ্রহগুলির কক্ষপথের কোন সামঞ্জস্য নেই। কক্ষপথের এই ধরণের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে অনেক বিজ্ঞানীরও এই ধারণা হয়েছিল যে, প্লুটো হয়তো কোন এক সময়ে তার নিকটতম গ্রহ নেপচুনেরই এক উপগ্রহ হিসাবে ছিল। অজানা কোন এক কারণে হয়তো সেই উপগ্রহ তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এক স্বাধীন গ্রহের আকারে নিজস্ব এক বিচিত্র কক্ষপথ তৈরি করে মহাকাশে বিচরণ করছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লুটোকে যেটুকু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে দেখা যায় যে, প্লুটোর গাত্রদেশ অত্যন্ত অমসৃণ, যার ফলে তার গাত্র থেকে সূর্যালোক বেশী প্রতিফলিত হতে পারে না। অবশ্য কম প্রতিফলিত সূর্যালোকের আরো একটি কারণ হয়তো সূর্য থেকে গ্রহটির বিরাট দূরত্ব। যাহোক, প্লুটোর চারদিকে কোন আবহমণ্ডল আছে বলে মনে হয় না। সূর্য থেকে বিরাট দূরত্ব ও অন্যান্য কারণে প্লুটোর পৃষ্ঠদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাত্র —210°C। আমাদের পরিচিত যে কোন জিনিষই এই তাপমাত্রায় জমে বরফের মত হয়ে যাবে। সে জন্যে প্লুটোতে কোন গ্যাসীয় বা তরল বস্তুর অবস্থান যে অসম্ভব, সে কথা সহজেই বুঝা যায়। প্লুটোকে এখনো পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তা সবই এই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে, পৃথিবী থেকে এই বিরাট দূরত্বের (প্রায় 350 কোটি মাইল) কোন গ্রহকে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা সত্যই এক দুরূহ ব্যাপার। সে জন্যে প্লুটোর আয়তন, ওজন, ঘনত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা খুবই কঠিন। তবুও 1950 সালে বিজ্ঞানী কুইপার যেসব পরীক্ষা করেছিলেন, তার ভিত্তিতে জানা যায় যে, প্লুটোর আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ এবং ওজন প্রায় আট-দশমাংশ—যা লাওয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর খুবই নিকটে। সুতরাং পৃথিবীর মত প্লুটোও তার আয়তনের তুলনায় বেশ ভারী। আর এর একমাত্র যুক্তি হতে পারে এই যে, হয়তো পৃথিবীর মতই প্লুটোর আভ্যন্তরীণ ভাগও যথেষ্ট লৌহজাতীয় জিনিষের দ্বারা গঠিত। তবে একটা প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীর পরে বেশ কয়েকটি হাল্কা ধরণের গ্রহের অবস্থানের পর, আবার পৃথিবীর মত ভারী একটা গ্রহের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হলো? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে বিজ্ঞানীরা যদিও এখনো সক্ষম হন নি, তথাপি তাঁদের অনেকেরই এই ধারণা যে, হয়তো প্লুটো সম্বন্ধে

আমরা আজ পর্যন্ত যে সব তথ্য পেয়েছি, তা সঠিক এবং সম্পূর্ণ নয়। প্লুটোর অস্তিত্ব ধরা পড়েছে মাত্র 1930 সালে। সেই হিসাবে তার বয়স মাত্র 40/42 বছর। কোন গ্রহ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পেতে গেলে তার এই বয়স যে অত্যন্ত নগণ্য, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় প্লুটো সম্বন্ধে হয়তো আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সেই সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়ে আমরা আজ স্বীকার করে নিতে পারি না কি যে, প্লুটোর উৎপত্তি, অবস্থান ও গতিপথ আজও গভীর রহস্যে ঘেরা ?

অঙ্কের ম্যাজিক

অমিতোষ ভট্টাচার্য*

তাসের প্যাকেটে যিনিই হাত দেন, দু-একটি ম্যাজিক হয়তো তিনি নিঃসন্দেহে দেখাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা হয়তো কেউই পি. সি. সরকার হতে পারবেন না। কিন্তু পি. সি. সরকার না হয়েও যেমন কয়েকটা চমৎকার ম্যাজিক অনেকেই দেখাতে পারেন, তেমনি খুব তুচ্ছ অঙ্কের জ্ঞান নিয়েও কয়েকটি প্রায় অবাক-করা অঙ্কের খেলা দেখানো সম্ভব। এই সব খেলা আয়ত্ত করতে হলে অঙ্কশাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞানের দরকার নেই ; যা চাই—তা হলো অভ্যাস, ধৈর্য আর চেষ্টা।

যাদুকর তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা দর্শকদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। ধরা যাক, সংখ্যাটি 785। সংখ্যাটি বোর্ডে বা কাগজের উপর যাদুকর দু-বার লিখলেন।

786 786

এবার দ্বিতীয় একটি তিন অঙ্কের সংখ্যার অনুরোধ এলো। হয়তো এবারের সংখ্যাটি হলো 827। 827-কে বাঁ-দিকের 786-এর নীচে লিখে ডান দিকের 786-এর নীচে যাদুকর নিজে একটি সংখ্যা লিখলেন। যাদুকরের সংখ্যাটি হলো 172। তাহলে অঙ্ক দুটি দাঁড়ালো—

786	786
827	172

যাদুকর ঘোষণা করলেন এক সঙ্গে দুট গুণ অঙ্ক করে গুণফল দুটির যোগফলটি তিনি লিখে দেবেন এবং বলেই খুব সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি লিখলেন 785214! এই দুটি অঙ্ক লিখতে যতটুকু সময় লাগে, তার চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী সময় তিনি নিলেন না।

এবার লক্ষ্য করুন, যাদুকর নিজে একটি সংখ্যা লিখেছেন। এই সংখ্যাটিই হলো এই ম্যাজিকের মোক্ষম অস্ত্র। এই সংখ্যাটি এমন হওয়া চাই, যা দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া দ্বিতীয় সংখ্যাটির সঙ্গে যোগ করলে যোগফল হবে 999। এই সংখ্যাটি যাদুকর নিজে না লিখে দর্শক-সেজে-বসা কোন বন্ধু বা সহকারীর কাছ থেকে নিতে পারেন। এর পরের ধাপটি অত্যন্ত সহজ। প্রথম সংখ্যার 786 থেকে 1 বাদ দিন, পেলেন 785। এবার অঙ্ক তিনটির 9-এর পরিপূরক (Compliment of 9) যথাক্রমে 2, 1, 4 785-এর পর লিখুন। আপনার উত্তরটি হলো 785214। কিন্তু শুধু গুণফল দুটি যোগ করে উত্তরটি লিখলে প্রথম সংখ্যা 786-এর সঙ্গে

* ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী, চন্দ্রায়ন গুট্টা লাইন্স, হায়দরাবাদ-5

উত্তরটির প্রথম তিনটি অঙ্কের সাদৃশ্য কোন কোন বুদ্ধিমান দর্শক লক্ষ্য করতে পারেন। এই সম্ভাবনাকে একটা কৌশলে এড়িয়ে চলা যায়। একটা কাজ করতে পারেন, ম্যাজিকটিকে কঠিন করবার জন্যে যোগফলকে দ্বিগুণ করে উত্তরটি লিখবেন। তাহলে আপনার উত্তর হবে 1570428। যোগফলটিকে 2 দিয়ে গুণ করতে গেলে 785214-এর পর 0 বসিয়ে 5 দিয়ে ভাগ দিয়ে বাঁ-দিক থেকে উত্তরটি লিখে দিন—আর সমস্ত হিসেবটি আপনাকে মনে মনে করতে হবে। এই মানসাঙ্ক নিতান্তই সহজ। যদিও মাত্র তিন অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ম্যাজিকটি বলা হলো, একই কায়দায় ম্যাজিকটিকে যে কোন অঙ্কের সংখ্যা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে। তবে ছোটখাটো সংখ্যা হলে তৎক্ষণাৎ সাধারণ গুণের সাহায্যে উত্তরটির নির্ভুলতা যাচাই করা চলে, কিন্তু সংখ্যাগুলি বড় হলে যন্ত্রের সাহায্যে উত্তরের নির্ভুলতা বিচার করতে হবে। স্বচ্ছন্দে বলা যাবে আপনার উত্তর আর যন্ত্রের হিসাব একই হবে।

গণিত-জগতে কিছু সংখ্যা আছে, যাদের চেহারায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই—কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দাপট প্রচণ্ড। এই ধরণের একটি সংখ্যা হলো 142857143। এই 9 অঙ্কের সংখ্যাটি দিয়ে অন্য যে কোন 9 অঙ্কের সংখ্যার গুণফল প্রায় অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। 1904 সালে আমেরিকায় আর্থার গ্রিফিথ নামে একজন অঙ্কের যাদুকর ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে একবার ম্যাজিক দেখান। তিনি বোর্ডের উপর 142857143 লিখে একজন অধ্যাপককে আর একটি 9 অঙ্কের সংখ্যা লিখতে অনুরোধ করলেন। অধ্যাপক যখন বাঁ-দিক থেকে সংখ্যাটি লিখতে সুরু করলেন, তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিফিথ বাঁ-দিক থেকে গুণফলটি লিখতে আরম্ভ করলেন। সমবেত ছাত্রেরা একেবারে অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছিল। 1911 সালে মাত্র 31 বছর বয়সে গ্রিফিথ মারা যান এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি Marvelous Griffith নামে পরিচিত ছিলেন।

এই বিরাট আকারের গুণ মাত্র 30 সেকেণ্ডে কি করে যে কেউ করতে পারেন, তা ব্যাখ্যা করবার আগে আমি একটি নিতান্ত সহজ গুণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো। অঙ্কটি হলো—

1,00 000,000,1 × ABC, DEF, GHI.

আমি ABC, DEF, GHI দিয়ে একটি 9-অঙ্কের সংখ্যা বোঝাতে চাইছি। গুণ অঙ্কের অ-আ-ক-খ বিদ্যা নিয়ে যে কেউ যে উত্তরটি পাবেন, তা হলো—

ABC, DEF, GHI, ABC, DEF, GHI।

এবার চেহারায় নিতান্ত সাদাসিধা 142857143-কে যদি 7 দিয়ে গুণ করা যায়, তাহলে আমরা 1,00,000,000,1 পাব। তাহলে 142857143-কে সমান আকারের অন্য যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ আসলে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে পাশাপাশি দু-বার লিখে 7 দিয়ে ভাগ করবার মত সহজ একটি প্রক্রিয়ায় এসে দাঁড়ালো; অর্থাৎ দ্বিতীয় সংখ্যাটি যদি 478,523,878 হয়, তাহলে পুরা অঙ্কটা দাঁড়াবে—

$$142857143 \times 478,523,878$$

এবং এই সংখ্যা দুটির গুণফলকে যদি আমরা X দিয়ে চিহ্নিত করি, তাহলে X হবে—

478,523,878,478,523,878 ÷ 7-এর সমান। সোজা বাংলায় দ্বিতীয় সংখ্যাটি মনে মনে দু-বার পাশাপাশি রেখে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ কিছুই থাকবে না। যদি ভাগশেষ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ভাগ করতে কোথাও ভুল হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাদুকর নিজে থেকে 142857143 লেখেন না—দর্শক-সেজে-বসা কোন সহকারী এই সংখ্যাটি দিয়ে যাদুকরকে সাহায্য করে থাকেন।

কিন্তু এই 142857143 দিয়ে ম্যাজিক দেখা-

বার একটা অসুবিধা আছে। যদি দ্বিতীয় সংখ্যাটি ঘটনার যোগাযোগে 7-দ্বারা বিভাজ্য হয়, কিংবা সংখ্যাটিতে যদি শুধু 7,14,21,42 ইত্যাদি সংখ্যার ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে গুণফলে একই অঙ্ক পর পর আসবে। তাছাড়া বাঁ-দিক থেকে গুণফল লিখতে আরম্ভ করলেই যে কোন বুদ্ধিমান দর্শক নিশ্চয়ই আন্দাজ করে নেবেন যে, আপনি গুণ করছেন না, ভাগ করছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে একটু চেষ্টার দ্বারা ভাজকটি খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। তাই ওয়ালেস লী নামক একজন অঙ্কের যাদুকর আর একটি সংখ্যা বের করেছেন, যা দিয়ে এই অসুবিধা এড়ানো যায়। ওয়ালেস লীর সংখ্যাটি হলো 2857143। আসলে প্রথম দুটি অঙ্ক বাদ দিলে আগের সংখ্যাটি থেকেই ওয়ালেস লীর সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। এবার যে কোন 7-অঙ্কের একটি সংখ্যা চেয়ে নিন এবং অনুরোধ করুন গুণফল নির্ণয়ের সমস্যাটিকে জটিল করবার জন্যে 7-অঙ্কের সংখ্যাটির প্রত্যেকটি অঙ্ক যেন 4-এর চেয়ে বড় হয়। পরবর্তী আলোচনায় দেখাবো এই প্রক্রিয়ায় 4-এর বড় অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা থাকলে সমস্যাটি তো কঠিন হয়ই না, বরং আরও অনেক সোজা হয়ে আসে।

সংখ্যা দুটির গুণ করবার পদ্ধতি অনেকটা আগের মতই, তবে 7 দিয়ে ভাগ করবার আগে দ্বিতীয় সংখ্যাটিকে 2 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে। কারণ 2857143-কে 7 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 20,000,001। কাজেই 20,000,001-কে ABC,DEF,G দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে—

2A2B2C2D2E2F2G ABC DEFG।

যদি দ্বিতীয় গুণকের প্রত্যেকটি অঙ্ক 4-এর বড় হয়, তাহলে নীচের পদ্ধতিতে দ্বিগুণ করে সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে উত্তরটি লেখা সম্ভব হবে।

ধরা যাক, দ্বিতীয় গুণকটি 6769869; অর্থাৎ পুরো অঙ্কটি হলো—

2857143 × 6769869

এর গুণফল নির্ণয় করতে হলে প্রথম অঙ্ক 6-কে দ্বিগুণ করে 1 যোগ দিন। হলো 13। 13-কে 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল পেলেন 1 আর ভাগশেষ 6। গুণফলের প্রথম অঙ্ক বাঁ-দিক থেকে লিখুন 1। দ্বিতীয় অঙ্ক 7-কে দ্বিগুণ করে 1 যোগ দিয়ে পাবেন 15 এবং 1-এর জায়গায় আগের ভাগশেষ 6 বসিয়ে পেলেন 65। 65-তে 7 গেল 9 বার, ভাগশেষ রইলো 2। উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক লিখুন 9। গুণকের তৃতীয় অঙ্ক 6-কে 2 দিয়ে গুণ করে 1 যোগ করলে পাবেন 13 এবং আগের নিয়মে 1-এর জায়গায় আগের ভাগশেষ বসালে 23 হবে। 7 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল 3, ভাগশেষ 2। উত্তরের তৃতীয় অঙ্ক হবে তাহলে 3। এইভাবে 6769869-কে শেষ অঙ্ক পর্যন্ত একই কায়দায় গুণ করে 7 দিয়ে ভাগ করে যান এবং শেষ অঙ্ক 9-কে দ্বিগুণ করবার পর আর 1 যোগ দেবেন না। সর্বশেষ ভাগশেষ 2-কে নিয়ে আসুন সামনে এবং 26769869-কে 7 দিয়ে সাধারণভাবে ভাগ দিয়ে উত্তরটি লিখুন: 19342483824267। আপাতদৃষ্টিতে এই পদ্ধতিটি একটু গোলমেলে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে অভ্যাস করলেই নিয়মটি সহজে আয়ত্ত হয়ে যাবে। উপরের কায়দায় গুণ করবার পদ্ধতিটি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলেই বুঝতে পারবেন দ্বিতীয় গুণকের প্রত্যেকটি অঙ্ক 4-এর চেয়ে বড় হওয়ায় ব্যাপারটি কত সহজ হয়ে গেছে।

অঙ্কের যাদুকরেরা ঘনমূল (Cube root) এবং পঞ্চমমূল (Fifth root) অসামান্য দ্রুততার সঙ্গে করতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে এই খেলাও খুব সহজ এবং বর্তমান প্রবন্ধে শুধু ঘনমূল নির্ণয়ের কৌশলটি নিয়ে আলোচনা করবো। এই খেলাটি দেখাতে গেলে 1 থেকে 10-এর ঘন সংখ্যাগুলিকে (Cubes) মনে রাখতে হবে। মিনিট কয়েকের

চেষ্টায় নীচের টেবিলটি যে কেউ মনে রাখতে পারবেন।

অঙ্ক (x)	অঙ্কের 3য় ঘাত (x^3)
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729
10	1000

এই টেবিলটি মন দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 4,5,6 এবং 9-এর তৃতীয় ঘাতে মূল অঙ্কটি এসে হাজির হয়েছে; অর্থাৎ 64-এর শেষে 4 দেখলেই বলা যাবে 64-এর ঘন মূল হবে 4; অনুরূপ কারণে 125-এর 5, 729-এর 9 ইত্যাদি। তাহলে 4,5,6 এবং 9-এর তৃতীয় ঘাতের শেষ অঙ্কে যথাক্রমে 4,5,6 এবং 9 থাকবে এবং বাকী অঙ্কগুলির তৃতীয় ঘাতে এই অঙ্কগুলির কোন পুনরাবৃত্তি নেই বলে মনে রাখবার জন্যে কোনও রকম অসুবিধা দেখা দেবে না। বাকী 2,3,7 এবং 8-এর তৃতীয় ঘাতের মান দেখেও ঘনমূলটি বলে দেওয়া সহজ। কারণ 2-এর ঘনমান 8; এখন 10 থেকে এই ঘনমান 8 বাদ দিলে ঘনমূল 2 পাওয়া যাবে। 7-এর ঘনমান 343। 343-এর শেষ অঙ্ক 3 এবং 10 থেকে 3 বাদ দিলে ঘনমূল 7 পাওয়া যায়। অনুরূপে 512-এর ঘনমূল 8; কারণ $10-2=8$।

এবার কেউ যদি আপনাকে 912673-এর ঘনমূল নির্ণয় করতে বলে, তাহলে শেষের তিনটি অঙ্ক 673 বাদ দিয়ে 912 নিয়ে চিন্তা করুন। টেবিল থেকে দেখা যাচ্ছে 912 হলো 9-এর ঘনমান 729-এর বড় এবং 10-এর ঘনমান 1000-এর ছোট! তাহলে 912-এর ঘনমূল 9-এর বড় এবং 10-এর ছোট। আপনি ছোট অঙ্কটি বেছে নিন; অর্থাৎ উত্তরের প্রথম অঙ্ক হবে 9। এর পরে দেখুন 673-এর শেষ অঙ্কটিতে রয়েছে 3। কাজেই উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক হলো $10-3=7$; অর্থাৎ 912673-এর ঘনমূল হবে 97। দ্বিতীয় একটি উদাহরণ নিন। 91125-এর ঘনমূল কত? শেষ তিনটি অঙ্ক 125 বাদ দিলে থাকে 91 এবং 91 হলো 4 আর 5-এর ঘন-মানের মধ্যবর্তী কোন একটি সংখ্যা। তাহলে উত্তরের প্রথম অঙ্ক হবে 4 এবং যেহেতু 115-এর শেষে রয়েছে 5, তাই উত্তরের দ্বিতীয় অঙ্ক হবে 5; অর্থাৎ 91125-এর ঘনমূল হলো 45।

1968 সালের 12-ই জুন কি বার—প্রশ্ন করতেই যাদুকর জবাব দিলেন বুধবার। এই সাল-তারিখের খেলা অঙ্কের যাদুকরদের আর একটি অত্যন্ত প্রিয় প্রোগ্রাম। এই খেলাটি দেখিয়ে দর্শকদের প্রায় অবাক করে দেওয়া যায়। এই ম্যাজিকটি দেখাতে হলে আপনাকে আর একটি সূত্রের টেবিল মনে রাখতে হবে। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মাসের জন্যে একটি করে সাঙ্কেতিক অঙ্ক আছে। বছরের বারোটি মাসের জন্যে এই সাঙ্কেতিক অঙ্কগুলি হলো যথাক্রমে 144, 025, 036, 146। এই সাঙ্কেতিক অঙ্কগুলি মনে রাখবার জন্যে ওয়ালেস লীর সূত্রটি নীচে দেওয়া হলো:

মাস	সাঙ্কেতিক অঙ্ক	সূত্র
জানুয়ারী	1	A FIRST MONTH
ফেব্রুয়ারী	4	A COLD (চার অক্ষর) MONTH
মার্চ	4	THE KITE (চার অক্ষর) MONTH
এপ্রিল	0	ON APRIL FOOL'S DAY 1 FOOLED NO BODY.
মে	2	MAY DAY IS TWO WORDS.
জুন	5	THE BRIDE (পাঁচ অক্ষর) MONTH
জুলাই	0	ON JULY 4 I FIRE NO FIRE CRACKERS.
অগাষ্ট	3	A HOT (তিন অক্ষর) MONTH
সেপ্টেম্বর	6	START OF AUTUMN (ছয় অক্ষর)
অক্টোবর	1	A WITCH RIDES ONE BROOM
নভেম্বর	4	A COOL (চার অক্ষর) MONTH
ডিসেম্বর	6	BIRTH OF CHIRST (ছয় অক্ষর)

এই টেবিলটিকে সম্বল করে সাল-তারিখ-বারের খেলাটি দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। প্রশ্ন—1947 সালের 15ই অগাষ্ট কি বার ছিল? প্রদত্ত সালের শেষ অঙ্ক দুটি 47-কে 12 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফল 3, ভাগশেষ 11; অবশিষ্ট 11-কে 4 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগফল হলো 2। এখন প্রথম ভাগফল 3, প্রথম ভাগশেষ 11 আর দ্বিতীয় ভাগফল 2 যোগ দিন। যোগফল 16-কে 7 দিয়ে ভাগ দিয়ে শুধু ভাগশেষ 2 মনে রাখুন। এবার 2-এর সঙ্গে মাসের তারিখ আর প্রদত্ত মাসের সাঙ্কেতিক যোগ দিন। তাহলে 2+15+3=20 পাবেন। 20 কে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 6। এখন শনিবারকে 0 (শূন্য) ধরে পর পর ছ-টা দিন গুণে আসুন। তাহলে 1947 সালের 15ই অগাষ্ট ছিল শুক্রবার।

আরেকটা উদাহরণ নিন—1937 সালের 14ই মার্চ। 37-কে 12 দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফল 3, ভাগশেষ 1; 1-কে 4 দিয়ে ভাগ যায় না; তাই আপনি মনে মনে হিসাব করুন 3+1+0=4। 4-কে 7 দিয়ে ভাগ যায় না; তাই 4-এর সঙ্গে মাসের তারিখ আর সাঙ্কেতিক অঙ্ক যোগ দিয়ে পেলেন 4+14+4=22। 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 1; তাহলে দিনটি ছিল রবিবার। একটু অভ্যাস হয়ে গেলে 7 দিয়ে ভাগ দেবার ব্যাপারটিকে আরও সহজ করে ফেলা যায়। যেমন—তারিখটি যদি 24 কিংবা 9 বা অন্য কিছু হয়, তাহলে মাসের সাঙ্কেতিক অঙ্কের সঙ্গে মাসের তারিখ যোগ না করে আপনি 3 (24−21=3) বা 2 (9−7) যোগ দিতে পারেন। যাহোক, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে হিসেব করবার ক্ষমতাটি বেশ বেড়ে যায়। এভাবে 7 বাদ দিয়ে অঙ্ক করবার পদ্ধতি-কে অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা বলে থাকেন Modulo-7 !

আর বছরটা যদি লিপ ইয়ার হয়, আর মাসটা যদি জানুয়ারী কিংবা ফেব্রুয়ারী হয়, তাহলে অবিকল একইভাবে অঙ্ক করে গিয়ে একদিন বাদ দিয়ে বারটা হিসেব করুন। লিপ

ইয়ারের অন্যান্য মাসের জন্যে আর কোন পরিবর্তনের দরকার নেই। গ্রেগরিয়ান কালপঞ্জী অনুযায়ী শতাব্দীসূচক সালগুলিকে তখনই লিপ ইয়ার বলে ধরা হবে, যখন সালটি 400 দিয়ে বিভাজ্য হবে। এই হিসেবে 1900 লিপ ইয়ার নয়, কিন্তু 2000 লিপ ইয়ার।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার যে, বর্তমান পদ্ধতিটি দিয়ে শুধু এই শতকের বার নির্ণয় করা যাবে। অন্যান্য শতাব্দীর বার নির্ণয় করতে গেলে আবার কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন উনিশ শতকের জন্যে আপনাকে দু-দিন এগোতে হবে এবং একবিংশ শতাব্দীর জন্যে একদিন পেছিয়ে আসতে হবে। তবে উনিশ শতক ছাড়িয়ে আর পেছনে না যাওয়াই ভাল, কারণ 1752 খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় গ্রেগারিয়ান কালপঞ্জীর ব্যবহার আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বরের 4 তারিখের পর 11 দিন বাদ দিয়ে পরের দিনটিকে 15 তারিখ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই কালপঞ্জীর সংস্কার করা হয়েছিল 1582 সালে। তাই হিসেবে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে বলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ম্যাজিকটিকে টেনে না যাওয়াই ভাল।

ভারতের শকুন্তলা দেবীর বার নির্ণয়ের পদ্ধতিটি উল্লিখিত নিয়মের চেয়ে একটু আলাদা। শকুন্তলা দেবীও বছরের বারোটি মাসের জন্যে একই সাংকেতিক অঙ্ক 144, 025, 036, 146 ব্যবহার করে থাকেন। তবে তাঁর অঙ্ক কষবার নিয়মটি একটু অন্য রকম। 1967 সালের 28শে জানুয়ারী কি বার ছিল—শকুন্তলা দেবীর নিয়মে নির্ণয় করা যাক। প্রদত্ত সালের শেষ দুটি অঙ্ক 67 নিন। তার সঙ্গে 67-এর চার ভাগের এক ভাগ 16, মাসের তারিখ 28 আর সেই মাসের সাংকেতিক অঙ্ক 1 যোগ দিন। যোগফল 112-কে 7 দিয়ে ভাগ দিন। ভাগশেষ রইলো 0। তাহলে দিনটি ছিল শনিবার।

উনবিংশ শতকে নানা লোকে বার নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেও খুব সম্ভব লুই ক্যারলই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (Nature, Vol 35, March 31, 1887, P. 517)। ক্যারলের পদ্ধতিতে অনেকাংশে বর্তমান পদ্ধতির মতই এবং তাঁর ধারণা, যে কেউ চেষ্টা করলেই 20 থেকে 30 সেকেণ্ডের মধ্যে এই খেলাটি দেখাতে পারেন; তবে শকুন্তলা দেবী সেকেণ্ড কয়েকের বেশী সময় নেন না।

বিপরীত-কণা

অরবিন্দ দাশ*

বিপরীত-কণা (Anti-particle) বলতে আমরা স্বাভাবিক যে কোনও কণার সম্পূর্ণ অনুরূপ বিপরীত কণা (Counter part of a particle) বুঝি। বিপরীত-কণার আবিষ্কার পরমাণু-জগতে আলোড়ন এনেছে। অনেক জটিল তত্ত্বের সমাধান সম্ভব হয়েছে। অনেক তত্ত্ব জটিল হয়েছে। আজ প্রশ্নও উঠছে, বিপরীত-কণা মানুষের বন্ধু, না শত্রু?

পরমাণুতে যে ইলেকট্রন (ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা), প্রোটন (ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা) ও নিউট্রন (তড়িৎ-বিহীন একক ভরবিশিষ্ট কণা) রয়েছে, একথা আজ আর নূতন নয়। পরমাণুর এই উপাদান কণাগুলি নিয়ে নানাপ্রকার গবেষণা হয়েছে। ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণাকালে (1928) পি. এ. এম. ডিরাক আপেক্ষিক তরঙ্গবাদে তত্ত্বীয়ভাবে এক গুরুতর তথ্য পরিবেশন করেন। আইনষ্টাইনের ভর-শক্তি সমীকরণ, $E=mc^2$ অনুসারে আলোচ্য ক্ষেত্রে ডিরাক দেখলেন মোট-শক্তি, E_t-র জন্যে নিম্নলিখিত দু-প্রকার সমাধান সম্ভব:

$$E_t \geqslant {}^{+}mc^2 \text{ অথবা } \leqslant {}^{-}mc^2,$$

যেখানে $m=$ ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের ভর, $c=$ আলোর গতিবেগ। সুতরাং আঙ্কিক দিক থেকে ধনাত্মক ইলেকট্রন কণার (ইলেকট্রনের ভরযুক্ত কিন্তু বিপরীতভাবে আহিত) অস্তিত্ব সম্ভব।

1932 সালের কথা। কার্ল অ্যাণ্ডারসন তখন মিলিকানের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) ধর্ম অনুশীলন করছিলেন। এই প্রকার রশ্মিকে উইলসনের মেঘ-কক্ষে (Wilson's cloud chamber) শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এমন কিছু কুয়াশা-মার্গ (Fog tracks) পাওয়া গেল। তাদের বক্রতা পরিমাপ করে দেখা গেল যে প্রকার কণা এই কুয়াশা-মার্গ গঠন করেছে, তাদের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান, কিন্তু আধান ইলেকট্রনের বিপরীত। সত্যই ডিরাক-বর্ণিত কণার সন্ধান পাওয়া গেল! এই সকল কণাকে বিপরীত-ইলেকট্রন বা পজিট্রন ($^{0}_{+1}e$) বলা হয়েছে। গ্যাসীয় অণুর সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির ধাক্কায় এই জাতীয় কণার সৃষ্টি হয়। বিপরীত কণার কথা যিনি প্রথম বলেছিলেন ও যিনি গবেষণাগারে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন—সেই ডিরাক ও অ্যাণ্ডারসন—উভয়েই পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইলেকট্রন ও পজিট্রন—এই কণাযুগলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—কাছাকাছি হলেই নিজেদের পারস্পরিক অপমৃত্যু; অর্থাৎ কণা তার বিপরীত কণার সংস্পর্শে এলেই বিলীন (Annihilation) হয়ে যায় এবং পরিবর্তে তুল্যাঙ্ক (Equivalent) পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। প্রমাণিত হয়েছে, প্রায় 10^{-10} সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই একটি পজিট্রন একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক্স-রশ্মির দুটি ফোটনে রূপান্তরিত হতে পারে।

$$_{-1}^{0}e + _{+1}^{0}e \rightarrow 2\gamma, \quad [\gamma = \text{এক্স-রশ্মির একটি ফোটনের শক্তি}]$$
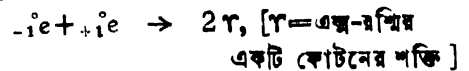
উল্লিখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনাও মহাজাগতিক রশ্মির পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা গেছে; অর্থাৎ উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি (প্রায়

---

* রসায়ন বিভাগ—রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়; নরেন্দ্রপুর, 24 পরগণা।

1 Mev [1]) থেকে একজোড়া ইলেকট্রন ও পজিট্রন সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কাজেই যে কোনও কণা-বিপরীত-কণা যুগলের জন্যে আমরা লিখতে পারি—

কণা + বিপরীত-কণা → শক্তি ;

বিপরীত ক্রমে, শক্তি → কণা + বিপরীত-কণা।

কেবলমাত্র মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারাই পজিট্রনের সৃষ্টি হয় না ; মৌলের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষাকালে আইরিন কুরী জোলিও ও ফ্রেডারিক জোলিও (1934) নিম্নলিখিত কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার দ্বারা পজিট্রন নির্গমন দেখিয়েছেন। অ্যালুমিনিয়ামের $\left({}^{27}_{13}Al\right)$ উপর আলফা রশ্মির দ্বারা আঘাত করলে প্রোটন ও নিউট্রন উৎপন্ন হয়—

$${}^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{1}_{1}p$$

$${}^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}p^{*} + {}^{1}_{0}n$$
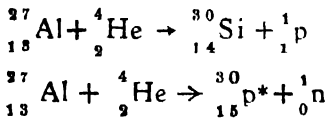
স্পষ্টতঃই আলফা রশ্মির উৎস সরালে প্রোটন ও নিউট্রন নির্গমন বন্ধ হবে ; কিন্তু জোলিও দম্পতি দেখলেন, এই অবস্থায় অ্যাণ্ডারসন-বর্ণিত পজিট্রন কণার নির্গমন বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, আবিষ্ট তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় আল্ফা-কণারূপে অ্যালুমিনিয়ামকে আহত (Irradiate) করলে প্রথমে তা অস্থায়ী মৌল সমস্থানিক তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাসে $\left({}^{30}_{15}p^{*}\right)$ পরিণত হয়। পরে তা পজিট্রন নিঃসরণ (Emission) করে ও সিলিকনের স্থায়ী সমস্থানিকে পরিবর্তিত হয়—

$${}^{30}_{15}P^{*} \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{+1}e$$

এইভাবে বিপরীত-ইলেকট্রন সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইলো না।

ডিরাকের মোট শক্তির সমীকরণ সকল মুক্ত-কণার (Free particles) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাদের ঘূর্ণনমাত্রা (Spin value)

$=\frac{1}{2}, \frac{h}{2\pi}$, h = প্লাঙ্ক ধ্রুবক। এরূপ কণার প্রত্যেকেরই তাই বিপরীত-কণা থাকবে। বিপরীত-প্রোটন (Anti-proton)-এর কথা ধরা যাক। আমরা দেখেছি, ইলেকট্রন-পজিট্রন কণা যুগলের সৃষ্টির জন্যে প্রায় 1 Mev শক্তির প্রয়োজন ; অতএব, প্রোটন ও বিপরীত-প্রোটন—এই কণাদ্বয় সৃষ্টির জন্যে প্রায় 1836 Mev পরিমাণ শক্তি লাগবে। [একটি প্রোটন একটি ইলেকট্রন অপেক্ষা প্রায় 1836 গুণ ভারী।] প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষের (Collision) দ্বারা একটি বিপরীত-প্রোটন উৎপন্ন হবার সমীকরণ নিম্নলিখিতভাবে লেখা হয়—

$$p^{+} + p^{+} \rightarrow (p^{+} + p^{+}) + (p^{+} + \bar{p}),$$

এক্ষেত্রে p^{+} = স্বাভাবিক প্রোটন, $\bar{p}$ = বিপরীত-প্রোটন। বিপরীত-প্রোটনের আধান প্রোটনের আধানের সমান, কিন্তু বিপরীত মানের ভর অবশ্য উভয় কণার একই। 1955 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণাগারে বিভাট্রন (Bevatron) নামক যন্ত্র থেকে প্রায় 6 Gev[2] যান্ত্রিক শক্তিবিশিষ্ট ত্বরিত প্রোটন-কণা ধাতুর উপর আঘাতের দ্বারা যে সকল কণা উৎপন্ন হয়, তাদের বিশ্লেষণ করে বিপরীত-প্রোটনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেছে। কপার ধাতুকে লক্ষ্যবস্তু (Target) হিসাবে ব্যবহার করে p^{+} : $\bar{p}$—এই কণাযুগলের সৃষ্টি ও তাদের পারস্পরিক অপমৃত্যু উভয়ই পরীক্ষা করা হয়েছে। এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব যাঁদের, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদ্বয়—সেগ্রে ও চেম্বারলেন।

---

1. 1 Mev = 1 মিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট = $1{\cdot}6 \times 10^{-6}$ আর্গ

* অস্থায়ী সমস্থানিককে এই চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে।

2. 1 Gev = 1 giga electron volt = $1{\cdot}6 \times 10^{-3}$ আর্গ।

বিপরীত-প্রোটন নিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এই জাতীয় কণা তরল হাইড্রোজেনে প্রবেশ করালে প্রায় 0.3% সংঘর্ষের দ্বারা নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে :

$\bar{p} + p^{+} \rightarrow n^{0} + \bar{n}$,
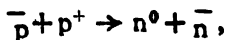
এই সমীকরণে n^{0} = স্বাভাবিক নিউট্রন, $\bar{n}$ = বিপরীত-নিউট্রন (Anti-neutron)। বিপরীত-নিউট্রন, নিউট্রনের সঙ্গে বিলীন হয়ে যে শক্তি উৎপন্ন করে, তার স্ফুরণ গণক যন্ত্রে (Scintillation counter) পরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে। বস্তুতঃ 1955 সালে বিপরীত-প্রোটন বিশ্লেষণকালে নিউট্রনকে বিলীন করতে সক্ষম—এরূপ কণা উৎপন্ন করা গিয়েছিল। পরের বছর বুদ্‌বুদ-কক্ষে (Bubble chamber) পরীক্ষাকালে এই কণা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।

উল্লিখিত বিপরীত-কণা ছাড়াও বিপরীত-মেসন (Anti-meson), বিপরীত-নিউট্রিনো (Anti-neutrino), বিপরীত-হাইপারন (Anti-hyperons) প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এক জাতীয় বিপরীত-কণা অন্য জাতীয় বিপরীত-কণাকে বিলীন করতে পারে না; তাই বিপরীত-নিউক্লিয়নের (Anti-nucleon) কথা বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন। বিপরীত-নিউক্লিয়ন হলো ঋণাত্মক তড়িদাহিত বিপরীত-পরমাণুর (Anti-atom) কেন্দ্রক, যেখানে বিপরীত-পরমাণুর মোট বিপরীত-নিউট্রন সংখ্যা ও বিপরীত-প্রোটন সংখ্যা পুঞ্জীভূত আছে। বস্তুতঃ বিপরীত-ডয়টেরন (ডয়টেরন হলো Deuterium বা ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রক) গবেষণাগারে প্রস্তুত করা হয়েছে। 1965 সালে প্রথম বিপরীত-নিউক্লিয়ন সৃষ্টি করে যিনি ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করেছেন, তিনি হলেন—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লেডারম্যান (Prof. Lederman)। ব্রুকহেভেন জাতীয় গবেষণাগারে পরমাণুপেষক কসমোট্রন (Atom-smasher cosmotron) নামক যন্ত্র থেকে প্রায় 30 Gev শক্তি প্রয়োগে এরূপ নিউক্লিয়ন গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এই বিপরীত-নিউক্লিয়নটিতে আছে একটি বিপরীত-প্রোটন ও একটি বিপরীত-নিউট্রন।

এই ধারণাকে একটু বাড়িয়ে নিলে আমরা যে কোনও পরমাণুর জন্যে বিপরীত-পরমাণুর কথা চিন্তা করতে পারবো। পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এখন আমাদের যে ধারণা আছে, তাথেকে বলতে পারা যায়—প্রোটন ও নিউট্রন কণাসমূহ কেন্দ্রক গঠন করে, আর এই কেন্দ্রকের বাইরে ঘুরতে থাকে প্রোটনের সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন; অর্থাৎ বিপরীত-পরমাণুর বেলায় তার কেন্দ্রে থাকবে বিপরীত-প্রোটন, ও বিপরীত-নিউট্রন আর এই কেন্দ্রকের বাইরের খোলে থাকবে ঘূর্ণায়মান পজিট্রনসমূহ। উদাহরণস্বরূপ, অক্সিজেন পরমাণুর ($^{16}_{8}O$) কথা ধরা যাক। আমরা জানি, এই মৌলের কেন্দ্রে আছে আটটি করে প্রোটন ও নিউট্রন এবং তার চারধারে আছে আটটি ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন। তাহলে বিপরীত-অক্সিজেন (Anti-oxygen) পরমাণুর কেন্দ্রে থাকবে আটটি করে বিপরীত-প্রোটন ও বিপরীত-নিউট্রন (কেন্দ্রক হবে ঋণাত্মক তড়িতাধান যুক্ত) এবং এই কেন্দ্রকের বাইরে ঘুরতে থাকবে আটটি পজিট্রন। এই বিপরীত-অক্সিজেন পরমাণু যদি কোনও ক্রমে সাধারণ অক্সিজেন পরমাণুর সংস্পর্শে আসে, তবে তারা উভয়েই বিলীন হবে আর উদ্ভব হবে দুটি পরমাণুর ভরের তুল্যাঙ্ক পরিমাণ শক্তির। এভাবে পর্যায়সারণীর প্রত্যেক মৌল-পরমাণুর জন্যে বিপরীত-পরমাণুর কথা বলা যেতে পারে। বিপরীত-পরমাণু সম্ভব হলে বিপরীত-অণুর কথাও কল্পনা করা যেতে পারে। বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে তবে আমরা বিপরীত-বিশ্বের (Anti-world) কথা বলতে পারি। সেই বিশ্বের যে

কোনও একজন বাসিন্দা মিঃ এক্সের কল্পনা করাও ভুল হবে না। আমাদের বিশ্বের মি. এক্সের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবেন, তবে ইনি যদি বিপরীত-মি. এক্সের (Anti-Mr. X) সঙ্গে করমর্দন করতে যান, তবেই বিপদ! তাঁদের দু-জনার পরিবর্তে পাওয়া যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ-সহ শক্তির ঝলক।

বিশ্বে যত কণা আছে তত বিপরীত-কণাও আছে, আর যদি তাদের পরস্পর মিলন হয়, তবে বেরিয়ে আসবে পর্যাপ্ত শক্তি—ডিরাকের তত্ত্বের এই যে ধারণা. এর সম্বন্ধে বেশ কিছু আভাস বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। মহাকাশের কিছু কিছু ছায়াপথ, নীহারিকা ইত্যাদির বিস্ফোরণসহ অবলুপ্তি তাদের বিপরীত-বস্তুর (Anti-matter) সংঘর্ষের দ্বারাই ঘটা সম্ভব, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 1908 সালে জুনের শেষে সাইপ্রাসে যে অস্বাভাবিক বিস্ফোরণ হয়েছিল, তার তদন্ত করতে গিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকার বিজ্ঞানী লিবি (Libby) প্রমাণ করেছেন—এই বিস্ফোরণ বিপরীত-উল্কাপিণ্ডের (Antirock meteorite) দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। বিজ্ঞানীমহলে বিপরীত-কণার ব্যবহার সম্বন্ধে বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা চলছে। আমেরিকান পদার্থবিদ্ এডওয়ার্ড ম্যাকমিলান ও অন্যান্যেরা বিপরীত-কণার দ্বারা চালিত মহা-জাগতিক রকেটের (Cosmic rocket) কথা উল্লেখ করেছেন। এই রকেটের ইঞ্জিনে কণা ও বিপরীত-কণার সংঘর্ষে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হবে এবং সেই শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে দিলে রকেটটি মহাকাশে আলোর সমান গতিবেগে চলবে। তার ফলে মহাকাশের যে কোনও গ্রহ বা নক্ষত্রে খুব সহজেই যাওয়া যাবে এবং আজকের মহাকাশ অভিযানের সার্থক রূপায়ণ সেদিনই হবে। আজ আমরা চাঁদে যাচ্ছি—সেদিন আমরা 1,500,000 আলোকবর্ষ দূরে অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda) ছায়াপথে বেড়িয়ে আসতে হয়তো বা যাব—এরূপ সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছেন বিজ্ঞানী ম্যাকমিলান। এই সংবাদ শুনে নিশ্চয়ই আমাদের শিহরণ ও পুলক জাগে। কণা ও বিপরীত-কণা মিলিত হলেই বিস্ফোরণ হয়—এই ধারণা নিয়েই মহাজাগতিক বোমার (Cosmic bomb) কথাও ভেবেছেন কেউ কেউ! এই বোমার ভিতরে পৃথক পৃথকভাবে কণা ও বিপরীত-কণার উৎস থাকবে এবং এমন ব্যবস্থা করা হবে, যাতে ঠিক বিস্ফোরণের আগে তারা মিলিত হয়। এই জাতীয় বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া যে অকল্পনীয় ভয়াবহ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি! এই জাতীয় বোমায় যে পরিমাণ কণা ও বিপরীত-কণা থাকবে, তার 100%-ই শক্তিতে রূপান্তরিত হবে, তাই কয়েক টন বিপরীত-কণা হলেই এক নিমেষে পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করা যেতে পারে। এভাবে বিপরীত-কণার আবিষ্কার মহাজাগতিক রকেটের সম্ভাবনার দ্বারা অজানাকে জানবার যেটুকু সুযোগ এনে দেয়, মহাজাগতিক বোমার ধ্বংসাত্মক রূপ আমাদেরকে আবার বহুগুণ স্তিমিত করে দেয়। তাহলে আমরা আবার সেই একই প্রশ্নের সম্মুখীন—বিপরীত-কণা আবিষ্কার মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, না অভিশম্পাত?

আলোক-গতির বেশী

সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ

মহাশূন্যে পৃথিবীর গতিবেগ কত? এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মৌলিক কয়েকটি পরীক্ষার অবতারণা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের A. Michelson ও E. Morley দুটি আলোক-কিরণ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। তাঁরা পৃথিবীর গতির দিকে একটি কিরণ এবং অপরটি বিপরীত দিকে ব্যবহার করেন। সাধারণ আপেক্ষিক গতিবেগ থেকে আমরা জানি যে, যদি কোন গতিশীল স্থানের গতিবেগ x হয় এবং ঐ স্থান থেকে যদি কোন বস্তু একই দিকে y গতিবেগে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে বস্তুটির সংহত গতিবেগ $Z = x + y$ হয়। কিন্তু Morley এবং Michelson বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, একই দিকের এবং বিপরীত দিকের আলোক-কিরণ দুটির সংহত গতিবেগ একই রয়ে গেল! ঘটনাটা খুব সাধারণ নয়। কারণ আলোকের গতিবেগের এই অদ্ভুত ব্যবহার সোজাসুজি গ্যালিলিও ও নিউটনের বলবিদ্যার এতদিনকার তত্ত্বকেই চরম আঘাত করে বসলো। আলোক-কিরণের এই আশ্চর্য ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত শোনা গেল। কিন্তু অ্যালবার্ট আইনস্টাইন 1905 সালে তাঁর আপেক্ষিতা তত্ত্বের মাধ্যমে পুরনো ধ্যানধারণা আর সুপ্রচলিত গণিত-শাস্ত্রের সমস্ত চিন্তাকে পাল্টে দিলেন। স্থান-কালের পুরনো ধারণায় আলোড়ন এনে তিনি বললেন—আলোক-তরঙ্গের চেয়ে অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন বস্তুকণার অস্তিত্ব সম্ভব নয়, নচেৎ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল নিয়মগুলি অগ্রাহ্য করা হয়। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে, আলোকের গতিবেগ একটি ধ্রুবক এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ গতিবেগ। সুবিখ্যাত Lorentz-এর নিয়ম দেখায় যে, কোনও বস্তু-স্থিত ভর যদি m_0 হয় এবং তার গতিবেগ ও গতি-ভর যদি যথাক্রমে v ও m_v হয়, তবে—

$$m_v = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

যেখানে c হলো আলোকের গতিবেগ। কোনও বস্তুকণার v যত বাড়বে m_v-ও বাড়বে। কিন্তু যখন $v=c$ হবে, তখন $m_v=\infty$ হয়ে যাবে, যা অসম্ভব। আবার v যদি c-এর চেয়ে বেশী হয়, তখন ডানদিকের হর কাল্পনিক সংখ্যায় পরিণত হয়। কাজেই আপেক্ষিতা তত্ত্বানুযায়ী আলোকের গতিবেগ শুধু ধ্রুবক নয়, গতিবেগের উচ্চতম সীমা—যাকে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একটি লিমেরিক তৈরিও হয়ে গেল—

স্বাতী নামে একটি মেয়ে মামাবাড়ী যেতে
'আইনস্টাইন এক্সপ্রেসে' চড়ে রওনা হলো পথে;
আলোর চেয়েও বেশী জোরে
আজ সকালে গাড়ী চড়ে
আনন্দেতে পৌঁছলো সে গতকাল রাতে!

কার্যক্ষেত্রেও সত্যই দেখা গেল, পারমাণবিক বস্তুকণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের কাছাকাছি গেলেও তা পেরিয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু সাধারণ নিয়মানুযায়ী বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধি করে তার গতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেও আইনস্টাইনের নিয়মকেই গ্রহণযোগ্য বলে ধরলেন। আলোকের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও স্থানাঙ্ক পরিবর্তনের নিয়মও (Galilean law of transformation of co-ordinates) খাটলো

না। গতিবেগের বেড়া হিসাবে আলোক-গতি $c = 3 \times 10^8$ মিটার/সেকেণ্ড থেকে গেল।

কিন্তু তবুও একটি প্রশ্ন থেকেই গেল। Limit-এর সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী

$$\underset{v \to c}{Lt} \frac{m_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

বললে কিছুই বোঝায় না। কারণ v, c-এর কাছাকাছি ঠিক কথা। কিন্তু v কম থেকে বেশী হয়ে c-এর সমান চলেছে, না বেশী থেকে কম হয়ে c-এর সমান হতে চলেছে, সেটা দেখতে হবে; অর্থাৎ v এবং m_o রেখচিত্র continuous বা discontinuous হোক, তার বাঁ-দিক ও ডানদিক চরিত্র থাকবেই। ব্যাপারটা গাণিতিক যুক্তি (Mathematical logic), কঠিন মনে হলেও অর্থাৎ c-এর সমান না হতে পারলেও c-এর চেয়ে কম গতিবেগসম্পন্ন বস্তুকণা থাকলে c-এর চেয়ে বেশী গতিবেগ-সম্পন্ন বস্তুকণা থাকা সম্ভব; অর্থাৎ এই সম্বন্ধে আইনস্টাইনকে চরম বলে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিলেন না। প্রথম দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে মনে হলেও এর সম্ভাব্যতা দূর হলো না।

নিউ ইয়র্কের ভারতীয় নবীন বিজ্ঞানী ই. সি. জি. সুদর্শন এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি কিছু বস্তুকণার অস্তিত্বের কথা বলেছেন, যার গতিবেগ আলোক-গতির চেয়েও বেশী। যদিও সুদর্শন এর চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে যথেষ্ট নিশ্চিত নন, তবে আইনস্টাইনের তত্ত্বের পরবর্তী অধ্যায়ে এই বস্তুকণাগুলি বহু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে। এগুলিকে বলা হয় ট্যাকিয়ন (Tachyon)। আমরা সমগ্র বস্তুজগৎকে গতিবেগের বিশেষত্বে তাহলে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(1) সাধারণ বস্তুকণা, যার গতিবেগ আলোক-গতির কম; অর্থাৎ $v < c$;

(2) যে বস্তুকণার গতিবেগ আলোক-গতির সমান; অর্থাৎ $v = c$। এদের ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত করা যায় না।

(3) ট্যাকিয়ন, যার গতিবেগ আলোক-গতির বেশী; অর্থাৎ $v > c$।

আমরা যদি H. A. Lorentz-এর পূর্ব-ব্যবহৃত সমীকরণটি আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অনুযায়ী লিখি, তাহলে দাঁড়ায়—

$$E = \frac{m}{\sqrt{1 - q^2}}, \text{ যেখানে } q = \frac{v}{c}$$

(43-তম সমীকরণ)

E-কে যদি q^2-এর ঘাতে উন্নীত করা যায়, তবে

$$E = m + \frac{m}{2}q^2 + \frac{3}{8}mq^4 + \cdots$$

স্পষ্টতঃই $q = o$ হলে, অর্থাৎ বস্তুকণাটি যখন থেমে আছে, তখন $E = m$ হয়। আইনস্টাইন সিদ্ধান্তে এলেন, 'ভর ও শক্তি অতএব নিশ্চিতই এক'। কিন্তু প্রশ্ন হলো, q যখন 1 থেকে বেশী $(q > 1)$, তখন হরটি কাল্পনিক হয়ে যায়। ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে এই অসম্ভব ব্যাপারটি সম্ভব হয় কতকগুলি ধারণার উপর। প্রথমতঃ স্থিত-ভর m_o-ই তো ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে কাল্পনিক। কাজেই শক্তির হর যদি কাল্পনিক সংখ্যা $(\sqrt{-1})$ সমেত হয়, তবে কাল্পনিক m_o-ই শক্তি E-কে বাস্তব সংখ্যা করে তোলে। ট্যাকিয়ন কিন্তু কখনই থামতে পারে না। কারণ তাহলে তাকে আলোক-গতির বেড়া অতিক্রম করতে হয়। সব সময়েই ট্যাকিয়নের গতিবেগ আলোক-গতির বেশী, কখনই সমান হয় না। ধরা যাক, একটি বস্তুকণা i বিন্দু থেকে বিকিরিত হলো এবং j বিন্দুতে শোষিত হলো। যদি একটি সরলরেখা i এবং j বিন্দু দিয়ে টানা যায়, তবে তা হবে i ও j-এর স্থান-অক্ষরেখা। যদি স্থান ও সময় অক্ষকে x এবং t বলি, তবে ঘটনা দুটিকে (xi,ti) এবং (xj,tj) বলা যেতে পারে। স্পষ্টতঃই

$t_j > t_i$। প্রথম দর্শকের আপেক্ষিক অপর কোন একজন দর্শকের যদি ঐ একই ঘটনার স্থানাঙ্কদ্বয় (x'_i, t'_i) ও (x'_j, t'_j) হয়, তবে ট্যাকিয়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দর্শকের গতিবেগের উপর নির্ভর করে সময়ের অবস্থা উল্টে যেতে পারে; অর্থাৎ $t'_i > t'_j$, বলাই বাহুল্য দ্বিতীয় গতিশীল দর্শক শোষণ আগে দেখবে পরে বিকিরণ দেখবে। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে। শক্তি E ও ভরবেগ P-এর পরিবর্তনের সমীকরণ দুটি হলো—

$$E'(E - v.p) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \text{ এবং}$$

$$P' - \left(P - \frac{V.E}{c^2}\right) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

যেহেতু ট্যাকিয়নের $v > c$, সেহেতু গতিশীল দর্শকের কাছে পরিবর্তিত শক্তিকে বিপরীত চিহ্নের মনে হবে। কাজেই যদি দর্শক j-কে বিকিরণ এবং i-কে শোষণ হিসাবে নথীভুক্ত (Record) করে তবেই ট্যাকিয়নের ধনাত্মক শক্তি লক্ষ্য করা যাবে; অর্থাৎ আমাদের কাছে ট্যাকিয়নের বিকিরণ ও শোষণ পরস্পর পরিবর্তনশীল।

বিশ্বজগতের বহু ধারণাই হয়তো ট্যাকিয়ন পাল্টে দেবে। কোয়াসার (Quasi Stellar Radio Sources) সম্বন্ধে যে সমস্যা উঠেছে বা বিশ্বের প্রসারণের সমস্যা, এই সবের উত্তরই হয়তো ট্যাকিয়ন দিতে পারবে। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের তারাগুলি বিপুল বেগে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব তো শেষ হবে না! আবার শক্তি থেকে ভর আসবে, ভর থেকে শক্তি হবে। কাজেই এক দর্শকের কাছে যেটা শোষণ, অপর দর্শকের কাছে সেটা বিকিরণের মত—হয়তো এক মহাবিশ্বের ধ্বংস অপর এক মহাবিশ্বের জন্মের ট্যাকিয়নীয় সিদ্ধান্ত। এটা ঠিক, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পর ট্যাকিয়ন হলো গাণিতিক পদার্থবিদ্যার এক আলোড়নকারী পদক্ষেপ!

মহাবিশ্বে প্রাণ

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

আদি অন্তহীন মহাবিশ্বের কোন এক ছায়াপথের কোন এক সৌরজগতে পৃথিবী নামে যে গ্রহটি আছে, তারই একজন কবি একদিন গেয়েছিলেন, "মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে/আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে…"! কিন্তু আজ সেই গ্রহের অধিবাসী মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, এই বিশাল মহাবিশ্বে সে কি সত্যই একাকী! নিঃসীম অন্তলস্পর্শী এই ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও কি প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় নি?

এই প্রশ্নের জবাব কয়েক দশক আগেও যেভাবে দেওয়া যেত, এখন আর সেভাবে দেওয়া যায় না। কিছুদিন আগেও এটা ছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে, গল্প-গুজবের আসরে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আকস্মিকভাবে প্রশ্নটা বিজ্ঞানের আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

মানুষের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মানব-মনীষা এমন বহু জিনিষ আবিষ্কার করেছে, যা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত, মানুষের কল্পনার পথ ধরেই এসেছে

বাস্তব বিমানপোত, মারণাস্ত্র বা মহাকাশযান। মহাশূন্যে প্রাণের ব্যাপারটাও অনেকটা সেরকম। মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও উন্নত সভ্যতা আছে কিনা, বিজ্ঞান যখন এ নিয়ে মাথা ঘামানো সুরু করে নি, তখন থেকেই মানুষ কল্পনা করতে ভালবাসে মহাশূন্যে কোথাও তারই মত কোন সভ্য জীব রয়েছে। তাই গ্রহান্তরের আগন্তুকের পৃথিবী ভ্রমণ নিয়ে বহু গল্পও রচিত হয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলস্-এর "War of the worlds" এমনই একটি গল্প। এটিকে নিয়ে একবার একটি মজার কাণ্ড হয়। অভিনেতা অর্সন ওয়েলস ঐ উপন্যাসটির বেতারভাষ্য তৈরি করে একবার নিউইয়র্ক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছিলেন। তখন সভ্যতাভিমানী আমেরিকার বহু নাগরিক তা শুনে অন্য কোন গ্রহের জীব সত্যই এসে পৃথিবী আক্রমণ করেছে ভেবে শহর ছেড়ে পালাতে লাগলো। পালাবার দাপটে কত লোক হাত-পা ভাঙলো, কত সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি হলো! ব্যাপারটা যখন অনুষ্ঠান শেষে বোঝা গেল, তখন সুরু হলো হাসাহাসি। বেচারী অর্সন ওয়েলসকে এর জন্যে ক্ষমাও চাইতে হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, মানুষ এসব কল্পনা করতে ভালবাসে। ভালবাসে বলেই সে গ্রহান্তরে সভ্যতার কল্পনা করে, আকাশে 'উড়ন্ত চাকি' দেখে।

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ আজ এমন স্তরে পৌঁচেছে যে, উড়ন্ত চাকিকে আর অলস মস্তিষ্কের কল্পনাবিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রটনা এখন বাস্তবসম্মত ঘটনায় পরিণত হতে চলেছে। এই উড়ন্ত চাকি ছাড়াও আরও এমন কতকগুলি ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে, যার ফলে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা বিজ্ঞানীই গ্রহান্তরে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করেছেন। তাঁরা যে এ নিয়ে শুধু অনুসন্ধান করছেন তাই নয়, তাঁদের অনেকে এতে বিশ্বাসও করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন এমন কিছু প্রথিতযশা মনীষী, যাঁদের মতামতকে লঘু করে দেখা সমীচীন নয়।

ধারণা এবং অনুমান

মহাবিশ্বে আর কোথাও প্রাণ আছে কিনা, এই অনুসন্ধান সুরু হওয়া উচিত আমাদের সৌরজগতেরই ভিতর থেকে। চাঁদই হচ্ছে মহাকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী. কিন্তু প্রাণের দিক দিয়ে সে আমাদের নিরাশ করেছে। তারপর মঙ্গল—যেখানে উন্নত সভ্যতার অস্তিত্ব নিয়ে কিছুদিন আগেও মানুষের ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। কিন্তু আধুনিকতম মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণও সেখানে জীবনের কোন সন্ধান দিতে পারে নি। তারপর মেঘের ঘোমটাটানা শুক্র—মানুষের মহাকাশযান যার বুকে অনুসন্ধান চালিয়েছে। কিন্তু মেঘাবরণের অন্তরালে কোন প্রাণকণিকার সন্ধান এখন পর্যন্ত মেলে নি। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা যা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাদের সৌরজগতে জীবনের দ্বিতীয় কোন লীলাভূমি সম্পর্কে নিরাশ হতে হয়। আর যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় আমাদের সৌরজগতে অন্য কোথাও প্রাণ আছে, তবে তা অতি নিম্নস্তরের না হয়ে যায় না।

এখন আমাদের দৃষ্টি আরও দূরে প্রসারিত করা যাক। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা তাই করেছেন। যে অসংখ্য তারা নিয়ে মহাশূন্যে বিশাল ছায়াপথের সৃষ্টি, আমাদের সূর্যের মত ঐসব তারারও কি কোন প্রাণময় গ্রহ থাকতে পারে না? সূর্যকে বাদ দিলে আমাদের নিকটতম তারা হচ্ছে আলফা সেন্টরাই—এর কোন প্রাণময় গ্রহ থাকবার সম্ভাবনা নেই। যে সব তারার

এই সম্ভাবনা আছে, তার মধ্যে আমাদের নিকটতম হচ্ছে টাউ সেটি এবং এপসিলোন এরিডানি (সূর্য থেকে দূরত্ব যথাক্রমে 11·2 এবং 10·7 আলোকবর্ষ)। আমেরিকার গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা এর দিকে অনবরত লক্ষ্য রাখছেন। জ্যোতির্বিদ্ ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক 1960 সালে আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রদেশের এক রেডিও মানমন্দির থেকে ঐ দুটি তারার উপর পর্যবেক্ষণ চালান। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয় 'আজমা'। প্রথম চেষ্টাতেই প্রথম তারাটি থেকে তিনি একটি নিয়মিত শব্দ ধরতে সক্ষম হন, কিন্তু দশ মিনিট পরে বুঝতে পারেন যে ওটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলেরই উচ্চ স্তরের কোন উৎসজাত। এভাবে 'আজমা' প্রকল্প বিফল হয়।

এবার দেখা যাক, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা কি বলেন। 1953 সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ্ হার্লো শাপ্‌লি বলেছেন, মহাবিশ্বে প্রায় দশ কোটি তারার প্রাণময় গ্রহ থাকবার সম্ভাবনা আছে। গত 1966 সালেও তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্রহ জুড়ে জীবনের অপরূপ খেলা চলছে। তিনি বলেছেন, বর্তমান গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আমাদের সূর্য যেমন লক্ষ কোটি তারায় তারায় খচিত ছায়াপথের অন্তর্গত, ব্রহ্মাণ্ডে তেমন ছায়াপথ অন্ততঃ কয়েক শত কোটি রয়েছে। একটি ছোট-খাটো ছায়াপথেই আমাদের সূর্যের মত দশ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে। সুতরাং বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় আমাদের পৃথিবী কতটুকুই বা! আর এই পৃথিবীর মানুষ আমরা বিপুল এই ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু জানি? ডক্টর শাপ্‌লি আরও বলেছেন, আমাদের গ্রহ থেকে শতকোটি আলোকবর্ষ দূরে অন্ততঃ এমন দশ কোটি গ্রহ আছে, যেখানে পৃথিবীরই মত সজীব প্রাণী, অর্থাৎ তরুলতা, তৃণভূমি বা মানুষ জাতীয় জীব রয়েছে, আমরা তাদের খোঁজ না পেতে পারি, কিন্তু তাদের অস্বীকারও করতে পারি না। ডক্টর শাপ্‌লির এই মত সমর্থন করেছেন আরও তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী।

সমসাময়িক আরও বহু বিজ্ঞানী নিজেদের যে সব মতামত ইদানীং কালে প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রকারান্তরে ঐ ধারণারই সমর্থন মেলে। মার্কিন বিজ্ঞানী কার্ল সেগান ও সোভিয়েট বিজ্ঞানী যোসেফ স্কলভ্‌স্কি যুগ্ম প্রচেষ্টায় পত্র-মারফৎ মত বিনিময় করে একটি বই লিখেছেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মহাবিশ্বে আমাদের ছায়াপথেই অন্ততঃ দশ লক্ষ গ্রহে উন্নত সভ্যতা আছে। যে রাসায়নিক ঘটনা-বৈচিত্র্যে মানুষের সৃষ্টি, সেই একই কারণে অন্য গ্রহেও মানুষের মত জীব সৃষ্ট হয়ে থাকতে পারে এবং তারা হয়তো পৃথিবীতে সফরও করে গেছে। যদিও তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, পৃথিবীর বুকে এর কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবু পৃথিবীর বাইরের প্রমাণ অর্থাৎ নীহারিকা, তার গ্রহাণু-পুঞ্জ, প্রাণের সম্ভাবনাময় গ্রহ ইত্যাদির উপর নিরীক্ষা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গ্রহান্তরের সভ্য অধিবাসীরা এর পূর্বে অন্ততঃ দশ হাজার বার পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। যাই হোক, পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী মহলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখন এই মতের পৃষ্ঠপোষক।

সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর ফিওদোরভও বলেছেন সেই কথাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরও আশ্চর্য এক কাহিনী শুনিয়েছেন। ডক্টর ফিওদোরভ বলেছেন, পৃথিবীতে মানুষের আবি-র্ভাবেরও আগে গ্রহান্তরের সুসভ্য প্রাণীরা পৃথিবীতে এসেছিল। তখন এই নবীন গ্রহে তাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ ছিল না। তাই সেই সব আগন্তুক এই পরিবর্তনশীল পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার সময় শনি ও সূর্যের মাঝামাঝি দুটি অজ্ঞাত গ্রহের গায়ে তাদের অভিযান কাহিনী লিপিবদ্ধ করে

গেছে এই আশায় যে, ভাবীকালের পৃথিবীর বাসিন্দারা মহাকাশচারণাবিদ্যা আয়ত্ত করে তাদের এই পৃথিবী আবিষ্কারের কাহিনী জানতে পারবে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহাকাশে না গিয়েই কি করে তা জানতে পারলেন, সে কথা তিনি আর জানান নি।

পূর্বোল্লিখিত রুশ বিজ্ঞানী স্কলভ্‌স্কি বলেছেন যে, গ্রহান্তর থেকে আগত বেতার-বার্তা ধরবার জন্যে একটি বিরাট রেডিও টেলিস্কোপ যদি সর্বক্ষণ মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়, তবে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পনেরো-কুড়ি বছরের মধ্যেই আমরা গ্রহান্তরের বার্তা ধরতে সক্ষম হবো। এই সম্ভাবনার জন্যে পৃথিবীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ এই চেষ্টা করবার প্রস্তুতি রাশিয়ায় চলছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কতকটা একই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে থেকে মহাশূন্যে ভেসে আসা আলোক ও বেতার-তরঙ্গকে অবিকৃতভাবে ধরবার জন্যে 1966 সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহের আকারে পুরা একটি বেতার মানমন্দির মহাকাশে পাঠিয়েছে। এরকম প্রচেষ্টা এর পরেও বিজ্ঞানীরা করেছেন।

বছর ছয়েক আগে আটজন রুশ বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে একটি সাময়িক পত্রিকায় এই মত প্রকাশ করেন যে, মহাকাশ থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে অনবরত গ্রহান্তরের কোন সুসভ্য জীব বার্তা পাঠাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাতে সাড়া দিতে না পারায় তা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

বৃটেনের জোড্‌রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অধ্যক্ষ বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেল একাধিক স্থানে বলেছেন, বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একাধিক গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের খুবই সম্ভাবনা আছে। তিনি বলেন, নীহারিকার মেঘপুঞ্জের মধ্যে প্রাণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদার্থ নিশ্চয়ই রয়েছে। স্যার লোভেল আরও বলেছেন যে, অন্য গ্রহের বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে পৃথিবীর সমস্ত সামরিক বেতারযন্ত্র ও বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগাতে হবে।

ঘটনা ও রটনা

এই তো গেল বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ও অনুমানের কথা। এখন দেখা যাক, মহাবিশ্বে প্রাণ আছে, এমন অনুমান করবার সপক্ষে কি কি প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং সেগুলি কতটা সত্য। প্রথমে বেতার-তরঙ্গের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানীরা একাধিকবার মহাকাশ থেকে ভেসে আসা বেতার-তরঙ্গ ধরে সবিস্ময়ে দেখেছেন, এর উৎস বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন জ্যোতিষ্ক এবং এই বেতার-তরঙ্গের ধ্বনি বিরতির সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য দেখে অনুমান করেছেন, কোন সুসভ্য প্রাণীই এর প্রেরক।

1932 সালে জ্যোতির্বেত্তা জানস্কি তাঁর গবেষণাগারে 100 আলোকবর্ষ দূরের এরকম এক বার্তা শুনতে পান এবং তাঁর কথা শুনে আরও বহু বিজ্ঞানী তা ধরতে সক্ষম হন। 1965-এর এপ্রিল মাসে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা "এস-টি-এ-102" নামে কোটি মাইল দূর থেকে ভেসে আসা এক বেতার-তরঙ্গ ধরতে সক্ষম হন। 1967 সালের নভেম্বরে বৃটেনের মুলারড মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা মহাকাশের "কোন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণসত্তার আহ্বান" শুনে চমকে ওঠেন। অতি সূক্ষ্ম রেকর্ডিং যন্ত্রে প্রতি 1·337 সেকেণ্ড অন্তর 'বিক্‌' 'বিক্‌' ধ্বনি ধরা পড়ে। বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় 200 আলোকবর্ষ দূরের কোন উৎস থেকে এই সঙ্কেত আসছে। এত সমান সময় অন্তর এই রকম সবিরাম ধ্বনিপ্রবাহ এর আগে আর কখনও আসে নি। তাই বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, কোন বুদ্ধিবৃত্তিশীল জীবই এই সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা উৎসটির নাম দিলেন "সবুজ মানুষের দেশ"। এই দেশকে মহাকাশের

অন্তহীন বিস্তৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাঁচজন বিজ্ঞানী। এঁদের নেতা অধ্যাপক সার মার্টিন রাইল বলেছেন, এই ঘটনার একটি অন্য রকম সিদ্ধান্তও সমান জোরদার। এই অভূতপূর্ব বেতার-সঙ্কেত কোন নিউট্রন তারকার ধ্বংস সঙ্কেতও হতে পারে। দুগ্ধপথ নীহারিকার বাসিন্দা বহু দূরের এই নক্ষত্রগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে হতে মিলিয়ে যায়। এর ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহবস্তু বেতার-তরঙ্গ হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য মহাশূন্যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণীর মত নিউট্রন তারকার অস্তিত্বও এখন পর্যন্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত মাত্র। তাই এই বেতার-সঙ্কেতকে মহাবিশ্ব সভ্যতার নিশ্চিত প্রমাণ বলে ধরা না গেলেও অন্যতম অনিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে করা যেতে পারে।

এরপর উড়ন্ত চাকির কথায় আসা যাক। বিজ্ঞানীমহলে এগুলিকে বলা হয় অচেনা উড়ন্ত বস্তু বা unidentified flying object, কিংবা এগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে UFO বা উফো। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম-বেশী উফো দেখা গেছে—এমন কি, এই মুনি-ঋষির দেশ সনাতন ভারতবর্ষও বাদ যায় নি। বিভিন্ন ব্যক্তি এর বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিয়েছেন—অপরূপ বৈচিত্র্যময় সব বর্ণনা! কত রকম এর আকার, আয়তন, গতিবিধি, আলো, বেগ এবং শব্দ! এই উফোর যত প্রত্যক্ষদর্শী আছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন সমীক্ষা এবং তদন্ত চালানো হয়েছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, কেউ কেউ হয়তো উফো দেখেছে বলে দাবী করে ভাওতা দেবার জন্যে, কেউ কেউ ভুল দেখে, কিন্তু কেউ কেউ আবার সত্যই উফো দেখেছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে আছেন বহু সভ্রান্ত বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাঁদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, উফোর যুগ সুরু হয়েছে মানুষের মহাকাশচারণার যুগ সুরু হবার বহু পূর্বে। বাইবেল ইত্যাদির পৌরাণিক কাহিনীর কথা বাদ দিলেও ইতিহাসে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যা আরব্য উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর। রোমান ইতিহাসবিদ্ লিবি লিখেছেন, খৃঃ পূঃ 218 অব্দে ঝাঁকে ঝাঁকে উফো এসেছিল। মধ্যযুগে ইউরোপীয় চাষীরা আকাশ থেকে উজ্জ্বল গোলকে চেপে দেবদূতদের নামতে দেখেছে। 1561 সালে জার্মেনীর নুরেনবার্গ শহরের আকাশে নল আর গোলক দেখা গিয়েছিল। এই শতাব্দীর আগেও উফোর এই রকম অসংখ্য ঘটনা আছে।

উফোর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। বিমানের পাশে পাশে ছুটন্ত আলোকপিণ্ড, সুইডেনে 1946 সালে হাজার হাজার উফো, চ্যাপ্টা গোলাকার উফোর মধ্যে রূপালী পোষাকপরা প্রাণী, তাদের সঙ্কেত, অবতরণ, মোটরগাড়ী ধাওয়া করা—ইত্যাদি বহু ঘটনার সাক্ষ্য মিলেছে। বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে দেখা গেছে, বিভিন্ন আকারের এই উফোগুলির কোনটি পিরিচের মত চ্যাপ্টা, কোনটি বেলনাকার, অর্থাৎ সিগারের মত, কোনটি ডিম্বাকার, কোনটি বা থালার মত, কোনটি আবার শনিগ্রহের মত, অর্থাৎ বলয়ের ভিতর গোলক। কোন কোনটিতে আবার জানলা থাকে, তার আরোহীরা কখনও বা মানুষের মত, কখনও বা নয়। কেউ বা নিঃশব্দে যায়, কেউ আবার এত তীব্র শব্দ করে যে, পশুপাখীরা ভয়ে ছুটে পালায়। কেউ বেতার-তরঙ্গে ছেদ ঘটায়, কেউ বা রেডার-যন্ত্রে ছায়া ফেলে। বিভিন্ন রং এবং তীব্রতায় আলোক বিচ্ছুরিত করবার বিবরণও পাওয়া গেছে। কোনটির গতি দ্রুত, কোনটির বা মন্থর। এক বিদেশী দম্পতিকে উফোর আগন্তুকেরা তাদের মহাকাশযানের ভিতরে ডেকে নিয়ে তাদের স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়েছে—এরকম একটা সংবাদও পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানের পর যে সব ঘটনাকে

সত্য বলে ধরা হয়েছে, সেগুলি থেকে উফোর যে প্রকৃতি জানা যায়, তাতে এর অপার্থিবতাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই উফো দেখা গেছে—সাতটি দেশে ঝাঁকে ঝাঁকে। শুধু 1954 সালেই পৃথিবীতে দুই সহস্রাধিক উফো দেখা গেছে। গত সাতষট্টি সালের অক্টোবরে আমাদের দেশে শিলঙেও একটি উড়ন্ত এবং ঘুরন্ত চাকি নদীতে নেমে পড়ে, বাতাসকে গরম করে দেয়, জল মন্থন করে, বাতাসে বহু জিনিষ উড়িয়ে দিয়ে বনভূমির গাছে গাছে চিহ্ন রেখে যায়। এর ঠিক দু-দিন আগে কানাডাতেও অনুরূপ চাকি দেখা গিয়েছিল।

সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে, পঞ্চাশ লক্ষাধিক মানুষ উফো দেখেছে বলে দাবী করে। বিভিন্ন দেশের বিমান বাহিনী এই নিয়ে গবেষণা করেছে। মার্কিন বায়ুসেনার পরামর্শদাতা জ্যোতির্বিদ্ হাইনেক বলেছেন, অধিকাংশ ঘটনার পিছনেই যদিও ধাপ্পা থাকে, তবু আজ এমন দিন এসেছে যে, একে আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—হতেও পারে এরা গ্রহান্তরের দূত। মার্কিন বায়ুসেনার উফোসংক্রান্ত সরকারী তদন্ত কমিটির প্রধান পদার্থবিদ্ কণ্ডন বলেছেন, 1947 সালের পর থেকে এগারো হাজারেরও বেশী উফোর খবর নথিভুক্ত হয়েছে, যার শতকরা ছয়টির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই এগারো হাজারের মধ্যে সবগুলিই অবশ্য ঘটনা নয়, অনেক রয়েছে রটনা এবং কিছু ভুল। বেলুন, পাখী, ঘুড়ি, জ্যোতিষ্ক, মেঘ, বিদ্যুৎ, পৃথিবীর মহাকাশযান ইত্যাদি এই ভুলের উৎস। কেউ কেউ আবার উফোর ফটোও তুলেছেন, যার অনেকগুলির পিছনেই রয়েছে নানা জাল-জুয়াচুরি।

উফোসংক্রান্ত এই ঘটনাগুলি থেকে একটি সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা এখনই সম্ভব নয়। এর বিবরণে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, এর ব্যাখ্যাতে তেমন রয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন, উফো হয়তো পৃথিবীর আবহের বা কাছাকাছি আকাশেরই কোন প্রাকৃতিক ঘটনা, যা আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। আবার এই ব্রহ্মাণ্ডে 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'—এই জাতীয় ধারণাকেও বিজ্ঞান সমর্থন করতে পারে না। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, উফোকে গ্রহান্তরের আগন্তুকরূপে দেখলেই এই সমস্যার সমাধান সহজে হবে।

মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর কাছে আসে, তখনই উফোর প্রকোপ বাড়ে, সেই কারণে এরা মঙ্গলেরই দূত বলে কোন কোন বিজ্ঞানী যে মত প্রকাশ করেছেন, তাও ধোপে টেকে না; কারণ মঙ্গলে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আজ আর কেউ স্বীকার করেন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উফো নির্জন স্থানে নেবেছে কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন সুসভ্য উফো-আরোহীরা হয়তো তাদের তুলনায় অসভ্য পৃথিবীবাসীর কাছে নামবার প্রয়োজন বোধ করে নি। আবার পূর্বোক্ত মার্কিন ও রুশ বিজ্ঞানীদ্বয় প্রণীত গ্রন্থে বলা হচ্ছে, ছায়াপথের ঐ দশ লক্ষ গ্রহ থেকে প্রতি বছরে যদি একটি করেও মহাকাশযান ছাড়া হয়, তবে পৃথিবীর আকাশে তার আবির্ভাব ঘটবে বহু বছর পর পর, উফোর মত ঘন ঘন নয়।

কেউ কেউ আবার দার্শনিকভাবেও এর ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করছেন। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, এর কারণ আন্তর্জাতিক অশান্তিজনিত মানুষের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার অবক্ষয় ইত্যাদি। কিন্তু এই দার্শনিক ব্যাখ্যায় যে সমস্যা মিটবে না, তাতে সন্দেহ নেই। গত 1967 সালের নভেম্বরে উফোবিষয়ক সপ্তম বিশেষজ্ঞ কংগ্রেসে জনৈক রকেট-বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, সুদূর গ্রহ থেকে উন্নততর জীবেরা

যেসব মহাকাশযান পাঠায়, তাই উল্কোরূপে দেখা যায়। ঐ জীবেরা হয়তো জীবনকে দীর্ঘায়ত করতেও শিখেছে। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমাদের কল্পনা করতে দোষ কি!

জল্পনা-কল্পনা

বিজ্ঞানের কল্পনা অনেক সময় উপন্যাসকেও হার মানায়। মহাশূন্যের অন্য কোথাও যদি সুসভ্য জীব থাকে, তবে তাদের চেহারা কেমন হতে পারে, সে সম্পর্কে জীব-বিজ্ঞানীরা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেছেন, এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বহু নৃতত্ত্ববিদ্। এঁরা এত বিস্তারিত জল্পনা-কল্পনা করেছেন যে, এই নিয়েই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যায়। শুধু গ্রহান্তরের প্রাণীর আকার, আচরণ ও দেহবস্তুই নয়, তাদের জীব-লোকের রসায়ন সম্পর্কেও বৈপ্লবিক কল্পনা করা হয়েছে। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির কাজে জল ও কার্বন অপরিহার্য। পার্থিব প্রাণের ভিত্তি যে প্রোটোপ্লাজম, তা বিভিন্ন কার্বন পরমাণুর বিভিন্ন ধরণের সংযোজনে সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী রেনল্ডস দেখিয়েছেন, কার্বন ছাড়া সিলিকনও এই কাজ করতে পারে এবং এই জাতীয় প্রোটোপ্লাজম হবে বেশী তাপসহ। বিজ্ঞানী হলডেন বলেছিলেন, অ্যামোনিয়াকে ভিত্তি করেও জৈব রসায়ন গড়ে উঠতে পারে। বিজ্ঞানীদের এসব প্রকল্প থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, পৃথিবীর মত পরিবেশ না হলেই যে প্রাণের বিকাশ হতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই।

মহাকাশের অন্য কোন জগতে যদি বুদ্ধি-বৃত্তিশীল প্রাণী থেকে থাকে, তবে কিভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, এই নিয়েও বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করেছেন।

যোগাযোগ করবার প্রথম অসুবিধা ভাষা। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ উপায় বিশুদ্ধ গণিত; কারণ যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিশীল প্রাণী গণিত জানবেই। পৃথিবীর বুকে বিরাট জ্যামিতিক চিত্রের আকারে আগুন জ্বালিয়ে গ্রহান্তরের প্রাণীদের ডাক দেওয়া হোক, এরকম একটি প্রস্তাবও এসেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত তা আর কার্যকর হয় নি। বেতার-তরঙ্গ, লেসার-রশ্মি প্রভৃতি অনেক রকম যোগাযোগের মাধ্যমের কথাই বিভিন্ন বিজ্ঞানী বলেছেন। বিজ্ঞানীদের আর একটি অভিনব পরিকল্পনা হচ্ছে, ছবির ভাষায় বার্তা প্রেরণ। টেলিগ্রাফ-পদ্ধতিতে সঙ্কেত পাঠানো হবে বিন্দু ও রেখার সাহায্যে একটি উজ্জ্বল ও একটি অনুজ্জ্বল অংশের জন্যে। সব মিলিয়ে সাদায়-কালোয় এক ছবি গড়ে উঠবে। এমন একটা পরীক্ষা আমেরিকায় সফলও হয়েছে। 266টি বিন্দু এবং 1005টি শূন্যস্থান দিয়ে একটি কাল্পনিক গ্রহান্তর বার্তা বিভিন্ন বিজ্ঞানীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের অনেকেই খুব সহজে বুঝতে পেরেছিলেন এর অর্থ—'এক তারার চতুর্থ গ্রহে এক দ্বিপদ প্রাণী বাস করে, তাদের দুই লিঙ্গ, তারা মহাকাশ বিচরণবিদ্যা আয়ত্ত করেছে, প্রতিবেশী এক গ্রহে গিয়ে মাছের মত প্রাণী আবিষ্কার করেছে। এই মানুষদের দৈর্ঘ্য সাত ফুট, হাতে ছয় আঙ্গুল ইত্যাদি; অর্থাৎ মাত্র 266টি বিন্দু দিয়েই এত কথা বলা সম্ভব'। এই থেকে আর একটা কথা বোঝা যায় যে, গ্রহান্তরের সম্ভাব্য প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথা বিজ্ঞানীরাও গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথমতঃ তত্ত্বগতভাবে বহু বিজ্ঞানীই আজ স্বীকার করেন—বহিঃপৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীর বুকে বেতার-তরঙ্গ ও অচেনা উড়ন্ত বস্তুর যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে সেই অস্তিত্বের সম্ভাবনা যেমন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না, তেমনই সেই সম্ভাবনা নাকচও করা যায় না। এই সম্ভাবনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক,

আমরা আশা করতে পারি—সেই সম্ভাবনাকে বাচাই করবার সুযোগ বিজ্ঞান একদিন আমাদের দেবে, সেদিন হয়তো মানুষের বিজ্ঞান অসাধ্যসাধন করবে—তারায় তারায় মহামিলনের সেতু রচনা করবে—দূরকে করবে নিকট, আর পরকে করবে আপন!

সঞ্চয়ন

হলুদ-বামনের রহস্য

সম্প্রতি একটি নিবন্ধে স্তানিস্লাভ খাবারোভ লিখেছেন—আমাদের কাছে সূর্যই জীবনের উৎস। কিন্তু বহির্বিশ্বে সূর্য একটি সাধারণ নক্ষত্র মাত্র। সবচেয়ে উত্তপ্ত নীল নক্ষত্র এবং শীতলতম লাল নক্ষত্রগুলির মাঝামাঝি তার স্থান। সূর্য হলো তথাকথিত হলুদ বামনদের অন্যতম। পৃথিবী খুব কাছে বলেই পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রভাব এত বেশী।

যদিও সূর্যকে নিয়েই আমাদের সবচেয়ে বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তবু বলা যায়, এই নক্ষত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখনও অনুমান মাত্র। যেমন—আমাদের এরকম একটা ধারণা আছে যে, সূর্যের কেন্দ্রস্থলে গ্যাসের অস্তিত্ব আছে। অবশ্য এই গ্যাস অসাধারণ রকমের। এর ঘনত্ব সীসার ঘনত্বের চেয়েও অনেক গুণ বেশী। কিন্তু বস্তুটা তো গ্যাসই! এর পরমাণুগুলি হলো চলমান বিক্ষুব্ধ বস্তুকণার পুঞ্জ। পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তাদের বিদ্যুৎ পরমাণুর বহির্ভাগ থেকে তাড়িত হয়। অণু পরমাণুর সংঘর্ষে একটা শক্তিশালী রঞ্জেন রশ্মির প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সূর্যের উদর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। কেন্দ্র থেকে জমিতে পৌঁছুতে তার সময় লাগে গড়ে কুড়ি হাজার বছর। গ্যাস যখন সূর্যের স্বচ্ছ উজ্জ্বল স্তর থেকে নির্গত হয়, তখন তার আলোকময় বহিরাবরণ, বিচ্ছুরিত বস্তু অতিবেগুনী রশ্মিতে এবং দৃশ্য আলোকে রূপান্তরিত হয়। আট মিনিটে এই আলোকবর্ষণ পৃথিবীতে পৌঁছায়।

দু-দশক আগে পর্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা এবং সৌরজগৎ বহির্ভূত নক্ষত্রলোকের গবেষণা দৃশ্য আলোকরশ্মির উপর নির্ভর করতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সর্বদা একটা জানালার স্বপ্ন দেখেছেন, যে জানালাটা বিশ্বজগতের দিকে উন্মুক্ত হবে এবং বায়ুমণ্ডলের অন্ধকার দূর করবে। বিশ্বজগতের অধিকাংশ তথ্যই বায়ুমণ্ডলে অভেদ্য বাধার সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ অতিবেগুনী রশ্মিবিকিরণ, রঞ্জেন এবং গামা রশ্মি আমাদের গ্রহ থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটা অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রথম দিকে পৃথিবীর যে সব উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর ভূমি থেকে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বে ও পৃথিবীর আবরণকে এক বিরাট শূন্যতা-রূপে গ্রহণ করা যাবে না। যদিও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 30 কিলোমিটার উচ্চতা ছাড়িয়ে যে স্তর রয়েছে, সেই স্তরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মাত্র এক শতাংশ উপাদান থাকে, তবুও বায়ুমণ্ডলের এই শীর্ষ অঞ্চলগুলি বিকিরণ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের বিশেষ অবস্থাই পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে।

এগারো বছর আগে একটি অস্বাভাবিক ও

শিক্ষণীয় ঘটনা ঘটে। হঠাৎ বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। বিমান এবং সমুদ্রগামী জাহাজ বেতার-চালকহীন হয়ে পড়ে। যন্ত্রের চৌম্বক বাহুগুলি এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাগলের মত লাফিয়ে ওঠে এবং পৃথিবীতে লোহিত বিদ্যুৎ-চমক হতে থাকে। সূর্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা এই ভয়াবহ ও বিভ্রান্তিকর ঘটনাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন।

জানা গেল যে, সূর্যের ভূমিতেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সূর্যের একটা বড় রকমের ঝলক মানে হলো—এক অকল্পনীয় বিস্ফোরণ, যা রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটায়। এরকম বিস্ফোরণে রঞ্জেন-রশ্মির 'কাঠিন্য' হাজার গুণ বেড়ে যায় এবং সূর্য অতি দ্রুত হাইড্রোজেনের ঘনীভূত অংশ, প্রোটন এবং পরমাণুর ভারী অংশ নির্গত করে।

এই চমকগুলি সূর্য-বায়ুতে সংঘর্ষজনিত তরঙ্গের সৃষ্টি করে। চাঁদ আগ্নেয়গিরির মুখের নীচে সূর্যের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশের অনুরূপ যে অঞ্চল পাওয়া গেছে, তারও কারণ হলো সূর্যের প্রচণ্ড ঝলক। যখন সৌর হাইড্রোজেনের মেঘ পৃথিবীকে আঘাত করে, তখন সবচেয়ে ধ্বংসকারী ঝড়ের চেয়েও বায়ুমণ্ডলে অধিকতর শক্তির সূত্রপাত ঘটে। বায়ুমণ্ডলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—সৌরমণ্ডলের কর্মকাণ্ডে যখন ভাঁটার টান, তখন সঙ্কুচিত করে এবং যখন জোয়ারের টান, তখন প্রসারিত করে।

পৃথিবীর জলবায়ু নির্ধারিত হয় সূর্যের তেজ এবং পৃথিবীর রশ্মি বিচ্ছুরণের ভারসাম্যের দ্বারা। যে তেজ বিকিরিত হয়, তা বহির্বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক মিশ্রণ এবং সৌরবিকিরণের হ্রস্ব-তরঙ্গের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হলে সূর্যের আবহাওয়া সম্পর্কে জানতে হবে। অনেক দিন আগে থেকে আমরা যদি সূর্যের আচরণ সম্পর্কে জানতে পারি, তা হলে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীও আমরা করতে পারবো।

কারিগরি-শিল্পে শব্দের ব্যবহার

বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান ও কারিগরি-শিল্পের ক্ষেত্রে অতিশব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে চালু হয়েছে। বর্তমানশিল্পের বিভিন্ন শাখায় শ্রবণযোগ্য শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজকাল মাটির তলায় তৈলাধার নির্মাণের জন্যে শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পদ্ধতি বেশী নির্ভরযোগ্য এবং ধাতুনির্মিত তৈলাধারের চেয়ে এতে 30-40 শতাংশ খরচ কম হয়।

মাটির তলায় এই তৈলাধারগুলি নির্মিত হয় ভূ কারিগরি পদ্ধতিতে; অর্থাৎ মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই। পাথুরে নুনের স্তরে একটি কূপ খনন করে তাতে পাইপ বসানো হয়। কেন্দ্রীয় পাইপের ভিতর দিয়ে জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই পাইপটাই সবচেয়ে দীর্ঘ। জলে নুন গলে যায় এবং সেই দ্রবীভূত নুন পাম্প করে নির্গত করা হয়। পাহাড়ের প্রবল চাপ যাতে সহ্য করতে পারে, সে জন্যে তৈলধারটিকে গোলাকার করতে হবে। এর গোলাকার ছাঁচ নির্মাণই সবচেয়ে জটিল কাজ।

মস্কো খনি ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছেন। আসলে তাঁরা একই সঙ্গে দুটি সমস্যার সমাধান করেছেন। গোলাকার ছাঁচ নির্মিত হয়েছে এবং অতিস্রাবণের ব্যবস্থাও হয়েছে। এখন এসবই শব্দের সাহায্যে করা হচ্ছে।

একটি শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্র শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে আর তা লবণ-সম্পৃক্ত জলের স্তরে তার প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে এর মধ্যে সূক্ষ্ম জলঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। জল ফুটতে সুরু করে এবং শব্দ-তরঙ্গের ফলে লবণের অণুগুলি গহ্বরের চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ে। এই লবণ বিশেষভাবে গহ্বরের তলার দিকে উৎপাদক-যন্ত্রের কাছে সে দ্রুত গলে যায়। সেখানে সূক্ষ্ম জলঘূর্ণি সবচেয়ে বেশী। এর ফলে গহ্বরটি গোল আকৃতি ধারণ করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এটা দেখা গেছে যে, শব্দ এই পদ্ধতিকে 2·5 গুণ দ্রুততর করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্র ছাড়া অভিস্রাবণ-ব্যবস্থার একটি বিশেষ আয়তনের তৈলাধার তৈরি করতে যদি তিন বছর লাগে, তাহলে শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্রের সাহায্যে তা করতে লাগবে দু-বছর।

শ্রবণযোগ্য শব্দ দূরদূরান্তে প্রবল শক্তি সঞ্চার করতে পারে। সে জন্যে একে বিভিন্ন কাজে প্রয়োগ করা যায়। মস্কো খনি ইন্‌স্টিটিউটে পরিকল্পিত শব্দ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত উৎপাদক-যন্ত্রের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল মস্কোর নিকটে খাত থেকে তোলা পাথর, নুড়ি পরিষ্কার করবার কাজে। খাত থেকে পাথর, নুড়ি তোলা হলে তার গায়ে যে কাদা লেগে থাকে, তা শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে মুছে ফেলা যায়। শব্দ-তরঙ্গে যে প্রচণ্ড স্পন্দন সৃষ্টি করে, সেই স্পন্দনের ফলে ধূলিকণাগুলি তৎক্ষণাৎ ঝরে যায়। এভাবেই পাথর, নুড়িগুলি পরিচ্ছন্ন হয়ে ব্যবহারের উপযোগী হয়। ধূলিমুক্ত হবার জন্যে তাদের আর কোন শিল্প সংস্থার দীর্ঘ পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যেতে হয় না।

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ধাতুকে কেন্দ্রীভূত করবার কাজে শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গ খুবই কার্যকর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চালুনির ভিতর দিয়ে ধাতু গলানো হয়। কিন্তু এই কাজে মাঝে মাঝেই বাধা পড়ে, কারণ ধাতুর টুক্‌রায় চালুনির ছিদ্রমুখগুলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দ-তরঙ্গে আলোড়িত চূর্ণধাতু স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং তা মুখ বন্ধ না করে চালুনির ভিতর দিয়ে গলে যায়।

মস্কোতে শব্দ-বিজ্ঞানের সাহায্যে টিন খাদ্য সম্পর্কে গবেষণা চালাবার যে সংস্থা আছে, সেখানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, তাতে নতুন সংমিশ্রণ ও তাপ বিনিময়ের উন্নততর পদ্ধতিতে জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। বলা হয়েছে যে, তাতে জ্যামের স্বাদও উন্নত হবে। চমৎকার সংমিশ্রক হিসাবে রাসায়নিক শিল্পে শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করা যায়।

শক্তিশালী শব্দ-তরঙ্গ ধ্বংসকারী তরঙ্গের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শব্দ-তরঙ্গকে ব্যবহার করা যায়। গভীর এবং অতিগভীর কূপ খননের জন্যে, কয়লা এবং ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে, মাটির তলায় আকরিক সালফারকে গলাবার জন্যে এবং কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করবার জন্যে শব্দ-ত ঙ্গকে ব্যবহার করা যায়।

কাজাক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির রাসায়নিক বিভাগ নানারকম লতা-গুল্ম-বল্কলের মণ্ড নিয়ে শব্দের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। এই বস্তুটি প্লাস্টিক ও কৃত্রিম কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। আঠার মত এই জিনিষটা ভুট্টার গোড়', বাদামের খোলা এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের বর্জিত অংশ থেকে পাওয়া যায়। অবশ্য সেগুলির উপর সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে এক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তত্ত্বগতভাবে লতা-গুল্ম-বল্কলের মণ্ডের যে পরিমাপ দেখানো হয়, বাস্তবে তার পঞ্চাশ শতাংশের বেশী উৎপন্ন হয় না এবং অর্ধেক কাঁচামালই নষ্ট হয়ে যায়। তবে শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে কাঁচামালকে মণ্ডে পরিণত করবার পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে উৎপাদন 60 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

করোনারী হৃদ্‌রোগে ভোজ্য তেল ও চর্বির ভূমিকা

নরসিংহ নারায়ণ গোড়বোলে

করোনারী হৃদ্‌রোগের (Coronary thrombosis) কারণ সম্পর্কে অনেক জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা অধুনা হয়েছে। আহার্যের ভূমিকা, বিশেষ করে তাতে ব্যবহৃত চর্বির ধরণ, পরিমাণ ও শ্রেণীবিষয়ক তত্ত্বটির প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সকলেরই জানা আছে যে, মানুষের আহার্যের তিনটি প্রধান খাদ্যসামগ্রী রয়েছে—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ভোজ্য তেল ও চর্বি।

তেল ও চর্বির ভিতরে যে উপাদান unsaponifiable (অর্থাৎ যেটুকু সাবানে পরিণত হতে চায় না বা হবার অযোগ্য) নামে জ্ঞাত, তারাই এখানে (অর্থাৎ মনুষ্যের বিপাকক্রিয়ায়) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যা দিয়ে এই unsaponifible অংশটুকু গঠিত, তা হলো—lipoids, lipo-proteins, sterols এবং হাইড্রোকার্বনসমূহ। চর্বির অণুর সঙ্গে এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যদিও এদের মাত্রা স্বল্প, এরাই কিন্তু তথাকথিত থ্রম্বাসের (Thrombus) গঠন ও জমাট্‌রক্তের জন্যে দায়ী। এদের মধ্যে কয়েকটিই তরল এবং অসম্পৃক্ত (Unsaturated), তাদের আয়োডিন অঙ্ক (Iodine value) অত্যন্ত বেশী। এরাই আবার হাইড্রোজেনপরিশীলিত (Hydrogenated) হলে এমন সব দানাদার কঠিন পদার্থের উদ্ভব করে, যাদের গলনবিন্দু বেশী। হৃদ্‌যন্ত্রে তারাই সম্ভবতঃ চর্বির আস্তরণ ও থ্রম্বাসসমূহ সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

এখন তেল-চর্বি মানেই হলো মিশ্র-গ্লিসিরাইড (বা গ্লিসারিনের সঙ্গে মেদজ অম্ল বা ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির এস্টার)। আর যে সমস্ত তেলের ভিতর নিম্ন গলনবিন্দুর মিশ্র গ্লিসিরাইডের হার বেশী, তারা ব্যবহৃত হলে কঠিন আস্তরণ ও জমাটবাঁধা (Solid increasation and clots) স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়।

E.F.A ও তার প্রভাব

অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির গ্লিসিরাইডসমূহ, বিশেষ করে লিনোলেইক গ্লিসিরাইডগুলি মুখ্য মেদজ অ্যাসিড (Essential Fatty Acid বা সংক্ষেপে E.F.A.) নামে পরিচিত। মানুষের দৈহিক তাপে যে সব অ্যাসিড তরল অবস্থায় থাকে, তারা হলো—

ওলিইক্ $CH_3.(CH_2)_7.CH-CH.(CH_2)_7 COOH$ (অর্থাৎ $C_{18}H_{34}O_2$)

লিনোলিকি $CH_3 (CH_2)_4.CH=CH.CH_2 CH-CH.(CH_2)_7.COOH$ অর্থাৎ $C_{18}H_{32}O_2$)

লিনোলেনিক্ $CH_3.CH_2CH=CH.CH_2 CH-CH.CH_2 CH=CH(CH_2)_7.COOH$ (অর্থাৎ $C_{18}H_{30}O_2$)

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বিত্ব বন্ধনের (Double bond) অবস্থিতি প্রথমোক্তটিতে একটি, দ্বিতীয় অ্যাসিডে দুটি এবং তৃতীয়তে তিনটি। আর এই দ্বিত্ব বন্ধনে নির্দিষ্ট ব্যবস্থাধীনে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হওয়ার অবাধ ও অনায়াসে সুযোগ দেয়। উপরের তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডই অসম্পৃক্ত পর্যায়ভুক্ত।

এখন দেখা গেছে যে, পূর্বোক্ত ওলিইক গ্লিসিরাইড সব তেল বা চর্বিতে 'মেলে।

লিনোলেইক গ্লিসিরাইডগুলি কতক তেলে পাওয়া যায় (কিন্তু ওলিইকের মত তত ব্যাপক ভাবে নয়)। আর কাঠে পেন্ট বা রঞ্জন কাজে ব্যবহৃত তেলে (যথা তিসির তেল) লিনোলেনিক গ্লিসিরাইডের মাত্রাধিক্য। মাছের তেলের গ্লিসিরাইডে যে সবচেয়ে বেশী, তাহলো ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিড ($C_{22}H_{34}O_2$)। লিনোলেইক অ্যাসিডই E.F.A. রূপে সমাদর লাভ করছে। অবশ্য অ্যারাকাইডোনিক অ্যাসিডও লিনোলিইকের মতই প্রয়োজনীয়।

নিম্নে বিভিন্ন তেলে E.F.A-এর গড়পড়তা শতকরা হার দেওয়া হলো :

সূর্যমুখীর তেল	60%
ভুট্টার তেল	50%
বাদাম তেল	8-25%
তুলাবীজের তেল	43%
শুকরের চর্বি	10%
তিল তেল	38%

পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর আহার্যের ভিতর (যথা—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ভোজ্য তেল-চর্বি) তেল এবং চর্বির মধ্যে নিগূঢ়ভাবে দেখলে কোন পার্থক্য নেই, তারা নির্দ্বিধায় সমতুল (তাদের রাসায়নিক গঠনভঙ্গীমা বা সংযুতি যাই থাক না কেন)। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে তেল স্বাভাবিক অবস্থায় তরল, পক্ষান্তরে চর্বি কঠিন। আগেই বলা হয়েছে যে, তেল ও চর্বি হলো মিশ্র ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডের একত্র সমাহার। এখন গ্লিসারিন (বা রসায়নসম্মত আখ্যা গ্লিসিরল) হলো

$$\begin{array}{l} CH_2-OH \\ | \\ CH\ -OH \\ | \\ CH_2-OH \end{array}$$

ধরা যাক পামিটিক অ্যাসিডের (Palmitic acid) কথা।

রসায়ন মতে পামিটিক অ্যাসিড হলো—

$$C_{15}H_{31}.COOH$$

সুতরাং গ্লিসারিনের সঙ্গে পামিটিক অ্যাসিডের যে গ্লিসারাইড পাওয়া যায়, তা নিম্নোক্তরূপে সম্ভব :

$$\begin{array}{l} CH_2.OH\quad OH\,CO\,C_{15}H_{31} \\ | \\ CH\ .OH+OH\,CO\,C_{15}H_{31} \\ | \\ CH_2.OH\quad OH\,CO\,C_{15}H_{31} \end{array}$$

$$= \begin{array}{l} CH_2\,O\,CO\,C_{15}H_{31} \\ | \\ CH\ O.CO\,C_{15}H_{31} \\ | \\ CH_2.O.CO\,C_{15}H_{31} \end{array} + 3H_2O$$

ট্রাই-পামিটিন

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এক-একটি গ্লিসারিন অণুর জন্যে প্রয়োজন তিনটি পামিটিক অ্যাসিডের অণু (যার ফলে তেল-চর্বির উদ্ভব হয়)। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, তিনটি পামিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে দুটি বা একটি পামিটিক অ্যাসিড হয়তো অংশগ্রহণ করেছে, আর ঐ সঙ্গে হয়তো একটি স্টিয়ারিক অ্যাসিড এবং একটি লরিক অ্যাসিড। এটা তো অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়! কোন তেল বা চর্বির ভিতর একদিকে যেমন খাঁটি গ্লিসিরাইড থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র গ্লিসিরাইডও থাকতে দেখা যায়।

মানবদেহের তাপমাত্রা 35-37° সেন্টি.। ট্রাই-গ্লিসিরাইডগুলি ও তার ভিতরের অ্যাসিডগুলির ধরণ ও প্রকৃতি এবং (মানবদেহের তাপমাত্রার তুলনায়) তাদের গলনবিন্দু কত, সে দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। এখন অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি ও তাদের গ্লিসিরাইডগুলি সচরাচর কম গলনবিন্দু যুক্ত হয়; তবে এইগুলিতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা বেশ কিছু বেশী (সচরাচর C_{16} থেকে C_{18})। অসম্পৃক্ত ছাড়া সম্পৃক্ত (Saturated) অ্যাসিডও রয়েছে; যেমন—

বিউটাইরিক (C_4), ক্যাপরইক (C_6), ক্যাপ-রাইলিক (C_8), ক্যাপরিক (C_{10}), লরিক (C_{12}), মাইরিস্টিক (C_{14}), পামিটিক (C_{16}), স্টিয়ারিক (C_{18}), অ্যারাকাইডিক (C_{20}) বিহিনিক (C_{22}), লিগনোশিরক (C_{24}) ইত্যাদি। তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, সম্পৃক্ত পর্যায়ের এই তালিকায় ক্যাপরিক অ্যাসিড পর্যন্ত যতগুলি অ্যাসিড রয়েছে, সেগুলির গলন-বিন্দু কম (অবশ্য দৈহিক তাপের অনুপাতে)।

আর লরিক (C_{12}) থেকে অগ্রবর্তী অ্যাসিড-গুলি ও তাদের গ্লিসিরাইডগুলির গলনবিন্দু উচ্চ অর্থাৎ 44° সেন্টিগ্রেডের বেশী। বিষয়টির স্বীকৃতি করলে সরল কথায় এই তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, ফ্যাটি অ্যাসিডের অসম্পৃক্ত গ্লিশিরাইডগুলি এবং C_{10} পর্যন্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডগুলি নিম্ন গলনবিন্দুসমন্বিত (মানব-দেহের তাপক্রমের তুলনায়)। সুতরাং এই হিসাবে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত উভয় বর্গের ঐ গ্লিশিরাইডগুলিকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে নিশ্চিন্তে।

চিকিৎসা-জগতে তেল এবং চর্বির শোষণের (Resorption) বিষয়ে যে তুলনামূলক পরীক্ষণ করা হয়, তাতে মোট সম্পৃক্ত অ্যাসিড ও তাদের গ্লিশিরাইডগুলি ও মোট অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি ও তাদের গ্লিশিরাইডগুলির অনুপাত গণনা করা হয়। এক্ষেত্রে যেন মনে করা হয় যে, (কার্বন পরমাণুর সংখ্যা নির্বিশেষে) সকল সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি অনুরূপ ভৌত ও রাসায়নিক গুণসমন্বিত। কিন্তু ব্যাপারটি আপাতদৃষ্টিতে ঠিক মনে হলেও আসলে অযৌক্তিক এবং এর সংশোধন হওয়া উচিত।

ভোজ্য তেল-চর্বির ব্যাপারে এটাই দেখা যায় যে, নিম্ন আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের অনেকগুলি গলন-বিন্দু দৈহিক তাপমাত্রার নিম্নে এবং তার দরুণ সহজে আত্তীকরণযোগ্য (Assimilable); যেমন ঘি। সুতরাং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে লরিক (ফ্যাটি অ্যাসিড) পর্যন্ত গ্লিশিরাইডগুলি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের একই শ্রেণীতে ধরা উচিত। কারণ এরা সকলেই নিম্ন গলনবিন্দুযুক্ত।

উপরন্তু আরো কয়েকটি বিষয় ধর্তব্যের মধ্যে আসবে; শুধু সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির অনুপাত গণনা করেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়। তেল ও চর্বির গ্লিশিরাইড গুলির এক-একটি অণুর স্বরূপও নিতান্তই প্রয়োজনীয় বিষয়, যেহেতু অণুর চরম গলনবিন্দু নির্ভর করে তিনটি আলাদা আলাদা মূলকের (Radical) সম্মিলিত গলনবিন্দুর উপর। এই মূলক দিয়েই গ্লিশিরাইড হয়। এখানেই ঘিয়ের প্রাপ্ত বিমিশ্র (Heterogenous) গ্লিশিরাইডের ভূমিকা এসে পড়ে। মিশ্র গ্লিশিরাইডের অণু-সমূহের (যেমন ঘিয়ে) অধিকাংশ দৈহিক তাপ-মাত্রার নিম্নে গলনবিন্দুযুক্ত হবে—যদিও চরম বিশ্লেষণে দেখা যেতে পারে যে, উচ্চ গলন-বিন্দুর অ্যাসিডগুলি বেশ অনুভবযোগ্য শতকরা হারে রয়েছে। এই জন্যেই পিত্তস্থলীর বা ঐ রকম ব্যাধিতে ঘিয়ের উপকারিতার কারণ আরোপ করা যায়। তাইতো অধিকাংশ ব্যারামে মাখন ও ঘিয়ের কোন পরিবর্ত (Substitute) জিনিষ নেই—এটাই হলো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা।

গবাদি পশুর চর্বি, শূকরের চর্বি এবং কোকো-চর্বি (নারকেল তেল নয়) যদিও রাসায়নিক উপাদান হিসাবে অনুরূপ সংযুতিসম্পন্ন, তথাপি কোকো-চর্বির (গলনবিন্দু 32-36° সেন্টি.) গ্লিসারিন অংশকে (মূলকে) অণুগুলির বিন্যাস এমনি ধরণের যে, তা গবাদি পশুর চর্বি ও শূকরের চর্বির (যাদের গলনবিন্দু 42-50°C) চেয়ে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট।

প্রাণ-রসায়নের মতবাদ এবং গলনবিন্দুর নিয়মানুসারে তেল-চর্বি শোষণ

প্রাণ-রসায়নের মতে, মানুষের দেহতন্ত্রে তেল-চর্বি তখনই আত্তীকরণ সম্ভব, যখন নাকি তারা চলমান অবস্থায় গৃহীত হয়, অর্থাৎ তরল বা বায়বীয় আকারে। অবস্থাটি হলো অবদ্রবীভূত (Emulsified) তরল পদার্থেরই নামান্তর মাত্র। অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) পচন-যোগ্য জিনিষের সংস্পর্শে গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিডগুলিতে বিভক্ত হবার আগে এই অবদ্রবীভূত তরল পদার্থই কার্যকর হবে। স্পষ্টতঃ তরল অবদ্রবীভূত অথবা তরল অবস্থান্তরে প্রতিটি গ্লিশিরাইড অণুও পচনের (Ferment) সংস্পর্শে বিক্রিয়ার ফলে বিষয়টি কি দাঁড়ায়, তা দেখা যাক। উচ্চ গলনবিন্দুর অণু থাকলে তার বিভাজনের সম্ভাবনা নিতান্তই নগণ্য। এমন এক সময় ছিল, যখন মনে করা হতো যে, গ্লিশিরাইড অণু বিভক্ত হয়—গ্লিশারিন ও তিনটি অ্যাসিড মূলকে (Radical)। আর এই মূলকগুলি যে একই রকমের অর্থাৎ অনুরূপ হবে, এমন কোন কথা নয়—বিষমও (Dissimilar) হতে পারবে। বিভাজনের ফলে ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি একদিকে যেমন (ক) তাপশক্তি জুগিয়ে থাকে এবং (খ) অপরদিকে তেমনি সংশ্লেষণের ফলে নতুন নতুন চর্বির উদ্ভব হয়ে যায়—তারাই আবার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে থাকে। আধুনিক গবেষণামতে বিভাজন বিক্রিয়া একক (Mono) এবং দ্বৈত (Di) গ্লিশিরাইড পর্যন্ত হয়েই থেমে যায়। কারণ এরা হলো উত্তম অবদ্রবীভবনের নিয়ন্তা (Emulsifying agents)। আর তারা চর্বির পশ্চাৎবর্তী বিভাজন, আত্তীকরণ ও পরিবহনে সহায়ক হয়ে থাকে। সুতরাং এটা পরিস্ফুট হয়ে যাচ্ছে যে, অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইড এবং নিম্ন আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির গ্লিশিরাইডের ক্ষেত্রে তেল-চর্বির শোষণকার্য স্বভাবতঃই হয়ে থাকে বেশী। বিপরীতভাবে উচ্চ গলনবিন্দুর গ্লিশিরাইড এবং উচ্চ আণবিক ওজনের সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি শোষণক্রিয়ার বিঘ্নের সৃষ্টি করে।
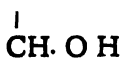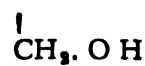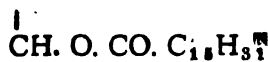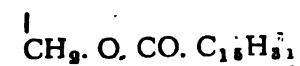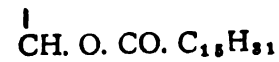
$CH_2.O.CO.C_{15}H_{31}$	$CH_2.O.CO.C_{15}H_{31}$	$CH_2.O.CO.C_{15}H_{31}$
|	|	|
$CH.OH$	$CH.O.CO.C_{15}H_{31}$	$CH.O.CO.C_{15}H_{31}$
|	|	|
$CH_2.OH$	$CH_2.OH$	$CH_2.O.CO.C_{15}H_{31}$
মনো-গ্লিশিরাইড	ডাই-গ্লিশিরাইড	ট্রাই-গ্লিশিরাইড (পূর্বোক্ত ট্রাই-পামিটিন)

তালিকা — ভোজ্য তেল-চর্বির গঠনপ্রণালী

পরবর্তী তালিকার সাঙ্কেতিক→	উচ্চ গলনবিন্দুর Saturated অম্লসমূহ (ক)→	ওলেইক (গ)→	লিনোলেইক (ঘ)
প্রথম শ্রেণী : (জান্তব চর্বি) :			
(ক) ভেড়ার চর্বি	57%	40%	3%
(খ) শূকরের চর্বি	36%	54%	10%

তালিকা ভোজ্য তেল ও চর্বির গঠনপ্রণালী

	উচ্চ গলনবিন্দুর Saturated অম্লসমূহ	ওলেইক	লিনোলেইক
দ্বিতীয় শ্রেণী : (উদ্ভিজ্জ তেল) :	[অধিকাংশই ভারতে ব্যবহৃত]		
(ক) সয়াবীন তেল	12%	34%	54%
(খ) তিল তেল	14%	48%	38%
(গ) সরিষার তেল	4%	50+26% ↓ ইউরিশিক অ্যাসিড	20%
(ঘ) বাদাম তেল	18%→	62%	20%
(ঙ) জলপাইয়ের তেল	12%	80%	8%
(চ) তুলাবীজের তেল	23%	33%	44%
তৃতীয় শ্রেণী :			
(ক) নারকেল তেল	26%	2%	74% ↓ নিম্ন গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত অ্যাসিডসমূহ

ঘি হলো স্বশ্রেণীতে একক। কারণ এতে রয়েছে মিশ্র গ্লিসিরাইডগুলির অত্যন্ত জটিলতা (যা অন্য কোন চর্বিতে পাওয়া যায় না)। এই জন্যেই এর প্রতিটি অণু বিভাজন ও আত্তীকরণ-যোগ্য (প্রায় 92%)। এক কথায় ঘিয়ের প্রতি 100টি অণুর মধ্যে 92টি অণু নিম্ন গলনবিন্দু সমন্বিত এবং সহজে পাচনযোগ্য। এর পাচন-যোগ্যতা মান সর্বাধিক অর্থাৎ 21। অতি আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী ঘিয়ে প্রায় 26টি সম্পৃক্ত অ্যাসিড রয়েছে। অন্য কোন তেল বা চর্বির এই রকমের নিম্ন আণবিক ওজনের সংযুতিসম্পন্ন হতে দেখা যায় না। আর সংযুতি হিসেবে (গব্য বা ভয়সা) ঘৃতই সর্বাগ্রগণ্য, তার পরেই নারকেল তেলের স্থান।

Athero-sclerosis* রোগে প্রধান বিষয় হলো যে, ক্ষতের গভীরতম আবরণ থাকে চর্বি (Natural-fat), ফস্‌ফোলিপিড, বিশেষ করে কোলেস্টেরল ও তার এস্টারসমূহ। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, মেদজ দ্রব্যাদি জমায়েতের জন্যে atheroma-র (আঁশের মত গঠন) সূত্রপাত হয়। রক্তবাহী নালীগুলিতে যে ছিদ্র থাকে (lumen), তাতে ধাক্কা দেয় এই জমাটবাঁধা অংশগুলি (জলবাহী নলে আস্তরণ পড়লে যেমন জলের নলগুলিতে সক্রিয় ব্যাসের হ্রাস ঘটে থাকে) সেই রকম রক্ত সঞ্চালনের ব্যাসের সঙ্কোচন হয় এবং ক্রমে ক্রমে রক্ত চলাচল কমে আসে। প্রক্রিয়াটি যখন অগ্রসর হতে থাকে, তখন রক্ত জমাটবাঁধার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এবং রোগদুষ্ট হয়ে যায়। অথবা বিকল্পরূপে ক্ষত ছিদ্রান্বিত (lapillarised) হয়ে রক্তক্ষরণের উদ্ভব করে। সুতরাং গড়ে উঠবে মেদজ ছিট্‌ ছিট্‌ বিক্ষিপ্ত অংশ ও সুতার মত আস্তরণ। এরাই উদ্ভব করতে পারে সেই সমস্ত উপাদানসমূহের, যাদের মধ্যে থাকে উচ্চ গলনের হাইড্রোকার্বনসমূহ, মোম-

* ধমনীগুলি শক্ত হয়ে যাওয়ায় অ্যাথিরো-স্ক্লেরোসিশের উদ্ভব। এতে রক্তবাহী নালীর গায়ের ভিতরের আবরণে পেশীর মত স্থিতিস্থাপক অথবা সুতার মত তন্তুরাজি গজিয়ে ওঠে।

সমূহ, লিপোয়েড, স্টেরল ও তাদের এস্টার সমূহ এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট, পামিটেট এবং স্টিয়ারেটসমূহের (যারা এক কথায় Unsaponifiable রূপে জ্ঞাত) ক্যালসিফিকেশন সঞ্চয় বা আস্তরণ।

লিপোয়েডগুলি* প্রকৃতিজাত তেল-চর্বিতে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোটিন ও চর্বি থেকে মানবদেহে সংশ্লেষিত হয়ে থাকে—যে সমস্ত চর্বি ও প্রোটিন নিছক প্রয়োজনবশতঃই উদরসাৎ করা হয়।

করোনারী হৃদ্‌রোগে (Coronary thrombosis) একটা প্রয়োজনীয় বিষয় হলো আস্তরণ ফলক (Plaque) গঠন। এই আস্তরণ ফলকগুলি মুখ্যতঃ লিপোয়েডের দ্বারাই গঠিত মনে করা হয়।

লিপোয়েডগুলির আণবিক গঠনপ্রণালী—

$$
\begin{array}{l}
CH_2-R \\
| \\
CH-R^1 \\
| \\
CH_2-OPO_3^- -CH_3-CH_2-N(CH_3)_3
\end{array}
$$
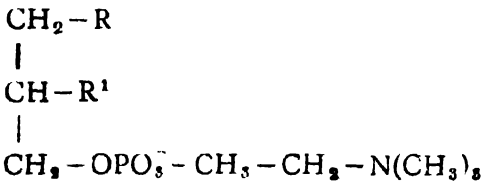
গোদুগ্ধে লিপোয়েডের পরিমাণ 0·4 থেকে 0·৫%। মাখনে ফস্‌ফো-লিপোয়েডের মাত্রা অল্প।

এখন স্নায়ু, পেশী, মস্তিষ্ক ইত্যাদির গঠনের জন্যে প্রয়োজন নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের। প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ফ্যাটি অ্যাসিডের (উপর্যুক্ত, R, R^1) স্বরূপ এবং তাদের গলনবিন্দু। পালাক্রমে গলনবিন্দু অ্যাসিডের স্বরূপের উপর নির্ভরশীল; যথা—সম্পৃক্ত অথবা অসম্পৃক্ত এবং কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্ভিজ্জ তেলের অধিকাংশ অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলি (E.F.A.) নিম্ন গলনবিন্দুসমন্বিত, তাদের কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও অসম্পৃক্ত হবার ফলে (অর্থাৎ দ্বিত্ববন্ধন থাকার দরুণ) ঐ অংশে (অক্সিডেশন হবার ফলে) ভাঙন ধরে এবং আত্তীকরণ ও সংশ্লেষণের নতুন পথ এরূপে উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর C_{10} (ক্যাপরিক) পর্যন্ত সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলিও, নিম্ন গলনবিন্দুর; সুতরাং তরল এবং আত্তীকরণযোগ্য।

অসুবিধার সৃষ্টি হয় C_{10}-এর উর্ধ্ব সংখ্যক সম্পৃক্ত (এবং উচ্চ গলনবিন্দু সমন্বিত) অ্যাসিডগুলির ক্ষেত্রে, কারণ তখন লিপোয়েড অণুগুলি আত্তীকরণের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি বনস্পতি বা হাইড্রোজেনেটেড উদ্ভিজ্জ বা মাছের তেলের আত্তীকরণে বিশেষরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। তাদের লিপেইয়েডগুলির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এই বিষয়টি লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। খাদ্যরূপে গৃহীত এই সমস্ত চর্বি সৃষ্টি করে আস্তরণ ফলকগুলির সঞ্চয়ন এবং সেই সঙ্গে অপরাপর দানা বাঁধা পদার্থরাজি। হাইড্রোজেনেটেড মাছের তেলের বেলায় অসুবিধা আরো বেড়ে যায়—কারণ তাতে উচ্চ আণবিক ওজনের উচ্চ গলনের সম্পৃক্ত পর্যায়ের হাইড্রোকার্বন এবং মোম থাকে আর ঐ একই সঙ্গে থাকে ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিডজাত উচ্চ গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত গ্লিসিরাইডসমূহ।

স্টেরলবর্গ* ও তাদের সংযুতি

কোলেস্টেরল (Cholesterols) হলো উচ্চ

* লিপিড ও লিপোয়েড (Lipid and Lipoid)—চর্বির সঙ্গে নিকট সম্পর্কযুক্ত একশ্রেণীর পদার্থরাজি রয়েছে, যারা ফস্‌ফেটাইড (ফস্‌ফোলিপিন, ফস্‌ফোলিপিড) নামে জ্ঞাত। স্নেহজ ধরণের জিনিষ এগুলি এবং সকল জান্তব ও উদ্ভিজ্জ কোষের মুখ্য উপাদান। এগুলি ট্রাইগ্লিসিরাইড। এতে রয়েছে দুটি দীর্ঘ-শৃঙ্খল ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন স্টিয়ারিক অথবা ওলিইক অ্যাসিড এবং একটা ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড উদ্ভূত এই শেষোক্তটির সঙ্গে কোলিনের (Choline) মত ক্ষারক (Base) সংযুক্ত থাকে] অনুবাদক

* সব স্টেরলই পড়ে মিশ্র অ্যালকোহল বর্গের পর্যায়ে। অংশতঃ যুক্ত এবং অংশতঃ

গলনের অসম্পৃক্ত সেকেণ্ডারী অ্যালকোহল। প্রত্যেক তেল বা চর্বিতে শতকরা কিছু পরিমাণ স্টেরল আছে। উদ্ভিজ্জ তেল বা চর্বিতে থাকে ফাইটোস্টেরল (গলনবিন্দু 132-144° সেণ্টি; রম্বিক দানা)। আর জান্তব তেল চর্বির অন্যতম উপাদান কোলেস্টেরল (গলনবিন্দু 148·5°-150·8° সেণ্টি, সূঁচের আকারের দানাবিশিষ্ট)। এরা পরস্পর হলো isomer এবং এদের উভয়েরই আণবিক গঠন $C_{27}H_{45}OH$, কিন্তু উভয়ের গলনবিন্দুতে পার্থক্য রয়েছে।

সুতরাং ভারতে যাঁরা নিরামিষাশী, তাঁদের আহার্য তেলের (ঘি ছাড়া) ভিতর রয়েছে ফাইটোস্টেরল ও তার এষ্টার ইত্যাদি। এখন যে প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে যাচ্ছে, তা হলো—ফাইটোস্টেরলের কি পরিণতি ঘটে? এটা কি অব্যবহৃত থেকে বেরিয়ে যায় অথবা এটা পরিবর্তিত হয় অথবা এর isomer-এ রূপান্তরিত হয়?

উদ্ভিজ্জ স্টেরল বিষয়ক গবেষণাকার্য নিতান্তই স্বল্প হয়েছে। জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে, জীবদেহে অন্ত্র বা তন্তুরাজির ভিতর ফাইটোস্টেরল রূপান্তরিত হচ্ছে কোলেস্টেরলে। ফাইটোস্টেরলযুক্ত উদ্ভিজ্জ বীজ আহারান্তে গবাদিপশুর সঞ্চিত চর্বিতে কোলেস্টেরলের উপস্থিতি ঘটে এই হেতু।

পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক Dr. H. P. Kaufmann-এর মতবাদ নিম্নোক্তরূপ: মানবদেহে রক্ত, যন্ত্রাদি (Organ) এবং তন্তুরাজির মধ্যস্থ মোট কোলেস্টেরলের 10% বেশী মুক্ত কোলেস্টেরল (Exo-cholesterol) থাকে না। এই পরিমাণটাও প্রাণী-জগতের সেই খাদ্যাংশ থেকে উদ্ভূত হয়; যেমন—মাংস, গোচর্বি অথবা শূকরের চর্বি। অধুনা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে এটা দেখানো সম্ভব হয়েছে যে, যদিও (Gastro-intestine অংশ থেকে) ফাইটোস্টেরল শোষণ কোলেস্টেরলের চেয়ে কম, এই ফাইটোস্টেরলগুলির কিয়দংশ নিশ্চিতরূপে রক্তে শোষিত হয়েছিল। এটাও দেখা গেছে যে, সাইটো-ভেজিটো স্টেরলসমূহ কোলেস্টেরলের তুলনায় দ্রুততর হারে বের হয়।

এতদিন মনে করা হতো যে, জান্তব (সুতরাং সম্পৃক্ত) এবং উদ্ভিজ্জ (সেই কারণে অসম্পৃক্ত) চর্বি অপরিবর্তনীয়, অন্ততঃ সিরাম-কোলেস্টেরলের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে। মাংসাহারীদের সঙ্গে নিরামিষাশীদের পৌষ্টিক অনুসন্ধানের তুলনায় জানা যায় যে, উচ্চ গলনবিন্দুর সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড খাবার সঙ্গে বেশী মাত্রায় প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরলের সীমার সম্বন্ধ রয়েছে; অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির (যাদের গলনবিন্দু কম) অভাব। ইউরোপীয় আখ্যায় নিরামিষভোজীরা দুধ ও ডিম গ্রহণ করে। সম্পূর্ণ নিরামিষাশীদের (যাঁরা অবাধে উদ্ভিজ্জ তেল খান) প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরল ইউরোপীয় নিরামিষাশীদের চেয়ে কম।

আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উভয়-শ্রেণীর নিরামিষাশীদের কোলেস্টেরল সীমা (আমিষভোজী বর্গের চেয়ে) নিম্নতর। এটাও দেখানো হয়েছে যে, আহার্য কোলেস্টেরল হ্রাস পেলে প্লাজ্‌মা-কোলেস্টেরল হ্রাসের ব্যাপার নিতান্ত নগণ্য। কতকগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, কতক কতক উদ্ভিজ্জ স্টেরল শোষিত হয়ে কোলিক (Cholic) অ্যাসিডে (কোলেস্টেরলের মত) রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিজ্জ (Ergo) স্টেরলের শোষণ কয়েক বছর

এস্টারের ছদ্মবেশে বহু প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ তেল-চর্বিতে এদের পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল আর আরগোস্টেরল (Ergosterol)-এর মধ্যে কোলেস্টেরল একমাত্র প্রাণী-জগতে পাওয়া যায়; আরগোস্টেরল প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব। ফাইটোস্টেরল এবং স্টিগমাস্টেরল ইত্যাদি উদ্ভিজ্জেই মূলত। শেষোক্তগুলি সমষ্টিগতভাবে ফাইটোস্টেরল নামে প্রচলিত। অনুবাদক

পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে [Men-Schick এবং Page দ্বারা (1932)]। প্রাণীদেহে তন্তুগুলিতেও আর্গো-স্টেরল (কাইটো) রয়েছে। বিবর্তনের নিম্নতর পর্যায়ে (যেমন—Yeast) উভয় স্টেরলই এক সঙ্গে দৃষ্ট হয়।

কোলেস্টেরল সীমা

শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে যে, কোলেস্টেরল নিতান্তই প্রয়োজন এবং একে পরিহার করবার চিন্তা হলো অন্যায়, কারণ এছাড়া কোন Bile-acid বা হর্মোন হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে কতটা? তেল বা চর্বি (যথা ঘি) শুধুমাত্র কোলেস্টেরলের অস্তিত্বের দরুণই বর্জিত হওয়া ঠিক নয়। এই বিষয়টি চিকিৎসাবিদ্যায় প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে ঘিয়ের ব্যাপারে।

প্রয়োজনীয় ভোজ্য তেল-চর্বির কোলেস্টেরলের পরিমাণ নিম্নোক্তরূপ (প্রতি 100 গ্র্যামে) ডিমের কুসুম 2000 মিলিগ্র্যাম; টাট্কা ডিম (সম্পূর্ণ) 462 মিলিগ্র্যাম; মেষশাবক মাংস 610 মিলিগ্র্যাম : শূকরের মাংস 420 মিলিগ্র্যাম, ঘি 280 মিলিগ্র্যাম, এরা এস্টার হিসাবে থাকে। এই কোলেস্টেরলের পরিমাণই কোলেস্টেরল-সীমা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

কোলেস্টেরলের এস্টারসমূহ

কোলেস্টেরলের সীমা আলোচনা কালে তাদের এস্টারগুলিরও বিশেষরূপে পর্যালোচিত হবার যোগ্য। ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহের স্বরূপ ও তাদের আণবিক ওজনের উপর এস্টারের গলনবিন্দু নির্ভরশীল। যথা—স্টিগ্‌মা স্টেরল (এক প্রকারের উদ্ভিজ্জ স্টেরল) (গলনাঙ্ক 168-170° সেণ্টিগ্রেড) থেকে পাওয়া যায়—স্টিগ্‌মা স্টিয়ারেট, গলনবিন্দু 101° সেণ্টিগ্রেড, স্টিগ্‌মা ওলিয়েট, গলনবিন্দু 88° সেণ্টিগ্রেড, অ্যাসিডগুলির অসম্পৃক্তির মাত্রা যত বেশী এস্টারের গলনবিন্দু ততই নিম্নগামী, কিছুটা সীমা পর্যন্ত। সম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির চেয়ে অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির (E. F. A) কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য এস্টারের গলনবিন্দুর উপর একই হারে প্রভাব বিস্তার করে না। কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে এর ওলিয়েটের গলনবিন্দু 44·5° সেণ্টিগ্রেড এবং একটি লিনোলিয়েট প্রায় 420° সেণ্টিগ্রেড। (অসম্পৃক্ত অ্যাসিডগুলির) এই ধরণের এস্টারগুলি মনুষ্যদেহে (অক্সিডেশনের দরুণ) সহজে বিভাজিত হয়ে আত্তীকরণের যোগ্য হয়। তারা তুলনামূলকভাবে নিম্ন গলন পদার্থেরও উদ্ভব করে।

শীলের (Seal) তেলে পর্যাপ্ত মাত্রায় রয়েছে কোলেস্টেরল। এস্কিমোরা যথেষ্ট মাত্রায় তা খেয়ে থাকে, তবুও তাদের হৃদ্‌রোগ বা থ্রম্বোসিস হয় না এবং এই রোগে তারা অত্যন্ত কম ভুগে থাকে। এর কারণ শীলের তেলে রয়েছে (কোলেস্টেরলের এস্টার হিসাবে) অসম্পৃক্ত শ্রেণীর ফ্যাটি অ্যাসিড (E. F. A.)

মার্জারিন, তার উৎপাদন ও গঠনপ্রণালী

ইউরোপের দেশসমূহে ভোজ্য চর্বির ক্ষেত্রে মার্জারিনের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এবং মাখনের বিকল্প হিসাবেও। এর কোন সুনির্দিষ্ট মান বা standard নেই। আগেকার দিনে বিশোধিত গো-চর্বি এবং গাঁজানো (Fermented) দুধ থেকে মার্জারিন তৈরি হতো, যাতে নাকি মাখনের মত অবদ্রব পাওয়া যেত। এর ভিতর থাকতো প্রায় 16% যুক্ত (Combined) জল। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধিত গো-চর্বির স্থলে ব্যবহৃত হতে লাগলো মুখ্যতঃ হাইড্রোজেনেটেড বাদাম তেল (ভারতে) এবং মাছের তেল (ইউরোপ ও আমেরিকায়)। উদ্ভিজ্জ তেলের তুলনায় স্বল্প মূল্যের হবার দরুণ হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য-তৈলের উৎপাদন ও বিক্রয় জাপান, আমেরিকা

ও ইউরোপে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতহারে। এখনকার দিনে এর ভিতর থাকছে হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য বা বাদাম তেল, তিল তেল, নারকেল তেল অন্যান্য ভোজ্য তেল এবং দুগ্ধ সিরাম। এর গড়পড়তা গঠনপ্রণালী—প্রায় 32-35% হাইড্রোজেনেটেড তেল, 15-20% অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তেল, প্রায় 40-50% নারকেল তেল এবং 16% জল (আইনের দ্বারা এই শেষোক্ত বিষয়টি বিধিবদ্ধ)। উপাদানসমূহের ইতরবিশেষ হয়ে থাকে কাঁচামালের দাম অনুযায়ী এবং তাদের অর্থনৈতিক মূল্যমানের উপর। এখন এটা জানা যাচ্ছে যে, এরকমের মার্জারিন বর্ধিত হারে ব্যবহারের ফলে করোনারি থ্রম্বোশিসের মাত্রা সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে (সেই সঙ্গে মাথার টাক ?)।

উপরের বিবৃতিতে কোন রকমেই এটা বলা হচ্ছে না যে, ভোজ্য তেল-চর্বি বা মার্জারিনের অংশগ্রহণের ফলে থ্রম্বাসের আবির্ভাব হয় (করোনারি থ্রম্বোশিসে), কিন্তু মুখ্যরূপে পরিগণিত কারণগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এটাও সুবিদিত যে, মাংসভোজীদের আহার্যতালিকায় (তেল এবং চর্বি ছাড়া) যথেষ্ট পরিমাণে গো-চর্বি, গোমাংস, শূকরের চর্বি ইত্যাদি, সবুজ পাতাযুক্ত উদ্ভিজ্জের সীমিত মাত্রা, অতিমাত্রায় প্রোটিনসমন্বিত (যাতে মুক্ত কোলেস্টেরল 3·4% রয়েছে) ডিমের যথেচ্ছ ব্যবহার ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আছে। এসবের সঙ্গে যথেষ্ট শারীরিক ব্যায়ামের অভাব, আবহাওয়ার চরম অবস্থা, বংশপরম্পরা, মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি উপরের ব্যাধিতে রসদ জোগায়।

মৎস্য-তৈল

মাছের তেলে রয়েছে squalene-এর মত হাইড্রোকার্বন, সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের গ্লিসিরাইডবর্গ এবং মোমসমূহ। আর এই মাছের তেলের ভিতরের উপাদান (ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিড) বিষয়ে আগেই কিছু বলা হয়েছে। মাছের তেল যখন হাইড্রোজেনেট করা হয়, তখন (Squalene-এর মত) অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থেকে উচ্চ গলনের সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের উদ্ভব হয়। এছাড়া উচ্চ গলনের মোমরাজি, ক্লুপানোডোনিক অ্যাসিডের মত সম্পৃক্ত এবং উচ্চ আণবিক ওজনের পদার্থরাজি (Derivatives) এবং সংশ্লিষ্ট স্টেরলবর্গ যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবশালী। এই উচ্চ গলনের অণুগুলি (Hydrolysis অথবা lipase ও অন্যান্য অগ্ন্যাশয়ের জারক দ্রব্যের দ্বারা) বিভাজিত হয় না। যদি মলত্যাগের সময় না যায় হয়, তবে অবশেষে এই কঠিন দানাবাঁধা কণাগুলি থ্রম্বাসের সৃষ্টি করতে পারে অথবা ধমনী ও হৃৎপিণ্ডে রক্ত জমাট বাঁধাতে পারে এবং এইভাবে ধমনীতে রক্ত সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়।

হাইড্রোজেনেটেড মৎস্য বা উদ্ভিজ্জ তেলের ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি গ্লিসিরাইডসমূদয়ে C_{16} থেকে C_{26} কার্বন পরমাণু থাকে। দৈহিক তাপমাত্রা অপেক্ষা গ্লিসিরাইডের এই অণুগুলি অনেক উচ্চ গলনবিন্দু সমন্বিত। মার্গারিন তৈরি করা হয় গড়ে 36-37° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বজায় রেখে—বাদাম তেল, তিল অথবা নারকেল তেল যুক্ত করে গলনবিন্দু নামানো যায় এবং নামানোও হয়ে থাকে; অর্থাৎ 40-50° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর উদ্ভিজ্জ হাইড্রোজেনেটেড তেল বাদাম অথবা তিল শ্রেণীর পরিশোধিত তেল মিশ্রিত করে গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে ফেলা বিচিত্র নয়। এরকমের লোক ঠকানো পদ্ধতি কোন কোন কারখানায় অনুসৃত হয় বলে প্রকাশ এবং সে কারণে এখানে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। এরকমের মিশ্রণের আচরণ ভিন্ন প্রকারের হবে, এটা মনে রাখা দরকার। ঘিয়ের গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডের বেশী নয়। মূল পার্থক্য হলো এই যে, ঘি নিম্ন গলনের মিশ্র গ্লিসিরাইডের

একক অণুগুলির দ্বারা গঠিত, পক্ষান্তরে 36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর হাইড্রোজেনেটেড চর্বির একক অণুগুলির গলনবিন্দু তা নয়। এরকমের অণুগুলি ভাঙনযোগ্য নয় এবং আত্তীকরণের সম্ভাবনা কম থাকে।

ভারতে বনস্পতি উৎপাদন

ভারতে বনস্পতি উৎপাদনের একটা শর্ত হলো এই যে, তার গলনবিন্দু 36-37° সেন্টিগ্রেডের বেশী যেন না হয় (36-37° সেন্টিগ্রেড বাস্তব ক্ষেত্রে গড়ে দৈহিক তাপমাত্রা), যাতে দেহমধ্যে প্রবেশের সময় বনস্পতি গলে যায়। শিল্পক্ষেত্রে যা করা হয় তা, নিম্নোক্তরূপ : (এখনকার দিনে) তুলাবীজের তেল, বাদাম তেল, ঐ জাতীয় বিশোধিত তেল নিকেলজাতীয় অনুঘটকের (Catalyst) উপস্থিতিতে ক্রমশঃ হাইড্রোজেনেট করা হয়, যতক্ষণ না গলনবিন্দু 36°-37° সেন্টি. পর্যন্ত পৌঁছায়। এই প্রক্রিয়ায় ওলেইক ও লিনোলেইক অ্যাসিডগুলি স্টিয়ারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয় হয়। দেহাভ্যন্তরে এরকমের চর্বি (বনস্পতি) গলে যাওয়া উচিত।

এর ফলে যে বনস্পতি পাওয়া গেল, তার চরম উপাদানগুলির ভিতর থাকছে—পামিটিক, স্টিয়ারিক ও শেরোটিক পর্যন্ত অ্যাসিডের গ্লিসিরাইড কিছু ওলেইক ও আইসো-ওলেইক গ্লিসিরাইড এবং কদাচিৎ লিনোলেইক (E.F.A.) গ্লিসিরাইড। রঙীন বিক্রিয়ার জন্যে 5-10% তিল তেল মিশিয়ে দেওয়া বাধ্যতামূলক।

কোন কোন কারখানায় একটা চাতুর্যপূর্ণ এবং প্রবঞ্চনাকর পদ্ধতি অনুসৃত হয়। নিবন্ধকারের দৃষ্টি এতে আকর্ষণ করা হয়েছে। এরকমের উৎপাদনের ফলে যে চর্বি পাওয়া যায়, তা হজম করা শক্ত। এই রকমের পদ্ধতি হলো : তেল বা তেলের মিশ্রণটি অনেক বেশী গলন-বিন্দুর (ধরুন 45° সেন্টিগ্রেড) চর্বিতে পরিণত করা হয়। অতঃপর তাতে মিশিয়ে দেওয়া হয় যথেষ্ট পরিমাণে বিশোধিত বাদাম তেল। ফলে আইনানুসারে যে 36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দু চাওয়া হয়। তাই পাওয়া যায় এই রকমের হাইড্রোজেনেটেড তেলে। এর কুফল সহজেই অনুমেয়। 45° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর চর্বি (বনস্পতি) উপকার করা দূরে থাকুক, অপকার করে অনেকখানি। এরকমের উৎপাদন পরিহার করা উচিত। আইসো-ওলেইক অ্যাসিড কতকটা আছে এবং unsaponifiable-এর মাত্রা নিরূপণ করে উপরের চাতুরিটি ধরা যায়।

বনস্পতির উন্নতিবিধানার্থে কয়েকটি প্রস্তাব

যদিও আইন অনুযায়ী (21শে অক্টোবর 1950) বনস্পতির গলনবিন্দু 36° সেন্টিগ্রেড থেকে 37° সেন্টিগ্রেডে রাখা বাধ্যতামূলক (এবং কতিপয় শীতপ্রধান স্থানের জন্যে 31° সেন্টিগ্রেড), বাস্তবক্ষেত্রে উৎপন্ন বনস্পতির অধিকাংশই (পরিবহনের সুবিধার জন্যে) 36-37° সেন্টিগ্রেড (বা তার বেশী) তাপমাত্রা রাখা হয়। বিস্কুট মচ্‌মচে রাখবার জন্যে বিস্কুট উৎপাদনকারীদের 41° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুর বনস্পতি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

বনস্পতির উন্নতি বিধানার্থে দুটি নূতন সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপিত করা হচ্ছে—প্রথমটি হলো গলনবিন্দুর নিম্নমাত্রাটি 31° সেন্টিগ্রেড (যেমন শীতপ্রধান জায়গাগুলিতে অনুমতি দেওয়া হয়) রাখা, তাতে বনস্পতির খাদ্যমূল্য বর্ধিত হবে এবং সেই সঙ্গে বিশোষণ (Absorbtion) অঙ্কও (অর্থাৎ 31° সেন্টিগ্রেডের বেশী হাইড্রোজেনেশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত)। দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো—বিশোধিত তিল বা স্যাফ্লাওয়ার তেল অধিক মাত্রায় যুক্তকরণ (পরীক্ষামূলকভাবে আরো 10%), যাতে E.F.A. অঙ্ক বৃদ্ধি পাবে এবং বনস্পতির পৌষ্টিক মূল্য বর্ধিত হবে। এরকম করলে (অর্থাৎ

36-37° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দু থেকে নামিয়ে 31° সেন্টিগ্রেড করলে) পরোক্ষভাবে আইসো-ওলেইক অ্যাসিড উৎপাদন (যার হাত এড়িয়ে যাওয়া যায় না) যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাবে। 45° সেন্টিগ্রেড গলনবিন্দুসমন্বিত আইশো-ওলেইক অ্যাসিড এবং এর অবদ্রবীভবনের গুণ রহিত হওয়ায় বনস্পতির উপকারিতা কমে আসে।

অনুবাদক: শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

বিজ্ঞান-সংবাদ

পরিত্যক্ত মোটর টায়ারের অভিনব ব্যবহার

মোটর গাড়ীর পরিত্যক্ত অংশ টায়ার ইত্যাদি নতুনভাবে জনকল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে কি না—সেই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা রকম পরীক্ষা চলছে। আমেরিকার গুডইয়ার টায়ার অ্যাণ্ড রবার কোম্পানীর ওহিয়োর আকরনস্থিত গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর জেমস্ ডি. ডিইয়ারির নির্দেশে একদল বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার পুরনো টায়ারের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রায় এক বছর ধরে নানাবিধ পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, ঐ সকল টায়ার দিয়ে ঘাসের মত একপ্রকার কৃত্রিম উপকরণ তৈরি করা যেতে পারে। রাজপথের পার্শ্বে, খেলার মাঠে অথবা যে সকল স্থানে বহু লোকের চলাচলের ফলে ঘাস জন্মাতে পারে না, সে সকল স্থানে ঐ সকল কৃত্রিম ঘাস লাগানো যেতে পারে। এই কৃত্রিম ঘাস শক্ত ও নরম দু-রকম জাতেরই হতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট কাজের উপযোগী করে প্রয়োজনানুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।

এই অভিনব কৃত্রিম ঘাস এভাবে তৈরি করা হয়—প্রথমতঃ টায়ার থেকে ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর এদের খুব ছোট ছোট টুক্‌রা করে কাটা হয় এবং প্রত্যেকটি টুক্‌রার দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে 2.5 সেন্টিমিটার। ঐ সকল টায়ারের টুক্‌রা একটি কংক্রিট মিক্সার যন্ত্রে রেখে আঠালো রবারের সঙ্গে মেশানো হয়। ঐ মিশ্রিত উপাদান রাস্তায় বা পাকা রাস্তার পাশে ঢালা হয় এবং কংক্রিটের মতই বারো ঘন্টার মধ্যেই জমে শক্ত হয়ে যায়।

কংক্রিট মিক্সার যন্ত্রে মেশাবার পূর্বে বা পরে ইচ্ছানুযায়ী ঐ টুক্‌রা টায়ার ও রবারকে রং করা যেতে পারে। সবুজ রং করবার পর এই সব দেখতে হয় ঠিক ঘাসের মত। এই জিনিষটি ছিদ্রযুক্ত বলে এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টির জল প্রবেশ করতে পারে। হোস পাইপ দিয়েও এই কৃত্রিম ঘাস ধোওয়া যায়। এই অভিনব উপকরণের শব্দ আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা আছে বলে এই বস্তুটি ঘরের দেয়াল বা গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নতুন তথ্য

মঙ্গলগ্রহে আড়াই মাইল গভীর একটি গিরিখাত এবং এক মাইলেরও বেশী গভীর, 1200 মাইল দীর্ঘ একটি গহ্বরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সকল গহ্বর উল্কার সংঘাতে অথবা আগ্নেয়-গিরির অগ্নিউদ্গীরণের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। গত 47 বছরের মধ্যে এই প্রথম 1971 সালের জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল। তখন পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে ব্যবধান ছিল 3 কোটি 50 লক্ষ মাইলের।

ম্যাসাচুসেট্‌সের ওয়েষ্টফোর্ডস্থিত হেষ্ট্যাক মান-মন্দিরের 120 ফুট রেডিও রেডার অ্যাণ্টেনার

সাহায্যে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর বিজ্ঞানীরা এই সব তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ কয় মাসের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তিনবার বিজ্ঞানীরা রেডার রশ্মি মঙ্গলগ্রহাভিমুখে প্রেরণ করেছেন।

এই সকল রশ্মির কতক কতক মঙ্গলপৃষ্ঠে প্রতিহত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে এবং ঐ সকল প্রতিফলিত রশ্মি ঐ মানমন্দিরের অ্যান্টেনায় ধরা পড়েছে। ঐ গ্রহের উচ্চভূমি ও গিরিচূড়ায় প্রতিহত হয়ে যে সকল রশ্মি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে, সেগুলির তুলনায় মঙ্গলগ্রহের গহ্বরের তলদেশে প্রতিহত হয়ে যে সকল রশ্মি এসেছে, সেগুলিকে অনেক বেশী পথ পরিক্রমা করতে হয়েছে। তার জন্যে সময়ও লেগেছে কিছুটা বেশী। সময়ের এই ব্যবধান ও অন্যান্য বিষয় বিচার-বিবেচনা করে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চতার অনুমান করতে পারছেন। ইতিমধ্যে রেডার যন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতির খুবই উন্নতি হয়েছে। তারই জন্যে আজ এই যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা দশ হাজার মাইল দূরে থেকেও একটি ছোট পাথরের গড়ন ও তার সঠিক আকার বলে দিতে পারেন।

কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুব কাছে থেকে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের যে চেষ্টা হচ্ছে ও তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, সেই সকল তথ্যের সঙ্গে পৃথিবী থেকে বেতারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যসমূহ মেলানো হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই তুলনামূলক আলোচনার ফলে মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে বেতারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে এবং বিচার-বিবেচনা করে দেখাও সম্ভব হবে। ঐ মানমন্দিরের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, তাঁরা রেডারের সাহায্যে মঙ্গলের পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা ও গহ্বরের প্রায় সঠিক আকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ কার্যসূচীর উদ্যোগেই এই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখার 16 ডিগ্রী দক্ষিণে—উত্তর থেকে দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় 100 মাইল এলাকার তথ্যাদি বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহ নিজের কক্ষে কিছুটা ধীরে আবর্তন করে। ফলে মঙ্গলের একটি দিনের দৈর্ঘ্য পৃথিবীর একটি দিনের তুলনায় 37 মিনিট বেশী হয়ে থাকে। 35 দিনের মধ্যে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহের প্রায় পুরা চিত্রটি দেখতে পেয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা ও গভীরতা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন।

এই সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, সর্বনিম্ন উপত্যকা ও সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ার মধ্যে উচ্চতার ব্যবধান দশ মাইলেরও কম। সমুদ্রের একেবারে তলদেশ ধরে বিচার করলে পৃথিবীতেও সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্থানের মধ্যে এই রকম ব্যবধানই দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের দু-চার কথা

লোকেশ ভট্টাচার্য

বিশ বছর আগেও অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষীসাবুদ, প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এবং গোয়েন্দাদের ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হতো। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই সকল জবানবন্দী ও বিশ্লেষণের মধ্যে ভুল থাকা বিচিত্র ছিল না বা চতুর অপরাধীর পক্ষে এই সকল বিশ্লেষণকে নস্যাৎ করে দেওয়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে আধুনিক কালে অপরাধী নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মাইক্রোস্কোপ; স্পেক-ট্রোমিটার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ সাক্ষীসাবুদ বা ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের স্থান গ্রহণ করেছে। এর ফলে অপরাধী নির্ণয়ের কাজ ক্রমশঃ আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর ও নির্ভুল হয়ে উঠেছে।

অপরাধ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে যে, অপরাধ সর্বদা দুটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। প্রথমতঃ, বস্তু অর্থাৎ বা অপরাধের মাধ্যম বা যার সাহায্যে অপরাধ করা হয়েছে বা যে সমস্ত বস্তু অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরাধ করেছে ও যার উপর অপরাধ করা হয়েছে। প্রত্যেক অপরাধের ক্ষেত্রে এই বস্তু অপরাধের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং নীরব ভাষায় অপ-রাধের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধী অনুসন্ধানের মূল কথা হলো, বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই নীরব ভাষায় বলা কথার অর্থ উদ্ধার করা। পরবর্তী আলোচনায় বোঝা যাবে, এই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে এমন নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া সম্ভব হয় যে, তাকে নস্যাৎ করা কোনও অপরাধীর পক্ষে, তা সে যতই চতুর হোক না কেন, সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানের প্রথম ও প্রধান বিষয় হলো—অপরাধসংক্রান্ত সমস্ত বস্তুতে হাত, পা বা দেহের অন্য কোন বিশেষ অংশের ছাপ (যেমন—ঠোঁট বা গালের), অকুস্থলে পাওয়া অপরাধীর পোষাক বা তার কোন অংশ। অপরাধী-বাহিত খানিকটা ধুলা বা ধুলামাখা জুতার ছাপ, অপরাধীর একফোঁটা রক্ত, যা অপরাধকালে কোনভাবে ক্ষরিত হয়েছে, ফেলে-যাওয়া সিগারেট কেস বা একগাছা চুল অথবা লোম সংগ্রহ করা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে তাকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করা। এই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে সাধারণতঃ পুলিশ গবেষণাগারে। গোয়েন্দারা অকুস্থল থেকে যে সব সূত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন, তা বিশ্লেষণ করে এই গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা—কিভাবে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল, সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে অপরাধের সম্পর্ক কি, অপরাধের উদ্দেশ্য কি ছিল—ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় করেন। এই উদ্দেশ্যে মনোবিজ্ঞানের সহায়তাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই সব বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বসে থেকেই অপ-রাধী নির্ণয় ও তাকে সনাক্ত করে থাকেন। তাছাড়া প্রাপ্ত সূত্রের ভিত্তিতে অপরাধ মানসিকতা বিশ্লেষণ করাও পুলিশ গবেষণাগারের অন্যতম কাজ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক অপরাধ-বিজ্ঞানের জন্ম বেশী দিন হয় নি। তাই পুলিশ গবেষণাগারের পক্ষে এখনও সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই

বলে এর অবদান মোটেই নগণ্য নয়। এমন বহু অপরাধের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে, যা অন্যভাবে করা যেত না বা করতে গেলে বহু সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় ঘটতো।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি যে সব বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো হাত, পা বা শরীরের অন্য কোন অংশের ছাপ বা জুতার ছাপ। সব অবস্থাতেই মানুষ কিছু না কিছু ঘামে, বিশেষ করে অপরাধ করবার সময় স্নায়বিক উত্তেজনার ফলে ঘাম বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। ঘামের পরিমাণ অপরাধীর স্নায়বিক স্থৈর্য, অপরাধপ্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কম-বেশী হতে পারে, কিন্তু কিছু না কিছু ঘাম প্রত্যেক অপরাধীরই হয়ে থাকে। ঘামের সঙ্গে অ্যালবুমিনয়েড, ফ্যাটি অ্যাসিড, সালফেট, ফস্‌ফেট, ল্যাক্‌টেট, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রবণে শরীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। ঘামের সঙ্গে এসব পদার্থ অপরাধের মাধ্যম, যেমন—ছোরা ইত্যাদির গায়ে লেগে যায়। ঘামের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে গেলেও এই সব পদার্থ অটুট থাকে এবং এদের সাহায্য নিয়েই সাধারণতঃ অপরাধীকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ তিন রকম পদ্ধতিতে হাতের ছাপ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে। প্রথম পদ্ধতিতে হাতের ছাপ পাবার সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে গ্যাসীয় আয়োডিন ছড়ানো হয়। এসব সম্ভাব্য জায়গাগুলি হলো ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি, চেয়ার টেবিল, দরজা বা জানালার পাল্লা, জানালার শিক দেরাজ বা যার উপর অপরাধ করা হয়েছে, তার শরীর বা পোষাক। অবশ্য অপরাধের প্রকৃতির উপর এসব সম্ভাব্য জায়গা নির্ভর করে। আয়োডিনের বাষ্প ছড়ালে যে সব জৈব পদার্থ ঘামের সঙ্গে বের হয়ে আসে, সেগুলি আয়োডিন শোষণ করে এবং হাতের ছাপ লাল রঙের রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হতো এই—লাল রং ক্ষণস্থায়ী। তাই রংকে স্থায়ী করবার জন্যে প্যালাডিয়াম ক্লোরাইড, ট্যানিক অ্যাসিড, অ্যালাম ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অস্‌মিক অ্যাসিড বা অস্‌মিয়াম টেট্রাক্সাইডের জারণ-পদ্ধতির সাহায্যে হাতের ছাপ পরিস্ফুট করা হয়ে থাকে। কিন্তু বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো 5% সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণ সম্ভাব্য জায়গাগুলিতে স্প্রে করা। সিলভার নাইট্রেটের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্লোরাইড, সালফেট, ফস্‌ফেট, ল্যাক্‌টেট ও ফ্যাটি অ্যাসিডের সিলভার লবণের অধঃক্ষেপ পড়ে। এই অধঃক্ষেপকে বিশেষ এক বিজারকের (যাতে থাকে ফরম্যাল-ডিহাইড, পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড, পিরিডিন, হাইড্রোকুইনোন ও সোডিয়াম ল্যাক্‌টেটের জলীয় দ্রবণ) দ্বারা বা ফটো-কেমিক্যাল বিজারণ-পদ্ধতিতে বিজারিত করা হয়ে থাকে। তার ফলে কালো রেখায় হাতের ছাপ ফুটে ওঠে। সেই ছাপের ছবি অপরাধী সনাক্তকরণের জন্যে তুলে রাখা হয়। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে হাতের ছাপ বহু পুরনো হলে বা গলিত, পোড়া বা শুকিয়ে যাওয়া মৃতদেহ থেকে হাতের ছাপ তুলতে গেলে কখনও কখনও এক্স রশ্মির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

অপরাধ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে হাতের ছাপ নিশ্চিত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তার কারণ প্রত্যেকটি মানুষের হাতের ছাপ অপরের হাতের ছাপ থেকে স্বতন্ত্র। দৈহিক দিক থেকে এক রকমের দেখতে হলেও—এমন কি, যমজ হলেও তাদের হাতের ছাপের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কোন একজন মানুষের হাতের ছাপ আমৃত্যু অপরিবর্তিত থাকে। হাতের ছাপের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে শুধু মাত্র অপরাধী

সনাক্তকরণই নয়, অপরাধীর মানসিকতা, তার রুচি, কর্মক্ষেত্র, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। ঘামের সঙ্গে যে সমস্ত পদার্থ বেরিয়ে আসে, তার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া যায়। এই সব কারণে হাতের ছাপ অপরাধ-বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

হাতের ছাপের মত শরীরের অন্যান্য অংশের ছাপ, যেমন—পা বা ঠোঁটের ছাপ, কানের নক্সা ইত্যাদি অপরাধী সনাক্তকরণে বিশেষ কার্যকর। এসব ছাপ এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির মধ্যে সর্বদাই স্বতন্ত্র এবং যে কোন একজন মানুষের পক্ষে তা আজীবন অপরিবর্তনীয়। সাধারণতঃ ভিজা বা নরম মাটিতে বা কাদা লাগা পা নিয়ে অপরাধী ঘরে ঢুকলে ঘরের মেঝেতে পায়ের ছাপ পাওয়া যায়। পায়ের ছাপ প্লাষ্টার অব প্যারিসের ছাঁচে তুলে রাখা হয়। শুধুমাত্র অপরাধী সনাক্তকরণের জন্যেই নয়, পায়ের ছাপের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং দুটি সন্নিকটস্থ পায়ের ছাপের দূরত্ব মেপে অপরাধীর দৈর্ঘ্য, দৈহিক গড়ন, চলবার ধরণ, শারীরিক কোন খুঁৎ আছে কিনা—ইত্যাদি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যায়, যা অপরাধীর অন্বেষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

দু-জন জাপানী বৈজ্ঞানিক ডক্টর কাজুও সুজুকী ও ডক্টর ইয়াসুৎ সুচিহাসি সম্প্রতি ঠোঁটের ছাপ নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা 1971 সালের জানুয়ারী মাসে একটি সচিত্র পত্রিকার উপর রেখে যাওয়া ঠোঁটের ছাপের সাহায্যে এক রাহাজানীর আসামীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। অবশ্য এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবার আগে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। আজকাল সংখ্যার ব্যাপকতার জন্যে হাত, পা, বা ঠোঁটের ছাপ বা কানের নক্সা সংরক্ষণ, বাছাই, শ্রেণী বিভাগ প্রভৃতির জন্যে কম্পিউটারের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

এবার এমন একটা জিনিষের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করবো, যেটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই নগণ্য বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই বস্তুটির অবদান অপরিসীম। এই বস্তুটি হচ্ছে ধূলা। অপরাধী অনুসন্ধানের জন্যে বিশ্লেষণীয় ধূলা সাধারণতঃ সংগ্রহ করা হয় অকুস্থল থেকে। অপরাধীর ফেলে-যাওয়া কোট, রুমাল, জুতা অথবা জুতার ছাপ থেকে বা আক্রান্ত ব্যক্তির চুল ও জ্র থেকে। এই ধূলা নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন। সেই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে অপরাধীর প্রকৃতি, কর্মক্ষেত্র, রুচি, বাসস্থানের প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সুনিশ্চিত ধারণা করা যায়, যা অপরাধী অনুসন্ধানে যথেষ্ট সহায়তা করে।

1960 সালে এডলফ কুর নামক এক ব্যক্তিকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে সন্ধান পেয়ে পুলিশ জোসেফ করবেট নামে এক ব্যক্তিকে সন্দেহ করে। অকুস্থল থেকে 2900 কিলোমিটার দূরে জোসেফকে গাড়ীসহ আটক করা হয়। অন্য কোন উপায় না পাওয়ায় অপরাধ-বিজ্ঞানীরা গাড়ীর টায়ার খুঁড়ে ধূলা সংগ্রহ করেন এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, 421 রকম ধূলা সেই টায়ারে রয়েছে, যার মধ্যে একটি অকুস্থলের ধূলার অনুরূপ। এই থেকে পুলিশ জোসেফের অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

এবার আলোচনা করা যাক রক্ত পরীক্ষার কথা। সাধারণত: ব্যক্তি-পরিচয় নির্ধারণের জন্যেই রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে রক্ত পরীক্ষার ফলাফল থেকে ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক প্রমাণের ক্ষেত্রে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া যায়। সাধারণতঃ অকুস্থলে যে রক্ত পাওয়া যায়, তা বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মানুষের রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে—এ, বি, এবি এবং ও (Gr, A,B,

AB, O)। যদি দেখা যায় যে, প্রাপ্ত রক্তের গ্রুপ এ, তবে সারা পৃথিবীর এ গ্রুপের রক্ত আছে, এমন যে কোন মানুষ অপরাধী হতে পারে। সুতরাং তাথেকে অপরাধী সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ এ নয়, তবে নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। এই জন্যে নেতিবাচক প্রমাণ হিসেবে রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক, কিন্তু ইতিবাচক দিক থেকে এই পরীক্ষার তেমন গুরুত্ব নেই। কিন্তু অপরাধী সনাক্তকরণের চেয়ে পিতৃত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশী। সন্তানের রক্তের গ্রুপ পিতা বা মাতা কারোর একজনের রক্তের গ্রুপের সঙ্গে অভিন্ন হবেই; অর্থাৎ মাতার ও সন্তানের রক্তের গ্রুপ যদি একই হয়, তবে পিতার রক্তের গ্রুপ যে কোনও হতে পারে। কিন্তু যদি সন্তানের রক্তের গ্রুপ এ হয় এবং মাতার রক্তের গ্রুপ এ ছাড়া অন্য কিছু হয়, তবে পিতার রক্তের গ্রুপ এ হবেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও রক্ত পরীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক অপেক্ষা নেতিবাচক হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—কোনও দম্পতি যদি কোনও শিশুকে নিজেদের বলে দাবী করেন এবং যদি শিশুটির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে সেই দম্পতির কারোরই রক্তের গ্রুপে মিল না থাকে, তবে তাঁদের সেই দাবী খারিজ করে দেওয়া যায়। কিন্তু যদি শিশুটির রক্তের গ্রুপের সঙ্গে তাঁদের কোনও একজনের রক্তের গ্রুপের মিল থাকে, তাহলে কিন্তু শিশুটি যে তাঁদেরই—একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে সর্বাধুনিক জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে রক্তের গঠন, উপাদান নির্ণয় ও বংশধারার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা নিয়ে গবেষণা চলছে, যার ফলে হয়তো রক্ত পরীক্ষাকেও ইতিবাচক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

রক্তের মত বিভিন্ন জৈব নির্যাস অপরাধী সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সাধারণতঃ অপরাধী বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে—তার পোষাকে এসব জৈব নির্যাসের দাগ দেখা যায়। জৈব নির্যাসের প্রকৃতি পরীক্ষার জন্যে পোষাকে শুকানো এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে পরিষ্কার করে আলট্রাভায়োলেট আলোয় মেলে ধরলে কাপড়ের যে সমস্ত জায়গায় জৈব নির্যাস লেগে রয়েছে, সে সমস্ত জায়গায় প্রতিপ্রভা বা ফ্লুরেসেন্স দেখা যায়। প্রতিপ্রভ অংশগুলিকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয় ও পরে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নানা ধরণের জৈব নির্যাসের দাগ পোষাকে লেগে থাকতে পারে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞানে এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো seminal fluid। সাধারণতঃ যৌন উত্তেজনার সময় এই seminal fluid-এর ক্ষরণ হয়। সুতরাং যৌন অপরাধে লিপ্ত কোন ব্যক্তির অন্তর্বাসে seminal fluid লেগে যাবে। কিন্তু যৌন অপরাধ ছাড়াও সাধারণ যৌন মিলনের সময়ও এই নির্যাসের ক্ষরণ হতে পারে। তাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির অন্তর্বাসে নির্যাসের চিহ্ন পাওয়া গেলেই তার অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে সে রকম কোন চিহ্ন না পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে তাকে অব্যাহতি দেওয়া চলে। অতএব যেমন রক্ত পরীক্ষার বেলায় তেমনি জৈব নির্যাসের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ইতি-বাচকের চেয়ে নেতিবাচক দিকটাই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

অপরাধী অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রঙের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। সাধারণতঃ আকস্মিকভাবে ঘটা অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে (যেমন—মোটর গাড়ী দুর্ঘটনা ইত্যাদি) অনেক সময় রঙের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। 1965 সালে ক্লড নামে একটি পনেরো বছর বয়সের বালক গাড়ী চাপা পড়েছিল। দুর্ঘটনার পর গাড়ীটা পালিয়ে যায়। পুলিশ মৃত বালকটির গায়ে নীলাভ সবুজ রঙের

সামান্ত একটু দাগ পায় এবং একমাত্র এই রঙের উপর নির্ভর করেই পুলিশ গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। সাধারণতঃ অকুস্থলে পাওয়া রঙের সঙ্গে গাড়ীর রঙের তুলনা করে দেখা হয়। কিন্তু এই তুলনার জন্তে বিজ্ঞানীরা নিজেদের চোখের উপর পুরাপুরি নির্ভর করেন না। তাঁরা প্রাপ্ত রংকে জ্বালিয়ে স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত আলোকসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন। যদি দুটি রং থেকে প্রাপ্ত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুরূপ হয়, তবেই তাদের অভিন্ন বলা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো, যদি অপরাধের পর গাড়ীকে নতুন করে রং করা হয়ে থাকেও তবু পুরনো রং ধরা পড়তে বাধ্য। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত গাড়ীকে সাতবার নতুন করে রং করা সত্ত্বেও গাড়ীটি ধরা পড়ে এবং অপরাধ-বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে তা থেকে পুরনো রঙের হদিস করতে সক্ষম হন।

এখন প্রশ্ন হলো যে, দুটি রঙের অভিন্নতার সাহায্যে গাড়ীকে সনাক্ত করা কিভাবে হয়ে থাকে? একই কোম্পানীর বিশেষ একটি রঙের উপাদান সর্বদাই এক এবং একই কালে তা একাধিক গাড়ীতে দেওয়া হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা এই সমস্তার সমাধান করেছেন এক অদ্ভুত উপায়ে। তাঁদের মতে, বিভিন্ন গাড়ীতে একই রঙের উপাদান অভিন্ন হলেও রঙের অবিশুদ্ধতা বা impurity বিভিন্ন ধরণের হবে। এই অবিশুদ্ধতা রং লাগাবার সময় বা গাড়ী ব্যবহার করবার ফলে আসতে পারে। বিভিন্ন রং বিশ্লেষণ করে এই অবিশুদ্ধতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে এবং অবিশুদ্ধতার পরিমাণ থেকেই বলা যায়, দুটি রং অভিন্ন কিনা।

বিভিন্ন ধরণের দলিলপত্র ইত্যাদির জালিয়াতি ধরবার জন্তে বহুদিন আগে থেকেই হস্তলিপি বিচারের পদ্ধতি চলে আসছে। আধুনিক কালে এই বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। হস্তলিপির তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে বর্তমানে জ্যামিতিক মাপজোখের সাহায্য নেওয়া হয়। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখতে গেলে হস্তলিপির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে গবেষণা করে সব ভাষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি নিয়ম বা মাপজোখের চেষ্টা চলছে। তাছাড়া বয়োবৃদ্ধি, রোগ, মানসিক উদ্বেগ বা বিকৃতির ফলে হস্ত-লিপির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত হস্তলিপি থেকে মূল হস্তলিপি উদ্ধার করা বর্তমানে সম্ভব হয়েছে।

নানা ধরণের দলিল ও কাগজপত্রের জালিয়াতি ধরবার জন্তে (প্রধানতঃ যেগুলি হাতে লেখা নয়) আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাগজ ও কালি পরীক্ষা করা হয়। কালি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিভিন্ন ধরণের কালির উপাদান বিভিন্ন। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে কালির উপাদান পরিবর্তিত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যে কালির উপাদান নির্ণয় করে ও তার পরিবর্তন পরীক্ষা করে জালিয়াতি ধরতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্তে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাতে থাকে অক্সালিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সাল-ফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরাস অ্যাসিড, হাইপো, ক্লোরিন ওয়াটার ও অ্যামো-নিয়ার একটি মিশ্রণ। এর সংস্পর্শে এসে কালির কি ধরণের পরিবর্তন হয়, তা লক্ষ্য করে তার উপাদান ও উপাদানের পরিবর্তন সম্বন্ধে জানা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে অবশ্য এই পরিবর্তন বোঝবার জন্তে আল্ট্রাভায়োলেট আলোর সাহায্য উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে কোথাও কোথাও গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কিছুদিন আগে একটা দলিলে দাবী করা

হয় যে, 1940 সালে এক বৃদ্ধার সম্পত্তি জার্মানরা দখল করে নিয়েছিল এবং যুদ্ধের পর তাঁকে আর তা ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেল—দলিল লেখা হয়েছে যে কালিতে, তা তৈরি হয়েছে 1950 সালের পর, সই করা হয়েছে যে কলমে, তা 1943 সালের আগে তৈরিই হয় নি আর দলিলের কাগজ তৈরি হয়েছে 1958 সালের পর। সুতরাং সমস্ত দাবীটাই ভুয়া।

আজকাল সনাক্তকরণের জন্যে বহু ক্ষেত্রে দাঁত ও দাঁতের গঠনের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন মানুষের দাঁতের গঠন বিভিন্ন। তাই সন্দেহভাজন ব্যক্তির দাঁতের আলোকচিত্রের সাহায্যে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে একটি খুনের মামলায় নিহত ব্যক্তির দেহে দাঁতের দাগই ছিল পুলিশের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য বিস্তারিতভাবে প্রয়োগ করবার আগে এই বিষয় নিয়ে এখনও প্রভূত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অস্থিবিদ্যার উন্নতির ফলে দুর্ঘটনায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত মানুষের পরিচয় নিখুঁৎভাবে নির্ণয় করা বর্তমানে সম্ভব হয়েছে। সাধারণ হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে বয়স নির্ধারণের জন্যে করোটির অংশবিশেষ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের ক্ষেত্রে যেখানে ব্যাপকভাবে হাড় ভেঙে গেছে, সে ক্ষেত্রে দেহের ফিমার (Femur) হাড়ের মজ্জা পরীক্ষা করে বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া অজ্ঞাত পরিচয় বা নিহত ব্যক্তির সনাক্তকরণের জন্যে মস্তিষ্কের করোটির এক্স-রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে জীবিতাবস্থায় তোলা কোন ছবির সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে উন্নত দেশগুলিতে অপরাধী নির্ণয়, জালিয়াতি ইত্যাদি ধরবার জন্যে যে সমস্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে উদাহরণ দেব। এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে আর্সেনিক দিয়ে হত্যা করে মৃতদেহ ছ-মাস একটা ট্রাঙ্কের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারপর সেই দেহ গোপনে পুড়িয়ে ফেলেন। অপরাধ ঘটিত হবার প্রায় তিন মাস বাদে ঘটনাচক্রে পুলিশ সামান্য একটু ছাই পায়। কিন্তু সেই ছাইয়ের পরিমাণ এতই কম ছিল যে, তাকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত ছাইকে তেজস্ক্রিয় করে নিয়ে নির্গত রশ্মির প্রকৃতি গাইগার কাউণ্টারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে পুলিশ ছাইয়ে আর্সেনিকের সন্ধান পায়। পরে বিভিন্ন কারণে পুলিশ হত্যাকারী বলে ওই ভদ্রমহিলাকে সন্দেহ করে এবং নিউট্রন অ্যাক্টিভেশনের সাহায্যে তাঁর হাতে আর্সেনিকের সন্ধান পায় ও তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

কয়েক বছর আগে এক ব্যক্তি এমন একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের কঙ্কাল পেয়েছে বলে দাবী করে, যার গঠন ডারউইনের তত্ত্বের বিরোধী। কিন্তু তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মাথার খুলিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের হলেও ধড়টা আধুনিক কালের; অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বৈজ্ঞানিক ধাপ্পা।

গত বিশ বছরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধ নির্ণয়-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্রমশঃ সার্থক হয়ে উঠছে। তবে এখনও গবেষণা চলছে এবং বহু তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবার আশায় দিন গুণছে। তাই মনে হয়—সেদিন বোধ হয় আর খুব দূরে নয়, যেদিন অকুস্থলে না গিয়েও প্রাপ্তসূত্রের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বসেই তাঁদের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে পরীক্ষা করে অপরাধীকে নিশ্চিতই ধরিয়ে দিতে পারবেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা
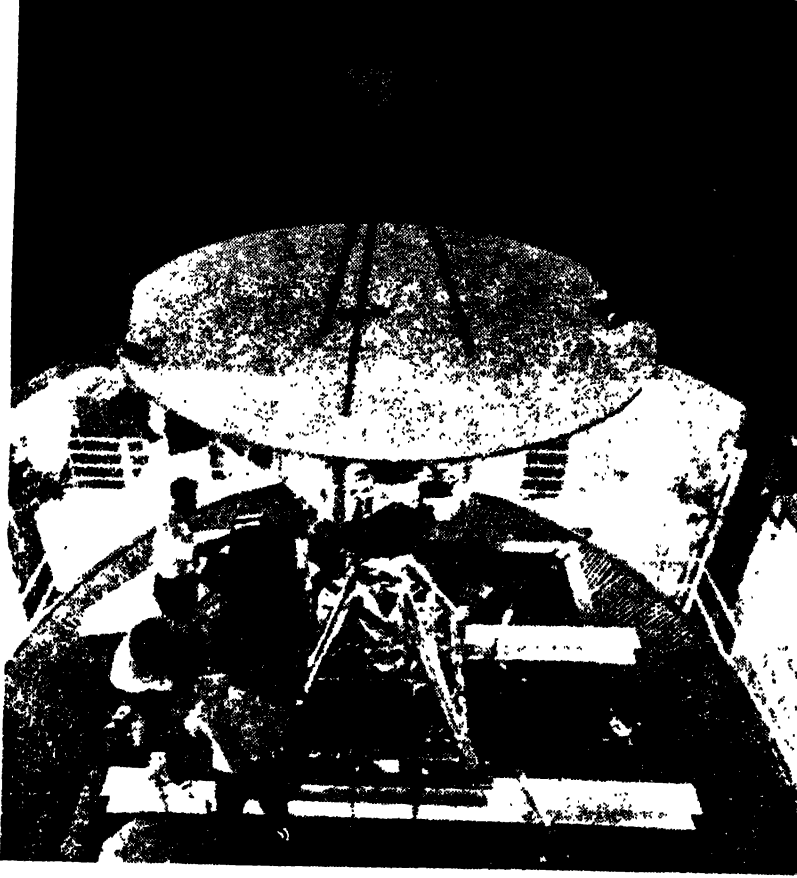
গ্রহরাজ বৃহস্পতি এবং তাকে ছাড়িয়েও মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে অভিযান চালাবার সময় মহাকাশযানকে কিরূপ তাপ, শৈত্য, শূন্যতা ও বিকিরণের সম্মুখীন হতে হবে, সে বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় কৃত্রিম স্পেস চেম্বারে পাইওনিয়ার-11 স্পেসক্র্যাফ্‌টের পরীক্ষার প্রস্তুতি। এতে 11টি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। আগামী 1973 সালে পাইওনিয়ার-12 নামে অনুরূপ মহাকাশযান বৃহস্পতিগ্রহের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের ওজন

পৃথিবী, সূর্য এবং চাঁদের ওজনের কথা বলবার আগে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভাল, 'ওজন' কথাটা আমরা অনেক সময় কিছুটা ভুল অর্থে ব্যবহার করি। মনে করা যাক, এক টুক্‌রা লোহা নিয়ে স্প্রিং তুলায় ওজন করা গেল—ছয় কিলোগ্র্যাম। ঐ লোহার টুক্‌রা সমেত স্প্রিং তুলাটি যদি চাঁদে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে দেখা যাবে সেখানে বস্তুটির ওজন এক কিলোগ্র্যাম হয়ে গেছে। ঐ লোহার টুক্‌রার বস্তু-পরিমাণ হ্রাস না হওয়া সত্ত্বেও ওর ওজন কমে গেল কেন—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগতে পারে। এর উত্তর হলো—লোহার টুক্‌রাটা যখন পৃথিবীর উপর ছিল তখন তার উপর পৃথিবীর যে টানটা পড়ছিল, চাঁদে নিয়ে যাওয়ায় তার টানটা প্রায় ছয় গুণ কমে গেছে। এই কারণেই ছয় কিলোগ্র্যামের বস্তুটা চাঁদে গিয়ে এক কিলোগ্র্যাম হয়ে গেছে। এবার মনে করা যাক, ঐ লোহার টুক্‌রাটা দাঁড়িপাল্লার একদিকে রেখে অপর পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে দেখা গেল, বস্তুটির ওজন ছয় কিলোগ্র্যাম। এবার ঐ দাঁড়িপাল্লায় বস্তু এবং বাটখারাসমেত যদি চাঁদে গিয়ে ওজন করা যায়, তবে দেখা যাবে—এক্ষেত্রে বস্তুটির ওজন ছয় কিলোগ্র্যামই আছে। এক্ষেত্রেও আবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—এখন কি তবে চাঁদের টান কম হয় নি? এই প্রশ্নের জবাব হলো—এক্ষেত্রেও চাঁদের টান কমেছে, তবে বস্তু এবং বাটখারার উভয় দিকেই টান কমেছে বলে পাল্লাটি সাম্য অবস্থায় রয়ে গেছে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, স্প্রিং তুলায় কোন বস্তু ঝুলিয়ে দিলে যে টান পড়ে, সেটাই হলো বস্তুর 'ওজন'। কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় বাটখারার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে যে বস্তু-পরিমাণ মাপা হয়, তা হলো বস্তুর 'ভর'। বস্তুর ভরকেই আমরা ভুল অর্থে অনেক সময় ওজন বলি। পৃথিবীর ওজন, সূর্যের ওজন বা চাঁদের ওজন—এই কথাগুলি এই একই কারণে সঠিক নয়—নির্ভুলভাবে বলা উচিত পৃথিবীর ভর, সূর্যের ভর এবং চাঁদের ভর। এখন এই তিনটি ভর কি ভাবে পরিমাপ করা যায়, তা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমেই ধরা যাক, পৃথিবীর ভর পরিমাপের কথা। একটা লোহার টুক্‌রার ভর আমরা দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি; কিন্তু পৃথিবীকে তো আর কোন দাঁড়িপাল্লায় চাপানো সম্ভব নয়। সুতরাং পৃথিবীর ভর মাপতে হলে একটু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নিউটন তাঁর মহাকর্ষ-তত্ত্বে বলেছেন—এই বিশ্বজগতে প্রতিটি বস্তু পরস্পরকে একটি বলের দ্বারা আকর্ষণ করে। এই বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক; অর্থাৎ m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু যদি পরস্পর r দূরত্বে থাকে, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ হবে, যেখানে G

হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। ক্যাভেণ্ডিস, বয়েস, পয়েনটিং প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে এই ধ্রুবকের মান নির্ণয় করে দেখেছেন, $G = 6{\cdot}67 \times 10^{-8}$ সি. জি. এস. একক।

এখন মনে করা যাক, একটা আপেল পৃথিবীর উপরিস্থিত একটি গাছে ঝুলছে। এই অবস্থায় পৃথিবী এবং আপেলের মধ্যে পারস্পরিক এক আকর্ষণ-বল ক্রিয়া করবে। যদি পৃথিবীর ভর হয় Me এবং আপেলের ভর হয় m, তবে ওদের আকর্ষণ-বলের পরিমাণ হবে

$$F = G\frac{M\ m}{R^2} \cdots\cdots (1)$$

যেখানে R হলো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে আপেলের কেন্দ্রের দূরত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ।

এখন যদি আপেলটির বোঁটা ছিঁড়ে যায়, তবে ঐ আকর্ষণ-বলের জন্যে আপেলটি সজোরে মাটির দিকে ছুটে যাবে। ছুটে যাবার সময় আপেলটির উপর ত্বরণ সৃষ্টি হবে। ত্বরণ হলো বস্তুর বেগ পরিবর্তনের হার। পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বলের প্রভাবে বস্তুর উপর যে ত্বরণ সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় অভিকর্ষজ ত্বরণ। এই অভিকর্ষজ ত্বরণকে g দিয়ে সূচিত করা হয় এবং এই g-এর মান একটি সরল দোলকের সাহায্যে অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। যদি কোন সরল দোলকের দোলনকাল হয় T এবং কার্যকরী দৈর্ঘ্য হয় l, তবে $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ এই সমীকরণের সাহায্যে g-এর মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পরিমাপ করে ভূপৃষ্ঠে g-এর মান পাওয়া যায় 980 সে. মি./সে.^{2}।

যেহেতু ঐ আপেলের উপর g-অভিকর্ষজ ত্বরণ ক্রিয়া করছে, সুতরাং m ভরের ঐ আপেলের উপর পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল হবে—

$$F = mg \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$$

সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে লেখা যায়—

$$\frac{G\ Me\ m}{R^2} = mg \text{ বা } Me = \frac{gR^2}{G}$$

এখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $R = 4000$ মাইল $= 6{\cdot}4 \times 10^8$ সে. মি., অভিকর্ষজ ত্বরণ $g = 980$ সে. মি./সে.^{2} এবং $G = 6{\cdot}66 \times 10^{-8}$ সি. জি. এস. একক

অতএব, পৃথিবীর ভর $Me = 6{\cdot}1 \times 10^{27}$ গ্র্যাম বা $6{\cdot}1 \times 10^{21}$ টন।

এই গেল পৃথিবীর ভর নিরূপণের উপায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সূর্যের ভর পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ সূর্য-পৃষ্ঠে একটা সরল দোলকের সাহায্যে সূর্যের মহাকর্ষীয় ত্বরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সূর্যের ভর নির্ণয় করবার জন্যে রয়েছে তার গ্রহগুলি। যেহেতু পৃথিবী হলো সূর্যের একটি গ্রহ, সেহেতু সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর আবর্তন গতি থেকে সূর্যের ভর নির্ণয় করা যায়। যখন পৃথিবী এক বৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করে, তখন পৃথিবীর উপর এক অভিকেন্দ্রিক বল (Centripetal force) ক্রিয়া করে সূর্যের

অভিমুখে আর ঐ বলের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে অপকেন্দ্রিক বল (Centrifugal force)। এই উভয় বলের মান সমান।

এখন যদি পৃথিবীর ভর হয় Me এবং পৃথিবী যে বৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তার কোন একটি বিন্দুতে পৃথিবীর সরলরৈখিক বেগ হয় V, তবে ঐ অভিকেন্দ্রিক বা অপকেন্দ্রিক বলের মান হবে $\frac{MeV^2}{Ds}$, যেখানে Ds হলো সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব।

আর যদি সূর্যের ভর হয় Ms, তবে নিউটনের মহাকর্ষ-তত্ত্ব অনুসারে বলা যায়, সূর্য ও পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ বলের মান হবে $G\frac{MsMe}{Ds^2}$, যেখানে G হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

এখন যেহেতু পৃথিবী সূর্যের টানে তার দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে না বা সূর্যের টান কাটিয়ে বেরিয়েও যেতে পারছে না, তখন বলা যেতে পারে উপরিউক্ত দুটি বলের মান সমান : অর্থাৎ

$$\frac{G\,MsMe}{Ds^2}=\frac{MeV^2}{Ds}$$

$$\therefore \quad \text{সূর্যের ভর } Ms=\frac{DsV}{G}$$

এখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব $Ds=1{\cdot}5\times10^{13}$ সে. মি., বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর রৈখিক বেগ $V=30$ কি. মি./সে $=3\times10^6$ সে. মি./সে. এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক $G=6{\cdot}67\times10^{-8}$ সি. জি. এস. একক,

সুতরাং সূর্যের ভর $Ms=2\times10^{33}$ গ্র্যাম $=2\times10^{27}$ টন।

অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী।

এবার আসা যাক চাঁদের ভর মাপবার পদ্ধতিতে। চাঁদের ভর পরিমাপের কাজটা কিন্তু সূর্য বা পৃথিবীর ভর পরিমাপের চেয়ে বেশ কঠিন। এমন কি, দূরের নেপচুন গ্রহের ভর পরিমাপের কাজটা চাঁদের ভর নির্ণয়ের চেয়ে সহজ কাজ। কারণ এই যে, নেপচুনের উপগ্রহ আছে। যে সব গ্রহ বা উপগ্রহের কোন উপগ্রহ নেই, তাদের ভর পরিমাপের কাজটা বেশ কঠিন। যেহেতু আমাদের চাঁদের কোন উপগ্রহ নেই এই কারণে চাঁদের ভর নির্ণয় করা হয় পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর মহাসমুদ্রের জলের জোয়ার-ভাঁটা লক্ষ্য করে। সূর্য এবং চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর উপর মহাসমুদ্রের জল যখন স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন তাকে জোয়ার বলা হয়। জোয়ার সাধারণতঃ দু-রকমের হয়ে থাকে—ভরা কোটাল (Spring tide) এবং মরা কোটাল (Neap tide)। অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় যে জোয়ার হয়, তাকে বলা হয় ভরা কোটাল এবং শুক্লাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমীতে যে জোয়ার হয়, তাকে বলা হয় মরা কোটাল। ভরা কোটালে সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করে; অর্থাৎ

তখন সমুদ্রজলের উপর সৌরশক্তি এবং চান্দ্রশক্তি যুগ্মভাবে ক্রিয়া করে। অন্যভাবে বলা যায়—এটা হলো সৌর জোয়ার এবং চান্দ্র জোয়ারের যুগ্ম ফল। আর মরা কোটালে সূর্য ও পৃথিবী সংযোগকারী রেখা পৃথিবী ও চাঁদ সংযোগকারী রেখার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে; অর্থাৎ তখন সমুদ্রজলে চান্দ্র জোয়ার এবং সৌর জোয়ার ঘটাবার শক্তির অন্তর ফল ক্রিয়া করে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মরা কোটালে জোয়ারের উচ্চতা ভরা কোটালে জোয়ারের উচ্চতার 0·42 ভাগ। এখন চাঁদের জোয়ার ঘটাবার শক্তিকে যদি Em এবং সূর্যের জোয়ার ঘটাবার শক্তিকে যদি Es দিয়ে নির্দেশ করা যায়, তবে—

$$\frac{Em+Es}{Em-Es}=\frac{100}{42}$$

$$\text{বা}\quad \frac{Em}{Es}=\frac{71}{29}\quad\cdots\cdots\ (3)$$

এখন চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিতলের এক গ্র্যাম বস্তু যে বলে আকর্ষিত হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত এক গ্র্যাম বস্তু তার চেয়ে কিছুটা কম বলে আকর্ষিত হয়। যদি চাঁদের ভর হয় Mm এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় Dm এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় R, তবে এই আকর্ষণ-বলের পার্থক্য হবে—

$$\frac{GMm.1}{(Dm-R)^2}-\frac{GMm.1}{D^2m}$$

$$=\frac{2\,GMmR}{D^3m}$$

অনুরূপভাবে যদি সূর্যের ভর হয় Ms এবং সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হয় Ds, তবে প্রমাণ করা যাবে, সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে পৃথিবীর উপরিতলের এক গ্র্যাম বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থিত এক গ্র্যাম বস্তুর চেয়ে $\frac{2\,GMsR}{D^3s}$ অধিক বলে আকর্ষিত হবে।

সুতরাং চাঁদ আর সূর্যের জোয়ার ঘটাবার অনুপাত হবে—

$$\frac{2\,GMmR}{D^3m}:\frac{2\,GMsR}{D^3s}=\frac{Mm}{Ms}\left(\frac{Ds}{Dm}\right)^3\cdots\cdots\cdots(4)$$

এখন সমীকরণ (3) এবং (4) থেকে আমরা পাই—

$$\frac{Mm}{Ms}\left(\frac{Ds}{Dm}\right)^3=\frac{71}{29}$$

যেহেতু সূর্য থেকে চাঁদের দূরত্ব Ds = 150000000 কি. মি. এবং পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব Dm = 380000 কি. মি. অর্থাৎ $\frac{Ds}{Dm}=400$ (প্রায়)।

$$\text{সুতরাং}\quad \frac{Mm}{Ms}.\,(400)^3=\frac{71}{29}$$

এখন সূর্যের ভর $Ms - 2 \times 10^{33}$ গ্র্যাম

অতএব চাঁদের ভর $Mm = 7\cdot6 \times 10^{25}$ গ্র্যাম বা $7\cdot6 \times 10^{19}$ টন

চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় আশী ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ আশীটা চাঁদের বাটখারা চাপিয়ে আমাদের পৃথিবীটাকে ওজন করা যাবে। তবে সঠিকভাবে বলতে গেলে চাঁদের ভর হলো পৃথিবীর ভরের 0 0123 অংশ।

গিরিজাচরণ ঘোষ*

---

* পদার্থবিস্তা বিভাগ, বিস্তাসাগর কলেজ, কলিকাতা-6

পারদর্শিতার পরীক্ষা

জীববিস্তায় তুমি কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্মে নীচে 4টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। 1 ও 2নং প্রশ্নের প্রতিটিতে 20 নম্বর আছে এবং 3 ও 4নং প্রশ্নের প্রতিটিতে 30 নম্বর; শেষোক্ত দুটি প্রশ্নের (ক), (খ) ও (গ)-এর প্রত্যেকটিতে 10 নম্বর করে আছে। উত্তর দেবার জন্মে মোট সময় 3 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে 80 বা আরো বেশী নম্বর পেলে জীববিস্তায় তোমার পারদর্শিতা খুব বেশী বুঝতে হবে। 60 বা 70 পেলে পারদর্শিতা বেশী, 40 বা 50 পেলে পারদর্শিতা চলনসই, 20 বা 30 পেলে পারদর্শিতা কম এবং 20-এর কম পেলে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

1. ক্লোরোফিলের মধ্যে কোন্ উপাদানটি বর্তমান থাকে ?

　(ক) লোহা
　(খ) তামা
　(গ) ম্যাগ্নেসিয়াম
　(ঘ) সিলিকন

2. কোন্‌টি ঠিক বল—

মাইয়োসিস প্রক্রিয়ায় কোষ-বিভাজনে মূল কোষের তুলনায় প্রতিটি নতুন কোষে

　(ক) ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক হয়
　(খ) ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়
　(গ) ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে
　(ঘ) ক্রোমোজোম সংখ্যা অনির্দিষ্ট

3. নীচের বাঁ-দিকের (ক), (খ) ও (গ)-এর এক-একটিকে ডান দিকের এক-একটি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। কোন্‌টিকে কি হিসাবে চিহ্নিত করবে ?

(ক) পেপসিন	ভিটামিন
(খ) ইনসুলিন	হর্মোন
(গ) থায়ামিন	এনজাইম

4. নীচের বাঁ-দিকে তিনটি প্রাণীর এবং ডান দিকে তিনটি গোষ্ঠীর নাম দেওয়া আছে। কোন্ প্রাণীটি কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ?

(ক) অ্যামিবা	প্ল্যাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes)
(খ) ফিতা কৃমি	প্রোটোজোয়া (Protozoa)
(গ) স্পঞ্জ	পরিফেরা (Porifera)

(উত্তরের জন্য 185নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ফসিল

ফসিল বা জীবাশ্ম নামটার সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই নিশ্চয় পরিচয় আছে। ল্যাটিন ভাষায় ফসিল কথাটির অর্থ—খুঁজে পাওয়া জিনিষ। তাই ফসিল বলতে আমরা বুঝি প্রস্তরীভূত প্রাণিদেহ, যা মাটির নীচ থেকে খনন করে বের করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অনেক সময় বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। তার ফলে সে যুগের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ চাপা পড়েছে মাটি বা শিলাস্তরের নীচে। পরবর্তী যুগে এগুলির উপর একটার পর একটা স্তর জমে উঠেছে। বর্তমানে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেহাৎ আকস্মিকভাবেই লক্ষ লক্ষ—এমন কি, কোটি কোটি বছর আগেকার এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া গেছে। এগুলিই আমাদের কাছে ফসিল বা জীবাশ্ম নামে পরিচিত।

জীবজন্তু এবং গাছপালার প্রস্তরীভূত দেহকেই সাধারণতঃ আমরা ফসিল বা জীবাশ্ম বলি। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু আরো একটু ব্যাপক অর্থে কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের

মতে, অবস্থা অনুসারে ফসিলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(1) কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের অবিকৃত আসল দেহাংশ, (2) সম্পূর্ণভাবে শিলীভূত বা পাথর হয়ে যাওয়া ফসিল, (3) শিলীভূত দেহ বা দেহাংশের ছাঁচ ও চিহ্ন।

প্রথম শ্রেণীর ফসিলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের কিছু অংশ, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেহটাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। অনেক বছর আগে সাইবেরিয়ার বরফস্তূপের মধ্যে বিরাট আকৃতির এক ম্যামথের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির দেহের প্রত্যেকটি অংশ—এমন কি চামড়ার উপরের লোমগুলি পর্যন্ত এখনো অবিকৃত রয়েছে। অথচ তোমরা শুনলে অবাক হবে, আজ থেকে অন্ততঃ ছয় কোটি বছর আগেই এই ধরণের দৈত্যাকার ম্যামথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে। এছাড়া অ্যাম্বারজাতীয় রজনের স্তরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা রকম কীট-পতঙ্গের সম্পূর্ণ দেহ, অ্যাসফাল্ট হ্রদের গর্ভে অতিকায় জলচর জীবের বিরাট দাঁত ইত্যাদিও পাওয়া গেছে অক্ষত অবস্থায়। সুতরাং এগুলিকে ফসিল না বলে বরং প্রকৃতির তৈরি মামি বলাই ভাল। সহজেই বুঝতে পার, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এগুলির দাম অপরিসীম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ফসিলে জৈবাংশের পরিবর্তে পাথর বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ বেশী থাকে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রেও প্রস্তরীভবন এমন নিখুঁতভাবে ঘটে যে, ফসিলের সূক্ষ্ম অংশগুলি পরীক্ষা করতে অসুবিধা হয় না। লৌহ পাইরাইটিজ, চুনাপাথর, কোয়ার্ট্জ্ প্রভৃতির তীব্র বিক্রিয়ার ফলেই কালক্রমে প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর ফসিলে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সরাসরি দেহাংশের পরিবর্তে পাওয়া যায় তুটি নরম মাটি বা অন্য কোন ধাতব স্তরের মধ্যে সেটির দেহের অবিকৃত ছাপ। 50 কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াতো এমন কয়েকটি নরম মাংসবিশিষ্ট অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের ছাপ বিভিন্ন মৃত্তিকার স্তরে পাওয়া গেছে। এগুলি এখনো এমন অবিকৃত আছে যে, জন্তুগুলির আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে বিজ্ঞানীদের কোন অসুবিধা হয় নি।

সকল শ্রেণীর মাটিতে ফসিল পাওয়া যায় না। যে শিলাস্তরে বালি, নরম মাটি, কাদা অথবা চুনের ভাগ অধিক, সেই ধরণের শিলাতেই ফসিল পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশী। গ্র্যানিট প্রভৃতি আগ্নেয়প্রস্তর কিংবা খনিতে প্রাপ্ত কঠিন ধাতুতে ফসিলের সন্ধান মেলে না। কারণ সৃষ্টির প্রথম যুগে এসব প্রস্তর প্রচণ্ড গরম ছিল, ফলে এগুলির মধ্যে কোন জীবজন্তুর দেহাবশেষ রক্ষিত হতে পারে নি। ঠিক এই কারণেই আগ্নেয়গিরির লাভাস্তরেও তেমন কোন ফসিল পাওয়া যায় নি, তবে সামান্য কয়েকটি আগ্নেয়গিরির কাছে ফসিল দেখা গেছে। এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা একটা

মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা দেখেছেন এসব লাভাস্রোতের মধ্যে গণ্ডার, মহিষ, হাতী প্রভৃতি বিরাটকায় জন্তুদের পাশেই রয়েছে অনেক হিংস্র মাংসাশী প্রাণীর শিলীভূত দেহ। এর কারণ ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানীরা বলেন, লাভাস্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা পিচ্‌জাতীয় জিনিষের মধ্যে বড় বড় জন্তুগুলি হয়তো মারা পড়েছে এবং সেগুলিকে শিকার মনে করে কোন কোন মাংসাশী জন্তু তার উপর লাফিয়ে পড়ে এই একই ভাবে প্রাণ হারিয়েছে সেই মরণ ফাঁদে। তাই লাভাপিণ্ডের মধ্যে শিকার ও শিকারী উভয়েরই ফসিল দেখা যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাওয়া ফসিলগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মানব এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেছেন। এক-একটি বিশেষ সময়ের ভূস্তর এবং তখনকার জীবজন্তু পরীক্ষা করে তাঁরা প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করেছেন। এই সকল জীবগোষ্ঠীর কাল ঠিক করা হয়েছে ভূস্তরের সময় অনুযায়ী। নৃতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন, এক-একটি যুগে এক-একটি জীবগোষ্ঠীর প্রাধান্য ঘটেছে পৃথিবীপৃষ্ঠে; যেমন—ছয় কোটি বছর পূর্বেকার কেনোজোয়িক যুগের প্রথম দিকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রাধান্য ঘটেছিল। এর পরবর্তী চার কোটি বছর আগেকার অলিগোসিন যুগের ভূস্তরে প্রোপ্লিওপিথেকাস নামক একশ্রেণীর বানরের ফসিল পাওয়া গেছে। জন্তুগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের লেজ নেই। বিজ্ঞানীদের মতে, অলিগোসিন যুগের এই লেজহীন বানরই বোধ হয় বর্তমান মানব ও মানবসদৃশ বানরের আদিমতম সংস্করণ। এর ঠিক পরেই 3 কোটি বছর আগেকার মধ্য মায়োসিন যুগের স্তরে অনেকগুলি বানরের ফসিল পাওয়া গেছে, যেগুলির সঙ্গে বর্তমান মানবগোষ্ঠীর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। নৃতাত্ত্বিকেরা তাই বলেন, অলিগোসিন ও মধ্য মায়োসিন যুগের মধ্যবর্তী সময়ে জীবজগতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এরই ফলে মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট বিরাট আকারের বানরের আবির্ভাব ঘটে। তবে 5 লক্ষ বছরের পুরনো পিথেক্যানথ্রোপাস নামে যে নর-বানরের ফসিল পাওয়া গেছে, তাতেই মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির আভাস প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পরে আরো দীর্ঘ ও ব্যাপক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই মানবের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি চূড়ান্তভাবে আধুনিক মানবের দিকে পরিবর্তিত হয়েছে।

বিভিন্ন ফসিল পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, পৃথিবীতে প্রথম মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্য এশিয়ায়। কারণ বিশ্বের প্রাচীনতম ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে এই অঞ্চলেই, তাছাড়া আমাদের পরিচিত প্রায় সমস্ত গবাদি-পশুর জন্ম যে মধ্য-এশিয়াতেই, তারও প্রমাণ রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে মধ্য এশিয়া থেকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে আদি মানবের সুবিধা হয়েছিল।

মিনতি সেন

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (গ) ম্যাগ্‌নেসিয়াম

2 (ক) ক্রোমোজোম-সংখ্যা অর্ধেক হয়

3. (ক) পেপসিন—এনজাইম

(খ) ইনসুলিন—হর্মোন

(গ) থায়ামিন—ভিটামিন

4. (ক) অ্যামিবা—প্রোটোজোয়া

[Protozoa শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ Protos ও Zoön থেকে। Protos-এর অর্থ : প্রথম এবং Zoön-এর অর্থ : প্রাণী।]

(খ) ফিতা কৃমি—প্ল্যাটিহেলমিনথিস

[Platyhelminthes শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রীক শব্দ Platy ও Helminthes থেকে। Platy-এর অর্থ : চ্যাপ্টা এবং Helminthes-এর অর্থ : পোকা।]

(গ) স্পঞ্জ—পরিফেরা

[Porifera শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Porus ও Ferre থেকে। Porus-এর অর্থ : ছিদ্র এবং Ferre-এর অর্থ : ধারণ করা।]

লৌহ ও ইস্পাতের ইতিহাস

আমাদের বর্তমান সভ্যতাকে বিরাট কোন যানের সঙ্গে তুলনা করলে লোহাকে নিঃসন্দেহে তার চলমান চাকা বলা যায়। যুগ যুগ ধরে সে মানুষের সঙ্গে কি ভাবে চলেছে, তা এক ইতিহাস।

লোহার ইংরেজী প্রতিশব্দ Iron, খুব সম্ভব স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান কথা Iarn থেকে এসেছে। লোহার ব্যবহার মানুষ এত প্রাচীনকাল থেকেই জানে যে, মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও এর ব্যবহার জানতো। মিশরের পিরামিড, যার বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর—সেখানেও অভিযান চালিয়ে লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই অমূল্য ও সম্ভাবনাপূর্ণ ধাতুটির ব্যবহার করে গেছেন—শুধু ব্যবহারই করেন নি, ব্যবহারের বিভিন্ন নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লোহার তৈরি খোঁচ,

বল্লম, বর্শা, তীর ইত্যাদির ব্যবহার যে সে যুগের লোক জানতো, বেদে তার উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠের ধনুর্বেদে সম্পূর্ণ লোহার তৈরি এক প্রকার বিশেষ ধনুকের উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ভারতে যে ইস্পাতের ব্যবহার ছিল, তারও বহু নিদর্শন আছে। দামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির ফলা ভারতীয় ইস্পাতেই তৈরি হতো।

ইউরোপীয়েরা তখনই এই ধাতুর সঙ্গে পরিচিত হয়, যখন আর্যেরা দেশ ঘুরতে ঘুরতে তাদের জ্ঞান ও কৃষ্টি নিয়ে ইউরোপে হাজির হয়। সম্ভবতঃ এট্রাস্কানরা (Etruscan), যারা কিনা আর্য বংশোদ্ভূত, ইউরোপীয়দের মধ্যে তারাই প্রথম এই ধাতুর ব্যবহার শেখে।

প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে এই ধাতু ব্যবহারের বেশ দক্ষতা ছিল। তারা এই ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ পরিচিত ছিল। আধুনিক স্মেলটিং পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল। পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোণারকের মন্দিরের লোহার কড়ি এবং আবু পর্বতের মন্দির-শীর্ষের বৃহৎ ত্রিশূল এবং সিংহলের বৃহৎ লৌহ শিকল সে যুগের লোকের ব্যাপক লৌহ ব্যবহারের কথারই প্রমাণ দেয়। চীনারা যে সুপ্রাচীন 2500 খৃঃ পূর্বাব্দেও লোহার ব্যবহার জানতো, তা তাদের পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের আবিষ্কারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম ধাতুবিদ্ বলতে গেলে মিশরীয় ও অ্যাসিরীয়দেরই বোঝায়। ইজিপ্টে রট আয়রনের ব্যবহারের নমুনা চার হাজার বছর পূর্বেও ছিল এবং তা সম্ভবতঃ হিটিটিসদের (Hittites) আমদানী করা ছিল। এগুলি হিমাটাইট আকর থেকে নিষ্কাশিত হতো। কিন্তু কিভাবে ও কখন মানুষ কয়লা ও চুনাপাথর সহযোগে ধাতব লৌহের নিষ্কাশন করতে শিখলো, তার সঠিক হদিশ মেলে না। বোধ হয় তখন সভ্যতার প্রত্যুষকাল। সেই আধা আলো আধা অন্ধকারে কি ঘটেছিল, তা পরিস্কার জানা যায় নি। জানি না, পৃথিবীর সেই আদিম কালে ভূ-পদার্থবিষয়ক অবস্থা সামান্য কিছু লোহাকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রেখে ছিল কিনা!

অতি সাধারণ লোহার আকরে বালি ও পাথুরে জিনিষের সঙ্গে অম্লজানযুক্ত লোহা মিশে থাকে। অম্লজান ছাড়া অন্য জিনিষগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লোহা থেকে আলাদা করা যায়। অম্লজানমিশ্রিত লোহাকে কয়লা ও চুনাপাথর মিশিয়ে মারুৎ-চুল্লীতে উত্তপ্ত করলে লোহা পাওয়া যায়। এই লোহাকে বলা হয় পিগ-আয়রন, কারণ ঐ গলা লোহাকে ঠাণ্ডা করলে যে আকার নেয়, তা দেখলে মনে হয় যেন একপাল শূকরের বাচ্চা। এই পিগ-আয়রনে প্রায় চার শতাংশ অঙ্গার, কিছু শতাংশ ফস্‌ফরাস, সালফার, ম্যাঙ্গানিজ ও সিলিকন থাকে।

অনেকে মনে করেন যে, কৃষ্ণ-সাগরের তীরে যে উপজাতি বাস করতো, তারাই প্রথম ইস্পাতের ব্যবহার জানতো। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর আরম্ভের আগে পর্যন্ত মারুৎ-

চুল্লী থেকে পাওয়া প্রায় লোহাই রট-আয়রন হিসাবে ব্যবহার করা হতো। রট-আয়রন প্রায় বিশুদ্ধ লোহা। কারণ এতে অঙ্গারের পরিমাণ প্রায় 0·1%।

আধুনিক পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈরির কাজে যার অবদান সর্বপ্রথম, তিনি হচ্ছেন উইলিয়াম কেলী। এরকম একজন লোককে নিয়ে সে যুগের লোক উপহাস করতে কসুর করে নি। কেলীই প্রথম চিন্তা করেন যে, সাধারণ পিগ-আয়রনকে গলিয়ে তার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করালে লোহার মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থগুলি পুড়ে যায় এবং প্রচুর বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাঁর এই কথাকে আমল দিতে চায় নি। আর সবচেয়ে মজার কথা হলো, তাঁর শ্বশুর মশায় তো জামাতার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেন। কিন্তু কেলী তাঁর সিদ্ধান্তে এমন অটল ছিলেন যে, তিনি একটি বিরাট ন্যাসপাতির আকারের পাত্র তৈরি করেন এবং প্রচুর গলিত লোহা তাতে রেখে অনেক ঠাণ্ডা বাতাস তার মধ্য দিয়ে চালিত করেন। গুরু গুরু শব্দের সঙ্গে একটি রঙীন শিখা পাত্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। সেই শিখা নিভে যাবার পর লোহাকে ঠাণ্ডা করে যা পাওয়া গেল, তা হলো ইস্পাত। সমগ্র দেশ কেলীর কাণ্ড দেখে তো হতবাক।

উইলিয়াম কেলী যখন তাঁর আবিষ্কারকে আরো কার্যোপযোগী করতে ব্যস্ত, তখন ইংল্যাণ্ডের হেনরী বেসিমারও প্রায় একই জিনিষ আবিষ্কার করে ফেলেন। বেসিমারের পদ্ধতি কেলীর উদ্ভাবিত পদ্ধতি থেকে উন্নত। এই উল্লেখযোগ্য কাজের সম্মানার্থে তিপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর দেশের সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন।

যদিও বেসিমার পদ্ধতিতে পাওয়া ইস্পাত আমাদের অনেকখানি চাহিদাই মিটিয়ে দেয়, তবুও এর বেশ কিছু অসুবিধাও থেকে যায়। লোহায় খুব বেশী ফস্‌ফরাস থাকলে এতে কাজ করবার অসুবিধা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরাও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নন। কার্ল উইলহেলম্‌ সিমেন্স নামে জার্মেনীর (পরে ইংল্যাণ্ডের নাগরিক) এক বৈজ্ঞানিক তাঁর বিখ্যাত ওপেন হার্থ পদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে আসেন।

যদিও সারা বিশ্বে যথেষ্ট পরিমাণে লোহা ও ইস্পাত তৈরি হচ্ছে, তথাপি এই সভ্যতার প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অপর পক্ষে যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের বড় বড় খনিগুলির আকর যোগাবার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। তবে কি এর অভাবে আমাদের সভ্যতার চাকা স্থির হয়ে যাবে? জানি না, টাইটানিয়াম কিংবা কোন বিশেষ ধরণের প্লাসটিককে লোহা তার উত্তরাধিকারী করে যাবে কিনা!

শ্যামসুন্দর পাল

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : মুক্তা কিভাবে সৃষ্টি হয় ?

শেফালি রায়, কলিকাতা-14

প্রশ্ন 2. : গুদামজাত খাদ্যশস্যে যে সমস্ত কীট ও মথের আক্রমণ হয়, তাদের কয়েকটির নাম কি ?

প্রমথনাথ চক্রবর্তী, কলিকাতা-24

উত্তর 1. : সমুদ্রের মেলিয়াগ্রিনা নামক একজাতীয় ঝিনুকের মধ্যে মুক্তার সৃষ্টি হয়। আহার্য সংগ্রহের সময় ঝিনুক তার দেহের দু-পাশের শক্ত খোলক দুটি অল্প প্রসারিত করে। এই সময় কখনো কখনো খোলকের ভিতরে (প্রাণীর দেহে) শক্ত কণা ঢুকে যায়—যা এই প্রাণীদের নরম দেহের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। এই অবস্থায় ঝিনুক তার দেহ থেকে একপ্রকার রস নিঃসৃত করে শক্ত কণার চারদিকে প্রলেপের সৃষ্টি করে কণাটিকে সহনীয় করে তোলে। এভাবে আস্তে আস্তে কণাটি বড় হতে থাকে। কালক্রমে ঝিনুকটি মারা গেলে শক্ত খোলক আপনা থেকেই খুলে যায় যায় এবং ভিতরের নরম পদার্থ নষ্ট হয়ে গেলে কণাটি সমুদ্রের তলায় পড়ে থাকে, যাকে আমরা মুক্তা বলি। তবে সাধারণতঃ ডুবুরীর সাহায্যে সমুদ্রের তলা থেকে জীবন্ত ঝিনুক তুলে এনে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। মুক্তার উপর আলো পড়লে বিভিন্ন রঙে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

উত্তর 2. : সাধারণতঃ গুদামজাত খাদ্যশস্যের মধ্যে রিজোপারথা ডোমিনিকা, সিটোফিলাস ওরিজা, ওরিজাফিলাস সারিনামেনসিস, ক্রুচাস, ট্রাইবোলিয়াম ক্যাস্‌টেনিয়াম প্রভৃতি পোকা এবং এফেসটিয়া কটেলা, করসিরা সেফালোনিকা প্রভৃতি মথের আক্রমণ দেখা যায়। উপযুক্ত পরিবেশে এদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়, ফলে এদের আক্রমণে অল্প সময়েই গুদামজাত চাল, গম, আটা, ময়দা, রবিশস্য প্রভৃতি খাদ্যশস্য নষ্ট হয়ে যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

---

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

গত 20শে—23শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কলেজ-প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম এবং সভাপতিত্ব করেন সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ডাব্লিউ. ডি. ওয়েস্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীএ এল. ডায়াস এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত। চারদিনব্যাপী এই অধিবেশনে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে 20 জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী যোগদান করেন। এবারের অধিবেশনে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক টি. আর, শেষাদ্রিকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করা হয়। অধিবেশনের বিভিন্ন দিনে 13টি শাখার আলোচনা-চক্র ও বিশেষ বক্তৃতা ছাড়া কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতারও আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও প্রচার এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোহানেস কেপ্‌লারের চতুঃশতবার্ষিকী উপলক্ষে দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগের ছাত্রদের তৈরি মডেলের প্রদর্শনীও করা হয়। (বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশন সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হবে)।

কলকাতায় আর্থার সি. ক্লার্ক

কলিঙ্গ পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞান কাহিনীকার ও লোকরঞ্জক বিজ্ঞান-লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক সম্প্রতি তিন দিনের সফরে কলকাতায় এসেছিলেন। 4ঠা ফেব্রুয়ারী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আয়োজিত এক বিজ্ঞানী-সভায় তিনি 'একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী' সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। তিনি বলেন—সেই ভাবীকালে সমগ্র পৃথিবী ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে প্রায় একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছুবে। পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে কোন মানুষকে ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগবে, আর সে জন্যে খরচ পড়বে অতি সামান্য। সেই পৃথিবীতে আজকালকার মত এমন অসংখ্য শহর থাকবে না বরং সমগ্র পৃথিবীই একটি অখণ্ড শহরে পরিণত হবে—কি বার্তা বিনিময় ব্যবস্থা, কি পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা—সব কিছুই তখন নিয়ন্ত্রিত হবে মহাকাশ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে। তখন জীবন হবে অনেক স্বচ্ছন্দ, কর্মহীন। অফুরন্ত সময়ই হবে ভাবীকালের মানুষের প্রধান সমস্যা। এই বিশ্রামকে সে কি ভাবে ব্যবহার করবে, সেটাই হয়তো সে দিন তার প্রধান ভাবনার বিষয় হবে।

ভাবীকালে গড়ে উঠবে ছোট ছোট শহর। তবে শহর বলতে আমরা এখন যা বুঝি, তেমনটি নয়। ইস্পাতের মত শক্ত কাগজের হাল্কা পদার্থ

দিয়ে তৈরি হবে ছোট ছোট বাড়ী। বাড়ীগুলি এমনভাবে তৈরি হবে যে, গরমের দিনে সেগুলি বাতাসে ভর করে ভেসে যাবে শীতলতর স্থানে, আবার শীত ঋতুতে সেগুলি ভেসে আসবে উষ্ণতর স্থানে। আজকের মত হাওয়া-বদলের প্রয়োজন হবে না তখন।

উপসংহারে ক্লার্ক বলেন, আমাদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে উল্টে দিতে হবে, মনকে নমনীয় করে তুলতে হবে। যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ মানুষের হাতে আসছে, তাকে কাজে লাগাবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমাদেরই।

5ই ফেব্রুয়ারী মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ক্লার্ক বিজ্ঞান-শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক সভায় 'মহাকাশের প্রতিশ্রুতি' সম্পর্কে আর একটি আলোচনা করেন। তাছাড়া কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞান প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।

লুনা-20 পৃথিবীতে ফিরে এসেছে

সোভিয়েট চান্দ্রযান লুনা-20 25শে ফেব্রুয়ারী নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁচেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নির্দিষ্ট স্থানেই চান্দ্রযানটি ভূমি স্পর্শ করে।

মনুষ্যবিহীন এই চান্দ্রযান এক দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থানকালে চাঁদ থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে। গত 14ই ফেব্রুয়ারী লুনা-20-কে উৎক্ষেপণ করা হয়।

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

গত 23শে জানুয়ারী থেকে 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে এক সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। এই প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শাখার ছাত্রদের সঙ্গে বিজ্ঞান শাখার ছাত্রেরা এক অভিনব বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত কয়েকটি মডেল বিদ্যালয়ের কিশোর বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসার এক চমৎকার নিদর্শন বহন করে। এদের মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং, হরমনোগ্রাফ, বিভিন্ন মাধ্যমে একই শক্তির পরিচালন প্রভৃতি কয়েকটি প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু ছিল ছাত্রদের তৈরি একটি তারকামণ্ডল বা প্ল্যানেটেরিয়াম (Planetarium)। ছোট ছোট ছাত্রেরা এখানে এত সুন্দরভাবে সত্যকারের প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

এই প্রদর্শনী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে দেখা গেল, বিদ্যালয়ে উৎসাহী ছাত্রদের জন্যে বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক-একটি হবি ক্লাব আছে। সারা বছর ধরে ছাত্রেরা এই হবি ক্লাবগুলিতে অবসর সময়ে কাজ করে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নতুন নতুন মডেল ও যন্ত্রপাতি তৈরি করে। সেগুলি বার্ষিকী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। আলোচ্য প্রদর্শনীটি তারই ফল।

শোক-সংবাদ

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রখ্যাত কৃষিবিশেষজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ মিত্র গত 14ই জানুয়ারী 1972 পরলোকগমন করিয়াছেন। 1889 সালের 29শে অক্টোবর হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামের বিখ্যাত মিত্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হিন্দু স্কুল এবং সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজে সাধারণ শিক্ষান্তে সাবোর কৃষি কলেজে ভর্তি হন। উক্ত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অবিভক্ত বাংলার কৃষি বিভাগে যোগদান করিয়া ত্রিশ বৎসর-ব্যাপী বহুবিধ দায়িত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করিয়া 1945 সালে সহকারী উন্নয়ন কমিশনাররূপে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কৃষির প্রসার ও উন্নতিই ছিল তাঁহার একান্ত লক্ষ্য। শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষির প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি বহু কার্যকর পরিকল্পনা রচনা করেন। গ্রামে কৃষি আন্দোলনকে পরিচিত করিবার জন্য কৃষিমেলা প্রদর্শনীর আয়োজনে তিনি সংগঠনের পরিচয় দিয়াছিলেন। সরকারী কর্মচারীরূপে ফরিদপুরে (বাংলা দেশ) তিনি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করিতেন, সেখানে মহাত্মা গান্ধী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি যোগদান করেন। পরবর্তীকালে স্বগ্রাম আঁটপুরে তিনি কৃষিমেলার প্রবর্তন করেন এবং রাজ্যপালসহ বিভিন্ন সময়ে বহু বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মিত্র কৃষিসম্বন্ধীয় পাক্ষিক পত্রিকা 'খাদ্য উৎপাদন'-এর সম্পাদক ছিলেন। ইহা ব্যতীত কৃষিবিষয়ক কয়েকখানি ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকের তিনি রচয়িতা। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় কৃষি ও তাহার সমস্যা লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'শিক্ষা' এবং অন্যান্য ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বহু কৃষি ও শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্যাকাল্টির এবং পুরাতন মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সদস্য ছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 8নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

1. যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়, তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

2. প্রকাশনের কাল—মাসিক

3. মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

4. প্রকাশকের নাম জাতি ও ঠিকানা—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীয়, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

5. সম্পাদকের নাম :— জাতি ও ঠিকানা :—

সম্পাদকের নাম	জাতি ও ঠিকানা
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক)	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত	ভারতীয় পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 6
শ্রীজয়ন্ত বসু	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতীয়, পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

6. স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান), পি-23, রাজারাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

আমি, শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য ঘোষণা করিতেছি, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'
মাসিক পত্রিকা

তারিখ—4.3. 2

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(বাঁ-দিক থেকে)—ডক্টর কুদরত-ই খুদা, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মূল সভাপতি—ডক্টর ডাব্লিউ ডি. ওয়েষ্ট. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস. উদ্বোধক—কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম। (এই বিষয়ে বিবরণ 240 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ　　এপ্রিল, 1972　　চতুর্থ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও সমাজ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থা ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যৌথ উদ্যোগে গত 23শে ফেব্রুয়ারী 'ভারতের আঞ্চলিক ভাষাগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান শিক্ষা' বিষয়ে যে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ করে ভারত ও বাংলাদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ব পর্যায়ে বিজ্ঞান-চর্চার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমতের মূল কারণ হলো—

(1) মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না এবং শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার ক্ষমতাও ব্যাহত হয়। (ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা।')

(2) মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিখতে হলে শিক্ষার্থীর সীমিত সময় ও শক্তির অনেকখানি অংশ ভাষার বেড়া-জাল অতিক্রম করতেই ব্যয়িত হয়ে যায়। (বাঙালী শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, 'পদার্থবিতার অবতারণার বিকট মূর্তি ছাত্রদিগের মনে কিরূপ আতঙ্ক সঞ্চার করে, তাহা ভুক্তভোগী

ছাত্রমাত্রেই অবগত আছেন। আমি কিন্তু দেখিয়াছি সহজ বাংলায় সেই আঁচড়গুলার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিলে ছাত্রদের হৃৎকম্প তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায় ; এমন কি তাহাদের মনের ভিতর যে একটা আনন্দের সঞ্চার হয় তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি।')

(3) সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন ও বিজ্ঞানমুখী করে গড়ে তোলা এবং এইভাবে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের উপযোগী একটি সর্বাঙ্গীণ পরিবেশ সৃষ্টি করবার একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অন্যান্য দেশের বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে পরিচিত থাকবার জন্যে আমাদের দেশে উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি, রুশ, জার্মান, ফরাসী বা অন্য বিদেশী ভাষা শিখবার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। কিন্তু সে জন্যে মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করবার প্রস্তাব একান্তই অযৌক্তিক, কারণ সেটা নিঃসন্দেহে হবে 'গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার' সামিল।

যা হোক, আমরা এখন উপরিউক্ত 3নং বিষয়টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানজাত কারিগরী বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি ও ব্যাপ্তি। এই উন্নতির প্রতীক হিসাবে মানুষের কল্পলোক চন্দ্রে মহাকাশচারীদের সশরীরে উপস্থিতির কথা বলা যেতে পারে। অন্যদিকে আগেকার যুগের মত বিজ্ঞান আর কয়েকজন মুষ্টিমেয় জ্ঞানী-গুণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—হাজার হাজার লোক এখন বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে, সমাজের চিন্তা-ভাবনা কতকাংশে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করছে। ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষের ফলে যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মূলে পর্যন্ত টান পড়ছে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞান যে হারে এগিয়ে চলেছে এবং সার্বিক কল্যাণ সাধনে এর যে সম্ভাবনা রয়েছে, আমাদের সমাজব্যবস্থা বা আমাদের চিন্তাধারা ও মানসিকতা কি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুতে পারছে? দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশ তো বটেই, অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই উত্তরটি এখনো নেতিবাচক। বিজ্ঞান ও আমাদের সমাজের মধ্যে এখনো যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে, তাকে অপসারিত করতে হলে সমাজের সর্বস্তরে বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন, প্রয়োজন সারা দেশ জুড়ে একটি বৈজ্ঞানিক পরিবেশ গড়ে তোলবার।

যে বিজ্ঞান চর্চাকে এককালে কয়েকজনের নেশা হিসাবে গণ্য করা যেত, এখন তা সমাজে একটি অন্যতম পেশারূপে চিহ্নিত। বিজ্ঞান-কর্মীর সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা বোঝা যায় এই তথ্য থেকে যে, পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত বিজ্ঞানী কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ বিজ্ঞানী বর্তমানে জীবিত রয়েছেন। বিজ্ঞান এখন এত ব্যাপক যে, আমাদের মত দরিদ্র দেশে—যেখানে মাথাপিছু দৈনিক আয় এক টাকারও কম, সেখানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ এক-শো থেকে দু-শো কোটি টাকা। এটা আশা করা নিশ্চয়ই সঙ্গত যে, এই অর্থের প্রতিদানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা বড় অংশ সরাসরি-ভাবে সমাজের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকবে। কিন্তু আমাদের দেশে ঐ গবেষণা এখনো অনেকটা ঘর সাজাবার কাগজের ফুলের মত—কেবলমাত্র শোভা বৃদ্ধি করাই যেন এর উদ্দেশ্য। এর মধ্যে সজীবতা আনতে হলে এবং দেশের সত্যকারের কল্যাণের কাজে একে নিয়োগ

করতে হলে সামগ্রিকভাবে আমাদের বিজ্ঞানকে সমাজ-সচেতন হতে হবে এবং আমাদের সমাজকে হতে হবে বিজ্ঞান-সচেতন।

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষি, শিল্প বা কারিগরী কাজে লিপ্ত আছেন। এঁদের পরিশ্রমকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে এঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। এঁদের অনেকের মধ্যে জিজ্ঞাসাও আজ প্রবল। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই এই জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করা সম্ভব। এজন্যে বহুকাল আগেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গলা ভাষায় আপন উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।' এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কোন সমাজের দ্রুত উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ঐ সমাজের সাধারণ মানুষের একটু ভাল রকম পরিচয় থাকা দরকার, যাতে কেবল বিজ্ঞানের মূলনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী বা যন্ত্রপাতি সম্পর্কেই নয়, বিজ্ঞানের সম্ভাব্য ব্যবহার ও ফলাফল সম্পর্কেও তাঁদের অন্ততঃ একটা মোটামুটি ধারণা থাকে। এই ধারণা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে উচ্চতম পর্যায় অবধি বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের আবশ্যকতা রয়েছে; কারণ তখনই কেবল বিজ্ঞানের নতুন নতুন ভাবধারাগুলি উচ্চতম পর্যায় থেকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সমাজের সর্বস্তরে অনুপ্রবেশ করতে পারবে এবং এইভাবে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে একটা একাত্মতা গড়ে উঠবে।

জয়ন্ত বসু

কালবৈশাখী

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়*

শীতকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরাণ ইত্যাদি অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেড়ে গিয়ে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তার কারণ, এই অংশে তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা। এই সময়ে যদি ভারতের দক্ষিণাংশ, সিংহল, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া এবং বিষুব রেখার নিকটবর্তী সমুদ্রের অঞ্চলগুলির বায়ুর চাপ নেওয়া হয় তবে দেখা যাবে, সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুর ধর্ম সব সময় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়া। তাই দাক্ষিণাত্যের উত্তরার্ধে এবং উত্তরের গাঙ্গেয় সমভূমিতে শীতকাল ধরে বাতাস বইতে থাকে। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর ঘোরবার জন্যেই এই বায়ুর গতি কিছুটা বেঁকে উত্তরের বদলে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে বইতে থাকে। এই বাতাস ঠাণ্ডা ও শুকনো। রাত্রিবেলায় সমুদ্রের দিক থেকে উপকূলের দিকে বয়ে যায় সমুদ্রের হাওয়া। উত্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া ও সমুদ্রের হাওয়ার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় কুয়াশার। কিন্তু কালবৈশাখীর জন্যে যতটা উত্তাপের প্রয়োজন, তা এই সমুদ্রের হাওয়ায় না থাকায় শীতকালে কালবৈশাখী দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যেও গরম ও ঠাণ্ডা হাওয়ার তাপমাত্রার তফাৎ কম থাকায় সেখানে বজ্রঝটিকার সংখ্যাও কম।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের মত বায়ুর চাপ বলয়গুলির স্থানের পরিবর্তন ঘটে।

* ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-19

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের উচ্চচাপ কেন্দ্র কিছুটা দক্ষিণে সরে যায়। দক্ষিণ অংশের নিম্নচাপ কেন্দ্র কিছুটা উত্তরে উঠে যায়। এই ওঠা-নামা চলে প্রায় ছয় মাস। শেষকালে উচ্চচাপ স্থায়ী হয় আরব সাগরে আর নিম্নচাপ স্থায়ী হয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে। ফলে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে উত্তরের স্থলভাগে বাতাস প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই দক্ষিণের হাওয়া কিছুটা বেঁকে দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু এবং গাঙ্গেয় সমভূমিতে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুরূপে প্রবাহিত হয়। এই পরিবর্তন আরম্ভ হয় ফাল্গুন মাসে, সমাপ্তি ঘটে বর্ষার আগমনে। বর্ষা ও শীতকালে বায়ুপ্রবাহের একটি নির্দিষ্ট গতি থাকে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুগুলি হলো বায়ুচাপ বলয়গুলির স্থান পরিবর্তনের যুগ। ফলে বায়ুর গতি এবং জলীয় বাষ্পের সরবরাহ অনির্দিষ্ট ও দেশের এক এক অংশে তা এক এক রকম।

ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বাগ্রে দক্ষিণের হাওয়া প্রবাহিত হয় এবং তা গরম ও শুক্‌নো বলে সমুদ্রের উপর দিয়ে আসবার সময় সঙ্গে করে আনে প্রচুর জলীয় বাষ্প। এই জলীয় বাষ্পই হচ্ছে কালবৈশাখী তৈরির দরকারী মালমশলা। এখন প্রশ্ন হতে পারে—কালবৈশাখী তাহলে রোজ কেন হয় না? কালবৈশাখী হলো এক ধরণের বজ্রঝটিকা। বজ্রঝটিকার উৎপত্তি হয় বৃহদাকার উল্লম্ব কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে। এই মেঘ অস্থির (Unstable) বায়ুতেই শুধু সৃষ্টি হয়। ল্যাপ্‌স্ রেট (Lapse rate) বা উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাসের হার প্রতি 280 মিটারে 15 বা 16° সে. বেশী হলে অস্থির বায়ুর সৃষ্টি হয়। এই উচ্চ ল্যাপ্‌স্ রেটযুক্ত বায়ু অন্য ঋতু তো বটেই, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসেও কম দেখা যায়। অথচ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, কলকাতার উপর ঐ পঞ্চাশের বেশী কালবৈশাখীর আগমন ঘটে। এই কারণে যে, বায়ুস্তরে ল্যাপ্‌স্ রেট কম থাকলেও বায়ুর ঊর্ধ্বস্তরে বেশ কিছুটা সুপ্ত অস্থিরতা থেকেই যায়। এটা আবার বায়ুর স্তরে জলীয় বাষ্পের বণ্টনের উপর নির্ভরশীল।

ভূমির উপর তাপমাত্রা 31° সে. এবং শিশিরাঙ্ক (Dew Point) 21° সে. হলে ভূমিসংলগ্ন বায়ুর পরম আর্দ্রতা প্রায় 52% হয়।

এখন বায়ুর মধ্যেকার যে কোন একটি ক্ষুদ্র অংশকে আলাদা করে পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে যে, বায়ুর ক্ষুদ্র অংশ উপরে ওঠবার সময় এর উপরের বায়ুমণ্ডলের চাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। ফলে এর আয়তন বাড়ে ও তাপমাত্রা কমে। এই ক্ষুদ্র বায়ুর অংশ অ্যাডিয়াবেটিক বা তাপাবরোধক নিয়ম অনুসরণ করে উপরে উঠবে। শিশিরাঙ্কের কাছাকাছি পৌঁছুবামাত্র এই বায়ুর অংশ সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তখন এটা ড্রাই অ্যাডিয়াবেটিকের পরিবর্তে ময়েস্ট অ্যাডিয়াবেটিক রেখা অনুসরণ করে বলে এর ঊর্ধ্বগতির যাত্রাপথের পরিবর্তন ঘটে। যতক্ষণ এর উত্তাপ পারিপার্শ্বিকের তুলনায় কম থাকে, ততক্ষণ তা ভারী থাকে ও উপরের দিকে ওঠে না। কিন্তু উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে থাকলেই বায়ুমণ্ডলের অবস্থা অস্থির হয়ে পড়ে। একে আবহবিজ্ঞানের ভাষায় বাতাসের সুপ্ত অস্থিরতা বা 'লেটেন্ট ইনষ্ট্যাবিলিটি অফ এয়ার' বলে।

ধনাত্মক এলাকা ঋণাত্মক এলাকার তুলনায় বেশী থাকে বলে এক্ষেত্রে ল্যাপ্‌স্ রেট 5·6-এর কম থাকলেও বজ্রঝটিকার সৃষ্টি হয়। কারণ কোনক্রমে উল্লম্ব মেঘ একবার ধনাত্মক এলাকায় পৌঁছুলে এর ঊর্ধ্বগতি অপ্রতিরোধ্য থাকে। যদি ধনাত্মক এলাকার পরিমাণ কমে যায়, তখন উল্লম্ব মেঘের ঊর্ধ্বগতি বন্ধ হয়ে যায়। আবার নীচেকার ঋণাত্মক এলাকার পরিমাণ বেশী হলে প্রাথমিক বাধার জন্যে মেঘ ধনাত্মক এলাকাতে যেতেই পারবে না। অতএব কালবৈশাখীর সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন সুবৃহৎ ধনাত্মক এলাকা এবং তার নিম্নে অতি

ক্ষুদ্র ঋণাত্মক এলাকা। এছাড়া কালবৈশাখী সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন, জলভরা মেঘকে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যে পর্বতের মত কোনও বাধার অবস্থান। কলকাতা ও আর নিকটবর্তী অংশে কোনও মাথা উঁচুকরা হিমালয় পাহাড় দাঁড়িয়ে নেই, তাই বৃষ্টির জন্যে দরকার শহরের উত্তরে 1524 মিটার উঁচু পাঁচিল। কথাটা অবাস্তব হলেও মিথ্যা নয়। পাঁচিল একটা আছে, যদিও তা অদৃশ্য। বিভিন্ন তাপমাত্রার দুই বিস্তৃত বায়ুস্তর এক জায়গায় মিলিত হলে তাদের পার্থক্য-পৃষ্ঠকে বলা হয় সম্মুখ পৃষ্ঠ বা ফ্রন্ট্যাল সারফেস। এই পার্থক্য-পৃষ্ঠ ও পৃথিবী-পৃষ্ঠের ছেদরেখাকে আবহ-বিজ্ঞানে ফ্রন্ট বলে এবং সেটাই অদৃশ্য পাঁচিলের কাজ করে দেয়। দুটি বিভিন্ন অঞ্চলের বাতাস পরস্পরের নিকটবর্তী হলেই সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়। ভিন্ন ধরণের বাতাসের কথা ভাবলেই সাধারণতঃ মনে পড়ে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে আসা দক্ষিণা বাতাস এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসা উত্তুরে হাওয়া।

পৃথিবীর ক্রমাগত ঘূর্ণনের ফলে ভিন্ন ঘনত্বের দুটি বিস্তৃত বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য-পৃষ্ঠ অনুভূমিক থেকে কিছুটা উপরের দিকে হেলে যায়। পার্থক্য-পৃষ্ঠের এই হেলানোটা শুধু পৃথিবীর আবর্তনের উপরই নির্ভর করে না, উপরে ও নীচে দুটি বায়ুপ্রবাহের মধ্যেকার আপেক্ষিক বেগের জন্যেও এই হেলানো অবস্থাটা ঘটে।

পার্থক্য-পৃষ্ঠ অথবা ফ্রন্টের উন্নতি কোণটি যৎসামান্য (সাধারণতঃ এর ট্যানজেন্ট বা স্পর্শক গড়ে $\frac{1}{100}$ ভাগ হয়ে থাকে)। এই পার্থক্য-পৃষ্ঠের গা বেয়েই আর্দ্র ও উষ্ণ সামুদ্রিক বায়ু ক্রমাগত উপরে উঠে গিয়ে কনডেনশেসন লেভেলে পৌঁছুলেই মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রঝটিকা, ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হয় বলেই পৃথিবীর আবহাওয়ার অস্তিত্ব রক্ষায় ফ্রন্টের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ফ্রন্ট সাধারণতঃ দুই রকম। ওয়ার্ম ফ্রন্ট এবং কোল্ড ফ্রন্ট। বর্ষাকালের একটানা বৃষ্টির জন্যে ওয়ার্ম ফ্রন্ট দায়ী, কিন্তু কোল্ড ফ্রন্ট থেকেই হয় পশলা বৃষ্টি ও বজ্রঝটিকা।

কোল্ড ফ্রন্টে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস নীচে ঢুকে পড়ে গরম বাতাসকে উপরের দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে। গরম বাতাস উপরে উঠে বৃহদাকার কিউমুলোনিম্বাস মেঘের উৎপত্তি ঘটায় এবং তার ফলে পশলা বৃষ্টি ও বজ্রঝটিকা দেখা দেয়। ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যেও মেঘের সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তাথেকে বৃষ্টি হয় না।

যে গরম বাতাস ফ্রন্টের গা বেয়ে ওঠে, সেটা যত বেশী অস্থির হবে, বজ্রঝটিকার শক্তি তত বেশী হবে। বজ্রঝটিকার মুখ্য শক্তি ফ্রন্টের মধ্যেই থাকে। ফ্রন্টের নীচের দিকে ভারী বাতাস ও উপরের হাল্কা বাতাস অর্থাৎ ঘনত্বের পার্থক্য দু-দিকেই থাকে। আর ফ্রন্ট সৃষ্টির পক্ষে কার্যকর দুটি বাতাসের তাপমাত্রার পার্থক্যের জন্যেই ধীরে ধীরে জমা হয় বিশাল একটা স্থৈতিক (Potential) তাপশক্তির ভাণ্ডার, যেটা শেষকালে গভীর শক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে বড় বড় বজ্রঝটিকার সৃষ্টি করে।

কোল্ড ফ্রন্ট এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। এর গতিবেগ ঘণ্টায় 48 থেকে 64 কিলোমিটার। ফ্রন্টের মধ্যেকার অস্থির বায়ু থেকে বজ্রঝটিকার সৃষ্টি হয়। এখন দেখা যাক, এই ধরণের কোল্ড ফ্রন্ট যখন আমাদের কলকাতার আকাশে এসে পড়ে, তখন কি কি ঘটে ?

ফ্রন্টের আবির্ভাবের কিছু আগেই বায়ুর চাপ কমে গিয়ে 1″ অথবা 43 মিলিবারে দাঁড়ায়। কিন্তু ফ্রন্ট এসে পড়া মাত্রই বায়ুর চাপ দ্রুত বাড়তে থাকে। সাধারণ ব্যারোমিটারে এটা বোঝা যায় না। এর জন্যে আবহাওয়া অফিসে স্বয়ংক্রিয় ব্যারোমিটার থাকে। আমরা অনেকেই বলে থাকি কালবৈশাখীর ঝড় হবার পর ঠাণ্ডা ভাবটা হয় কালবৈশাখীর বৃষ্টির জন্যে ; কিন্তু বৃষ্টি

যখন হয় না তখনও একটা ঠাণ্ডা ভাবের সৃষ্টি হয়। সকলেই তখন ধরে নেয় নিশ্চয় আশেপাশে বৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেটা ভুল ধারণা। বজ্রঝটিকা সুরু হবার পর কোল্ড ফ্রন্টের ভিতরের স্থৈতিক তাপশক্তির বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছুটা তাপশক্তি শেষ হয় এবং ঊর্ধ্বাকাশে কিউমুলোনিম্বাস মেঘের মধ্য থেকে অতি শীতল একটা বায়ুপ্রবাহ সজোরে নীচে নামে। তাই বৃষ্টি হোক বা না হোক, কালবৈশাখীর পর আমরা কিছুটা ঠাণ্ডা বোধ করি।

এবার বৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যাক। বজ্রঝটিকা যখন কলকাতার 4·8-6 কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে থাকে, তখন সামান্য বৃষ্টি হয়। তারপর একেবারে এসে গেলে প্রবল পশলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিও হয়। তারপর কলকাতা অতিক্রম করে বজ্রঝটিকা আরো দক্ষিণে চলে গেলে বৃষ্টির বেগও কমে আসে। তারপর আবার দু-এক পশলা বৃষ্টি কোন কোন দিন হয় আবার কখন কখন তাও হয় না। রাত্রি নয়টার পর বেশীর ভাগ দিনই আকাশ পরিষ্কার থাকে।

বজ্রঝটিকা দু-ধরণের। প্রথমটি কোল্ড ফ্রন্টের বজ্রঝটিকা এবং দ্বিতীয়টি স্থানীয় বজ্রঝটিকা। স্থানীয় বজ্রঝটিকা খুব একটা শক্তিশালী হয় না। গ্রীষ্মকালের দুপুরে ভূপৃষ্ঠ যখন গরম হয়ে ওঠে, তখন তার সংস্পর্শে এসে বাতাস গরম ও হাল্কা হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। আবহ-বিজ্ঞানে বায়ুর এই ধরণের উপরে ওঠাকে 'ট্রিগার অ্যাকশন' নামে অভিহিত করা হয়। তারপর এই গরম হাওয়া ঊর্ধ্বাকাশে ঠাণ্ডা ও বর্ধিত হয়ে কিউমুলোনিম্বাস মেঘ ও শেষে বজ্রঝটিকার সৃষ্টি করে। এভাবে তৈরি স্থানীয় বজ্রঝটিকা বেশীর ভাগ ...কটা অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে পরিসংখ্যা)। সমা... পকাশে ...ীর বেলায় যে স্থানীয় বজ্রঝটিকা প্রকৃতিতে এই কা... তা নগণ্য। কেন্দ্রিকতা

কালবৈশাখীর সময় উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত একটা প্রসারিত নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়। বঙ্গোপসাগর থেকে কোন্ দিকে এবং কি পরিমাণ জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হবে, সেটা নির্ভর করে এই প্রসারিত নিম্নচাপের অবস্থান, দিক পরিবর্তন এবং গভীরতার উপর। যে দিন এই নিম্নচাপ অঞ্চলটির অক্ষ এমনভাবে অবস্থিত থাকে যে, সমুদ্রের বাতাস পশ্চিম বঙ্গে এবং ছোটনাগপুরের দিকে বইতে থাকে, সে দিনটি কালবৈশাখীর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক। সকালের দিকে সাধারণতঃ আর্দ্র বাতাসের উচ্চতা 1050 মিটার এবং বিস্তার সুন্দরবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বেলা যেই বাড়তে থাকে, অমনি নিম্নচাপ অঞ্চলটি গভীরতর হয়। এর জন্যেই আর্দ্র বাতাসের উচ্চতা এবং বিস্তার দুই-ই বেড়ে যায় ও বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময় দেখা যায় যে, 1524-1804 মিটার উঁচু একটা সঙ্কীর্ণ বাতাসের স্তর সমুদ্রের উপকূল থেকে একেবারে ছোটনাগপুরে ঢুকে পড়েছে। এই বায়ুস্তরকে আবহ-বিজ্ঞানের ভাষায় বলে moist tongue। এই moist tongue-এর শেষ প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা ঠাণ্ডা বাতাস নীচের দিকে ঠেলে ঢুকে পড়ে কোল্ড ফ্রন্টের সৃষ্টি করে। তারপর এই কোল্ড ফ্রন্টের পিঠের উপর দিয়ে উষ্ণ এবং হাল্কা বাতাস কেবলই উপরে উঠতে থাকে; অর্থাৎ কোল্ড ফ্রন্টের পৃষ্ঠের হেলানো অবস্থাই ট্রিগার অ্যাকশন যোগায়। এছাড়া এই সময় ছোটনাগপুরের অতি উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ (110° ফা 40° সে) উপযুক্ত ট্রিগার অ্যাকশনের যোগানদার। এই দুই ভাবেই কিউমুলোনিম্বাস মেঘ উৎপন্ন হয়ে প্রথম কালবৈশাখীর আরম্ভ হয়। তারপর কোল্ড ফ্রন্ট যেমন পূর্বদিকে এগুতে থাকে, তখন একটির পর একটি কালবৈশাখীর সৃষ্টি হতে থাকে। এই ধরণের শ্রেণীবদ্ধ বজ্রঝটিকাকে আবহ-বিজ্ঞানে line squal বলে। বিমান চলাচলের

পক্ষে এই শ্রেণীবদ্ধ বজ্রঝটিকা সবচেয়ে বিপজ্জনক। তারপর শীতল ফ্রন্টের প্রভাবে যখন সম্মুখের উষ্ণ বায়ু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে যায় ও তার স্থান কোল্ড ফ্রন্ট দখল করে, তখন সেই ফ্রন্টকে occluded front বলে।

উত্তর-পশ্চিম থেকে কালবৈশাখীর আগমনের আগে বায়ুর গতি দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখে ময়েস্ট টাঙ বরাবর থাকে; অর্থাৎ কালবৈশাখীর বিপরীতে। প্রথমে বায়ুর গতিবেগ সামান্য বেড়ে গেলেও গতি মোটামুটি একই থাকে। তারপর এক সময় হঠাৎ এই দক্ষিণ-পূর্ব বাতাস নিশ্চল হয়ে যায়। এই সময়ে উত্তুরে বাতাস প্রবাহিত হয় না, একটা নিস্তব্ধভাব বিরাজ করতে থাকে। পরমুহূর্তে নেমে আসে কালবৈশাখীর ঝড়। এই ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায় তার পথ থেকে সব কিছু। এই ঝড়ের বেগ ঘন্টায় 96-120 কিলোমিটার। কিন্তু উর্ধ্বাকাশের সমস্ত অস্থিরতা এবং কোল্ড ফ্রন্টের যাবতীয় শক্তি যেদিন গতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, সেদিন ঝড়ের বেগ বেড়ে গিয়ে ঘন্টায় 160 কিলোমিটারের উপরে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যার কথা আলোচনা করা যায়। ঘূর্ণিবাত্যা ও বজ্রঝটিকার উৎপত্তির কারণ একই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে তফাৎ হলো, বজ্রঝটিকা স্থানীয়ভাবে ও অনেক কম এলাকায় সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিবাত্যা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এবং অনেক বেশী সময় ধরে হয় ও তার শক্তিও বজ্রঝটিকার চেয়ে অনেক বেশী। ঘূর্ণিবাত্যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গতিবেগের তারতম্যভেদে নানা নামে পরিচিত; যেমন—বঙ্গোপসাগরে সাইক্লোন, চীনসাগরে টাইফুন, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হারিকেন। এগুলির গতিবেগ ঘন্টায় 160-200 কিলোমিটার। যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর মোহানা দিয়ে প্রবাহিত টর্নেডোর গতিবেগ ঘন্টায় 320 কিলোমিটার। কখনও কখনও এই রকম ঘূর্ণিবাত্যা সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সমুদ্রের জলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে উঁচুতে তুলে জলস্তম্ভের সৃষ্টি করে। মরুভূমিতে ঐ একইভাবে বালুকা-স্তম্ভের সৃষ্টি হয়।

বজ্রঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার আয়তন ও গতির তারতম্য অনুসারে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপিত হয়। এই গতি ঘন্টায় 25 কিলোমিটার থেকে 320 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। সাধারণতঃ অল্প জায়গার উপর দিয়ে প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হলে ধ্বংসের মাত্রা বাড়ে। আর বেশী জায়গার উপর দিয়ে গেলে বেগ কমে গিয়ে ধ্বংসের পরিমাণ কমে। ঘূর্ণিবাত্যার কেন্দ্রে বাইরে থেকে বাতাস ঢোকবার সময় উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উল্টা দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার ব্যাস কখনও কখনও 9 কিলোমিটার থেকে 160 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। 1965 সালের বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 170 কিলোমিটার। সমুদ্রোপকূলে প্রায় লক্ষাধিক লোকের জীবনহানি ঘটে ও বহু লোক গৃহহীন হয়।

বজ্রঝটিকার বজ্র তৈরি হয় মেঘের মধ্যেকার বৃষ্টিবিন্দুর উপর। বৃষ্টিবিন্দুর ব্যাস 4 মিলিমিটারের বেশী এবং সেকেণ্ডে 8 মিটারের বেশী গতিবেগে পৃথিবীতে নেমে আসবার সময় যদি কিউমুলোনিম্বাস মেঘ সৃষ্টিকারী উর্ধ্বমুখী বায়ুর (গতিবেগ সেকেণ্ডে 8 মিটারের বেশী) সঙ্গে ধাক্কা খায়, তবে তারা চূর্ণ হয়ে আরো ছোট ছোট বিন্দুতে পরিণত হয়। এভাবে ক্রমাগত চূর্ণ হতে হতে কিউমুলোনিম্বাস মেঘের বৃষ্টিবিন্দুগুলির বৈদ্যুতিক আধানও বিভক্ত হয়ে যায়। ধনাত্মক আধান বৃষ্টিবিন্দুগুলির ভিতরে সঞ্চিত হতে থাকে এবং বায়ুর মধ্যে চলে যায় ঋণাত্মক আধান। এই প্রক্রিয়া বার বার চলায় মেঘের মধ্যেকার বৈদ্যুতিক আধানের পার্থক্য বাড়ে ও অতি বিশাল একটা বিদ্যুৎ-বিভবের ভাণ্ডার তৈরি হয়। মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী বায়ুস্তরের

আস্তরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকে বিদ্যুৎ নেমে আসতে হলে বৈদ্যুতিক বিভব 10 লক্ষ ভোল্ট হওয়া চাই।

কালবৈশাখীর সবটাই মানুষের কাছে ক্ষতিকারক নয়, তার একটা ভাল দিকও আছে। সারা বসন্ত ও গ্রীষ্ম ধরে সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প জমা হতে থাকে বাংলার আকাশে। এই জলীয় বাষ্প কালবৈশাখী সৃষ্টি করে লোকের প্রতি বছরই অসুবিধা করে ঠিকই, কিন্তু এই কালবৈশাখী এবং বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে প্রাক্-মৌসুমী নিম্নচাপগুলি যদি সময়মত ও যথেষ্ট সংখ্যক উৎপন্ন না হয়, তবে পরের বছরের বর্ষাকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যায় এবং তার ফলে বাংলার চাষী খরার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সমুদ্রের জলীয় বাষ্পের সাহায্যে কালবৈশাখীরও প্রয়োজন আছে।

বাংলাদেশের মৎস্য-সম্পদ

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ*

মৎস্য-সম্পদে বাংলাদেশ ভারত উপমহাদেশে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। নদীবহুল এই দেশটি জলজ সম্পদের জন্য বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আয়তনের তুলনায় আমাদের দেশে লোকসংখ্যা অনেক বেশী—প্রতি বর্গমাইলে প্রায় এক হাজার লোকের বাস। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মধ্যে আমাদের দেশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভূমির স্বল্পতা আমাদের যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, জলের আধিক্য তাহা সমাধানের উপায় করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, পদ্মা, কর্ণফুলী প্রভৃতি বড় বড় নদ-নদী ছাড়াও এই দেশে অসংখ্য ছোট ছোট নদী, খাল, বিল, হাওর ও বড় বড় পুকুর আছে। এইগুলিতে সারা বৎসরই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই দেশের ধানক্ষেতগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকায় তাহাতে প্রচুর পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হয়। এই দেশের খাড়ি অঞ্চলগুলি মৎস্যসম্পদের জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল জেলায় বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চল আছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগকে সামুদ্রিক প্রাণী ও মৎস্যের ভাণ্ডার বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত মৎস্য-ক্ষেত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(1) দীঘি ও পুকুর ইত্যাদির সংখ্যা 230135 এবং ইহাদের পরিমাপ 18,9000 একর।

(2) বিল—72,4000 একর।

(3) নদী ও খাল—3520 মাইল দীর্ঘ অথবা 20,51200 একর।

(4) নদীর মোহানা ও খাড়ি অঞ্চল—683 বর্গমাইল।

(5) সামুদ্রিক উপকূলভাগ—340 বর্গমাইল। (কক্সবাজারের টেক্‌নাফ হইতে খুলনার সুন্দরবন পর্যন্ত প্রসারিত)।

(6) ধানক্ষেত—বাংলাদেশে প্রায় 20195000 একর ধানক্ষেত আছে। এগুলির মধ্যে যেখানে প্রচুর জল থাকে, সেখানে যথেষ্ট মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী জন্মায়। জলজ প্রাণীর মধ্যে চিংড়ি, কাঁকড়া ও কচ্ছপ প্রধান।

*প্রাণিবিদ্যা বিভাগ—জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা; বাংলাদেশ

মৎস্যের প্রয়োজনীয়তা এবং মৎস্য ও মাংসের উপকারিতার পার্থক্য

মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য এবং দৈনন্দিন আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। মানবদেহে প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্য মাছ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মাছ এবং মাংস মানবদেহের পুষ্টিসাধনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাংস সহজপাচ্য নয়, কারণ উহার চর্বিজাতীয় উপাদানসমূহ সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে। অধিক পরিমাণ মাংস ভক্ষণ করিলে এই চর্বিজাতীয় উপাদান হইতে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহাকে কোলেষ্টেরল বলে। ইহা আস্তে আস্তে রক্তের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং এই কোলেষ্টরেলের বৃদ্ধিতে হঠাৎ মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। অপর পক্ষে, মাছের মধ্যে যে চর্বিজাতীয় উপাদান থাকে, তাহা অসম্পৃক্ত; কাজেই অতি সহজে হজম হইতে পারে। কারণ ইহাতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। সুতরাং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর নহে।

মিঠা ও নোনা জলের মাছ

বাংলা দেশের মৎস্য-সম্পদকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(1) মিঠা জলের মাছ—যে সমস্ত মাছ মিঠা জলে অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে মিঠা জলের মাছ বলে; যেমন—রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস, চেতল, কই, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি।

(2) সামুদ্রিক বা নোনা জলের মাছ—সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বহুবিধ মাছ পাওয়া যায়; যেমন—রূপচাঁদা, পায়রাচাঁদা, রূপাপাটিয়া, সামুদ্রিক কই, ট্যাংরা, সুবর্ণখরিকা, সুরমা, টৈকচাঁদা, নারকলি, কুকুরজিভ ইত্যাদি।

মৎস্য-বিশেষজ্ঞেরা এই পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় 5,800 শ্রেণীর মাছ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে মিঠা জলের প্রায় 2300 শ্রেণীর মাছ এবং প্রায় 3500 শ্রেণীর সামুদ্রিক মাছ আছে।

সামুদ্রিক মাছ সাধারণতঃ 300 ফ্যাদম বা 1200 হাতের বেশী জলের নীচে চলাফেরা করে না। খুব গভীর সমুদ্রেও প্রায় 100 প্রকার মাছ বাস করে। কিছু কিছু সামুদ্রিক মাছ গভীর অন্ধকারে নিজেদের শরীর হইতে উৎপাদিত আলোকরশ্মির সাহায্যে চলাফেরা করে।

মাছে বিভিন্ন প্রকারের উপাদান

আমিষজাতীয় খাদ্য আমাদের নিত্য অপরিহার্য। কয়েক জাতীয় মাছে কি কি উপাদান পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল :—

	গ্র্যাম হিসাবে				মিলিগ্র্যাম হিসাবে		
মাছের নাম	জল	প্রোটিন	চর্বি	মোট আয়রন	শরীরের উপযোগী আয়রন	ক্যালসিয়াম	ফস্‌ফরাস
কালবোস	81·0	14·7	1·0	0·33	0·26	320·0	380·0
মৃগেল	75·0	19·5	0·8	1·09	0·41	350·0	280·0
কাৎলা	73·7	19·5	2·4	0·76	0·55	510·0	210·0
রুই	76·7	16·6	1·4	0·85	0·50	680·0	150·0

মাছের স্বভাব

অধিকাংশ মাছ খুব দ্রুত চলাফেরা করে। একটি স্যামন মাছ ঘণ্টায় 16 মাইলেরও বেশী অতিক্রম করে। বোনেট মাছ জাহাজের সহিত পাল্লা দিবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঘণ্টায় 16 হইতে 20 মাইল অতিক্রম করিতে পারে। বড়কুড়া

ঘণ্টায় 27 মাইল, উড়ুক্‌ মাছ ঘণ্টায় 35 মাইল, টুনা ও এলবাকর ঘণ্টায় 40 হইতে 50 মাইল পর্যন্ত চলিতে পারে। সীল ও তরবারী মাছ ঘণ্টায় 60 মাইলেরও বেশী গতিতে চলিতে পারে। মাছের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহাদের কিছুটা স্মরণশক্তি আছে এবং শ্রবণশক্তিও প্রখর। ক্ষুধা পাইলে মাছ অস্থির হইয়া পড়ে এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অনেক সময় বৃহত্তর মাছ গিলিয়া বসে। জলের মাধ্যমেই মাছের ডিম নিষিক্ত হয়। মাদী মাছ নর মাছের নিকটবর্তী হইয়া ডিম ছাড়ে এবং তৎক্ষণাৎ নর মাছ উহার উপর বীর্য নিঃসৃত করে। এইভাবে নিষিক্ত হইবার পর যথাসময়ে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাচ্চা রক্ষার জন্য নর মাছেরই অধিক তৎপরতা দেখা যায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত কয়েক জাতীয় মাছ বাচ্চা অথবা ডিমের বিশেষ যত্ন নেয়। ডিম অথবা বাচ্চা রক্ষার জন্য উহারা শত্রুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করে। সি-হর্স ও পাইপ ফিসের ডিমগুলি পুরুষ সি-হর্স ও পাইপ ফিস তাহাদের দেহস্থ থলিতে জমা রাখে এবং উপযুক্ত সময়ে সেখান হইতেই বাচ্চা বাহির হয়।

মৎস্য-চাষ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে মৎস্য উৎপাদন করাই মৎস্য-চাষের প্রধান উদ্দেশ্য। মৎস্য-চাষের জন্য আমাদের দেশে প্রচুর জলাশয় আছে, কিন্তু ইহাদের উপযুক্ত ব্যবহারের পদ্ধতি না জানায় আমাদের আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। এখানে শুধু মাছ ধরা হয় অথচ উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নাই। পাঁচ বৎসর পূর্বেও বাজারে যে মাছ দেখা যাইত, বর্তমানে তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছিয়াছে।

রুই-কাৎলার চাষ—আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য-চাষের নিয়ম-কানুন জানা না থাকায় অনেকের পক্ষেই আশানুরূপ ফললাভ সম্ভব হয় না। অনাবাদী পুকুরগুলি মশার আবাসস্থলে পরিণত হইয়া থাকে। এই পুকুরগুলি পরিষ্কার করিয়া মাছের চাষ করিলে প্রতি পুকুরে যদি গড়ে 10 মণ মাছও উৎপাদিত হয়, তবে বৎসরে প্রায় 10 লক্ষ মণ মাছ শুধুমাত্র এই সমস্ত পুকুর হইতেই উৎপাদিত হইবে। মৎস্য-চাষে সুফল লাভ করিতে হইলে প্রয়োজন উপযুক্ত পুকুর, উন্নত ধরণের মাছ ও ব্যবহারিক জিনিষপত্রের। রুই, কাৎলা, মৃগেল, কালবোস ইত্যাদি মাছ জলজ উদ্ভিদ-ভোজী, ইহারা একে অন্যকে খায় না। সেই জন্য পুকুরে ইহাদের চাষ ভাল হয়। এই সমস্ত মাছ স্তরভেদে পুকুরে বাস করে। কাৎলা মাছ উপরের স্তরে, রুই মাছ মধ্যস্তরে, মৃগেল ও কালবোস নীচের স্তরে থাকে। আবার জলের বিভিন্ন স্তরে মাছের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য আছে; যেমন—প্ল্যাঙ্কটন, বেন্থস, বেনতন ইত্যাদি। সকল রকমের মাছ এক ধরণের খাদ্যে অভ্যস্ত নয়। কাজেই চার জাতের মাছ একসঙ্গে চাষ করিলে পুকুরের সকল স্তরের খাবার সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়। মাছের চাষ করিতে হইলে এই সম্পর্কে নিয়ম-কানুন ভালরূপে অবহিত হইতে হইবে। পোনামাছ পুকুরে ছাড়িবার পূর্বে জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। পুকুরের পাড় বাঁধানো আছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মৎস্যভুক্‌ মাছ এবং অন্যান্য প্রাণীদের দূর করিতে হইবে। শোল, শাল, শিঙি, মাগুর, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মাছ অন্যান্য মাছ খাইয়া ফেলে। প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে পুকুরে সার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বালুকাময় তলদেশসম্পন্ন গভীর পুকুরে কিভাবে মাছের চাষ করিতে হয়, সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকিলে মৎস্য-চাষে সুফল লাভ করা যায় না। পোনা সংগ্রহ করিবার সময়ও বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। মৎস্য ছাড়িবার পর পুকুরের মধ্যে কয়েকটি আধফালি বাঁশ পুতিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে কোন মাছ কোন প্রকার

জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে বাঁশের গায়ে ঘষিয়া তাহা ছাড়াইয়া নিতে পারে। তাছাড়া বাঁশের গায়ে যে শ্যাওলা জন্মায়, তাহা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পুকুরের পাড়ে ঝোপ-জঙ্গল বেশী থাকিলে তাহা মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা উচিত। আম, জাম, দেবদারু, পেয়ারা ইত্যাদি বড় বড় গাছ থাকিলে উহাদের ছায়ায় মাছের জীবনধারণে বিশেষ উপকার হয়। রাক্ষুসে মাছ ছাড়াও কচ্ছপ, মাছরাঙ্গা, উদ, সাপ, ব্যাং ইত্যাদি রুইজাতীয় মাছের বিশেষ ক্ষতিসাধন করে। কাজেই ইহাদের আক্রমণ হইতে মাছ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

পৃথিবীতে অস্থিময় মাছের সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে কাৎলাজাতীয় মাছই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার কারণ, ইহাদের প্রজননশক্তি অত্যন্ত বেশী। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, 410 তোলা ওজনের একটি রুই মাছ এক মরসুমে 19 লক্ষ 5 হাজার ডিম ছাড়ে।

তেলাপিয়ার চাষ—রুই, কাৎলা ইত্যাদি মাছের সঙ্গে তেলাপিয়ার চাষ করা যাইতে পারে। কিন্তু তেলাপিয়ার সংখ্যা যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলে ঐ সকল মাছের পোনা সময়মত বাড়িতে পারে না। কাজেই একই পুকুরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে তেলাপিয়ার চাষ না করাই উচিত। তেলাপিয়া বিদেশী মাছ। ইহার আদি বাসস্থান পূর্ব আফ্রিকা। 1939 সালে পূর্ব জাভার কোন একটি উপত্যকা হইতে এই মাছ পাওয়া যায়। 1954 সালে ইন্দোনেশিয়া হইতে এই মাছ বাংলাদেশে আমদানী করা হয়। তেলাপিয়া মাছ বিশেষ অর্থকরী সম্পদ। এই মাছের প্রজনন ক্ষমতা খুব বেশী। স্ত্রী-মাছ বৎসরে 3/4 বার ডিম ছাড়ে। চার মাসের মাছ প্রায় 6 ছটাক ওজনের হইয়া থাকে এবং তখনই খাইবার উপযোগী হয়। পুকুরে এই মাছের চাষ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তেলাপিয়া মাছের কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। তেলাপিয়া প্রোটিনসমৃদ্ধ ও সহজপাচ্য মাছ। ইহার চাষ অত্যন্ত লাভজনক। তেলাপিয়া বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে। কাজেই হাজা বা মজা পুকুর, ডোবা পরিষ্কার করিয়া তেলাপিয়ার চাষ করা যায়। পুকুর ছাড়া ধানক্ষেতেও তেলাপিয়ার চাষ করা চলে। জাপান, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও অন্য কয়েকটি দেশে ধানক্ষেতে তেলাপিয়ার চাষ হইয়া থাকে। জাভায় এইভাবে বৎসরে 6,000 টন মাছ উৎপাদিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে খুলনা ও সুন্দরবন ছাড়া আর কোথাও ইহার চাষের ব্যবস্থা নাই। তাহার প্রধান কারণ—আমাদের ধানক্ষেতের আল এত নীচু যে, ইহার মধ্যে মাছ আটকাইয়া রাখা সম্ভব নয়। তেলাপিয়া প্রায় 600 প্রকারের আছে। বাংলাদেশে যে কয়েক প্রকার তেলাপিয়া প্রবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের সবগুলিই ধানক্ষেতে চাষ করিবার উপযোগী।

মৎস্য-উৎপাদনে কতিপয় ক্ষতিকারক উদ্ভিদ :—নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত জলজ উদ্ভিদের দরুণ আমাদের দেশের প্রায় শতকরা 80 ভাগ পুকুরই অনাবাদী থাকে। একদিকে যেমন পুকুরে মাছ উৎপাদন করিতে না পারায় দেশের যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, অন্যদিকে তেমনি দূষিত জলে মশা জন্মিয়া জাতীয় স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে। আমাদের দেশে পুকুরে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কচুরী-পানা, ছোটপানা, গুঁড়িপানা ইত্যাদি ভাসমান অবস্থায় থাকে। চাঁদমালা, ত্রিমস্তক, সিঙ্গারা (পানিফল), পদ্ম, শালুক ইত্যাদি নির্গমমুখ পানা। কেশরা, কলমি, হেলেঞ্চা ইত্যাদি ছড়ানো জলজ শাক। এই সমস্ত উদ্ভিদ পুকুরে অল্প পরিমাণ থাকিলে সাধারণতঃ মাছের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু

পাটাশ্যাওলা, ঝরণঝাঁঝি, পাতাঝাঁঝি ইত্যাদি নিমজ্জমান উদ্ভিদ মৎস্য-চাষে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিসাধন করিয়া থাকে। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই সমস্ত উদ্ভিদ দূর করা কঠিন। কারণ, প্রথমতঃ ইহা খুব দামী; দ্বিতীয়তঃ এই রাসায়নিক দ্রব্য সঠিক-ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে অনেক সময় পুকুরের জল আরও বেশী দূষিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। 2, 4, D অথবা ডাইক্লোরোফিন-অক্সিঅ্যাসিটিক অ্যাসিড সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে পরিচিত। ইহা ব্যবহার করিলে মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত প্ল্যাঙ্কটনেরও কোন ক্ষতি হয় না। কাজেই মাঝে মাঝে পুকুরে এই রাসায়নিক দ্রব্যটি ব্যবহার করিয়া অবাঞ্ছিত উদ্ভিদগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজন।

পুকুরে সার প্রয়োগ—পুকুরে সার দেওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে বলা কঠিন। প্রত্যেকটি পুকুরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। গোবর, অ্যামোনিয়াম সালফেট, আবর্জনা, খৈল, হাড়ের গুঁড়া ও মাছের শুট্‌কী আমাদের দেশে পুকুরে সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। লাইম ষ্টোন, ফস্‌ফেট, পটাস, নাইট্রোজেন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সবুজ সার এবং আরও নানাপ্রকার জৈব সার পুকুরে ব্যবহার করা যায়।

এই সমস্ত সার অল্প পরিমাণ দিবার পর যদি পুকুরের জল অপেক্ষাকৃত ঘন ও সবুজ বর্ণ ধারণ করে, তবে বুঝিতে হইবে, উহাতে আর সারের প্রয়োজন নাই। সার দিবার ফলে মাছের খাদ্য শ্যাওলা প্রভৃতি উদ্ভিদ ভাল বাড়ে। এইগুলিই মাছের প্রকৃত খাদ্য। সার দিবার পূর্বে পুকুরে মাছের খাবার আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া সার দিতে হইবে। একটি বাহু জলে ডুবাইবার পর যদি কনুইর নীচের অংশ দেখা না যায়, তবে বুঝিতে হইবে জলে যথেষ্ট সার আছে। একটি সাদা কাঠির সাহায্যেও ইহা প্রমাণ করা যায়। কাঠিটা প্রায় 10 ফুট জলের মধ্যে ডুবাইতে হইবে। যদি ইহা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে বুঝিতে হইবে—পুকুরে আরও সারের দরকার। চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি, ভাত সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অধিক সারে যেন জল খারাপ না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। জল দূষিত হইলে মাছ মরিবার সম্ভাবনা থাকে।

ম্যালেরিয়া নিবারণে মাছের ভূমিকা—স্বল্পস্থায়ী জলাশয়ে শুককীটভোজী মৎস্য-চাষ সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। মেজর জেনারেল ক্যাণ্ডলের মতে, ম্যালেরিয়া নিরোধকল্পে যে সমস্ত মাছ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাদের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা দরকার।

(1) মাছ খুব ছোট আকৃতির হইতে হইবে, যেন আগাছার মধ্যেও অল্প জলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

(2) মাছগুলি যথেষ্ট জীবনীশক্তিসম্পন্ন এবং কষ্টসহিষ্ণু হইতে হইবে। ডাঃ নাজির আহম্মদ প্রায় 22 বৎসর পূর্বে এই সম্পর্কে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আমাদের দেশে খলিসা ও চাঁদা মাছ অপরিষ্কার ও অল্প জলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং প্রতিদিন গড়ে একটি খলিসা 150টি শুককীট ও মূককীট এবং চাঁদা 120টি মশার বাচ্চা খাইয়া থাকে। মশা বিনষ্টকারী জীব হিসাবে এই মাছগুলি বিশেষ পরিচিত। কাজেই এগুলি যেন বিনষ্ট না হয়, সেদিকে প্রত্যেকেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই মাছগুলি আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। কাজেই ইহারা যেন আমাদের উপকার করিবার পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য জন-সাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া দরকার।

মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ও চাহিদা— বাংলাদেশে ছোট-বড় বহু রকমের মাছ আছে। এখানকার মিঠা ও নোনা জলে প্রায় 120 প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীর মাছ পাওয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় 36024000 মণ মাছ উৎপাদিত হয়। ইহার অধিকাংশই মিঠা জল হইতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত কোটি। আমিষজাতীয় খাদ্যের জন্য এই দেশের লোক মাছ ও মাংসের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। দেশের শতকরা 90 জন লোকই মাছ বিশেষ পছন্দ করে। মাছ আমাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনের সীমাবদ্ধতায় দেশবাসীর পক্ষে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না। মেট্রিক টন হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৎসরে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাইবে; যেমন—জাপানে 47, যুক্তরাষ্ট্র 29, সোভিয়েট রাশিয়া 26, চীন 25, নরওয়ে 2·1, ক্যানাডা 1·07, যুক্তরাজ্য 1·05.; আর ভারতে উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র 1·10।

আমাদের দেশের প্রতিটি লোকের মাথাপিছু মাছের পরিমাণ প্রতি বৎসরে 4-5 কিলোগ্রাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। মৎস্য-সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক।

শতকরা 60 ভাগ মাছ স্বাদু বা মিঠা জল হইতে এবং শতকরা 40 ভাগ নোনা জল হইতে ধরা হয়। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূল এবং নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে মাছের কিছু প্রাচুর্য দেখা যায়, কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা ও সংরক্ষণের অসুবিধার জন্য দেশের অভ্যন্তর ভাগের অঞ্চলসমূহে টাট্‌কা মাছের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

মৎস্যদেহের প্রয়োজনীয় অংশসমূহ ও তদ্দ্বারা তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য—

1. মৎস্য-সার—মাছের আঁশ, পাখনা, নাড়ী-ভুঁড়ি ও চিংড়ির খোলস শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া মৎস্য-সার পাওয়া যায়। ইহাতে নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি থাকে। এই মৎস্যচূর্ণ হাঁস-মুরগীর খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

2. মৎস্যজাত আঠা—পরিত্যক্ত আঁশ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আঠা তৈয়ারী হয়।

3. হাঙ্গরের যকৃতের তৈল—হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ ও সি আছে।

অনেক মাছ হইতে তেল পাওয়া যায়। মৎস্যজীবীরা ইহা আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

4. ভাল ভাল মাছ শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ফিস ফ্লাওয়ার তৈয়ারী করা হয়। ইহা উত্তম শ্রেণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

5. মাছ হইতে উৎকৃষ্ট ধরণের কাপড় কাচিবার সাবান ও ছাপিবার কালি তৈয়ার হয়।

শুট্‌কী মাছ উৎপাদন—আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় 20 লক্ষ মণ শুট্‌কী মাছ উৎপাদিত হয়। সাধারণতঃ কক্সবাজার হইতে 6 মাইল দূরবর্তী সুনাদিয়া দ্বীপে, খুলনার সুন্দরবন ও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়, শুট্‌কী মাছ উৎপাদিত হয়। রৌদ্রে শুকাইয়া বা ধূম প্রয়োগ করিয়া এই শুট্‌কী মাছ প্রস্তুত করা হয়। লবণ মাখাইয়া নোনা শুট্‌কীও কিছু কিছু তৈয়ারী করা হয়। কিন্তু এই শুট্‌কী মাছ অনেক সময়েই ভালভাবে শুকানো হয় না বলিয়া অতি অল্প সময়ে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে 20 ভাগেরও অধিক পরিমাণ জল এবং সতর্কতার অভাবে প্রচুর পরিমাণ বালি ও ময়লা থাকে। কাজেই ইহা খাইবার অনুপযোগী হইয়া

পড়ে। শুটকী মাছ এই দেশের অনেকেরই উপাদেয় খাদ্য এবং অন্যান্য দেশেও রপ্তানী হয়। কাজেই শুটকী মাছের উৎপাদন ও রক্ষার ব্যাপারে উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন।

মৎস্যজীবীদের বর্তমান অবস্থা ও উন্নতির উপায়

মাছ ধরা ও মাছ বিক্রয় করা জেলেদের প্রধান ব্যবসায় ও উপজীবিকা। বংশানুক্রমিকভাবে জেলেরা মৎস্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ। বাংলাদেশে 6 লক্ষেরও অধিক জেলে বাস করে। ইহারা নিরীহ, গরীব, নিরক্ষর, দুর্বল ও অবহেলিত। তাহাদের অধিকাংশই দিন আনে, দিন খায়। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে মাছ ধরে, তাহাতে তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সংস্থান হয় না। জাতীয় সম্পদের উন্নতিবিধানে এই স্বাধীন দেশকে মৎস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য দেশবাসী সকলের জেলেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা যাহাতে এই ব্যবসায় ছাড়িয়া জীবিকা অর্জনের প্রয়াসে অন্য পথে না যায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বর্তমানে আধুনিক নৌকা, জাল ও মাছ ধরিবার সরঞ্জামে জাপান, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রেট বৃটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া অনেক অগ্রগামী। কিন্তু আমাদের দেশ মাছ ধরিবার সরঞ্জাম ও কৌশলে এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। মাছ ধরিবার আধুনিক কলা-কৌশল সম্পর্কে জেলেদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াসে অধিক সংখ্যক শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাহারা যেন সমাজের দুর্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও ইজারা ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইবে। তাহারা যেন সর্বপ্রকার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ ও ক্ষমতা অধিকারে স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। দেশের উন্নতিকল্পে এক বিরাট দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত। কাজেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ জীবনধারণের মধ্য দিয়া তাহারা যেন একাগ্রচিত্তে ও সততার সঙ্গে দেশের সম্পদের বৃদ্ধিসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারে, ইহাতে সকলেরই আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। স্বাধীন বাংলাদেশ গড়িবার কাজে জেলেদের অবদান হইবে উল্লেখযোগ্য।

মাছের খাদ্
এইগুলিই মাছে
পূর্বে পুকুরে মাছে
পরীক্ষা করিয়া :

জীবনীতি-বিজ্ঞান

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসাক ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে বিচিত্র চমক লাগিয়ে। তার গতির কোন বিরাম নেই। অনেক অজানা রহস্যের সন্ধান সে দিয়েছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে বাইরের জগৎ মানুষের কাছে অনেকখানি সোজা হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে মানুষের সামনে নতুন জ্ঞানের পথ খুলে দিয়েছে জীব-বিজ্ঞান। স্পষ্ট ভাষায় জীব-বিজ্ঞান জানান দিয়ে দিয়েছে—বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন, আসলে মানুষের সত্ত্বার মূলে রয়েছে জড় পদার্থের ক্রিয়া, যার প্রকাশেই প্রাণের প্রকাশ—তথা জীবসত্ত্বার অস্তিত্ব। ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় নেমে এসেছে ভগবানের উত্তরাধিকারীর আসন থেকে, স্বীকার করেছে সব মানুষই—সে মহত্তম দার্শনিক সক্রেটিস বা নিষ্ঠুরতম তৈমুর, যাই হোক না কেন—বিবর্তনের ফসলমাত্র। আজ তাই আমরা বিশ্বাস করি মানুষের এমন কিছু থাকতে পারে না, যা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এসেছে নতুন পরিবর্তন, আর তার অভিঘাতে সমাজদেহও পরিবর্তিত হয়েছে।

জীব-জগৎ প্রকৃতি এবং আধিব্যাধি উভয়েরই দাস। একদিকে যেমন পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের আবর্তন মানুষের শরীর—তথা মনকে দোলা দেয়, অপরদিকে জরা, মৃত্যু প্রায়শঃই তাকে নিজের অসহায় অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই অন্ধকারে একমাত্র বিজ্ঞানই তাকে খানিকটা আলোর সন্ধান দিতে পেরেছে। জীব-বিজ্ঞান তাকে আশা দিয়েছে, অচিরেই হয়তো জরা, মৃত্যু ইত্যাদিকে ভয় না করলেও চলবে আর তাই মানুষও সোৎসাহে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। জীব-বিজ্ঞান যে মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে কিছুটা সার্থক ভূমিকা নিয়েছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতার ফলে জীব-বিজ্ঞানের ব্যবহার জীবনের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে। যে সব কীটঘ্ন পদার্থকে (Pesticide) এক সময়ে বেশী ফসল উৎপাদনের জন্যে অপরিহার্য বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি শস্যের মধ্যে জমে থেকে পরে প্রাণীদের যে ক্ষতি করে, তা জানবার পর অনেকেই সেগুলিকে ব্যবহার করবার বিপক্ষে রায় দিয়েছেন; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে ফসল কল্যাণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা নিশ্চয়ই মানুষের অজ্ঞতার ফল। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের ইচ্ছাকৃত অপব্যবহারও ইতিমধ্যে কম হয় নি। নিষ্পত্রকারী পদার্থ (Defoliant) বা স্নায়ুঅসাড়ক গ্যাস (Nerve gas) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ তাই কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে সুন্দর সমাজ তৈরির কথা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজকে সুস্থভাবে বাঁচতে হলে আজ প্রয়োজন নতুন এক বিজ্ঞানের, যার মূলনীতি হবে জীব-বিজ্ঞানের মূল তথ্য আর তার মধ্যে থাকবে যান্ত্রিক বিজ্ঞানের বাইরের একটা সামাজিক মূল্য-বোধ, তথা দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি। এই ধরণের বিজ্ঞানই হলো জীবনীতি-বিজ্ঞান (Bio-ethics), যা বিজ্ঞান হয়েও মানবাশ্রিক।

বিজ্ঞানের মূলনীতি বিশ্লেষণ, অংশের মাধ্যমে পূর্ণকে জানার চেষ্টা। জীব বিজ্ঞানী তাই প্রাণকে বিশ্লেষণ করে তার রহস্যকে জানতে চেয়েছে।

* প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাণীকে ভেঙে সে পেয়েছে কোষ, কোষকে বিশ্লেষণ করে পেয়েছে অণু-পরমাণু। কিন্তু হঠাৎ চোখ খুলে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে—অণু-পরমাণুর প্রাণ নেই, বিশ্লেষণের পথে প্রাণসত্তা হারিয়ে গেছে, কোথায় বা কখন, তা জানা নেই। জীব-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে তাই অণুর আচরণের অনেক কথাই ধরা দিয়েছে, কিন্তু প্রাণের খবর মেলে নি। তাই আজ অনেক চিন্তাশীল বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ জেগেছে—বিশ্লেষণের পথে প্রাণের রহস্যের কোন কিনারা হবে কিনা, যদিও প্রাণী ও অণুকে একেবারে আলাদা করে দেখা যায় না, তবুও কেবলমাত্র অণুর খবরে প্রাণের সঠিক খবর পাওয়া যাবে কিনা; অর্থাৎ আজকের জীব-বিজ্ঞানীর সামনে প্রবলতম প্রশ্ন—জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয় কি হবে—অণু না প্রাণী, অংশ না পূর্ণ, খণ্ড না অখণ্ড ?

জীব-বিজ্ঞানে খণ্ডবাদ বনাম অখণ্ডবাদ
(Reductionism versus holism)

আজকের জীব-বিজ্ঞানের যেটুকু প্রগতি—যদি তাকে প্রগতি বলি—তা হলো আণবিক জ্ঞান বা খণ্ডবাদের প্রগতি। যেহেতু প্রাণীর গঠনের মূলে রয়েছে অণু, সেহেতু অণুকে জানলে প্রাণকে জানা যাবে, এটাই খণ্ডবাদের মূলমন্ত্র। আজকের খণ্ডবাদের অগ্রগতিতে অনুঘটকের মত কাজ করেছে ওয়াট্‌সন ও ক্রিকের ডি. এন. এ-গঠন-তত্ত্ব। প্রাণীকে কোষে, কোষকে অণুতে বিশ্লেষণ করবার পথে জীব-বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছে ডি. এন. এ, যা কোষের প্রায় সব ক্রিয়াকলাপ—এমন কি, নিজের সব প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডি. এন. এ. এমন এক অণু, যাতে জড় অস্তিত্ব এবং প্রাণের চেতনা—এই দুটি ধর্ম মিথুনীকৃত। তাই আণবিক জীব-বিজ্ঞানীরা সোৎসাহে ঘোষণা করলেন, অণুর বৈশিষ্ট্যই প্রাণের বৈশিষ্ট্যের গোড়ার কথা, অর্থাৎ অণুকে জানা গেলে প্রাণের রহস্য আপনা থেকেই ধরা দেবে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত ডি. এন. এ-র সাহায্যে মানুষ তো দূরের কথা, কোন প্রাণীরও বাহ্যিক আচরণ কেমন হবে, সে সম্পর্কে কিছু হলফ করে বলা যায় নি। প্রাণীর একটা কোষকে দেখে সে প্রাণী সম্পর্কে কোন বাস্তব ধারণা আমাদের মনে আসে না কিংবা সমাজের এক-একটি লোককে দেখে তারা একত্রিত অবস্থায় কেমন ব্যবহার করবে, তা বলা সম্ভব নয়; অর্থাৎ খণ্ডকে দেখে অখণ্ড সম্পর্কে ধারণা করবার কোন পথ আমরা জানি না। অনেকের ধারণা, আমাদের জ্ঞান সীমিত বলেই এটা হচ্ছে। কিন্তু অনেক জীব-বিজ্ঞানী আজ বলতে সুরু করেছেন—পূর্ণকে তার নিজের মত করে ভাবতে হবে, অংশের মাধ্যমে তার ঠিকানা কোন দিন মিলবে না। তাই বলে অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানীরা ভাববাদী (Vitalist) Michael Polanji প্রমুখ জৈব বিজ্ঞানীদের মত মনে করেন না, "Life is not explainable in terms of chemistry and physics alone, and the added ingredients transcend the realm of knowledge that is available to the minds of men."

জীব-বিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু অপপ্রয়োগ হয়েছে, যা মানবসমাজের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিসাধন করেছে। তাই অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানীদের বক্তব্য—প্রাণী, তথা প্রাণকে বোঝবার কাজে যেখানে প্রয়োজন আণবিক জ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণীর কি সম্পর্ক (অণুর নয়), এই নিয়ে আরম্ভ হবে অখণ্ডবাদী জীব-বিজ্ঞানের এবং এই বিজ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশ ও প্রাণীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিভিন্ন পরিবেশে প্রাণীর ব্যবহার ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাণ—পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার যন্ত্রবিশেষ

প্রাণের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর কোথাও মেলে নি। আজকের দিনের জীব-বিজ্ঞানীর মতে, প্রাণ জীবদেহের অণুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার এক বিশেষ ধরণের বহিঃপ্রকাশ। জীব-বিজ্ঞানী Reiner মনে করেন, মানুষ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতাবিশিষ্ট এক যন্ত্র। যেহেতু প্রাণীর মধ্যে যে নিয়ন্ত্রণ তার উৎস আণবিক গঠনের কোন এক স্তরে, তাই জীবনীতি-বিজ্ঞানের মূল কাঠামো প্রাণ সম্পর্কে আমাদের 'আণবিক জ্ঞানের' উপর নির্ভর করেই তৈরি করতে হবে। এই সমস্ত 'আণবিক জ্ঞান' হবে এমন সব তথ্য, যার সত্যতা সম্পর্কে কোন জীব-বিজ্ঞানীর কোন সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানী Van Renssaelaer Potter এই ধরণের 12-টি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(1) প্রত্যেক জীবসত্তা অণুর এক বিশেষ সমন্বয়, যা ক্রমাগত ধ্বংস ও সৃষ্টির ব্যাপকতার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে চলেছে। সমন্বয় সাধনের প্রতি স্তরেই শক্তির প্রয়োজন হয় বা শক্তির উদ্ভব হয়।

(2) অনুঘটন—জীবকোষের বেশীর ভাগ প্রক্রিয়া এত শ্লথগতিতে চলে যে, অনুঘটক ছাড়া এই প্রক্রিয়াগুলি প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ে। কোষ যে অনুঘটক ব্যবহার করে, তা হলো এনজাইম। এক একটি এনজাইম এক এক রকমের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবার কাজে লাগে।

(3) শক্তির উৎস—জীবনের অস্তিত্বের জন্যে সব সময়েই শক্তির প্রয়োজন। এই শক্তি কোষের বিভিন্ন রকমের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই কোষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোষের শক্তিদায়ক এবং শক্তিগ্রাহক বিক্রিয়াগুলিকে একসঙ্গে সংযুক্ত রাখে অন্যথায় জীবনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

(4) কোষে বিশেষ কোন অণু শক্তি উৎপাদনের কাজে বা কোষ গঠনের কাজে লাগতে পারে। তাই কোষে প্রায় সব প্রয়োজনীয় পদার্থই একাধিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং বিভিন্নভাবে কাজে লাগে।

(5) প্রতিটি কোষে, তথা কোষ-সংগঠনের প্রতি ধাপে যৌগিক পদার্থরূপে কিছু পরিমাণ শক্তি জমা থাকে। এই শক্তির উৎস যথাযথ অবস্থায় রাখবার প্রক্রিয়া কোষের মধ্যে থাকে।

(6) প্রতিটি জীবকেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয় এবং মানিয়ে চলবার জন্যে প্রয়োজনীয় সংকেত কোষের ডি. এন.-এ-তে জমা থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার পথে উন্নততর প্রাণীর বেলায় মস্তিষ্কেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বাহিত সংকেতই বিশেষ এনজাইম, হর্মোন ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে প্রাণীকে পরিবেশের সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রামে সাহায্য করে।

(7) কোষের বাহিত সংকেত বংশানুক্রমে বাহিত হওয়া প্রয়োজন এবং ডি-এন-এ দ্বিত্বকরণের মাধ্যমে সংকেত কোষ থেকে কোষান্তরে বাহিত হয়।

(8) সংকেত দ্বিত্বকরণে ভুলের এক বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। এই ভুলের ফলেই বংশপরম্পরায় বাহিত সংকেত, তথা জীবের ধর্মে পার্থক্য দেখা দেয়। এই ভুল পরে জীবের দ্বারা বাহিত হয় এবং প্রকৃতির পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এটাই ডারউইনের তত্ত্বের মূল কথা এবং বিবর্তনের মূল সূত্র।

(9) প্রত্যেক জীবের মধ্যে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। এর সাহায্যে জীব তার শারীরিক ও মানসিক সংবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অবশ্য জীনগত সংকেতের উপর নির্ভর করে এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কম-বেশী হতে পারে।

(10) কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটাই কোষ তথা জীবের বিশেষ ধরণের গঠনের মূল কথা।

(11) প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পরিবেশে এমন সব ছোটখাটো অণু থাকে, যা কোন অতি প্রয়োজনীয় অণুর সঙ্গে গঠনগত সাদৃশ্যের জন্যে বিশেষ কোন এনজাইমকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে জীবও স্বাভাবিকভাবেই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া জানা ও অজানা নানা ধরণের রশ্মি এবং রাসায়নিক পদার্থ প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকে, যা আমাদের কোষের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে।

(12) প্রতিটি জীব জীনবাহিত সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ ক্ষমতা পেয়ে থাকে, যার সাহায্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়।

অস্তিত্বের তিন ধাপ—ব্যক্তিগত, সামাজিক ও কৃষ্টিগত

প্রাণ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর থেকে অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে এসেছে, বাহ্যিক রূপ ও অন্তঃপ্রকৃতি উভয়েরই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এই দীর্ঘ পথে অনেকেই এসেছে, অনেকে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে আর যারা তা পারে নি, তারা হারিয়ে গেছে। এই সবের মূলে রয়েছে প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার তারতম্য। মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার তিনটি ভিন্ন স্তর—ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং কৃষ্টিগত।

পরিবেশের সঙ্গে ছোটখাটো সমঝোতা আমাদের সারাক্ষণই চলছে। একটু বেশী শীত বা গরম, কড়া আওয়াজ—এমন কি, অফিস যাবার বাসে ঝুলে যাওয়া ইত্যাদি। এসব ঘটনার ফলে জীবের আণবিক গঠনে নিশ্চয়ই পরিবর্তন হচ্ছে, যা হয়তো চোখে—এমন কি, যন্ত্রের কাঁটায়ও ধরা দিচ্ছে না। কিন্তু আণবিক গঠনের সামান্য পরিবর্তনও জীবকে প্রভাবিত করে এবং বিবর্তনের ক্ষেত্রে এদের প্রভাব খুব তুচ্ছ নয়। পরবর্তী স্তরে মানুষ সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এখানে সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদে মানুষ সহগামীদের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। পরবর্তী বা শেষ স্তর হলো কৃষ্টিগত স্তর।

মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, যে ধরণেরই হোক না কেন, নির্ভর করে জীন এবং পরিবেশ দুটিরই উপর। প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত বেছে নেবে—কে টিকে থাকবে। তাই প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, আজকের দিনের বড় প্রয়োজন প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মানবাত্মিক ব্যবহার। এটা আজকের মানুষ এবং তার ভবিষ্যৎ বংশধর—উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

জীবনীতি-বিজ্ঞান ও সমাজ

জীব-বিজ্ঞানের প্রগতি তর্কাধীন নয়। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকের মত জীব-বিজ্ঞান সরলরেখায় চলে না। তাই জীব-বিজ্ঞানের বাঁকা পথে কিন্তু বিংশ শতকের শেষ পাদে চিন্তাধারা এবং প্রয়োগে জীব-বিজ্ঞানের এমন মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে, যাকে যুগান্তর বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এক কালে বিজ্ঞান ও সমাজের চলাফেরা স্বতন্ত্র পথেই হতো, কিন্তু আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকে পৃথক করে দেখবার কোন যুক্তি নেই। বিজ্ঞানের অভিঘাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের সংঘাতে আজ যে পরিবর্তন হতে চলেছে, তা শ্রেয়-এর সঙ্গে প্রেয়-এর সংঘাত নয়, প্রাচীন মূল্য

বোধের সঙ্গে নবীন মূল্যবোধের সংঘাত। এই সংঘাত শ্রেয় এবং প্রেয়-এর সংঘাতের তুলনায় দারুণতর। তাই বিজ্ঞানের ব্যবহারে শ্রেয়নীতির প্রয়োগে যারা সোচ্চার, তাদের মেজাজে ভাববাদের আমেজ কিঞ্চিৎ লেগেছে—এই অভিযোগ আংশিক সত্য হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, অতীতের অভিজ্ঞতা এবং মানবিক মূল্যবোধের উপর নির্ভর করেই বহু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিজ্ঞানীই মনে করেন, জীব-বিজ্ঞানের বল্গাবিহীন অপপ্রয়োগ আর চলা উচিত নয়। নীতিবিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দেয়, ভাল বলতে কি বোঝায় আর জীববিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় জানান দিয়ে দেয়. সীমিত বিশ্বে সসীম জীবসত্তার পক্ষে কি পাওয়া সম্ভব। এর কোন সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান এক্ষুণি পাওয়া যাবে, এমন সাহস করা ঠিক নয়। তবে এই সমাধান পাবার পথ নিঃসন্দেহে জীবনীতিবিজ্ঞান—যার কাজ হবে "To balance cultural appetites against physiological needs in terms of public policy."—বিজ্ঞানের হাত থেকে মানবতাকে বাঁচাবার একমাত্র রক্ষাকবচ।

গ্যাসের তরলীকরণ ও অতি নিম্ন উষ্ণতা

অরূপ রায়

গ্যাসের গতিসূত্র (Kinetic theory) অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় যে, চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি খুব কাছাকাছি এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি অণুগুলির বেগও হ্রাস করানো যায়, তবে গ্যাসটি তরলে পরিণত হয়ে যেতে পারে।

উপরিউক্ত ধারণা থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করবার জন্যে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আসল বক্তব্য আরম্ভ করবার আগে আমাদের জানতে হবে—গ্যাস কি এবং তার সঙ্গে বাষ্পের তফাৎ কি? সর্বপ্রথম J. B. Von Helmont (মৃত্যু 1644) বিজ্ঞানশাস্ত্রে গ্যাস শব্দটিকে ব্যবহার করেন। এখন যে সব বায়বীয় পদার্থের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার (Critical temperature) নীচে, তাদের ভেপার বা বাষ্প এবং যে সমস্ত বায়বীয় পদার্থের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার উপরে, তাদের গ্যাস বলে। বাষ্প সহজেই চাপের প্রভাবে তরলিত হয়, কিন্তু গ্যাস তরল করতে উষ্ণতা হ্রাস ও চাপ উভয়েরই প্রয়োজন।

গ্যাসকে তরল করবার চেষ্টা এক দীর্ঘ ইতিহাস—একে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্যায়ে সঙ্কট উষ্ণতার কোন ধারণা বৈজ্ঞানিকদের ছিল না। তখন গ্যাসকে যথাসম্ভব শীতল করে চাপ প্রয়োগ করা হতো। ফ্যারাডে ও তাঁর পূর্বসূরীরা ছিলেন এই পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যাসকে সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামিয়ে অতঃপর চাপ প্রয়োগের দ্বারা তরলে পরিণত করা হতো। তৃতীয় পর্যায়ে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার (Joule-Thomson Effect) সাহায্যে অতি নিম্ন সঙ্কট উষ্ণতার গ্যাসকে তরলিত করা হয়। এখন সংক্ষিপ্তভাবে গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিণত করবার ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

সর্বপ্রথম Boerhaave গ্যাসীয় পদার্থকে তরল করবার চেষ্টা করেন। 1732 সালে তিনি

বাতাস নিয়ে পরীক্ষা চালান, কিন্তু ব্যর্থ হন। এই সময়ের বহু বিজ্ঞান-সাধকই বাতাসকে তরল করবার প্রয়াস পান, কিন্তু কেবলমাত্র বাতাসের জলীয় বাষ্প ছাড়া আর অন্য কোন উপাদান তরল করতে অসমর্থ হন। Von Marum 1799 সালে ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে অ্যামোনিয়াকে তরল অবস্থায় পরিণত করেন। সেই বছরেই De Morveau, De Fourcroy, Vanquelin −40°C উষ্ণতায় অ্যামোনিয়া গ্যাসকে শীতল করে তরলিত করেন। এই সময় Monge এবং Clouet প্রথমে শীতল ও পরে চাপ প্রয়োগ করে তরল SO_2 পান। কিন্তু এই সকল বৈজ্ঞানিকদের কার্যপ্রণালী বহু ত্রুটিপূর্ণ ছিল সন্দেহ নেই। কারণ পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্যাস সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকতো না এবং জলীয় বাষ্প থেকে প্রাপ্ত তরলকেই (জল) পরীক্ষণীয় গ্যাসের তরল অবস্থা বলে ভুল করা হতো। প্রাথমিক উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথাযথ ও নির্ভুল হিসাবে Northmore-এর নামই উল্লেখযোগ্য। তিনি 1805 সালে ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস এবং সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে চাপ প্রয়োগ করে তরল করেন, কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড তরল করতে ব্যর্থ হন।

প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট পথে গ্যাসকে তরলে পরিণত করবার জন্যে পরীক্ষাকার্য চালান মাইকেল ফ্যারাডে। তিনি উল্টা V আকারের একটি টিউব নিয়ে তার এক-প্রান্তে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন করবার বিকারক নেন ও মুখটি গালিয়ে বন্ধ করে দেন। অপর প্রান্তটি হিমমিশ্রণের (নুন ও বরফ) মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। বিকারকপূর্ণ দিক উত্তপ্ত করলে ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে ক্লোরিন নিজেরই উৎপন্ন চাপে তরল হয়ে যায় ও শীতল অংশে জমা হয়। এভাবে তিনি ক্লোরিন ছাড়াও হাইড্রোজেন সালফাইড, সায়ানোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাস তরল করতে সক্ষম হন। Colladon 400 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও −30°C উষ্ণতা প্রয়োগ করেও বাতাসের অবস্থান্তর ঘটাতে ব্যর্থ হন। ঢালাই লোহার পাত্র প্রস্তুত করে M. Thilorier কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ফ্যারাডের পদ্ধতিতে তরল অবস্থায় পরিবর্তিত করেন এবং প্রাপ্ত তরল পদার্থটিকে আংশিক বাষ্পীভূত করে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড পান। তিনি কঠিন CO_2 ও ইথারের সাহায্যে এক প্রকার হিমমিশ্রণ প্রস্তুত করেন এবং −110°C উষ্ণতা পেতে সক্ষম হন 1835 সালে। Thilorier-এর হিমমিশ্রণের সাহায্যে ফ্যারাডে 1845 সালে ইথিলিন, ফস্ফিন টেট্রাফ্লুরাইড, বোরন টেট্রাফ্লুরাইড গ্যাস তরল করেন ও কিছু তরলসাধ্য গ্যাসকে কঠিনেও পরিণত করেন।

−110°C উষ্ণতায় অনেক গ্যাস প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও অবিকৃত থেকে যায়; যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, বাতাস, কার্বন মনোক্সাইড ও মিথেন। J. O. Natterer (1844-45) অতি উচ্চ চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাদের তরলিত করতে সক্ষম হন নি। তিনি বিশেষভাবে নির্মিত পাম্পের দ্বারা 3000 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। শেষে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, এই সব গ্যাসকে কখনই তরল করা যাবে না। তাঁরা এই গ্যাসগুলিকে স্থায়ী গ্যাস (Permanent gas) নামে অভিবহিত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়।

গ্যাস তরলীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি দেন T. Andrews 1869 সালে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত করেন। গ্যাসের আয়তন, উষ্ণতা ও চাপ

বিভিন্নভাবে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে তিনি গ্যাস তরলীকরণের পদ্ধতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি বিভিন্ন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় CO_2-এর বিভিন্ন চাপে প্রাপ্ত আয়তনের সাহায্যে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করেন। এটি Andrews Isothermal বা অ্যাণ্ড্রুজের সমউষ্ণতা লেখ নামে পরিচিত (1নং চিত্র)। অ্যাণ্ড্রুজের সমউষ্ণতা
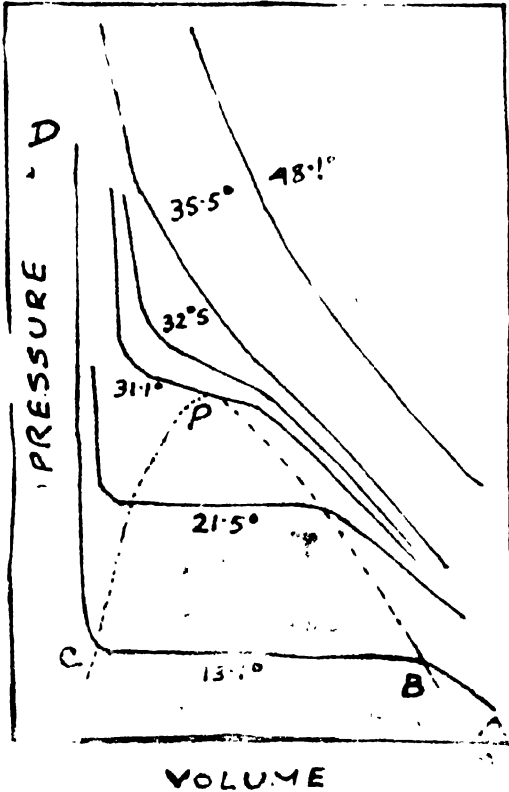
1নং চিত্র

লেখ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, 13·1°C-এ নিম্ন চাপ A-বিন্দুতে CO_2 পুরাপুরি গ্যাসীয়। তারপর চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তনের হ্রাস ঘটে বয়েলের সূত্র অনুযায়ী (চিত্রে AB অংশ)। B বিন্দুর চাপে CO_2 তরল হতে থাকে এবং আয়তনও দ্রুত কমে আসে এবং C বিন্দুতে CO_2 পুরাপুরি তরল হয়ে যায়। লেখর CD অংশ নির্দেশ করে—চাপ বৃদ্ধি ঘটলেও তরল CO_2-এর আয়তনের বিশেষ সংকোচন হয় না, অতএব লেখর AB অংশে CO_2 সম্পূর্ণ গ্যাস, CD অংশে সম্পূর্ণ তরল এবং BC অংশে গ্যাস ও তরল এই দুটি অবস্থারই মিশ্রণ। আবার যেহেতু BC অক্ষ আয়তন অক্ষের সমান্তরাল, সেহেতু বলা যেতে পারে যে, চাপ ধ্রুবক যখন তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা একই সঙ্গে অবস্থান করে। 21·5°C উষ্ণতায় আয়তন-চাপ লেখর ধর্ম একই থাকে, কেবল মধ্যভাগের সমান্তরাল অংশের দৈর্ঘ্য কিছুটা ছোট হয়। 31·1°C উষ্ণতায় এই মধ্যভাগের বিস্তার বলতে গেলে বিন্দুতে পরিণত হয় আর 31·1°C-এর উপর পৃথকভাবে লেখর মধ্য অংশ বলতে কিছু থাকে না। অ্যাণ্ড্রুজ দেখেছিলেন 31·1°C উষ্ণতার উপর CO_2 গ্যাসকে 400 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করলেও তরল করা যায় না অথচ 31·1°C উষ্ণতায় মাত্র 75 বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই CO_2 তরল হয়ে যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে উষ্ণতার এমন একটা সীমা আছে, যার উপরে উষ্ণতা থাকলে যত চাপই প্রয়োগ করা হোক না কেন CO_2-কে তরল করা যাবে না। পরে তিনি দেখান যে, প্রত্যেক গ্যাসেরই এরকম একটি উষ্ণতাসীমা আছে। সর্বোচ্চ যে উষ্ণতায় এবং ঠিক যে উষ্ণতার উপরে যত চাপই প্রয়োগ করা হোক না কেন, গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায় না—সেই উষ্ণতাকেই সেই গ্যাসের সঙ্কট উষ্ণতা বলে।

সঙ্কট উষ্ণতা আবিষ্কারের ফলে বোঝা গেল, স্থায়ী গ্যাসগুলিকে এতদিন কেন তরল অবস্থায় পরিণত করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণটি আর কিছুই নয়—চাপ প্রয়োগের আগে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে শীতল করা হয় নি অর্থাৎ সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামানো হয় নি।

অ্যাণ্ড্রুজের আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিকদের সামনে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল—কেমন করে নিম্ন উষ্ণতার সৃষ্টি করা সম্ভব। কারণ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়ামের সঙ্কট

উষ্ণতা যথাক্রমে −118°C, −146°C, −241°C ও −268°C.

1877 সালে R. P. Pictet তরল অক্সিজেন প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। তিনি ক্যাসকেড পদ্ধতির (Cascade process) সাহায্যে অক্সিজেনকে সঙ্কট উষ্ণতার নিয়ে আসেন। ক্যাসকেড পদ্ধতিতে একটি শীতকের মধ্য দিয়ে CO_2 গ্যাস পাঠানো হয় ও শীতক নল ঘিরে নিম্ন চাপে তরল SO_2 দ্রুত বাষ্পীভূত করা হয়। ফলে CO_2 গ্যাস সহজেই তরল হয়ে যায়। এবার উৎপন্ন তরল CO_2-কে অপর একটি শীতক নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অক্সিজেন ঘিরে নিম্ন চাপে বাষ্পীভূত করা হয়। ফলে উষ্ণতা নেমে −120°C-এ পৌঁছায়। এই সময় 500 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগের দ্বারা অক্সিজেন তরল করা হয়। বিশুদ্ধ তরল অক্সিজেনের একটা সুন্দর নীল রং আছে।

L. Cailletet (1877) অন্য একটি পদ্ধতিতে অক্সিজেন নাইট্রোজেন, বাতাস, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসকে তরল করেন। এটির নাম অ্যাডিয়াবেটিক প্রসারণ (Adiabatic expansion) পদ্ধতি। 1884 সালে পোলিশ বিজ্ঞানী S. von Wroblewske এবং Olschewski ক্যাসকেড পদ্ধতিতে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করে হাইড্রোজেন গ্যাসকে তরল করবার চেষ্টা চালান, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

Kamerlingh Onnes 1894 সালে ক্যাসকেড পদ্ধতিতে ইথিলিন ও মিথাইল ক্লোরাইড ব্যবহার করে অক্সিজেনকে তরল করেন। ক্যাসকেড পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা −218°C তরল অক্সিজেন ব্যবহার করে। কিন্তু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সঙ্কট উষ্ণতা যথাক্রমে −241°C ও −268°C; সুতরাং ক্যাসকেড পদ্ধতিতে এই দুটি গ্যাসকে তরল করা গেল না।

ক্যাসকেড পদ্ধতি যখন হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকে তরল করতে ব্যর্থ হলো, তখন জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। J. P. Joule ও W. Thomson (Lord Kelvin) বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে এক ধরণের বিশেষ পরীক্ষা চালান (1852-1862)। 1807 সালে সর্বপ্রথম গে-লুসাক এই ধরণের পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখেন, উচ্চ চাপে রক্ষিত গ্যাসকে যদি হঠাৎ নিম্ন চাপে প্রসারিত হতে দেওয়া হয়, তবে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে। এই প্রতিক্রিয়াকেই জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া বলে। বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে তাঁরা এই পরীক্ষাটি করেন এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

(1) জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্যাসের উষ্ণতার যে পরিবর্তন হয়, তা উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপের অন্তরফলের সমানুপাতিক।

(2) সাধারণ উষ্ণতায় সকল গ্যাসই, কেবল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ছাড়া, জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার ফলে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।

(3) প্রত্যেক গ্যাসেরই একটি নির্দিষ্ট ব্যস্ত-উষ্ণতা (Inversion temperature) আছে। গ্যাস প্রাথমিক অবস্থায় এই উষ্ণতার উপরে থাকলে উষ্ণতা জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায় এবং এর নীচে থাকলে উষ্ণতা হ্রাস পায়; অর্থাৎ যে উষ্ণতায় জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার উষ্ণতা চিহ্ন পরিবর্তন করে, তাকেই ব্যস্ত উষ্ণতা বলে।

সর্বপ্রথম Cailletet এই জুল-টমসন প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে 1877 সালে গ্যাসকে (তরল করবার জন্যে) শীতল করবার চেষ্টা করেন। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের ব্যস্ত উষ্ণতা সাধারণ তাপমাত্রার উপরে, কিন্তু হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ব্যস্ত উষ্ণতা যথাক্রমে —80°C এবং —240°C। J. Dewer (1900) জুল-টমসন প্রতিক্রিয়াকে গ্যাসের উষ্ণতা হ্রাসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে হাইড্রোজেন গ্যাস

তরলিত করেন। তিনি তরল নাইট্রোজেনকে নিম্ন চাপে বাষ্পীভূত করে কাসকেড প্রণালীতে হাইড্রোজেন গ্যাসকে প্রথমে —200°C উষ্ণতায় নামিয়ে আনেন। তারপর শীতল গ্যাসকে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে তার সঙ্কট উষ্ণতার নীচে (প্রায় —250°C) নামিয়ে আনেন এবং 150 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে তাকে তরলে পরিণত করতে সক্ষম হন। Dewer হাইড্রোজেন গ্যাসকে কঠিনে পরিণত করবার সাফল্যও অর্জন করেন। প্রাপ্ত তরল হাইড্রোজেনকে নিম্ন চাপে দ্রুত বাষ্পীভূত করতে থাকলে তার উষ্ণতা আরও হ্রাস পায় ও —259°C-এ উপনীত হলে তা কঠিনে পরিণত হয়। তরল ও কঠিন উভয় হাইড্রোজেনই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন।

হিলিয়াম গ্যাস তরল করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন বৈজ্ঞানিক H. Kamerlingh Onnes 1908 সালে। তিনি নিম্ন চাপে তরল হাইড্রোজেন বাষ্পীভূত করে কাসকেড পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা —255°C-এ নিয়ে আসেন। অতঃপর জুল-টমসন প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সঙ্কট উষ্ণতার নীচে উষ্ণতা নামাতে সক্ষম হন। সঙ্কট উষ্ণতার নীচে উষ্ণতা নামিয়ে তিনি হিলিয়াম গ্যাসকে 150 বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সাহায্যে তরলে পরিণত করেন। চাপ প্রয়োগ করে তিনি তরল হিলিয়ামকে কঠিনে পরিণত করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তবে হিলিয়ামের উষ্ণতা তিনি 0.82°k-তে নামাতে সক্ষম হন। Onnes-এর মৃত্যুর পর Keesam 130 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করে হিলিয়ামকে কঠিনে পরিণত করেন। পরে অবশ্য 4.2°k উষ্ণতায় 140 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগে ও 1.1°k উষ্ণতায় 23 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগে তাকে কঠিন করা সম্ভব হয়েছে। Keesam ও Clausius তরল হিলিয়াম নিয়ে বহু পরীক্ষাকার্য চালান। তাঁদের মতে, তরল হিলিয়াম দুটি অবস্থায় থাকে—He I ও He II। এই দুটি অবস্থা কঠিন হিলিয়ামের সঙ্গে 2°k উষ্ণতায় ত্রি-বিন্দুতে (Triple point) সাম্যাবস্থায় (Equillibrium) থাকে। তরল হিলিয়াম নিয়ে সবচেয়ে বেশী পরীক্ষাকার্য চালান Guiaque। তিনি তাঁর ফলাফল একটি মনোগ্রাফের (Monograph) মাধ্যমে প্রকাশ করেন। Kamerlingh Onnes ভারতবর্ষের ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের মোনাজাইট বালুকা (Monazite Sand) থেকে হিলিয়াম সংগ্রহ করেন। হিলিয়াম তরলীকরণ খুব ব্যয়সাধ্য এবং পৃথিবীতে খুব কমই হিলিয়াম তরল করবার প্ল্যান্ট আছে।

ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক W. Hampson (1895) ও জার্মান বৈজ্ঞানিক C. von Linde (1895) পৃথকভাবে শিল্পপদ্ধতিতে বাতাস তরল করতে স্বতঃশীতলীভবন ও জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া কাজে লাগান। Linde বাতাসকে 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে 40 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ও Hampson 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ থেকে 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে প্রসারিত হতে দেন। বিজ্ঞানী Claude-ও (1900-05) বায়ু তরল করতে জুল-টমসন প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করেন। গ্যাসসমূহকে তরলিত করতে Claude কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হন। অ্যাডিয়াবেটিক প্রসারণের সময় গ্যাসের উষ্ণতা যখন হ্রাস পায়, তখন পিস্টন ও মেসিনের পিচ্ছিল তেল জমে গিয়ে যন্ত্র অকেজো করে দেয়। তাই তিনি পিচ্ছিল তেল হিসাবে পেট্রোলিয়াম ইথার ব্যবহার করেন। পেট্রোলিয়াম ইথার —160°C পর্যন্ত পিচ্ছিল থাকে। পেট্রোলিয়াম ইথার ও তেসেলীনের মিশ্রণ ব্যবহার করেও যথেষ্ট সুফল পান। 1934 সালে P. Kapitza Claude-এর মেসিনে পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহারের সমস্যার নতুনভাবে সমাধান করেন। তিনি মেসিনে সিলিণ্ডার ও পিস্টনের মধ্যে খুব সামান্য ফাঁক রাখেন, ফলে প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন সংযোগ ঘটে না। তাই পিচ্ছিলি-করণেরও কোন প্রয়োজন হয় না। পিস্টন ও

সিলিণ্ডারের মাঝখান দিয়ে উচ্চ চাপের গ্যাস সহজেই বেরিয়ে যায়, কিন্তু পিস্টন এত তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসা করে যে, খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাসই বের হয়।

F. Simon (1926) এক বিশেষ পদ্ধতিতে হিলিয়াম গ্যাসের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নামিয়ে তরল করেন। যখন কোন গ্যাস অঙ্গার কর্তৃক শোষিত হয়, তখন তাপের উদ্ভব ও শোষিত গ্যাস বের করে নিলে তাপের শোষণ হয়। এই তত্ত্বকে তিনি কাজে লাগান। সক্রিয় অঙ্গারকে (Active charcoal) তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে ঠাণ্ডা করলে তা প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম গ্যাস শোষণ করে। এখন পাম্পের সাহায্যে এই শোষিত গ্যাস টেনে নিলে অঙ্গারের উষ্ণতা সঙ্কট উষ্ণতার নীচে নেমে আসে। এই সময় চাপ প্রয়োগ করে হিলিয়ামকে তরল করা হয়।

গ্যাসকে তরলে পরিণত করতে, বিশেষ করে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসকে তরল করতে যখন অত্যধিক নিম্ন তাপমাত্রার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টা চলতে লাগলো—কি করে −273°C বা 0°K উষ্ণতা পাওয়া যায়। Kemerlingh Onnes 0·82°K ও Keesom 0·71°K উষ্ণতা সৃষ্টি করেন তরল হিলিয়ামের সাহায্যে। 1926 সালে P. Debye ও W. F. Guiaque নিম্ন তাপমাত্রা সৃষ্টির জন্যে অ্যাডিয়াবেটিক বিচুম্বকনের (Adiabatic demagnetization) প্রস্তাব করেন। অ্যাডিয়াবেটিক বিচুম্বকনের ভিত্তি রচনা করেন P. Curie (1895)। তিনি বলেন, ডায়াম্যাগ্‌নেটিক (Diamagnetic) পদার্থগুলির ধর্ম সাধারণতঃ ক্ষেত্র প্রাবল্য (Field strength) এবং উষ্ণতা নিরপেক্ষ কিন্তু প্যারাম্যাগ্‌নেটিক (Paramagnetic) পদার্থের চুম্বকপ্রবণতা (Susceptibility) পরম উষ্ণতার সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। আবার চুম্বকপ্রবণতা ক্ষেত্র-প্রাবল্যের সমানুপাতিক। এই মতবাদকে Curie-Langevin তত্ত্বও বলা হয়। এই মতবাদকে কাজে লাগিয়ে Debye-এর প্রদর্শিত পথে উষ্ণতাকে পরম শূন্যের খুব কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে প্যারাম্যাগ্‌নেটিক পদার্থকে একটি আধারে রেখে তরল হিলিয়ামের, সাহায্যে 1°K-তে নিয়ে আসা হয়। আধারের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস নিম্নচাপে রাখা হয়। এখন 30,000 গস্‌ ক্ষেত্র-শক্তি প্রয়োগ করা হয়। এই সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু উৎপন্ন তাপ আধারের ভিতর নিম্নচাপে রক্ষিত হিলিয়াম কর্তৃক বিকিরিত হয়ে যায় ও উত্তপ্ত প্যারাম্যাগ্‌-নেটিক পদার্থটি আবার তরল হিলিয়াম কর্তৃক ঠাণ্ডা হয়ে 1°K-তে নেমে আসে। এই সময় আধারের হিলিয়াম পাম্প করে বের করে নেওয়া হয় ও চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত করা হয়। প্যারাম্যাগ্‌নেটিক পদার্থটির উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। Guiaque 1933 সালে গ্যাডোলিনিয়াম সালফেট ব্যবহার করে 0·16°K উষ্ণতা সৃষ্টি করেন। De Hess সিরিয়াম ফ্লোরাইড ও ডিসপ্রোসিয়াম (Dysprosium) ইথাইল সালফেট ব্যবহার করে যথাক্রমে 0·15°K ও 0·09°K উষ্ণতা পান। F. Simon ও N. Kürti 1935 সালে ফেরিক অ্যামো-নিয়াম ফটকিরি ব্যবহার করে আরও ভাল ফল পান। 1935 সালেই W. J. de Hess ও E. C. Wiersma পটাসিয়াম ক্রোম ফটকিরির সাহায্যে 0·003°K উষ্ণতার সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করেন। আজকাল খুব সহজেই চৌম্বক পদ্ধতিতে 0·01°K থেকে 0·02°K উষ্ণতা সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই প্রচণ্ড নিম্ন তাপমাত্রা মাপতে তাপমান যন্ত্রের যথেষ্ট অভাববোধ করেন বিজ্ঞানীরা।

সঞ্চয়ন

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সন্ধানের উদ্যোগ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহের যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয়েছে, তা সমগ্র মানবজাতির সম্মুখে এক বিপুল সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে এসেছে। ভারত-সহ পৃথিবীর 22টি রাষ্ট্র এই পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছে। 70টি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে এর সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এজন্যে আমেরিকা ও ব্রেজিলে যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্যসন্ধানী কেন্দ্র রয়েছে, তাতে ঐ সকল রাষ্ট্রের কর্মীদের তালিম দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষি, বনবিজ্ঞান, জল ও ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং ধাতব সম্পদ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করা হবে। তাছাড়া সমুদ্র-বিজ্ঞান, আকাশ ও জলপথে পরিবহন, জলবায়ু দূষিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে সঙ্কেত দেবার বিষয়েও উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য-সংগ্রহ ও সমীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

সমবেত প্রচেষ্টায় এই প্রথম ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা, সন্ধান ও হিসাব নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সৌদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে পঙ্গপালের জন্মস্থান সম্পর্কে এই প্রথম তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হচ্ছে।

পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী এই সকল মার্কিন উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে—আর্থ রিসোর্সেস টেকনোলজী স্যাটেলাইট। এই রকম দুটি পরীক্ষা-মূলক কৃত্রিম উপগ্রহ 1972 ও 1973 সালে মহাকাশে উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঐ সকল উপগ্রহে থাকবে বহু বর্ণালীয় বা মাল্টি স্পেকট্র্যাল অপ্‌টিক্যাল ক্যামেরা ও অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে বহুদূর থেকে তথ্য সংগ্রহের নানা প্রকার যন্ত্রপাতি। এই প্রথম সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের একটা মোট হিসাব নেবার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে।

এর আগে নিম্বাস নামে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী মার্কিন উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিতও হয়েছে। এক টন ওজনের প্রাকৃতিক সম্পদ-সন্ধানী এই উপগ্রহের আভ্যন্তরীণ গঠন এবং এর পাখায় সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা ঠিক নিম্বাসেরই অনুরূপ হবে। আর জেমিনি ও অ্যাপোলো পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং 1963 সাল থেকে মেক্সিকো, ব্রেজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সমীক্ষা গ্রহণকালে যে ধরণের ক্যামেরা ও অব-লোহিত রশ্মি বা ইনফ্রারেড লেন্স ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই ধরণের ক্যামেরা ও অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে বহু দূর থেকে তথ্য সংগ্রহের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের বিজ্ঞান দপ্তরের উপদেষ্টা ডক্টর এডওয়ার্ড ই. ডেভিড (জুনিয়ার) কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপক কার্যসূচী প্রণয়নের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এর ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে কোন্ প্রকার তথ্য কার কাছে মূল্যবান ও ফলপ্রসূ বলে পরিগণিত হতে পারে, সে বিষয়ে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও ভালভাবে ওয়াকিবহাল হওয়া যাবে। তারপরে প্রকৃত প্রয়োজনানুযায়ী সেই সম্পদকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যাবে।

বিভিন্ন দেশের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি সম্প্রতি এই পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন। এই কার্যসূচী রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি আগামী মে মাসে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

ঐ উপগ্রহ প্রচুর পরিমাণ তথ্য পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবে। এই সকল তথ্যের সদ্ব্যবহারের উপরেই যে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে, সে বিষয়ে কমিটির সকল সদস্যই একমত। তাঁদের অভিমত, যে সকল অঞ্চল এই সকল তথ্যকে কার্যক্ষেত্রে রূপ দিবে, তা তাদের কাছে যাতে বোধগম্য হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যুরো অব মিনারেল রিসোর্সেস-এর পৃথিবীর সম্পদ-সন্ধানী কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর নরম্যান ফিশার কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এই তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা না থাকলেও আজ বা কাল, মহাকাশের সীমানা এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের সর্ত নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হতে পারে।

ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর করেন সেক্রেটারী এবং ক্যালিফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর সদস্য ডক্টর হ্যারিসন এস. ব্রাউন তাঁর এই কথার উত্তরে বলেন যে, এই সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানেই নিয়মমাফিক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে তিনি এই প্রশ্নও করেন—কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা আন্তর্জাতিক আইনের প্রকৃত কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? তিনি বলেন যে, আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয় দেশেরই মহাকাশে সামরিক লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। কিন্তু কোন দেশই অন্যের উপগ্রহটিকে গুলিবিদ্ধ করে পৃথিবীতে নামিয়ে আনছেন না। তথাকথিত স্পাই স্যাটেলাইট বা গোয়েন্দা উপগ্রহে এই সকল সম্পদ-সন্ধানী উপগ্রহের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ক্যামেরা ও রিমোট সেন্সার যন্ত্রপাতি থাকে।

এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হলে সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ডজনখানেক পৃথিবীর সম্পদ সম্পর্কে তথ্যকেন্দ্র গড়ে উঠবে এবং এক-একটি কেন্দ্র ঐ বিশেষ এলাকায়, বিশেষ দেশের কাজে লাগবে।

বৈদ্যুতিক গোলক

সোভিয়েট বিজ্ঞান লেখক বি. উমারোভ একটি নিবন্ধে লিখেছেন—বৈদ্যুতিক গোলক প্রকৃতির এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যা শত শত বছর ধরে বিজ্ঞানীদের বিভ্রান্ত করেছে। তাঁদের পরিশ্রম ও উদ্যোগ সত্ত্বেও এই গোলকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আজও সম্ভব হয় নি।

বৈদ্যুতিক গোলকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয় এবং খুব তাড়াতাড়ি অপসৃত হয়। গবেষণাগারে এই বৈদ্যুতিক গোলক সৃষ্টির প্রচেষ্টা আজো সফল হয় নি। এই কথা সত্য যে, একবার সোভিয়েট বিজ্ঞানী জি. বাবোভের প্রচেষ্টায় আকস্মিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলকের অনুরূপ একটা কিছুর সৃষ্টি হয়েছিল। গবেষণার সময় ইলেকট্রোডের মধ্যে যখন তীব্র টান বৃদ্ধি পেল, তখন প্রকাণ্ড একটা উজ্জ্বল আলোর গোলক সশব্দে জ্বলে উঠলো।

অতীতে এবং বর্তমানে আমাদের দেশের শত শত বিজ্ঞানী এই বিদ্যুতের গবেষণায় ব্যাপৃত

ছিলেন এবং এখনো আছেন। তাঁদের মধ্যে এম. এ. লেভ্রেন্তিয়েভ এবং পি. এল. কাপিৎসার মত বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরাও আছেন।

বিজ্ঞানীরা অনেক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন। সব তত্ত্বেরই যুক্তি আছে, কিন্তু কোন অনুমানই ভ্রান্তির অতীত নয়। কারো কারো মতে, এটা হলো একটা ঘনীভূত প্লাজ্‌মা, বহুদিন ধরে যা সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের দ্বারা পুষ্ট।

এই মতবাদের বিরোধীরা বলেন যে, সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ফলে এই শিখা জ্বলে উঠে রাসায়নিক উপাদানগুলি দগ্ধ হয়। আরেকটা অনুমানও আছে—সাধারণ বিদ্যুৎ স্ফুরণের ফলেই গোলকের বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়, কিন্তু তার শক্তির উৎস হলো বেতার-তরঙ্গ। কখনো কখনো এক অনুমান অন্য অনুমানকে নাকচ করে এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, এই স্ফুরণ এমন অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করে, যা সোজাসুজি ব্যাখ্যা করা যায় না।

একটা বিদ্যুতের গোলক টেলিভিশন এবং রেডিও বন্ধ করে দেয়। টেলিফোন অকেজো করে দেয়। বাড়ীর দরজায় বিদ্যুৎ-বোতাম টিপে দেয়। তারা বাগদাদের চোরের মত নিপুণভাবে আংটি এবং চুড়ি খুলে নেয়। আসলে তারা তুলে নেয় না, বরং এক পলকে সেই ধাতুকে উবিয়ে দেয়—যাতে তার এতটুকু চিহ্নও থাকে না।

কি করে এসবের ব্যাখ্যা করা যায়? এই রকম একটা মত আছে যে, বৈদ্যুতিক গোলকে দুটি উপাদান আছে। বহিরাবরণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় এবং একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। গোলকের মধ্যে একটি গভীর শূন্যতা আছে এবং সর্বদাই এটা প্রচণ্ড শক্তির দ্বারা বিদীর্ণ হয়। ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক শক্তিগুলি গোলকটিকে চূর্ণ করতে চেষ্টা করে, আর বায়ুর চাপ তাকে চাপ দিয়ে ঠেলে রাখে। এই বিদ্যুতের আয়ু নির্ভর করে ভারসাম্যের স্থায়িত্বের উপর। এজন্যে বোধ হয় গোলকটি আংটি এবং চুড়ির ব্যাপারে উদাসীন নয়। পলকের মধ্যেই ধাতব দ্রব্যে তা অভূতপূর্ব তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। বড় বড় জিনিষ উবিয়ে দেবার পক্ষে এই শক্তিই যথেষ্ট।

অসামান্য গোলকটির এটাই হলো বহুমুখী, রহস্যজনক এবং সম্ভাবনাপূর্ণ রূপ। দিনের পর দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তাঁরা বৈদ্যুতিক গোলকের জন্ম-রহস্য সম্পর্কে বিশদভাবে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং এই শক্তিকে আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এই বিপুল উপহারকে সংহত করে আমরা হয়তো শক্তির এক অভূতপূর্ব উৎসের সন্ধান পাব।

রঙের অনুভূতি

যোগেন দেবনাথ*

লাল, নীল, হলদে, সবুজ—প্রকৃতি জোড়া এমনি রঙের ছড়াছড়ি। রঙীন দুনিয়ার বিপুল বৈচিত্র্যে একাত্মভাবে মিশে আছে সৌন্দর্যের যাদুকাঠি। এই বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের বেদীমূলে রয়েছে যে বর্ণ বা রং, বাস্তব জগতে তার যথার্থ অস্তিত্ব সত্যই আছে কিনা এবং থাকলে তার সত্যকার স্বরূপ কি, জানা নিতান্তই প্রয়োজন। কেন না, কীট-পতঙ্গের কাছে এর কোন মূল্যবোধই নেই—দুনিয়াটা তাদের কাছে সাদামাটা। মানুষ সমেত যেসব প্রাণী বিশেষ ধরণের সংজ্ঞাবহ ও বিশ্লেষণধর্মী অঙ্গের অধিকারী, শুধুমাত্র তাদের কাছেই রঙের মূল্যবোধ রয়েছে। তারা দৃশ্য আলোর বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে যেমন প্রভেদ-রেখা টানতে পারে, তেমনি পারে আলোর তীব্রতাকে পৃথক করতে। বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো মানুষের চোখে অবস্থানকারী রেটিনার গ্রাহককোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তার ব্যাপ্তিও ভিন্ন। দুটি বর্ণকে একই মনে হবে যদি তারা গ্রাহককোষে একই ভাবে সমপরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। লাল ফুল থেকে ফিরে আসা আলো (620-700 $m\mu$) রেটিনার গ্রাহককোষে যদি সবুজ ফুল থেকে ফিরে আসা আলোর (500-570$m\mu$) সমান উত্তেজনা জাগাতে সক্ষম হয়, তবে লাল ফুলকে সবুজ বলেই মনে হবে। একইভাবে 580$m\mu$ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো চোখে পড়ে যেমন হলদে রঙের অনুভূতি জাগায়, তেমনি লাল ও সবুজের সংমিশ্রণও একই অনুভূতি জাগাতে পারে। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, প্রতিটি বর্ণালী-রং গ্রাহককোষে যে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং যার জন্যে বিশেষ অনুভূতি জাগ্রত হয়, পরিবর্তিত পরিবেশে পড়ে তারও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ, তীব্র লাল আলোতে মিনিট কয়েক তাকাবার পর কেউ যদি হলদে রঙের দিকে তাকায়, তাহলে হলদে রংকে তার সবুজ বলেই অনুভূত হবে।

প্রধানতঃ তিনটি জিনিষের উপর রঙের অনুভূতি নির্ভর করে। যথা বর্ণ (লাল, নীল ইত্যাদি), বর্ণের তীব্রতা (উজ্জ্বলতার পরিমাপ) এবং বর্ণের সম্পৃক্তি। বর্ণের বিশুদ্ধতা বলতে যা বোঝায় সম্পৃক্তি অনেকটা সেরকমই। অবশ্য অন্যভাবেও এর সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সমান উজ্জ্বল এবং বর্ণহীন ধূসর থেকে একটি নির্দিষ্ট বর্ণের পার্থক্য কতটুকু, পরিমাণগতভাবে সে-টুকুই তার সম্পৃক্তি। দু-ভাবে এই সম্পৃক্তির পরিমাপ করা চলে। সাদা আলোতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্ণকে মিশিয়ে মিশিয়ে সাদা থেকে তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রঙে নিয়ে আসা অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্ণে সাদা আলোকে মিশিয়ে মিশিয়ে একইভাবে তাকে সাদার সঙ্গে ন্যূনতম বোধগম্য করে তোলা। মূল বর্ণ ও সাদার মধ্যে ন্যূনতম এই প্রভেদরেখা টানতে যে আঙ্কিক পদক্ষেপের প্রয়োজন, তাকেই সেই বর্ণের সম্পৃক্তির মাপকাঠি স্থির করা হয়েছে। 1নং চিত্রে তারই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সাদা থেকে শুধুমাত্র একটি বোধগম্য ধাপে বর্ণের যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তাই দেখানো হয়েছে A-রেখার মারফত (অক্ষ ডানপাশে)। F, বর্ণালী রঙের প্রবাহ এবং Fw, সাদা আলোর প্রবাহ। বর্ণালী রং ও সাদা আলোর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে B-রেখার মাধ্যমে (অক্ষ বামপাশে)।

* শরীরবৃত্ত বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে বর্ণালীরঙের সম্পৃক্তি দারুণ ভাবে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রান্তসীমায় যেমন বেগুনী ও লালের তীব্র সম্পৃক্তি ঘটেছে, তেমনি নিতান্ত অসম্পৃক্তি ঘটেছে হলদে ও সবুজের বেলায়। সাধারণভাবে বর্ণালী আলোর সংমিশ্রণে যেসব রঙের উৎপত্তি ঘটে, মূল রং থেকে তাদের সম্পৃক্তি কম হয়।

গোটা বর্ণালী চোখে পড়ে যে প্রক্রিয়ায় সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সাদা আলোর অনুভূতি জাগাতে পারে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ হলদে ($\lambda = 80m\mu$) ও নীল ($\lambda = 479m\mu$) আলোর সংমিশ্রণ। এভাবে হলদে
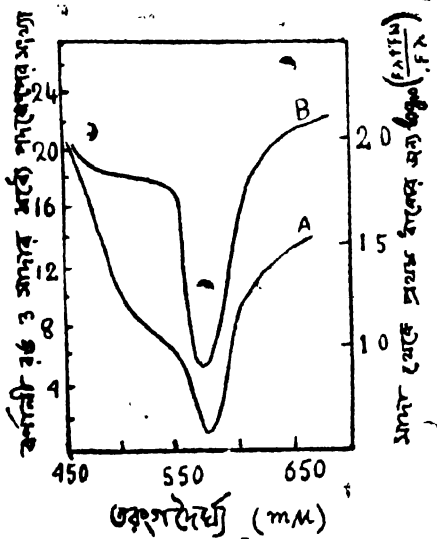
1নং চিত্র

ও নীল আলো থেকে সাদা আলোর পুনর্গঠন পরিপূরক বর্ণের অনুক্রমের একটি উদাহরণ মাত্র। বর্ণালীর বিশেষ তিনটি রংকে (লাল, হলদে ও সবুজ) মিশিয়ে মিশিয়ে এভাবে সাদা আলোর পুনর্গঠন সম্ভব। এছাড়াও আলোর এমনি অসংখ্য তরঙ্গযুগল রয়েছে, যাদের নির্ভুল সংমিশ্রণে সাদা আলোর প্রাপ্তিযোগ ঘটে। 1নং তালিকায় তারই কিছু নমুনা তুলে ধরা হয়েছে।

1নং তালিকা

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (mμ)	সাদার পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় শক্তির লগ
700	2·20
492	0·70
650	0·81
492	0·71
600	0·30
489	0·68
580	0·495
479	0·586
570	0·720
450	0·430
568·5	0·77
410	1·398

গোটা বর্ণালী বা সাদা আলো রেটিনার অবস্থানকারী গ্রাহককোষে যেভাবে উদ্দীপনা জাগায় এইসব জোড়া তরঙ্গের আলোও একই ভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সাদা আলোর অনুভূতি জাগায়।

বর্ণালী রং শারীর-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও কম উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এদের যখন তখন ও নির্দিষ্ট উত্তেজক হিসাবে যেমন ব্যবহার করা চলে, তেমনি সহজে সংমিশ্রণ করাও সম্ভব। এছাড়া অন্যসব বর্ণের সীমারেখা নিরূপণের প্রারম্ভিক ক্রমহিসাবেও এদের ব্যবহার করা চলে। তবে বর্ণের অনুভূতির বুনিয়াদ খুঁজতে গিয়ে একসময়—বৈজ্ঞানিকেরা আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে চোখের রেটিনায় অবস্থানকারী গ্রাহককোষে উৎপন্ন

স্নায়ুউত্তেজনার বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে গ্র্যানিট ও তাঁর সহকর্মীদের নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁরা নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোর পছন্দসই অভিযোজনের সাহায্যে এবং আরও নানা পরীক্ষা থেকে দেখেছেন অনেক স্নায়ুতন্তুর প্রতিক্রিয়া আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যেসব স্নায়ুতন্তু থেকে এধরণের পরিবর্তনসূচক খবরাখবর জোগাড় করা সম্ভব, তাদেরকে—সুর আন্দোলক বা মডুলেটর বলা হয়। সত্যই এরা খুব গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ এদের ভিতরকার পরিবর্তন রেটিনায় অবস্থানকারী এমনসব পদার্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্রুততালে পরিবর্তিত হয়, যখন চোখে এসেপড়া আলোক তরঙ্গের পরিবর্তন ঘটে। এসব পদার্থই আসলে বর্ণের পৃথকীকরণে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য তাদের কাজের বিশদ ব্যাখ্যা এখনও প্রশ্নাতীত নয়। ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীর রেটিনার সীমাবদ্ধ পরিধিকে ব্যবহার করে রকমারি মডুলেটর রেখা পাওয়া গেছে। কারো কারো মতে এধরণের রেখার উৎপত্তি বিভিন্ন কারণসঞ্জাত হতে পারে। সরাসরি গ্রাহককোষ অথবা রেটিনার বিভিন্ন অংশের কোষের মধ্যে ক্রিয়াবিক্রিয়াও এদের উৎপত্তির কারণ হতে পারে।

1807 সালে থোম্যাস রঙের অনুভূতির ত্রিবর্ণ-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেন। এরপর হেম্‌হোজ অপরিমেয় গবেষণার সাহায্যে তাঁর ত্রিবর্ণ মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তার বিকাশ ঘটান। বর্ণালী বহির্ভূত রং-সমেত সবরকমের রংকে শুধুমাত্র তিনটি প্রাথমিক উদ্দীপক বা বর্ণালীর তিনটি পরিচ্ছন্ন তরঙ্গ বিস্তারের (নীল, সবুজ ও লাল) ব্যবহারে এবং তাদের বিভিন্ন সমানুপাতিক সংমিশ্রণে লাভ করা সম্ভব। এই বিশেষ প্রাথমিক তিনটির প্রতিটির তীব্রতার একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে, যাদের যথাযথ সংমিশ্রণে সঠিক বর্ণ, তার উজ্জ্বলতা ও সম্পৃক্তির প্রকাশ ঘটে। যে কোন বর্ণকে নীচের সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। যেমন—

$$aC = xB + yG + zR$$

এখানে a যেমন C বর্ণের উজ্জ্বলতার পরিমাপ, তেমনি x, y ও z যথাক্রমে নীল, সবুজ ও লালের উজ্জ্বলতার মাপকাঠি। এই সূত্রকে ব্যবহার করে যে কোন একপ্রস্ত প্রাথমিককে প্রকাশ করা চলে। যেমন—

$$aC = x_1B' + y_1G' + zR'$$

এই সূত্রটি তাই প্রতিটি বর্ণের বেলায়ই প্রযোজ্য—বর্ণটি বর্ণালীর অন্তর্ভুক্ত কিনা—এ প্রশ্ন তখন অবান্তর। দ্বিতীয়প্রস্ত প্রাথমিকের (B', G' এবং R') প্রত্যেকটিকে যদি প্রথমপ্রস্থ উদ্দীপকের মানদণ্ডে বিচার করা হয়, তবে অতি সহজেই একপ্রস্থ উদ্দীপককে অন্যপ্রস্থে রূপান্তরিত করা চলে। যথা—

$$x_1B' = p\,B + q\,G + r\,R$$
$$y_1G' = P_1B + q_1G + r_1R$$
$$z\,R' = P_2B + q_2G + r_2R$$

এবং aC-কে এই তিনের সমষ্টি হিসাবে ধরা যায়।

দুই বা ততোধিক আলোর সংমিশ্রণ থেকে উৎপন্ন মিশ্র আলোর উজ্জ্বলতা পৃথক পৃথক উদ্দীপকের উজ্জ্বলতার সমষ্টির সমান। ac_1 একটি বর্ণ এবং bc_2 যদি অপর আর একটি বর্ণ হয়, তবে তাদের প্রত্যেককেই আগের মত প্রকাশ করা চলে। যথা—

$$aC_1 = x_1B + y_1G + zR$$
$$aC_2 = x_2B + y_2G + zR$$

এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নবজাত যে বর্ণের প্রকাশ সম্ভব, তাকেও একইভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন, $C_3 = ac_1 + bc_2$। এই নবজাত মিশ্র আলোর উজ্জ্বলতা a+b এবং, সম্পূর্ণ সমী-করণটির চেহারা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—

$$(a+b)C_3=(x_1^-+x_2)B+(y_1^-+y_2)G+(z_1+z_2)R$$

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনটি প্রাথমিক বা মুখ্য বর্ণের উজ্জ্বলতার পরিমাণের সাহায্যে যেমন কোন বর্ণকে প্রকাশ করা চলে, তেমনি বর্ণালী রঙের সংমিশ্রণ ঘটালে তাদের উপাদানগুলির উজ্জ্বলতাকেও সবরকম ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সংযোজন করা যায়। আলোচিত দুটি ফলাফলই মূলতঃ রকমারি বর্ণের মাপকাঠি এবং তাদের নির্দিষ্টকরণের মুখ্য নির্দেশক।

তিনটির (650mμ, 530mμ এবং 460mμ) সহায়তায় যদি বর্ণালী রংকে একে একে ম্যাচ করানো যায়, তা হলে প্রথমতঃ সাদার সঙ্গে তাদের মানানসই পরিমাপকে একক হিসাবে গণ্য করা যাবে এবং একে ভিত্তি করেই অন্যসব রঙকে বিচার করা চলবে। 2নং ছবিটি এইসব ফলাফলের ভিত্তিতেই পাওয়া গেছে। y-অক্ষে তিনটি প্রাথমিকের যে অনুপাত দেওয়া আছে, তাদের সঠিক সংমিশ্রণে যে কোন বর্ণের উৎপত্তি সম্ভব। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বর্ণালীর নীল অংশে
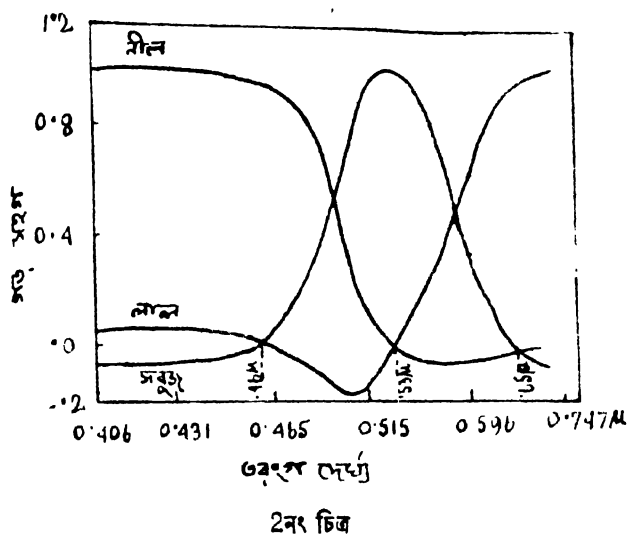
2নং চিত্র

প্রাথমিক উদ্দীপক তিনটির জুতসই এককের বিচারও নানাভাবে করা হয়েছে। বর্ণালীর এই মুখ্য বর্ণ তিনটিকে যদি এমনভাবে বাছাই করা হয়, যাতে তাদের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার সংমিশ্রণ সাদা রঙের প্রকাশ ঘটায়, তা হলে সাদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই প্রাথমিক তিনটির নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা যথাক্রমে লাল, নীল ও সবুজ উদ্দীপকের একক বলে পরিলক্ষিত হতে পারে। এই শর্ত মেনে নিলে হরেক-রকম বর্ণকেই এই এককের সাহায্যে প্রকাশ করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ মুখ্য উদ্দীপক সবুজ উদ্দীপক না-ধর্মী। সবুজ অংশে লাল উদ্দীপককে মানানসই বা ম্যাচিং ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে হয়েছে।

অন্যান্য এককের সন্তোষজনক ব্যবহারও পাওয়া গেছে। সেসব ক্ষেত্রে পরিমাণগতভাবে লাল ও সবুজকে মিশিয়ে হলুদের সঙ্গে অথবা নীল ও সবুজকে মিশিয়ে নীলাভ সবুজের সঙ্গে ম্যাচ করানো হয়েছে।

2নং ছবির সংখ্যাগুলিকে যদি উজ্জ্বলতার মাপকাঠিতে অর্থাৎ নীল, সবুজ ও লাল বিকিরণের

অবিমিশ্র পরিমাণের আওতায় নিয়ে আসা হয়, তবে বর্ণালী রঙের সঙ্গে ম্যাচিং-এর সম্পর্ককে 3নং ছবির সাহায্যে চিত্রিত করা চলে। নীল উদ্দীপকের উজ্জ্বলতার মাত্রা খুবই কম বলে তাকে 10 দিয়ে গুণ করা হয়েছে। রং ও রঙের সম্পৃক্তির উপর নীল উদ্দীপকের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, কিন্তু উজ্জ্বলতার উপর তার কার্যকরী ক্ষমতা খুবই কম।

2নং ছবিতে সহগগুলিকে একের ভগ্নাংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 4নং ছবিতে তারই করা যেতে পারে। এই চার্টের উপর ভিত্তি করেই যার গোড়া পত্তন হয়েছে। চার্টের অবস্থান দেখে যে কোন বর্ণকে নির্দিষ্টকরণ সম্ভবপর। 0·33,0·33 বিন্দুর দ্বারা সাদা বিন্দুর অবস্থান জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই বিন্দু থেকে বর্ণালীর সঞ্চার-পথের দিকে রঙের সম্পৃক্তি ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে।

রঙের এই বৈচিত্র্যের শারীরতাত্ত্বিক মূল্যায়নে আবার ফিরে আসা যাক। চোখের রেটিনায় অবস্থানকারী রড ও কোণ গ্রাহককোষের

3নং চিত্র
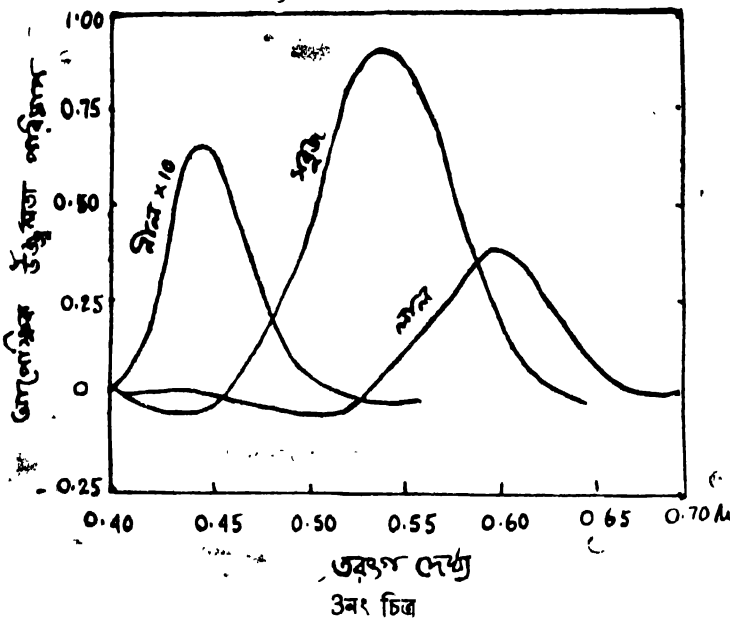
প্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবে। এখানে বর্ণালীর লাল ও সবুজের সহগকে [R ও G] পরস্পরের বিপরীতে রাখা হয়েছে। এক থেকে অন্যদের বাদ দিলে নীলের সহগের সন্ধান পাওয়া সম্ভব [যেহেতু R+G+B=1]। এই ছবিটি যথার্থই কৌতুহলোদ্দীপক, কেননা অনেক নির্দিষ্ট মানের বর্ণ তালিকায় এ হলো একটি ভিত্তিস্বরূপ। উদাহরণ হিসাবে সি. আই. ই বা Commission Internationale d' Eclairage-এর নাম উল্লেখ মধ্যে রঙের অনুভূতির জন্যে কোণ গ্রাহককোষই দায়ী। রেটিনার যে অংশে এই কোণ গ্রাহক-কোষের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী বা যে অংশ পুরোপুরি রড গ্রাহককোষমুক্ত (ফভিয়া কেন্দ্র), তার উপর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো ফেলে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষা থেকে জানা গেছে দু-রকমের কোণ গ্রাহককোষের অস্তিত্ব সেখানে রয়েছে এবং এরাই মূলতঃ রঙের অনুভূতির জন্যে দায়ী। বিশেষ করে এদের প্রত্যেকের অভ্যন্তরে

পৃথক পৃথক যে রাসায়নিক পদার্থ বর্তমান, তারাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশীদার। এরকম একটা ইঙ্গিত আগেও দেওয়া হয়েছে, যা মডুলেটর স্নায়ুতন্ত্র থেকে পাওয়া গেছে। এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের (ক্লোরোল্যাব ও ইরীথ্রোল্যাব ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গ্রাহককোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, স্নায়ুতন্ত্র মারফত তাই মস্তিষ্কে পরিচালিত হয় এবং রঙের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এক ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষ যখন অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে; অর্থাৎ ক্লোরোল্যাব যখন ইরীথ্রোল্যাবের উপর প্রাধান্য লাভ করে তখন নীল-সবুজের অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিপরীত হলে কমলালেবুর রঙ বা লালের অনুভূতি জাগে। তবে ফভিয়া কেন্দ্রের অনুভূতির ব্যাপার স্বাভাবিকভাবে রঙের অনুভূতির পদ্ধতি থেকে খানিকটা পৃথক। অবশ্য তার কারণও রয়েছে যথেষ্ট। ফভিয়া কেন্দ্রের রড্ গ্রাহককোষমুক্ত এলাকা যেমন খুবই কম (30′ ব্যাসযুক্ত এলাকা), তেমনি পরীক্ষার সময় সেই অংশকে স্থিতিশীল করে রাখতে হয়। অন্যদিকে স্বাভাবিক রঙের অনুভূতি ঘটে থাকে রেটিনার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। চোখ ইচ্ছামত যে কোন দিকে ঘোরাফিরা করে রেটিনার যে কোন অংশকে কাজে লাগাতে পারে। এই পরিস্থিতিতে হেমহোজের ত্রিবর্ণ মতবাদের বক্তব্যই বেশী জোরদার হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যে প্রাথমিক বর্ণ তিনটির বিভিন্ন বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ধর্মী তিন ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বের কথা এই মতবাদে স্বীকার করা হয়। এই তিন ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষই রঙের অনুভূতির জন্যে দায়ী। যেমন, নীল কোণ্ গ্রাহককোষ স্পষ্টভাবেই বর্ণালীর ক্ষুদ্র প্রান্তের আলোক সম্পাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বর্ণালীর মধ্য অংশের আলোক সম্পাতেও এরা খানিকটা প্রতিক্রিয়াশীল, তবে দীর্ঘ তরঙ্গের আলোতে এরা নিষ্ক্রিয়। সবুজ কোণ্ গ্রাহককোষ সাধারণ-

4নং চিত্র

ভাবেই বর্ণালীর মধ্য অংশের আলোয় সাড়া দেয়। লাল কোণ্ গ্রাহককোষও একইভাবে দীর্ঘ তরঙ্গের আলোতে ক্রিয়াশীল।

তবে মজার ব্যাপার হলো এ অবধি দু-প্রকার কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বের মূল্যায়ণ করা গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্বকে নিয়েই বেঁধেছে যত রকম ঝামেলা। এ রকম কোণ্ গ্রাহককোষের কোন সন্ধান রেটিনাতে পাওয়া যায় নি। তাই এদের প্রতিকল্প হিসাবে তৃতীয় প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ বর্ণালীর নীল প্রান্তের সঙ্গে জড়িত। এজন্যে একে নীল প্রক্রিয়া বলে অভিবহিত করা হয়েছে। ম্যার্ক ও তাঁর সহকর্মীরা অবশ্য কোণ্ গ্রাহককোষের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার নির্ভরশীলতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। তবে তাঁদের বক্তব্যকে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হন নি। কারণ দেখা গেছে নীল প্রক্রিয়ার মধ্যে এমন সব ধর্মের সমাবেশ রয়েছে, যাদের সঙ্গে জানাশুনা কোন কোণ্ গ্রাহককোষের ধর্মের মিল নেই। এ ব্যাপারে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে। ত্রিবর্ণ ভিত্তিক ম্যাচিং সব সময় সঠিক নাও হতে পারে, কারণ তারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। দেখা গেছে উজ্জ্বলতার মাত্রা পরিবর্তনকালে ত্রিবর্ণ ভিত্তিক ম্যাচিং বিনষ্ট হয়ে যায়।

স্টাইল নীল অনুভূতির সঙ্গে জড়িত নীল প্রক্রিয়াটিকে একটি জটিল প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। একে তিনি π_1, π_2 এবং π_3 এই তিনটি প্রক্রিয়াতে বিশ্লিষ্ট করেছেন। সবুজ ও লাল প্রক্রিয়া তার মতে π_4 এবং π_5। তিনের বদলে এই পাঁচটি প্রক্রিয়ার আবির্ভাব নিশ্চিতভাবে নূতনত্বের দাবীদার। তবে এদের গুরুত্ব কতটুকু এখনও তা সঠিকভাবে নির্ণীত ও স্বীকৃত হয় নি। ধাপে ধাপে রঙের সংমিশ্রণে নবজাত রঙের অনুভূতির যে প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে, তার সঙ্গে π_1 (নীল প্রক্রিয়া) π_4 (সবুজ প্রক্রিয়া) এবং π_5 (লাল প্রক্রিয়া)-এর সাদৃশ্য খুবই বেশী। কভিয়া কেন্দ্র থেকে পরীক্ষালব্ধ যে রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তার সঙ্গে π_4 ও π_5 প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠতাও খুব বেশী। অতএব কভিয়া কেন্দ্রে দু-ধরণের কোণ্ গ্রাহককোষের অস্তিত্বকে কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না।

এই মুহূর্তে আরও একটা বিষয় নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। বর্ণালীরঙ গ্রাহককোষে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সব গ্রাহককোষে তার পরিমাণ সমান নয়। এই মুখ্য উত্তেজনার অন্তর ফলের মূল্যায়ণ করে পাঠাতে পারে রেটিনায় অবস্থানকারী অন্যান্য স্নায়ুকোষ। এই কোষগুলির অনুভূতির প্রারম্ভিক মাত্রা নিশ্চিত ভাবে গ্রাহককোষ থেকে পৃথক হবে। 5নং ছবিতে এ রকমই একটি সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। উত্তেজনা সরাসরি C এবং E পথে
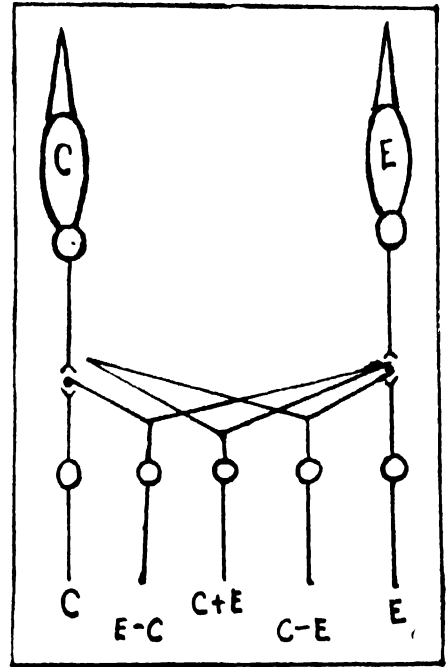
5নং চিত্র

এদিকে যেতে পারে, আবার একত্রে C+E পথে (উজ্জ্বলতার পরিমাণ হিসাবে) এগোতে পারে। বিকল্প হিসাবে, C−F (নীলাভ সবুজের মাপকাঠি) ও E−C (কমলা-লালের মাপকাঠি) পথে উত্তেজনা পরিবাহিত হতে পারে। রেটিনাতে এই ধরণের স্নায়ুকোষের অস্তিত্ব সম্ভবপর। এরা কোন একপ্রকার গ্রাহককোষের দ্বারা যেমন উত্তেজিত হবে, তেমনি অন্যদের দ্বারা বাঁধা পাবে।

হেরিং আবার রেটিনায় অবস্থানকারী বিশেষ তিনটি ফটো-রাসায়নিক দ্রব্যের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই ফটো-রসায়নগুলির বিশ্লেষণ ও পুনর্সংশ্লেষণের উপর রঙের অনুভূতি জড়িত। তার বক্তব্যটা অবশ্য ইয়ং হেল্মহোল্জের ত্রিবর্ণ মতবাদেরই সামান্য রূপান্তর। এই ফটো-রসায়ন তিনটির প্রকৃতি এমনই যে, এরা ছয়টি বিভিন্ন বর্ণের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। নীচে এই মতবাদের নমুনা তুলে দেওয়া হলো।

ফটো-রাসায়নিক পদার্থ	রেটিনায় কার্যপ্রণালী	অনুভূতি
সাদা-কালো	বিশ্লেষণ	সাদা
	পুনর্সংশ্লেষণ	কালো
লাল-সবুজ	বিশ্লেষণ	লাল
	পুনর্সংশ্লেষণ	সবুজ
হলদে-নীল	বিশ্লেষণ	হলদে
	পুনর্সংশ্লেষণ	নীল

এই মতবাদ স্বীকার করলে পরিপূরক বর্ণ তাদের নির্দিষ্ট প্রাথমিক বর্ণের বিরোধী হয়ে পড়ে। তাছাড়া এটি নির্দিষ্ট স্নায়ুশক্তির কথাও স্বীকার করে না, এর মূল বক্তব্য একই স্নায়ুতন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পরিবহন করতে পারে।

উপসংহারে বলা চলে, বর্ণালী-রঙ তাদের নির্দিষ্ট উজ্জ্বলতা ও সম্পৃক্তি নিয়ে রেটিনায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তার চরম বিচার হয় গুরু-মস্তিষ্কে—বিশেষ করে গুরুমস্তিষ্কের অক্সিপিটাল অংশে। এই অংশটি রঙের অনুভূতির পীঠস্থান। দেখা গেছে এই অংশের ক্ষতিসাধন করলে কোণ্ গ্রাহককোষের কাজকর্ম যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি রঙের অনুভূতিও বিনষ্ট হয়। পরিপূরক রঙের বিশ্লেষণও এই একই অংশে সম্পন্ন হয়।

সৌর ধ্রুবক

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত সার্বজনীন, সেই সব অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও তাদের আদান-প্রদানের উপায় হলো বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের নানা বিভাগে আবার নানা প্রকার ধ্রুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাদের প্রাধান্য ও গুরুত্ব সমগ্র বিজ্ঞান-জগতে পরিলক্ষিত হয়। সৌর বিজ্ঞানে এমনি একটি ধ্রুবক হলো সৌর ধ্রুবক (Solar Constant।)

সূর্য প্রতিনিয়ত তার চতুর্দিকে শক্তি বিকিরণ করে চলেছে, যার সামান্য মাত্র অংশ (22,00 × 10⁶ ভাগের একভাগ মাত্র) আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আবার সূর্যের শক্তির এই ভগ্নাংশের বেশ কিছু অংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলকণা, তুষারকণা ও মেঘ থেকে প্রতিফলিত এবং ধূলিকণা ও বায়ুকণার দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়। তাছাড়া

* পদার্থবিদ্যাবিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

দিনের নানা ভাগে ও বছরের নানা ঋতুতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই শক্তির শতকরা কুড়ি থেকে চল্লিশ ভাগ শোষণ করে নেয়। তাই পৃথিবীতে বসে সূর্য থেকে আসা প্রকৃত শক্তির মাত্রা নিরূপণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। ফলে খোঁজ করতে হয় একটি ধ্রুবক পরিমাপকের। এই পরিমাপকটি হলো সৌর ধ্রুবক। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্বে রাখা একটি একক ক্ষেত্রফলের কালো বস্তু (যা সকল তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণ শোষণ করে) এক মিনিটে লম্বভাবে আপতিত যে পরিমাণ সৌর শক্তি গ্রহণ করে, তাকে সৌর ধ্রুবক বলা হয়। এখানে অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, বায়ুমণ্ডলে কোন প্রকারে সৌর শক্তি নষ্ট হচ্ছে না কিংবা বলা যায় বায়ুমণ্ডলের উপস্থিতিই নেই। সৌর ধ্রুবক জেনে সূর্যের আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা এবং সৌর বিকিরণের পরিমাণ সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যায়।
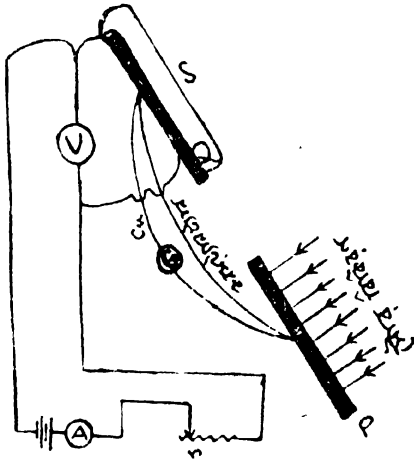
অ্যাংষ্ট্রমের পাইর্‌হেলিওমিটার।

P ও Q-দুটি একই মাপের ধাতব কালো পাত। P পাতে সৌর বিকিরণ লম্বভাবে পড়ছে। Q পাতটি S পর্দার দ্বারা ঢাকা, যাতে পাতটির উপর কোন সৌর বিকিরণ না পড়তে পারে। (Cu-কনষ্ট্যানট্যান) একটি থার্মোকাপ্‌ল্‌। G-গ্যালভানোমিটার, V-ভোল্টামিটার, A-অ্যাম্মিটার, r-পরিবর্তনীয় রোধ, P পাত যতটা শক্তি গ্রহণ করে, তা Q পাতের সঙ্গে তড়িৎ-বর্তনী ব্যবহার করে মাপা হয়।

সৌর ধ্রুবক নানা উপায়ে নির্ধারণ করা যায়। যে সব যন্ত্র দিয়ে সৌর ধ্রুবক নির্ধারণ করা হয়, সেগুলির নাম পাইর্‌হেলিওমিটার (Pyrheliometer) বা অ্যাক্টিনোমিটার (Actinometer)। একটি কালো বস্তুর উপর সৌর বিকিরণ লম্বভাবে ফেলা হয় এবং নানা উপায়ে তার পরিমাপ করা হয়। কালো বস্তুটি তার একক ক্ষেত্রে এক মিনিটে যে পরিমাণ সৌর শক্তি গ্রহণ করে, সেটাই হয় সৌর ধ্রুবকের মান। এখানে একটি সহজ পাইর্‌হেলিওমিটারের চিত্র দেওয়া হলো। বেশ উঁচু জায়গায়, খুব ভাল আবহাওয়ায় পরীক্ষা করা ভাল। কারণ এর ফলে সৌর শক্তির প্রতিফলন, বিচ্ছুরণ, বিশোষণ প্রভৃতি বেশ কম হয়। পরীক্ষালব্ধ সৌর ধ্রুবকের মানকে অবশ্য বায়ুমণ্ডলের বিচ্ছুরণ, বিশোষণ প্রভৃতির জন্যে সংশোধন করে প্রকৃত সৌর ধ্রুবকের মান গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরে থেকেও সৌর ধ্রুবক নির্ণয় করা যেতে পারে। 1902 সাল থেকে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে মাপা সৌর ধ্রুবকের গড় মান হলো;

1902 সাল থেকে 1912 সাল পর্যন্ত—1·933 ক্যালরি, প্রতি বঃ সে.মিটারে, প্রতি মিনিটে।

এবং 1912 সাল থেকে 1920 সাল পর্যন্ত—1·946 ক্যালরি প্রতি বঃ সে.মিটারে প্রতি মিনিটে।

যদি শক্তির একক ক্যালরিতে না প্রকাশ করে আর্গে প্রকাশ করা হয়, তাহলে সৌর ধ্রুবকের মান দাঁড়ায় $1{\cdot}36\times10^{6}$ আর্গ প্রতি বঃ সে. মিটারে, প্রতি সেকেণ্ডে এবং এথেকেই সূর্য থেকে মোট বিকিরণের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে $3{\cdot}86\times10^{33}$ আর্গ।

আগে মনে করা হতো যে, সূর্য থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ সব সময় সমান ও অর্থাৎ সৌর

শক্তির বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই। সুতরাং সংজ্ঞা অনুযায়ী সৌর ধ্রুবকের মানও নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 1954 সাল থেকে 1959 সাল পর্যন্ত সূর্যের ঔজ্জ্বল্য শতকরা দু-ভাগ বেড়ে গেছে। ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের দ্বারা প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির বর্ণালীর নীল অংশের সঙ্গে কাছাকাছি ষোলটি নক্ষত্রের প্রত্যক্ষ আলোর তুলনা করে এই ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির পরিমাণ পাওয়া গেছে। তাই বলা যেতে পারে যে, সৌর ধ্রুবকের মানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাছাড়াও দেখা যায় যে, সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে সৌর ধ্রুবকের মানও পরিবর্তিত হয়। সূর্যে কলঙ্ক দেখা দিলে সূর্য থেকে বিকিরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানী অ্যাংষ্ট্রম (Ångström) সৌর ধ্রুবকের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। সম্পর্কটি হলো, $S = 1.903 + 0.011\sqrt{N} - 0.0006N$. S—সৌর ধ্রুবকের মান, N—একটি গুণাঙ্ক, যা সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও পরিমাপের গুণ বা প্রকৃতি প্রকাশ করে।

সূর্যে শক্তির পরিমাণ অসাধারণ। যদি সমগ্র সূর্যকে চল্লিশ ফুট গভীরতাবিশিষ্ট বরফের দ্বারা আবৃত করা যায়, তবে তা সূর্যের তাপে এক মিনিটেই সম্পূর্ণ গলে জল হয়ে যাবে। কিংবা যদি দু-মাইল ব্যাস নিয়ে পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত (93,000,000 মাইল) কোন বরফের সেতু নির্মাণ করা যায় এবং কোন উপায়ে যদি সমগ্র সৌর শক্তি তার উপর ফেলা যায়, তাহলে এক সেকেণ্ডের মধ্যেই সমগ্র বরফ সেতু গলে যাবে এবং আট সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত বরফগলা জল বাষ্পে পরিণত হবে। এই উদাহরণ দুটি সৌর শক্তির প্রচণ্ডতার প্রমাণ দেয়।

এখন দেখা যাক যদি সৌর ধ্রুবকের মান পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ সৌর বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের কি প্রকার পরিবর্তন ঘটে। যদি সৌর ধ্রুবকের মান বাড়ে অর্থাৎ সূর্যে বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তাহলে এই বিকিরণ বৃদ্ধির দরুণ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে বাষ্পীভবন বেশী হবে, আকাশে আরও বেশী মেঘ জমা হবে, সমতলে বৃষ্টিপাত ও পর্বতগাত্রে তুষার-পাত বৃদ্ধি পাবে। অধিক তুষার জমা হবার ফলে পর্বতগাত্র থেকে তুষার-ধ্বস নামবে এবং তা সমতলের দিকে হিমবাহ বা তুষার-নদীর আকারে নামতে থাকবে। এমনি করে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক চতুর্থাংশ বরফাচ্ছাদিত হয়ে যাবে। চারদিকে হিমশীতলতা বিরাজ করবে। আরম্ভ হবে তুষার যুগ (Ice age), যাকে ভূতত্ত্ববিদেরা Pleistocene Epoch বলেন। তুষার যুগে পৃথিবীর স্থলভাগে, বিশেষ করে মেরুপ্রদেশে বেশী বরফ জমা হবার ফলে সমুদ্রে জলের পরিমাণ কমে যাবে এবং সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু যদি সূর্যের বিকিরণমাত্রা ক্রমশঃ আরও বাড়তে থাকে তখন পৃথিবী আরও বেশী উত্তপ্ত হবে। ফলে সমস্ত বরফ গলতে সুরু করবে এবং চারদিকের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে, তুষার যুগের অবসান হবে—সুরু হবে আন্তঃতুষার যুগ (Inter-Glacial Period)। সৌর বিকিরণের চরম অবস্থায় অর্থাৎ আন্তঃতুষার যুগের শেষের দিকে সমগ্র পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যাকে বলা হয় বর্ষণমুখর কাল বা Pluvial period। সমুদ্র ও হ্রদে জলস্ফীতি দেখা দেবে, যার ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি জলপ্লাবিত হয়ে যাবে।

সৌর বিকিরণ চরম অবস্থায় পৌঁছুবার পর আবার কমতে সুরু করবে, ফলে পৃথিবীতে আবার বরফ জমতে আরম্ভ করবে, তুষার নদী বইতে সুরু করবে এবং সৃষ্টি হবে দ্বিতীয় তুষার যুগের। সৌর বিকিরণ কমতে কমতে এবার অবম অবস্থায় পৌঁছায়। পৃথিবী এই অবস্থায় বেশ শীতল, সুতরাং বাষ্পীভবন প্রায়ই হবে না—ফলে তুষারপাত নাম-মাত্র ঘটবে। তুষারপাত না হবার ফলে ধীরে

ধীরে তুষারনদী বা হিমবাহের মৃত্যু ঘটবে। আবার দেখা দেবে আন্তঃতুষার যুগ। তাহলে দেখা গেল যে, সৌর বিকিরণের একটি সম্পূর্ণ চক্রে পৃথিবীতে দুটি তুষার যুগ ও দুটি আন্তঃতুষার যুগের সৃষ্টি হবে। ডক্টর সিম্পশন এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অবশ্য অতীতে সৌর ধ্রুবকের মানের বেশ পরিবর্তন হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানীদের মতে, অতীতে বা বর্তমানে সৌর বিকিরণের পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় নি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—বর্তমানকালে Dr. Ewing এবং Dr. A. T. Wilson তুষার যুগ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন, যা অনেক বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন। তবে তাঁদের উভয়ের মতে, বর্তমানে আমরা আন্তঃতুষার যুগে বাস করছি। সামনে তুষার যুগ আসছে।

তবে বিজ্ঞানী Hoyle ও Littleton দেখিয়েছেন যে, সূর্যের পরিক্রমার পথে যদি কোনদিন একটা বিস্তৃত মহাজাগতিক কণাপুঞ্জ পড়ে, তাহলে কণাগুলি সূর্যের অভ্যন্তরে আছড়ে পড়বে, ফলে কণাগুলির গতিশক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে সমগ্র সূর্যের বিকিরণমাত্রা বাড়িয়ে দেবে। এরূপ বিস্তৃত মহাজাগতিক কণা-পুঞ্জের কেন্দ্রস্থলের ঘনত্ব বেশী, সুতরাং স্বভাবতঃই প্রথমে সৌর বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পেতে একবার চরম অবস্থায় আসবে এবং তারপর কমতে সুরু করবে। অবশ্য এরূপ একটি মহাজাগতিক কণাপুঞ্জ পার হতে সময় লাগবে প্রায় এক লক্ষ বছর। এভাবে যদি কোন দিন সৌর বিকিরণের মাত্রা বা সৌর ধ্রুবকের মানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে, তাহলে ভবিষ্যতে সিম্পসনের তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীতে তুষার যুগও নামতে পারে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

রকেট-টর্চ

একটি দ্রুত ধাবমান মোটর গাড়ী রাস্তার পাশে ধাক্কা খেয়ে একেবারে উল্টে গেল এবং গাড়ীটির দরজা এমনভাবে আটকে গেল যে, আরোহীদের আর কিছুতেই বের করে আনা সম্ভব হলো না। দরজা ভেঙ্গে বা কেটে তাদের যে বের করে আনা হবে, এমন কোন যন্ত্রপাতিও তখন কারো সঙ্গে ছিল না। এমন সময়ে একটি যুবক একটি রকেট-টর্চ হাতে নিয়ে দৌড়ে এলো। ঐ অদ্ভুত ধরণের টর্চের রিং টানামাত্র সেটি জ্বলে উঠলো। তারপর ঐ ভাঙ্গা গাড়ীর যে অংশ কেটে আরোহীদের বের করে আনতে হবে, সেই অংশের উপর আলো ফেলে সেই অংশটি অতি দ্রুত কেটে নিয়ে আরোহীদের বের করে আনা হলো। আরোহীরা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলেন।

এটি ছিল একটি সাজানো ঘটনা। ঐ অভিনব টর্চটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই ঐ দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। গাড়ীটির গতি ও চলা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল একটি কেন্দ্র বা রিমোট কণ্ট্রোল সেণ্টার থেকে, আর যাত্রীরা ছিল সাজানো পুতুল।

এই রকেট-টর্চটির দৈর্ঘ্য 17.5 ইঞ্চি, ব্যাস 2.5 ইঞ্চি এবং ওজন 6.75 পাউণ্ড। অফুরন্ত এর প্রাণশক্তি এতে ব্যাটারি বদলাবার বা রিচার্জ করবার কোন প্রশ্ন নেই। এর তীব্র রশ্মিতে প্রায় সব ধাতুই গলে যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যানফ্রানসিসকোস্থিত ইউনাইটেড এয়ারক্র্যাফ্ট.

কর্পোরেশনের একটি শাখা ইউনাইটেড টেক্‌নোলোজী সেণ্টার কর্তৃক এই অভিনব যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। রকেটকে এতকাল কোন বস্তুকে সামনের দিকে চালিয়ে নেবার জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। রকেটের এই ধরণের ব্যবহার এই প্রথম।

অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য নানা দুর্ঘটনার সময়ে বিপন্ন ব্যক্তিদের যথাকালে উদ্ধার করতে না পারায় প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। দুর্ঘটনার পর যথাসময়ে উদ্ধার করতে না পারায় রক্তক্ষরণও বহু ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। এই অভিনব যন্ত্রটির সাহায্যে তাদের অতি শীঘ্রই উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ট্রেনে, বিমানে, মোটর গাড়ীতে পুলিশের গাড়ীতে, অ্যাম্বুল্যান্স গাড়ীতে এই যন্ত্রটি রাখা যেতে পারে। ভবিষ্যতে কৃষি, শিল্প ও বনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্র প্রয়োগের বিপুল সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারবহনের ক্ষমতা নির্ধারক বৃহত্তম যন্ত্র

পাহাড়ী পথের পুল তৈরি করবার লোহার তারের, সমতল ভূমিতে বড় বড় নদীর উপর পুল নির্মাণের সাজসরঞ্জামের এবং বাড়ী তৈরির কড়িবরগার ভার বহনের ক্ষমতা পরীক্ষা করবার একটি অভিনব যন্ত্র সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ভারবহন পরীক্ষণ যন্ত্র। এই যন্ত্রটির 1 কোটি 20 লক্ষ পাউণ্ডের চাপশক্তির সাহায্যে কড়িবরগা প্রভৃতির বহন ক্ষমতা এবং 60 লক্ষ পাউণ্ড শক্তির সাহায্যে কোন তারের টান সইবার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যায়। কোন বৃহৎ ভবনের অংশ বিশেষের ভার বহনের ক্ষমতাও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

এই যন্ত্রটির উচ্চতা 101 ফুট। ওয়াশিংটনের মেরীল্যাণ্ডের গেথারবার্গস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব স্ট্যাণ্ডার্ডসের একতলায় এজন্য নির্মিত একটি বিশেষ ভবনে—এই যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে।

রোলিং মিলের সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ভারী বস্তু ওজন করা, তাদের মান ও পরিমাণ নির্ণয় এবং রকেট ইঞ্জিনের চাপের পরিমাণ নির্ণয়ও এই যন্ত্রের সাহায্যে করা যাবে। যেমন স্যাটার্ন রকেট 5-এর সাহায্যেই মার্কিন মহাকাশচারীরা চাঁদে যাচ্ছেন। পৃথিবী থেকে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রার সময়ে এই রকেট 75 লক্ষ পাউণ্ডের চাপ সৃষ্টি করে থাকে।

সমুদ্রগর্ভে খননকার্যের জন্যে বিরাট লম্বা লম্বা লৌহদণ্ডের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ঐ সকল দণ্ড বাঁকাতে হয়। কি পরিমাণ চাপে ঐ সকল দণ্ড বাঁকানো যেতে পারে, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেতে পারে। তাছাড়া জলে কোন জাহাজ ও আকাশে কোন রকমের বিমান কি পরিমাণ চাপ সইতে পারে, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণীত হতে পারে।

এই যন্ত্রটির নামকরণ করা হয়েছে জেন্টেল জায়েণ্ট বা নম্রস্বভাবের একটি দৈত্য। দেখতে যেমন বিরাট, শক্তিও এর প্রচণ্ড। একটি ডিমের চাপ সইবার ক্ষমতা যে কতটুকু, তাও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জানা যেতে পারে।

পেনসিলভ্যানিয়ার গ্রোভসিটির উইলম্যান মেশিন কোম্পানী এই যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন। আর তৈরি করেন, ওহায়োর সালেমস্থিত ই ডাব্লিউ ব্লিস কোম্পানী। ওহায়োর ক্লীভল্যাণ্ডস্থিত ম্যাকডোয়েল ওয়েলম্যান কোম্পানী যন্ত্রাংশ একত্রিত করে এর পূর্ণরূপ দিয়েছেন।

শব্দ, তাপ, শৈত্যনিরোধক জানালা

পেনসিলভ্যানিয়ার পিটস্‌বার্গস্থিত পি পি জি ইণ্ডাষ্ট্রিজের গ্লাস রিসার্চ লেবরেটরী নূতন এক ধরণের জানালা তৈরি করেছেন। এই জানালা শব্দ, তাপ, আর্দ্রতা, শৈত্য ও বায়ু নিরোধক।

কাচের এই জানালাটির একটি পাট এক ইঞ্চির আট ভাগের তিন ভাগ, আর একটি পাট এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ পুরু। ঐ দুটি পাটের মাঝখানে দু-ইঞ্চি ফাঁক রাখা হয় এবং বাইরের আলো ও তাপ ঘরের ভিতরে প্রতিফলনের জন্যে ঐ শূন্যস্থানে একটি পাত্‌লা ফিল্ম এঁটে দেওয়া হয়। এই ফিল্মের নাম 'সোলারব্যান 500'। ফিল্মের বেধ কমিয়ে বা বাড়িয়ে প্রয়োজনানুযায়ী আলো ও তাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। বর্তমানে দু-রকমের জানালা তৈরি করা হচ্ছে। এক প্রকার জানালা দিয়ে বাইরের আলোর শতকরা 42 ভাগ এবং আর এক প্রকার জানালা দিয়ে শতকরা 36 ভাগ আলো ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে ঘর ঠাণ্ডা থাকে, ঘরের ভিতরে যারা থাকেন, তারা কড়া রৌদ্র ও তাপে পীড়িত হন না। ঐ ধরণের জানালা যে কোন আকারের পাওয়া যায়।

টেলিভিসনের মাধ্যমে বৃহৎ এলাকায় পাহারার ব্যবস্থা

রাস্তাঘাটে, বৃহৎ বিপণন কেন্দ্রে, বিরাট এলাকায় টেলিভিসনের মাধ্যমে পাহারার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আমেরিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মিশিগ্যানের ট্রেনটনস্থিত মোটর উৎপাদন সংস্থা ক্রাইজলার কর্পোরেশনের 3000 মোটর গাড়ী রাখবার স্থানে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

এই ব্যবস্থায় একজন পাহারাদার টেলিভিসন পর্দার সামনে বসে থাকেন। এটি ক্লোজ্‌ড্‌ সার্কিট টেলিভিসন ব্যবস্থা। ঐ ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক তারযোগে সঙ্কেত বাহিত হয় এবং তাতে মাত্র সুনির্দিষ্ট কয়েক স্থানে সেই সকল সঙ্কেত ও সংবাদ পরিবহনের ব্যবস্থা থাকে। ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ পাহারাদার দিনে এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ স্থানের এবং রাত্রিতে প্রায় আধ মাইল এলাকার উপর নজর রাখতে পারেন। ঐ ব্যবস্থায় বহু দূর থেকে টেলিভিসন ক্যামেরাটির সাহায্যে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে ছবি তোলা যাবে এবং এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ক্যামেরাটিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে ঘোরানো যাবে। পুরা এলাকার বা চারদিকের ছবি যাতে তোলা যায়, সেই ভাবেও এই ক্যামেরাটিকে স্থাপন করা যাবে। তাছাড়া একটি সুইচ্‌ টিপে একটি ছবিকে দশ গুণ বড় করবার এবং আর একটি টিপে টেপ রেকর্ড করবার ব্যবস্থাও সেখানে থাকবে।

আবর্জনাকে নানা উপকরণে রূপান্তরিত করবার উদ্যোগ

ফেলে দেওয়া নানা উপকরণ ও ময়লাকে পুনরায় কি ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং পরিবেশকে মালিন্যমুক্ত রাখা যেতে পারে সে বিষয়ে আমেরিকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নিউইয়র্ক শহরের ময়লা অপসারণের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। মিঃ চার্লস ম্যাকালুসো ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। তিনি ময়লা নিষ্কাশন এবং ময়লাকে অন্য জিনিষে রূপান্তরিত করবার একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। পুরনো বড় বড় মোটর গাড়ী ঐ যন্ত্রে ফেলবার পর দেখা যায় গাড়ীর কাচসমূহ আলাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারপর ধাতব পদার্থ ও কাচ গলিয়ে নূতন নূতন পদার্থ তৈরি করা হচ্ছে। ছোট ছোট কৌটা প্রভৃতি সবই এর মধ্যে ফেলা হয়। যে সব উপাদান ছাইয়ে পরিণত হয়, সেই সব ছাই বাড়ী বা রাস্তা তৈরির মালমশলা হিসাবে কাজে ব্যবহৃত হয়। আর কোন কোন আবর্জনাকে জীবাণুমুক্ত করবার পর ইন্ধন বা জমিতে সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। আবর্জনা পুড়িয়ে কারখানা চালাবার জন্যে বাষ্পশক্তি উৎপাদনের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কৃত্রিম রেশম

তুহিনেন্দু সিন্‌হা*

রেশম একটি অত্যন্ত মূল্যবান পদার্থ। রেশমের তৈরী জামাকাপড় অনেকেরই প্রিয় এবং আভিজাত্যের নিদর্শনও বটে। কিন্তু এখনকার দিনে বাজারে যে সব রেশমের জামা-কাপড় দেখা যায়, তার মধ্যে অধিকাংশ মোটেই আসল রেশমে তৈরি নয়। আসল রেশম প্রাকৃতিক (Natural fibre) তন্তু আর কৃত্রিম রেশম হলো পুনর্গঠিত তন্তু (Regenerated fibre)। পুনর্গঠিত তন্তু বলা হয় সেই সব তন্তুকে, যার জটিল অণুকে কৃত্রিমভাবে (Synthetically) প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে সেই জটিল অণু সংগ্রহ করে পুনরায় তন্তুর আকারে রূপদান করা হয়।

দৃশ্যত: আসল রেশম ও কৃত্রিম রেশমের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আবার রাসায়নিক গঠন-তত্ত্বের দিক থেকে এই কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে গুটিপোকার আসল রেশমের কোনও মিল নেই। আসল রেশম হলো গুটিপোকার দেহনিঃসৃত একরকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যার গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। কিন্তু কৃত্রিম রেশম তৈরি হয় সেলুলোজ অণুর সাহায্যে, যার গঠনে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে, কিন্তু নাইট্রোজেন থাকে না। সেলুলোজ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার। সেলুলোজ হলো একটি জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ, প্রকৃতির রসায়নে যা উৎপন্ন হয় উদ্ভিদের দেহে। উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রেই প্রধানতঃ সেলুলোজের দ্বারা গঠিত। কাঠের তন্তু, নানা রকম উদ্ভিজ্জের আঁশ, তুলা প্রভৃতির মুখ্য উপাদান হলো সেলুলোজ।

রাসায়নিক গঠনতত্ত্বের দিক থেকে কৃত্রিম রেশমকে বলা হয় পুনর্গঠিত সেলুলোজ তন্তু (Regenerated Cellulosic fibre)। আর আসল রেশমকে বলা হয় প্রোটিন তন্তু (Protein fibre)।

রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই কৃত্রিম রেশম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোথাও এর নাম গ্লান্‌স্ (Glanse), কোথাও লাস্ট্রন (Lustron), আবার কোথাও বলে কেমিকেল সিল্ক (Chemical silk)। কৃত্রিম রেশম শিল্পে আমেরিকাই সবচেয়ে অগ্রসর, আর সে দেশের কৃত্রিম রেশম রেয়ন নামে পরিচিত। আমাদের দেশে আমেরিকার রেয়ন সিল্কের প্রচলনই বেশী।

সাধারণতঃ আমরা বাজারে যে রেয়নের জামা-কাপড় দেখতে পাই, তাদের উৎপাদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(1) ভিস্‌কস রেয়ন (Viscose rayon), (2) কিউপ্রামোনিয়াম (Cup ammonium rayon), (3) অ্যাসিটেট রেয়ন (Acetate rayon)। কিন্তু তাদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্মের কোনও পার্থক্য নাই। এই তিন প্রকার রেয়নের মধ্যে ভিস্‌কস রেয়নই বাজারের রেয়ন, তথা কৃত্রিম রেশম। কাজেই এস্থলে ভিস্‌কস রেয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

ভিস্‌কস রেয়ন

বৃটিশ বিজ্ঞানী E. J. Bevan এবং C. E.

* কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজী,
শ্রীরামপুর

Cross যুগ্মভাবে এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। ভিস্‌কস রেয়ন প্রস্তুতি এখানে আটটি বিভিন্ন ধাপে বর্ণনা করা হবে।

কাঁচামাল থেকে সেলুলোজ নিষ্কাশন ও ব্লিচিং

ভিসকস রেয়ন তৈরির জন্যে কাঁচামাল হিসাবে সাধারণতঃ সাধারণ কাঠ ও সময়ে সময়ে কোনও সূতা মিলের পরিত্যক্ত তুলা (Cotton linters) ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কাঠ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ক্যালসিয়াম বাইসালফাইটের মধ্যে ডুবানো হয় এবং পরে বাষ্পের সাহায্যে অতিরিক্ত বায়ুর চাপে চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত সেদ্ধ করা হয়। এর ফলে সেলুলোজের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু কাঠের মধ্যে অবস্থিত অন্যান্য বস্তুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এবার ঐ পাত্রের মধ্যে অতিরিক্ত জল দিয়ে লঘু করে পরিস্রুত করলে কাঠের মণ্ড জলের উপর ভেসে ওঠে। ঐ কাঠের মণ্ডকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দিয়ে ব্লিচিং করা হয় এবং পরে তাকে চাদরের আকার দেওয়া হয়। এই চাদরকে বলা হয় কাঠের মণ্ড, এর মধ্যে 90-94% সেলুলোজ থাকে।

স্টিপিং এবং প্রেসিং

এবার ঐ চাদরগুলিকে খাড়াভাবে একটি বিশেষ ধরণের পাত্রের মধ্যে রেখে তার মধ্যে 17.5% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ ঢালা হয়। চাদরগুলিকে ঐ দ্রবণের মধ্যে 1-4 ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা হয়, ফলে সরু চাদরগুলি ফুলে ওঠে এবং কাঠের মধ্যে অবস্থিত হেমিসেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে যায়। এর জন্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের রং বাদামী হয়। এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে সেলুলোজ বিক্রিয়া করে এবং সোডা সেলুলোজ তৈরী হয়।

শ্রেডিং (Shredding)

এই পদ্ধতিতে সোডা-সেলুলোজের চাদরগুলিকে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের মেশিনে (Shredding machine) সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করা হয়।

এজিং

এই এজিং একটি বিশেষ ধরণের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে চাপ ও তাপমাত্রা পরিবর্তনের ব্যবস্থা আছে। এখন 22°C তাপমাত্রায় 2-3 দিন ঐ পাত্রের মধ্যে সোডা সেলুলোজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চূর্ণগুলি রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে সেলুলোজের অণুর লম্বা শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছোট ছোট সেলুলোজ অণু শৃঙ্খল (Short chain molecule) হয়ে যায়।

মন্থন বা জেন্থেশন

(Churning Or Xanthation)

এবার সোডা সেলুলোজের চূর্ণগুলিকে কার্বন ডাই সালফাইডের সঙ্গে মিশিয়ে 20-25°C তাপমাত্রায় 3-4 ঘণ্টা ধরে একটি মন্থন পাত্রের মধ্যে রেখে পাত্রটিকে আস্তে আস্তে ঘুরানো হয়। এর ফলে কার্বন ডাই সালফাইডের মধ্যে সোডা সেলুলোজ দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেট তৈরি হয়। সাধারণতঃ সমগ্র সোডা সেলুলোজের ওজনের 10% কার্বন ডাই সালফাইড মেশানো হয়।

মিশ্রণ

এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেটকে 6.5% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যে 4-5 ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে সোডিয়াম সেলুলোজ জেন্থেট দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং পরিষ্কার করে ঘন বাদামী বর্ণের তরল পদার্থ তৈরি করা হয়। এই বাদামী বর্ণের তরল পদার্থকেই ভিস্‌কস বলে। এই ভিস্‌কসের মধ্যে প্রায় 7.5% সেলুলোজ বর্তমান থাকে।

রাইপেনিং

এই পদ্ধতিতে ভিস্কস দ্রবণকে 10-18°C তাপমাত্রায় 4-5 দিন রেখে দেওয়া হয়। এই সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে-যাওয়া ছোট ছোট শৃঙ্খল অণুগুলি আবার জোড়া লাগতে আরম্ভ করে এবং শেষে আবার আগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্তুর স্থায়িত্ব অনেকটা এই পদ্ধতির গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল। এখন দ্রবণটি ভিস্কস রেয়ন তন্তু তৈরির উপযুক্ত।

স্পিনিং

এবার ঐ ভিস্কস দ্রবণকে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র-বিশিষ্ট পাত্রের মধ্যে নিয়ে পাম্পের সাহায্যে চাপ দিয়ে দ্রবণের সূক্ষ্ম ধারাপ্রবাহ চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাইরের একটা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের জলীয় দ্রবণের মধ্যে। এই দ্রবণে থাকে সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম সালফেট, জিঙ্ক সালফেট ও গ্লুকোজ। এই সব রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়ায় ভিস্কস সূত্রগুলি জমে আবার সেলুলোজ তন্তুর আকার ধারণ করে।

এই পুনর্গঠিত সেলুলোজের চেহারা হয় অবিকল আসল রেশমের মত চক্চকে উজ্জ্বল। আবার কোনও কোনও সময়ে ভিস্কস রেয়ন আসল রেশমের থেকেও চক্চকে হয়। ভিস্কস রেয়নের এই অতিরিক্ত চাকচিক্য ও চমক কমিয়ে আসল রেশমের অনুরূপ করবার রাসায়নিক উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে এবং এরূপ অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ভিস্কস রেয়ন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরূপ চাকচিক্য ও চমক কমাবার জন্যে মিশ্রণের সময় সামান্য পরিমাণ টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়।

কৃত্রিম রেশমের সঙ্গে আসল রেশমের গুণগত দিক থেকে তুলনা করা চলে না। আসল রেশমের তুলনায় এর স্থায়িত্ব অনেক কম। আসল রেশম ঘন ক্ষারের মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার অ্যাসিডের মধ্যে এর স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। তাহলেও এই যুগে কৃত্রিম রেশমের বিরাট শিল্প বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে, আর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড এরূপ রাসায়নিক রেশম সূত্রের সুদৃশ্য বস্ত্রাদি উৎপাদিত হয়ে আধুনিক মানুষের রুচি ও সৌখিনতা বাড়িয়েছে। ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যে আসল রেশমের মত, অথচ দামে সস্তা এসব নকল সিল্কের কেবল সুদৃশ্য শাড়িই নয়, এ দিয়ে তৈরী বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, মোজা, রুমাল প্রভৃতি এই যুগে বিশেষ জনপ্রিয়। আবার তুলা বা পশমের আঁশের সঙ্গে এই কৃত্রিম রেশম সূত্র মিশিয়ে ও পাকিয়ে এক রকম মিশ্র সূতা তৈরী হয়, যা দিয়ে নানা রকম কাপড় বোনা হয়। এই কাপড় অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য ও ব্যবহারোপযোগী হয়ে থাকে।

অ্যাসবেস্টস

অমলকান্তি ঘোষ

অ্যাসবেস্টস আঁশযুক্ত একপ্রকার খনিজ পদার্থ। এই আঁশগুলি আলাদা করে পাক দিয়ে সুতা তৈরি করে বোনবার কাজে ব্যবহার করা যায়। অ্যাসবেস্টস তাপসহ ও অদাহ্য পদার্থ।

অ্যাসবেস্টস ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট বলে পরিচিত। দুই জাতীয় অ্যাসবেস্টস আছে; যথা—

1. ক্রিজোটাইল বা সারপেন্টাইন অ্যাসবেস্টস। এটি একপ্রকার জলযুক্ত ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট।

2. অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টস। এটি জলযুক্ত লৌহ ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। অ্যাম্ফিবোলের মধ্যে পড়ে অ্যানথোফাইলাইট, অ্যামোসাইট, ক্রোসিডোলাইট, ট্রিমোলাইট ও অ্যাক্টিনোলাইট।

ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায় সারপেন্টিটাইট নামক আগ্নেয় শিলায়। এই অ্যাসবেস্টস শিলার মধ্যে শিরার ন্যায় সঞ্চিত থাকে। শিরার ভিতর অ্যাসবেস্টসের আঁশগুলি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত থাকে। এর আঁশগুলি ছোট, শক্ত এবং বোনবার কাজের উপযোগী। অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টস সিস্ট নামক একপ্রকার পরিবর্তিত শিলার মধ্যে থাকে। এর আঁশগুলি শিরার সমান্তরাল ও দীর্ঘ হলেও ভঙ্গুর হবার ফলে বোনবার কাজের অনুপযোগী।

খনি থেকে অ্যাসবেস্টস চাপড়ার আকারে পাওয়া যায় - দেখতে কতকটা পাটের গোড়ার মত আঁশের গুচ্ছ। রং সাদা, সবুজ বা বাদামী, প্রায় শণ বা রেশমের মত চকচকে। আঁশগুলি সহজে পৃথক করা যায়। আঁশের দৈর্ঘ্য, সূক্ষ্মতা, নমনীয়তা, টান সহ্য করবার ক্ষমতা, তাপ ও বিদ্যুৎ সহনক্ষমতা, অ্যাসিডে অদ্রবণীয়তা ও বয়নকার্যে উপযোগিতার উপর অ্যাসবেস্টসের উৎকর্ষ ও মূল্য নির্ভর করে। উপরিউক্ত গুণগুলি থাকবার ফলে অ্যাসবেস্টস শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ক্রিজোটাইল ও অ্যাম্ফিবোল অ্যাসবেস্টসের মধ্যে ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টসই শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর অ্যাসবেস্টসের 90%ই ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস।

অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই জানতো এবং নানা কাজে তা ব্যবহার করতো। প্রাচীন চীন ও মিশর দেশের লোকেরা যে অ্যাসবেস্টসের তৈরি কাপড় ও মাদুর ব্যবহার করতো, তার প্রমাণ আছে। রোমানরা অ্যাসবেস্টস দিয়ে শবাচ্ছাদানী ও টেবিলের ঢাকনা তৈরি করত। অভিজাত ব্যক্তি ও রাজাদের মৃতদেহ অ্যাসবেস্টসের তৈরী বস্ত্র জড়িয়ে সমাধিস্থ করা হতো। প্রাচীন রোমে দেবদেবীর পূজায় নিয়োজিত কুমারীরা যে পবিত্র প্রদীপ বহন করতো, তার পলতে অ্যাসবেস্টস দিয়ে তৈরি হতো। অ্যাসবেস্টসের তৈরি পলতে কখনও পুড়ে যায় না, ফলে আগুনের শিখাও অনির্বাণ থাকতো।

পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাতার সাম্রাজ্যে অ্যাসবেস্টসের সন্ধান পান। তিনি এর সন্ধান পেয়েই চুপ করে বসে থাকেন নি। শিলা থেকে কেমন করে অ্যাসবেস্টস নিষ্কাশন করা যায় এবং তা দিয়ে কেমন করে কাপড় বোনা যায়, সেই কৌশল আয়ত্ত করেন। সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় তিনি আকরিক অ্যাসবেস্টস আবিষ্কার করেন। তিনি সেগুলি শুকিয়ে খলের মত একটি পাত্রের মধ্যে

গুঁড়া করেন এবং আকরিকের ময়লাগুলি পরিষ্কার করে ফেলেন। তারপর সেই অ্যাসবেস্টস দিয়ে কাপড় বোনবার ব্যবস্থা করেন। মার্কো পোলোর পর বহু বছর পর্যন্ত অ্যাসবেস্টস সম্বন্ধে বেশী কিছু শোনা যায় নি। এর অনেক বছর পর রাশিয়ার উরাল পর্বতশ্রেণীতে অ্যাসবেস্টস পাওয়া যায় এবং সেখানে অ্যাসবেস্টসশিল্পের পত্তন হয়। বর্তমান শতকের অ্যাসবেস্টসশিল্পের গোড়াপত্তন হয় 1868 সালে, যখন ইটালীতে 200 টন অ্যাসবেস্টস উৎপন্ন হয়। এরপর পৃথিবীর নানা দেশে অ্যাসবেস্টসশিল্প গড়ে উঠতে থাকে এবং বহু লোক এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা অর্জনে ব্যাপৃত হয়।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাসবেস্টস উৎপাদনের স্থান ক্যানাডার অন্তর্গত দক্ষিণ কুইবেক। পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অ্যাসবেস্টস এখানে উৎপন্ন হয়। এরপর সোভিয়েট রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মেলন, দক্ষিণ রোডেসিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, সাইপ্রাস ও ইটালী। ভারতে পাওয়া যায় অন্ধ্র প্রদেশের কাডাপ্পা জেলায়, বিহারের সিংভূম ও উড়িষ্যার সারাইকেলা এবং মাইশোরে।

খনি থেকে আকরিক অ্যাসবেস্টস বের করবার জন্যে বায়ুচালিত ড্রিল, ছেনি-হাতুড়ী এবং বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। আকরিক অ্যাসবেস্টস খনি থেকে তুলে নিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়া করে আঁশগুলি আলাদা করে ফেলা হয়। এর ভিতর যে সব পাথর এবং ভাঙ্গা রকড্রিল থাকে, সেগুলি বের করে দেবার জন্যে সেণ্টিফিউগ্যাল সেপারেটর (Centrifugal Separator) ও বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এইবার এই অ্যাসবেস্টসকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়:

1. লম্বা আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস ($\frac{3}{4}$" বা তার চেয়ে বড়), যা বোনবার জন্যে কাজে লাগবে।

2. এর চেয়ে ছোট আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস, যা দিয়ে মিলবোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

3. একদম শেষে যে গুঁড়া পড়ে থাকে, সেগুলি ব্যবহৃত হয় সিমেণ্ট, পেণ্ট এবং বয়লার ও পাইপ আচ্ছাদনের জন্যে।

আকরিক ক্রিজোটাইল অ্যাসবেস্টস

অ্যাসবেস্টসের লম্বা আঁশগুলি পাক দিয়ে এক আঁশযুক্ত কিংবা বহু আঁশযুক্ত সুতা তৈরি করে চাদর, দড়ি ও ফিতা প্রস্তুত হয়। তাপসহ ও অদাহ্য বলে অ্যাসবেস্টসের চাদর দিয়ে তৈরি পোষাক ও দস্তানা পরে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মী, লোহা ঢালাই বা সেলুলয়েড কারখানার শ্রমিকেরা আগুনের তাপের মধ্যেও নিরাপদে কাজ করতে পারে। চকচকে অ্যাসবেস্টসের আঁশ দিয়ে তাপোজ্জ্বল ম্যান্টেল তৈরি হয়। ব্রেক ও ক্লাচ লাইনিং তৈরি হয় অ্যাসবেস্টসের সঙ্গে সরু পিতলের তার দিয়ে মজবুত করে বুনে। অ্যাসবেস্টসের তৈরি বেল্ট কনভেয়র গরম জিনিষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়। বাষ্পের পাইপের ফ্লান্‌জে যে প্যাকিং বা গ্যাসকেট ব্যবহার করা হয়, তাতে অ্যাসবেস্টস ও রবার থাকে। অনেক সময় এই জয়েন্টি'কে শক্ত করবার জন্যে পিতলের সরু তারের উপর বোনা অ্যাসবেস্টসের কাপড় ব্যবহার করা হয়। গরম জলের পাইপ কিংবা বয়লারের তাপের বিকিরণে যে তাপশক্তি ক্ষয় হয়, তা রোধ করবার জন্যে অ্যাসবেস্টসের দড়ি দিয়ে পাইপ বা বয়লারের গা মুড়ে দেওয়া হয় এবং তার উপর অ্যাসবেস্টসের চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ছোট আঁশওয়ালা অ্যাসবেস্টস দিয়ে মিলবোর্ড, অ্যাসবেস্টস কাগজ প্রস্তুত হয়। অ্যাসফ্যাল্ট, বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাস্টিক পদার্থ এবং রঙে অ্যাসবেস্টসের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসবেস্টসের বিদ্যুৎ সহনক্ষমতা থাকায় বৈদ্যুতিক সরু কিংবা মোটা তার, সুইচ-বোর্ড এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অ্যাসবেস্টস বিদ্যুৎ-প্রতিরোধকের কাজ করে। কোন কোন জাতীয় অ্যাসবেস্টস অ্যাসিডের সংস্পর্শে নষ্ট হয় না। এগুলি অ্যাসিড ছাঁকবার কাজে লাগে।

অ্যাসবেস্টসের সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শিল্পে। সিমেন্ট ও অন্যান্য জমাট বাঁধবার উপকরণের সঙ্গে ছোট আঁশযুক্ত অ্যাসবেস্টস (শতকরা 15-20) ভাগ মিশিয়ে পাইপ, টালি, শ্লেটের মত সমতল ও ঢেউ তোলা সিট তৈরি হয়। এই সিটগুলি গৃহনির্মাণে গ্যালভানাইজ্‌ড্ সিটের বদলে খুব চলে। এই সিট বেশী তাতে না, মরচে পড়েও নষ্ট হয় না। ভারতে অ্যাসবেস্টস-সিমেন্ট শিল্প বেশ ভালভাবেই গড়ে উঠেছে।

সহজে ,
নমনীয়তা, টা

কেপ্‌লার সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা ও প্রশ্ন

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

কেপ্‌লারের চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণে আহূত সভায় কিছু বলবার সুযোগ পাওয়ায় জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ ও ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আদৌ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক না হয়েও কেপ্‌লার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি, কারণ যখন কোনও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর জীবন আমরা স্মরণ করি, তখন আমাদের মনে কিছু চিন্তা ও প্রশ্নের উদয় হয়। কেপ্‌লার সম্বন্ধে সামান্য জেনেও সেই রকম চিন্তা ও প্রশ্ন আমার মনে কিছু আছে। শ্রোতাদের মনেও নিশ্চয় আছে—তবু আমার চিন্তা ও প্রশ্নগুলি শ্রোতাদের কাছে উপস্থিত করবার সুযোগটুকু আমি পেয়ে হারালাম না।

প্রশ্ন ও চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ থাকলাম বলে, সময় সংক্ষেপ করবার জন্যে ও বন্ধুবর সমর সেন মহাশয়ের সঙ্গে যেন কোনও কথার পুনরুক্তি না হয়. সে জন্যে কেপ্‌লার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দিকটা আদৌ বলবো না।

ষোড়শ শতাব্দী বিজ্ঞানের একটি স্মরণীয় শতাব্দী। এই সময় গ্যালিলিওর আবির্ভাব ঘটেছে। এই সময় তথ্য ও পরীক্ষার গুরুত্ব পদার্থবিদ্ তথা সমস্ত বিজ্ঞানীর কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে। এই শতাব্দীরই একটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কেপ্‌লার।

কেপ্‌লার জীবনের প্রারম্ভে ঠিক করেছিলেন ধর্ম সংস্থায় যাবেন, কিন্তু সে সময়কার তাঁদের দেশের ধর্ম সংস্থার সঙ্কীর্ণ সংস্কারহেতু সে পথ ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি বিশেষভাবে গণিত অধ্যয়ন দিয়ে তাঁর জীবন আরম্ভ করেন।

এখানে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সঙ্কীর্ণতা তো মানুষের সর্বক্ষেত্রেই আছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যেই কি সঙ্কীর্ণ সংস্কার নেই? কিন্তু বিজ্ঞানে একা চলা সম্ভব, অন্ততঃ তখন ছিল। একের সঙ্কীর্ণ সংস্কারে সেখানে অন্যের কিছু এসে যায় না। সেই জন্যেই কি কেপ্‌লার বিজ্ঞানের পথ অবলম্বন করেছিলেন?

কেপ্‌লার টাইকোব্রাহীর সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাটান। এই সময়টা তাঁর সুসময় নয়। কিন্তু কিছুদিন পর টাইকোব্রাহীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর সংগৃহীত সমস্ত তথ্য কেপ্‌লার পান। প্রায় এরই সাহায্যে তিনি তাঁর খ্যাত বিধিগুলি আবিষ্কার করেন। ধৈর্যের প্রয়োজন বিজ্ঞানীর জীবনে কতটা, এই ঘটনা থেকে আমরা তা বুঝি।

কেপলারের দীর্ঘদিনের ধৈর্য ও প্রচেষ্টার ফল নিউটন পেয়েছিলেন। ঠিক সেই মতে স্পেকট্রো-স্কোপিস্টদের দীর্ঘদিনের তথ্যানুসন্ধান কণাতম-বিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরমাণুবিদ্যায় কি আমরা সেইভাবে চলেছি? চলছি না এমন কথা আমার বক্তব্য নয়—এই বিষয় চিন্তা করবার আছে, এই আমার বক্তব্য। হয়তো সেদিনের পথ ও আজকের পথ এক হওয়া সম্ভব নয় বা যুক্তিযুক্তও নয়। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকেরা হয়তো এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন।

কেপ্‌লারের অবদানের মধ্যে এমন কিছু বর্তমান, যা অনেক বিজ্ঞানীর কাছে সুস্পষ্ট হলেও সর্বসাধারণের সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। গ্রহের চালচলন লক্ষ্য করে কেপ্‌লার যে কয়টি

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, আই. আই. টি., খড়্গপুর

নিয়ম দেখতে পান, তাকে ব্যবহারিক বিধি বলা যেতে পারে; অর্থাৎ কোনও সম্পূর্ণ তত্ত্ব (Theory) তা নয়। নিউটন সমস্ত বলবিদ্যার পূর্ণ তত্ত্ব জগতের কাছে উপস্থিত করেছিলেন। কেপ্‌লার-কৃত মাত্র দুটি বিধি থেকেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব পাওয়া যেতে পারে। কেপ্‌লারের অন্য বিধিটি থাকায় তত্ত্ব ও ব্যবহারিক বিধি পরস্পরকে সুদৃঢ় করে—সর্বসাধারণের এটাই জানা প্রয়োজন। এই কারণে কেপ্‌লারের দান—এই ধরণের দানের আদর্শ।

[23শে ফেব্রুয়ারী '72 ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অনুষ্ঠিত কেপ্‌লারের চতুর্থ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণ সভায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ।]

কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম অধিবেশন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক অধিবেশন এই বছর (1972) জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আলিগড়ে হবার কথা ছিল। প্রস্তুতিপর্ব সেইভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। হঠাৎ গত ডিসেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ সুরু হওয়ায় সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হলো। তার ফলে জানুয়ারীর গোড়ায় আলিগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রাখতে হয়। যুদ্ধ শেষ হবার পর আলিগড়ে বার্ষিক অধিবেশন আয়োজন করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অধিবেশন আয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসেন। এর আগে কলকাতায় শেষবার অধিবেশন হয়েছিল 1964-65 সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে।

এবারের অধিবেশন হয়েছিল চার দিনব্যাপী 20—23 ফেব্রুয়ারী। 20শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মণ্ডপে বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী ও ভারতের নানা প্রান্ত থেকে আগত প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রাক্-হীরক জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যাবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রহ্মণ্যম। এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন বিশিষ্ট ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানী ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ডাব্লিউ. ডি. ওয়েষ্ট। প্রারম্ভে সমবেত বিজ্ঞানী ও প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্যম তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের সমস্ত সম্পদ ও সুযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে ভারতকে দ্রুত স্বয়ম্ভর করে তুলতে এদেশের সকল বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করে চলবার জন্যে আহ্বান জানান। তিনি বলেন দেশ আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার, সঠিক পরিকল্পনা ও সক্রিয় সমর্থন পেলে দেশ এখন

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং,
কলিকাতা-29

আমাদের অর্থনীতিকে স্বয়ম্ভর করবার জন্যে দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু যতদিন আমরা একটি মজবুত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী ভিত্তি গড়ে তুলতে না পারছি, ততদিন আমরা অনগ্রসরতার আওতামুক্ত হতে পারছি না অথবা অন্যের উপর নির্ভরশীলতা ছাড়তে পারছি না।

উপসংহারে বিজ্ঞানকে লোকরঞ্জক করে তোলবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেন, কিশোর ও তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। আধুনিক প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে হবে।

মূল সভাপতি ডক্টর ওয়েস্ট তাঁর 'ভারতের কল্যাণে ভূতত্ত্ব' সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন: জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশ ভূতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও ভারত এই ব্যাপারে অনেক মন্থর গতিতে কাজ সুরু করেছিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আমাদের দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের দায়িত্ব পড়েছিল ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার উপর। এই বিভাগটির তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল—দেশে কয়লার অনুসন্ধান করা। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের কাজ ব্যাপকতর হয়েছে। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, সোনা এবং খনিজ লবণ সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে কাজ সুরু হলো। তবু বলা চলে, কাজের পরিধির দিক থেকে ভারতে ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগ পৃথিবীর তৃতীয় প্রাচীনতম বিভাগরূপে পরিগণিত হলেও, আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগেও এর আয়তন ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। স্বাধীনতা অর্জনের পর ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ব্যাপকতা অনেকখানি বেড়ে গেছে। পরে অবশ্য ভূতত্ত্ব সমীক্ষার দায়িত্ব অনেকটা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

উপসংহারে ডক্টর ওয়েস্ট বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সব সময় একটা অসন্তোষ ও আত্মসমালোচনার প্রবণতা কাজ করছে। এটা উচিত নয়। এ পর্যন্ত আমরা যা করেছি, তাতে গর্ববোধ করা চলে। আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের দেখা উচিত অগ্রগতি যেন অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে। একমাত্র তা হলেই জনসাধারণের কল্যাণ সাধন ও দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মূল সভাপতির ভাষণের পর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সম্মানীয় সদস্যপদ প্রদান করা হয় জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক টি আর শেষাদ্রিকে।

এরপর বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের পরিচয় করিয়ে দেন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়। এবার বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানী দল এবং তাঁদের নেতা ছিলেন ডক্টর মহম্মদ কুদরত ই-খুদা। এ ছাড়া এই দলে ছিলেন বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর শামসের আলি, ডক্টর ফজলুল হালিম চৌধুরী, ডক্টর এ এইচ পাটওয়ারি, ডক্টর এম এ মহম্মদ হোসেন, ডক্টর আলি নবাব, ডক্টর এম রসিদুল হক, মিঃ ইব্রাহিম হোসেন তালুকদার, মিঃ সিরাজুল ইসলাম, ডক্টর আহমেদ সামসুল ইসলাম, ডক্টর এম আই চৌধুরী, ডক্টর মাজারুল হক, ডক্টর আখতারুজ্জমান এবং ডক্টর ফাতেহ। বুলগেরিয়া থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক কালচো ইভানফ মারকফ; চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ডক্টর ডেনচেক সোবৎকা, ডক্টর এডমণ্ড কানক্লির এবং ডক্টর ভি বাবুস্কা; পশ্চিম জার্মেনী থেকে অধ্যাপক জি কেলারম্যান এবং ডক্টর ডাব্লিউ জিক, জাপান থেকে অধ্যাপক এম তাসাকা এবং অধ্যাপক এন ইশিদা; পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক এডওয়ার্ড বোরোওস্কি; বৃটেন থেকে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অধ্যাপক ডি এইচ আর বার্টন, শ্রীমতী মিরিয়াম গ্রিফিথ

এবং অধ্যাপক এন ডাব্লিউ পিরি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অধ্যাপক ই এফ এডলফ এবং অধ্যাপক গ্যাবর ফোডর; সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অ্যাকাডেমিশিয়ান এম এইচ চাইলাখিয়ান, অধ্যাপক এস এ আজিমজানোভা এবং অধ্যাপক এম এল পালস্নিন।

বিদেশাগত বিজ্ঞানীদের পরিচিতির পর কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তাঁদের প্রকাশিত বিজ্ঞান পুস্তক ও পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগের সভ্যদের তৈরি মডেল প্রদর্শন করেন।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 21 ফেব্রুয়ারী থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের তেরোটি শাখার পৃথক পৃথক অধিবেশন সুরু হয় এবং সেখানে সভাপতির ভাষণ, গবেষণাপত্র পাঠ, আলোচনা-চক্র ও বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বারের মত এবারও কয়েকটি লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ডি এইচ বার্টনের 'পেনিসিলিনের রসায়ন', অধ্যাপক সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'ভূমিকম্প—প্রকৃতি ও উপযোগিতা', অধ্যাপক বি এম জোহরীর 'টেস্ট-টিউব উদ্ভিদ', ডক্টর নীলরতন ধরের 'খাদ্য ও পুষ্টি', ডক্টর আত্মারামের নবম বার্ষিক ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক বক্তৃতা 'বৈজ্ঞানিক নীতি সম্পর্কে ভাববার কথা' এবং ডক্টর এস ওয়াই পদ্মনাভনের 'ধান বিপ্লবের দিকে' সম্পর্কিত আলোচনা। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে 23 ফেব্রুয়ারি বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-কক্ষে 'মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও তার প্রসার' এবং যোহানেস কেপ্‌লার সম্পর্কে বাংলা ভাষায় আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডক্টর কুদরত-ই খুদা, ডক্টর শামসের আলি, ডক্টর শামসুল ইসলাম, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীসমরজিৎ কর, ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। এবার আর একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছিল এগ্রোনমিক্স (Egronomics) সম্পর্কে। সাড়ে তিন দিনব্যাপী এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন উপাচার্য ডক্টর সেন এবং আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণ করেন বহু বিশেষজ্ঞ।

এবারের অধিবেশন পূর্ণাঙ্গ না হলেও যথারীতি প্রীতি সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিদের মনোরঞ্জন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, কলকাতার মেয়র এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তিন দিন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। তিন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রী এ সি সরকার ম্যাজিক, সুরসঞ্চয়ন রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কবিতা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য, শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার বাদন এবং শিশু রংমহল 'ভারতের সঙ্গীত' নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এছাড়া অধিবেশন শেষে 24 ফেব্রুয়ারীতে বহিরাগত প্রতিনিধিদের কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ও কলকাতার আশেপাশের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এবারকার অধিবেশন আয়োজিত হওয়ায় কেউ কেউ পূর্বাহ্ণে সংশয় পোষণ করেছিলেন, কলকাতার এই অধিবেশনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মর্যাদা রক্ষিত হবে কিনা। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের আড়ম্বর এবার না থাকলেও এই অধিবেশনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মর্যাদা যে যথাযথভাবেই বজায় ছিল, এ কথা সকলেই শেষে স্বীকার করেছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

প্রাকৃতিক রবারের কথা

বর্তমান যুগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপাদান হিসাবে রবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম রবারের প্রচলনই বেশী, কারণ চাহিদা পূরণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ রবার প্রকৃতি থেকে আহরণ করা অসম্ভব, যদিও প্রাকৃতিক রবার বহু কাজেই ব্যবহৃত হয়।

কৃত্রিম রবার আবিষ্কারের পূর্বে প্রাকৃতিক রবারই মানুষের চাহিদা মেটাতো। ক্রিষ্টোফার কলম্বাস প্রথম রবারের সন্ধান পান। তিনি আদিবাসীদের মধ্যে রবারের ব্যবহার লক্ষ্য করেন। তারা প্রাকৃতিক রবার জুতা তৈরির কাজে ব্যবহার করতো। একটি পাত্রে রবারের রস নিয়ে তাতে পা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ পরে তুলে নিত। ঐ রস তখন শুকিয়ে একটি প্রলেপ পড়তো। এভাবে কয়েক বার পা ডুবিয়ে প্রলেপটি একটু মোটা হলেই সেটা তাদের জুতার কাজ করতো। কলম্বাসই প্রথম রবার ইউরোপে নিয়ে যান।

1776 খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিষ্টলি লক্ষ্য করেন যে, রবারের দ্বারা কাগজের উপর থেকে পেন্সিলের দাগ তোলা যায়। সে জন্যে ইংরেজীর Rub (ঘষা) শব্দ থেকে এর নাম হয় Rubber বা রবার।

প্রাকৃতিক রবার গাছ থেকে উৎপন্ন হয়। এটা একপ্রকার গাছের রস। যে গাছ থেকে বেশীর ভাগ রবারের রস পাওয়া যায়, তার বৈজ্ঞানিক নাম হিভিয়া ব্র্যাসিলিয়েনসিস (Hevea Brasiliensis)। রবার গাছের কাণ্ড ছুরি দিয়ে চিরে দিলে রস বের হয়। ঐ রস গাছের গোড়ায় একটি পাত্রে জমা হয়। টাট্‌কা রস আঠালো ও ঘন দুধের মত

সাদা। এই রসে প্রায় শতকরা 60 ভাগ জল, 35·62 ভাগ রবার হাইড্রোকার্বন, 2·03 ভাগ প্রোটিন ও 1·65 ভাগ রেজিন (Resin) থাকে। এক একটি গাছ থেকে বছরে প্রায় 6 পাউণ্ড পরিণত রবার পাওয়া যায়। এই গাছ সিংহলে বেশী জন্মায়, ভারতে কেরালাতেও রবারগাছ জন্মায়।

গাছ থেকে সদ্য সংগৃহীত রসের সঙ্গে কিছু ব্যাক্টিরিয়া মিশানো হয়। এরা অ্যাসিড উৎপন্ন করে বলে শতকরা 0·6-1 ভাগ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড মেশানো হয়। একে তখন ফ্যাক্টরীতে জমা রাখবার প্রয়োজনে লিটার প্রতি 0·5-1 গ্রাম সোডিয়ামবাই-সালফাইট মেশানো হয়। এটা জারণ রোধ করে। যখন ঐ রস থেকে রবার প্রস্তুত করা হয়, তখন এতে শতকরা 5 ভাগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে ঘনীভূত করা হয়। এই ঘনীভূত রবারকে ফিল্টার করে আলাদা করা হয়। এই ঘনীভূত রবারে শতকরা 92 ভাগ রবার হাইড্রোকার্বন থাকে। একে তখন রোলারের মধ্যে দিয়ে চালিয়ে জল নিষ্কাশন করে রবারের চাদর প্রস্তুত করা হয়। এই রবারকে বলা হয় crude rubber বা অপরিণত রবার। এটি খেলার জুতার শোলের কাজে ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি শক্ত, ঘাতসহ ও স্থিতিস্থাপক।

ইংল্যাণ্ডে 1800 শতকে টমাস হ্যানকক (Thomas Hancock) ও চার্লস ম্যাসিন-টোস (Charles Masintosh) নামে দুই ভদ্রলোক কাপড়ের দুই পিঠে রবার মাখিয়ে বর্ষাতি প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেন। হ্যানকক রবারের দু-একটি ছোটখাটো জিনিসও প্রস্তুত করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কাছে বেশী যন্ত্র না থাকায় এসব জিনিষ তৈরি করা কঠিন ছিল। সে জন্যে তিনি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তার নাম দেন 'Hancock's Pickle।' এটিই আধুনিক রবার মিলের জনক।

রবারের সঙ্গে গন্ধক, কর্পূর, তৈল ইত্যাদি মিশিয়ে যন্ত্রে চাপ ও তাপ প্রয়োগ করে একে নরম ও নমনীয় করা হয়। এই যন্ত্রে চাপ ও তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। রবার দিয়ে তন্তু, পাইপ, সাইকেল বা মোটরের টায়ার ইত্যাদি তৈরি হয়। সুতার উপর রবারের প্রলেপ লাগিয়ে টায়ার প্রস্তুত করা হয়।

আমেরিকায় প্রায় 1800 খৃষ্টাব্দ নাগাদ রবার ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বিশেষ সাফল্যলাভ করা সম্ভব হয় নি। কারণ এই রবারের তৈরি জিনিষগুলি গরমে নরম ও আঠা-আঠা হয়ে যেত এবং ঠাণ্ডায় শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে পড়তো। ফলে এই সমস্ত জিনিষ বেশীদিন ব্যবহার করা সহজ হতো না। চার্লস গুডইয়ার (Charles Goodyear) এই রবার নিয়ে কাজ করছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য ও অসুস্থতার জন্যে তিনি সাফল্যলাভে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেষে 1839 সালে তিনি আবিষ্কার করেন যে, রবারকে গন্ধক ও কিছু ধাতব অক্সাইডের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে এটি গরম ও ঠাণ্ডায় অপরিবর্তিত থাকে। এই প্রক্রিয়াকে ভালক্যানাইজেসন (Vulcanisation) বলে। পরে জানা যায়

যে, গন্ধক ছাড়া আরও নানা রকম রাসায়নিক, যেমন—জৈব পারঅক্সাইড, নাইট্রোজেন যৌগ ইত্যাদিও একই কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় সম্ভবতঃ গন্ধক রবার অণুর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর কাজ করে। মিশ্রিত গন্ধকের পরিমাণের উপর রবারের গুণাগুণ নির্ভর করে। যদি শতকরা 1-6 ভাগ গন্ধক মেশানো হয়, তবে এটি সাধারণ নরম রবার হয়, যদি 25-30 ভাগ মেশানো হয়, তবে তা শক্ত রবার হয়।

ভালক্যানাইজেসন প্রক্রিয়ায় দস্তার উপস্থিতিতে লিথার্জ চুন, ম্যাগ্নেশিয়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সময় সংক্ষেপ করে। এই রবারের সঙ্গে কিছু পূরক, রং ইত্যাদি মেশানো হয়। কার্বন ব্ল্যাক, জিঙ্ক অক্সাইড প্রভৃতি পূরকের কাজ করে। পেট্রোলিয়াম, রেজিন প্রভৃতি মিশালে রবার নরম হয়। অজৈব রঙীন রং, যেমন—লৌহ অক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইড ইত্যাদির চেয়ে জৈব রংই বেশী ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত জিনিষ রবারের গুণাবলীর নানাভাবে উন্নতি সাধন করে।

বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম রবারের ব্যবহারই বেশী, তথাপি প্রাকৃতিক রবারেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীমলয় সরকার

পারদর্শিতার পরীক্ষা

ভূ-বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নে 20 নম্বর আছে। এক একটি প্রশ্নে যতগুলি ভাগ আছে, তাদের প্রত্যেকটিতেই সমান নম্বর। প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তুমি যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী ভূ-বিজ্ঞানে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

1. (ক) পৃথিবীর ভর কত ?

6×10^{12} কিলোগ্র্যাম

6×10^{18} কিলোগ্র্যাম

6×10^{24} কিলোগ্র্যাম

(খ) পৃথিবার গড় ঘনত্ব কত ?

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 0·55 গ্র্যাম

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 5·5 গ্র্যাম

প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 55 গ্র্যাম

2. (ক) ভূপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ স্থানের উচ্চতা হচ্ছে—

884 মিটার

8844 মিটার

88444 মিটার

(খ) পৃথিবীর সমুদ্রগর্ভে গভীরতম স্থানটির গভীরতা হলো—

10900 মিটার

19000 মিটার

91000 মিটার

3. (ক) পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে বিষুবরেখাস্থিত যে কোন বিন্দু এক ঘণ্টায় কতখানি পথ আবর্তিত হয় ?

17 কিলোমিটার

170 কিলোমিটার

1700 কিলোমিটার

(খ) পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে এক ঘণ্টায় পৃথিবী গড়ে কতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে ?

1060 কিলোমিটার

10600 কিলোমিটার

106000 কিলোমিটার

4. (ক) সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপ এসে পৌছয় এবং সূর্য থেকে নির্গত যে মোট তাপ, তাদের অনুপাত হচ্ছে—

$1 : 2 \times 10^5$

$1 : 2 \times 10^9$

$1 : 2 \times 10^{13}$

(খ) পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে মসৃণ একটি গোলক হতো (অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-গহ্বর ইত্যাদি বর্তমান না থেকে ভূপৃষ্ঠের সব স্থানই যদি ভূকেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হতো), তবে পৃথিবীতে সঞ্চিত জলরাশি সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আবৃত করে রাখতো। সেক্ষেত্রে ঐ জলরাশির গভীরতা হতো—

36·6 মিটার

366 মিটার

3660 মিটার

5. এক ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের জলে

(ক) সোনার পরিমাণ :

0 4 কিলোগ্র্যাম

4 কিলোগ্র্যাম

40 কিলোগ্র্যাম

(খ) রূপার পরিমাণ :

3·4 কিলোগ্র্যাম

34 কিলোগ্র্যাম

340 কিলোগ্র্যাম

(গ) লোহার পরিমাণ :

116 কিলোগ্র্যাম

1160 কিলোগ্র্যাম

11600 কিলোগ্র্যাম

(ঘ) পারদের পরিমাণ :

30 কিলোগ্র্যাম

300 কিলোগ্র্যাম

3000 কিলোগ্র্যাম

(ঙ) থোরিয়ামের পরিমাণ :

8·1 কিলোগ্র্যাম

81 কিলোগ্র্যাম

810 কিলোগ্র্যাম

(উত্তরের জন্যে 250নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

ঈল ও কয়েকটি বৈদ্যুতিক মাছ

1856 সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডক্টর ক্যাম্পের জালে ধরা পড়লো একটি অদ্ভুত প্রাণী। অনেকটা লরেল পাতার মত দেখতে—চ্যাপ্টা ও স্বচ্ছ। লম্বায় দু-ইঞ্চির বেশী নয়। ডক্টর ক্যাম্প এর নাম দিলেন Leptosephalus brevirostris। তারপর গ্রোসি, ক্যালাড্রুসিও, শ্মিড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ব্যাপক গবেষণার ফলে জানা গেল—এই লেপ্‌টো-সেফালি ঈল মাছেরই কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাচ্চা বা লার্ভা। প্রাথমিক লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছতে এদের দেহের আকার আটবার পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের রহস্য আজও অজানা।

পূর্ণাঙ্গ ঈল কিন্তু দেখতে অনেকটা সাপের মত। দেহটি সাপের মতই মসৃণ, কিন্তু পিচ্ছিল। কিন্তু ঈলের পাখ্‌না আছে, সাপের যা নেই। পিঠের দিক থেকে সুরু করে একেবারে লেজ পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন পাখ্‌না। প্রাগৈতিহাসিক মাছের অনেক বৈশিষ্ট্যই এদের মধ্যে বর্তমান। এর একটি হলো স্থলভাগের উপর দিয়ে চলবার ক্ষমতা, বিশেষ করে হ্রদ বা পুকুরে যাদের বাস। ডিম পাড়বার সময়ে তারা স্থলভাগ ছেড়ে নদীতে নামে—তারপর নদী থেকে সমুদ্রে যায়।

সাধারণতঃ ঈল মাছ তিন থেকে পাঁচ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। ছয়-সাত ফুট দীর্ঘ ঈলও দেখা যায়। এরা হলো সমুদ্রবাসী কঙ্গার ঈল। আর ঈল-মাছের মধ্যে যারা দৈত্যবিশেষ, অর্থাৎ সামুদ্রিক মোরে—লম্বায় তারা দশ ফুটের কাছাকাছি।

আমাদের পরিচিত বাণ মাছের মত ঈল একধরণের মাছ, সাপ নয়। যদিও এক সময় লোকের সে রকমেরই ধারণা ছিল। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্ মনে করতেন, সমুদ্রের আবর্জনা থেকেই ঈলের উদ্ভব হয়। কিছুদিন আগেও এরকম একটা প্রবাদ ছিল যে, জলে ঘোড়ার লেজের চুল পড়লে সেগুলি ঈল মাছে রূপান্তরিত হয়। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এইসব উদ্ভট ধারণা হয়তো আজও আছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে।

ঈলের জন্ম হয় গভীর সমুদ্রে। এদের বসবাস প্রধানতঃ ইউরোপ, আমেরিকা আর আইসল্যাণ্ডের মিঠা জলে। পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর অষ্ট্রেলিয়া—এমন কি, ভারতবর্ষেও ঈল দেখা যায়। সাধারণতঃ নদী বা হ্রদে—অনেক সময় পুকুরেও এরা বাস করে। আবার কিছু কিছু ঈল আছে, যেমন—কঙ্গার বা মোরে, যারা স্থায়ীভাবেই সমুদ্রের বাসিন্দা।

ভারী অদ্ভুত এইসব ঈল মাছ। ইউরোপের নদী আর হ্রদ অঞ্চল থেকে ওরা ডিম পাড়তে আসে বারমুডার গভীর অ্যাটলান্টিকে—একটানা তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। আমেরিকান ঈলদের যাত্রাপথ কিছুটা কম। হাজার মাইলের মত। ভারত,

আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াবাসী ঈলদের ডিম ছাড়বার জায়গা হলো ভারত মহাসাগর। গভীর সমুদ্রে কিছু কিছু সমুদ্র-গুল্মের প্রাচুর্য এবং নোনা জলে ডিম ফোটবার উপযুক্ত পরিবেশ—এই দুটি কারণে ডিম পাড়বার জন্যে ঈলকে হাজার হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়।

ডিম ফুটে প্রথমে বেরোয় শূক—দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চিরও কম। তারপর শূক থেকে লেপ্টোসেফালি এবং তা থেকে দুটি স্তর পেরিয়ে এল্‌ভার বা গ্লাস-ঈল। তখনও শরীরটা বেশ চ্যাপ্টা এবং আধা স্বচ্ছ। এই অবস্থায় পৌঁছুতে সময় লাগে প্রায় দু-মাস। এই দু-মাস ওরা সমুদ্রের তলায় চুপ করে বসে থাকে। এলভার অবস্থাতেই ওরা প্রথম সাঁতার দিতে শেখে। তারপর হয় যাত্রা সুরু—নোনা জল থেকে এবার মিঠা জলের দিকে। আর এই যাত্রাপথেই ঘটে যায় জীবনের বাকী পরিবর্তনগুলি। ক্রমশঃ চ্যাপ্টা থেকে সরু। আধা স্বচ্ছ থেকে প্রায়-অস্বচ্ছ তারপর পুরাপুরি অস্বচ্ছ। পরিশেষে মিঠা জলে পৌঁছে পূর্ণাঙ্গ লাভ করে। গবেষকের জালে কখনো কখনো ধরা পড়েছে এই সব বিভিন্ন জীবন-স্তরের ঈল এবং তার ফলেই ঈল মাছের জীবন-রহস্য কিছু কিছু জানা গেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দীর্ঘ এই অভিযানে পূর্ণবয়স্ক ঈল কখনো ধরা পড়ে নি। বিশেষজ্ঞদের তাই ধারণা, গভীর সমুদ্রে ডিম ছাড়বার পরেই ওদের মৃত্যু ঘটে।

যৌন-পূর্ণতায় পৌঁছুতে স্ত্রী-ঈলের প্রায় আট বছর সময় লাগে। তারপর গভীর সমুদ্রে গিয়ে প্রসব ও মৃত্যু। এরা কুড়ি বছর পর্যন্ত বাঁচে। ঈল মাছের খাদ্য প্রধানতঃ সমুদ্র-গুল্ম এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী। বৃহদাকার মোরে ঈল অনায়াসেই ছোট ছোট অক্টোপাস ধরে খায়।

ঈল শুধু খাদকই নয়, খাদ্য হিসেবেও অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর মাছ। স্রোতের মুখে ওরা যখন সমুদ্রে যাত্রা করে, ফাঁদ পেতে বা জালের সাহায্যে ঈল শিকার তখন অনেক অঞ্চলেই একটি ভাল স্পোর্ট।

বৈদ্যুতিক মাছ

বৈদ্যুতিক ঈলের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। ঈল মাছের শরীরে কি সত্যসত্যই বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে? ব্রেজিল এবং গায়নার নদী ও সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা ঈল মাছের মতই দেখতে, মারাত্মক বিদ্যুৎভরা সেই সব সর্পাকৃতির প্রাণী আসলে ঈল নয়। জাতি, ধর্মে ঈল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক আশ্চর্য মাছ। ঈল-সদৃশ আকৃতির জন্যে এবং শরীরে বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি করতে পারে বলেই এদের বলা হয় ইলেকট্রিক ঈল। তা ছাড়া ক্যাট-ফিস এবং ইলেকট্রিক-রে বা টরপেডো মাছ নিজের দেহের মধ্যেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ক্যাটফিস প্রধানতঃ দেখা যায় আরব দেশে। আর উষ্ণ সমুদ্রাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই টরপেডো মাছ ঘোরাফেরা করে।

এদের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতায় ইলেকট্রিক ঈল সবাইকে হার মানায়। ছয় ফুট লম্বা একটি বৈদ্যুতিক ঈল তড়িৎ-স্পর্শে একটি ঘোড়াকে অনায়াসেই অবশ করে দিতে পারে।

এদের তড়িৎশক্তির মাত্রা কয়েক-শ ভোল্ট। এর তুলনায় টরপেডো এবং ক্যাটফিসের তড়িৎশক্তি অনেক কম—ত্রিশ চল্লিশ ভোল্ট মাত্র।

প্রধানতঃ শিকার ধরবার কাজেই ওরা নিজেদের বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে। ক্যাটফিস বিদ্যুতের স্পর্শ লাগিয়ে আহাররত অন্য কোন মাছকে অবশ করে দিয়ে তার খাবারটা আত্মসাৎ করে। টরপেডো মাছের স্বভাব হলো বালির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকা এবং শিকার কাছে আসামাত্র হঠাৎ বেরিয়ে এসে তাকে কাবু করে ফেলা। আর ইলেকট্রিক ঈল তার বিপুল শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগায়।

বৈদ্যুতিক মাছের শরীরে বিদ্যুৎ সৃষ্টির মূল রহস্যটি কি? জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন, এদের শরীরের লেজের দিকে আছে পরিবর্ধিত পেশীনির্মিত এক ধরণের বৈদ্যুতিক কোষ। এগুলি কিন্তু সাধারণ রাসায়নিক ব্যাটারী বা ড্রাই সেলের মত নয়। প্রতিটি ব্যাটারী বা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র বহু কেন্দ্রকযুক্ত (Multinucleate) সজীব পেশী-কোষ বা মাস্‌ল-সেল দিয়ে তৈরি কতকগুলি চাকৃতির সমন্বয়। এগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রোপ্লাক্স। যে কোন দুটি চাকৃতির মাঝখানে রয়েছে সংযোজক-তন্তুর দ্বারা গঠিত বিভেদ-প্রাচীর এবং প্রতিটি চাকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করে তড়িৎ সঞ্চয় ও ক্ষরণের ব্যাপারটিকে নিয়ন্ত্রিত করছে কতকগুলি মোটর নার্ভ। ইলেকট্রিক টরপেডোর লেজে উল্লম্বভাবে সজ্জিত এরকম কুড়ি হাজার চাকৃতি থাকে। ইলেকট্রিক ঈলের ক্ষেত্রে চাকৃতির সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেগুলি অনুভূমিকভাবে সজ্জিত।

মানুষের জানা আদিমতম তড়িৎ-যন্ত্র হলো এসব বৈদ্যুতিক মাছ। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ এদেরকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। এই ধরণের কম্পনশীল সঙ্কেত-বার্তা (Vibro message) সৃষ্টির ব্যাপারে একসময় টরপেডোকে কাজে লাগানো হতো। এমন কি বাতের রোগীকে এই মাছের উপরে খালি পায়ে দাঁড় করিয়ে মৃদু ‘শক্’ নেবার চিকিৎসা-পদ্ধতিও কোন কোন স্থানে চালু ছিল।

বিমল বসু

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 6×10^{24} কিলোগ্রাম

   (খ) প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 5·5 গ্র্যাম

2. (ক) 8844 মিটার

   [বলা বাহুল্য, সর্বোচ্চ স্থানটি হলো মাউন্ট এভারেষ্ট।]

(খ) 10900 মিটার

[সমুদ্রগর্ভে গভীরতম স্থানটি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। স্থানটির নাম 'ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ'।]

3. (ক) 1700 কিলোমিটার

[24 ঘণ্টায় বিন্দুটির আবর্তন-পথের মোট পরিমাণ হচ্ছে $2\pi r$, যেখানে r হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। এথেকে সহজেই ঘণ্টায় আবর্তনের বেগ হিসাব করা যায়।]

(খ) 106000 কিলোমিটার

[পৃথিবীর কক্ষপথকে বৃত্তাকার ধরে নিলে ঐ বৃত্তের পরিধি হচ্ছে $2\pi r$, যেখানে r হচ্ছে সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব। পৃথিবী এক বছরে এই পরিধি একবার অতিক্রম করে। সুতরাং পৃথিবী ঘণ্টায় কতটা পথ অতিক্রম করে, তা সহজেই হিসাব করা যায়।]

4. (ক) $1 : 2 \times 10^7$

(খ) 3660 মিটার

5. (ক) 4 কিলোগ্রাম

(খ) 340 কিলোগ্রাম

(গ) 1160 কিলোগ্রাম

(ঘ) 30 কিলোগ্রাম

(ঙ) 810 কিলোগ্রাম

[সমুদ্রের জলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং লবণের সোডিয়াম ও ক্লোরিন ছাড়াও সোনা, রূপা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সীসা, টিন, তামা, কোবাল্ট, নিকেল, পারদ, থোরিয়াম প্রভৃতি বহু প্রকার পদার্থ থাকে।]

অন্ধদের সহায়ক টেলিভিশন-ক্যামেরা

পৃথিবীতে দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। তাছাড়া আরও আছেন, যারা চশমা নিয়েও দিন-দিন অন্ধত্বের পথে পা বাড়াচ্ছেন।

অন্ধদের নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা দেবার জন্যে চেষ্টা চলছে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে। আজকে বিজ্ঞানের এই উন্নতির দিনে দৃষ্টিহীনেরা যাতে পড়াশুনার জন্যে আরও সহজ উপায়ে যন্ত্রের সাহায্য নিতে পারেন, সেই আশাই করেছেন সবাই।

বিজ্ঞানীদের চেষ্টার ফলে টেলিভিশন-ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই টেলিভিসন-ক্যামেরা দৃষ্টিহীনদের পক্ষে খুব সহায়ক হবে।

আসলে এই সম্পর্কে গবেষণা হয়েছিল অনেক দিন আগেই। 1958 সালে ডক্টর

বার্টনের একটা পরীক্ষা সবার মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল। আমেরিকার স্নায়ু-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বার্টন একটি অন্ধ মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত করে তাঁকে পৃথিবীর আলোর অনুভূতি দিয়েছিলেন।

রেডারের সাহায্যে ডক্টর বার্টন পরীক্ষাটি করেছিলেন। তাঁর মতে, অন্ধদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে নির্জীব মনে করবার কোন কারণ নেই। বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে ঐ কোষগুলিকে আবার সজীব করা যায়। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে অন্ধেরা তাঁর পরীক্ষার ফলে দেখতে সক্ষম হবেন। 1958 সালে অনেক বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর এই পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছিল।

এটা বলা যেতে পারে যে, ডক্টর বার্টনের এই সূত্রটির উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে দৃষ্টিহীনদের বর্ণ পরিচয়ের জন্যে টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

1970 সালের 22শে জুলাই বৃটিশ চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ পার্লামেন্টে তাঁদের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা জানিয়েছেন। এই সংবাদে সমস্ত পৃথিবীতে আজ সাড়া পড়ে গেছে।

মস্তিষ্কের যে অংশটি সাধারণ মানুষকে কোন কিছু 'দেখিয়ে থাকে', একজন দৃষ্টিহীনের মাথার সে অংশটিতে ছোট ছোট বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে তাঁকে 'আলোর চিহ্ন' দিতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

বেতারের সহায়তায় এই পরীক্ষাটিতে তাঁর মস্তিষ্কে অক্ষরের ছাপ দিয়ে এবং টেলিভিসন-ক্যামেরার সাহায্যে সেই বিশেষ অংশটিতে ছাপা অক্ষরের ছবি পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন—দৃষ্টিহীন লোকটি তা পড়তে পেরেছেন। বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এই ধরণের নতুন টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

মস্তিষ্কের বিশেষ অংশটি সম্বন্ধে যা জানা গেছে, তা হলো মানুষের মস্তিষ্কের একটি বিশেষ স্থানে দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র অবস্থিত। দৃষ্টিহীনদের ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটি সাধারণতঃ নীরব থাকলেও বৈদ্যুতিক-তরঙ্গের সাহায্যে সে কেন্দ্রে সাড়া জাগানো সম্ভব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করা হয়েছে। আমেরিকার স্নায়ু-তত্ত্ববিদ্ ডক্টর বার্টন ও বৃটিশ চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ তাঁদের পরীক্ষায় ঐ দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

1958 সালের পত্রিকার সংবাদে ডক্টর বার্টনের পরীক্ষার কথা জানানো হয়েছিল। ডক্টর বার্টন 18 বছরের অন্ধ মেয়েটির মাথায় খুলির মধ্যে গর্ত করে খুব সরু একটি বৈদ্যুতিক তার লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বাইরের একটি কোট ইলেকট্রিক সেলের অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পরিবর্ধিত অবস্থায় দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল। মস্তিষ্কে অবস্থিত দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে সাড়া জাগাবার ফলে অন্ধ মেয়েটি

বাইরের পৃথিবীর আলো দেখতে পেরেছিল। এতে প্রমাণ হলো, মস্তিষ্কের কোষগুলি কখনও নষ্ট হয়ে যায় না—তাকে আবার সজীব করা যায়।

আর বৃটিশ বিজ্ঞানীরা বেতারের সাহায্যে মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রে অক্ষরের ছাপ দিয়েছেন। টেলিভিসন-ক্যামেরার সাহায্যে সেই অংশে ছাপা অক্ষরের ছবি পাঠিয়েছেন। ফলে দৃষ্টিহীন লোকটি দৃষ্টিশক্তির মূল কেন্দ্রে সাড়া পাবার ফলে ঐ লেখা পড়তে পেরেছেন। লক্ষণীয় যে, এই দ্বিতীয় পরীক্ষাটির সাফল্য প্রথম পরীক্ষার উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল ও প্রথমটির পরিপূরক।

এই টেলিভিসন-ক্যামেরা তৈরি করে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা ডক্টর বার্টনের পরীক্ষাটির সফল স্তরে পা দিতে পেরেছেন। এই যন্ত্রটি যে দৃষ্টিহীনদের কাছে আজ নতুন আশা নিয়ে এসেছে, সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। দৃষ্টিহীনেরা এই ক্যামেরার সহায়তায় আরো সহজে ছাপার অক্ষর পড়তে পারবেন বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

অজয় গুপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : সৌর আলোকমণ্ডলের ফেকুলাস ও ফ্লোকিউলাস সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

সোমা ও ঝুমা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা-12

প্রশ্ন 2. : হোলোগ্রাফ কি ?

সুখেন চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ
রাজেন্দ্রনাথ পোদ্দার, দার্জিলিং

উত্তর 1. : সূর্যের আলোকমণ্ডলের উপর স্থানে স্থানে কোন কোন সময় উজ্জ্বল মেঘের মত অংশ দেখা যায়। এগুলি সূর্যের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রা বিশিষ্ট। এগুলিকেই ফেকুলাস বলা হয়। সূর্যের গোলক প্রান্তের বাইরে অপেক্ষাকৃত শীতল স্তরগুলিতে ফেকুলাস দৃষ্ট হয়। এদের উৎপত্তি আলোকমণ্ডলের উচ্চতর স্থান-সমূহে। এদের তাপমাত্রা বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের দিকে বেশী। এখানের পরমাণু আলোকমণ্ডলের পরমাণুর তুলনায় বেশী উত্তেজিত। ফেকুলাস থেকে অধিক-মাত্রায় অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরিত হয়—যা পরমাণুতে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে

বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আলোকমণ্ডলের তুলনায় ফেকুলাসে ক্যালসিয়াম আয়নের পরিমাণ কম থাকে। সে কারণে ফেকুলাসের বর্ণালী বিশ্লেষণে ক্যালসিয়াম আয়নের রেখা স্পষ্ট ধরা যায় না।

ফেকুলাস যখন বর্ণমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়, তখন তাকে ফ্লোকিউলাস বলা হয়। সৌর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ফ্লোকিউলাসের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশী হয়ে থাকে। কাজেই এখানের পরমাণু অপেক্ষাকৃত বেশী উত্তেজিত। সৌর-সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোকিউলাসের ক্ষেত্রফল ও তীব্রতা বাড়ে। এদের আকৃতিও সূর্যের পর্যায়কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। ফ্লোকিউলাস সূর্যের সমগ্র গোলকেই দেখা যায়।

উত্তর 2. : এক নতুন পদ্ধতির আলোকচিত্রকে হোলোগ্রাফ বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দৃশ্য বস্তুর আকৃতিকে আলোক-তরঙ্গের ব্যতিকরণ ও অপবর্তন ধর্মের সাহায্যে বিশেষ সঙ্কেতে আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত বিশেষ ব্যবস্থায় আবদ্ধ সঙ্কেত থেকে মূল বস্তুর সঠিক প্রতিকৃতি নির্ণয় করা হয়ে থাকে—যা চোখে দেখা বাস্তব আকৃতিক ঠিক অনুরূপ। দেখবার দিক পরিবর্তন করে দৃশ্য বস্তুর আকৃতির বিভিন্ন অংশ দেখা যেতে পারে। হোলোগ্রাফে পাওয়া প্রতিকৃতিতেও একই সুবিধা পাওয়া যায়। আলোকচিত্রে বস্তুর প্রতিকৃতি আসলটির অনুরূপ হয় না। সেখানে তিনমাত্রার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা) মধ্যে মাত্র দুটি মাত্রাই প্রকাশিত হয়—তাই চিত্রের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। ত্রিমাত্রিক চলচ্চিত্রেও আসল বস্তুর বোধ পুরাপুরি প্রকাশ পায় না। হোলোগ্রাফের সাহায্যে আমরা এই সব অভাব কাটিয়ে উঠতে পারি। যার জন্যে এই নতুন কায়দার আলোকচিত্র ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

1949 সালে বিজ্ঞানী গ্যাবর (D. Gabor) প্রথম এই হোলোগ্রাফীয় পদ্ধতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রবর্তন করেন। আলোকের অপবর্তন ও ব্যতিকরণ ধর্মের গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে হোলোগ্রাফীয় ব্যবস্থার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সুসঙ্গত এবং জোরালো রশ্মি—লেসার রশ্মি—আবিষ্কৃত হবার পর 1963 সালে গ্যাবর তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ হিসাবে প্রথম তৈরি হোলোগ্রাফ থেকে বিজ্ঞানীরা মূল বস্তুর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করেন।

বর্তমানে হোলোগ্রাফ পদ্ধতির সাহায্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হোলোগ্রাফের প্রয়োগ বিরাট সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা-সভা

গত 23শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও প্রসার সম্পর্কে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বাংলাদেশ থেকে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী-দলের নেতা বিশিষ্ট রসায়নবিদ্ ডক্টর কুদরাত ই খুদা বলেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা পেলেই তবে ছাত্রদের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এই ব্যাপারে বাংলাদেশে এতদিন তেমন একটা চেষ্টা হয় নি। বাংলাদেশ প্রাণ দিয়ে মাতৃভাষার মান রেখেছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবী তাই নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। আর দেরী না করে এখনই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার জন্যে সকলকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানাই। একাজে অসুবিধা আছে ঠিকই, কিন্তু তা অনতিক্রম্য নয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষার মান কমে যাবে বলে সাধারণ ভাবে যে মত প্রকাশ করা হয়ে থাকে, আমি তার সঙ্গে একমত নই। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা মোটেই অসম্ভব নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে ডক্টর খুদা বলেন, ছাত্র জীবনে ইংরেজীতেই পড়াশোনা করতে হয়েছে। অধ্যাপনার সময়েও ইংরেজীতে পড়াতে হয়েছে, মনে মনে এর জন্যে বেদনা ছিল। অবসর পাওয়ার পর তাই জৈব রসায়নের চারটি শাখার বাংলা বই লিখেছি। আদর্শ বই লেখা নয়, ছোটদের জন্যে বাংলাভাষায় বই লেখার অন্যদের উৎসাহিত করাই ছিল এর একমাত্র উদ্দেশ্য। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান ও অন্যান্য পাঠ্য বই রচনার জন্যে তরুণ লেখকদের আমি আহ্বান জানাই। বিজ্ঞানের বই লেখার সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত পরিভাষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের প্রধান ডক্টর শামসের আলি বলেন, শিক্ষায় মাতৃভাষা চালু করতে হলে আগে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। যে ভাষায় কথা বলি, চিন্তা করি, স্বপ্ন দেখি, সে ভাষায় সব কিছুই করা যায়—এই বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সহজসাধ্য বলেই আমি মনে করি। ইংরেজী ভাষার চাপে অনেক প্রতিভা চাপা পড়ে থাকে, বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। কেবল বহিঃসংযোগের জন্যে ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে ইংরেজী আমরা শিখব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর শামসুল ইসলাম বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব কিনা, সে ব্যাপারে 1969 সালের আগে পর্যন্ত আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আজ তা কেটে গেছে। বাংলাদেশের ছাত্রেরা আজ সাফ বলে দিয়েছেন, যে শিক্ষক ইংরেজীতে পড়াবেন, আমরা তাঁর ক্লাশ করব না। এতে

অনেক ভাল ফল দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ায় গিয়ে দেখলাম, পি-এইচ-ডি-র থিসিস পর্যন্ত মাতৃভাষায় লেখা হচ্ছে। আমি মনে করি, একটা ভাষা ভাল জানলে অন্ত ভাষা শেখাও শক্ত হয় না। সুতরাং প্রয়োজনে ইংরেজী আয়ত্ত করবার কোন অসুবিধা হবে না।

কলকাতার বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালার অধি-কর্তা ডক্টর অমলেন্দু বসু দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রসারের জন্তে তাঁরা যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তার বিবরণ দেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে ক্রমশঃ আগ্রহ বাড়ছে।

'দেশ' পত্রিকার শ্রীসমরজিৎ কর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেন, যাদের জন্তে আমরা লিখি তাদের মাঝে মাঝে বৈঠক ডেকে মতামত জানা দরকার। তা হলে আমরা বুঝতে পারব, কি ভাবে অগ্রসর হলে আমরা সুফল পাব।

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের যোহানেস কেপ্-লারের চতুঃশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন খড়্গপুরের আই. আই. টির অধ্যাপক ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদবপুরের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় কেপ্-লারের জীবনকথা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের বিষয় আলোচনা করেন। আর শ্রী সেন পদার্থবিদ্যায় কেপ্লারের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সভাপতি অধ্যাপক বসু আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলবার জন্তে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 25 বছর ব্যাপী নানা কর্মপ্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। আজকাল বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা যে ক্রমশঃ আগ্রহ প্রকাশ করছে, তাতে তিনি আনন্দিত। এই ব্যাপারে তরুণদের এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান এবং বিজ্ঞান প্রসারের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন।

ডক্টর বি. পি. পাল এফ-আর-এস নির্বাচিত

নয়া দিল্লী থেকে 21শে মার্চ পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর প্রথম ডিরেক্টর-জেনারেল ডক্টর বি. পি. পাল লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ-আর-এস) নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রধান সম্পাদক —শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | মে, 1972 | পঞ্চম সংখ্যা

বর্তমান ভারতে রাসায়নিক শিল্প

বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ আমাদের সকলের কাছে বিশেষ গৌরব ও গর্বের বিষয়। এর ফলে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা যেভাবে জেগে উঠেছে, তা এর আগে আর কখনও তেমন-ভাবে প্রকাশ পায় নি। একদিন ছিল যখন খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, প্রতিরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির জন্যে বিদেশের উপর আমাদের একান্ত-ভাবে নির্ভর করে থাকতো হতো। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। আজ আমরা সে পরনির্ভরতা অনেকখানি দূর করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি। খাদ্যের ক্ষেত্রে আজ আমরা স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি—একথা বলা চলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ আমরা স্বনির্ভর হতে না পারলেও পরনির্ভরতা ক্রমশঃ কমে আসছে।

তিরিশ বছর আগে এই দেশে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফটকিরি, ন্যাপথা-লিন ইত্যাদি অল্প কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হতো। কিন্তু আজ আমাদের দেশে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন—সার, ভেষজ, কীটঘ্ন, অতিকায় অণুঘটিত পদার্থ (প্লাস্টিক), কৃত্রিম তন্তু, রঞ্জন দ্রব্য প্রভৃতি প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের মোট মূলধন হচ্ছে 16,00 কোটি টাকা। এই দেশে বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে রাসায়নিক শিল্পের স্থান হচ্ছে চতুর্থ—তন্তু, লৌহ ও ইস্পাত

এবং বস্ত্রশিল্পের পর তার স্থান। দশ বছর আগে উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্য ছিল 200 কোটি টাকা, কিন্তু আজ রাসায়নিক দ্রব্যের মূল্যমান দাঁড়িয়েছে 700 কোটি টাকা। শুধু মূল্যমান বৃদ্ধি নয়, রাসায়নিক শিল্পের বৈচিত্র্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে প্রভূতভাবে।

রাসায়নিক শিল্পের এই শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের বহু উল্লেখযোগ্য দিক আছে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভেষজ দ্রব্যের মাধ্যমে জাতীয় স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান। আজ প্রায় প্রতিটি গৃহে প্লাস্টিকের তৈরি জিনিসপত্র স্থান করে নিয়েছে। কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। এভাবে রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদিত জিনিষগুলি আজ প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক মানুষের সদ্ব্যবহারে লাগছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আজও আমরা অনেকখানি পিছিয়ে আছি। আর এই জৈব রাসায়নিক দ্রব্যগুলিই হচ্ছে আধুনিক প্লাস্টিক্স, রঞ্জন দ্রব্য ও ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুতের মূল উপকরণ। উন্নত দেশগুলিতে আজ রাসায়নিক শিল্পের মূল উপকরণের অধিকাংশ পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে আহরিত হয়ে থাকে। পেট্রো-কেমিক্যালের সর্বপ্রথম উদ্ভব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কারণ সেখানে গৃহস্থালীর প্রয়োজনে গ্যাসোলিনের (Gasoline) চাহিদা ছিল অত্যধিক। পশ্চিম জার্মেনীতে 1939 সালে রাসায়নিক মূল উপকরণের শতকরা মাত্র 10 ভাগ পাওয়া যেত পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে। কিন্তু আজ তা শতকরা 50 ভাগেরও বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেট্রো-কেমিক্যালের ক্ষেত্রে ইটালী এবং জাপানও আজ অনেক উন্নতি লাভ করেছে। ভারতে আজ পেট্রো-কেমিক্যাল থেকে রাসায়নিক মূল উপকরণ উৎপাদনের প্রধান বাধা হচ্ছে কারিগরী জ্ঞানের অভাব ও উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগের অপ্রতুলতা। আর্থিক ভিত্তিতে পেট্রো-কেমিক্যালের সদ্ব্যবহার করতে হলে এই জটিল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা বৃহদাকার হওয়া প্রয়োজন এবং এই পদ্ধতিতে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হবে, এদেশে সেগুলির প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, নইলে আর্থিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে বিবিধ জৈব রাসায়নিক দ্রব্য ও তাদের উপজাত দ্রব্যগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে উৎপাদন ভারত নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প গড়ে তোলবার জন্যে বিগত কয়েক বছরে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নানাবিধ বিচার-বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে যা অগ্রগতি হয়েছে, তাকে মন্থরই বলা চলে; কারণ পেট্রো-কেমিক্যাল উৎস থেকে উপজাত গ্যাসোলিন জাতীয় কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা এখন আর তেমন দেখা যাচ্ছে না। এসব দ্রব্যের সদ্ব্যবহারের জন্যে বিদেশ থেকে যথোপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান আহরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আর একটি জটিল বিষয় হচ্ছে, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত অপরিশুদ্ধ তেলের ক্রমবর্ধমান দাম। এসব অসুবিধার দরুণ ভারতে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। মহারাষ্ট্রে ভারত সরকার যে নিজস্ব প্রকল্প চালু করেছেন, তার অগ্রগতি সীমিত।

পশ্চিম বাংলায় তমলুকের কাছে হলদিয়ায় একটি পেট্রো-কেমিক্যাল প্রকল্প চালু করবার প্রস্তাব হয়েছে। এর সমর্থনে নানা মহল থেকে যুক্তিও পেশ করা হয়েছে। একটা কথা বলা দরকার, বিদেশ থেকে অপরিশুদ্ধ তেল আমদানী করেও আর্থিক ভিত্তিতে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে

তোলা যায়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জাপান। জাপানে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প বিদেশ থেকে আমদানীকৃত তেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও জাপান আজ পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। কারণ জাপানে এই জটিল রাসায়নিক দ্রব্যগুলি যেমন প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তেমনি তাদের চাহিদাও আছে প্রচুর। হলদিয়ায় পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে উঠলে পশ্চিম বাংলা উৎপাদিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলির একটা মোটা অংশের সদ্ব্যবহার করতে পারে—সেটা রং ও ভার্নিস প্রস্তুতের জন্যে হোক বা প্লাস্টিক্সের জিনিষপত্র তৈরির জন্যে হোক। বস্তুতঃ আসাম, বিহার (বারৌনি) ও পশ্চিম বাংলাকে (হলদিয়া) নিয়ে গঠিত পূর্বাঞ্চলের পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে হলদিয়ার প্রকল্প।

রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত উজ্জল চিত্র দেখতে পাই। এই ক্ষেত্রেই সম্ভবতঃ রাসায়নিক শিল্পের সবচেয়ে বড় অবদান। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 70% কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তাদের কাছে রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থ হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। আজ যে আমরা খাদ্যের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হতে পেরেছি, তার মূলে রয়েছে রাসায়নিক শিল্পের অনেকখানি অবদান। রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন পদার্থ এদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত না হলে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা সম্ভব হতো না।

ভেষজ দ্রব্য হচ্ছে রাসায়নিক শিল্পের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এদেশে ভেষজ দ্রব্য বহুকাল থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে, কিন্তু 1960 সালের পর থেকে এক্ষেত্রে প্রকৃত অগ্রগতি দেখা গেছে। 1947 সালে এদেশে 10 কোটি টাকার মত ভেষজ দ্রব্য বছরে প্রস্তুত হতো। ক্রমোন্নতির ফলে আজ এদেশে প্রস্তুত ভেষজ দ্রব্যের মূল্যমান হচ্ছে বছরে 200 কোটি টাকারও বেশী। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, 20 বছর পূর্বে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত উপকরণ দিয়ে ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুত হতো। কিন্তু আজ বিবিধ ভেষজ প্রস্তুতের নানাবিধ মূল উপকরণ এদেশে প্রস্তুত হচ্ছে। বর্তমানে উৎপন্ন মূল উপকরণের পরিমাণ হচ্ছে বছরে 20 কোটি টাকার মত।

জাতীয় অর্থনীতিতে ভেষজ দ্রব্যাদি আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমাজের সর্বস্তরে কল্যাণকর কার্যক্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর ভেষজ অধিক পরিমাণে উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

প্লাস্টিক শিল্পও আজ এদেশে একটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। ধাতব জিনিষপত্রের তুলনায় প্লাস্টিকের জিনিষপত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশী সুবিধাজনক। সে কারণে আজ টিন, তামা, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জিনিষপত্রের পরিবর্তে প্লাস্টিক্সের তৈরি জিনিষপত্র অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্লাস্টিক্স যেমন অতিকায় অণুঘটিত রাসায়নিক পদার্থ, নাইলন টেরিলিন ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তুও তেমনি সমগোত্রীয় রাসায়নিক পদার্থ।

সাম্প্রতিক কালে ব্যাপক আন্তর্জাতিক রাসায়নিক গবেষণার ফলে এই জাতীয় কৃত্রিম তন্তুর প্রভূত উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশেও সরকার কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন এবং আগামী পাঁচ বছরে নাইলন, অ্যাক্রাইলিক, পলিএস্টারজাতীয় তন্তুর উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের একটি কারখানা স্থাপনের কাজও আমাদের দেশে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে এদেশে প্রস্তুত প্লাস্টিক্সের মূল উপকরণের মূল্যমান হচ্ছে আনুমানিক 40 কোটি টাকা।

সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বর্তমানে এদেশে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশে সংশ্লেষিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ বলতে বিশেষ কিছু প্রস্তুত হতো না। কিন্তু আজ পলিইথিলিন, পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC), পলিস্টেরিন, ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড, আই. এন. এইচ (INH), ডি. ডি. টি, হর্মোন, ভিটামিন-সি ইত্যাদি নানা প্রকার জৈব রাসায়নিক দ্রব্য এদেশে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হচ্ছে। তবে এখনও অনেক জৈব রাসায়নিক পদার্থ এদেশে সংশ্লেষণ করবার অবকাশ রয়েছে।

এভাবে বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ আশাপ্রদ। এক সময় আমাদের রাসায়নিক শিল্পের কারিগরী জ্ঞানের জন্যে বিদেশের দ্বারস্থ হতে হতো এবং উন্নত দেশগুলির মানের সমপর্যায়ে আসবার জন্যে আজও কয়েকটি ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশী কারিগরী জ্ঞানের সাহায্য নিতে হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা নিজেরাও রাসায়নিক শিল্পের বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আমাদের আহরিত কারিগরী জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করছি। আমাদের বিভিন্ন জাতীয় গবেষণাগার নতুন নতুন কারিগরী পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এই বিষয়ে অনেকখানি সাহায্য করেছে ও করছে। তবে রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্যে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার প্রতি আরও গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভাব্যতাবাদের গোড়ার কথা

কল্পনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তাস-পাশা খেলাকে আমাদের দেশে আজও সম্মানের চোখে দেখা হয় না। তাস-পাশা বা লুডো নিয়ে খেলতে দেখলে আমরা প্রায়ই বলে বসি—ছেলেটার আর কিছু হলো না। তাস-পাশায় যখন মন গেছে, তখন ছেলেটার বারোটা বেজে গেছে। কিন্তু শুনে হয়তো আশ্চর্য লাগবে যে, এই তাস-পাশাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে সম্ভাব্যতাবাদ বা Theory of Probability, যার প্রয়োজন আজ বিজ্ঞান-জগতে অপরিহার্য। এটি গণিতের এক শাখা রাশিবিজ্ঞানের (Statistics) একটি অংশ।

আমরা প্রায়ই বলে থাকি—অমুক ছেলেটার পরীক্ষায় পাস করবার 'নাইন্টি পারসেন্ট চান্স' বা অমুক প্রশ্নটি পরীক্ষায় পড়ার 'নাইন্টি নাইন পারসেন্ট চান্স', তখন কিন্তু আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে এই সম্ভাব্যতাবাদের কথাই বলি।

সম্ভাব্যতাবাদে কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা কত, তাই নিয়েই আলোচনা করা হয়। সেখানে নিশ্চয়তার কোন কথা নেই। কোন একটি ঘটনা কতবার ঘটতে পারে, সেই সম্ভাব্যতার কথাই সম্ভাব্যতাবাদ থেকে আমরা শুধু জানতে পারি। কিন্তু কোন একটি মুহূর্তে ঠিক সেই ঘটনাটি ঘটবে কিনা, তা বলা যায় না। উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। মনে করুন, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলায় ক আর খ বাবু টস্ করতে নেমেছেন। এখন

টস্ করলে হয় হেড, নয় টেল হবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে হেড হবে, না টেল হবে, তা বলা মুস্কিল। কিন্তু হেড বা টেল পড়বার সম্ভাবনা সমান সমান। কারণ ঐ দুটির মধ্যে যে কোন একটি হতে পারে অর্থাৎ তাদের সম্ভাবনা শতকরা 50 বা $\frac{1}{2}$, কাজেই দু-বার টস্ করলে হেড পড়বার কথা একবার, টেল অন্যবার। সম্ভাবনা সে শুধু সম্ভাবনাই—তার কোন নিশ্চয়তা নেই; অর্থাৎ দু-বার টস্ করলে আপনি দেখবেন যে, দু-বারই হেড হলো বা দু-বারই টেল হলো। এর ফলে হয়তো আপনার মনে সংশয় দেখা দেবে যে, সম্ভাব্যতাবাদ তাহলে সত্য হলো কি করে? কিন্তু না, সম্ভাব্যতাবাদের কথাগুলি সত্য কিনা—তা দেখতে হলে আপনাকে টসের সংখ্যা বাড়াতে হবে। টসের পরিমাণ যত বাড়াবেন, ততই সম্ভাব্যতাবাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হবে। কাজেই টসের সংখ্যা যদি এক লক্ষ করা যায়, তবে হেড-টেল দুইয়েরই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি হবে। এথেকে আমরা কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতাকে এইভাবে লিখতে পারি—

কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা = ঘটনাটি যথার্থ যতবার ঘটে / মোট ঘটবার সংখ্যা

অর্থাৎ ঘটনাটি যথার্থ যতবার ঘটে = ঘটনাটি ঘটবার সম্ভাব্যতা × মোট ঘটনার সংখ্যা

এটা তখনই ঘটবে, যখন ঘটনার সংখ্যা খুব বেশী এবং প্রত্যেকটি ঘটনা স্বাধীন (Independent)।

যেমন ধরুন, লুডো খেলবার সময় সবাই ছক্কা পড়ুক—এটাই চায়। লুডো খেলার ঘুঁটিতে ছয়টা পিঠ, এক থেকে ছয়। এখন ছয়বার লুডোর ঘুঁটি চাললে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সব ঘরের চাল একবার করে পাওয়া যেতে পারে—গাণিতিক দিক দিয়ে এমন কথা বলা যায়। কাজেই ছয়বার চাললে ছক্কা একবার পড়তে পারে। কাজেই ঘটনার সংখ্যা যখন ছয়, তখন ছক্কা পড়বে একবার অর্থাৎ ছক্কা পড়বার সম্ভাব্যতা হচ্ছে $\frac{1}{6}$। 6 বার চাল দিলেই যে ছক্কা একবার পড়বেই—একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কিন্তু চালের সংখ্যা যদি খুব বেশী হয়—যেমন ধরুন 6,00,000 বার, তবে ছক্কা প্রায় 1,00,000 বারের কাছাকাছি পড়বে। তেমনি লটারীর টিকিট কেটে অনেকে প্রথম পুরস্কার পাবার আশায় সুখস্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আপনার মত আরও দশ লক্ষ লোক টিকিট কেটে আপনার মতই স্বপ্নজাল পেতেছে। কিন্তু প্রথম পুরস্কার ঐ দশ লক্ষ লোকের মধ্যে যে কেউ পেতে পারে। কাজেই প্রত্যেকের প্রথম পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{10,00,000}$; অর্থাৎ খুবই কম! কিন্তু যদি ঐ দশ লক্ষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ আপনি কিনতেন, তবে আপনার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই হতো $\frac{1}{10,00,000} \times 5,00,000 = \frac{1}{2}$, অর্থাৎ 'আপনার পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা শতকরা 50 ভাগ; অর্থাৎ উজ্জ্বল সম্ভাব্যতা! আর সব টিকিটই যদি আপনার কেনা থাকতো, তবে তো আপনার প্রথম পুরস্কার পাবার সম্ভাব্যতা শতকরা 100 ভাগ। তার অর্থ—আপনি সব পুরস্কার পেয়ে বসে আছেন।

এতক্ষণ আমরা কোন একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা কত, তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসুন কোন একটি মিশ্রিত ঘটনা (Composite event) ঘটবার সম্ভাব্যতা বের করা যাক।

মনে করুন, আপনার কাছে দু-রকম মুদ্রা আছে এবং প্রত্যেকটিকে অনেকবার টস্ করলেন। এখন প্রথম মুদ্রার হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$ এবং

দ্বিতীয় মুদ্রার হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$। এখন একই সঙ্গে দুটি মুদ্রাকে টস্ করলে উভয় ক্ষেত্রেই হেড হবার সম্ভাব্যতা কত বলতে পারেন? সবসমেত সম্ভাব্যতা কয়টি? প্রথমটির হেড দ্বিতীয়টির টেল কিংবা প্রথমটির টেল দ্বিতীয়টির হেড—এই হলো দুই বা দুটিই হেড হতে পারে কিংবা দুটিই টেল, এই বাকী দুই। তাহলে, এই চারটি সম্ভাব্যতার মধ্যে দুটিই হেড হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{4}$ বা $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$; অর্থাৎ কোন একটি মিশ্রণের ঘটনা ঘটবার সম্ভাব্যতা হবে ঐ মিশ্রিত ঘটনা যতগুলি স্বাধীন ঘটনার দ্বারা গঠিত (এক্ষেত্রে দুটি ঘটনা), তাদের প্রত্যেকের সম্ভাব্যতার গুণফলের সমান।

মিশ্রণের ঘটনার আর একটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। ধরুন কোন পিতামাতা দুটি মাত্র সন্তান চান এবং সে দুটি সন্তানের মধ্যে প্রথমটি পুত্র হোক এবং দ্বিতীয়টি কন্যা হোক, এই তাঁরা চান। তাহলে তার সম্ভাব্যতা কত? এটি একটি মিশ্রিত ঘটনা, যা দুটি স্বাধীন ঘটনার মিশ্রণে গঠিত। দুটি সন্তানের মধ্যে প্রথমটি পুত্র হবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{2}$ এবং দুটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয়টি কন্যা হবার সম্ভাব্যতাও $\frac{1}{2}$। তা হলে দুটি সন্তানের প্রথমটি পুত্র ও দ্বিতীয়টি কন্যা হবার সম্ভাব্যতা $=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$। আবার ধরুন, পাঁচটি ছেলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ রয়েছে। তাদের দিকে একটি লাল বল এবং একটি সাদা বল এমনভাবে ছোঁড়া হচ্ছে যে, তাদের বল দুটি পাবার সম্ভাব্যতা সমান। এখন ক-এর লাল বলটি পাবার সম্ভাব্যতা $\frac{1}{5}$। আর ক-এর সাদা বলটি পাবার সম্ভাব্যতাও $\frac{1}{5}$। কিন্তু দুটি বলই ক-এর একই সঙ্গে পাবার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই কম এবং সেই সম্ভাব্যতা হচ্ছে $\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{25}$। কারণ এটি নিঃসন্দেহে একটি মিশ্রিত ঘটনা।

সম্ভাব্যতাবাদের এটি গোড়ার কথা। কিন্তু সম্ভাব্যতাবাদ আজ গণিতের একটা বড় অংশ দখল করে আছে। এর প্রয়োজন আজ সর্বত্র। এর বহু বিচিত্র ব্যবহারিক দিকের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই π (পাই) নামক গ্রীক অক্ষরটির সঙ্গে পরিচিত। গণিতে সাধারণতঃ কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে π-দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। π-এর স্থূল মান $\frac{22}{7}$ এবং চার দশমিক স্থান পর্যন্ত এর আসন্ন মান 3.1416। সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে π-এর প্রায় সঠিক মান নির্ণয় সম্ভাব্যতাবাদের নির্ভুলতাই শুধু প্রমাণ করে না—বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুল ব্যবহারের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে করুন, একটি সমতলের উপর সমান a দূরত্বে কতকগুলি সরলরেখা টানা হলো এবং l দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (যেখানে l, a অপেক্ষা ছোট) একটি কাঠি যদি ঐ সমতলে ফেলা হয়, তবে অঙ্ক কষে দেখানো যেতে পারে যে, কাঠিটির ঐ সরলরেখাগুলির যে কোন একটির উপর পড়বার সম্ভাব্যতা $\frac{2l}{\pi a}$। এখন যদি কয়েক হাজার বার ঐ কাঠিটি ঐ সমতলের উপর ফেলা যায়, তবে ঐ ঘটনাটি যতবার ঘটবে এবং মোট যতবার কাঠিটি ফেলা হবে, তার অনুপাত প্রায় ঐ ভগ্নাংশের সমান হবে এবং l ও a-এর মান জানা থাকায়, এখান থেকে সহজেই π-এর মান নির্ণয় করা যাবে। 1855 সালে এ. স্মিথ 3204 বার পরীক্ষার ফলে π-এর যে মান নির্ণয় করেন, তা হলো 3.1553। অধ্যাপক মরগ্যানের এক ছাত্র 600 বার পরীক্ষার দ্বারা π-এর মান বের করেন 3.137। 1864 সালে π-এর আসন্ন মান নির্ণয় করেন 3.1419—যা আশ্চর্যভাবে π-এর সঠিক মানের প্রায় সমান।

সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে π-এর প্রায় কাছাকাছি মান নির্ণয়ের আরও অনেক পদ্ধতির মধ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি বেশ আকর্ষণীয়।

এটা জানা গেছে যে, যদি যেমন খুশী তেমনি

দুটি সংখ্যা লেখা যায়, তবে ঐ সংখ্যা দুটির পরস্পরের মৌলিক (Prime) হবার সম্ভাব্যতা $6/\pi^2$। একটি পরীক্ষার সাহায্যে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়।

50 জন ছাত্রের প্রত্যেকে যেমন খুশী তেমনি 5 জোড়া সংখ্যা লেখে এবং তার মধ্যে দেখা যায় যে, 154 জোড়া সংখ্যা পরস্পর মৌলিক। তার ফলে আমরা লিখতে পারি,

$$\frac{6}{\pi^2} = \frac{154}{250}$$

অর্থাৎ $\pi = 3{\cdot}12$

সত্যই অদ্ভুত! খেয়ালখুশীমত যা কিছু লেখাটা বেনিয়ম হতে পারে, কিন্তু সেই বেনিয়মের মধ্যেও লুকিয়ে আছে নিয়মের কঠিন বন্ধন।

আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে সম্ভাব্যতাবাদের প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। কারণ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে যেখানে বেনিয়ম ঘটেছে—যার খেয়াল-খুশীর হদিশ পাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয়েছে, সেখানেই তারা সম্ভাব্যতাবাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। বেনিয়মের মধ্যে লুকিয়ে আছে নিয়মের যে প্রচ্ছন্ন বন্ধন, তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মতে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি বিশ্বের মৌলিক কণাসমূহের (Fundamental particles) ব্যষ্টিগত অনুসন্ধান অসম্ভব। কেবলমাত্র সমষ্টিগতভাবেই প্রাথমিক উপাদান কণাগুলির মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব। এই সমষ্টিগত বিচারে বিজ্ঞানী আজ সম্ভাব্যতাবাদকে মেনে নিয়েছেন।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কোন তরলে ভাসমান সূক্ষ্ম পদার্থের ব্রাউনীয় গতিবৈচিত্র্য (Brownian movement) নিরূপণে এই সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্য নিয়েছিলেন।

গ্যাসের কাইনেটিক তত্ত্বে (Kinetic theory of gases) গ্যাসের অণুগুলির ভিতর গতিবেগ বন্টনের সূত্র (The law of distribution of velocities) নির্ণয়ে সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্য নেওয়া হয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা থার্মো-ডিনামিক্স (Thermodynamics) আলোচনা বর্তমানে সম্ভাব্যতাবাদের সাহায্যে করা হচ্ছে এবং অনেক নতুন তথ্য এই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

কাজেই একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সম্ভাব্যতাবাদ গণিতবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে বিশ্বের রহস্য-সন্ধানে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাব্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সেচের বৈজ্ঞানিক নীতি ও পদ্ধতি

বিমলেন্দু গাঙ্গুলী*

পশ্চিমবঙ্গে সেচ দিয়ে যে সব ফসলের চাষ করা হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রধান হলো ধান। সেচপ্রাপ্ত প্রায় ছেচল্লিশ লক্ষ একরের শতকরা ষাটভাগ জমিতেই আউস বা আমন ধানের চাষ হয়। সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণের দিক থেকে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ফসল হলো—গম, বোরো ধান, আলু, সব্জি এবং আখ। মোট যত জমি সেচের জল পায়, তার দুই-তৃতীয়াংশ জমিই জল পায় বর্ষায় বা প্রাক্-বর্ষার মরসুমে আর রবিখন্দে সেচের ব্যবস্থা আছে বাকী এক-তৃতীয়াংশ জমিতে।

জলাভাবে ফসল যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্যে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত সেচের দ্বারা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও কম নয়। জলের অপচয় ছাড়াও মাঠে জল জমলে ফসলের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। জলের সঙ্গে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান ধুয়ে যায় এবং কালক্রমে মাটিরও যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব সেচের জল ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার—যেন জলের সম্যক সদ্ব্যবহার হয় এবং প্রয়োজনের বেশী জল ফসল বা মাটির কোনও ক্ষতির কারণ না হয়। সেচের জলের সম্যক সদ্ব্যবহার করতে হলে মাটির সঙ্গে জলের এবং ফসলের সঙ্গে মাটি, জল ও আবহাওয়ার সম্পর্ক কি—সে বিষয়ে মোটামুটি অবহিত হওয়া দরকার।

মাটি, জল ও ফসলের পারস্পরিক সম্বন্ধ

জীবনধারণের প্রয়োজনে উদ্ভিদ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল টেনে নেয়। যে পরিমাণ জল এভাবে উদ্ভিদ মাটি থেকে গ্রহণ করে, তার অতি সামান্য অংশ সে নিজের দেহে সঞ্চিত রেখে বাকী প্রায় সবটাই বাষ্পাকারে ছেড়ে দেয়। উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্যে এই বাষ্পমোচন অত্যাবশ্যক। উদ্ভিদ বাষ্পাকারে যে জল বাতাসে ছেড়ে দেয়, তার পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে উদ্ভিদের চতুর্দিকের বাতাসের প্রকৃতির উপর। তাছাড়া মাটিতে জলের পরিমাণ এবং উদ্ভিদের বয়স ও অন্যান্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও এই প্রক্রিয়াকে কিছুটা প্রভাবিত করে। তবে মাটিতে জলাভাব না হলে কোনও বিস্তীর্ণ সবুজ শস্যক্ষেত্র থেকে যে বাষ্পমোচন হয়, তা একান্তভাবেই আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কড়া রোদ, শুক্‌নো ও গরম আবহাওয়ায় জলের প্রয়োজন বেশী হয়, আর স্যাঁৎসেতে, ঠাণ্ডা আবহাওয়া ও মেঘলা দিনে জলের প্রয়োজন হয় কম। কাজেই ফসলের জলের প্রয়োজন হিসেব করতে গেলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা, আবহাওয়ার অবস্থা, উদ্ভিদের বয়স ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশদভাবে জানা প্রয়োজন।

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি উপযুক্তভাবে ভিজিয়ে দিতে কতটা জলের দরকার, তা নির্ভর করে ঐ মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উপর এবং এই জলধারণ-ক্ষমতা ঐ মাটির প্রকৃতি ও গঠনের উপর নির্ভরশীল। আবার মাটি যতটা জল ধরে রাখতে পারে, তার সবটাই উদ্ভিদ কাজে লাগাতে পারে না। মাটির রসের যে অংশ উদ্ভিদের কাজে লাগতে পারে, তাকে ব্যবহারযোগ্য জল বলা হয়। একটি ভারী সেচ বা বৃষ্টির দু-দিন পরে

* গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুঁচুড়া, হুগলী।

সম্পূর্ণ জল নিষ্কাশন হয়ে গেলে মাটিতে যে জল থাকে, তাকে ঐ মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতার ঊর্ধ্বসীমা ধরা হয়। জলাভাবে উদ্ভিদ যখন শুকিয়ে যায়, তখন ঐ মাটিতে যে জল থাকে, তাকে ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতার নিম্নসীমা ধরা হয়। সাধারণ বেলে, দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা মোটামুটি নিম্নোক্তরূপ :—

মাটির প্রকৃতি	মাটির প্রতি 10 সেণ্টিমিটার গভীরতার জন্যে ফসলের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ (সেণ্টিমিটার)*
বেলে	0·4—1·2
দোঁয়াশ	1·2—1·6
এঁটেল	1·6—1·9

ফসলে সেচের রীতি ও পদ্ধতি

সেচ দেবার সময় স্বভাবতঃই তিনটি প্রশ্ন মনে আসে :—(1) কোন্ সময়ে সেচ দেওয়া উচিত; (2) প্রতিটি সেচে কি পরিমাণ জল দেওয়া যুক্তিযুক্ত এবং (3) জলের অপচয় কমিয়ে কি পদ্ধতিতে মাঠের সর্বত্র সমানভাবে ভিজিয়ে দেওয়া যায়? এই তিনটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু আলোচনা করলে সেচ সম্পর্কে আধুনিক রীতি-নীতি অনেকটা স্পষ্ট হবে আশা করা যায়।

(1) সেচের সময় নির্ধারণ

উদ্ভিদের শিকড় মাটির যে স্তরে বিস্তৃত থাকে, সে স্তরে যখন উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ এমন পর্যায়ে কমে যায় যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরিণামে ফলন ব্যাহত হতে পারে—তার আগেই সেচের ব্যবস্থা করা দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক পরিমাণ খরচ হবার পর ফসলের বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হতে সুরু করে।

মাটির জলধারণ-ক্ষমতার তারতম্যের ফলে প্রথমে বেলে মাটিতে পরে ক্রমান্বয়ে দোঁয়াশ ও এঁটেল মাটিতে সেচের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন ফসল এবং একই ফসলের বিভিন্ন বয়সে শিকড় মাটির যে গভীরতায় প্রবেশ করে, তার তারতম্য হয়। চারা গাছের শিকড় মাটির মধ্যে কম গভীরতায় যায়—কাজেই চারা গাছে বড় গাছের চেয়ে ঘন ঘন হাল্কা সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন ফসলের অধিকাংশ শিকড়ই মাটির প্রথম স্তরের 30 সেণ্টিমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণ মেঠো ফসলের ক্ষেত্রে 90 সেণ্টিমিটারের বেশী গভীরতায় খুব কম শিকড়ই পৌঁছায়। অধিকাংশ শিকড় মাটির প্রথম স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় উদ্ভিদ এই স্তর থেকেই বেশী পরিমাণে জল আহরণ করে

---

* সাধারণতঃ সেচের জল বা মাটির জলের পরিমাণ মাপা হয় সেণ্টিমিটার বা ইঞ্চিতে। কোনও নির্দিষ্ট আয়তনের জমিতে এক সেণ্টি-মিটার গভীর একটি জলের স্তর দাঁড়ালে যে পরিমাণ জল হয়, তা সচরাচর এক সেণ্টিমিটার জল বলে প্রকাশ করা হয়। অনুরূপভাবে কোনও জমির 10 সেণ্টিমিটার গভীর মাটির স্তরে ফসলের ব্যবহারযোগ্য যে জল থাকে, তা সংগ্রহ করে জমির উপরে জমা করলে যদি এক সেণ্টিমিটার গভীর একটি জলের স্তর হয়, তবে ঐ পরিমাণ জলকেও এক সেণ্টিমিটার জল বলে প্রকাশ করা হয়।

এবং তার ফলে এই স্তরটাই তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এই কারণে মাটির উপর থেকে 22 সেন্টিমিটার (আধ হাত) গভীরতায় মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ যাচাই করে সেচের সময় নির্ধারণ করা হয়। মাটিতে রসের পরিমাণ নির্ধারণের জন্মে পশ্চিমবঙ্গের চাষীদের পক্ষে সহজ পন্থা হলো:—জমির আধ হাত গভীরতায় কিছু মাটি মুঠো করে ধরে মাটির চেহারা দেখে সঙ্গের সারণী থেকে ঐ মাটিতে ফসলের ব্যবহারযোগ্য জল কতটা থাকতে পারে, তার একটা হিসাব করা। মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগে পৌঁছাবার আগেই সেচ দেওয়া দরকার।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিবেচ্য বিষয় হলো—দুটি সেচের ব্যবধান। সব মাটিতেই উদ্ভিদের অধিকাংশ শিকড় মাটির উপর দিককার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকায় সাধারণভাবে বলা যায় যে, মাটির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অনেক দিনের ব্যবধানে একটা ভারী সেচ দেবার চেয়ে ঐ সময়ে অল্প দিনের ব্যবধানে একাধিক হাল্কা সেচ ফসলের পক্ষে বেশী উপকারী।

জমিতে সেচ দেওয়া অনেক সহজ হতো যদি সময়মত প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যেত, কিন্তু অনেক সময়েই তা পাওয়া যায় না। আবার উদ্ভিদ-জীবনের সকল পর্যায়েই সেচ ফলন বাড়াতে সমান কার্যকরী নয়। এজন্যে কোন্ ফসল তার জীবনের কোন্ কোন্ পর্যায়ে কতটা খড়া সহ্য করতে পারবে—সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে সেচের জলের অধিকতর সদ্ব্যবহার হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও ফলনের জন্যে সব সময়েই মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেকের বেশী থাকা উচিত। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় জলের যোগান কম হলে ফসলের জীবনের কোন্ কোন্ পর্যায়ে সেচের প্রয়োজন বেশী, তা জানা থাকলে ঐ সীমিত জল থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক ফলন পাওয়া যেতে পারে। যেমন—কোনও ফসলে যদি পাঁচটি সেচের প্রয়োজন থাকে আর জল থাকে দুটি সেচের উপযোগী, তবে ঐ সেচ দুটি কোন্ সময়ে দিলে ফসল সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে, তা জানা প্রয়োজন।

হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে জোড়ে মুঠো করলে মাটির তালের চেহারা বা স্পর্শের সঙ্গে মাটিতে রসের পরিমাণের সাধারণ সম্পর্ক (সারণী)।

ব্যবহার যোগ্য জলের শতকরা কত ভাগ মাটিতে আছে	মুঠোর মাটি দেখতে বা অনুভব করতে কেমন হবে — কাঁকুড়ে মাটি	বেলে মাটি	দোঁয়াশ মাটি	এঁটেল মাটি
0	শুকনো ঝুরঝুরে, মাটির দানাগুলি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।	শুকনো ও ঝুরঝুরে; আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়।	শুকনো, কখনো চটাবাঁধা, কিন্তু চটা সহজে ভেঙ্গে ধূলা হয়ে যায়।	শক্ত, ডেলা, কখনও ফাটল থাকে, জমির উপরে গুঁড়া মাটি থাকতে পারে।
50 বা কম	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল তৈরি হবে না।	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল তৈরি হবে না।	খানিকটা ঝুরঝুরে, কিন্তু চাপ দিলে পরস্পর লেগে থাকে।	কিছুটা মোলায়েম, চাপ দিয়ে তাল করা যায়।
50 থেকে 75	শুকনো, চাপ দিয়েও তাল করা যাবে না।	চাপ দিয়ে তাল হলেও সহজেই তালটি ভেঙ্গে যায়।	তাল তৈরি হবে, চেষ্টা করলে মাটিকে একটা নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়, চাপ দিয়ে কিছুটা মসৃণ ও চকচকে করা যায়।	তাল তৈরি করা যাবে, বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর সাহায্যে দড়ির মত লম্বা করা যাবে।
75 থেকে জলধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত	মাটির দানাগুলি পরস্পর লেগে থাকতে চায়, চাপ দিয়ে তাল করা করা যায়, কিন্তু তা আপনা থেকেই ভেঙ্গে যায়।	তাল করা যায়, কিন্তু তা সহজে ভেঙ্গে যায়, মসৃণ ও চকচকে করা যায় না।	তাল তৈরি হবে, মাটি বেশ মোলায়েম, কাদার ভাগ একটু বেশী থাকলে সহজেই মসৃণ ও চকচকে করা যাবে।	মসৃণ ও চকচকে হবে, আঙ্গুল দিয়ে সহজেই দড়ির মত লম্বা করা যাবে।
জলধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বসীমায়	চাপ দিলেও মাটি থেকে জল বেরিয়ে আসে না, কিন্তু মাটির তালের গোল ভিজা দাগ হাতে থাকে	কাঁকুড়ে মাটির মত।	কাঁকুড়ে মাটির মত।	কাঁকুড়ে মাটির মত।
জলধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী জল থাকলে	মুঠো করে চাপ দিলে জল আলাদা হয়ে আসে	ঘাঁটলে মাটি থেকে জল আলাদা হবে।	চাপ দিয়ে জল বের করা যাবে।	মাটি ঘাঁটলে কাদা হয় এবং থিতিয়ে গেলে উপরে জল দাঁড়িয়ে যায়।

(2) প্রতিটি সেচে কত জল দিতে হবে—

মাটির ভিতরে উদ্ভিদের শিকড় যতদূর গেছে, প্রতিবার সেচে ততদূর মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করে জল দেওয়া প্রয়োজন।

মাটির ভিতরে শিকড়ের বিস্তার 90 সেন্টিমিটার (দু-হাত) গভীর পর্যন্ত হতে পারে। পূর্বোক্ত হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মাটির ঐ স্তরের ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা :—বেলে—3·6 থেকে 10·8 সেঃ মিঃ, দোঁয়াশ—10·8 থেকে 14·4 সেঃ মিঃ এবং এঁটেল—14·4 থেকে 17·1 সেঃ মিঃ। ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক পরিমাণ খরচ হতেই পুনরায় সেচ দেওয়া হলে—বেলে, দোঁয়াশ এবং এঁটেল মাটির উপর দিককার 90 সেঃ মিঃ স্তর উপযুক্তভাবে ভিজিয়ে দিতে যথাক্রমে 1·8 থেকে 5·4, 5·4 থেকে 7·2 এবং 7·2 থেকে 8·6 সেঃ মিঃ জল প্রতিটি সেচে দেওয়া দরকার। এই হিসাব থেকে বোঝা যায় যে, প্রধানতঃ মাটির ব্যবহারযোগ্য জলধারণ-ক্ষমতা এবং শিকড়ের বিস্তার বিবেচনা করে প্রতিটি সেচে মোটামুটি দুই সেঃ মিঃ থেকে আট সেঃ মিঃ পর্যন্ত জল প্রয়োগ করবার প্রয়োজন হতে পারে। চারাগাছের শিকড় সাধারণতঃ 90 সেঃ মিঃ গভীরে যায় না, তাই সে ক্ষেত্রে কম জল দেওয়া উচিত। মোটা দানার বেলে মাটিতে সবচেয়ে কম জল লাগবে, আর মাটির দানা যত মিহি হবে, মাটিতে কাদার ভাগ যত বাড়বে, প্রতি সেচে দেয় জলের পরিমাণ সেই অনুপাতে বাড়বে। এই জন্যে এঁটেল মাটিতে সবচেয়ে বেশী জল দিতে হয়।

এই হিসাবে ধরা হয়েছে যে, সেচ ছাড়া অন্য কোনও সূত্রে শিকড়ের আয়ত্তের মধ্যে জল আসছে না। বস্তুতঃ বৃষ্টিপাত বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চাষের জমিতে মাটির ভিতর থেকে যথেষ্ট রস শিকড়ের আয়ত্তের মধ্যে চুঁইয়ে উঠে আসে। মাটি খুঁড়লে যে গভীরতায় জল পাওয়া যায়, মাটির প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ঐ স্তর থেকে দেড় কি দু-হাত পর্যন্ত বেশ কিছুটা রস চুঁইয়ে উঠে আসে। এভাবে যখন ফসলের জলের প্রয়োজন খানিকটা মেটে, তখন পূর্বোক্ত হিসাব অপেক্ষা কম জলেই সেচের প্রয়োজন মিটে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছুটা বেশী জল প্রয়োগ করতে হয়; কারণ সেচ দেবার সময় যে অপচয় অনিবার্য, তা পূরণ করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

(3) ফসলে সেচ দেবার পদ্ধতি

পূর্ববর্তী আলোচনার ধারানুযায়ী অল্প কথায় বলা যায় যে, সেচ দিয়ে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট স্তরের মাটির জলধারণ-ক্ষমতার উর্ধ্ব সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করে দিতে হবে, সেই সঙ্গে আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শিকড়ের আয়ত্তের বাইরে যেন জল বিশেষ না যায়, অর্থাৎ অপচয় যথাসম্ভব কম হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মাটির প্রকৃতি, গড়ন, ফসলের প্রয়োজন এবং জলের পরিমাণ প্রভৃতি বিবেচনা করে মাঠে সেচ দেবার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ফসলে সেচ দেবার ঐ সকল বিভিন্ন পদ্ধতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) মাটির উপর দিয়ে জল গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেচ দেওয়া; (খ) মাটির তলায় বসানো পাইপের সাহায্যে শিকড়ের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া; (গ) মাঠের উপরে পাতা সচ্ছিদ্র পাইপ থেকে বৃষ্টিধারার মত জল ছিটিয়ে দেওয়া। এদের মধ্যে প্রথম ধারাটিই পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা অবলম্বন করেন। অন্য দুটি ধারা আর্থিক ও প্রযুক্তিগত কারণে এই রাজ্যে অপ্রচলিত।

এক কথায়, পশ্চিমবঙ্গের জমি সমতল। এই রাজ্যে চাষীরা সেচের জল মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে প্রয়োগ করেন। সেচের পদ্ধতি হিসেবে এটি কম খরচসাপেক্ষ সন্দেহ নেই, কিন্তু এভাবে মাঠের সর্বত্র সমানভাবে ভিজিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে

প্রয়োজনীয় জল পৌঁছানোর মধ্যে প্রথম অংশের মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণ জল ঢুকে পড়ে। চেষ্টা করে এতে অপচয়ের পরিমাণ কিছুটা কমানো যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই সেচের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে ফসল বা মাটির ক্ষতি না হয়।

মাঠের উপর দিয়ে গড়িয়ে জল দেবারও নানা রকম প্রথা প্রচলিত আছে। সেচের পদ্ধতি হিসাবে এসব বিভিন্ন প্রথার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা দরকার। পশ্চিম বাংলার সাধারণ চাষীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতির বিষয় এখানে আলোচনা করা হলো।

ফসলে সেচ দেবার কম খরচ ও সবচেয়ে সহজ উপায় হলো—বন্যার জলের মত সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ধারায় মাঠে জল ঢুকিয়ে দেওয়া। যে ক্ষেত্রে কম খরচে প্রচুর জল পাওয়া যায় এবং আর্থিক লাভের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকায় সেচের জন্যে বেশী খরচ পোষায় না—সে সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এভাবে জল দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে জমি সমান করবার বালাই নেই এবং তার ফলে জলের যথেষ্ট অপচয় হয়। আজকের দিনের সেচ ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেচের জল থেকে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন। এই ধরণের অনিয়ন্ত্রিত সেচের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানসম্মত সেচ-পদ্ধতি অবলম্বন করে জলের অনেক বেশী সদ্ব্যবহার হতে পারে। জমিটিকে একটা নির্দিষ্ট দিকে অল্প ঢালু রেখে, ঐ ঢালু বরাবর সাত-আট আঙ্গুল উঁচু কয়েকটি ছোট আল দিয়ে জমিটাকে কয়েকটি লম্বা ফালিতে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতিটি ফালির উপর দিক থেকে জল ছাড়তে হবে, যেন দুটি আলের মধ্যবর্তী জমি ভিজিয়ে জল সহজেই ঢালুর দিকে গড়িয়ে যায়। মাটির প্রকৃতি ও জলের স্রোতের আকার অনুযায়ী এই ফাটলগুলি ছোট বড় হতে পারে। সাধারণতঃ তিন থেকে দু-হাত চওড়া ও ত্রিশ থেকে ষাট হাত লম্বা ফাটল করা সুবিধাজনক। বেলে মাটির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এঁটেল মাটির জমিতে প্রয়োজন-বোধে এর চেয়ে বড় খণ্ডেও জমিকে ভাগ করা যেতে পারে। ঘন করে বোনা ফসল—যেমন, ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা ধান, গম ইত্যাদির জন্যে এই পদ্ধতি বেশ কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে কম খরচে এবং কম পরিশ্রমে সেচ দেওয়া হয় এবং বোনার পরবর্তী ফসল পরিচর্যার কাজও সহজেই সম্পন্ন করা যায়। জমিতে সামান্য ঢাল থাকায় সেচের অতিরিক্ত জল বা বৃষ্টির জল সহজে বেরিয়ে যেতে পারে। এটি এই রাজ্যের চাষীদের গ্রহণযোগ্য একটি উন্নত সেচপদ্ধতি।

একটি বড় জমিকে সেচের সুবিধার জন্যে অন্যভাবেও ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করা চলে। এজন্যে তিন থেকে ছয় হাত চওড়া এবং ছয় থেকে বারো হাত লম্বা ছোট ছোট খণ্ডে জমিটিকে ভাগ করে জল ধরে রাখবার জন্যে প্রতি খণ্ডের চারধারে আল দিয়ে একটির পর একটি খণ্ড নালা থেকে জলে ভরে দিতে হবে। যখন জমি মোটামুটি সমান, কোনও দিকে বিশেষ ঢাল নেই এবং জলের স্রোত এক-একটি খণ্ডকে তাড়াতাড়ি ভরে দেবার উপযোগী—সে সব ক্ষেত্রে জলের সদ্ব্যবহারের জন্যে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী। এজন্যে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। জলের স্রোত বড় হলে খণ্ডগুলি 400 থেকে 600 বর্গমিটার (পাঁচ-সাত কাঠা) আয়তনের পর্যন্ত হতে পারে। ধান, গম, ভুট্টা, আখ, পেঁয়াজ, তামাক, বিভিন্ন সব্জি প্রভৃতি ফসলের জন্যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলে। তবে পূর্বোক্ত পদ্ধতির তুলনায় এভাবে সেচ দিলে নালা ও আলের জন্যে অপেক্ষাকৃত বেশী জমি ছাড়তে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত সেচ-পদ্ধতিগুলির মধ্যে জলের সদ্ব্যবহারের দিক থেকে সবচেয়ে যুক্তিসম্মত—আলুতে যেভাবে দুই ভেলির মধ্যে নালায় জল দেওয়া হয়। যে সব ফসল সারি করে চাষ করা হয় এবং দুই সারির মধ্যে নালা করা হয়, যেমন—আলু, বেগুন, টোম্যাটো, শীতের সব্জি, আখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। এই পদ্ধতিতে ছোট বড় সকল ধরণের জলস্রোতকেই এক বা একাধিক নালায় বাহিত করে ব্যবহার করা চলে। মোটামুটি সমতল বা অল্প গড়ানে জমির পক্ষে এই পদ্ধতি খুবই উপযুক্ত। যে দিকে জল ছাড়া হবে, সে দিকে নালাগুলি একটু ঢালু রাখা সুবিধাজনক। সাধারণতঃ নালার দৈর্ঘ্য 20-25 হাত হয়, তবে এঁটেল মাটিতে, বিশেষ করে আখের জমিতে এর চেয়ে লম্বা নালাও ব্যবহার করা হয়। এখানে আলোচিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিতে জলের অপচয় সবচেয়ে কম হয় এবং উদ্ভিদের গোড়ায় জল বসে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম। তবে এই ক্ষেত্রে জমি তৈরি এবং ফসলের অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ব্যয়সাপেক্ষ।

সেচের জন্যে প্রস্তুতি

ফসলে সেচ দিতে হলে জমি তৈরির সময় থেকেই যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন। ফসল নির্বাচনের সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কখন কি পরিমাণ সেচের জল পাওয়া যাবে, তাও বিবেচনা করা দরকার—বিশেষত: ক্যানেলের জলে সেচ দিতে হলে। মাটির প্রকৃতি, মাঠের গড়ান, ফসলের জলের প্রয়োজন এবং জলের স্রোত কত বড়—প্রভৃতি বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বীজ বোনবার আগেই উপযুক্ত সেচ-পদ্ধতি বেছে নেওয়া প্রয়োজন এবং তদনুযায়ী চাষের সময় বা সুযোগমত তার পরে সেচের জন্যে জমি তৈরি করে নেওয়া দরকার। এই কাজে প্রাথমিক প্রয়োজন জমিটিকে নিখুঁতভাবে সমান করা, যাতে জলের বিস্তারে কোনও অসুবিধা না হয় এবং সেচের পরে মাঠের মধ্যে এখানে-সেখানে জল দাঁড়িয়ে না যায়। জমিটিকে সুবিধামত একদিকে ঢালু রাখা উচিত—যাতে সেচের জল নিয়ন্ত্রিত পথে সহজে বাহিত করা যায়। বাঁধ, নালা ইত্যাদিতে চাষের জমি যত কম নষ্ট হয়, তার চেষ্টা করা আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান ফসলে সেচের ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ফসলের মধ্যে তণ্ডুলজাতীয় ফসল, যথা—ধান ও গমই প্রধান। এই জাতীয় ফসলের জীবনে বিয়ান বের হবার সময়, ফুল আসবার সময় এবং দানা পুষ্ট হবার সময় জলাভাব হলে ফসল ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ঐ সময়গুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে জলের যোগান দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আবহাওয়া এবং মাটির পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে একই ফসলের সেচের প্রয়োজনে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। কাজেই কোনও ফসলে এতদিন বাদে এই পরিমাণ জল দেওয়া উচিত—সর্বত্র প্রযোজ্য এমন কোনও সূত্র নির্ধারণ করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

ধান—জমিতে জল দাঁড়ালে ধান গাছ সহ্য করতে পারে। এজন্যে ধানে অতিরিক্ত জল দেওয়া হয় এবং ফলে প্রচুর জলের অপচয় হয় বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। এই অপচয় কমানো সম্ভব হলে বিভিন্ন সেচ প্রকল্প আরও লাভজনক হতে পারে।

বিয়ান বেরোবার সময়, শীষ বেরোবার একমাস আগে থেকে শীষ বেরোবার সময় এবং দানায় দুধ থাকা অবস্থায় জমিতে জলাভাব হলে ধানের ফসল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধানের জীবনের অন্যান্য পর্যায়ে সাময়িক খরা হলেও

ফসল তেমন ব্যাহত হয় না। ধানের জমিতে সব সময় সামান্য জল থাকা বাঞ্ছনীয়, যেন মাটি কখনও না ফাটে। জল স্থির থাকবার চেয়ে ধীরে প্রবাহমান হলে ভাল হয়। জমির জলে প্রতিফলিত আলো সম্ভবতঃ ধানের ফলন বাড়াতেও সাহায্য করে। অন্যদিকে পাঁচ সেন্টিমিটারের বেশী দাঁড়ানো জল ধানের জন্যে অপ্রয়োজনীয় তো বটেই, বেঁটে জাতের ধানের পক্ষে বোধ হয় ক্ষতিকারকও।

গম—কয়েক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হতো না। উচ্চ ফলনক্ষম বেঁটে জাতের গমের প্রচলন হবার পর থেকে গমের চাষ এই রাজ্যে দ্রুত বেড়ে চলেছে। ভাল ফলন পেতে হলে গমে সেচ দেওয়া দরকার। ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, গমের জীবনের সকল পর্যায়ে সেচ সমান কার্যকরী নয়। দিল্লীতে একটি চার বা সাড়ে চার মাসের বেঁটে জাতের গমের ফসলে সর্বোত্তম ফলনের জন্যে বোনবার আগে একটি এবং অঙ্কুরোদ্গমের পরে পাঁচটি—মোট ছয়টি সেচের দরকার। উক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে সেচের জলের যোগান অনুযায়ী ঐ পাঁচটি সেচ নিম্নোক্ত প্রয়োগসূচী অনুযায়ী ব্যবহার করলে জলের সর্বোত্তম ব্যবহার হতে পারে।

সেচের জলের যোগান (সেচের সংখ্যার হিসাবে)			সর্বোত্তম ফলনের জন্যে সেচ দেবার সময় (দিনের হিসাবে ফসলের বয়স)
এক	...	..	25
দুই	...	...	25, 65
তিন	...	...	25, 65, 105
চার	...	...	25, 45, 65, 105
পাঁচ	...	...	25, 45, 65, 85, 105

অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের পরে মাত্র দুটি সেচ দেবার মত জল পাওয়া গেলে, ঐ সেচ দুটির প্রথমটি ফসলের 25 দিন বয়সে এবং দ্বিতীয়টি 65 দিন বয়সে দিলে সবচেয়ে ভাল ফলন আশা করা যায়।

গমে সেচ দেবার এই ধরণের কোনও সময়-সূচী পশ্চিমবঙ্গের জন্যে তৈরি হয় নি। এই রাজ্যে শীত স্বল্পস্থায়ী হওয়ায় গম সাধারণতঃ সাড়ে তিন মাসের ফসল। বিয়ান বেরোবার সময়, থোড় আসবার সময় এবং দানা পুষ্টির সময়—মোটামুটি তিনবার সেচ দিয়েই এই রাজ্যে গমের ভাল ফলন আশা করা যায়।

আলু—অন্যান্য ফসলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে আলু অনেক বেশী শর্করাজাতীয় উপাদান সঞ্চয় করে। এজন্যে আগাগোড়াই এই ফসলে জল সহজলভ্য হওয়া দরকার। আবার আলুর জমিতে জল বসে গেলেও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। পরীক্ষায় দেখা গেছে—আলুর জমির 15 সেন্টিমিটার গভীরতায় মাটিতে ব্যবহারযোগ্য জলের মোটামুটি দুই-তৃতীয়াংশ থাকতেই আবার সেচের প্রয়োজন। এজন্যে আলুর জমিতে অল্পদিনের ব্যবধানে হাল্কা ধরণের সেচ দেওয়া যুক্তিযুক্ত। 20-40 দিন বয়সে জলাভাব হলে আলুর ফলন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে।

আখ—দশ, বারো মাসের এই ফসল এই রাজ্যে সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসে লাগানো হয় এবং পৌষ-মাঘে কাটা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুড়ি আখেরও যথেষ্ট চাষ হয়। বর্ষা সুরু হলে আখের বিশেষ জলাভাব হয় না। বর্ষার পরে আখ ক্রমে পাকবার দিকে যায়—এই সময়ে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকায় গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন দেখা যায় না। লাগাবার পর থেকে বর্ষা সুরু হওয়া পর্যন্ত (ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ) চারা আখের যথেষ্ট জলের দরকার। এই সময় জলাভাবে ফসলের বৃদ্ধি ও বিয়ান বেরোনো ব্যাহত

হলে শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। ভাল ফলন পেতে হলে এই প্রাক্-মৌসুমী সময়ে আখের জমির 22 সেন্টিমিটার (আধ হাত) গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগের নীচে যাওয়া উচিত নয়।

অন্যান্য ফসল—শীতের সব্জি, যথা—ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি ফসলে ব্যাপকভাবে সেচের ব্যবহার হয়। মোটামুটিভাবে এদের সেচের প্রয়োজন আলুর মতই। টোম্যাটো অপেক্ষাকৃত বেশী খড়া সহ্য করতে পারে।

ভুট্টা গাছের মাথায় ফুল আসবার সময় থেকে দানায় দুধ থাকা পর্যন্ত জলাভাব খুবই ক্ষতিকারক। আবার ভুট্টা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়িয়ে গেলেও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভুট্টা ক্ষেতের আধ হাত গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক খরচ হবার আগেই সেচের ব্যবস্থা করা দরকার।

রবিখন্দে ডালজাতীয় ফসল সাধারণতঃ মাটিতে সঞ্চিত রসের উপরে নির্ভর করেই চাষ করা হয়। ফুল ও ফল ধারণের সময় ডালের জমিতে জলাভাব দেখা দিলে প্রয়োজনমত একবার সেচ দিয়ে ভাল ফলন আশা করা যায়।

আজকাল কোথাও কোথাও প্রয়োজনবোধে পাটেও সেচ দেওয়া হয়। পাট ক্ষেতের ত্রিশ সেন্টিমিটার গভীরতায় ব্যবহারযোগ্য জলের অর্ধেক থাকতেই সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

সেচের জল ব্যবহারে উৎকর্ষ সাধনের প্রধানতঃ দুটি পন্থা—সম্ভাব্য সকল প্রকারে জলের অপচয় বন্ধ করা এবং সেচের জল থেকে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন। উৎপাদন বাড়াবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেচের সঙ্গে উন্নত বীজ ও পর্যাপ্ত সার ব্যবহার, উপযুক্তভাবে রোগ, পোকা ও আগাছা দমন এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পর্যায়সারণীতে ইউরেনিয়ামপূর্ব শূন্যস্থান পূরণকারী মৌলসমূহ

ললিতা কুণ্ডু*

একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে সম্মানার্ঘ্য-রূপে একটি অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানী উপহার দেবার ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হলেও সত্য সত্যই তা ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা এই উপহার দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডি. মেণ্ডেলিয়েভকে। এক-শ' বছর আগে অ্যালুমিনিয়ামের যা দাম ছিল, তা এখন অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। মেণ্ডেলিয়েভের বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা তাঁকে যে উপহারটি দিয়েছিলেন, সেটি অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানীটি তখন শুধু শ্রদ্ধার্ঘ্য বলে নয়, আর্থিক মূল্যের বিচারেও অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচনা করা হতো। বিগত শতকে অ্যালুমিনিয়াম আকর থেকে অ্যালুমিনিয়াম প্রচুর পরিমাণে সস্তায় নিষ্কাশন করবার পদ্ধতি জানা ছিল না, কাজেই স্বল্পতাহেতু অ্যালুমিনিয়াম তখন অন্যতম মূল্যবান ধাতু হিসাবে গণ্য হতো। এক-শ' বছর আগের এই মূল্যবান ধাতুটি এখন বহুল ব্যবহৃত একটি সস্তা ধাতু, কিন্তু মেণ্ডেলিয়েভ-আবিষ্কৃত পর্যায়সারণী বহুল ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও আজও তা অমূল্য। তিনি আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়সারণীতে সাজিয়ে এবং অনাবিষ্কৃত কতকগুলি মৌলের ভৌত ও

* রসায়ন বিভাগ, বিদ্যাসাগর মহিলা কলেজ, কলিকাতা-6

রাসায়নিক ধর্মাবলীর পূর্বাভাস দিয়ে বিজ্ঞান-জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর এই কাজের ফলে রসায়নশাস্ত্র একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিজ্ঞান-জগতে রসায়নশাস্ত্রের দ্রুত প্রগতি সূচিত হয়।

পর্যায়সারণীতে প্রত্যেকটি মৌলের পরমাণু-ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত ঘর আছে এবং প্রত্যেক মৌল তার নির্দিষ্ট পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত ঘরে বসে। 1930 সাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলগুলিকে পর্যায়সারণীতে সাজাতে গিয়ে দেখা গেল, চারটি ঘরের অধিকারী মৌলগুলি তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত এবং এদের পরমাণুক্রমাঙ্ক যথাক্রমে 43, 61, 85 এবং 87। এই সকল মৌলের কেন্দ্রকগুলির যেসব সম্ভাব্য গঠন হতে পারে, তাদের তত্ত্বগত দিক বিচার করে অনুমান করা হয়েছিল যে, এদের সকলেই তেজস্ক্রিয়, বেশ অস্থায়ী এবং এজন্যেই প্রকৃতিতে এদের দেখা যায় নি। 1932 সালে পরমাণুর অন্যতম আদিকণা নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়। এই নিউট্রন এবং অন্যান্য কণাগুলি দিয়ে বিভিন্ন পরমাণুর কেন্দ্রকগুলিকে আঘাত করবার ফলে যে মৌলগুলি পাওয়া যায়, তার অনেকগুলিই 1930-এর পূর্বে অদৃষ্ট ছিল। 43, 61, 85 এবং 87 পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত মৌলগুলি এভাবে বিভিন্ন আঘাতকারী কণা দিয়ে বিশেষ কয়েকটি মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আঘাত করবার ফলে পাওয়া যায়। আঘাতক্রিয়ালব্ধ মৌলটির পর্যায়-সারণীস্থিত প্রতিবেশী মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রক আঘাত করবার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয় এবং তাত্ত্বিক বিচারে যে কণার দ্বারা আঘাতের ফলে ঈপ্সিত মৌলটি পাওয়া যেতে পারে, তাকে আঘাতকারী কণা হিসাবে পছন্দ করা হয়। সাধারণতঃ আলফা কণা (α), ডয়টেরন, নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি আঘাতকারী কণারূপে ব্যবহৃত হয়। 43, 61, 85 এবং 87 মৌলগুলি কিভাবে পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

1. বাঞ্ছিত মৌল (Z = পরমাণুক্রমাঙ্ক = 43): মলিবডেনাম (Z = 42) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে ডয়টেরন কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে টেকনেশিয়াম (Z = 43) নামে পরিচিত মৌলটি পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়াটি ডি, এন (d, n) ক্রিয়ারূপে পরিচিত।

$$ {}^{95}_{42}\text{Mo} + {}^{2}_{1}\text{H} \longrightarrow \left({}^{97}_{43}\text{Tc} \right) \longrightarrow {}^{96}_{43}\text{Tc} + {}^{1}_{0}\text{n} $$
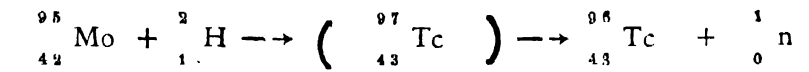
মলিবডেনাম পরমাণু — ডয়টেরন — টেকনেশিয়ামের অতি-অস্থায়ী সমস্থানিক — টেকনেশিয়াম — নিউট্রন

অন্যান্য কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়ার দ্বারা টেকনেশিয়ামের বিভিন্ন সমস্থানিক পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, টেকনেশিয়ামের সমস্ত সমস্থানিক তেজস্ক্রিয়। গ্রীক শব্দ টেকনেটস (Technetos) মানে কৃত্রিম এবং মানুষ কর্তৃক কৃত্রিম উপায়ে 43-মৌলটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলেই এর নাম দেওয়া হয়েছিল টেকনেশিয়াম। শ্লথগতি নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রকীয় ক্রিয়াধারে (নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর) কিলোগ্রাম পরিমাণ টেকনেশিয়াম তৈরি করা এখন কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়। পর্যায়সারণীতে অবস্থান বিচারে টেকনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ ও রেনিয়ামের সমবর্গী (বর্গ VII-A)। ম্যাঙ্গানিজ টেকনেশিয়ামের পূর্বসূরী এবং রেনিয়াম উত্তরসূরী। সমবর্গী হবার দরুণ ম্যাঙ্গানিজ, টেকনেশিয়াম এবং রেনিয়ামের কিছু কিছু ধর্মে সাদৃশ্য দেখা যায়।

2. বাঞ্ছিত মৌল (Z = 61): নিওডিমিয়াম (Z = 60) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আলফা

কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে প্রমিথিয়াম (Z=61) নামে পরিচিত মৌলটি পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়াটি আলফা, প্রোটন (α,n) ক্রিয়ারূপে পরিচিত।

$$^{143}_{60}\mathrm{Nd} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{146}_{61}\mathrm{Pm} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$$

নিওডিমিয়াম পরমাণু আলফা কণা প্রমিথিয়াম প্রোটন
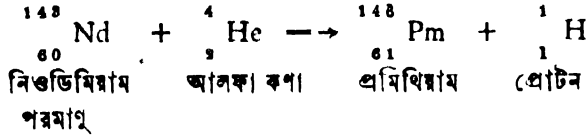
পূর্বে প্রমিথিয়ামের নাম ছিল। ইলিনিয়াম প্রমিথিয়াম তেজস্ক্রিয় এবং এরও বিভিন্ন সমস্থানিক আছে। এটি বিরলমৃত্তিক (Rare earth) মৌলশ্রেণীর অন্তর্গত। খুব ছোট ছোট ব্যাটারী তৈরি করতে প্রমিথিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে। খুব ভাল রাসায়নিক ব্যাটারীও ছয় মাসের বেশী চলে না, কিন্তু প্রমিথিয়াম-পরমাণুব্যাটারী পাঁচ বছর সমানে কাজ করে এবং শ্রবণযন্ত্র থেকে শুরু করে রকেট নিয়ন্ত্রণেও এটি ব্যবহৃত হয়। গ্রীক পুরাণের বীর প্রমিথিয়ুসের নামানুসারে এই মৌলের নাম দেওয়া হয়েছে প্রমিথিয়াম।

3. বাঞ্ছিত মৌল (Z—85): বিসমাথ (Z—83) মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রককে আলফা কণার দ্বারা আঘাত করবার ফলে বর্তমানে অ্যাস্টাটিন নামে পরিচিত (Z=85) মৌলটি পাওয়া যায়। এটি আলফা, দ্বিনিউট্রন (α, 2n) কেন্দ্রাঘাতন ক্রিয়া। কর্সন, ম্যাকেন্‌জি এবং সেগ্‌রে এই ক্রিয়ার দ্বারা অ্যাস্টাটিন আবিষ্কার করেন।

$$^{209}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow {}^{211}_{85}\mathrm{At} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

বিসমাথ পরমাণু আলফা কণা অ্যাস্টাটিন নিউট্রন
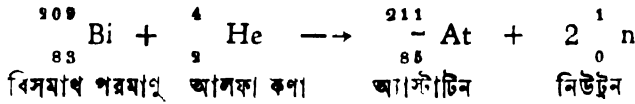
অ্যাস্টাটিনের এই সমস্থানিকটি তেজস্ক্রিয় এবং এর অর্ধায়ুকাল 7·5 ঘণ্টা। এটি আলফা কণা নির্গমনের ফলে বিসমাথের অন্য একটি সমস্থানিকে রূপান্তরিত হয়।

$$^{211}_{85}\mathrm{At} \longrightarrow {}^{207}_{83}\mathrm{Bi} + \mathrm{He}$$

অ্যাস্টাটিন বিসমাথ 207 আলফা কণা
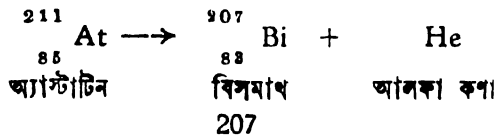
ইলেকট্রন অধিকার করবার ফলে অ্যাস্টাটিন অ্যাক্টিনিয়াম C′ মৌলে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাক্টিনিয়াম C′ মৌলটি অ্যাক্টিনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌলসারির অন্তর্গত এবং এটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সীসায় পরিণত হয়।

$$^{211}_{85}\mathrm{At} + {}^{0}_{1}e^{-} \longrightarrow {}^{211}_{84}\mathrm{Ac\,C'} \longrightarrow {}^{207}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$

অ্যাস্টাটিন ইলেকট্রন অ্যাক্টিনিয়াম C′ সীসক-207 আলফা কণা
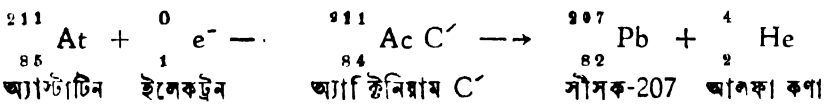
পর্যায়সারণীতে অ্যাস্টাটিন আয়োডিনের সমবর্গী এবং উত্তরসূরী হবার দরুণ আয়োডিনের ধর্মাবলীর সঙ্গে এর ধর্মাবলীর তুলনামূলক বিচারে কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যাস্টাটিন কিছুটা ধাতব গুণসম্পন্ন এবং পর্যায়সারণীতে এর অবস্থিতি বিচারে এটাই প্রত্যাশিত, কারণ অ্যাস্টাটিন হ্যালোজেন বর্গের (বর্গ-VII-B) গুরুতম মৌল। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অসুখে চিকিৎসকেরা অ্যাস্টাটিন ব্যবহার করবার চেষ্টা করছেন। এই অসুখে থাইরয়েডে আয়োডিন জমা হতে থাকে। অ্যাস্টাটিন আয়োডিনের সমবর্গী হওয়ায় যখন অ্যাস্টাটিন প্রয়োগ করা

হয়, তখন অ্যাস্টাটিনও থাইরয়েডে জমা হয় এবং অ্যাস্টাটিনের তেজস্ক্রিয় ধর্মাবলী রোগ নিরাময়ে অন্যান্য সাহায্য করে থাকে।

4. আকাঙ্ক্ষিত মৌল ($Z=87$): 1939 সালে মাদমোয়াজেল এম. পেরে (Perey) এটিকে অ্যাক্টিনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌল সারির অন্তর্গত অ্যাক্টিনিয়াম-K নামে চিহ্নিত করেন। বর্তমানে এটি ফ্রান্সিয়াম ($Z=87$) নামে পরিচিত।

$$^{227}_{89}Ac \longrightarrow {}^{223}_{87}Ac\text{-}K + {}^{4}_{2}He$$

অ্যাক্টিনিয়াম-227　অ্যাক্টিনিয়াম K　আলফা কণা
(ফ্রান্সিয়াম-223)

$$Ac\text{-}X + {}^{0}_{1}e$$
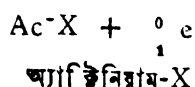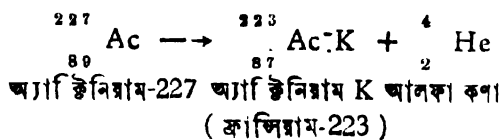
অ্যাক্টিনিয়াম-X

ফ্রান্সিয়াম-223 বিটা কণা নির্গমনের ফলে অ্যাক্টিনিয়াম-X-এ রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রকীয় ক্রিয়ায় ফ্রান্সিয়ামের অন্যান্য সমস্থানিক পরে আবিষ্কৃত হয়।

$$^{226}_{91}Pa \xrightarrow{-\alpha} {}^{222}_{89}Ac \xrightarrow{-\alpha} {}^{218}_{87}Fr \xrightarrow{-\alpha} {}^{214}_{85}At$$

প্রোট্যাক্টিনিয়াম　অ্যাক্টিনিয়াম-222　ফ্রান্সিয়াম-218　অ্যাস্টাটিন-214

$$^{214}_{85}At \xrightarrow{-\alpha} {}^{210}_{83}Ra\text{-}E \longrightarrow$$

ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয় মৌলসারির ন্যায় পরবর্তী ক্রিয়াগুলি
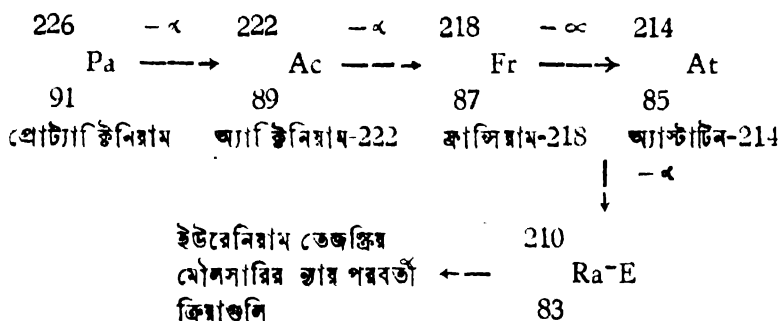
ফ্রান্সিয়াম প্রথম বর্গের গুরুতম মৌল। অতএব এটি প্রথম বর্গস্থিত ক্ষার ধাতুগুলির সমধর্মী হবে, এটি প্রত্যাশিত ছিল এবং বাস্তবে দেখা গেছে, এটিই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ধাতু (ক্ষার ধাতুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তীব্র মাত্রায় রাসায়নিক সক্রিয়তা)। ক্ষার ধাতুর অন্যান্য ধর্মের সঙ্গেও ফ্রান্সিয়ামের নানা সাদৃশ্য আছে।

মেণ্ডেলিয়েভের পূর্বাভাস অনুযায়ী অনেকগুলি আবিষ্কৃত মৌল 1925 সালের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে যায়, কিন্তু টেকনেশিয়াম, প্রমিথিয়াম, অ্যাস্টাটিন এবং ফ্রান্সিয়াম তখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। এই চারটি মৌল বাদে অন্য যে সব মৌল মেণ্ডেলিয়েভের পূর্বাভাস অনুযায়ী সত্বর খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি হলো—স্ক্যাণ্ডিয়াম (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নামানুসারে), জার্মেনিয়াম (জার্মেনীর নামানুসারে) পোলোনিয়াম (পোল্যাণ্ডের নামানুসারে), হ্যাফ্‌নিয়াম (কোপেনহেগেন থেকে), রেনিয়াম, রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম এবং প্রোট্যাক্টিনিয়াম। মেণ্ডেলিয়েভ এসব মৌলের ধর্মাবলী সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সেগুলি আশ্চর্য রকম সফল ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

43, 61, 85 এবং 87 পরমাণুক্রমাঙ্কচিহ্নিত ঘরগুলির অধিকারী চারটি মৌল আবিষ্কৃত হবার পর পর্যায়সারণীতে ইউরেনিয়ামপূর্ব আর কোন শূন্য ঘর রইলো না।

ভারতে নৃ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের পঞ্চাশ বছর

রেবতীমোহন সরকার*

একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ভারতে নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের অর্ধ শতাব্দীকাল ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকৃত হলেও সাধারণ্যে এর প্রচার বিশেষভাবে সীমিত, অথচ ভারতে এক সময় নৃ-বিজ্ঞানের চর্চা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বিভিন্ন ফল প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ শাসক, খৃষ্টধর্ম প্রচারক এবং পরিব্রাজকের দল এদেশে নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের বুকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার সুষ্ঠু দেশ শাসনের জন্যে ভারতের মত বিচিত্র জনগোষ্ঠীঅধ্যুষিত দেশে ধর্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারের এক সার্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করলো। পরিকল্পনামত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিযুক্ত করা হয়। এদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভারতের নানা জাতি-উপজাতির উপর বিবরণী রচিত হতে থাকে। পূর্ব ভারতে রিস্‌লে (Risley), ডাল্টন (Dalton) এবং ওম্যালি (O' Malley), মধ্য ভারতে রাসেল (Russel), উত্তর ভারতে ক্রুক (Crooke) এবং দক্ষিণ ভারতে থার্স্টন (Thurston) নানা সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে সামগ্রিক তালিকা এবং রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এই সমস্ত তথ্যাবলীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশী শাসকদের ভারতের সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা। কিন্তু এই সকল বিবরণী যখন প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হলো, তখন সুরু হলো এককভাবে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির অনুসন্ধান। উপজাতীয়দের বিচিত্র জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং সমাজব্যবস্থার ধারা বিদেশীয় শাসকদের পদে পদে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। সেজন্যেই নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শাসকদের উপজাতীয় গোষ্ঠীসমূহের জীবনধারা অনুসন্ধানে নিয়োগ করা হলো। প্রতিটি উপজাতিকে কেন্দ্র করে প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা সুরু হয়ে গেল। এই সমস্ত গ্রন্থে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা, যথা—শারীরিক নৃ বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, ভাষা, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতির উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। এছাড়া কতিপয় খৃষ্টধর্ম প্রচারক, যেমন—বডিং (Bodding), হফম্যান (Hoffman) প্রভৃতি উপজাতীয়দের জীবনধারার নানা দিকে আলোক সম্পাতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতীয় পণ্ডিতেরা এই সামগ্রিক অনুসন্ধানমালায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায় এবং এল, কে, অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের যথাক্রমে ছোটনাগপুর এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির উপর গ্রন্থ রচিত হয়। এঁরা প্রত্যেকেই বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীদের নিকট অনুসন্ধান বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং ফলতঃ এঁদের কাজ মোটামুটিভাবে বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞান চর্চার আদর্শে রূপায়িত হয়েছিল। সার এডওয়ার্ড

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ; কলিকাতা-9

গেটের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিহারে নৃ-বিজ্ঞান চর্চার এক বিশেষ পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শরৎচন্দ্র রায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1920 খৃষ্টাব্দে নৃ-বিজ্ঞানে বক্তৃতাদানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই বক্তৃতামালাই (Principles and Methods of Physical Anthropology) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভারতে নৃ-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম এবং সর্বাঙ্গীণ স্বীকৃতি। এই সময় থেকেই ভারতে শাসনসংক্রান্ত মহল থেকে অধিবিদ্য মণ্ডলে নৃ-বিজ্ঞানের আগমন বার্তা সূচিত হয়েছিল। আমাদের দেশে নৃ-বিজ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে স্বাতন্ত্র্য তা বিধানের পথিকৃৎ হলেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 1920 খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম নৃ-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর বিভাগ যুক্ত হয় এবং সেখানে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব—এই তিনটি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ সর্বপ্রথম এই নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে অনন্তকৃষ্ণ আয়ার দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতির উপর প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণার ভিত্তিতে মৌলিক রচনা প্রকাশ করে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী মহলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের গভীরতা তদানীন্তন বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানী টাইলর (Tylor), রিভার্স (Rivers), হাডন (Haddan), ম্যারেট (Marett) প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরা অনন্তকৃষ্ণ আয়ারকে অভিনন্দন জানান। 1914 খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে অনন্তকৃষ্ণ আয়ার জাতিতত্ত্ব শাখার (Section cf Ethnology) বিভাগীয় সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই অধিবেশনের মূল সভাপতি হিসাবে সার আশুতোষের দৃষ্টি অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে নবগঠিত নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণের সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন।

অনন্তকৃষ্ণ আয়ার তখন কোচিন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক। পরে তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সংগঠন ক্ষমতা এবং জনজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকার তাঁকে ত্রিচুরস্থিত প্রাদেশিক সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ এবং পশুশালার অধীক্ষক নিযুক্ত করেন। এছাড়া তিনি জাতিতত্ত্ব বিষয়ের অধীক্ষকও ছিলেন। এমন সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনার ভার গ্রহণে আমন্ত্রণ জানান। পূর্ব কথামত অনন্তকৃষ্ণ আয়ার রাজী হলেন। এদিকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করতে তাঁকে অনুরোধ জানায়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক বেশী বেতনদানের অঙ্গীকার করে কিন্তু অনন্তকৃষ্ণ আয়ার সার আশুতোষকে জানালেন যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই যোগদান করবেন, কারণ এই বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই কথা দিয়েছেন। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের কাজ স্বার্থত্যাগের এক মহৎ দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে সূচিত হলো। অনন্তকৃষ্ণ আয়ার নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে নৃ-বিজ্ঞানকে অত্যধিক ভালবাসতেন এবং অচিরেই নৃ বিজ্ঞান বিভাগকে এক সুব্যবস্থিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তোলেন। এখানে তাঁর 12 বছরের কর্মজীবনে তিনি নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের উন্নতিকল্পে বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তার সহকর্মী হিসাবে তিনি রায় বাহাদুর বি. এ. গুপ্তে, শরৎচন্দ্র মিত্র, পঞ্চানন মিত্র, বি. সি. মজুমদার, এ. এন. চাটার্জী প্রমুখ জ্ঞানীগুণীদের পূর্ণ

সমর্থন লাভ করেছিলেন। অনন্তকৃষ্ণ আয়ারের বিবিধ কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নৃ-বিজ্ঞানকে স্নাতক শ্রেণীতে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সাড়া পড়ে যায়। নৃ-বিজ্ঞানের তদানীন্তন সরকারী কর্মসূচী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচার-চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু 1936 খৃষ্টাব্দে কলেজের মাধ্যমিক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পঠনের ব্যবস্থা করেন। এর বেশ কিছুদিন পরে 1948 খৃষ্টাব্দে নৃ-বিজ্ঞান ঐ কলেজে স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। স্নাতকোত্তর ও স্নাতক-শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের প্রচেষ্টায় যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবাসী কলেজ ভারতে তাই পথিকৃৎ হিসাবে পরিগণিত। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ্য-নির্ঘণ্টে আংশিকভাবে নৃ-বিজ্ঞানের সংযোজন পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পরে নতুন চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের কাযক্রমের পটভূমিকায় নৃ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। 1947 খৃষ্টাব্দে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, 1950 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় এবং 1952 খৃষ্টাব্দে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নৃ-বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করে। তারপর ধীরে ধীরে সৌগড়, মাদ্রাজ, পুনা, রাঁচি, ডিব্রুগড়, উৎকল রবিশঙ্কর, ধারওয়ার, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয় এবং আজকের ভারতে 15-16টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃ-বিজ্ঞান স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠ্য-তালিকাভুক্তি লাভের মর্যাদা অর্জন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে নৃ-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যেও কিছু কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। 1945 খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের 'ভারতের নৃ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা' (Anthropological Survey of India) নামে একটি পরিপূর্ণ গবেষণা সংস্থার প্রতিষ্ঠা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ঐ সংস্থার প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ। কলিকাতায় এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ছাড়াও বর্তমানে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব ভারতে এবং আন্দামান দ্বীপে এর শাখা কার্যালয় রয়েছে। এই সংস্থা ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির রূপরেখা, অধিবাসীদের দৈহিক গঠন বৈচিত্র্য, রক্তদল (Blood group) ও বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্রের খননকার্য ও তাদের সুব্যবস্থিত আলোচনায় যত্নবান। এখানে শারীরিক ও সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞান—এই দুই শাখারই বিভিন্ন কর্মপন্থা রূপায়িত হবার ব্যবস্থা রয়েছে। 'ভারতের নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা' আজ একটি প্রকৃত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া কলিকাতাস্থিত ভারতীয় পরিসংখ্যানিক সংস্থায় (Indian Statistical Institute) এবং তার অধীনস্থ কার্যালয়গুলিতেও নৃ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও শিক্ষণকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাদের পরিচালিত উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রে অথবা তদ্রূপ সংস্থাগুলিতে নৃ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন কর্ম পরিচালনার জন্যে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

পত্র-পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা কোন বিষয়ের পঠন-পাঠনের প্রত্যক্ষ সাহায্য করে, কারণ বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান এবং বিনিময় এই সকল সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সংঘটিত হয়ে থাকে। নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী পূর্বে Journal of the Asiatic Society of Bengal (1784), Calcutta Review (1843),

Indian Antiquary (1872), Journal of the Anthropological Society of Bombay (1886), Modern Review (1907), Journal of Bihar and Orissa Research Society (1915) পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও শরৎচন্দ্র রায় কর্তৃক 1921 খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'Man in India' পুরাপুরিভাবে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা হিসাবে দেশ বিদেশে স্বীকৃতি লাভ করে। এর 26 বছর পরে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এন. মজুমদার The Eastern Anthropologist নামে অপর একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ সুরু করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী কালে Anthropologist নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। সাম্প্রতিককালে Indian Anthropological Association অপর একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায়ের জন্মশতবার্ষিকী (1971 খৃঃ) উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করে। এই পত্রিকাটির নাম Indian Anthropologist। তাছাড়া তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত Anthropology Club (পরে Indian Anthropological Society) বিভিন্ন আলোচনা বৈঠক এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নৃ-বিজ্ঞান আলোচনার এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলবার চেষ্টা করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের উভয় শাখারই গবেষণা প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে বিকাশ লাভ করে, যদিও প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সুরু হয় প্রশাসনের স্বার্থে এবং সর্বদেশীয় জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কর্মধারাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—(1) ব্যুৎপত্তিগত পর্যায়, (2) বর্ণনামূলক পর্যায় এবং (3) অভিসারী পর্যায়। প্রথম পর্যায় রিসলে কর্তৃক 1915 খৃষ্টাব্দে জনগণনার সময় শারীরিক মাপজোক এবং দৈহিক গঠনের অবলোকনের মধ্য দিয়ে সুরু হয়। এরপর সারগি, হাডন, হাটন কর্তৃক ভারতীয় জনগণের শারীরিক গঠন ও আকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনার সূত্রপাত করে। এঁদেরই কর্মপন্থা অনুসরণ করে নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গীতে ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ভারতীয় জনগণের শ্রেণীবিন্যাস করেন এবং এই অভিমত প্রদান করেন যে, আদি ভারতীয় জনগণ জাতি (Race) হিসাবে ছিল মূলতঃ নিগ্রো গোষ্ঠীভুক্ত। 1935 খৃষ্টাব্দে এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন রকমের বিশ্লেষণাত্মক কর্মধারা রচিত হয় এবং ডক্টর গুহ কর্তৃক সমীক্ষার উপর আক্রমণাত্মক ভূমিকা রচিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং হারাণচন্দ্র চাকলাদার তাঁদের ভারতীয় জাতিতত্ত্বের মৌলিক রচনাবলীর সাহায্যে গুহ কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করেন। এই পর্যায়ে জাতিতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাস ছাড়াও রক্তদল (Blood-group) এবং হস্তপদরেখাবলীর (Dermatoglyphics) উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রজননসম্পর্কিত পদ্ধতির (Genetical method) সূত্রপাত হয়। এই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির জাতিতত্ত্বমূলক প্রাক্তন তথ্যাবলীর নবীকরণ করা হয়।

1950 খৃষ্টাব্দ থেকেই সুরু হয় অভিসারী পর্যায়। এই পর্যায়ে নৃ-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। মানুষের প্রজনন বিদ্যার (Genetics) আলোচনায় ব্যাপক হারে জৈব পরিসংখ্যান সাধনার (Bio-statistical tool) ব্যবহার এই পর্যায়টিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া এই পর্যায়ে মানুষের বৃদ্ধি, বিকাশ, পুষ্টি এবং প্রজননজনিত বিভিন্ন

বিষয়ের উপর মৌলিক আলোকপাত করা হয়। ভারতীয় জাতিতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতের বহু বিতর্কিত কাদার উপজাতির নিগ্রোভ প্রত্যক্ষ গবেষণার ভিত্তিতে ডক্টর শশাঙ্ক শেখর সরকার আলোচনা করে পুরাপুরিভাবে বাতিল করেন। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ক্ষেত্র গবেষণায় প্রাপ্ত নরকঙ্কাল ও করোটির মাপজোখ এবং সর্বভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাদের অবদানের বিষয় আলোচিত হয়। ব্যুৎপত্তিগত পর্যায়ের জাতিতত্ত্বের অধিকাংশ আলোচনা এই পর্যায়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়িত হয়।

আমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের সার্বজনীন ব্যবহারের দিকে সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন, কারণ মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির সত্যই কোন ভূমিকা আছে কিনা, তা অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল ভেষজবিদ্যা, দন্তচিকিৎসা, রোগনিরূপণবিদ্যা প্রভৃতিতে ব্যাপক-ভাবে কাজে লাগানো হয়। চিকিৎসকেরা রোগীর সামগ্রিক বৃদ্ধি, অস্থির গঠন, মাংসপেশীর প্রকৃতি প্রভৃতির উপর যথাযথ জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপজোখের প্রত্যক্ষ সাহায্য এসব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞগণের সন্তান-সম্ভবা মহিলাদের শ্রোণীচক্রের বিস্তার এবং গর্ভস্থিত সন্তানের মস্তক পরিধির আনুপাতিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া অস্থিসম্পর্কিত শল্য চিকিৎসায় দেহের বিভিন্ন অস্থির নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপজোখের প্রাথমিক জ্ঞান চিকিৎসকদের প্রভূত সাহায্য করে। হস্ত ও পদরেখশৈলী, রক্তদল (Blood group) প্রভৃতি আদালত ও বিচারকার্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মানুষের শারীরিক গঠন এবং প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের কাজও হয়েছে। প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী হুটন (Hooton) আমেরিকায় ট্রেনযাত্রীদের বসবার স্থানসংক্রান্ত বিষয়ে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপ-জোখের প্রচলন করেছিলেন। ঐ দেশের Bureau of Home Economics-এর তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে উক্ত মাপজোখের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সেনাবিভাগে নৃ-বিজ্ঞানের বিশেষ ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সৈন্যদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিমাপের কাজে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক মাপ-জোখের প্রয়োগ অত্যধিক ফলপ্রদ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিমান বাহিনীর নানা কাজে, বিশেষ করে বায়ুযানগুলিতে শারীরিক বিস্তৃতি অনুযায়ী বসবার স্থান এবং যথোপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিকল্পনায় নৃ-বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। 1943 খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংগ্রহশালায় ফলিত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের এক বিশেষ আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের সনাক্তকরণ, সৈনিকদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সামরিক নৃ-বিজ্ঞানের অন্যান্য নানাদিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছিল। বর্তমানে খেলা-ধূলার জগতেও নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের ব্যবহার সুরু হয়েছে। টার্নার (Tarner) অলিম্পিক খেলোয়াড়দের শারীরিক গঠন পর্যালোচনায় নৃ-তাত্ত্বিক মাপজোখের প্রচলন করে এই ব্যাপারে এক নব দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভারতে ফলিত শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের এবম্বিধ ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় নি, যদিও জন-জীবনের বিভিন্ন পদক্ষেপে এর প্রয়োজন অনুভূত হয়। সম্প্রতি দক্ষিণ রেলপথে স্টেশন মাষ্টারদের ঢিলে-ঢালা পোষাক (Uniform) সরবরাহের প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালিত হয়। পাইকারীহারে পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহের ব্যাপারে নৃতাত্ত্বিক মাপজোকের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রেল-পথের অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর শয়নযানগুলির পার্শ্বস্থিত শয়নস্থানসমূহে সাধারণ দৈর্ঘ্যের যাত্রীদের শয়নে অত্যধিক অসুবিধা হয়, কারণ

দৈর্ঘ্যে এগুলি ছোট। কাজেই এক বিশেষ এলাকায় মানুষের গড় সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে তার পরিপ্রেক্ষিতে শয়নস্থানগুলির পরিকল্পনা করা অতীব প্রয়োজন। ভারতের মত বিচিত্র পরিবেশ এবং বিচিত্র ভৌগোলিক পরিস্থিতিপূর্ণ দেশে সামরিক ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ব্যবহার জরুরী প্রয়োজন। খেলাধূলাতেও ভারত আজ পিছিয়ে নেই। খেলোয়াড়দের শারীরিক মান মূল্যায়নে এবং সমতা রক্ষায় নৃতাত্ত্বিক মাপজোখের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

অপর পক্ষে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কার্যাবলীকেও মোটামুটি তিনটি বিভাগে ভাগ করা যায়—(1) বুৎপত্তিগত পর্যায়, (2) গঠনমূলক পর্যায় এবং (3) বিশ্লেষণমূলক পর্যায়। ভারতে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু হয় প্রকৃতপক্ষে 1774 খৃষ্টাব্দে Asiatic Society of Bengal-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই। এই সময় থেকে 1919 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের বুৎপত্তিগত পর্যায়ভুক্ত। এই পর্যায়ের কর্মপদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(1) সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সুচিন্তিত প্রবন্ধ, (2) সরকারী বিবরণী এবং জাতি-উপজাতি গোষ্ঠীর সারগ্রন্থ, (3) নির্বাচিত জাতি-উপজাতির প্রকরণ গ্রন্থ। এই সমস্ত রচনায় অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই বিদেশী, একথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 1920 খৃষ্টাব্দ থেকে নৃ-বিজ্ঞানের পেশাদারী ভূমিকা সূচিত হয় এবং এই সময় থেকেই ভারতীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই পর্যায়ে অন্যান্য সদৃশ এবং বিসদৃশ বিষয় থেকে বিভিন্ন পণ্ডিতদের নৃ-বিজ্ঞানের চত্বরে আগমনের বিষয় উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানী ভারতীয় সমাজের নানা দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করেন। এঁদের মধ্যে জি. এস. ঘুরে, কে. পি. চট্টোপাধ্যায়, এন. কে. বসু, এম. এন. শ্রীনিবাস, ডি. এন. মজুমদার এবং ইরাবতী কার্ভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরে ভেরিয়র এল্যুইনের মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতি গোষ্ঠীর উপর প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র গবেষণাভিত্তিক রচনা এই পর্যায়ের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত নৃ-বিজ্ঞানের সমস্ত গবেষণা ও রচনা বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানীদের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়েছিল এবং এখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে তদানীন্তন কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

1930 খৃষ্টাব্দের সুরু থেকেই সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সময় ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান বিভিন্ন আমেরিকান পণ্ডিতের চিন্তাধারা ও কর্মধারার প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। অপলার (Opler), লিউইস (Lewis), ম্যাণ্ডেলবাম (Mandelbaum) প্রমুখ নৃ-বিজ্ঞানীরা গবেষকদল নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভারতে এসে এখানকার গ্রাম, সমাজ ও গ্রামীন অর্থনীতি বিষয়ে অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাছাড়া রেডফিল্ড (Redfield) এবং সিঙ্গারের (Singer) অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের গবেষণা ভারতীয় সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্তের সন্ধানই শুধু দেয় নি, ভারতীয় সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়ণে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিল। এঁদেরই কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নবীন ও প্রবীন ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীরা গতানুগতিক উপজাতি ও আদিম জীবনযাত্রা প্রণালীর অনুসন্ধান ত্যাগ করে গ্রামীন সমাজ এবং জটিল সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় ভারতের গ্রাম সমীক্ষা, জাতি, ধর্ম, ক্ষমতা সংবৃতি এবং নেতৃত্ব, নগর সমীক্ষা প্রভৃতির প্রচুর তথ্য সংগৃহীত

হয়েছিল। নৃ-বিজ্ঞান গবেষণার এই সময়টি তাই বিশ্লেষণমূলক পর্যায় নামে পরিচিত।

ফলিত সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান আজ দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ফলপ্রদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তদানীন্তন বৃটিশ শাসকগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানের চর্চা এবং জাতি-উপজাতিদের জীবনধারা ও সমস্যাবলী সমাধানের চেষ্টা ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল। এই বিষয়ের যথেষ্ট নজির রয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাতের উদ্যোগপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। 1949 খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Eastern Anthropologist-এর বিশেষ 'উপজাতি সংখ্যায়' সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজাতির নানা সমস্যাবলীর আলোচনার সঙ্গে ঐ সকল বিষয়ের সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়। এর পর উপজাতির জীবনবিষয়ক সমস্যা-বলীর আলোচনায় এল্যুইনের নাম উল্লেখযোগ্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশের নানা উপজাতির জীবনধারার নৃ-বিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যায়নে তিনি পথপ্রদর্শক। তাঁর রচিত পুস্তক 'A Philosophy for NEFA' উপজাতি সমস্যার একটি গণ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীপূর্ণ আলোচনা। বিভিন্ন উপজাতির সংস্কৃতির প্রতি যথাযোগ্য স্বীকৃতি এই আলোচনা-ধারার মূল লক্ষ্য ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত উপজাতি কল্যাণ সংস্থাগুলির মুখপত্রে উপজাতির সংস্কৃতির প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলীর আলোচনা হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময়েই আলোচনার ফলাফল উপজাতিজীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। উপজাতি জীবনভিত্তিক আলোচনা ব্যতীত সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানকে বিভিন্ন গ্রাম-সমীক্ষার কাজে লাগানো হয়েছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্যাপকহারে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়ণে পল্লীজীবনের রূপরেখার পূর্ব আলোচনা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। ভারতীয় লোকগণনা বিভাগ পরিচালিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রাম-সমীক্ষার কথাও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে নানা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও আমাদের দেশে এদিকে যথাযোগ্য নজর দেওয়া হয় নি। আমেরিকায় যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিভিন্ন সামরিক সংস্থাগুলিতে তথ্য, অনুসন্ধান, বুদ্ধিমত্তা ও সমীক্ষা প্রভৃতিতে নৃ-বিজ্ঞানীদের কর্মপদ্ধতির এক সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। যুদ্ধকালে বেসামরিক জনতার মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং দেশের জরুরী অবস্থায় পারস্পরিক প্রীতি ও সহযোগিতা রক্ষা করে চলতে নৃ-বিজ্ঞানীদের অবদানের নজির রয়েছে। এছাড়া ব্যাপকহারে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রসারের জন্যে মানব সমাজের যে সমস্যাবলীর উদ্ভব হয়েছে বা প্রতিদিন হচ্ছে, তার সুষ্ঠু আলোচনায় নৃ-বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতির অনুশীলন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মূল উৎপাটনে প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। জাতীয় চরিত্রের অনুসন্ধান নৃ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অবদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী রুথ বেনিডিক্ট (Ruth Benedict) জাপানীদের জাতীয় চরিত্রের বিভিন্ন বিষয় সঙ্কলন করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে আমেরিকাবাসী জাপানীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলির উপর সুসমঞ্জস আলোক-পাত করেছিলেন। কোন জাতির ও দেশের এই বৈশিষ্ট্যগুলি জানা থাকলে সেই জাতির যুদ্ধ এবং শান্তিকালীন কর্মপদ্ধতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সহায়তা করবে। ভারতের মত বৈচিত্র্য এবং সমস্যাপূর্ণ দেশে সামাজিক নৃ-বিজ্ঞানীর যথেষ্ট করণীয় রয়েছে। বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কর্ম-পন্থা রূপায়ণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল ও জনগণের

সামগ্রিক সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। কোন সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনার প্রাক্কালে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রা প্রণালী এবং মনোবৃত্তির বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা জাতীয় অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয়রোধে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশে বিভিন্ন স্থানে অনেক নামজাদা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী জনসাধারণের ব্যবহার এবং ক্রয়ের মনোবৃত্তির উপর ব্যাপক সমীক্ষা চালাবার ব্যবস্থা করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নৃ-বিজ্ঞান বিশেষভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানুষ ও তার সমাজব্যবস্থায় দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডে এর অবদান অনস্বীকার্য। ভারতে এর চর্চা এবং শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে এর ব্যবহার বহু দিন থেকেই চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অর্ধশত বছর অতিক্রম করেও নৃ-বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের সুযোগের সীমারেখা প্রায় পূর্ববৎই থেকে গেছে। নৃ-বিজ্ঞান পঠন-পাঠন পরিচালনার ব্যাপারে পথিকৃৎ এই কলিকাতায় এখনও পর্যন্ত নৃ-বিজ্ঞান পাঠের সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবাসী কলেজের সীমা অতিক্রম করে নি। সাম্প্রতিককালে কলিকাতার বাইরে মাত্র চা:টি কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে নৃ-বিজ্ঞান একটি পাঠ্য বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। নানা ধরণের প্রত্যাশা থাকা সত্ত্বেও নৃ-বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা অর্জন না করবার পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কলিকাতায় নৃ-বিজ্ঞানের দিগন্তে পাণ্ডিত্যের কোন অভাব নেই এবং এখানের নৃ-বিজ্ঞানীদের নিরলস কর্মসাধনা সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের গবেষণার ফলাফল পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও দুরূহ পত্র পত্রিকায় সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। সাধারণের জন্যে সাধারণভাবে নৃ-বিজ্ঞানের কথা বলবার প্রচেষ্টা খুব বেশী হয় নি। নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সহজবোধ্যভাবে নৃ-বিজ্ঞানের পরিচয় দানের কোন ব্যবস্থাই হয় নি। নৃ-বিজ্ঞান পাঠের পঞ্চাশৎ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার আসর বসেছে—বহু দুরূহ ও তথ্যপূর্ণ বিষয়ের চুলচেরা বিচার হয়েছে. কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, নৃ-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কোন বাস্তব প্রস্তাব গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায় নি। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞান জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিনাতিপাত করে চলেছে। তাই জিজ্ঞাসু সাধারণ মানুষ যখন তার প্রশ্নের জবাবে শুনতে পান যে, তাঁর পার্শ্বোপবিষ্ট মানুষটি নৃ-বিজ্ঞান পাঠে অথবা অধ্যাপনায় নিযুক্ত, তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আলোচনার ইতি করতে চান। কারণ বিষয়টির নাম পর্যন্তও ইতিপূর্বে তার কর্ণগোচর হয় নি। নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান এবং অবদান সত্ত্বেও নৃ-বিজ্ঞানের মত একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় আজও ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এই অবস্থার অচিরেই অবসান হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অনুশীলন গবেষণাগার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বৈঠক এবং পণ্ডিতদের দুরূহ ও জটিল তর্ক-বিতর্কের গণ্ডী অতিক্রম করে সহজবোধ্য ও সুচারুভাবে জনগণের গোচরীভূত না হলে সেই বিষয় সামগ্রিক জনপ্রিয়তা লাভে বিশেষভাবে বঞ্চিত হয়। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে এবং সেই সঙ্গে তাল রেখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যনির্ঘন্টের পরিবর্তন অতীব প্রয়োজন। পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি, ভারতে যুগে যুগে নৃ-বিজ্ঞান চর্চার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়েছে—পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন দেশে সমাজের নানা সমস্যার সমাধানে নৃ-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানের পাঠ্যনির্ঘন্ট এখনও

সেই আশুকালের প্রভাবে প্রভাবিত। যুগের পরিবর্তনের ছাঁচে এটিকে ঢেলে সাজাবার সার্থক প্রবণতা দেখা যায় না। সরকারী মহলের উপজাতি উন্নয়ন সংস্থাগুলিতে নৃ-বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত কমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য এবং সহযোগিতা গ্রহণ করা হলেও প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগে নৃ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োগ লক্ষিত হয় না; যদিও এর যথেষ্ট প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় উদ্যম ও বাস্তব কর্মপন্থা রূপায়ণের উদাসীনতা সামগ্রিকভাবে নৃ-বিজ্ঞান শাখাটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা এবং মূল্যায়নে বিরোধিতা করেছে। আজকের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নৃ-বিজ্ঞান শাখাটির সমগ্র ভারতীয় পটভূমিতে এবং পরিবর্তনের স্রোতধারার পশ্চাৎপটে নবীকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। নৃ-বিজ্ঞানের শুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ফলিত জ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপনে ভারতের মত এমন বিচিত্র পটভূমি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই দুই জ্ঞানরাজ্যের সেতুবন্ধনে নৃ-বিজ্ঞানী এবং সরকারী প্রশাসনিক আধিকারিকগণের যুগপৎ পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিভিন্নধর্মী সমস্যা এবং নানান পরিকল্পনা রূপায়ণে উদ্যোগী ভারতের নৃ-বিজ্ঞান চর্চা বিশেষ সাহায্যে আসতে পারে এবং তা অতি স্বাভাবিকভাবেই নৃ-বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ দিগন্তকে প্রসারিত করে যথাযথ মর্যাদার আসন দান করবে।

সঞ্চয়ন

শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে তৎপর হয়েছে এবং দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাষ্ট্র তাতে সহযোগিতা করছে। এজন্যে তাদের সর্বদাই সচেতন থাকতে হচ্ছে, ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর, বিভিন্ন ভাইরাস, নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে যার ফলে ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়ে থাকে। আবহাওয়াকে কিভাবে কলুষমুক্ত করা যেতে পারে, সে বিষয়ে নানা কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে।

এই সকল প্রতিকূল পরিস্থিতি ও অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে এরকম ধান, গম ও ভুট্টা গাছের সৃষ্টি করাই এই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কর্মসূচীর লক্ষ্য। এজন্যে উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনের জন্যে তারা উদ্যোগী হয়েছেন। এই ধরণের বীজের প্রাণরসের জার্মপ্লাজমের সঙ্গে অন্য ধরণের গাছের বীজের প্রাণরসের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তারা নূতন ধরণের বীজ সৃষ্টি করছেন। এই সকল বীজ থেকে যে গাছ জন্মায়, তাতে ফসল ফলে অনেক বেশী, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও এদের বেশী হয়ে থাকে। চারাগাছের বৃদ্ধির সময় সাধারণতঃ যে সকল বাধা বিপদ দেখা যায়, এরা সে সকল কাটিয়ে উঠতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা নানা জাতের নানা ধরণের বীজ নিয়ে সঙ্কর শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর ইথিওপিয়া, ইরাক, ইজরায়েল, সৌদী আরব, সুদান, তুরস্ক, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্য নানা

জাতীয় শাকসব্জী এবং নানা রকম তৈল বীজ সংগ্রহ করেছেন।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের এই সকল গবেষণার সুফল পৃথিবীর সকল দেশই পাচ্ছে, সকল দেশের সঙ্গেই তথ্য এবং গবেষণার ফলাফলের অবাধ বিনিময় হচ্ছে। আমেরিকা সুদীর্ঘ কালের তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণার ফলে এই ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, বিশেষ করে ভারত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে তার সাহায্য নিয়েছে।

মার্কিন কৃষিদপ্তরের বিশেষ বীজ বিভাগ খোলা হয় 1898 সালে। তারপর থেকে এই বিভাগ সমগ্র পৃথিবীতে বীজসংগ্রহ ও চারাগাছ সম্পর্কে 150 বার অভিযান চালিয়েছে। এর ফলে মানুষ ও পশুর নূতন ধরণের খাদ্য, প্রাকৃতিক কীটঘ্ন গাছগাছড়া এবং ভেষজের সন্ধান করবার জন্যে সাড়ে তিন লক্ষেরও বেশী নানা ধরণের গাছ, ফসল ও সব্জি প্রভৃতির বীজ সংগৃহীত হয়েছে।

আমেরিকার কলোরেডোর ফোর্টকলিন্সের জাতীয় বীজ সংরক্ষণাগারেই নানা স্থান থেকে সংগৃহীত সকল বীজ জমা করা হয়। এই গবেষণাগারে হিমায়নের বিশেষ সাজসরঞ্জাম, বীজ অঙ্কুরিত করবার নানা ব্যবস্থা ও সুযোগ, সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি বীজের বৈশিষ্ট্য এক-একটি কার্ডে লেখা থাকে এবং কোন বিশেষ বীজ সম্পর্কে কোন কিছু জানতে হলে কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সেই বীজের কার্ডটি চাইবামাত্রই পাওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের ব্যাপারটি নূতন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বীজ সংগ্রহ সুরু হয়েছে 1819 সালে কৃষিদপ্তর খোলবারও বেশ কয়েক দশক থেকে। গাছগাছড়া ও বীজ সংগ্রহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খৃষ্টের জন্মের দেড় হাজার বছর আগে মিশরের রাণী হাতশেপসুত পূর্ব আফ্রিকার ধূপগাছ সংগ্রহ করবার জন্যে জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।

বর্তমানে নূতন ধরণের ফসল উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই বীজ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালে এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। উন্নতিশীল রাষ্ট্রে যে সকল উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ রোপণ করা হয়, সে সকল দেশে প্রধানতঃ সেই সকল শস্যের চাষ হয়ে থাকে এবং এতকাল যে সকল সুপ্রাচীন শস্যের চাষ হয়ে আসছিল, তাদের স্থান এই নূতন ধরণের শস্য গ্রহণ করছে। ফলে প্রাচীন জাতের শস্য ও বীজসমূহ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সমস্যায় পড়েছেন। কারণ ঐ সকল শস্যের বীজের সঙ্গে অন্য বীজের মিশ্রণ ঘটিয়ে রোগ প্রতিরোধক নূতন ধরণের চারাগাছ তারা উৎপাদন করতে পারতেন। পুরনো শস্যের বীজ গবেষণার দিক থেকে অতি মূল্যবান বস্তু। কিন্তু উন্নত ধরনের বীজ প্রবর্তিত হওয়ায় পুরাতন বীজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সে সকল আর পাওয়া যাচ্ছে না।

এজন্যে মার্কিন কৃষি বিভাগ বিশ্বের নানা দেশে উন্নত ধরণের শস্যের জন্যে পুরাতন বীজ সংগ্রহাগার ও গবেষণাগার গড়ে তোলবার জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে বলছেন। তাছাড়া ঐ বিভাগ বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে দ্রুত তথ্য বিনিময়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্যেও সুপারিশ করেছেন।

সম্পর্কে গবেষণাগার স্থাপন করা যে কত প্রয়োজন, তা আমেরিকায় উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধক বীজ উৎপাদনের দিক থেকে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সে দিকে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়।

আলফালফা নামে এক ধরণের ঘাস গবাদি পশুর খাদ্য। গুবরে পোকার মত এক প্রকার কীট ঐ ঘাস ও শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে। মার্কিন কৃষি দপ্তরের গবেষণা কৃত্যক ভারত, সৌদী আরব, আফগানিস্তান, ইজরায়েল ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ থেকে আনা বীজের

সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে এক নূতন ধরণের ঘাস উৎপাদন করেছেন। ঐ সকল কীট এই নূতন ধরণের ঘাসের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

স্পিনিজ নামে এক প্রকার শাকে ছত্রাক জন্মাতো। ফলে এই শাক চাষ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। ভারত, ইরান, তুরস্ক, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ থেকে এই জাতীয় শাকের বীজ আনিয়ে তাদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে নূতন ধরণের স্পিনিজ সৃষ্টি করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন দেশ থেকে আনা মটর থেকে নূতন ধরণের রোগ প্রতিরোধক একপ্রকার মটর সৃষ্টি করা হয়েছে। গবেষণার ফলে লোধ্র ফুলের একপ্রকার বীজও সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সকল বীজ থেকে জলপাইয়ের তৈলের মত এক প্রকার তৈল উৎপাদন করা হয় এবং রান্নায় ঐ তৈল ব্যবহৃত হয়। ইজরায়েল থেকে লেটুস এবং ইরান থেকে আনা ক্যানটালুপ নামে আর এক প্রকার শাকের বীজ মিশিয়ে উন্নত ধরণের শাক তৈরি করা হয়েছে। বহু নূতন ধরণের শাকসব্জী, ডাল, শস্য ইতিমধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার মাত্র কয়েকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

বিবর্তন বা জীবের চরম নিয়তি

রামচন্দ্র অধিকারী

বিবর্তন শব্দটি আজ আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত, বিশেষতঃ ইংরেজীতে Evolution বলিলে অনেকেই সহজে বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্ম বস্তু ক্রমপরিবর্তনে, কোনও বিশিষ্ট দেশস্থানে, কালধর্মে বিচিত্র ও বহুল হইয়াছে—অবশ্য এক দিনে নয়, এক বৎসরেও নয়, কালের গতিতে। এই বিবর্তন দৃষ্ট হয় বা বুঝান হয়, শুধু যে জীবজগৎ সম্পর্কেই তাহা নহে, সামাজিক ব্যবস্থা এবং নিখিল বিশ্ব ব্যাপারেও। একের বিবর্তনেই বহুত্ব—যাহা সূক্ষ্ম ও সরল ছিল, এখন বা আজ তাহাকে দেখিতেছি জটিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বিবর্তন কিরূপে ঘটে, কাহার প্রেরণায় কিংবা বিবর্তনের উদ্দেশ্য কি—সে বিষয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই নির্ণয় করিতে প্রয়াসী। বিবর্তন শব্দটির অধিকতর প্রচলন হইয়াছে চার্লস ডারুইনের মতবাদ হইতে।

তৎপূর্বে লামার্ক (Lamarck—1774-1829 খৃঃ অঃ) এই মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। এই দুই জন জীববিজ্ঞানী জীবজগতে বিবর্তনবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা বিদ্বজ্জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অবশ্য তাঁহাদের পরে আজ পর্যন্ত বিবর্তন সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার মতবাদের আবির্ভাব হইয়াছে। সংক্ষেপে—জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতি ক্ষুদ্র, অণু পরিমাণ প্রাণবন্ত জীবকণা (যাহা খালি চোখে দেখা যায় না, কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য) কালে ও দেশে ক্রমবিবর্তনের ফলে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে পরিণত হইয়াছে। জীববিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে কোন ভিন্ন মত নাই। কিন্তু তাঁহারা শুধু প্রাণীদেহের বিবর্তন লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন এবং প্রাণীর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে, অনেক অতিকায় জীব

জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের একদা অস্তিত্ব সর্বথা বিশ্বাসযোগ্য। মাতৃগর্ভে পিতৃরেতঃ মাতৃশোণিত সমবায়ে ভ্রূণ ও অতিসূক্ষ্ম জীবকণা 280 দিনে মাতৃগর্ভেই পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যে জীবদেহ সমগ্র জীবজগতে সংগঠিত হইয়াছে দীর্ঘকালে অন্ততঃ বহু কোটি বৎসরে। মানুষের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পূর্বকালীন বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ্‌গণের ধারণা আজ উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন মনে করিতেন, পরমেশ্বর প্রতিটি জীবের বীজ আকাশ হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করেন। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেণ্টে আছে—বিরাট প্লাবনের ফলে যখন পৃথিবী জলমগ্ন হয়, তখন প্রতিটি জীবের একটি করিয়া প্রতিনিধি নোয়ার নৌকায় বহন করা হয়। প্রতিটি জীব বিভিন্ন, তাদেরই অধস্তন সন্তান বর্তমান বিশাল জীবজগৎ। পরমেশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন সর্বশেষে ষষ্ঠ দিনে, সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম করেন। মানুষেরই আত্মা আছে; অন্য জীবের সৃষ্টি শুধু মানুষের দাসত্ব বা গোলামী করিবার জন্যই। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মযাজক অধ্যাপক লাইটফুট (Dr. Lightfoot) সিদ্ধান্ত করেন, ঈশ্বর 4004 খৃষ্টপূর্বাব্দে 23শে নভেম্বর সকাল নয়টায় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ সেইরূপ ছেলেভুলানো গল্পগাথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

সমস্ত জীবের পূর্বে একটিমাত্র অতি সূক্ষ্ম জীবকণাই বর্তমান ছিল। তাহাই ক্রমপরিবর্তনে অথবা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়—ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রাণ একক তত্ত্ব; তাহারই ঊর্ধ্বগতি, কালপ্রভাবে ক্ষরণ, বিকার বা দেহবিশেষ হইতে আকৃতি, কিন্তু প্রাণপ্রবাহ সমভাবেই চলিয়াছে। তাহার শেষ গন্তব্যস্থল কোথায়, এই বিবর্তনের উদ্দেশ্য ও নৈতিক মূল্য কি, কাহার প্রেরণায় ইহা চলিয়াছে এই সকল প্রশ্ন জীববিজ্ঞানীর আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক তাঁহার গবেষণাগারে আত্মা ও ঈশ্বর সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইজন্য সেই সকল আলোচনায় তিনি প্রবৃত্তও হন না। নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক কিন্তু এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করেন। কিন্তু দার্শনিকেরা একমত কোন দিনই ছিলেন না, এখনও নহেন। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"।

আমরা বিবর্তন প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশ ও কালে প্রাণিজগতে অভিনবত্ব আবির্ভূত হয়। কিন্তু সেই কারণে দেশ ও কালকে নিত্য, চিরন্তন বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। ভারতীয় দর্শনে বৈশেষিক মতবাদ, জৈন শাসন কালও দেশকে নিত্য স্বীকার করিয়াই বিচার আরম্ভ করিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেব বুদ্ধির ঊর্ধ্বে বোধি-দর্শনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন—সবকিছু অসৎ, অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে উদ্ভূত। যতক্ষণ স্থায়ী হয়, ততক্ষণের জন্য পুনরায় অসতে বিলীন হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদ্ বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, কালের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু কোনও ঘটনার জন্য কাল দায়ী নহে, কালের সৃজনী শক্তি তিনি মানেন না; সকল বিচার স্থলে কালের দাসত্ব যেন আমরা স্বীকার না করি—এই তাঁহার অভিমত।

দেশ ও কাল বর্তমানে বৈজ্ঞানিক মহলে এবং বিভিন্ন দেশে দার্শনিকগণের মধ্যে আলোচনার বিষয়ীভূত। জড় জগতে আমরা মানুষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জড় জগতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। এই জড় বা প্রাণহীন অনাত্ম তত্ত্বের প্রকৃত রূপ কি? ইহাও আজ প্রচণ্ড বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছে।

জীব ও জড় একান্তই বিলক্ষণ, সম্পূর্ণতঃ

বিভিন্ন দুই তত্ত্ব। প্রাণের আবির্ভাব প্রথম কোথায়, ডারুইন সেই সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। জড়দেহের ক্রমবিবর্তনে মনুষ্যস্তরে উন্নীত হইয়াছি, এই সিদ্ধান্তের পরবর্তী কোনও আলোচনা তাঁহার পুস্তকে নাই।

মানব স্তর হইতে অতিমানব পর্বে আরোহণ এই দেহে, এই দেশেই কালের গণ্ডীর মধ্যেই সম্ভব। এই সকল আলোচনা সম্প্রতি সুরু হইয়াছে। নিশ্চয় কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এই বিশ্ব-ব্যাপার, এই দেহ-মন-বুদ্ধির জন্ম—ইহা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই শক্তি কাহার বা এই শক্তির স্বরূপ কি, এই বিষয়ে বিজ্ঞানী নীরব।

আরও অনেক অনেক অমীমাংসিত দৃষ্ট ঘটনার সমাধান এখন পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত হয় নাই। উর্বরা ভূমিতে শস্য জন্মায়, বালুকায় তাহা সম্ভব নহে। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে সমৃদ্ধ ময়ুরপুচ্ছ ময়ুরীর অন্তরসেই থাকে। অন্য পাখীর ডিমে তাহা নাই। এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য জীব-বিজ্ঞানে আরেক অভিনব হৃদয়গ্রাহী শাখাবিজ্ঞান প্রবর্তিত হইয়াছে—Genetics। প্রতি জীবকোষে অসংখ্য জীন (Gene) আছে। তাহারা স্বতন্ত্র, কিন্তু পরস্পর মিলিত হইতে পারে; জীনের রাসায়নিক গুণাগুণ একান্তই স্বতন্ত্র। এই সকলই নিম্নস্তর হইতে উর্ধ্বস্তরে অবলোকন। এমনও অকাট্য সত্য থাকিতে পারে, কাল ও দেশের উর্ধ্বে কোনও মহাশক্তি অবতীর্ণ হইয়া কাল রাজ্যে দেশ সংস্থানে বিবর্তন ঘটায়। শক্তির অনন্ত রূপ, কিন্তু মূলে শক্তি একই বা একা এবং জগতে শক্তিই আছে, আর কিছুই নাই। যেমন ভারতবর্ষে চণ্ডীগ্রন্থে বলা হইয়াছে "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া মমাপরা"। শক্তি একই এবং শক্তি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও তত্ত্বই নাই।

দেশ ও কাল সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আজ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। দেশ অর্থে Space আকাশ বা মহাকাশ। আকাশ শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি—যাহা বস্তুনিচয়কে অবস্থানের জন্য অবকাশ দেয়। যাহা কিছু আছে সকলই আকাশে বা দেশে। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ দেশ ও কালের ভিন্নতার দৃষ্টভঙ্গীতে কুঠারাঘাত করিয়াছে। তিনি বলেন, দেশ ও কাল স্বতন্ত্র নহে। শব্দটি ব্যবহৃত হইবে দেশ-কাল নামে Time and Space নহে; প্রকৃত শব্দ Space-Time উভয়েরই আপেক্ষিক (Relative) অস্তিত্ব। কাল দেশেরই একটি Dimension বা মাত্রিক মাত্র। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডিংটনের উক্তি, সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নীহারিকাসমেত কোন সুদূরে দ্রুতগতিতে প্রয়াণ করিতেছে। Space বা দেশ, কাল বা Time উভয়ই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এতাবৎ যে সকল ধারণা পোষিত হইত, এখন দেখা যাইতেছে, তাহার উর্ধ্বে সাধারণ চিন্তাধারা অতিক্রম করিয়া দুর্বার গতিতে বিশ্বজগৎ ধাবমান হইতেছে। কোথায়, কি উদ্দেশ্যে, কি তাহার পরিণতি, মানুষের মন তাহা ধারণা করিতে অক্ষম।

আমরা বিবর্তন ও সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক অচিন্তিতপূর্ব বিষয়ের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগেও সৃষ্টিরহস্য কি, তাহা লইয়া ভূয়সী আলোচনা হইয়াছিল। [মানুষের সৃষ্টি কোন দিনই হয় নাই, মানুষ চিরদিনই আছে। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস, প্লেটো, আরিস্ততল ইহা মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি—বীজ হইতে অঙ্কুর, তাহা হইতে মহীরুহ এবং তাহার ফলমধ্যে পুনরায় বীজ সৃষ্টির কারণ নিহিত। এই 'বীজাঙ্কুর ন্যায়ে' সৃষ্টিতত্ত্ব অতি সহজে বুঝিতে পারা যায়।]

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ্ কিন্তু সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর ও যোনি বা প্রকৃতি মানিয়া লইয়াছেন।

সেই উপনিষদের শ্লোকে দৃষ্ট হয়—"কিং কারণং

ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা কেন চ সম্প্রতিষ্ঠা। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখতরেষু বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনি :— পুরুষ ইতি চিন্ত্যম। সংযোগ এষাং ন তু আত্মভাবাৎ আত্মাপ্যনীশ সুখদুঃখহেতোর"॥ সৃষ্টির কারণ কি ব্রহ্ম? কোথা হইতে আমাদের জন্ম? আমরা কিসের উপর নির্ভর করিয়া জীবিত থাকি। যাবতীয় সাংসারিক সুখ-দুঃখের হেতুই বা কি? কালবাদ (Temporalism) স্বভাববাদ (Naturalism), নিয়তিবাদ (Necessity), যদৃচ্ছা (Chance)? সবকিছুর জননী কি মূলা প্রকৃতি (Primordial nature)? জীব কি স্বাধীন অথবা নিজের কর্মবশে বদ্ধ বা মুক্ত? বিভিন্ন মতবাদ আছে, সেগুলির বিস্তৃত আলোচনাও ভারতীয় দর্শনে বিবৃত। সৃষ্টিতত্ত্ব বিচারে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকের নিকটে সেইগুলি উপেক্ষার বস্তু নহে, সে সকলের আলোচনা আদৌ অবান্তর নহে।

আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি মতবাদের বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

স্বভাববাদ

সবকিছু স্বভাববশে ঘটে, অন্য কোন কারণ অন্বেষণ করিবার আবশ্যক নাই। নৈসাগক ঘটনাই এইরূপ, এই উত্তরই পর্যাপ্ত। অন্য কোন অনৈসর্গিক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল, সময়ের অপব্যবহার মাত্র।

এইরূপ মতবাদের পোষকতা কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত আদৌ নহে। স্বভাববাদ মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের দ্বার রোধ করা হইবে। প্রাচীন ভারতে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা ঈশ্বর বা আত্মা কিছুই মানিতেন না। প্রচার করিতেন—এই জন্মই প্রথম এবং এই জন্মই শেষ। সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই এবং সৃষ্টির কারণও কিছু নাই। সব কিছু স্বভাববশে ঘটে। তাহাদের একটি শ্লোক আছে—"কঃ কন্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবান্ মৃগ পক্ষিণাম। মাধুর্য্যং ইক্ষ্যোঃকটুতাং চ নিম্বে—স্বভাবতঃ সর্বমিদং প্রবৃত্তম"।

ইঁহারা শুধু বিতণ্ডা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। প্রমাণ যত কিছু আছে, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণই একমাত্র। ভূত চতুষ্টয় বা জড়ই একমাত্র তত্ত্ব। আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। ইঁহাদের পূর্বে লোকায়তিক বলা হইত, পরে চার্বাক সম্প্রদায় নামে তাঁহারা অভিহিত হন। ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বেই তাঁহাদের বিভিন্ন দল বা সম্প্রদায় ছিল। শাক্যমুনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে তাঁহাদের মত শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন। জৈনাচার্যগণও তাঁহাদের অবজ্ঞা করিতেন, ভগবতীসূত্রে তাহার বিবরণ আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর উপদেশে আত্মা বা ঈশ্বর আছেন বা নাই, তাহার উল্লেখ করেন নাই। জৈনমতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বীকৃত না হইলেও প্রতি জীবে স্বতন্ত্র আত্মা বিরাজমান, নিষ্কলুষ আত্মা কেবলী হইয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরত্বে পর্যবসিত হন। তত্রাচ বিজ্ঞান বিরোধী চার্বাকগণকে ভারতবর্ষে কোন ধর্মমত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না।

কালবাদ বা Temporalism

কালবাদ প্রতিপন্ন করিয়াছে—সবকিছুর মূলে আছে কাল বা Time। সৃষ্টিকর্তাই কাল বা সময়। পরবর্তী যুগে কাল বা মহাকাল গণনাকারী বলিয়া গণিত হইয়াছে। গীতার দশম অধ্যায়ে "কালঃ কলয়তামহং"। কলন অর্থ গণনা। উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদগণ বলেন—মহাকাল গণনা করেন এবং উজ্জয়িনী ভারতবর্ষের গ্রীনউইচ।

যদৃচ্ছাবাদ বা Chance

এই মতবাদ কোন গভীর আলোচনার বিমুখ। ঘট মৃত্তিকা হইতেই হয়, সূত্র হইতে হয় না।

সূত্রে পট হয়, এইগুলির কারণ যদৃচ্ছা বা খেয়াল। এই মত অবৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধান-পরিপন্থী, ভারতবর্ষে গৃহীত নহে।

কাল বা আকাশ সম্বন্ধে আইনস্টাইনের অভিমত। শরীরের অবস্থানেই দর্শকের এই দুইটি তত্ত্বের আপেক্ষিকত্ব নির্ভর করে। মনের বিচার দেশ কাল নির্ণয়ে নিষ্প্রয়োজন বা অক্ষম। ইংরেজ দার্শনিক হোয়াইটহেড বলিয়াছেন: "It is the observer's body that we want and not his mind. Even the body is useful as an example of a familiar form of apparatus"—শরীরই কাল আকাশ নির্ধারণে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিশেষ। মানসিক পর্যালোচনার অবকাশ এই দুইটি বিষয়ে নিরর্থক।

পরিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

কিন্তু পরিবর্তন জগতে নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। পরিবর্তনের দার্শনিক আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক নহে। যদিও জগতে এবং জাগতিক সকল অবয়বের মধ্যে পরিবর্তন সর্বদাই দৃষ্টিগোচর এবং সাধারণ বুদ্ধিতে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তত্রাচ পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিকের মধ্যে পরিবর্তন সম্বন্ধে মতভেদ আছে—ইহাও এক রহস্য। গ্রীস দেশের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক প্লেটো পরিবর্তন স্বীকারই করেন না। তিনি বলিয়াছেন, পরম তত্ত্ব একটি পরম ভাব, কদাচ তাহার পরিবর্তন হয় না। এই পরম ভাবকে তাঁহার পরিভাষায় Idea বলা হইয়াছে। ভাবতত্ত্ব যাহা হন, যে অবস্থায় পরিণত হন, তিনি যাহা হইয়াছেন অর্থাৎ 'ভূত' (ভূ ধাতু ক্ত প্রত্যয়)—তাহাও তিনি।

এই বিষয়ে ভারতবর্ষে গীতায় পুরুষ বা একতত্ত্ব ক্ষরণে (By mutation) ভূত হইয়াছেন। "ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি"। মূলতঃ পরমার্থতঃ তত্ত্ব একটিই; তাঁহারই দুইটি বিভাব (Aspect)—একটি অক্ষর অপরটি ক্ষরণশীল। প্লেটো কিন্তু ভবন বা হওয়ার অবস্থাকে শুধু কায়াহীন ছায়ামাত্র গণনা করিয়াছেন (Realm of Shadows)।

শঙ্করাচার্যদর্শনে পরিবর্তনশীল জগৎকে অনিত্য বা মিথ্যা বলা হইয়াছে। মিথ্যা অর্থে অস্তিত্ববিহীন বা অলীক নহে; যাহা সত্য বা সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। কোনও পারমেশ্বরী অঘটন ঘটনপটিয়সী শক্তির (মায়ার) প্রভাবে। মায়ার উর্ধ্বে কোন পরিবর্তন নাই, কোন ক্ষরণ বা ব্যয় নাই—একই তত্ত্ব যাহার বিবর্তন, পরিবর্তন, ক্ষরণ ব্যয় নাই এবং তদ্‌ব্যতীত অপর যাহা কিছু, তাহা আমরা মায়াশক্তির প্রভাবে দেখি বা অনুভব করি।

জার্মান দার্শনিক হেগেল কিন্তু স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব উভয় অবস্থাই সমঞ্জসীভূত বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু কালের অপরিমেয় শক্তি প্রভাবে, নিত্যসনাতন পরমতত্ত্ব সেইরূপে পরিদৃষ্ট ও অনুভূত হন, কিন্তু তিনি দেশকাল ও পরিবর্তনের উর্ধ্বে চিরন্তন বিদ্যমান।

প্রাচীন পালি সাহিত্যের স্থবিরবাদ—বৌদ্ধমতে সব কিছু নিত্য পরিবর্তনশীল, স্থায়ী কিছুই নহে। গঙ্গার জলকণা নিত্য সরিয়া যাইতেছে, নিত্য যাহা, তাহা প্রবাহ মাত্র কিন্তু দীপ প্রতিক্ষণে নিজেকে ধ্বংস করিতেছে, সকলই অনিত্য এবং শূন্যমাত্র।

ঈশোপনিষদ অতি প্রাচীন উপনিষৎ—জগতে সব কিছুই গতিশীল কিন্তু গতিমান জগতও (জগত্যাং জগৎ) ঈশ্বর এবং তিনি সকলই (সর্বং ইদং)। তিনি সব কিছুই হইয়াছেন, এমন উক্তিও সেই শাস্ত্রে আছে—আত্মা অভূৎ সর্বভূতানি।

ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর মতে, সব কিছুই প্রাণগতির নিত্য চলনশীল তরঙ্গ, সর্বদাই পরিবর্তনের মাধ্যমে অনন্তের দিকে চলিয়াছে। তাঁহার মতে যে শক্তি প্রভাবে এরূপ সংঘটন হয়, তাহা নিত্য এবং প্রাণশক্তি। তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন,

"অস্তিত্বের অর্থই পরিবর্তন; পরিবর্তনেই সব কিছু সুপক্ক হয় (To change is to mature)। সৃষ্টি নিরন্তন পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই অলক্ষ্যের পথে চলিতেছে। এই পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা জাগতিক বস্তুনিচয়ের অভ্যন্তরেই আছে।

বিবর্তনের প্রেরণা

বিবর্তনের প্রেরণা কোথা হইতে আসিল—বৈজ্ঞানিকেরা তাহা লইয়া আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুধু রূপের পরিবর্তন এবং তাহার বাহ্য রূপের পরিবর্তনের তথ্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই বিবর্তন জীববিজ্ঞানীর বিচারে কালরাজ্যে শুধু প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ। প্রাণ প্রথমে কোথা হইতে আসিল—তাহার একটি উত্তর দেওয়া হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক কোন এক যুগে (Cambrean Epoch) যখন সমুদ্র-তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠ হইতে দূরে সরিয়া গেল, তখন যে শৈবালবৎ জড়পদার্থ পড়িয়া রহিল, তাহাতেই প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। জীব-বিজ্ঞানীর পরিধিতে প্রাণ ব্যক্তির বা ব্যষ্টির প্রাণ নহে, সমষ্টির প্রাণ (Cosmic life)। যাহার ঊর্ধ্বগতি মানবত্বেই পর্যবসান ঘটিয়াছে। মানুষের উপরে যদি কিছু থাকে, বিজ্ঞানী তাহাকে গণনার মধ্যে আনেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত প্রাণও একেবারে আলোচনার বাহিভূর্ত করিলে চলে না। আমার অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হইবে, এই চিন্তা দুঃসহ। বিশ্ব কবির ভাষায় "নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস, অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ"। কোরাণেও একস্থানে আছে—ঈশ্বর বলিতেছেন, স্বর্গ ও মর্ত্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু অন্তর্বর্তী স্থান এবং উপহাসের জন্যই কি সৃষ্টি করিয়াছি? ব্যক্তিগত বিবর্তন স্বতন্ত্র বিষয়, তাহাতে প্রতিটি জীবের অন্তর্গূঢ় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে বুঝিতে হয়, আত্মার গতাগতি আছে। মৃত্যু বা দেহপতনের সমকালেই সব কিছু ফুরাইয়া যায় না। ভবিষ্যৎ নিছক অন্ধতমসাবৃত, এই কথা মানিয়া লইতে পারি না।

সুতরাং স্বতঃই মনে জাগে, দেহপাতের পরে আর কোনও অবস্থা আছে। যে সকল ধর্ম ও দর্শন পুনর্জন্ম স্বীকার করে না, তাহারাও বলে, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি হয় অক্ষয় স্বর্গালোকে, না হয় চিরন্তন নরকে দুর্ভোগ। অথচ আত্মা সুখ দুঃখ বোধ করে কিনা; তথাকথিত দুঃখকষ্ট জড়দেহেরই, আত্মা অমর, অজর, সুখ-দুঃখাতীত—এই সকল আলোচনাও অবশ্যম্ভাবী হইয়া ওঠে। এই প্রসঙ্গে মানুষের কর্মের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা বা সংস্থানের প্রশ্ন নিবিড়ভাবে জড়িত। সংক্ষেপে কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদ প্রসঙ্গ অত্যাবশ্যক হয়। এই বিষয়ে আলোচনা বিস্তৃত হইয়াছে। আমরা শুধু অল্প কথায় বিবর্তনবাদ ও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্যের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

[৪ই এপ্রিল '72 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত সভায় প্রদত্ত ভাষণের সারাংশ]

কৃষি-সংবাদ

নারকেল-চাষে নারকেল-ছোবড়ার ব্যবহার

নারকেলের মত নারকেলের ছোবড়াও যে একটি মূল্যবান বস্তু—একথা সকলেই জানেন। গরীবের জ্বালানীর কাজে ছাড়াও শিল্পে নারকেল-ছোবড়ার বহুল ব্যবহার সম্বন্ধে সকলেই অবহিত আছেন। এই ছোবড়া থেকে দড়ি, কার্পেট, পাপোশ ইত্যাদি নানা রকম জিনিষ তৈরি হয়। তাছাড়া চাষের কাজেও যে এই ছোবড়া ব্যবহার করা যেতে পারে, একথা জেনেও অনেকে হয়তো এর সদ্ব্যবহার করেন না।

এক হাজারটি নারকেল থেকে প্রায় 82 কেজি ছোবড়া পাওয়া যায়। ভারতে মোট উৎপাদিত নারকেলের পরিমাণ প্রায় 5,450 লক্ষ এবং মাত্র 1,200 লক্ষ নারকেলের ছোবড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট ছোবড়া প্রধানতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার শিল্পে ছোবড়ার ব্যবহার বেশীর ভাগ কেরালা রাজ্যেই হয়ে থাকে, কারণ ভারতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ নারকেল ওখানেই জন্মায়। বাংলা দেশে শিল্পে এর ব্যবহারের পরিমাণ খুব বেশী নয়।

নারকেল ছোবড়ার মধ্যে শতকরা 15 ভাগ পটাস পাওয়া যায়, নারকেল চাষের জন্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় সার। ছোবড়া পোড়ানো ছাইয়ের পরিমাণ 20 থেকে 25 শতাংশ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, এক লক্ষ নারকেল থেকে প্রায় 1 টন পরিমাণ পটাশ পাওয়া যেতে পারে এবং এই হিসেবে 4,250 লক্ষ ছোবড়া বা জ্বালানী হিসাবে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাথেকে প্রায় 4,250 লক্ষ টন পটাশ নষ্ট হয়। নারকেল ছোবড়ার এই পটাশ আবার দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে, যা গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। দেখা গেছে 2 মাস ভিজিয়ে রাখলে ছোবড়ার 50 শতাংশ পটাস জলে বেরিয়ে আসে। কাজেই এই ছোবড়া গাছের আশেপাশে মাটিতে পুঁতে বৃষ্টির জলে ভিজবার পর মাটি চাপা দিলে অথবা ছোবড়া-পোড়ানো ছাই গাছের গোড়ায় দিলে খুব ভাল সারের কাজ করবে। নারকেলের চাষেই প্রধানতঃ এই সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

নারকেলের ছোবড়া পোড়াবার জন্যে মাটিতে একটি বড় গর্ত করতে হবে। গর্তটির মেজে এবং দেয়াল শক্ত হওয়া দরকার; কেন না ছোবড়া-পোড়ানো ছাইয়ের সঙ্গে মাটি মিশে গেলে ডেলা পাকিয়ে যায়। শুকনো ছোবড়া অল্প আঁচে আস্তে আস্তে পোড়াতে হয়, খুব তেজী আগুনে পোড়ালে কিছু পরিমাণ পটাস উড়ে যেতে পারে। এই ছাই কখনও জলে ভেজা থাকবে না, কারণ তাহলে এর দ্রবণীয় পটাস বেরিয়ে যাবে। খুব জোর হাওয়ার সময়ও একাজ করা উচিত নয়, কারণ অনেক পরিমাণ ছাই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যেতে পারে। ছোবড়া-পোড়ানো ছাই কোন নাইট্রোজেনঘটিত সারের সঙ্গে ব্যবহার করা চলবে না, কারণ এতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সারের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া আকারে উড়ে যেতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে অন্য সার প্রয়োগের অন্ততঃ 15 দিন আগে পরে ছোবড়ার ছাই প্রয়োগ করতে হবে।

সার ছাড়াও নারিকেল-ছোবড়ার একটি বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে জলধারণের শক্তি। একটি ছোবড়া তার ওজনের ছয়গুণ জল ধরে রাখতে পারে। কাজেই যে সব জায়গায় সেচের ভাল সুযোগ নেই, সেই সব নারকেল-বাগানে মাটির নীচে ছোবড়া সারি সারি করে বসিয়ে বর্ষার বৃষ্টিতে ভেজার পর মাটি চাপা দিয়ে দিলে নারকেল-বাগানের জলের চাহিদা অনেক পরিমাণে মিটতে

পারে। আমাদের দেশে নারকেলের চাষ সাধারণতঃ বিনা সেচেই করা হয়। অথচ দেখা গেছে যে, উপযুক্ত সেচ প্রয়োগে প্রতি গাছে বছরে অন্ততঃ 20টি বেশী নারকেল পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের বর্ষাকাল অতি সংক্ষিপ্ত—বছরে 2-3 মাস। বাকী প্রায় সমস্ত বছরই জমি বৃষ্টিশূন্য অবস্থায় থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে নারকেল-ছোব্ড়া মাটিতে পুঁতে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে জলের অভাব দূর হতে পারে এবং এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগের কাজও হয়ে থাকে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, ('কৃষি-ভবন' নয়া দিল্লী) কর্তৃক প্রকাশিত]

করোনারি থ্রম্বোসিস-প্রতিরোধ

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করোনারি থ্রম্বোসিস (Coronary Thrombosis) নামটির সঙ্গে আজকাল সকলেই পরিচিত। এটি দুরারোগ্য মারাত্মক ব্যাধিগুলির অন্যতম প্রধান। একদিকে যেমন নানা মারাত্মক ব্যাধির নির্দিষ্ট এবং বিশেষ ফলপ্রসূ ওষুধ আবিষ্কৃত হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। নানা দেশের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, করোনারি থ্রম্বোসিস এবং তার আক্রমণে মৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও লক্ষ্যের বিষয়, সম্পত্তিপন্ন পাশ্চাত্য দেশেই করোনারি থ্রম্বোসিসের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। অবশ্য ভারতবর্ষও এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ পিছনে পড়ে নেই।

একটি প্রবাদে আছে—'নিরাময় অপেক্ষা প্রতিষেধ ফলপ্রসূ' (Prevention is better than cure)। করোনারি থ্রম্বোসিস রোগেও এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শুধু দুরারোগ্য বলে নয়, রোগটি এতই আকস্মিকভাবে প্রকাশ পায় এবং এর প্রকোপে এতই দ্রুত প্রাণনাশ হয় যে, কখনও কখনও কোন চিকিৎসা প্রয়োগ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না।

পূর্বে ধারণা ছিল যে, করোনারি থ্রম্বোসিস প্রাচীন বয়সের ব্যাধি। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত তরুণেরাও এই রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না।

হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের দেশে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের করোনারি থ্রম্বোসিস হতে দেখা যায়। সুতরাং এটি 'বয়সের' অসুখ মনে করে নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত নয়। এই সব কারণে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হবার পূর্বেই তাকে প্রতিরোধ করা যায় কিনা, তা চিন্তা করা উচিত। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে সুপরিকল্পিতভাবে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তাহলে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগকে দূরে সরিয়ে রাখা অসম্ভব নয়।

প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি জানবার আগে কিভাবে এই রোগের উৎপত্তি হয়, সেইগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তাহলে প্রতিষেধের উপায়গুলি সত্বর বোধগম্য হবে।

যদি কোন কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের কোন অংশে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, তাহলে এই রোগের উৎপত্তি হয়। হৃদ্‌যন্ত্র এতই স্পর্শকাতর যে, এর সামান্যতম অংশেও যদি রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ অথবা বন্ধ হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিবিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বুকের মাঝখানে অত্যধিক যন্ত্রণা, তার সঙ্গে অত্যধিক অসুস্থতাবোধ এবং

অস্বাভাবিক অস্থিরতা, শরীরে ঘাম দেওয়া প্রভৃতি এই রোগের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি দেখলে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কিন্তু এর দু-একটি লক্ষণ দেখা গেলেই অকারণ উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।

হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হবার কারণ (1) সাময়িকভাবে ধমনীর আকুঞ্চন, এর ফলে যন্ত্রণাও হয় সাময়িক—যাকে বলা হয় অ্যানজাইনা পেক্‌টোরিস (Angina pectoris), (2) অথবা ধমনীর ছেদ বা অবকাশ (Lumen) সঙ্কীর্ণতর অথবা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হওয়া—করোনারি অক্লুশন (Coronary occlusion)। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের অংশবিশেষের রক্তশূন্যতাই করোনারী থ্রম্বোসিস বলে অভিহিত হয়। ধমনীর অবকাশ সঙ্কীর্ণতর অথবা অবরুদ্ধ হতে পারে একাধিক কারণে। করোনারি থ্রম্বোসিস হলো অন্যতম প্রধান কারণ। ধমনীর দেয়ালের (Arterial wall) কোন অংশে স্বাভাবিক উপাদানের পরিবর্তনে ঐ অংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল হয়ে পড়ে (Metabolic disturbances in the wall→arteriosclerosis)

ঐ স্থূলতা ক্রমান্বয়ে এত বৃদ্ধি পায় যে, ধমনীর ভিতর দিয়ে রক্তপ্রবাহ রুদ্ধ করে দেয় আবার কখনো কখনো ধমনীর ঐ অসুস্থ অংশ (Thrombus) আপন অবস্থান থেকে বিছিন্ন হয়ে রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সূক্ষ্মতর কোন ধমনীতে আট্‌কে পড়ে। ফলে সেখানে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। একেই থ্রম্বোসিস বলা হয়। উপাদানের পরিবর্তনজনিত ধমনীর এই বৈকল্যের প্রধান কারণ হলো, ধমনীর দেয়ালের অংশবিশেষের পুষ্টিগত উপাদানের বৈষম্য ও ক্রমশঃ স্বাভাবিক উপাদানের সম্পূর্ণ রূপান্তর ও বিকৃতি। এই বিকৃতির কারণ হলো রক্তে কোলেষ্টেরল (Cholesterol) জাতীয় স্নেহ-পদার্থের আধিক্য। এই কোলেষ্টেরল সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ধমনীতে সঞ্চিত হয়ে স্ফীতি বা স্ফোটকের মত হয়ে থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীতে অস্বাভাবিকভাবে কোলেষ্টেরলের অবস্থানের সুনির্দিষ্ট হেতু (Etiology) আজ অবধি নিরূপিত হয় নি। কিন্তু ধমনীর বৈকল্যঘটিত হৃদ্‌রোগীদের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ ধরণের কার্যকারণ এবং পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়, যেগুলিকে এই রোগের অতিরিক্ত উৎপাদক-কারণ (Factors) বলা যেতে পারে। নিম্নে অতিরিক্ত উৎপাদক-কারণ বিবৃত হলো।

3 : 1 অনুপাতে পুরুষেরাই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। মধ্যউচ্চতা এবং মধ্যবয়স্ক পুরুষদের মধ্যেই এর প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। জন্মজনিত প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী থাকে।

(1) শরীরে মেদবাহুল্য—স্থূলকায় ব্যক্তিদের ধমনী বৈকল্যের সম্ভাবনা বেশী। শরীরের স্থূলত্বের সঙ্গে ভোজনবিলাসের কিছু সম্বন্ধ থাকে এবং অধিক ভোজনের সঙ্গে ধমনী-বৈকল্যের নিকট সম্বন্ধ।

(2) কায়িক পরিশ্রমের অভাব—যাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না এবং ঘরে বসেই কাজকর্ম করতে হয়, তাদের ধমনীতে পুষ্টিগত বৈকল্য ঘটে। অঙ্গচালনার অভাবে শরীরের মেদ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা অধিক।

(3) উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তাজনিত উদ্বেগ—যে সকল লোককে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, তাঁদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য দেখা যায়।

(4) ধূমপান—যাঁরা অত্যধিক ধূমপান করেন, তাঁদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এবং মৃত্যুর হার বেশী। ধূমপানের ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে—যার ফলে ধমনী বৈকল্য ঘটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা ভাল। চা-পানেও হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনীর উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। চা-পান ও ধূমপানের

প্রতিক্রিয়া বিপরীতধর্মী। চা-পান ও ধূমপান একসঙ্গে জমে ভাল, কিন্তু এটা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়।

তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধরণের রোগ শরীরে বর্তমান থাকলে ধমনীর বৈকল্য ঘটবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে; যেমন—অস্বাভাবিক উচ্চ রক্তচাপ (High blood-pressure), শর্করাধিক্য-বশতঃ বহুমূত্র (Diabetes Mellitus), রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের (Uric acid) আধিক্য (Uricoemia)।

এবার হৃদ্‌যন্ত্রের ধমনী বৈকল্য প্রতিরোধের বিষয় আলোচনা করা যাক। যেহেতু ওষুধ সেবনে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় না, সেহেতু উৎপাদক কারণগুলি যথাসম্ভব বর্জন করতে পারলে সমধিক ফল লাভের আশা থাকে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে, করোনারি থ্রম্বোসিস প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদের রোগ হলেও তরুণেরাও নিরাপদ নয়। তাছাড়া যে সকল কারণ এই রোগ ঘটাতে সাহায্য করে, সেই কারণগুলি বহুদিন শরীরে বর্তমান থাকলে তবে এই রোগের সৃষ্টি হয়। তাহলে এই রোগ প্রতিরোধ করতে হলে রোগ আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই তার প্রতিরোধের সূচনা করতে হবে। সুতরাং তরুণ বয়স থেকে এই রোগ প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হওয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

(1) নিয়মিত ব্যায়াম—বিশেষ করে যাদের পেশা বা কর্মব্যপদেশে অঙ্গ চালনার অবকাশ কম, তাঁদের কোন না কোন উপায়ে কিছু ব্যায়াম করা বিশেষ প্রয়োজন। সকাল-সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ খালি হাতে ব্যায়াম (Free hand exercise), একস্থানে দাঁড়িয়ে দৌড়ানোর অনুকরণ, যোগাসন প্রভৃতি নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত। বয়স্কদের জন্যে প্রত্যহ আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা কিছু দ্রুতভাবে হাঁটা প্রশস্ত।

(2) শরীরের ওজন সীমিত রাখা—স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বয়স ও উচ্চতা অনুপাতে যে ওজনের তালিকা পাওয়া যায়, সেই অনুযায়ী শরীরের ওজন সীমিত রাখবার জন্যে চেষ্টা করা উচিত। নির্ধারিত ওজনের চেয়ে 10 শতাংশের বেশী বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এটি খাদ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(3) খাদ্য—খাদ্যের বিচারে দুটি জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে—খাদ্যের পরিমাণ ও উপাদান সম্পর্কে সতর্কতা। শরীরে যাতে মেদ বৃদ্ধি না হয়, সেজন্যে খাদ্যের পরিমাণ যেন প্রয়োজনীয় ক্যালরির মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। শর্করাজাতীয় খাদ্যও মেদবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, সেজন্যে ভাত, রুটি, চিনি, আলু প্রভৃতি খাদ্যের পরিমাণ সীমিত রাখা প্রয়োজন।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়ে একটু বিশেষ বিবেচনার কথা আছে। হৃদ্‌যন্ত্রে ধমনীতে যে কোলেষ্টেরলজাতীয় পদার্থ পলি পড়বার (Deposit) মত সঞ্চিত হয়, সেটি রক্তে আহৃত হয় স্নেহজাতীয় খাদ্য থেকে। আমরা দু-ভাবে স্নেহজাতীয় খাদ্য খাই—সরাসরি খাদ্য হিসাবে এবং ব্যঞ্জন তৈরির সাহায্যকারী হিসাবে। এর মধ্যে যেগুলিতে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড (Saturated fatty acid) অধিক পরিমাণে আছে, সেগুলি সীমিত অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্জনীয়। কারণ অধিক পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খেলে রক্তে কোলেষ্টেরলের আধিক্য হবার সম্ভাবনা। যে সকল স্নেহজাতীয় খাদ্যে পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের (Poly unsaturated fatty acid) পরিমাণ বেশী, সেগুলি খাওয়া নিরাপদ। শুধু নিরাপদ নয়, শেষোক্ত স্নেহজাতীয় খাদ্য খেলে রক্তে কোলেষ্টেরলের উৎপাদন হ্রাস পেতেও পারে। যে সব খাদ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি

অ্যাসিড অধিক, সেগুলি হলো—দুধ, ঘি, মাখন, পনীর, ডিমের কুসুম, চর্বিবহুল মাংস, মেটে প্রভৃতি। এগুলি বর্জন আবশ্যিক নয়, কিন্তু সীমিত রাখতে হবে। ব্যঞ্জন তৈরিতে বা ভাজার জন্যে যেগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির মধ্যে উভয়বিধ ফ্যাটি অ্যাসিডের হার নিয়ে দেওয়া হলো :

	স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড	পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড
ঘৃত—	64.2	×
সরিষার তেল—	5.5	18.1
তিল ,, —	13.00	31.7
নারিকেল ,, —	90.00	2.5
বনস্পতি (দালদা প্রভৃতি—	25.3	1.9
বাদাম তেল—	19.00	21.0
সয়াসিম তেল—	10.15	55.0

এতদসত্ত্বেও স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়ে অহেতুক আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করলে ভয়ের কোন কারণ নেই; যেমন—দৈনিক একটি করে ডিম খাওয়া অযৌক্তিক নয়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বয়স্কদের একসঙ্গে অল্প পরিমাণে এবং বারে বারে আহার গ্রহণ প্রশস্ত। ব্যঞ্জন ছাড়া বাড়তি লবণ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

(4) ধূমপান ও সুরাপান—অত্যধিক সুরাপান সর্বদাই ক্ষতিকর। অল্প পরিমাণে সুরাপান ক্ষতিকর না হলেও উত্তরোত্তর মাত্রা বৃদ্ধি এবং আসক্তি উৎপন্ন হবার সমধিক সম্ভাবনা থাকায় একেবারে পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

সুরাপানের মত ধূমপানও বর্জন করাই উচিত। সংযমীর পক্ষে প্রত্যহ চার-পাঁচটি সিগারেট খাওয়া ক্ষতিকর না হতে পারে।

(5) মানসিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা—নানা কারণে আধুনিক কালে মানুষের জীবনযাপন প্রণালী জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। শহর-বাসীদের পক্ষে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পেশায় বা চাকুরী জীবনে কর্মীদের উপর অত্যধিক মানসিক চাপ পড়ে। এভাবে ক্রমাগত সমস্যাসঙ্কুল জীবনযাপন করবার দরুণ ধমনী বৈকল্য ঘটবার সাহায্য করে। এসব কারণেই উন্নত এবং প্রগতিসম্পন্ন দেশে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সুতরাং বিশেষ করে বয়স্কদের মনের ভারসাম্য ও সন্তোষের মনোভাব বজায় রাখবার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট হওয়া উচিত। কায়িক পরিশ্রমের পর যেমন দৈহিক বিশ্রাম দরকার হয়, তেমনি মানসিক পরিশ্রমের পর মানসিক বিশ্রাম প্রয়োজন। সুনিদ্রা মানসিক বিশ্রামের একটি উপায়। দৈনিক আধ ঘণ্টা নিদ্রা স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া সপ্তাহে একদিন এবং বছরে একমাসের মত ছুটি উপভোগ করা উচিত। ছুটির দিন পছন্দমতভাবে অবসর বিনোদন করা উচিত। এই সময় শারীরিক বিশ্রাম বড় কথা নয়। যিনি যে কাজ করেন তিনি সেই কাজ ছাড়া অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকলেও মানসিক বিশ্রাম হয়।

নিত্যকার কাজেও সর্বদাই একটা সন্তোষের ভাব এবং জীবনযাত্রাকে একটা সহজ এবং হাল্কাভাবে নেবার চেষ্টা করা উচিত। সবসময় তাড়াহুড়া বা অনাবশ্যক ক্ষিপ্রতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রুচিভেদে কিছু সময় পূজা বা উপাসনার আশ্রয় নেওয়া ফলপ্রসূ অভ্যাস।

মোট কথা—হৃদ্‌রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সরল শান্তভাবে জীবন-যাপন, মাঝে মাঝে শান্ত পরিবেশে দিন যাপন করতে হবে। এর সঙ্গে পরিমিত আহার, বিশেষ করে, স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিষয়, ধূমপান ও সুরাপান বর্জন এবং যতদূর সম্ভব উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে দূরে সরে থাকা দীর্ঘায়ু হবার সহায়ক।

বিজ্ঞান-সংবাদ

অগ্নি-প্রতিরোধক উপাদান

অগ্নি-প্রতিরোধক একপ্রকার অভিনব রাসায়নিক উপাদান সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাড়ীঘর, কলকারখানা প্রভৃতিকে অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা করবার পক্ষে এই বস্তুটি বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ যে পরিমাণ তাপে বাড়ীঘর বা কলকারখানার আগুন ধরে যায়, সেগুলির উপর ঐ বস্তুর আস্তরণ থাকলে তার দ্বিগুণ পরিমাণ তাপেও তাতে আগুন ধরে না।

1967 সালের 27শে ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডীতে অ্যাপোলো মহাকাশযানে আগুন ধরে যায়। তখন তাতে ছিলেন মহাকাশচারী গ্রীসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট এবং রজার শাফে। এঁদের তিন জনেরই ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনার পরেই আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা অগ্নি থেকে মহাকাশচারীদের রক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হয়। তাদের গবেষণা ও চেষ্টার ফলেই ফ্লোরেল নামে একটি বস্তু উদ্ভাবিত হয়। 1967 সালের মে মাসের প্রথম দিকে টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টনে মনুষ্যবাহী মহাকাশ কেন্দ্রে ঐ বস্তুটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়।

মহাকাশ সংস্থার নিরাপত্তা বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ফিলিপ বলগার এই প্রসঙ্গে বলেন যে, দু-রকমের ফ্লোরাইড দিয়ে এই বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে। কোন বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর তাপরোধক ক্ষমতা বেড়ে যায়। বর্তমানে এর দাম খুবই বেশী। ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হলে এবং ব্যবহার বেড়ে গেলে বস্তুটি সস্তায় পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নর্থ চার্লস্টনের জেনারেল অ্যাসবেস্টস অ্যাণ্ড রবার ডিভিশন রেবেস্টাস ম্যানহাটন কোম্পানীর কারখানায় এই অগ্নিনিরোধক উপাদান তৈরি হচ্ছে। এর নামকরণ করা হয়েছে 'বেকমেট এল 3203 6'।

মিঃ বলগার এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে ত্রুটির ফলে অনেক সময় আগুন লাগে। ঐ সকল তারের উপর ঐ ফ্লোরাইডের প্রলেপ থাকলে এই ভয় থাকবে না। তাছাড়া মোটর গাড়ী প্রভৃতিতেও ঐ জিনিষটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া নানা প্রকার বিমান, বিমানের কামরা, কম্পিউটার কারখানা, জেট-ইঞ্জিনচালিত বিমানে আগুন লাগবার আশঙ্কা খুবই বেশী থাকে।

ফেনা, পেন্ট প্রভৃতি নানা আকারেই ঐ বস্তুটি পাওয়া যায়। এমন কি, 2200 ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ এবং আবহাওয়ায় শতকরা 100 ভাগ অক্সিজেন থাকলেও ফ্লোরাইডের আস্তরণ যে কোন বস্তুকেই অগ্নির কবল থেকে রক্ষা করবে। সাধারণতঃ আবহাওয়ায় থাকে শতকরা 20 ভাগ অক্সিজেন। ঐ আবহাওয়ায় কাগজ 800 ডিগ্রী, চামড়া 850 ডিগ্রী, প্লাইউড 900 ডিগ্রী এবং ক্যানভাস 100 ডিগ্রী ফারেনহাইটে দগ্ধ হয়।

মস্তিষ্কের রোগে একোলোকেটর

মস্তিষ্কের রোগের প্রকৃতি নিরূপণের জন্যে ডাক্তারেরা অনেক দিন থেকেই একটা পদ্ধতি প্রয়োগ করে আসছেন। এর নাম অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি। একটি বিপরীতধর্মী বস্তু রোগীর ক্যারোটিড ধমনীতে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সেই বস্তুটি ধমনীর মধ্যে ছড়িয়ে

পড়ে। তার ফলে রঞ্জেন রশ্মির ফটোতে গুরু-মস্তিষ্কের আকৃতির একটি স্পষ্ট ও বিশদ চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি প্রয়োগ করা সর্বদা সম্ভব হয় না। যাঁরা অত্যধিক উত্তেজনার রোগে ভোগেন, তাঁদের পক্ষে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি পদ্ধতি প্রয়োগের ফল রোগীর উপর খুবই বেদনাদায়ক হয়।

খুব বেশী দিনের আগের কথা নয়, মানুষের মস্তিষ্ক পরীক্ষার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণের যে সারা ইউনিয়ন গবেষণা সংস্থা আছে, সেই গবেষণা সংস্থায় একটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। তার নাম একো-11। এই যন্ত্রের সাহায্যে গুরুমস্তিষ্কের গঠন এবং তার জৈব আকৃতি প্রত্যক্ষ করা যায়। এই যন্ত্রটি উচ্চবেগসম্পন্ন স্পন্দনের সৃষ্টি করে এবং তাকে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঢোকায়। তার ফলে মস্তিষ্কের অন্তরতম অংশ প্রতিফলিত আলোকে পর্দার উপরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মস্তিষ্কের ভিতরে টিউমার আছে কিনা, রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা অথবা কোন রকম ফোড়া আছে কিনা—এই চিত্র থেকে ডাক্তারেরা তা জানতেপারেন। যদি থাকে, তবে তাদের অবস্থান এবং আয়তন সম্পর্কেও ডাক্তারেরা জানতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রোগ নিরূপণে এই যন্ত্রের ক্ষমতা অপরিসীম আর এই যন্ত্রের ব্যবহার ক্ষতিকর বা বেদনাদায়ক নয়। এই যন্ত্র নিউরোলজিক্যাল, নিউরোসার্জিক্যাল এবং ট্রমাটোলজিক্যাল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এই যন্ত্রের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এই যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রকে অনেকখানি বিস্তৃত করা যায়। ফার্স্ট এড এবং অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রেও এই যন্ত্র ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তার জন্যে চাই একটি হাল্কা ধরণের মেশিন। গবেষণা সংস্থাটি এই সমস্যারও সমাধান করেছে।

একো-12 নির্মাণে সেমিকণ্ডাক্টর শ্রেণীর উপাদান ব্যবহৃত হয়। একো-12 একটি ছোট ধরণের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র। এর ওজন 10 কিলোগ্র্যাম। মস্তিষ্কের রোগ নিরূপণে এই যন্ত্র খুবই সহায়ক হবে। কোন্ রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে—এই যন্ত্রের সাহায্যে ডাক্তারেরা সে সম্পর্কে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। তাছাড়া অচেতন অবস্থায় রোগীর রোগ-নির্ণয়েও এই যন্ত্র খুবই সহায়ক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা

পায়োনিয়ার স্পেস-ক্র্যাফ্‌টের অভিযানের লক্ষ্যস্থল বৃহস্পতিগ্রহকে তার চারটি উপগ্রহসহ (বাম দিক থেকে—ক্যালিস্টো, ইউরোপা, আইয়ো, গ্যানিমিড) ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

প্ল্যাটিপাস

কত অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তুই না দেখা যায় এই পৃথিবীতে—যাদের আকৃতি, স্বভাব, জীবনযাত্রাপ্রণালী আর গতিবিধির কথা শুনলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। প্ল্যাটিপাস বা হংসচঞ্চু এই রকমেরই এক বিচিত্র ধরণের প্রাণী। এই প্রাণীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করতে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন।

আমরা জানি, জীববিজ্ঞানীরা প্রাণী-জগৎকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। মেরুদণ্ডী প্রাণীরা আবার পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(1) মাছ, (2) উভচর, (3) সরীসৃপ, (4) পাখী এবং (5) স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—এদের দেহত্বক কম-বেশী লোম দিয়ে আবৃত। এদের দাঁত আছে, যার সাহায্যে এরা খাবার চিবিয়ে খায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাচ্চা প্রসব করে এবং জন্মের পর ঐ বাচ্চা মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পান করে পুষ্ট হয়। তাছাড়া স্তন্যপায়ীরা সমোষ্ণশোণিত প্রাণী, অর্থাৎ এদের দেহের উত্তাপ শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব ঋতুতে প্রায় একই থাকে।

কিন্তু প্ল্যাটিপাস নামের প্রাণীটিতে যে কেবলমাত্র স্তন্যপায়ীদের বৈশিষ্ট্যই আছে তা নয়, এতে পাখী এবং সরীসৃপজাতীয় প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যও কম-বেশী বিদ্যমান। তবুও জীববিজ্ঞানীরা একে স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্ল্যাটিপাসের ঠোঁট হাঁসের ঠোঁটের মতই চ্যাপ্টা বলে এদের হংসচঞ্চু বলা হয়। জীববিজ্ঞানীরা এদের যে বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন, তা হলো অর্নিথোরিঙ্কাস (Ornithoryncus)—যার অর্থ হলো, স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত হাঁসের মত ডিম্বজ প্রাণী।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও তার দক্ষিণে অবস্থিত টাসমানিয়া দ্বীপেই কেবলমাত্র এই জীবটিকে দেখা যায়। আকৃতিতে এরা খুব বড় নয়। পূর্ণাঙ্গ প্ল্যাটিপাস প্রায় দেড় ফুট লম্বা। এদের দেহ গাঢ় বাদামী রঙের ছোট ছোট লোমে আবৃত। এদের চারটি পা ও একটি নাতিদীর্ঘ লেজ আছে। বিবরবাসী প্রাণীদের মত এদেরও সব পায়েই ধারালো বাঁকা নখ আছে। এই নখের সাহায্যে এরা বসবাসের জন্যে নদীর তীরে সুড়ঙ্গ কাটতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে আত্মরক্ষার জন্যে আক্রমণও করতে পারে। প্ল্যাটিপাস আসলে জলচর। সাঁতার কাটবার সুবিধার জন্যে এদের সামনের পায়ের নখের মধ্যবর্তী ফাঁকগুলি হাঁসের পায়ের মত পাত্‌লা চামড়া দিয়ে জোড়া। এই দুটি পায়ের সাহায্যে এরা দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে পারে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত এদের দাঁত নেই, তার বদলে আছে পাত্‌লা চামড়া দিয়ে ঢাকা চওড়া শক্ত ঠোঁট। এরা হ্রদ বা নদীর ধারের কর্দমাক্ত স্থানে ঠোঁট ঢুকিয়ে

খাবার সংগ্রহ করে। সংগৃহীত খাদ্য কিন্তু এরা সঙ্গে সঙ্গেই গিলে ফেলে না। এদের গলার দু-পাশে দুটি থলি আছে। প্রয়োজনমত খাবার জন্যে এই থলিতে এরা খাবার জমিয়ে রাখে।

কিন্তু এদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হলো এই যে, এরা সরীসৃপ ও পাখীর মত ডিম পাড়ে। আবার ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তারা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত মায়ের দুধ খেয়ে পুষ্ট হয়। স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস সাধারণতঃ আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি লম্বা দুটি বা তিনটি সাদা ডিম পাড়ে। ডিম ফোটাবার জন্যে স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস ডিমে বসে তা দেয়। ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তার দেহে পালক বা লোম থাকে না, চোখও বন্ধ থাকে। তখন এদের ঠোঁট ছোট আর নরম থাকে। এই ঠোঁটের সাহায্যে মায়ের দুধ খাওয়া সম্ভব নয় বলে বাচ্চা প্ল্যাটিপাসের গালের দু-ধারে দু-সারি ছোট ছোট দাঁত থাকে। বাচ্চা বড় হলে এই দাঁত পড়ে যায়।

স্ত্রী-প্ল্যাটিপাসের বুকের উপরে জামার পকেটের মত একটা থলি থাকে। ডিম থেকে যে বাচ্চা বেরোয়, তা খুব অপুষ্ট থাকে বলে স্ত্রী-প্ল্যাটিপাস বাচ্চাকে ঐ থলিতে পুরে রাখে। যতদিন না বাচ্চাগুলি শক্ত-সমর্থ হয়ে ওঠে, ততদিন ওরা ঐ থলিতে থাকে। এই সময় বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় তাপ এরা নিরবচ্ছিন্নভাবে পেয়ে থাকে মায়ের দেহ থেকে।

স্ত্রী-প্ল্যাটিপাসের বুকে স্তন বা স্তনের বোঁটা বলে কিছুই থাকে না। এদের বুকে যে থলিটি থাকে, তার ভিতরের গাত্রত্বকে কতকগুলি দুগ্ধ-গ্রন্থি থাকে। বাচ্চাগুলি থলিতে অবস্থানকালে তাদের ছোট ছোট অস্থায়ী দাঁত দিয়ে দুগ্ধ-গ্রন্থির মুখের কাছে ত্বক কামড়ে ধরে দুধ চুষে খায়।

অস্ট্রেলিয়া ও টাসমানিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখা যায় না। বন্দী করে অন্য দেশে নিয়ে গেলে বেশীদিন বাঁচে না। জীববিজ্ঞানীদের মতে, একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়াই এদের জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত। এখন এই প্রাণীটির জীবনযাত্রাপ্রণালী এবং অন্য কোথাও এদের অস্তিত্ব আছে কি না, সে বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

গুণের নতুন নিয়ম

ছেলেবেলায় মা-বাবার কাছে বসে একটা ধারাপাত নিয়ে শরীর দুলিয়ে সুর করে—একে একে এক, এক দুগুণে দুই, এক তিনে তিন—এভাবে পঁচিশের ঘর পর্যন্ত নামতা মুখস্থ করেছি। তাতে ছোট-বড় যে কোনও রকমের গুণ বা ভাগ করতে অসুবিধা হতো না। এই তো সেদিন ছোটদের আসরে অমুদা 15-কে 13 দিয়ে গুণ করতে দিলেন। আমরা সবাই সাধারণভাবে যা শিখেছি, তাই প্রয়োগ করে গুণফল বের করলাম।

15
13
45
15×
195

যদি বল, সাধারণভাবে বলছি কেন? এর উত্তর কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুদার শেখানো নিয়মগুলির মধ্যে পাবে। এতে এমনও নিয়ম আছে, যাতে দুয়ের ঘরের নামতা জানলেই যথেষ্ট। শুনে অবাক হচ্ছো নিশ্চয়ই! অবাক তো হবারই কথা! আর মনে মনে ভাবছ, ছেলেবেলায় ঐ দাদা যদি আসতেন, তাহলে পঁচিশের ঘর পর্যন্ত নামতা মুখস্থের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। এখন একটু স্থির হয়ে ভালভাবে লক্ষ্য করে যাও, নতুন নিয়মগুলি কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপরে যে দুটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ 15 ও 13, ঐ দুটির একক হলো যথাক্রমে 5 ও 3। আর দশক সংখ্যা দুটির ক্ষেত্রেই 1। গুণফল বের করবার আগে একক ও দশক কাজে লাগবে বলে এই দুয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। এখন 15-এর সঙ্গে 13-এর, কিংবা 13-এর সঙ্গে 15-এর একক যোগ কর। যোগফল—$15+3=18$ অথবা $13+5=18$। এবার 18-কে 10 দিয়ে গুণ করতে হবে। এই গুণফলের অর্থাৎ 180-এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল ($5\times3=15$) যোগ করলেই 15 ও 13-এর গুণফল 195-এর সমান হয়। এই নিয়মে 18×19, 10×19, 11×18 প্রভৃতির গুণফল বের করা যাবে। এই নিয়মটাকে প্রথম নিয়ম বলা যাক। প্রথম বললাম এই কারণে যে, এর পরে আরও নিয়ম আছে। অন্য নিয়মে আসবার সার্থকতা এই যে, এই নিয়ম দিয়ে সব গুণ করা যায় না। যেমন ধরা যাক, $45\times48=$ কত? প্রথম নিয়ম দিয়ে এই গুণ করলে গুণফল ভুল বেরোবে। তাহলে কি প্রথম নিয়ম

ভুল? তা মোটেও না। প্রথম নিয়ম দিয়ে কেবলমাত্র 10 ও 20-এর মধ্যে যে কোনও সংখ্যাকে যে কোন সংখ্যা দিয়ে গুণ করা যায়।

এখন 45 ও 48-এর গুণফল নির্ণয়ের জন্যে অন্য নিয়ম দরকার। এই নিয়মটার নাম দেওয়া যাক দ্বিতীয় নিয়ম। এই নিয়মের সঙ্গে প্রথম নিয়মের কিছুটা মিল পাওয়া যাবে। এখানে দুটির একক সংখ্যা যথাক্রমে 5 ও 8। দশক সংখ্যা 4। এখন 45-এর সঙ্গে 8, কিংবা 48-এর সঙ্গে 5-এর যোগফল দাঁড়ায় 53 (45+8=53, 48+5=53)। এই যোগফলকে দশক সংখ্যা 4 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 53×4=212। এই 212-কে 10 দিয়ে গুণ করলে হয় 2120। এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল 5×8=40 যোগ করে দিলে—2120+40=2160—45 ও 48-এর গুণফল বেরিয়ে যায়।

এবার একটা গুণ দিচ্ছি। বল দেখি, কোন্ নিয়মে হবে? সংখ্যা দুটি হলো—91×98। এটাও দ্বিতীয় নিয়ম দিয়ে করলেই ঠিক উত্তর পাবে।

কিন্তু দ্বিতায় নিয়মে না করে অন্য এক নিয়মে এর নির্ধারিত গুণফল পাওয়া যাবে। এর নাম দেওয়া যাক তৃতীয় নিয়ম। এই নিয়ম করবার আগে যেটা বিশেষ করে জানা দরকার, সেটা হলো দ্বিতীয় আর তৃতীয় নিয়মের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে কোন্‌টা তৃতীয় নিয়মে করলে সুবিধা হবে বলে দিচ্ছি। যদি দেখা যায় দুটি সংখ্যাই 9-এর ঘরে (এখানে যেমন 91 ও 98), তাহলে তৃতীয় নিয়ম দিয়ে করলে সুবিধা।

এখন দেখা যাচ্ছে 100 থেকে 91 ও 98-এর সঙ্গে যথাক্রমে 9 ও 2 পার্থক্য থাকছে। এই 9 আর 2 গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 18। এই 18-কে ছেড়ে 91 আর 98-এর দিকে তাকানো যাক। এবার 91 থেকে 9 বিয়োগ না করে 100 ও 98-এর বিয়োগফল 2 বিয়োগ করলে দাঁড়ায়—91−2=89। অথবা 98 থেকে 2-এর বদলে 100 ও 91-এর বিয়োগফল 9 বিয়োগ করে বিয়োগফল হবে 89। এই 89-এর সঙ্গে 100 গুণ কর। গুণফল হবে 89×100=8900। এর সঙ্গে আগের গুণফল 18 যোগ করলে যে 8918 হয়, সেটাই 91 ও 98-এর গুণফল।

আবার যদি গুণ করতে গিয়ে দেখ যে, দুটির মধ্যে একটা 9-এর ঘরে অর্থাৎ ধর 93, আর অপরটি হলো 5-এর ঘরে অর্থাৎ ধর 53, তাহলে ঐ তিনটি নিয়মের কোনটিই খাটবে না। মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ জাগছে—কেন খাটবে না? দেখ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম দিয়ে যে গুণগুলি করা হলো, সেগুলির মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রত্যেকটিতে দুটি দশক সংখ্যার মিল আছে। প্রথমে 1−1 (15 ও 13), দ্বিতীয়ে 4−4 (45 ও 48) ও তৃতীয়ে 9−9 (91 ও 98)। কিন্তু এখানে 93 ও 53-তে কি দুই দশকের মিল আছে? মিল আছে যাতে, সে হলো এককের (3−3)। যাই

হোক, দুই দশকের যখন মিল নেই, তখন এর গুণফল অন্য এক নিয়মে করতে হবে। এর নাম দাও চতুর্থ নিয়ম।

এই নিয়মে 9-কে 5 দিয়ে গুণ করে যে গুণফল হবে (9×5=45), তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করলে হয় 4500। এবার 9 আর 5 যোগ করলে 14 হয় যোগফল। এই 14-এর সঙ্গে যে কোন একটির একক (এখানে 3) দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল হয় (14×3=42), তাকে আবার 10 দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় 420। এখন এই 420-এর সঙ্গে আগের 4500 যোগ করে ফল দাঁড়ায় 4920। এর সঙ্গে দুই এককের গুণফল (3×3=9) যোগ করলে যে সংখ্যা 4929 দাঁড়ায়, তাই ঐ সংখ্যা দুটির গুণফল।

একই নিয়মে অর্থাৎ চতুর্থ নিয়ম দিয়ে 35 ও 75-এর গুণফল বের করা যায়। এটা অন্য নিয়ম দিয়েও করা যায়। এই নিয়মটা নিয়ে পঞ্চম নিয়ম হলো। এই নিয়মের পরিধিতে সেটাই পড়বে, যাদের দুটি এককই 5। এই সংখ্যা অর্থাৎ 5 ভিন্ন অন্য কিছু সংখ্যা হলে এই নিয়ম খাটবে না। তাহলে চতুর্থ নিয়ম দিয়ে করা যাবে। এখন পঞ্চম নিয়ম প্রয়োগ করে দেখা যাক।

এতে প্রথমে দশক দুটির গুণফল (এখানে 3×7=21) বের করে তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাতে গুণফল দাঁড়ায় 2100। এবার দশক দুটিকে (3 ও 7) যোগ করে, তাদের যোগফলকে (3+7=10) 2 দিয়ে ভাগ কর—10÷2=5। এই 5-কে 100 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 100×5=500। এখন এই 500 আর আগের 2100 যোগ করে (2100+500=2600) তার সঙ্গে দুই এককের গুণফল 5×5=25 যোগ করে দিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় 2625। এটাই হলো 35 ও 75-এর গুণফল।

এই নিয়মের আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধর, দেওয়া হলো 35-কে 65 দিয়ে গুণ করতে। প্রথমে দুই দশকের অর্থাৎ 3 আর 6 গুণ করে তাকে আবার 100 দিয়ে গুণ করলে গুণফল দাঁড়ায় 1800। এবার দশক দুটিকে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করলে হয়—3+6=9, 9÷2=4½। এতে ভগ্নাংশ কিছু থেকে যায়। এখন এই ভগ্নাংশটা ফেলে রেখে পূর্ণসংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। পূর্ণসংখ্যা 4-কে 100 দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় 400 গুণফল। এই 400 আর আগের 1800 যোগ করলে হয় 2200। এই সংখ্যাকে 25 দিয়ে যোগ না করে 75 দিয়ে যোগ কর। তাহলে পূর্ণসংখ্যা হয় 2275। এই 75 যোগ করতে হবে তখনই, যখন 2 দিয়ে ভাগ করলে ভাগ মেলে না। তবে অন্য সব জায়গায় এই নিয়মে 25 যোগ করতে হবে।

যহোক পাঁচ-পাঁচটা নিয়ম শেখানো হলেও ঐ দিয়ে সব রকমের গুণ

করা যাচ্ছে না। তাই অন্য এক নিয়ম আছে, যা দিয়ে মোটামুটি সব রকমের গুণ করা যেতে পারে। এটি হলো ষষ্ঠ নিয়ম। এই নিয়মে 2 দিয়ে গুণ করা আর 2 দিয়ে ভাগ করা শিখলেই যথেষ্ট। এখন 13 ও 14-এর গুণফল নির্ণয় করতে দেওয়া হলো।

প্রথমে 13 আর 14-এর যে কোন একটাকে 2 দিয়ে পর পর ভাগ করে যেতে হবে, যতক্ষণ না ভাগফল 1 হয়। আর অন্য সংখ্যাকে 2 দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। ভাগের সময় যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তাহলে কেবল পূর্ণসংখ্যাটাই ধরতে হবে।

এখন 13-কে 2 দিয়ে ভাগ করতে বলা হলে, 14-কে 2 দিয়ে গুণ করে যেতে হবে। ফলাফলগুলি পর পর লিখে যাও—

13		14
6	($6\frac{1}{2}$-এর পরিবর্তে)	28
3		56
1	($1\frac{1}{2}$-এর পরিবর্তে)	112

এবার বাঁ-দিকে যে যুগ্মসংখ্যাগুলি (এখানে কেবল 6), সেগুলি ফেলে রেখে বাদবাকী সব যথারীতি রেখে দিতে হবে এবং বাঁ-দিকের যুগ্মসংখ্যা বাদ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডানদিকের ওরই সমান্তরালবর্তী সংখ্যাটা সরিয়ে নাও। এখানে 6-এর সঙ্গে 28 কেটে নাও, পড়ে থাকবে কেবল—

13	14
3	56
1	112

এখন ডানদিকের সংখ্যাগুলি যোগ করলে 13 ও 14-এর গুণফল পাওয়া যাবে।

অনেক রকম তো হলো। এবার যে জিনিষটা আসছে, তা আরও মজার। এটি কিন্তু শেষ নিয়ম। এর পর অমুদা আর বিরক্ত করেন নি। যদি 695-কে 327 দিয়ে গুণ করতে বলে, তাহলে সাধারণভাবে 695-কে প্রথমে 7 দিয়ে, পরে 2 ও সবশেষে 3 দিয়ে গুণ করে একটা নীচে রেখা টেনে ঐগুলি যোগ করলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এই নিয়মে অত কিছু না করে সহজে এক লাইনে গুণফল বের করা যাবে। দেখা যাক 695×327-এর গুণফল এই নিয়মে কি রকম ভাবে আসে।

প্রথমে 5-কে 7 দিয়ে গুণ কর। গুণফল দাঁড়ালো 35। এর 5 লিখলে হাতে থাকে 3। এর পর উপরে শেষের দুটি সংখ্যাকে নীচের শেষ দুটি সংখ্যা দিয়ে কোণাকুণিভাবে গুণ করে তাদের যোগফল বের করতে হবে অর্থাৎ $9 \times 7 + 5 \times 2 = 63 + 10 = 73$। এই 73-এর সঙ্গে হাতের 3 যোগ দিলে হয় 76। এখন শুধু 6 বসালে হাতে থাকে 7।

এবারে উপরের তিনটি সংখ্যাকে নীচের তিনটি সংখ্যা দিয়ে কোণাকুণি গুণ দিয়ে যোগফল বের করা যাক। $7\times6+2\times9+3\times5=75$। এর সঙ্গে হাতের 7 যোগ করলে হয় 82। এই 82-এর 2 বসালে হাতে থাকে 8।

এখন ডান দিকে একটা করে সংখ্যা বাদ দিয়ে গুণ করতে হবে; অর্থাৎ প্রথমে উপরে ও নীচে বাঁ-দিকের দুটি করে সংখ্যা নিয়ে গুণ করতে হবে। গুণ করলে 6×2 আর 9×3 হয়। ঐ দুটির যোগফল 39-এর সঙ্গে হাতের 8 যোগ করলে হয় 47। 47-এর 7 বসে হাতে 4 থাকবে।

ডানদিকের আরও একটা সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে শুধু 6 ও 3 গুণ করে হাতের 4 যোগ দাও। তাতে হয় 22। এবার গোটাটা লিখলে এরকম দাঁড়াবে—

695
327

227, 265

এখন এই নিয়ম দিয়ে একটা বড় গুণ করে দেওয়া চলে যেমন—

238, 756
12, 321

কত?

এতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নীচের সারিতে বাঁ-দিকে একটি ঘর ফাঁকা। তাতে শূন্য বসিয়ে দিলে আকারটা দাঁড়ায় এরকম :—

238, 756
012, 321

এবার গুণ করা যাক—

$$(1\times6)= \quad 6$$
$$(5\times1)+(6\times2)= \quad 17$$
$$(7\times1)+(5\times2)+(6\times3)= \quad 35$$
$$(8\times1)+(6\times2)+(7\times2)+(5\times3)= \quad 49$$
$$(3\times1)+(6\times1)+(8\times2+(5\times2)+(7\times3)= \quad 56$$
$$(2\times1)+(6\times0)+(3\times2)+(5\times1)+(8\times3)+(7\times2)= \quad 51$$
$$(2\times2)+(5\times0)+(3\times3)+(7\times1)+(8\times2)= \quad 36$$
$$(2\times3)+(7\times0)+(8\times1)+(3\times2)= \quad 20$$
$$(2\times2)+(8\times0)+(3\times1)= \quad 7$$
$$(2\times1)+(3\times0)= \quad 2$$
$$(2\times0)= \quad 0$$

02941712676

এভাবে যদি গুণটা মুখে মুখে সেরে নিয়ে উত্তরটা কেবল লিখে যাই, তাতে সকলকে অবাক করে দেওয়া যায় বৈকি। দেখ, বাড়ীতে বসে ভালভাবে অভ্যাস করে যদি সকলের সামনে দেখাও, তাহলে তুমি রাতারাতি বেশ নাম করে ফেলবে।

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী

যান্ত্রিক গরু

না—যান্ত্রিক মানুষ বা রবোটের মত যান্ত্রিক গরু নয় কিংবা দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত গরুর আকৃতি দেওয়া কোন খেলনা পুতুলও নয়; বৃটেনের খাদ্যশিল্প সংস্থার অন্যতম পরামর্শদাতা খ্যাতনামা জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী ডক্টর হুগ ফ্রাঙ্কলিন কৃত্রিম উপায়ে গরুর দুধ সংশ্লেষণের জন্যে যা ভেবেছিলেন, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং অভিনবও বটে।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ভেবেছিলেন—গরু ঘাস, খড়, খোল, ভূষি, চুনি ইত্যাদি খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যগুলি থেকে তাদের দেহাভ্যন্তরে পরিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে দুধের সকল প্রকার উপাদান সংগ্রহ করে থাকে। তাহলে গরুর খাবার সমস্ত দ্রব্যকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তা থেকে দুধের উপাদানগুলি সংগ্রহের দ্বারা কেন দুধের সমগুণসম্পন্ন তরল পদার্থ সংশ্লেষণ করা যাবে না? ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন বছর সাতেক এই নিয়ে একনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন এবং সম্প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ সাফল্যের কথা ঘোষণা করে বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।

তিনি কয়েক টন গরুর আহার্য ঘাস, খড়, ভূষি, বিভিন্ন শাকসব্জি ইত্যাদিকে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কয়েক গ্যালন দুধে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গরুর দুধ থেকে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক আবিষ্কৃত কৃত্রিম দুধের নাম উদ্ভিজ্জ দুধ দেওয়া হয়েছে। মানুষের দেহাভ্যন্তরের মতই গরুর দেহাভ্যন্তরেও রয়েছে বিভিন্ন জটিল সব যান্ত্রিক ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলি তাঁর নবাবিষ্কৃত যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে সংঘটিত করেছেন। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর যন্ত্রের জটিল গঠন-প্রণালী গোপন রেখেছেন, শুধু পদ্ধতিটির বর্ণনা দিয়েছেন।

যান্ত্রিক গরুর সাহায্যে উদ্ভিজ্জ দুধ প্রস্তুতির বিবরণ দেবার আগে গরুর দুধের বিভিন্ন উপাদান এবং সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে কিরূপভাবে তৈরি করা যায়, ত

সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। গরুর দুধের মুখ্য উপাদান হলো ল্যাক্টোজ বা শর্করাসমৃদ্ধ স্নেহজাতীয় এবং প্রোটিন-সমৃদ্ধ পদার্থ। তাছাড়া এতে আছে বিভিন্ন খনিজ লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিনযুক্ত পদার্থ। খাঁটি গরুর দুধের প্রতি এক-শত ভাগে 87 ভাগ জল, 3·3 ভাগ প্রোটিন, 3·6 ভাগ স্নেহজাতীয় পদার্থ, 4·8 ভাগ ল্যাক্টোজ, 0·7 ভাগ বিভিন্ন খনিজ লবণ এবং 0·6 ভাগ বিভিন্ন ভিটামিন (এ, বি, সি, ডি ও ই)। এখন যদি কোনভাবে উল্লিখিত সমস্ত উপাদানগুলি আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করি, তাহলেই আমরা গরুর দুধের সদৃশ সমান পুষ্টিকর এবং স্বাদবিশিষ্ট কৃত্রিম দুধ পেতে পারি। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ভাবতে থাকেন—ঘাস, খড়, খোল, শাকসব্জি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে গরু যদি তার দেহের অভ্যন্তরে দুধ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে ঐ বস্তুগুলি থেকেই গরুর মাধ্যম ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে দুধ কেন সংশ্লেষণ করা যাবে না? প্রথম দিকে তিনি সয়াবীন নিয়ে চেষ্টা করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে সয়াবীনের দুধ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন ছয়জন সহকারী নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন। এই শ্রমসাধ্য গবেষণায় একদিন তিনি সাফল্য লাভ করলেন। তাঁর উদ্ভাবিত যান্ত্রিক গরুতে তিনি প্রথমে 15 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ প্রস্তুত করেছিলেন, যা পরীক্ষা করে পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা রায় দেন যে, তা গরুর দুধের মতই সুস্বাদু এবং সমান পুষ্টিকর। এরপর ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন আরো কিছুদিন গবেষণা করে দুধের গুণবৃদ্ধি ও পদ্ধতিটির উন্নতিসাধন করেন। বর্তমানে ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন তাঁর যান্ত্রিক গরুর যে মডেলটি প্রস্তুত করেছেন, তার এক-প্রান্তে এক টন গো-খাদ্য (ঘাস, খড়, খোল, শাকসব্জি ইত্যাদি) প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রটি চালু করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অপর প্রান্ত থেকে 200 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ পাওয়া যাবে। গরুও সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ পরিমাণ খাদ্য খেয়ে প্রায় ঐ পরিমাণ দুধই দিয়ে থাকে তবে একবারে বা একদিনে নয়।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রে বিভিন্ন গো-খাদ্য কেটে টুক্‌রা করবার জন্যে দ্রুত আবর্তনশীল (মিনিটে 3,000 বার) একটি ধারালো ছুরি রয়েছে। ছোট ছোট টুক্‌রা-গুলি এরপর জলমিশ্রিত হয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আর একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে পড়ে, যেখানে গো-খাদ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে ক্লোরোফিলজাতীয় পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূরীভূত করা হয়। এবার ক্লোরোফিলমুক্ত অর্ধতরল খাদ্যপিণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন স্নেহ ও শর্করাজাতীয় দ্রব্য মেশানো হয়। সমস্ত দ্রব্যগুলি এরপর যান্ত্রিক উপায়ে আলোড়িত হয়ে তৈলাক্ত এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হয়; আইরিশ-মস নামে একজাতের বাদামী সামুদ্রিক আগাছার সাহায্যে তরলটিকে সুস্থিত (Stable) করা হয়। সর্বশেষে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিশোধন-ক্রিয়ার পর অপর প্রান্তের নির্গমন নল দিয়ে বেরিয়ে আসে কৃত্রিম উদ্ভিজ্জ দুধ।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে প্রতিদিন প্রতিটি যান্ত্রিক গরু থেকে 200 গ্যালন উদ্ভিজ্জ দুধ পাওয়া যাচ্ছে। গরুর দুধের মত এই কৃত্রিম দুধের কোন প্রকার পাস্তুরাইজেসনের প্রয়োজন নেই। পাস্তুরাইজেসন হলো পাস্তুর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় দুধকে জীবাণুমুক্ত করা। সাধারণতঃ 65 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরুর দুধকে 30 মিনিটকাল উত্তপ্ত করলে দুধের সকল রকম ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস হয় অর্থাৎ দুধ পাস্তুরাইজ্‌ড্‌ হয়ে থাকে। ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন বলেছেন, কোন রকম বিশোধন-প্রক্রিয়া ছাড়াই এই কৃত্রিম দুধকে কয়েক মাস অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত রাখা যায়, এতে এর পুষ্টি-মূল্যও অপরিবর্তিত থাকে।

এই উদ্ভিজ্জ দুধের প্রতি আউন্সে 10 মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, 0·18 মিলিগ্রাম ভিটামিন বি$_2$, 0·01 মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন-বি$_{12}$, 250 আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-এ, 20 আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন-ডি আছে। গরুর দুধের তুলনায় এই দুধ কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। ফুটিয়ে না নিলে গরুর দুধ থেকে বোভাইন টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষ্মারোগ সংক্রমণের (যদি গরুটি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়ে থাকে) যে সম্ভাবনা থাকে, এই উদ্ভিজ্জ দুধ থেকে সে রকম কোন সংক্রমণের বিন্দুমাত্র ভয় নেই। ল্যাক্‌টোজ পরিপাকের গোলযোগের জন্যে যে সকল শিশুরা মায়ের বুকের দুধ বা গরুর দুধ হজম করতে পারে না, তাদের পক্ষে এই উদ্ভিজ্জ দুধ সহজপাচ্য হবে বলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

গণিতে তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে আজ প্রথমে তোমাদের গণিতের একটি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলবো এবং তারপর 5টি প্রশ্ন দেব। প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হলো 20। প্রশ্নে দুটি ভাগ থাকলে প্রত্যেক ভাগে 10 নম্বর। প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বলতে হবে। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 5 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তুমি যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী গণিতে তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

আমরা সাধারণতঃ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ও 9, এই দশটি digit বা অঙ্কের সাহায্যে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে কোন সংখ্যা প্রকাশ করে থাকি (বহুকাল আগে এই পদ্ধতিটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছিল)। যখন আমরা লিখি 9068, তখন আমরা বোঝাই $8\times10^0+6\times10^1+0\times10^2+9\times10^3$। তবে দশটির বদলে

দুটি, তিনটি ইত্যাদি অঙ্কের সাহায্যেও যে কোন সংখ্যাকে প্রকাশ করা যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দুটি অঙ্ক 0 ও 1 ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যদি আমরা লিখি 1011, তাহলে বোঝানো হবে $1\times2^0+1\times2^1+0\times2^2+1\times2^3$। সুতরাং বুঝতেই পারছো, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 0 হচ্ছে 0, 1 হচ্ছে 1, 2 হচ্ছে 10, 3 হচ্ছে 11, 4 হচ্ছে 100 ইত্যাদি।

দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে ভগ্নাংশও প্রকাশ করা যায়। দশগুণোত্তর প্রণালীতে যখন আমরা লিখি 7.523, তখন আমরা বোঝাই $7\times10^0+5\times10^{-1}+2\times10^{-2}+3\times10^{-3}$। অনুরূপভাবে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে যদি লেখা হয় 1.101, তাহলে তা বোঝাবে $1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}$।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, সংখ্যাত্মক (digital) কম্পিউটারের ভাষায় দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বলে এর সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। যাহোক, এবার প্রশ্নের পালা।

1. (ক) যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 110110, দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

54
55
56

(খ) যে সংখ্যা দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 100, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

1100111
1100101
1100100

2. (ক) দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 111011 + 101101 হল

1011000
1001000
1101000

(খ) ঐ পদ্ধতিতে 111011 − 101101 হলো

1110
1010
10110

3. দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1011 × 101 হচ্ছে

101111
110111
111011

4. (ক) যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1.1011, দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

1.8765

1.7865

1.6875

(খ) যে সংখ্যা দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 0.8125, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

0.1011

0.1101

0.1111

5. যে সংখ্যা দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে 1001001, সপ্তগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

123

133

143

(উত্তরের জন্যে 316নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

রামধনু

সূর্যালোকিত দিনে সকালের দিকে বা বিকালের দিকে যখন আকাশের একপ্রান্তে বৃষ্টি পড়ে, তখন রামধনুর সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। ইহা আর কিছুই নয়, আকাশের গায়ে ধনুকের ন্যায় বাঁকানো বিভিন্ন বর্ণের সারি। যখন সূর্য হইতে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বাতাসে ভাসমান জলকণার উপর আপতিত হয়, তখন রশ্মিগুচ্ছ বিচ্যুত (Deviated) ও বিচ্ছুরিত (Dispersed) হয় এবং রামধনু (Rainbow) গঠন করে। এই রামধনুর সৃষ্টি সাদা আলোকের বিচ্ছুরণের জন্য হইয়া থাকে।

সূর্যরশ্মি জলকণার উপর আপতিত হইলে বিচ্যুত ও বিচ্ছুরিত হয়। একবার ও দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় আপতিত ও নির্গত রশ্মির মধ্যস্থিত সূক্ষ্ম কোণের মান 1 নং ও 2 নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে। একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণ ($\theta_r=42°$) বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণের ($\theta_v=40°$) চেয়ে বেশী (1নং চিত্র)। 2নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে

দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণ ($\theta'_r = 51°$) বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতির জন্য সূক্ষ্ম কোণের ($\theta'_v = 54°$) চেয়ে কম।
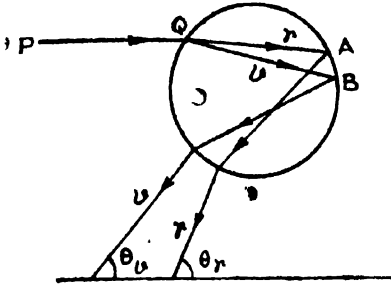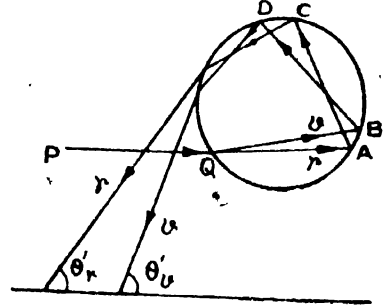
1নং চিত্র 2নং চিত্র

সুতরাং একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° - 42° = 138°$ ও বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° - 40° = 140°$।

দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হইলে লাল বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° + 51° = 231°$ ও বেগুনী বর্ণের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ $= 180° + 54° = 234°$।

সময়ে সময়ে আকাশে দুইটি রামধনু একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রাথমিক ও গৌণ রামধনু নামে পরিচিত। জলকণার উপর আলোক রশ্মির একমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে প্রাথমিক রামধনু গঠিত হয় এবং দুইবার প্রতিফলনের ফলে গৌণ রামধনুর সৃষ্টি হয়।

(3) নং চিত্রে E দর্শকের চক্ষু এবং $O, O_1, O_2, O_3 \cdots\cdots O_6$ হইলে একই উলম্ব-রেখায় জলকণার অবস্থান। EC হইল জলকণার উপর আপতিত সূর্যরশ্মির সমান্তরাল সরলরেখা।

যদি $\angle O_1EC = 40°$ হয়, তবে O_1 জলকণা হইতে বেগুনী বর্ণের রশ্মি ন্যূনতম চ্যুতি লইয়া নির্গত হইবে এবং E বিন্দুতে অবস্থিত চোখে প্রবল অনুভূতির সৃষ্টি করিবে। O_2 জলকণা এমন স্থানে অবস্থিত যে, EO_2 যেন EC-র সহিত 42° কোণে আছে। সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থিত জলবিন্দুগুলি দর্শকের নিকট লাল বলিয়া প্রতিভাত হইবে। O ও O_3 জলকণা এমন স্থানে অবস্থিত যে, EO ও EO_3 যেন EC-এর সঙ্গে যথাক্রমে 40° অপেক্ষা কম ও 42° অপেক্ষা বেশী কোণে আছে। ফলে একবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে EO ও EO বরাবর কোন নির্গত রশ্মি থাকিবে না। সুতরাং সূর্যের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে এবং E বিন্দুতে চক্ষু থাকিলে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার চাপের রঙের সারি (Series of concentric coloured arcs) দেখা যাইবে, যাহার মধ্যে বেগুনী বর্ণ ভিতরে ও লাল বর্ণ

বাহিরে থাকিবে এবং 40° হইতে 42° কৌণিক ব্যাসার্ধের (Angular radius) মধ্যে অন্যান্য রংগুলি থাকিবে; অর্থাৎ আকাশের গায়ে এমন একটি বৃত্তের চাপ, যে চাপের উপর অবস্থিত জলবিন্দুর দ্বারা সূর্যরশ্মি 138° চ্যুতিকোণে দর্শকের চোখে পৌঁছাইলে ঐ জলবিন্দুগুলি
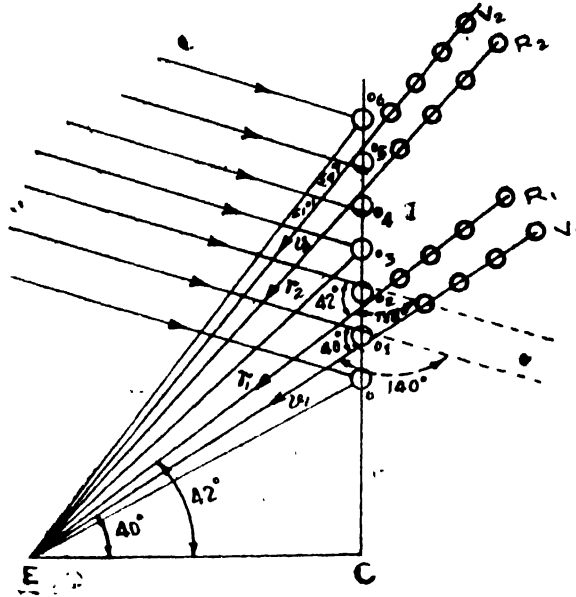
3নং চিত্র

দর্শকের নিকট লাল বলিয়া প্রতিভাত হইবে এবং দর্শক একটি লাল রঙের ধনুকের মত বাঁকানো বৃত্তাংশ দেখিতে পাইবে (4নং চিত্র)। ঐ জলকণাগুলি অন্য কোন রঙের রশ্মি দর্শকের চোখে পাঠাইবে না, কারণ অন্য রঙের রশ্মির ন্যূনতম চ্যুতিকোণ 138° নয়। তেমনি যদি আর একটি বৃত্তের চাপ কল্পনা করা যায়, যে চাপের উপর অবস্থিত জলবিন্দুগুলির দ্বারা সূর্যরশ্মি 140° চ্যুতিকোণে দর্শকের চোখে পৌঁছায়, তবে দর্শক ঐ বৃত্তাংশকে বেগুনী বর্ণের দেখিবে। এইভাবে অন্যান্য রঙের বৃত্তাংশও দর্শকের চোখে প্রতিভাত হইবে। ইহাকে প্রাথমিক রামধনু বলে।

সময়ে সময়ে প্রাথমিক রামধনুর উপরে আর একটি অস্পষ্ট রামধনু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে গৌণ রামধনু (Secondary Rainbow) বলে। জলকণা বেশী উপরে অবস্থিত থাকিলে, যেমন O_4, এবং EO_4 যদি EC-র সহিত 51° কোণ উৎপন্ন করে, তবে দুইবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে নির্গত রশ্মি চোখে লাল রঙের অনুভূতির সৃষ্টি করিবে এবং যখন এই কোণ 54° হইবে, তখন চোখে বেগুনী রঙের অনুভূতির সৃষ্টি করিবে। সুতরাং গৌণ রামধনুতে লাল বর্ণ নীচে ও বেগুনী বর্ণ উপরে থাকিবে এবং অন্যান্য বর্ণ 51° হইতে

54° কৌণিক ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকিবে; অর্থাৎ গৌণ রামধনুতে রঙের সজ্জা মুখ্য রামধনুর বিপরীত।
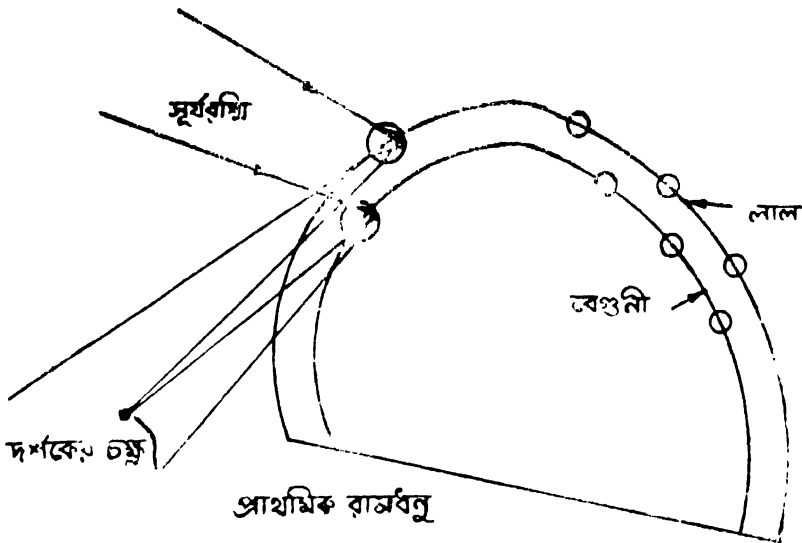
4নং চিত্র

তিন বার ও চার বার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে উৎপন্ন রামধনুর আলোর তীব্রতা অত্যন্ত হ্রাস পাওয়ায় উহা সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

বিজ্ঞানী মিলার (Millar) কৃত্রিমভাবে রামধনু তৈয়ার করিয়াছিলেন। তিনি উলম্বভাবে পতিত সূক্ষ্ম জলধারার (ব্যাস = ·022 ইঞ্চি) উপর সূর্যরশ্মি নিক্ষেপ করিয়া প্রাথমিক ও গৌণ রামধনু উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়ুই

টুয়াটারা

প্রাণী-জগতে টুয়াটারা এক বিরাট বিস্ময়। সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লেপিডো-সউরিয়া (Lepidosauria) উপশ্রেণীর মধ্যে রিন্‌কোসেফালিয়া (Rhynchocephalia) বর্গের প্রাণী টুয়াটারা। এদের বৈজ্ঞানিক নাম স্ফেনোডন পাঙ্কটেটাস (Sphenodon punctatus)। এই বর্গভুক্ত সমস্ত প্রাণী আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত টুয়াটারা আজও টিকে আছে পৃথিবীর বুকে। প্রায় 17 কোটি বছর আগে যাদের আবির্ভাব বলে অনুমিত, তারা শুধু টিকে থাকা নয়—তাদের দেহে বা জীবনধারায় প্রায় কোন পরিবর্তনের ছোঁওয়া লাগে নি। টুয়াটারা যেন বর্তমান যুগে পুরাকালের সাক্ষী। তাই টুয়াটারাকে বলা হয় জীবন্ত জীবাশ্ম।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরা যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন তাদের লিজার্ড বা টিকটিকি-গিরগিটি জাতের প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়। 1867 সালে আলবার্ট গান্থার টুয়াটারাকে একটি পৃথক বর্গ রিন্‌কোসেফালিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন।

টুয়াটারা দেখতে অনেকটা প্রায় টিকটিকি-গিরগিটি জাতের প্রাণীদের মত। মাওরী ভাষায় টুয়াটারা কথাটির অর্থ হচ্ছে কন্টকধারী। দু-ফুট-আড়াই ফুট লম্বা টুয়াটারার পৃষ্ঠদেশের মধ্যভাগে মাথার পিছন থেকে লেজের প্রায় শেষ পর্যন্ত এক সারি কাঁটা দেখা যায়। দেহের উপরিভাগে এদের থাকে ক্ষুদ্রকায় আঁশ আর ইতস্ততঃ বিন্যস্ত হলদে বিন্দু। নিম্নভাগে তুলনায় বড় চৌকা প্লেট। দেহের বর্ণ অনুজ্জ্বল সবুজ বা কাল্‌চে বাদামী। এদের লেজ মোটা ও চ্যাপ্টা। স্ফেনোডন কথাটির অর্থ হলো কিলকাকার দাঁত। উপর ও নীচের চোয়ালের অনেকটা বাটালীর মত দাঁতের গড়ন থেকে কথাটার উৎপত্তি। চার পায়ে থাকে ধারালো নখরযুক্ত পাঁচটা করে আঙ্গুল। টুয়াটারা সময় সময় অনেকটা ব্যাঙের মত শব্দ করে থাকে। এদের টিকটিকির মত লেজ খসে যেতে পারে ও সেখান থেকে অপুষ্টভাবে আবার তার পুনরুৎপত্তি ঘটে। পুরুষ টুয়াটারার কোন জননেন্দ্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না, যা সরীসৃপদের মধ্যে একমাত্র এদেরই বৈশিষ্ট্য। টুয়াটারার আর একটি মজার জিনিষ হচ্ছে—তার তৃতীয় চোখ, মাথার উপর দুটি চোখের মাঝামাঝি চামড়ায় ঢাকা। তবে এই চোখ কার্যক্ষম নয়।

টুয়াটারার স্বভাব বেশ ঠাণ্ডা। তবে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এরা আঁচড়াতে ও কামড়াতে ছাড়ে না। এরা খুবই অলস। পেটের দায় না থাকলে বা খুব দরকার না হলে নড়াচড়া করতে চায় না। সাধারণতঃ এরা মন্থর গতিতে চলে। তবে প্রয়োজন হলে অল্প দূর পর্যন্ত দ্রুত-গতিতে দৌড়ুতে পারে। টিকটিকি জাতের প্রাণী, কচ্ছপ—এমন কি ব্যাঙের চেয়ে একই তুলনীয় তাপে এদের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ অতি অল্প। কর্মরত অবস্থায় এরা সাত সেকেণ্ডে এক-বার করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। এরা এক ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাসগ্রহণ না করে থাকতে পারে।

অন্য সরীসৃপদের তুলনায় টুয়াটারার ঠাণ্ডা সহ্য করবার শক্তি অনেক বেশী। এদের দেহের তাপমাত্রা প্রায় 43° ফাঃ—যা অপর সরীসৃপদের প্রায় অচল করে দেয়। এই জন্যেই বোধ হয় নিউজিল্যাণ্ডের মত ঠাণ্ডা দেশে তারা টিকে আছে। আর অত ঠাণ্ডায় অন্য বড় জাতের সরীসৃপদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় না। তাছাড়া স্তন্যপায়ীদের সঙ্গেও ওখানে তাদের জীবনযুদ্ধে নামতে হয় নি। অবশ্য পরে স্তন্যপায়ীদের সেখানে মানুষই এনে বসিয়েছে।

টুয়াটারা মাংসাশী প্রাণী। নানা রকম পতঙ্গ, মাকড়সা, শামুক প্রভৃতি তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। পাখীর ডিম, ছানা প্রভৃতিও তারা খেয়ে থাকে। এরা সাধারণতঃ নিশাচর। দিনের বেলায় তাদের বাসায় কাটায়, রাতে বেরোয় খাদ্যের সন্ধানে। অবশ্য মাঝে মাঝে চলে আসে গর্তের মুখে রোদ পোহাতে। এরা মাটিতে

গর্ত করে বাস করে। দরকার পড়লে যে কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে দ্বিধা করে না। সুবিধা পেলে পাখীর ডিম, ছোট বাচ্চা—এমন কি, পাখাদেরও এরা শিকার করে খায়। তবে দেখা গেছে যে, যে অঞ্চলে পাখাদের বাস সেখানেই টুয়াটারা থাকে। পাখা নেই এমন দ্বীপে টুয়াটারার অস্তিত্ব নেই। এর কারণ সম্বন্ধে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না।

স্ত্রী-টুয়াটারা ডিম পাড়ে প্রায় 8 থেকে 15টি প্রায় 5 ইঞ্চি গভীর গর্তের মধ্যে। ডিম পাড়া হয়ে গেলে মাটি লতাপাতা দিয়ে ডিমগুলি চাপা দিয়ে দেয়। ডিমগুলি প্রায় এক ইঞ্চির মত। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে সময় লাগে এক বছরেরও বেশী—প্রায় 15 মাস। সরীসৃপদের মধ্যে ডিম ফুটতে এত সময় আর কারো লাগে না। মনে হয় শীতের সময় ডিমের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। টুয়াটারার ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতে যেমন সময় লাগে—তেমনি বাচ্চ'দের বাড়তেও সময় লাগে অনেক। টুয়াটারা প্রায় কুড়ি বছর না হলে সাবালক হয় না। যাহোক, টুয়াটারা বাড়ে প্রায় 50 বছর পর্যন্ত, আর তারা বেঁচে থাকতে পারে প্রায় 100 বছর পর্যন্ত।

এ তো গেল টুয়াটারার জীবনধারার কথা। মাওরী পুরাণ কাহিনীতেও এদের এক বিশিষ্ট স্থান ছিল। মাওরীদের সভাকক্ষে এরা ও সমজাতীয় প্রাণীরা স্থান পেত কাঠের অলঙ্করণে। টুয়াটারা ও সমজাতীয় প্রাণীদের ভাবা হতো ভয়াবহ দুর্ভাগ্যের অগ্রদূত হিসাবে।

এককালে নিউজিল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে টুয়াটারাদের দেখা মিলতো প্রচুর। সেখানে ছিল তাদের অবাধ রাজত্ব। কিন্তু সেদিন তাদের রইলো না চিরকাল। সংখ্যা কমতে কমতে একেবারে অবলুপ্তির প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু কেন, তার সঠিক হদিস মেলা ভার। তবে তাদের বংশধারা একেবারে লোপ পায় নি—অস্তিত্ব তাদের টিকে ছিল, কোন রকমে আজও আছে। মূল ভূখণ্ডের উত্তরে কয়েকটি দ্বীপেই তাদের দেখা যায়।

নিউজিল্যাণ্ড ছাড়া টুয়াটারার আর কোথাও বসবাস নেই। তাও আবার নিউ-জিল্যাণ্ড ভূখণ্ডের কাছে প্রায় 20টি দ্বীপেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাই নিউজিল্যাণ্ডের সর্বত্র টুয়াটারারা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সে দেশের সরকার। সেখানে এদের হত্যা এবং বিদেশে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ—একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র, গবেষণা ইত্যাদির ব্যাপার ছাড়া। সরকারের বিধিনিষেধ অমান্য করলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। সে জন্যেই আজ প্রায় বিলুপ্তির শেষ প্রান্ত থেকে তারা অব্যাহতি পেয়েছে এবং সংখ্যাও নাকি বেড়ে গেছে। যাহোক, আমাদের আশা, ভবিষ্যতেও তারা বেঁচে থাকবে পুরাকালের সাক্ষী হয়ে।

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র*

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 54

[110110 = $0\times2^0+1\times2^1+1\times2^2+0\times2^3+1\times2^4+1\times2^5$
$= 0+2+4+0+16+32$
$= 54$]

(খ) 1100100

[(খ)-এর প্রশ্নের সঙ্গে যে 3টি উত্তর দেওয়া আছে, সেগুলির কোন্‌টি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 100-এ রূপান্তরিত হচ্ছে, তা লক্ষ্য করে সঠিক উত্তরটি নির্ণয় করা যেতে পারে। তবে দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখিত কোন সংখ্যাকে সরাসরি দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করতে হলে সংখ্যাটিকে 2 দিয়ে পর পর ভাগ করে ভাগশেষগুলি স্থির করা দরকার। এক্ষেত্রে—

2	100
2	50·········0
2	25·········0
2	12·········1
2	6·········0
2	3·········0
2	1·········1
	0·········1

ভাগশেষগুলিকে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত পর পর লিখলে দাঁড়ালো : 1100100 — এটাই হলো দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে ঈপ্সিত সংখ্যা।]

2. (ক) 1101000

(খ) 1110

[দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে যোগের মূল নিয়মগুলি হলো : $0+0=0$, $0+1=1$, $1+0=1$, $1+1=10$ (অর্থাৎ 2)। এই থেকে বিয়োগের নিয়মও সহজেই বুঝতে পারা যায়।]

3. 110111

[দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে গুণের মূল নিয়মগুলি হলো : $0\times0=0$, $0\times1=0$, $1\times0=0$, $1\times1=1$। এক্ষেত্রে

```
    1011
     101
  ------
    1011
   0000×
  1011××
  ------
  110111
```

4. (ক) 1.6875

$$[\,1.1011 = 1\times2^{0}+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+1\times2^{-4}$$
$$= 1+0.5+0+0.125+0.0625$$
$$= 1.6875\,]$$

(খ) 0.1101

$$[\,0.8125 = 0+0.5+0.25+0+0.0625$$
$$= 0\times2^{0}+1\times2^{-1}+1\times2^{-2}+0\times2^{-3}+1\times2^{-4}$$
$$= 0.1101\,]$$

5. 133

$$[\,1001001 = 73$$
$$= 1\times7^{2}+3\times7^{1}+3\times7^{0}$$

সুতরাং সপ্তগুণোত্তর পদ্ধতিতে সংখ্যাটি হবে 133। 73-কে 7 দিয়ে পর পর ভাগ করে ভাগশেষগুলি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত নিয়েও এই সংখ্যাটি নির্ণয় করা যেতে পারে।]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. : ডাব এবং নারকেলের জলের রাসায়নিক উপাদান সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সনৎকুমার কুণ্ডু, কলিকাতা-34 ও
বলাইচাঁদ তলাপাত্র, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন 2. : সমুদ্রজলের মধ্যে সাধারণতঃ কি কি উপাদান থাকে?

শোভন ভট্টাচার্য, শান্তশ্রী ভট্টাচার্য ; খিদিরপুর

উত্তর 1. : ডাবের জল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে অল্পমাত্রায় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ইক্ষুশর্করা, গ্লুকোজ, ফস্ফেট, কিছু কঠিন পদার্থ এবং শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ জল থাকে। ডাবের জল অম্লযুক্ত।

নারকেলের জলের উপাদানও প্রায় এক, তবে উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণগত পার্থক্য লক্ষিত হয়। গ্লুকোজ ও জলীয় অংশের পরিমাণ ডাবের জলের তুলনায় নারকেলের জলে অনেক কমে যায়। ডাব অবস্থার বেশীর ভাগ গ্লুকোজই নারকেল অবস্থায় ইক্ষুশর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। নারকেল জলে অম্লত্বের পরিমাণও বেশী। তবে নারকেলের বয়স অনুযায়ী এই সকল উপাদানের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য দেখা যায়।

উত্তর 2. : সমুদ্রের জলে সাধারণতঃ সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট, ম্যাগ্নেসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম সালফেট প্রভৃতি ধাতব লবণ থাকে। এদের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডই পরিমাণে সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া সমুদ্রের জলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতির ব্রোমাইড পাওয়া যায়। সমুদ্রের জলে আয়োডিনও পাওয়া যায়। এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক গুল্ম, সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যেকার আয়োডিন যৌগকেই আয়োডিনের উৎস বলে মনে করেন। তাছাড়া সমুদ্রের নীচের বিভিন্ন পদার্থও জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। তবে এসব উপাদানের পরিমাণ বিভিন্ন জায়গার জলে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ ; কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপত্য বিশারদ শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত 24 জানুয়ারী 82 বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

শ্রীশচন্দ্র শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে আট বছর কলকাতায় সরকারী চাকুরি করেন। তারপরে তিনি রাজস্থানের বিকানীরে স্টেট ইঞ্জিনীয়াররূপে কাজ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর থেকে ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আমৃত্যু তিনি চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভারতের বহু মন্দির ও বাসগৃহের নির্মাণ পরিকল্পনায় তাঁর স্থাপত্য বিদ্যায় স্বাক্ষর আজও বিদ্যমান। দিল্লীর বিড়লা মন্দির, লছমনঝোলার সমীপবর্তী গীতাভবন, বারাণসী, ত্রিবাঙ্কুর, বিকানীর প্রভৃতি জায়গায় তাঁর স্থাপত্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তাঁর চেষ্টার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। তিনি কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ভারতের সর্বত্র এবং আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক ও অন্যান্য স্থানে ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার প্রচার করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম হচ্ছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'দেবায়তন ও ভারতীয় সভ্যতা', 'মগধের স্থাপত্য ও কৃষ্টি', 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড নিউ অর্ডার' প্রভৃতি গ্রন্থ।

তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় সাহায্যকল্পে দেড় হাজার টাকা দান করেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বিবিধ

বিজ্ঞানবিষয়ক লোকরঞ্জক বক্তৃতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত 8ই এপ্রিল, '72 তারিখে পরিষদ ভবনে 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী 'সৃষ্টি-রহস্য ও ক্রমবিবর্তনবাদ' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের সম্প্রসারণকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্য

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের সম্প্রসারণকল্পে এক লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য মঞ্জুর করেছেন। বিজ্ঞান পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি এই সহযোগিতার জন্যে উক্ত শিক্ষা বিভাগ পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

অ্যাপোলো-16 মহাকাশচারীদের সফল চন্দ্রাভিযান

অ্যাপোলো-16 মহাকাশযানের যাত্রী জন ইয়ং ও চার্লস ডিউককে নিয়ে অ্যাপোলো-16-র চন্দ্রযান ওরাইয়ন 21শে এপ্রিল সকালে চাঁদে অবতরণ করেন। অবতরণের অল্পক্ষণ পরে জন ইয়ং ওরাইয়ন থেকে বেরিয়ে আসেন ও চাঁদের উচ্চভূমিতে পদচারণা সুরু করেন। চাঁদের বুকে পৃথিবীর যে কয়জন মানুষ এপর্যন্ত পদার্পণ করেছেন ইয়ং তাঁদের মধ্যে নবম; কিন্তু চাঁদের পার্বত্য অঞ্চলে তিনিই প্রথম ভ্রমণকারী। ইয়ং-এর চাঁদে পদার্পণের কয়েক মিনিট বাদে চার্লস ডিউকও সেখানে পদার্পণ করেন। তাঁরা চাঁদের পাথর ও মাটি সংগ্রহ করেন। অ্যাপোলো-16 মূলযান ক্যাস্পার-এর পরিচালক ছিলেন কেন ম্যাটিংলি।

27শে এপ্রিল অ্যাপোলো-16 মহাকাশ যানের তিন যাত্রী কেন ম্যাটিংলী, জন ইয়ং, চার্লস ডিউক প্রশান্তমহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করেন। তাঁরা 16ই এপ্রিল চন্দ্রাভিযানে যাত্রা করেছিলেন।

সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে ভারতের প্রগতি

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রকের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, 1970-71 সালে ভারতে সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণে এক উল্লেখযোগ্য প্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। 1970 সালে ভারতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল সবচেয়ে কম এবং চারটি রাজ্য ও আটটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল হয়েছে কলেরা রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

1969 সালে যেখানে বসন্ত রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 19, 120 ও 4151, 1970 সালে তা দাঁড়ায় 10, 055 ও 1805। 1970 সালের 31শে মার্চ পর্যন্ত 15·89 কোটি লোককে প্রথমবার এবং 67·43 লোককে দ্বিতীয়বার টিকা দেওয়া হয়।

বর্তমানে এদেশে 52·7 কোটি লোকের জন্যে 393টি ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কেন্দ্র কাজ করছে। বাকী 1·5 কোটি লোক এমন সব অঞ্চলে বাস করে, যা সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়ামুক্ত।

আলোচ্য বছরে জাতীয় ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল গঠিত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের পান্না ও কাটনিতে দুটি নতুন ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে 69টি ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র আছে।

বর্তমানে এদেশে 52টি যক্ষ্মারোগ নিরাময়-কেন্দ্র কাজ করছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্যবাস, হাসপাতাল ও যক্ষ্মারোগ চিকিৎসা-কেন্দ্রে প্রায় 35,000টি শয্যা যক্ষ্মারোগীদের জন্যে রয়েছে।

আলোচ্য বর্ষে পনেরোটি বি. সি. জি. দল সংযোজিত হওয়ায় সারা দেশে বি. সি. জি. দলের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 247। 1949 সালে পোলিও প্রতিরোধ অভিযান সুরু হবার পর থেকে 1970 সালের ডিসেম্বর 13·76 কোটি লোককে বি. সি জি. টিকা দেওয়া হয়েছে।

যে চারটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কলেরা রোগ মুক্ত, সেগুলি হচ্ছে হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাভূমি, রাজস্থান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, চণ্ডীগড়, গোয়া, দমন ও দিউ, হিমাচল প্রদেশ, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ, মণিপুর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল এবং

ত্রিপুরা। 1970-71 সাল থেকে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ও সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ এই সাতটি প্রধান কলেরা-আক্রান্ত রাজ্যে কলেরা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছে।

জাতীয় কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ এদেশে 16 বছর পূর্ণ হয়েছে এবং 17 লক্ষ লোককে 1970-71 সালে এই পরিকল্পনায় চিকিৎসা করা হয়েছে। মহীশূরে দুটি এবং উত্তর প্রদেশে তিনটি—মোট পাঁচটি নতুন কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর ফলে মোট কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 196টি।

চিঠিপত্রের বিভাগ ঃ একটি বিজ্ঞপ্তি

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় একটি 'চিঠিপত্রের বিভাগ' খুলিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে চিঠি আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিটি চিঠির একটি উপযোগী শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজন এবং চিঠির আয়তন মোটামুটিভাবে 400 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। চিঠির প্রকাশ এবং আবশ্যকবোধে উহার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—প্রধান সম্পাদক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ জুন, 1972 ষষ্ঠ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও প্রতিরক্ষা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে প্রতিরক্ষার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। আদিম যুগ থেকে মানুষ তার সহজাত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিকেই প্রথমে আত্মরক্ষার কাজে নিয়োজিত করেছে। তাই তীরধনুক, ব্যুমেরাং থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র পর্যন্ত প্রতিরক্ষা-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আধুনিক-বিজ্ঞানের যে দুটি বিস্ময়কর বিষয় বিংশ শতাব্দীতে সাড়া তুলেছে, তা হলো নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ-বিজ্ঞান। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিকতম অস্ত্র ফিসন ও ফিউসন বোমা এবং ক্ষেপণাস্ত্র মিসাইল প্রভৃতি এই দুটি বিজ্ঞান-গবেষণার ফল। বস্তুতঃ সামরিক তাগিদেই গত মহাযুদ্ধে ফিসন বোমার আবিষ্কার হয়। তাছাড়া রকেট সম্পর্কিত গবেষণা সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। এখন সেই গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ICBM (Inter-Continental Ballistic missile)। ফিসন বোমার সাহায্য নিয়ে আরো শক্তিশালী ফিউসন বোমা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানের আরো নতুন নতুন আবিষ্কার, যেমন—সেমিকণ্ডাক্টর, লেসার প্রভৃতি পরোক্ষভাবে প্রতিরক্ষার কাজে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

রকেট গবেষণার ফল ক্ষেপণাস্ত্র যেমন প্রতিরক্ষার সমরসম্ভার হয়ে পড়েছে, তেমনি কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ পরিক্রমা এর শান্তিপূর্ণ দিক।

ফিসন থেকে বোমা ছাড়াও বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাচ্ছে—যাকে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বলে অভিহিত করা যায়। হাইড্রোজেন ও হাল্কা নিউক্লিয়াস দিয়ে ফিউসন বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে অমিত শক্তি পাওয়া যায়, ফিউসন বোমা ছাড়া তার কোন শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় নি। চেষ্টা চলেছে উপযুক্ত প্লাজ্‌মা তৈরি করে ফিউসনের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার যাতে সম্ভব হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। বিশেষতঃ ভারত সরকারীভাবে পরমাণু-শক্তির যখন কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী-সূত্রে 'ভারত পরমাণু-বিজ্ঞানে প্রথম সারিতে' এই কথাও বার বার বলা হচ্ছে, তখন এদেশে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের মূল্যায়ন করবার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে দেখা দিয়েছে। যে দুটি বড় প্রশ্ন আমাদের কাছে উপস্থিত, তা হলো ফিসন ও ফিউসন বোমা আমাদের তৈরি করা উচিত কিনা? যদি উচিত হয়—তবে আমাদের পক্ষে তা করা সম্ভব কিনা? প্রথম প্রশ্নটি বহুলাংশে রাজনৈতিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এটা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে যাঁরা ভূমিকা নেবেন, তাঁদের দুর্বল হলে চলবে না। পরমাণুশক্তি সমন্বিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় বলীয়ান বলেই আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স বিশ্ব শান্তির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এমন কি, চীন বিশ্বের বৃহত্তম দেশ হয়েও সে গোষ্ঠীতে অপাংক্তেয় ছিল; আধুনিক সমরসম্ভারে বলীয়ান হয়ে সেও বিশ্বের দরবারে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছে। এসব দেশই নিজেদের শান্তিকামী বলে প্রচার করে। তবু পরস্পরের মধ্যে পরমাণু বোমার পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে এদের মধ্যে কখনও ঐক্যমত হয় নি। তার কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবিশ্বাস আধুনিক যুগে একটি বড় অভিশাপ। ভারত শান্তিকামী বলেই নির্বিরোধ থাকতে পারে না। গত বাংলা দেশের যুদ্ধেই দেখা গেছে যে, ভারতকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এবং গত এক দশকে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা অনেক আধুনিকতর হয়েছিল বলেই সে যুদ্ধ আমরা জয়লাভ করতে পেরেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের বহু কিছু উপকরণই আমাদের প্রতিরক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আধুনিকীকরণের ফলেই যে আমরা বাংলা-দেশের ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়েছি, একথা অস্বীকার করা যায় না। নৈতিক দিক দিয়ে তাই পরমাণুশক্তিকে প্রতিরক্ষার কাজে লাগানো বোধহয় অনুচিত বলা যায় না। তবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই যুক্তি যাচাই হওয়া প্রয়োজন। চীনের মত উন্নতিকামী দেশ নিশ্চয়ই বহু ত্যাগ স্বীকার করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক সমরসম্ভার যুক্ত করেছে, সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। পরমাণু বোমা ও মিসাইল নির্মাণে চীনের অগ্রগতি এশিয়া মহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

পরমাণু বোমা, মিসাইল ইত্যাদি আধুনিক সমরসম্ভার নির্মাণ ভারতের যদি অবশ্য কর্তব্য হয়, তবে তা নির্মাণের ক্ষমতা তার রয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ আসে নিউক্লীয় জ্বালানীর (Nuclear fuel) প্রসঙ্গ। ইউরেনিয়াম-235 অথবা প্লুটোনিয়াম এই দুটির প্রচুর সরবরাহ না থাকলে ফিসন বা ফিউসন বোমা তৈরি করা যায় না। ফিউসন বোমার প্রত্যক্ষ জ্বালানী অবশ্য হাইড্রোজেনের আইসোটোপের নিউক্লিয়াস বা অন্য কোন হাল্কা নিউক্লিয়াস—কিন্তু ফিউসন ক্রিয়া পেতে হলে ফিসন বোমাজনিত তাপের প্রয়োজন। চীনের সুবিধা হলো তার প্রচুর স্বাভাবিক ইউরেনিয়াম খনিজ আছে। আর ইউ-235 পৃথকীকরণের জন্যে তাদের দুটি বিশাল ডিফিউসন প্ল্যান্ট (Geseous diffusion plant) রয়েছে। আমাদের

অবশ্য প্লুটোনিয়ামের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। চালু রিঅ্যাক্টরগুলি থেকে প্লুটোনিয়াম পৃথক করা যায়—কিন্তু আমাদের বর্তমান রিঅ্যাক্টর-গুলি বৈদেশিক সহায়তায় তৈরি হয়েছে। বোমা তৈরির কাজে তাই এই সব রিঅ্যাক্টর থেকে প্লুটোনিয়াম সংগ্রহ করবার বাধা আছে। কাল-ক্রমে নতুন রিঅ্যাক্টরটি বিনা বৈদেশিক সহায়তায় চালু করবার পরিকল্পনা রয়েছে। তা সম্ভব হলে তবেই ফিসন বোমার জ্বালানী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। জ্বালানী পাওয়া গেলেও তা প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ফিসন বোমায় লাগানো আমাদের দেশে সম্ভব কিনা, তা দেখতে হবে। আধুনিক মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণায় ভারতের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যায় আমরা কত দূর এগিয়ে আছি, সে প্রশ্ন বিতর্কিত। আজ পর্যন্ত আমাদের রিঅ্যাক্টর প্রযুক্তিবিদ্যায় কিছু অভিজ্ঞতা আছে মাত্র—কিন্তু কোন বড় যন্ত্র নির্মাণে আমাদের অভিজ্ঞতা সীমিত। যেমন ধরুন, কোন বড় ত্বরণযন্ত্র (Accelerator) আমাদের দেশে পুরাপুরি এখনও তৈরি করা যায় নি। কলকাতার VEC বা ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রনটি সম্পূর্ণ দেশী প্রচেষ্টায় চালু হলে আমরা বলতে পারবো যে, একটি বড় আধুনিক যন্ত্র আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি মৌলিক বিজ্ঞানের সমানুপাতিক অগ্রগতি ছাড়াও সম্ভব। চীনই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 1966 খৃঃ থেকে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, তার সাফল্য একটি বিতর্কিত বিষয়। 1968 খৃঃ জুলাইতে ওয়েন হুই পাও পত্রিকার মন্তব্য হলো—'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বর্তমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়'। সে যাহোক, সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি না হলেও প্রাক্-বিপ্লব যুগে 1964 খৃঃ 16ই অক্টোবর চীন ফিসন বোমার প্রথম পরীক্ষা করেছিল। তারপর 1966 খৃঃ ডিসেম্বরে লিথিয়াম-6 জ্বালানী দিয়ে ফিউসন বোমা পরীক্ষার ব্যবধান সময়ে 20 থেকে 500 কিলোটন পর্যন্ত প্রায় আরো তিনটি ফিসন বোমা তারা পরীক্ষা করেছে। 1971 খৃষ্টাব্দের 18ই নভেম্বরের ফিসন বোমার শেষ পরীক্ষা ধরলে চীন মোট বারোটি বোমা পরীক্ষা করতে পেরেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ফলে সাধারণ বিজ্ঞান-গবেষণায় হয়তো কিছু বাধা এলেও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে চীনের এই অগ্রগতি থেমে থাকে নি। তাছাড়া চীনের হাতে যে আরও প্রায় 100টি ফিসন বোমার জ্বালানী জমা আছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করবার মত। চীনের ফিসন ও ফিউসন বোমা পরীক্ষার ব্যবধানকাল অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম, তা নীচের সারণী থেকে বোঝা যাবে—

দেশ	ফিসন বোমা পরীক্ষার সময়	ফিউসন বোমা পরীক্ষার সময়	ব্যবধান কাল বছর
আমেরিকা	জুলাই 16, 1945	নভেঃ 1, 1952	9·5
রাশিয়া	অগাস্ট 29, 1949	অগাস্ট 12, 1953	8·4
গ্রেট বৃটেন	অক্টোঃ 3, 1952	মে 15, 1957	4·5
ফ্রান্স	ফেব্রুঃ 13, 1960	অগাস্ট 24, 1968	8·5
চীন	অক্টোঃ 16, 1964	জুন 17, 1967	2·5

অবশ্য 1945-52 খৃঃ নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক স্তর। সে ক্ষেত্রে আমেরিকার পক্ষে এই ব্যবধানকাল হয়তো যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু চীনের মত উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই সামান্য ব্যবধান

সময়ে উপরিউক্ত অগ্রগতি বিস্ময়কর সন্দেহ নেই।

ভারতের মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত, কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় তার অগ্রগামিতা প্রমাণিত হয় নি। তাছাড়া প্রতিরক্ষায় সেই প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ আরও প্রয়াসসাপেক্ষ। সেই প্রয়াসযুক্ত না হলে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সম্ভব হবে না। প্রতিরক্ষায় নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলে শুধু সমরসম্ভারই পাওয়া যাবে—তা নয়, আত্মবিশ্বাসী সফল একদল প্রয়োগকুশলী পাওয়া যাবে—যাঁরা ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তোলবার শ্রেষ্ঠ সৈনিক হবেন ও আরো কুশলী মানুষ গড়ে তুলতে সাহায্য করবেন।

শুধু ফিসন বা ফিউসন বোমা হলেই চলে না, তা বহন করবার উপযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রও আধুনিক প্রতিরক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। দূরপাল্লার ICBM (Inter-Continental Ballistic Missile) ক্ষেপণাস্ত্র এখন রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উপরিউক্ত সব দেশেরই রয়েছে। চীনও আগামী কয়েক বছরে তা তৈরি করে ফেলবে—এ হলো বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অবশ্য নিকট ও মাঝারি পাল্লার বেশ কিছু ক্ষেপণাস্ত্র চীনের এখনই আছে।

ভারত মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এখনও প্রাথমিক স্তরে আছে। সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ কার্যকরী বলেই প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তাই মহাকাশ প্রকল্পটি প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে কৃত্রিম উপগ্রহ, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্যে ভারতের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। প্রতিরক্ষার অঙ্গীভূত হলেও এই সব অগ্রগতির ফলাফল শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের কোন বাধা থাকবে না। মূলতঃ কোন দেশের সামরিক বিজ্ঞানকে অনুন্নত রাখা বিপজ্জনক বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ নিউক্লীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও মহাকাশ-গবেষণার প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, তাতে প্রকল্পগুলি যথাযথ সময়ে সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা বাড়বে।

ভারত একটি মহান দেশ। জনবলে, আদর্শে ভারত প্রথম শ্রেণীর যে কোন উন্নত রাষ্ট্রের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

সবুজ বিপ্লবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

মনোজকুমার সাধু*

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে ভারত দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। প্রজননবিদ্যা ও রাসায়নিক প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে উচ্চ ফলনশীল নব নব প্রজাতির ফসল সৃষ্টি হয়েছে। রোগ ও কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধকারী রাসায়নিক পদার্থ এবং রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহারের ফলে ধান ও গমসহ অন্যান্য সব ফসলেরই ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য এই অত্যাশ্চর্য সাফল্যের মূলে রয়েছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উল্লেখযোগ্য অবদান। বিগত দু-দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে মানব-কল্যাণ সাধনে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই কৃষি-গবেষণায় এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রণালী নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভূমিকা

সম্প্রতি উচ্চ ফলনশীল শস্যের জন্যে সারের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও আমরা এখনও সঠিক-ভাবে জানি না, কোন্ সার কোন্ জমিতে কখন ও কিভাবে প্রয়োগ করলে সর্বাপেক্ষা কার্যকর হবে। কেবলমাত্র তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাই উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দানে সক্ষম। এই সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে; যেমন—চিহ্নিত সুপার ফস্ফেট (P_{32}) নিয়ে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থার গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে যে, নীচু জমিতে উৎপন্ন ধানে ফস্ফরাসঘটিত সার ছিটিয়ে দিয়ে মাটির 2cm-এর মধ্যে মিশ্রিত করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। পূর্ব প্রচলিত ধারণানুযায়ী মাটির গভীরে ফস্ফরাস-ঘটিত সার প্রয়োগ করলে বিশেষ কার্যকরী হয় না। আরও জানা গেছে যে, বারংবার প্রয়োগ করবার চেয়ে ধান রোপণের সময় সবটুকু ফস্ফেট একই সঙ্গে প্রয়োগ করলে ধানের বৃদ্ধির জন্যে সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক হয়। আরও দেখা গেছে যে, বীজতলায় ফস্ফেটের প্রয়োগ গাছের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্যে মোটেই প্রয়োজনীয় নয়।

নাইট্রোজেনঘটিত সারের ক্ষেত্রে স্থায়ী N_{15} আইসোটোপ নিয়ে গবেষণা করে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া—এই উভয় সারই ধানের ফলন বৃদ্ধিতে প্রায় সমানভাবে কার্যকরী এবং ঐ দুটি সার মৃত্তিকার 5cm গভীরে প্রয়োগ করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়ার তুলনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের কার্যকারিতা শতকরা প্রায় 20 ভাগ কম এবং নীচু জমিতে এই সার প্রয়োগ করা মোটেই উচিত নয়। শিষ বের হবার দু-সপ্তাহ পূর্বে চাপান সার হিসাবে জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।

ইদানীং নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাসের জটিল রাসায়নিক সার, যেমন—নাইট্রোফস্ফেট ও অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট নানাকারণে বিশেষ জন-প্রিয়তা লাভ করছে। N_{15} ও P_{32} দিয়ে চিহ্নিত নাইট্রোফস্ফেট এবং অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তুলনামূলকভাবে শেষোক্ত সারটি অধিকতর ফলদায়ক।

*কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার সার প্রয়োগ ও জলসেচন থেকে সন্তোষজনক ফল পেতে হলে শস্যের মূলের বিস্তার ও বিন্যাস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি ট্রেসার টেকনিকের (Tracer technique) সহায়তায় দেখা গেছে যে, কল্যাণ সোনার মূল গমের অন্যান্য জাতের তুলনায় মৃত্তিকার অনেক বেশী গভীরে প্রসারিত হয়। শতকরা 35 ভাগ মূল মৃত্তিকার 15cm নীচে থাকতে দেখা গেছে। ধানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, দীর্ঘকায় জাতের গাছ, যেমন—NP-130-এর তুলনায় খর্বকায় জাতের গাছ, যেমন—IR-8, সবরমতি, জ্যামাইকা ইত্যাদির মূল গভীর মৃত্তিকায় বিস্তৃত। এরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-লব্ধ নূতন নূতন তথ্যের ভিত্তিতে সার প্রয়োগের সার্থকতার পূর্ণ মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উদ্ভিদরোগ প্রতিরোধে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার

বর্তমানে রোগ দমনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সাফল্যজনকভাবে কোন কোন উদ্ভিদে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে যেন উদ্ভিদের কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়, খাদ্যগুণের কোন তারতম্য না ঘটে এবং মানুষের ব্যবহারের পক্ষে তা যেন সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়।

ভাইরাস রোগ উদ্ভিদের শত্রুদের মধ্যে অন্যতম। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে এই রোগের নিরাময় এখনও সম্ভব হয় নি। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গামারশ্মি টোবাকো মোজেইক ও সানহেম্প মোজেইক (Sunhemp mosaic) ভাইরাসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অন্য দিকে অতিবেগুনী রশ্মি bottle gourd mosaic, radish mosaic, soyabean mosaic ইত্যাদি ভাইরাসকে ধ্বংস করে। আবার কেউ কেউ এক্স-রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ও সালফারের সহায়তায় ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন। আর যেহেতু এই সব তেজস্ক্রিয় রশ্মি ব্যবহারের ফলে উদ্ভিদের মধ্যে পরিব্যক্তির (Mutation) যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, যেহেতু এদের ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ভাইরাস ছাড়া ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক দমনের জন্যেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। Agrobacterium tumefaciens নামক ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা আক্রান্ত টোম্যাটো গাছের কাণ্ডে অস্বাভাবিক দানাদার স্ফীতি দেখা যায়। গামা রশ্মির (30 Krad) সহায়তায় উক্ত রোগের প্রতিবিধান করা যায়, উদ্ভিদেরও কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় না।

আলুর একটি বিশেষ রোগ হলো Late blight বা নাবি ধসারোগ। সংরক্ষণের সময় আলু 15 দিন 70-75° F তাপমাত্রায় রেখে 40 Krad পরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগ করলে এই রোগের কারণ Phytophthora infestens নামক ছত্রাককে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা যায়।

তাছাড়া মৃত্তিকাস্থিত বিভিন্ন ধরণের রোগ বীজাণুর বিনাশও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় সম্ভব। বর্তমানে কোন কোন দেশে মৃত্তিকা নির্বীজণে তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের বিকিরণ ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফসল তোলবার সময় থেকে সুরু করে বিক্রয় পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন ছত্রাক ফল ও শাকসব্জির সমূহ ক্ষতি সাধন করে। এমন কি, কম তাপমাত্রায় রক্ষিত ফসলও ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্তমানে ফল ও শাকসব্জি সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কোন কোন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যেহেতু অধিকাংশ ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়ার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, সেহেতু এদের ধ্বংস করতে হলে অত্যধিক

মাত্রায় বিকিরণ প্রয়োগ করতে হয়। সে জন্যে অনেক সময় ফলের উৎকর্ষের অবনতি ঘটে, যেমন—ফলের স্বাভাবিক কাঠিন্য নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাদ ও গন্ধের অবনতি ঘটে। কাজেই স্বাদ ও গন্ধ অপরিবর্তিত রেখে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। কম তাপমাত্রা বা ছত্রাক-বিনাশী রাসায়নিক পদার্থ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যুগ্মভাবে ব্যবহার করে ইতিমধ্যেই বিশেষ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। গামা রশ্মির দ্বারা কমলা-লেবু, ন্যাসপাতি, পীচ, ষ্ট্রবেরি ও বিভিন্ন ধরণের সব্জির সংরক্ষণকাল বেশ কিছু দিন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে (1নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

1নং তালিকা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি

ফলের নাম	ছত্রাকের নাম	বিকিরণ মাত্রা	সংরক্ষণকালে তাপমাত্রা	সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি
কাগজীলেবু	Pen icillium digitatum	1,50,000—2,00,000 rep	75° F	12 দিন
কাগজীলেবু	Penicillium italicum	1,500,000 rep	55° F	17 দিন
			75° F	15 দিন
কমলালেবু	P. italicum	2,00 000 rep	55° F	17 দিন
			75° F	20 দিন
পীচ	Rhizopus nigracans	2,50,000 rep	80°-85° F	10 দিন
পীচ	Monilia fructicola	2,00,000 rep	80°-85° F	10 দিন

কীট-পতঙ্গ দমনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

কীট-পতঙ্গের আক্রমণে প্রতি বছরই ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হয়। এদের দমনে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হলেও অধিকতর কার্যকরী প্রতিরোধের জন্যে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন এবং এই বিষয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। নিম্ন-লিখিত বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাঞ্ছনীয়।

1. কীট-পতঙ্গ ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াপদ্ধতি।

2 ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থের বিরুদ্ধে কীট-পতঙ্গের স্বাভাবিক সহনক্ষমতা ও প্রতিরোধ।

3. উদ্ভিদের মধ্যে কীটঘ্ন পদার্থের পরিণতি।

4. তেজস্ক্রিয় পদার্থের সাহায্যে কীট-পতঙ্গের সরাসরি দমন।

শেষোক্ত বিষয়ে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু সাফল্য লাভ হয়েছে। যেমন—আমেরিকায় গবাদি পশুর একটি বিশেষ শত্রু কীটের (Screw worm) সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে, পুরুষ কীটগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে নির্বীজিত করে। বলা বাহুল্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় পুরুষ কীটদের নির্বীজিত করা হয়েছিল। অনুরূপ উপায়ে অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের চেষ্টা চলেছে। শুধু এদের উচ্ছেদই নয়, প্রয়োজনীয় কীট-পতঙ্গ, যেমন—মৌমাছি, লাক্ষাকীট ও রেশমকীটের উন্নত প্রজাতি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

ফসল সংরক্ষণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

কন্দজাতীয় ফসল, যেমন—আলু পিঁয়াজ ইত্যাদির অন্যতম সমস্যা হলো—সুদীর্ঘকাল

এগুলিকে সংরক্ষিত রাখা যায় না। দীর্ঘ সংরক্ষণ-কালে এগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং অনেক সময় পচেও যায়। রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে আলু, পিঁয়াজের অঙ্কুরোদ্গম সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় নি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অঙ্কুরোদ্গম করতে সক্ষম। আশা করা যায়—ভবিষ্যতে প্রক্রিয়াটি আলু ও পিঁয়াজের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে।

বিদেশের বাজারে আম ও কলার বেশ চাহিদা রয়েছে। কিন্তু এই ফল দুটির সংরক্ষণ-কাল বৃদ্ধির উপায় এখনও আমাদের জানা নেই। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সহায়তায় ফলের পরিপক্কতায় কিছু বিলম্ব ঘটানো যেতে পারে। তবে এই বিষয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

গুদামজাত থাকাকালীন শতকরা প্রায় 10-30 ভাগ শস্য কীট-পতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়। যথেষ্ট সতর্কতা ব্যতীত রাসায়নিক কীটঘ্ন পদার্থ সংরক্ষণ-কালে ব্যবহার করা যায় না। আবার কীট-পতঙ্গের ডিমের উপর রাসায়নিক কীটঘ্ন পদার্থ বিশেষ কার্যকরীও নয়। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে গুদামজাত শস্য ধ্বংসকারী কীট-পতঙ্গ দমনের চেষ্টা হচ্ছে।

খাদ্যশস্যের গুণগত উৎকর্ষসাধনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা

আমাদের পুষ্টি ও শরীর রক্ষায় প্রোটিন অপরি-হার্য। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ নিরামিশাষী এবং তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য তাদের প্রধান খাদ্য। ধান, গম, ভুট্টায় অতি সামান্যই প্রোটিন আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই ঐ প্রোটিন নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কারণ ঐ প্রোটিনে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড অতি অল্প পরিমাণে আছে বা অনেক ক্ষেত্রে একেবারেই নেই। প্রোটি-নের উৎকর্ষ ও গুণাগুণ নির্ভর করে তার উপাদান বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রকৃতি ও পরি-মাণের উপর। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্যে নিম্নোক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি একান্তই প্রয়ো-জনীয়; যথা—লাইসিন, ট্রিপটোফ্যান, ফিনাইল অ্যালানিন, মিথিওনিন, লিউসিন, আইসোলিউ-সিন, থ্রিয়োনিন ও ভ্যালিন। বর্তমানে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অধিক প্রোটিনসমৃদ্ধ ফসল আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছে। ইতিমধ্যে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় গামা রশ্মি ও অতিবেগুনী রশ্মি যুগ্মভাবে ব্যবহার করে একটি নূতন পরিব্যক্ত (Mutant) গম আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নূতন ধরণের গমের নাম হলো সরবতী সোনোরা। এতে অন্যান্য প্রকার গমের তুলনায় অনেক বেশী প্রোটিন ও লাইসিন আছে। গামা রশ্মি প্রয়োগ করে অধিক লাইসিনসমৃদ্ধ এক প্রকার ভুট্টাও আবিষ্কৃত হয়েছে। তেমনি এক্স-রশ্মির সাহায্যে বার্লিতে পরিব্যক্তির ফলে যে নূতন ধরণের বার্লি পাওয়া গেছে, তাতে শতকরা 25 ভাগ বেশী প্রোটিন আছে। অনু-রূপভাবে এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদির বিকি-রণের সাহায্যে নূতন নূতন পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা, যব, জোয়ার ইত্যাদি শস্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

খেসারি (Lathyrus sativus) আমাদের দেশে প্রায় 50 লক্ষ একর জমিতে চাষ হয় এবং স্বল্প মূল্যের জন্যে ডাল হিসাবে অনেকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এই ডালে একটি মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ আছে, যা ক্রমাগত শরীরে যাবার ফলে বহু সহস্র লোক চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগটির নাম হলো ল্যাথিরিজম (Lathyrism)। স্নায়ু আক্রমণকারী বিষাক্ত পদার্থটির রাসায়নিক নাম হলো B(N) oxalyl, B-diamino-propionic acid (BOPA)। বর্তমানে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে গামা রশ্মির সহায়তায়

নূতন পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে বিষমুক্ত খেসারি ডাল উদ্ভাবনের চেষ্টা চলেছে।

আবার অধিকাংশ ডালজাতীয় শস্যে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিওনিনের (Methionine) স্বল্পতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কৃত্রিম উপায়ে পরিব্যক্তি সৃষ্টি করে অধিক মেথিওনিনযুক্ত প্রোটিনসমৃদ্ধ ডালের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাগারে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। আবার সরিষার তেলে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, যেমন—লিনোলিক, লিনোলাইক ও আরকিডোনিক অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

কৃষির কয়েকটি প্রধান সমস্যায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ভূমিকা আলোচিত হলো। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার গবেষণায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও কৃষি গবেষণায় এর ব্যবহার সীমিত। কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শস্যের ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সমস্যাও উদ্ভূত হচ্ছে। আশা করা যায়, ঐ সকল সমস্যাবলীর দ্রুত সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক ও কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হবে।

ভারতে তুঘলক রাজত্বকালের স্থাপত্য ও নগর-বিন্যাস

অবনীকুমার দে*

1192 খৃষ্টাব্দে মোহাম্মদ ঘোরী রাজপুত বীর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে দিল্লীতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠান ও তুর্কী সুলতানেরা তিন-শ' বছরেরও বেশী দিল্লীতে রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে 1320 থেকে 1413 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় এক-শ' বছর ধরে তুঘলক রাজবংশ রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের সুরু ও পরিসমাপ্তি দুঃখময়। তুঘলক বংশের এগারো জন সুলতানের মধ্যে মাত্র তিনজন বাস্তুকলার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন; যথা—এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলক (1320 থেকে 1325 খৃষ্টাব্দ), তাঁর পুত্র মোহাম্মদ বিন তুঘলক 1325-1351 খৃঃ) ও ফিরোজ শাহ তুঘলক (1351—1388 খৃঃ)। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত ফিরোজ শাহই প্রচুর ইমারত ও সৌধাদি নির্মাণ করেছিলেন।

সুলতানী আমল

দিল্লীর সুলতানদের সুবর্ণ যুগ হলো ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী। সুলতানেরা পারস্যের সম্রাটদের অনুকরণে নিজেদের রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন। হারেমে দাস, দাসী এবং রাজ্যে আমীর, ওমরাহ ইত্যাদি পোষণ করে বিলাস-ব্যসনে তাঁরা জীবনযাপন করতেন। ক্রীতদাস পালন করা তাঁদের একটা সখ ছিল। এই দাসদের খাসবান্দা বলা হতো। ফিরোজ শাহের খাসবান্দার সংখ্যা নাকি ছিল দু-লক্ষ। সুলতানেরা বিভিন্ন নগরে নানা রকম নির্মাণকার্যে এসব ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করতেন। এদের মধ্যে হাজার হাজার কারিগর, পাথর-খোদাই শিল্পী ও কারুশিল্পীরা এত দক্ষ ছিল যে, তারা নাকি পনেরো

* স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শিবপুর।

করেছিলেন। এখানে ছিল সোনার মত উজ্জ্বল ইটের তৈরি প্রাসাদ। এই প্রাসাদের উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে এই ইটগুলির প্রখর ঔজ্জ্বল্যে চোখে ধাঁধা লেগে যেত। প্রাসাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা সম্ভব হতো না। তুঘলকাবাদ ছিল দুর্গ, প্রাসাদ ও সহরের এক বিরাট সংমিশ্রণ। তদানীন্তন আবাসিক ও সামরিক প্রয়োজনানুসারে এটি গড়ে উঠেছিল।

উঁচু পাহাড়ী জায়গার উপর তুঘলকাবাদ স্থাপিত হয়েছিল। রোমকদের দুর্গ নির্মাণরীতি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত নগরটির ছিল দুটি অংশ—পাশ্চাত্যের দুর্গের মত সহর রক্ষার জন্যে দুর্গ এবং এই দুর্গের লাগোয়া বাইরের প্রাচীরঘেরা সহর। এখানকার পাথরের তৈরী হেলানো দেয়াল সম্ভবতঃ আরবদের সেনানিবাসের অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল। আরবদের দেয়ালগুলি মাটি অথবা রৌদ্রপক্ক ইট দিয়ে তৈরি হতো বলে সেগুলি হেলানো থাকতো। আরবদের এই রকম নির্মাণ-পদ্ধতি আবার রোমক পূর্তবিদ্‌দের নির্মাণ-পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

জমির উপর জমা হওয়া প্রস্তর স্তর যে রকম ভাবে বিন্যস্ত ছিল, সেই ভাবেই বাইরের প্রাচীর তৈরি করবার জন্যে তুঘলকাবাদের বাইরের রেখাও খুব অসমান ছিল। তবে মোটামুটি এটি ছিল আয়তাকার, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় 2200 গজ করে বিস্তৃত। নগরের চারপাশের প্রাচীরের মোট দৈর্ঘ্য ছিল চার মাইলেরও বেশী। মাটি থেকে প্যারাপেটের উপর পর্যন্ত এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল প্রায় নব্বই ফুট। আক্রমণকারীদের হাত থেকে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষা করবার জন্যে নিশ্চয়ই এই নগর-প্রাচীর এত মজবুতভাবে নির্মিত হয়েছিল। কারণ ঘিয়াসুদ্দীনের পূর্ববর্তী কালে আলাউদ্দীন খিলজীর রাজধানী ও দিল্লীর দ্বিতীয় সহর সিরি-কে (যা এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে) সহজে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। নগর-প্রাচীরের মধ্যে সন্নিবিষ্টভাবে ছিল বৃহদায়তনের বৃত্তাকার পর্যবেক্ষণ বুরুজ। এগুলি দুর্গের প্রাচীর থেকে ঠেলে বের করা ছিল। কয়েকটি বুরুজ ছিল আবার দ্বিতল। প্রাচীরের উপরকার প্যারাপেটে ছিল তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করবার জন্যে অসংখ্য ফোকর। প্রাচীরের পাশ ছিল বেশ হেলানো। প্রাচীরের মধ্যেও তীরন্দাজদের তীর নিক্ষেপ করবার জন্যে ছিদ্রযুক্ত অসংখ্য স্থান ছিল। সমগ্র প্রাচীরের মধ্যে ছিল বাহান্নটি প্রবেশদ্বার। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রবেশদ্বারগুলি ছিল খুব প্রশস্ত ও উঁচু। দ্বারের দুই পাশে ছিল বুরুজ। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে-আসা চওড়া রাস্তা দিয়ে প্রবেশদ্বারে পৌঁছানো যেত। সহজেই হাতী চলাচলের জন্যে রাস্তা এই রকম অল্প ঢালু এবং প্রবেশদ্বার প্রশস্ত ও উঁচু করা হতো। পাহাড়ী জায়গায় স্থাপিত হওয়ায় পাশাপাশি জায়গার পাথর-খাদ থেকে পাথর সংগ্রহ করা হতো। অসমানভাবে কাটা বড় বড় আকারের পাথর দিয়ে এখানকার নির্মাণ কাজ করা হয়েছিল।

প্রাচীরঘেরা তুঘলকাবাদের ভিতরের বিভিন্ন অংশের, বিশেষতঃ সহর অংশের ইমারতগুলির বিশেষ কোন চিহ্নই এখন আর নেই। চারপাশের সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়েথাকা এই দুর্গটির চারদিক ছিল গভীর পরিখাবেষ্টিত। পরিখা, তীর নিক্ষেপের জন্যে ফোকরযুক্ত দেয়ালবিশিষ্ট দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ বারান্দা এবং সুরক্ষিত প্রবেশদ্বারের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও আছে। এখানকার প্রাসাদটি দুটি ঘেরা অংশে বিভক্ত ছিল। প্রাসাদে ছিল বাসভবন, জেনানা মহল, জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে দরবার কক্ষ ইত্যাদি। এখানে কোনও কোনও ঘরের ছাদের নীচে কাঠের কড়ি ব্যবহৃত

হয়েছিল। আরও ছিল একটি লম্বা ভূগর্ভস্থ বারান্দা-পথ, যার দু-ধারে ছিল অনেকগুলি কক্ষ, যেখান থেকে গুপ্তদ্বার দিয়ে দুর্গের বাইরে যাওয়া ও ভিতরে প্রবেশ করা যেত। এই পথের সঙ্গে সুন্দর স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ইমারতের সংযোগ ছিল। এটি হলো ঘিয়াসুদ্দীন তুঘলকের সমাধিসৌধ।

সমাধিসৌধটি খুব ভাল অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন এই হ্রদ আর দেখা যায় না। দুর্গ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হলেও এই বৃহৎ হ্রদের উপরে তৈরী পাথর-বাঁধানো 250 গজ লম্বা উঁচু একটি রাস্তা দিয়ে সমাধিসৌধটি দুর্গের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ছোটখাটো দুর্গও বলা চলে। মনে হয় এটি ছিল সহরের পিছন দিকে অবস্থিত দূরবর্তী ঘাঁটি অথবা সহরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের শেষ আশ্রয়স্থল।

সমাধিসৌধটির বাইরের আকার অসমান পঞ্চভুজাকৃতি। প্রাচীরের প্রত্যেক কোণে ছিল প্রাচীর থেকে ঠেলে বের-করা অংশ। যে ছোট পাহাড়ী দ্বীপটির উপর এটি নির্মিত হয়েছিল, তার অসমান সীমারেখার জন্যে এটিকেও এই রকম অসাধারণ আকারে তৈরি করতে হয়েছিল।

প্রাচীরের মধ্যে প্রধান প্রবেশপথে ছিল অতি সুন্দর একটি দ্বার। এটি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মরণফাঁদ হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। প্রাচীরের ভিতরের চত্বরটিও বাইরের মত একই রকম অসমান আকৃতির। এই চত্বরের নীচে কয়েকটি খুব মজবুত করে তৈরি ভূগর্ভস্থ ও খিলানকরা ছাদযুক্ত কক্ষ ছিল। আসল সমাধিকক্ষের সঙ্গে এই কক্ষগুলির কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। সুলতানের সঞ্চিত ধনরত্ন ও অন্যান্য ঐশ্বর্য নিরাপদে রাখবার জন্যে এই সুরক্ষিত কক্ষগুলি ব্যবহৃত হতো। ইবন বতুটা বলে গেছেন যে, ঘিয়াসুদ্দীন এখানে অতুল ঐশ্বর্য জমা করে রেখেছিলেন। এখানে একটি বড় চৌবাচ্চা তৈরি করিয়ে তিনি তার মধ্যে সোনা গালিয়ে ঢেলে রেখেছিলেন। এই সোনা জমাট হয়ে একটি বিরাট শক্ত সোনার তালে পরিণত হয়েছিল।

সৌধটির বহুলাংশ সূক্ষ্মভাবে কাটা লাল বেলে পাথরে তৈরি। উপরের দিকের খানিকটা অংশ সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি হওয়ায় একঘেয়েমির ভাব আংশিকভাবে লাঘব হয়েছে। সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত এর গম্বুজটি দিল্লীতে এই ধরণের প্রথম গম্বুজ। সে জন্যে ভারতের মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে এই সমাধিসৌধটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

সঠিকভাবে মক্কার অভিমুখে রাখবার জন্যে সমাধিকক্ষটিকে চত্বরের সবচেয়ে চওড়া অংশে স্থাপন করা হয়েছে। 75 ডিগ্রীতে হেলানো এর বাইরের দেয়াল খুব চিত্তাকর্ষক। কক্ষটির বর্গাকার নীচের অংশের প্রত্যেকটি দিক 61 ফুট লম্বা এবং এর মোট উচ্চতা 80 ফুটেরও বেশী। প্রত্যেক দেয়ালের মাঝখানে আছে ভিতরে ঢোকানো, উঁচু ও ছুঁচালো খিলানযুক্ত ফাঁক। এগুলির মধ্যে তিনটিতে আছে প্রবেশদ্বার। চতুর্থটির ভিতরের দিকে মিহরাব থাকায় সেটি বন্ধ। খিলানের নিম্নাংশ দুটিকে যুক্ত করে আছে কড়ি। এভাবে কড়ি ও খিলান—এই দুই রকমের ভার বহন করবার পদ্ধতিই একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বেশী মাত্রায় অলঙ্করণের জন্যেই কড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এই ধরণের নির্মাণ-পদ্ধতি সর্বপ্রথম। আরও বেশী অলঙ্করণের জন্যে কড়ির দুই প্রান্তের তলার দিকে ব্র্যাকেট ব্যবহৃত হয়েছে। ভিতরে 30 ফুট বর্গাকার একটি মাত্র কক্ষ আছে। উপরিউক্ত তিনটি খিলানযুক্ত ফাঁকের ভিতর দিয়ে কক্ষের মধ্যে আলো প্রবেশ

করে। কক্ষের উপরকার গম্বুজ নির্মাণে বিশেষত্ব আছে। ভিতরের দিকে ইট এবং বাইরের দিক মার্বেল পাথর দিয়ে গাঁথা। ভিতর ও বাইরের দুই তলের মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান নেই। 55 ফুট বিস্তারের এই গম্বুজটি 'তাতার' বা ছুঁচালো আকৃতির। অস্থায়ী কাঠামো (Centering) তৈরি করে তার উপরে সম্পূর্ণ গম্বুজটি তৈরি করা হয়েছিল।

বারখাম্বা

তুঘলক সুলতানদের সময়ের সাধারণ বাসগৃহের কোন নিদর্শন এখন আর নেই। তবে বাসগৃহের প্রাচীরঘেরা চত্বরের মধ্যস্থলে ছিল কূপ ও স্নানের জায়গা এবং চারধারে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল ও ভৃত্যদের থাকবার ঘর। আরও ভিতর দিকে অবস্থিত সিঁড়ি দিয়ে উপরকার প্রশস্ত সমতল ছাদে যাওয়া যেত। চারপাশে প্যারাপেটঘেরা এই ছাদ গ্রীষ্মকালে খুবই আরামদায়ক হতো। নীচেকার চত্বর-সংলগ্ন থামওয়ালা অংশটি সম্ভবতঃ বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হতো। বাসকক্ষের বাইরে ছিল উঁচু পাঁচিলঘেরা বাগান। বাগানের মধ্যে ছিল কূপ ও চবুতরা অর্থাৎ বাইরে বসবার জন্যে বাঁধানো চাতাল। নিরাপত্তা ও রাস্তা থেকে
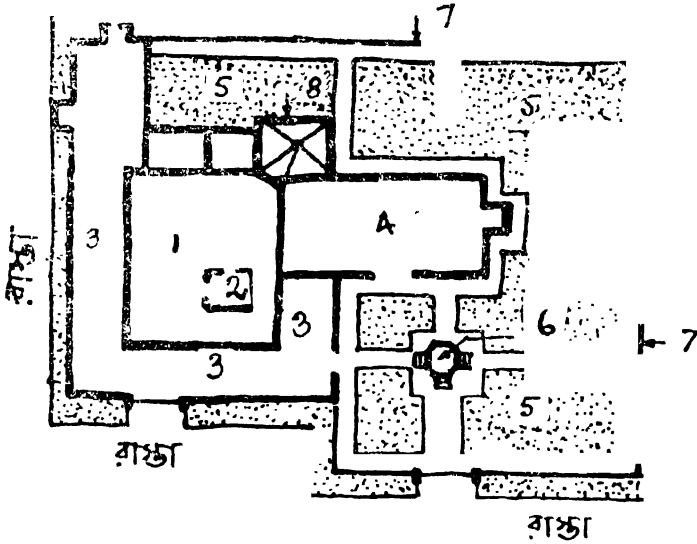
বারখাম্বা বাড়ীর নক্সা
1—চত্বর, 2—কূপ ও স্নান ঘর, 3—ঘোড়ার আস্তাবল, 4—থামওয়ালা প্রশস্ত ঘর, 5—বাগান, 6—চবুতরা, 7—উঁচু প্রাচীর, 8—তিনতলা উঁচু বুরুজ।

কিছু পরবর্তীকালে লোদী বংশের রাজত্বের (1451 থেকে 1517 খৃষ্টাব্দ) সময়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরী তদানীন্তন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে পুরনো দিল্লীর বেগমপুরায়। এটিকে বলা হয় বারখাম্বা বা বারোটি স্তম্ভ। এই গৃহের অভ্যন্তর ভাগের গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে সম্পূর্ণ বাড়ীটিই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। তদানীন্তন অনিশ্চিত জীবনযাত্রার কথাই মনে করিয়ে দেয় এই ধরণের নির্মাণ-পদ্ধতি। গৃহের একতলার সকল অংশ থেকেই সহজে পৌঁছানো

যায়, এমন স্থানে ছিল তিনতলা বর্গাকার একটি বুরুজ। সমগ্র গৃহটির একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল এই বুরুজ। বুরুজের উপরতলার ঘরগুলি ছিল খোলামেলা। পরিবারের বয়স্কেরা এই সব ঘরে বাস করতেন। ফলে তাঁরা প্রচুর আলো-বাতাস পেতেন এবং চারদিকের দৃশ্য উপভোগ করতে পারতেন। এই বুরুজের হেলানো ছাদ ছিল পিরামিডের আকৃতিবিশিষ্ট।

জাহাপনা

গিয়াসুদ্দীনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মোহাম্মদ বিন তুঘলক (1325-1351 খৃষ্টাব্দ) তুঘলকাবাদের কাছেই দিল্লীর প্রথম ও দ্বিতীয় সহরের মধ্যের স্থানটিকে বিশাল সুরক্ষিত প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। এই বিরাট প্রাচীরটির আর বিশেষ কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। এখানে তিনি দিল্লীর চতুর্থ সহর নির্মাণ করেছিলেন, যার নাম ছিল জাঁহাপনা অর্থাৎ পৃথিবীর আশ্রয়স্থল। এখানে অল্প যা কিছুর নিদর্শন এখনও আছে, তাদের মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে সাতটি বিস্তার-এর দু-তলা ও অলঙ্কৃত একটি জলদ্বার (Sluice)। এটির দুই প্রান্তে আছে দুটি বুরুজ। নতুন সহরের বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু ছিল একটি কৃত্রিম হ্রদ। এই জলদ্বারের সাহায্যে ঐ হ্রদে জল প্রবেশ করানো ও নির্গমনের কাজ নিয়ন্ত্রিত হতো।

সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক ছিলেন অতিমাত্রায় খামখেয়ালী। এই খেয়ালের বশে 1340 খৃষ্টাব্দে তিনি ছয় শত মাইল দূরে সুদূর দাক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তার সঙ্গে অগণিত প্রজাকেও সেখানে চলে যেতে হয়েছিল। সকলকে অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল তাঁর এই খেয়াল চরিতার্থের জন্যে। ফলে যে দিল্লীকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা সুন্দর করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই চেষ্টার বিরতি হলো। দিল্লী সহর পরিত্যক্ত ও নির্জন হয়ে পড়লো এবং সেখানে বাস্তুকলার প্রসারে ছেদ পড়লো। পরে তাঁর উত্তরাধিকারী ফিরোজ শাহের সময়ে সেখানে স্থাপত্যের কাজ পুনরায় সুরু হয়।

দৌলতাবাদ

ঔরঙ্গাবাদ সহরের নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ইলোরা যাবার রাস্তার ধারে দৌলতাবাদের স্থল ও পার্বত্য দুর্গটি অবস্থিত। সমতল জমি থেকে খাড়াভাবে সাত-শ' ফুট উঠে-যাওয়া শঙ্কুর আকারের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের উপর দুর্গটি তৈরি করা হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগের দিকে প্রধানতঃ হিন্দুশৈলীতে এই শক্তিশালী দুর্গটি নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ 1080 থেকে 1090 খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানকার অন্তর্দুর্গের পাদদেশের চারদিকের পরিখাটি তৈরি করা হয়েছিল। এ হলো দুর্গটির মুসলীম অধিকারের বহু দিন আগেকার কথা। অন্তর্দুর্গের পাদদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক পাহাড় খোদাই করে তৈরি করা একটি হিন্দু মন্দির অথবা পীঠস্থান ছিল। পরিখা খনন করবার সময় পীঠস্থান ও সেখানে যাবার রাস্তা সংরক্ষিত করে সামনের চত্বরের ধার দিয়ে পরিখাটি ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হিন্দু পীঠস্থান সংরক্ষণ করবার এই প্রয়াস দেখে মনে হয় যে, মুসলিম অধিকারের পূর্বেই এই পরিখাটি খনন করা হয়েছিল। দুর্গের নীচের দিকে পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় পর পর অবস্থিত প্রাচীরগুলি ও অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা মুসলমান আমলে তৈরি করা হয় অথবা পুরাতন ব্যবস্থার রদবদল বা মেরামত করা হয়।

পরবর্তী কালে দুর্গের নীচের দিকে সহর স্থাপন করা হয়েছিল। সহর ঘিরে বাইরের দিকে ছিল পাচিল। এই পাচিলের সামান্য

অংশমাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দৌলতাবাদ দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এত শক্তিশালী ছিল যে, দুর্গটি একপ্রকার দুর্ভেদ্য ছিল বলা যায়।

দৌলতাবাদ দুর্গের নক্সা
1—পরিখা, 2, 3, 4—প্রবেশদ্বার, 5—দুটি প্রাচীর ও পরিখা, 6—পরিখা, 7—সুড়ঙ্গ, 8, 9, 10—প্রাচীর, 11—অন্তর্দুর্গ।

সহরের পর দ্বিতীয় বাধাস্বরূপ ছিল 60 ফুট ব্যবধানে অবস্থিত দুটি প্রাচীর। প্রত্যেক প্রাচীরের সামনে ছিল পরিখা। ভিতর দিককার প্রাচীরে আছে প্রবেশদ্বার। শক্তিশালী প্রবেশ-দ্বারের সামনে পারখার উপর ছিল টানা সেতু। সেতুটি টেনে তোলা যেত আবার প্রয়োজনমত নামানো যেত। এর ফলে শত্রুর আক্রমণের সময় দুর্গের প্রবেশপথ বন্ধ হয়ে যেত। প্রবেশ-পথের অংশটি প্রাচীর থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। প্রথম প্রবেশদ্বারের ডান দিকে আছে বিশাল একটি বুরুজ। প্রবেশপথের সামনের দিকের অংশ পুর্বদিকে অনেকটা বাঁকা। এর ফলে প্রথম প্রবেশদ্বার, পরিখার উপর টানা পুল ও বুরুজ থেকে প্রবেশপথের ভিতরের প্রথম চত্বর ও বাইরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখা চলতো। বুরুজের পিছন দিকে হলো প্রথম চত্বর। তারপর আবার একটি প্রবেশদ্বার দিয়ে দ্বিতীয় চত্বর। তারপর আবার একটি প্রবেশদ্বার। দুর্গের প্রবেশপথে পর পর এই রকম দুটি চত্বর ও কয়েকটি শক্তিশালী প্রবেশদ্বার থাকায় দুর্গের ভিতরে শত্রুর পক্ষে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। প্রতিরোধ ব্যবস্থা কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি। এর পর পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় আছে দুই সারি প্রাচীর এবং প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশদ্বার। আক্রমণকারীরা প্রাচীর দুটিতে বিরাট বাধার সম্মুখীন হতো।

সর্বশেষ পাহাড়ের উপরে হলো অন্তর্দুর্গ। এর বাইরের দিকে চারপাশ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। পরিখার উপর অন্তর্দুর্গের প্রবেশপথে আছে অদ্ভুত ধরণের একটি সেতু। প্রথমে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে, তারপর একটু সমতল স্থান। তারপর আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেখান থেকে প্রাচীরঘেরা দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ পথ চলে গেছে। এই পরিখার জলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা ছিল। শত্রুর আক্রমণের সময় অন্তর্দুর্গের প্রতিরোধ আরও দৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে পরিখার জলের গভীরতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যেত, যাতে শত্রুসৈন্য সেতুর উপর দিয়ে অতিক্রম করতে না পারে।

দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথটি একটি উঁচু বুরুজের তিন দিক দিয়ে চলে গেছে। শত্রুসৈন্য এই পথ দিয়ে অগ্রসর হলে এই বুরুজের উপর থেকে এবং সংলগ্ন উঁচু প্রাচীরের উপরকার ফোকর থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হতো। সঙ্কীর্ণ পথটির বন্ধ শেষ প্রান্ত থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে ঐ উঁচু প্রাচীরের উপর। শত্রুসৈন্য সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীরের উপর ওঠবার চেষ্টা করলেও বাধার সম্মুখীন হবে। পথটি শেষ হবার অল্প একটু আগেই প্রাচীরের ফোকর দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে একটি বৃহৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে। গুহায় প্রবেশের সামনেই বাঁ-দিকে আছে প্রহরীদের জন্যে একটি পাথরের বেঞ্চি। প্রশস্ত ও দীর্ঘ গুহা পেরিয়ে আবার একটি সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে একটি উন্মুক্ত চত্বরে আসা যায়।

চত্বরের অপর দিকে আছে সুড়ঙ্গ ও সেখানে প্রবেশ করবার বিরাট প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশ-দ্বারটি 400 খৃষ্টাব্দে তৈরি দৌলতাবাদের নিকটবর্তী হিন্দু স্থাপত্যে নির্মিত ইলোরার কৈলাস মন্দিরের প্রবেশদ্বারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

সুড়ঙ্গ থেকে বের হয়ে আসবার পর খুব প্রশস্ত অনেক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটি মণ্ডপে এসে পৌঁছানো যায়। পরবর্তী কালে খুব সম্ভব 1636 খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান এই মণ্ডপটিকে পুনঃ-নির্মাণ অথবা নতুন আকারে গঠন করেন। মণ্ডপটি খাড়া উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় এখান থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। মণ্ডপ থেকে আবার অনেকগুলি সিঁড়ি আঁকাবাঁকাভাবে উঠে গিয়ে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁচেছে। মাঝপথে পর পর দুটি দ্বার আছে। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি খাড়া পাহাড়ের মধ্যে আছে এই দুটি দ্বার। পাহাড়ের চূড়ায় একটি বর্গাকার প্রাচীরে ঘেরা চত্বরের এক কোণে আছে একটি ভগ্ন ইমারত। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে দুটি উঁচু ঢিবির উপর কামান রাখবার বন্দোবস্ত করা হয়। পাহাড়ের প্রস্রবণ থেকে অন্তর্দুর্গে সারা বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যেত।

দৌলতাবাদ দুর্গের বিন্যাস ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার বর্ণিত ব্যবস্থাদি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মধ্যযুগের সবচেয়ে শক্তিশালী ও চিত্তাকর্ষক দুর্গগুলির মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

ফিরোজ শাহ তুঘলক (1351—88 খৃষ্টাব্দ) বাস্তু নির্মাণে যে খুবই উৎসাহী ছিলেন, তাঁর নিজের লেখা থেকেই তা বোঝা যায়। তিনি লিখে-ছিলেন—"ভগবান তাঁর দীন ভৃত্য আমাকে যে সব বস্তু দান করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো জনসাধারণের জন্যে ইমারত নির্মাণের প্রবল ইচ্ছা"।

ফিরোজ শাহের নির্মিত প্রধান প্রধান ইমারত-গুলিতে তাঁর নিজস্ব এক অদ্ভুত শৈলী দেখা যায়। এই শৈলী পূর্ববর্তী কালের স্থাপত্যশৈলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর সঙ্গত কারণও ছিল। পাথর কাটাই ও পাথরের কাজে কুশলী ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজমিস্ত্রী ও বাস্তু নির্মাণের অন্যান্য কারিগরের একান্ত অভাব হওয়ায় এবং তাঁর পূববর্তী সুলতানের অমিতব্যয়িতার ফলে

রাজকোষের অর্থ অসম্ভব রকম কমে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত সুলভ মালমশলা দিয়ে এবং সাধারণ মিস্ত্রী ও কারিগরের দ্বারা ফিরোজ শাহকে ইমারতাদি নির্মাণ করতে হয়েছিল। এই জন্যে তাঁর স্থাপত্য খুবই সাধারণ ও কার্যকরীভাবে করতে হয়েছিল। পূর্ববর্তী সময়ে বাস্তু নির্মাণে সুন্দরভাবে খোদাই করা ও খুব ভালভাবে সম্পূর্ণ করা বেলেপাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। অলঙ্করণের কাজও যথেষ্ট ছিল।" এই সবের পরিবর্তে ফিরোজ শাহকে অসমানভাবে খোদাই করা পাথর দিয়ে বাস্তু নির্মাণ এবং ওই একই রকম পাথর দিয়ে কড়ি, থাম ইত্যাদি তৈরি করতে হয়েছিল। তাঁর স্থাপত্যে অলঙ্করণের কাজও খুব কম দেখা যায়। অল্প যা কিছু অলঙ্করণের ব্যবহার করা হয়েছিল, তাও পাথরে খোদাই করবার বদলে ছাঁচের মধ্যে প্লাস্টার দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। ইমারতের বাইরের দিকে চুনকাম ও রং-করা থাকতো।

তিনি জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার ও দিল্লীর পঞ্চম সহর ফিরোজাবাদে চারটি দুর্গনগরী নির্মাণ করেন।

ফিরোজাবাদ

1354 খৃষ্টাব্দে যমুনাতীরে বিরাট সমতল জায়গায় অবস্থিত ফিরোজ শাহের রাজধানী ফিরোজাবাদের নির্মাণকার্য শুরু হয়। বর্তমান ফিরোজ শাহ কোটলাতে এর ধ্বংসাবশেষ আছে। এই বিশাল প্রাসাদদুর্গটি ছিল সম্পূর্ণ প্রাচীর-ঘেরা। এর ভিতরে রাজকীয় বাসস্থান ও আনুষঙ্গিক ইমারতাদি ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্তও ছিল। স্থাপিত হবার দেড়-শ' বছর পরে এই প্রাসাদ দুর্গটি পরিত্যক্ত হয়।

এটি আকারে একটি আয়তক্ষেত্র। উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত লম্বা দিকটির দৈর্ঘ্য আধ মাইলের চেয়ে অল্প কিছু কম এবং চওড়ায় প্রায় সিকি মাইল বিস্তৃত। চারদিকের উঁচু প্রাচীরের উপরের প্যারাপেটে মাঝে মাঝে অসংখ্য ফাঁক ছিল। এই সব ফাঁক দিয়ে শত্রুর উপর তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করা হতো। প্রাচীরের মধ্যে মাঝে মাঝে বিস্তৃতভাবে ঠেলে বেরকরা বুরুজ ছিল। এগুলি রক্ষীদের পর্যবেক্ষণ বুরুজরূপে ব্যবহৃত হতো। দুর্গপ্রাসাদের প্রধান প্রবেশ-দ্বার পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। অতি-সুরক্ষিত এই তোরণদ্বারটির ভিতরের দিকে অবস্থিত চত্বরের পাশে ছিল প্রহরীদের কক্ষ ও সৈন্যদের বাসস্থান। প্রধান প্রবেশদ্বারের বিপরীত দিকে নদীর বাঁধ ঘেঁষে ছিল প্রাচীরঘেরা বৃহৎ ও আয়তাকার একটি চত্বর, যেখানে ছিল রাজপ্রাসাদ বা খাসমহল, জেনানা মহল ও অন্যান্য ব্যক্তিগত প্রাসাদ। নদীর শীতল বাতাস মহল-গুলির মধ্যে চলাচল করবার সুবিধার জন্যে এই প্রাসাদগুলির বেশীর ভাগেরই বাইরের দেয়াল নদীর ধারসংলগ্ন ছিল।

কোটলার অভ্যন্তর ভাগ প্রাচীরঘেরা ও আয়তাকার অথবা বর্গাকার কয়েকটি চত্বরে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে বড় চত্বরটি ছিল দেওয়ান-ই-আম, যেখানে সুলতান জনসাধারণকে দর্শন দিতেন এবং আমদরবার পরিচালনা করতেন। এই সুবিস্তৃত উন্মুক্ত চত্বরের চারপাশ ঘিরে ছিল থামওয়ালা বারান্দা। এখানে সরকারী ও রাজ-নৈতিক কাজকর্ম চলতো। অবশিষ্ট চত্বরগুলিতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জল-উদ্যান, স্নানাগার, পুষ্করিণী, সৈন্যদের বাসস্থান, অস্ত্রাগার, ভৃত্যদের বাসস্থান ইত্যাদি ছিল। নদীর ধারের প্রাচীরসংলগ্ন ও কোটলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জুম্মা মসজিদ বা জনসাধারণের উপাসনা স্থান। বিশাল ও চিত্তা-কর্ষক এই মসজিদের চত্বরে প্রায় দশ হাজার লোকের একত্রে সমবেত হবার মত স্থান ছিল। জুম্মা মসজিদ ছাড়া কোটলার বিভিন্ন অংশে

ছোট ছোট উপাসনাগার এবং প্রাসাদের নিজস্ব একটি পৃথক উপাসনাগারও ছিল।

কোটলার কেন্দ্রস্থলে আর একটি বিশাল ও চিত্তাকর্ষক ইমারত ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এটির নাম লাট পিরামিড। এটিকে ধাপে ধাপে আকারে কমে-আসা পিরামিডের মত মনে হতো। পর পর তিনটি বিভিন্ন তলে অবস্থিত স্তম্ভশ্রেণীর উপরে খিলানযুক্ত পথের উপরকার বর্গাকার সমতল ছাদের সমষ্টি ছিল এই ইমারতটি। যত উঁচু হয়েছে, ততই এই ছাদগুলি আকারে ছোট হয়ে গেছে। অশোকের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধস্তম্ভ এই ইমারতটির উপর স্থাপিত হয়েছিল।
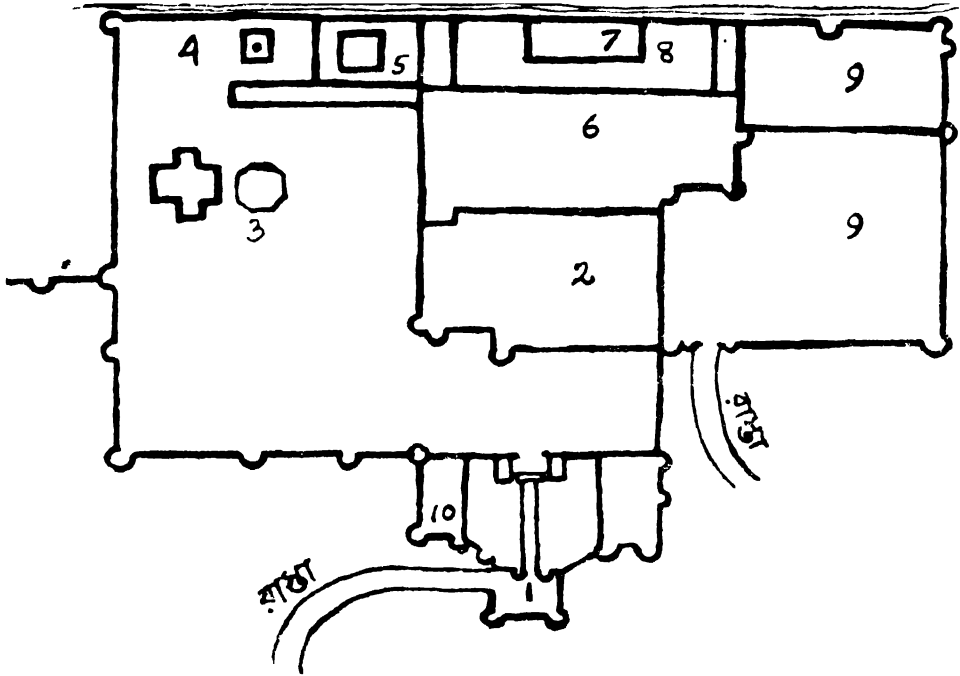
আম্বালার কাছে প্রথম থেকে প্রায় ষোল শত বছর ধরে থাকবার পর ফিরোজ শাহ্ এটিকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে ফিরোজাবাদে স্থাপন করেন। জানা যায়, এই উঁচু স্তম্ভটিকে খুব

ফিরোজ শাহ্ কোটলার আনুমানিক নক্সা
1—প্রধান প্রবেশদ্বার, 2—দ্রাক্ষাউদ্যান, 3—মণ্ডপ, 4—অশোক লাট, 5—জুম্মা মসজিদ, 6—দেওয়ান-ই-আম, 7—খাসমহল, 8—জেনানা মহল, 9—পরবর্তী কালের

সাবধানে নিয়ে এসে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুনরায় স্থাপন করা হয়। সমসাময়িক পুস্তক সিরাত-ই-ফিরোজশাহীতে লিখিত আছে যে, একটিমাত্র পাথর থেকে খোদাই করা এই বিশাল স্তম্ভটির প্রতি ফিরোজ শাহ্ অত্যন্ত আকৃষ্ট হন এবং এটির নাম দেন মিনার-ই-জরীন বা স্বর্ণস্তম্ভ। তাঁর রাজধানী ফিরোজাবাদের জুম্মা মসজিদে এটিকে স্থাপন করতে মনস্থ করেন। সুলতানের পূর্তবিদেরা কি করে এই স্তম্ভটিকে নামিয়ে নিয়ে

গিয়ে কি ভাবে তুলে আবার ফিরোজাবাদে স্থাপন করা যায়, সে বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন করতে না পারায় সুলতান নিজেই এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। প্রত্যেকটি দশ গজ পরিধির ও স্তম্ভের সমান লম্বা ছয়টি কাঠের থামের সঙ্গে বেঁধে দড়ির সাহায্যে স্তম্ভটিকে মাটিতে নামানো হয়। স্তম্ভটির সমান লম্বা এবং প্রত্যেকটি দশ গজ পরিধিবিশিষ্ট বিয়াল্লিশটি চাকার একটি গাড়ীতে স্থাপন করে বলদ, হাতী ও হাজার হাজার লোক দিয়ে টেনে যমুনাতীরে এনে কয়েকটি বড় বড় নৌকার উপর স্তম্ভটিকে রাখা হয়। কোটলায় আনীত হবার পর একই-ভাবে স্তম্ভটিকে নামানো হয় এবং 1367 খৃষ্টাব্দের 30শে সেপ্টেম্বর পঁয়ত্রিশটি মজবুত কাছির সাহায্যে স্তম্ভটিকে টেনে তুলে খাড়াভাবে স্থাপন করা হয়। যে পিরামিডাকৃতির ইমারতের উপর স্তম্ভ-টিকে স্থাপন করা হয়, সেটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছাদগুলি যথাক্রমে 118 ফুট, 83 ফুট ও 55 ফুট বর্গাকার। স্তম্ভের নীচে চারদিকে সাদা মার্বেল, লাল ও কালো পাথরের চাতাল তৈরি করা হয়। নীচের দিক থেকে উপর দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে আসা এই স্তম্ভটিকে গিল্টি ও পালিশ করা হয়। সোনার মত রঙের উপর আবার পালিশ করবার ফলে স্তম্ভটির সৌন্দর্য খুবই বৃদ্ধি পায়।

হাউজ-খাস

বৃহত্তর দিল্লীর যে অংশটিকে এখন বলা হয় হাউজ-খাস, সেখানে ছিল একটি বিরাট মাদ্রাসা ও তার অনেকগুলি আনুষঙ্গিক ইমারত। এগুলির মধ্যে ফিরোজ শাহের সমাধিসৌধটিই প্রধান। এই স্মৃতিসৌধটি ছাড়া আর সব কিছুই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই সব ইমারত একটি রমণীয় কৃত্রিম হ্রদের দু-ধারে ছবির মত বিন্যস্ত ছিল। হ্রদে আজ আর জল নেই, অনেক দিন আগেই শুকিয়ে গেছে। হ্রদটির কাছাকাছি যে প্রান্তরে একদা দিল্লী অধিকারের জন্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানে এখন সরকারী কর্মচারীদের বাসগৃহ তৈরি হয়েছে।

চারপাশের ভগ্নস্তূপের মাঝে ফিরোজ শাহের এই সমাধিসৌধটি মোটামুটি সম্পূর্ণভাবেই রক্ষিত আছে। বর্গাকার এই সমাধিসৌধটির এক-একদিকের মাপ 45 ফুট। দেয়ালগুলি দেখতে সাধাসিধা ও খাড়াইয়ের দিকে অল্প হেলানো। প্রত্যেক দিকের খানিকটা অংশ ঠেলে বের করা। এরূপ চারটির মধ্যে দুটি অংশের মধ্যে আছে সুদৃশ্য খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। সৌধটির উপরের দিকের অলঙ্কারবহুল প্যারাপেটের উপর অষ্টভুজা-কৃতি পিপার মত অংশের উপর রয়েছে স্বল্প উচ্চতার সূচালো গম্বুজ। দক্ষিণ দিকে সৌধটির সামনে আছে সুদৃশ্য ও অল্প উচ্চতার রেলিং ঘেরা নীচু ও ছোট চাতাল। সমাধিসৌধটির ভিতরে আছে একটিমাত্র বর্গাকার কক্ষ। কক্ষটির পশ্চিম দেয়ালের মধ্যে আছে ভিতরে ঢোকানো খিলানযুক্ত মিহরাব। সমগ্র সৌধটি দেখতে খুব সাদাসিধা হলেও খুবই গাম্ভীর্যের পরিচায়ক।

তৈমুরলঙ

এই তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়েছিল সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে। 1388 খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিদ্রোহ দ্রুত বাড়তে থাকে। এর কিছু কাল পরে 1398 খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত সমরকন্দের অধিপতি তৈমুর-লঙ এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারত আক্রমণ করে। উত্তর ভারতের উপর দিয়ে তার মঙ্গোল দলবল নিয়ে বিধ্বংসী অভিযান চালিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসে তৈমুর। নানা স্থান ধ্বংস করে সে দিল্লীতে উপস্থিত হয়। রাজধানী নির্মমভাবে

লুণ্ঠন করে এবং প্রায় এক লক্ষ লোককে হত্যা করে। পূর্ববর্ণিত হাউজ-খাসের হ্রদের ধারে তার শিবির স্থাপিত হয়েছিল। বিজেতা তৈমুর পাথর-খোদাই কাজের মিস্ত্রী, ইমারত নির্মাণের অন্যান্য কারিগর এবং প্রয়োজনীয় শিল্পীদের হত্যা করে নি। বিজিতদের হত্যা করাই ছিল তার সাধারণ নিয়ম। এই ক্ষেত্রে সে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিল; কারণ তার সাম্রাজ্যের রাজধানী সমরকন্দে সে সারা পৃথিবীতে অতুলনীয় একটি জুম্মা মসজিদ নির্মাণের সঙ্কল্প করেছিল। এই সব শিল্পী ও কারিগরদের এই মসজিদ নির্মাণে নিযুক্ত করবার জন্যেই সে হত্যা করে নি। তার পরিকল্পিত এই বিরাট সৌধটি নির্মাণের জন্যে অভিযানে ধৃত নব্বইটি হাতীর পিঠে বোঝাই করে এদেশ থেকে পাথরও নিয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্য-বশতঃ তৈমুর বেশী দিন এদেশে ছিল না। সামনে যা কিছু পেয়েছিল, সব কিছুই নিষ্ঠুর-ভাবে ধ্বংস করে দিয়ে তার দেশে ফিরে গিয়েছিল

পৃথিবীর বাইরে জীবনের সম্ভাব্য অস্তিত্ব

অরুণকুমার সেন*

অগণিত তারায় শোভিত রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কার না মনে হয়, "যদি একবার যেতে পারতাম ঐ তারার দেশে, তাহলে জানা যেত না জানি কত রহস্যই লুকিয়ে আছে ঐ তারার রাজ্যে। সত্যই কি ঐ মিট্‌মিট্‌করা তারাটির কাছে গেলে সেটি ক্রমশঃ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হবে, তার দিকে আর তাকানো যাবে না? সত্যই কি তারাটির চারপাশে গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে রয়েছে একটি তারার জগৎ? সে সব গ্রহ কি মরুময়, না আমাদের মত বিচিত্র জীবে ভরা, না আমাদের চেয়ে উন্নততর জীবনের স্পন্দন সেখানে বিরাজমান? এসব নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগে। প্রশ্নের কোন মীমাংসা করতে না পেরে পরক্ষণেই হয়তো দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একটি স্থির ও উজ্জ্বল তারার দিকে, যেটি আসলে হয়তো আমাদের পৃথিবীর মতই সূর্যের আর একটি গ্রহ—বৃহস্পতি, না হয় মঙ্গল, না হয় শুক্র। আছে কি ওখানে জীবনের স্পন্দন, না কি এগুলি জীবনের অস্তিত্বশূন্য? বস্তুতঃ [পৃথি]বীর বাইরে অন্য কোন গ্রহ, উপগ্রহ বা তারার রাজ্যে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, থাকলে তা কি ধরণের, তাদের সঙ্গে যোগা-যোগের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা—এসব প্রশ্ন নিয়ে মানুষ বহু দিন থেকেই ভেবে আসছে। মানুষের এই সব ভাবনা অনেকেই অবাস্তব পরি-কল্পনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। কারণ, পৃথিবীর বাইরে মানুষ যে কখনও যেতে পারবে—একথা তখনও প্রমাণিত হয় নি। 1957 সালে রাশিয়া থেকে পৃথিবীর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুট্‌নিক-1 সাফল্যের সঙ্গে কক্ষপথে স্থাপন করবার পর থেকে মানুষকে যেন আবার নূতন করে পেয়ে বসেছে ঐসব ভাবনা।

সেদিন ঠাকুমার কাছে গল্প শুনছিলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এসে গর্বভরে মা-কালীকে বলেছিলেন—মা, দেখবে এস কেমন ব্রহ্মাণ্ড বানিয়েছি আমি। উত্তরে মা কালী

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা-9

নাকি বলেছিলেন,—কেন ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলছিস তুই? তাই শুনে ব্রহ্মা তো রেগে আগুন হয়ে বলে উঠেছিলেন, ব্রহ্মাণ্ড তো একটাই, যেটা আমি বানিয়েছি। তখন নাকি মা কালী ব্রহ্মাকে একটার পর একটা ব্রহ্মাণ্ড দেখাতে সুরু করেছিলেন আর তাই দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপক্রম হয়েছিল। গল্প হলেও মূল ভাবটি হয়তো উড়িয়ে দেবার নয়। বস্তুতঃ সব দেশেই এই ধরণের পৌরাণিক কাহিনীগুলি মানুষের কল্পনার ইঙ্গিত বহন করে। আর সে সব কল্পনার অনেকগুলিকেই পরবর্তী কালে অনেকটা বাস্তব রূপ নিতে দেখা গেছে। পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এটা ভাবা খুবই অস্বাভাবিক হবে যে, এতবড় বিশ্বে পৃথিবীস্বরূপ আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডই শুধুমাত্র বহন করে জীবনের স্পন্দন, যা সঞ্চালিত হয় সৌরশক্তিতে, উদ্ভাসিত হয় সূর্যকিরণে। বস্তুতঃ আকাশের বহু তারা আছে, যেগুলি আয়তনে ও শক্তিতে আমাদের সূর্যেরই মত। আবার অনেক তারা আছে, যা সূর্যের চেয়ে অনেক গুণে বড়। আসলে সূর্য নিজেও ঐ তারাগুলিরই একটি; তবে তারার তুলনায় অনেক কাছে আছে বলে সূর্যকে আমরা আলো ও শক্তির আধার হিসাবে দেখে থাকি। সূর্যস্বরূপ ঐ দূরদেশের তারাগুলির চারপাশেও তাদের নিজস্ব গ্রহ-উপগ্রহ থাকা সম্ভব, যেমন রয়েছে আমাদের সৌরজগতে। ঐসব গ্রহ-উপগ্রহের কোন কোনটিতে জীবনের সৃষ্টি ও ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ থাকাও অসম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিকেরা হিসাবে বসলেন, সারা বিশ্বে এহেন ব্রহ্মাণ্ড বা জীবজগৎ কটা থাকতে পারে, তাদের পারস্পরিক দূরত্বই বা কতটা, তাদের মধ্যে যোগাযোগের সম্ভাবনাই বা কি রকম—এই সব ব্যাপার নিয়ে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে বর্তমানে এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব ভেদ করে দেখা যায় সেখানকার জ্যোতিষ্ককে। বলা বাহুল্য, আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবিত হয়। তাহলে আলো এক দিনে কতটা যাবে—এক মাসে, এক বছরে এবং সর্বশেষে এক হাজার কোটি বছরে কতদূর যাবে, তার হিসাব খাতায় কলমে করতে পারলেও প্রকৃত ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। এহেন দূরত্ব পর্যন্ত যত তারা দেখা যায়, তার সংখ্যা হলো প্রায় এক হাজার কোটির এক হাজার কোটি গুণ। বিশ্বের ঐসব অঞ্চল যে সকল পদার্থে গঠিত, পৃথিবীতেও আমরা সেগুলি দেখতে পাই। আর সেই সকল পদার্থের ধর্ম ও রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ এই 'নিয়মের রাজত্বে' সারা বিশ্বে একই রকম। তাই এমন কোন বিশেষ কারণ থাকতে পারে না, যাতে ঐসব অগণিত তারার মধ্যে একমাত্র সূর্য তার গ্রহ পৃথিবীতেই কেবল জীবনের সঞ্চার ও সঞ্চালনের উপযুক্ত আবহাওয়া বজায় রেখেছে।

তারার রাজ্যে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান করেছেন, সৌরমণ্ডলের আর কোন গ্রহে জীবন আছে কিনা। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে সেগুলিকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা হলো যে, গ্রহগুলির মধ্যে একমাত্র মঙ্গলগ্রহেই হয়তো জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাই মঙ্গলগ্রহ নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। প্রায় এক শত বছর আগে ইটালীর জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. ভি. সিয়াপারেলি মঙ্গলগ্রহের উজ্জ্বল কয়েকটি অংশে কতকগুলি প্রায় সোজা সোজা সূক্ষ্ম দাগ দেখতে পান, যেগুলির নাম দিয়েছিলেন তিনি ক্যানেল বা খাল। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী কালের গবেষক লভেল ও সহকর্মীরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, খালগুলি যেন গ্রহটির উপর কতকগুলি কালো কালো অঞ্চলকে সেগুলির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এক-একটি ছোট গোলাকৃতি বিন্দুর সঙ্গে সুসংবদ্ধভাবে

যোগাযোগ স্থাপন করিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা ভাবলেন যে, ঐ বিন্দুগুলি হয়তো জলাশয়। তাই সেগুলির নাম দিলেন হ্রদ। ঐ হ্রদের জলকে কালো অঞ্চলের শুক্‌নো জমিতে সরবরাহ করবার জন্যেই যেন খালগুলি কেটে রেখেছে মঙ্গলগ্রহের কোন বুদ্ধিমান জীব। এই ধারণার পরিবর্তন হলো উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন ই.এম.অ্যান্টনিয়াডি, মিউডন মানমন্দিরের 32″ ব্যাসবিশিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐসব খালের আরও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, ঐসব দাগ খুবই আঁকাবাকা এবং কোন প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট। বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সেগুলিকে মোটেই মনে হয় না। কালক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। 1941 সালে জ্যোতির্বিদ্ লিয় ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল পিকি ডু মানমন্দিরে। তাঁরা এবং পরবর্তীকালে 1948 সালে এডলফাস বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখতে পান যে, খালের মত যেগুলিকে মনে হতো, সেগুলির কোন কোনটি আসলে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বিন্দুর সারি ছাড়া আর কিছুই নয়।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে মঙ্গলগ্রহের মেরু অঞ্চলকে খুব চক্‌চকে সাদা মনে হয়। ঐ অঞ্চলের পরিধি ও অবস্থান সেখানে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লাতে দেখা যায়। এখন জানা গেছে যে, ঐ উজ্জ্বল মেরু অঞ্চল আসলে বরফে ঢাকা। মঙ্গলগ্রহের কোন গোলার্ধে শীতের পর গরমকাল এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেরু অঞ্চল ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায়, যা থেকে অনুমান করা হয় যে, ঐ সময় মেরু প্রদেশের বরফ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মেরুপ্রদেশের চারধারের কালো অঞ্চল বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং অবশেষে বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, কালো অঞ্চলগুলি বিস্তার লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির রংও বদ্‌লাতে থাকে। মঙ্গলগ্রহে বসন্তের সুরু থেকে ঐসব অঞ্চলের রং ধূসর, নীল অথবা সবুজ থেকে বদ্‌লে গিয়ে বাদামী হয়ে যায়। অঞ্চলবিশেষে সময় সময় রং বদ্‌লে গিয়ে বেগুনী ও ক্রিমশন বর্ণও ধারণ করে। ঐসব রঙীন অঞ্চলে কি আছে, তা নিয়ে গবেষণা সুরু হলো। 1948 সালে পিকারিং বললেন যে, ওগুলি সমুদ্র হতে পারে না। টেলার ও ফেসেনকফ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করলেন যে, ঐসব অঞ্চলে কোন তরল পদার্থই থাকতে পারে না। অনেকে মনে করলেন রঙীন অঞ্চলগুলি আসলে আমাদের পৃথিবীর মত গাছপালায় আবৃত।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে হলে সেখানে জীবের উপযোগী বায়ুমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। তাই সেখানকার বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি নিয়েও গবেষণা চলেছে। মঙ্গলগ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায় যে, সেখানে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস। জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুইপারের মতে, এই গ্যাসের পরিমাণ হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যা আছে, তার দ্বিগুণ। অপর দিকে 1933 সালে অ্যাডাম্‌স্ ডানহাম অনেক চেষ্টা করেও মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেনের অস্তিত্বের কোন নিদর্শন পেলেন না। পরবর্তী কালে তিনি মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরে শক্তিশালী যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করেও গ্রহটিতে জলীয় বাষ্পের কোন নিদর্শন পেলেন না। 1948 সালে তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, জলীয় বাষ্প যদিও থাকে, তবে তার পরিমাণ প্রতি 600 ভাগের মধ্যে এক ভাগের বেশী হবে না। তত্ত্বগত হিসাবে অনুমান করা হয় যে, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাস আছে।

মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় অনেক সময় রং-বেরঙের মেঘ দেখা যায়। নানা রঙীন

কাচের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলগ্রহকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে সেখানকার আবহাওয়ায় নীল, হলদে ও সাদা রঙের মেঘ লক্ষ্য করা গেছে। তাছাড়া গ্রহটির গায়ে মাঝে মাঝে কতকগুলি বিন্দুর আকারে বেগুনী স্তর দেখা যায়। এগুলি আসলে হয়তো ঘনীভূত জলীয় বাষ্প, না হয় ঘনীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড। নীলাভ মেঘগুলি সম্পর্কে রাশিয়ার জ্যোতির্বিদ্ খারোনভ এবং আরও অনেকে বললেন যে, ওগুলি আসলে গভীরভাবে ঘনীভূত গ্যাস, যা আছে বেগুনী স্তরে। হলদে মেঘগুলি সম্বন্ধে ডগলাস এবং অ্যান্টনিয়াডির ধারণা হলো যে, ওগুলি হয়তো মঙ্গলগ্রহের কোন মরুময় অঞ্চলে ধূলিঝড়ের সময় উত্থিত ধূলিমেঘ। কেউ কেউ অবশ্য বললেন যে, হলদে মেঘগুলি আসলে মঙ্গলগ্রহের কোন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের সময় উত্থিত ধূলিমেঘ। সাদা রঙের মেঘগুলি সাধারণতঃ গ্রহটির কালো অঞ্চলগুলির উপর দেখা যায় এবং অনেকের মতে, এগুলির সঙ্গে সৌরবিকিরণের সম্পর্ক আছে। মঙ্গলগ্রহের শীতকালে মেরু অঞ্চলে নীলাভ কুয়াশার মত দেখা যায়। গরম আসবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাটা ক্রমে কেটে যায়।

মঙ্গলগ্রহে বায়ুমণ্ডলের চাপ জীবের জীবনধারণের উপযোগী কিনা, সে সম্বন্ধেও গবেষণা হয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে পর্যবেক্ষণ করে মনে হয়েছে যে, সেখানে বায়ুমণ্ডলের চাপ খুবই কম, হয়তো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের $\frac{1}{11}$ ভাগ হবে। মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা জীবের পক্ষে অনুকূল কিনা, তা জানবার উদ্দেশ্যে 1922 সালে লাওয়েল মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোবলেন্‌জ্, ল্যাম্পল্যাণ্ড এবং মেন্সেল মঙ্গলগ্রহের চিত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে থার্মোকাপ্‌ল্ নামে সূক্ষ্ম তাপনির্ণায়ক যন্ত্রের উপর ফেলে সরাসরি-গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা নির্ধারণ করেন। দেখা গেল যে, পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা গড়ে -40° সেন্টিগ্রেড হবে। সেখানকার গরমকালে দুপুরবেলায় অবশ্য কতকগুলি অঞ্চলে 0° সেন্টিগ্রেডের উর্ধ্বে—এমন কি, 20° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠতে পারে। পরবর্তী কালে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির পরিমাপ করে জানা গেছে যে, ঐ তাপমাত্রা সেখানকার দুপুরে সূর্য ঠিক মাথার উপরে এলে 33° সেন্টিগ্রেড হতে পারে। আবার মেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা হয়তো মাত্র -72° সেন্টিগ্রেড। 1956 সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা 50 ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে 3.15 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত করেন যে, সমগ্র পৃষ্ঠদেশের গড় তাপমাত্রা হবে -55° সেন্টিগ্রেড। 1958 সালে আরও নিখুঁৎ পর্যবেক্ষণে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকেরা দেখালেন যে, ঐ গড় তাপমাত্রা হলো -62° সেন্টিগ্রেড। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে নির্ধারিত এই গড় তাপমাত্রা অবশ্য ঠিক পৃষ্ঠদেশের বলা যায় না বরং এটা আসলে মঙ্গলগ্রহের মাটির নীচের খানিকটা তাপমাত্রা সূচিত করে। বস্তুতঃ রেডার যন্ত্রের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গের ঝলক পাঠালে ঝলকটি গ্রহটির মাটিকে কিছুটা ভেদ করে গিয়ে নীচ থেকে প্রতিফলিত হয়। 1963 সালে গোল্ডষ্টাইন ও গিলমোর এবং কটেলনিকভ ও তাঁর সহকর্মীরা দেখলেন যে, ঐ প্রতিফলন-শক্তি মঙ্গলগ্রহের দ্রাঘিমার সঙ্গে পরিবর্তন হয়। 1965 সালে ইভান্স এবং অ্যারেকিবোর আয়োনোস্ফিয়ার গবেষণা কেন্দ্রে ডাইস অনুরূপ প্রতিফলন-শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করেন। এই সব গবেষণা থেকে অনুমান করা গেল যে, মঙ্গলগ্রহের মাটি শক্ত পাথরে গড়া নয়। আর প্রতিফলন-শক্তির তারতম্য থেকে মনে হলো যে, ঐ মাটির গঠন সর্বত্র এক রকম নয়, না হয় ঐ মাটি এক এক জায়গায় এক এক রকমভাবে অমসৃণ।

বিগত দশকে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে মঙ্গল গ্রহের খুব কাছ থেকে তোলা আরও নিখুঁৎ চিত্র পাওয়া গেছে। 1965 সালের জুলাই মাসে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনার-4 স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ও টেলিভিসন যন্ত্র বহন করে মঙ্গলগ্রহের 6000 মাইলের মধ্যে গিয়ে খুব চমকপ্রদ অনেকগুলি ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছবিগুলিতে মঙ্গলগ্রহে তথাকথিত খালের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি বরং দেখা যায়, অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ সদৃশ গহ্বর বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যার সংখ্যা সমগ্র গ্রহটিতে অন্ততঃপক্ষে 10,000 হবে। বলা বাহুল্য, এই ধরণের জ্বালামুখ চাঁদের গায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। তাই মনে হয়, মঙ্গলগ্রহেও ঐ গহ্বরগুলি একই কারণে সৃষ্ট হয়েছে। বড় বড় উল্কাপাতকে এরকম জ্বালামুখ সৃষ্টির কারণ হিসাবে বলা হয়। উল্কাপিণ্ড গ্রহের জমিতে পড়ে সেখানে অতবড় গহ্বরের সৃষ্টি করে। পৃথিবীর ক্ষেত্রে অবশ্য অধিকাংশ উল্কাপিণ্ডই বায়ুমণ্ডলে ঢোকবার সময় ঘর্ষণের ফলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়—যদিও কদাচিৎ দু-একটা বিশালাকার উল্কাপিণ্ডকে ঐভাবে সম্পূর্ণ না পুড়ে মাটিতে পড়তে দেখা যায়। তবে পৃথিবীর গায়ের ঐ সব উল্কাপাতের দাগ জলীয় বাষ্পসমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে দ্রুতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং শেষে মিলিয়ে যায়। চাঁদের বেলায়—এমন কি, মঙ্গল গ্রহেও যেখানে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প প্রায় নেই বললেই চলে, সেখানে গহ্বরগুলি দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ, তথা যে কোন জ্যোতিষ্ককে পর্যবেক্ষণ করবার প্রধান অসুবিধা হলো, ধূলিকণাবহুল বায়ুমণ্ডলের শোষণ। তাই 1969 সালে ষ্টারস্কোপ-2 নামে একটি বেলুনে করে 36″ ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে পৃথিবীপৃষ্ঠের 15 মাইল উপরে পাঠানো হয়। একদিন পরে টেলিস্কোপটি প্যারাসুটের সাহায্যে পৃথিবীতে নেমে আসে, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে। এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে মনে হয়, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় হয়তো অল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প আছে। বলা বাহুল্য, জলীয় বাষ্পের অস্তিত্বটা জীব সৃষ্টি ও তার বেঁচে থাকবার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি আমরা মনে করি, মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া পৃথিবীর আবহাওয়ার মত একই রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, তাহলে বলতে হয় যে, সেখানে প্রথমে ছিল জল, হাইড্রোজেন এবং অ্যামোনিয়া। এগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ জল উচ্চ বায়ুমণ্ডলের আলোক-রাসায়নিক (Photo-Chemical) ক্রিয়াকলাপে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর মঙ্গলগ্রহের দুর্বল মাধ্যাকর্ষণের ফলে হাইড্রোজেন গ্যাস ক্রমে গ্রহ ছেড়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। আর তখন অ্যামোনিয়া ভেঙ্গে গিয়ে তার একটি রাসায়নিক উপাদান নাইট্রোজেনের সৃষ্টি হয়। এমন কি, যতটা হাইড্রোজেন মিথেন গ্যাসের আকারে ছিল, তাও ভেঙ্গে গিয়ে অন্তর্হিত হলো মহাশূন্যে আর মিথেন গ্যাসের অপর একটি উপাদান কার্বনের সঙ্গে আবহাওয়ার অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে তৈরি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই সব রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় জৈব পদার্থ তথা জীবের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। তবে সেখানে এভাবে সৃষ্ট জীবনের নিদর্শন যদিও থাকে, তাহলে তা আমাদের পৃথিবীর মত উন্নত স্তরের হবে না। কারণ সেখানকার বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন প্রধান। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের চাপ, মেরিনার-4-এর সাহায্যে সর্বশেষ যা জানা গেছে, তা হলো পৃথিবীর বায়ুচাপের 200 ভাগের এক ভাগ মাত্র।

মঙ্গলগ্রহ ছাড়া সৌরমণ্ডলের আর যে সব গ্রহে জীবের সন্ধান করা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে শুক্রগ্রহ, যাকে আমরা সন্ধ্যার আকাশে শুকতারা-রূপে দেখে থাকি। বলা বাহুল্য, মঙ্গল ও শুক্র—এই গ্রহ দুটিই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। আর সূর্য থেকে শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব হলো যথাক্রমে 6½ কোটি, 9 কোটি 30 লক্ষ এবং 14 কোটি মাইল। আয়তনে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর প্রায় ⅛ ভাগ আর শুক্রের আয়তন পৃথিবীরই মত।

শুক্রগ্রহ নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের গঠন ও প্রকৃতি কি রকম—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা আজও একমত হতে পারেন নি। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন যে, গ্রহটির পৃষ্ঠদেশে আছে মরুভূমি, কেউ বা বললেন, সেখানে আছে সমুদ্র আবার কেউ হয়তো বললেন, ওখানে আছে তেলের সমুদ্র। পৃষ্ঠদেশের বিষয়ে এত মতভেদের প্রকৃত কারণ হলো এই যে, সেটি সব সময়ে খুব ঘন মেঘের স্তরে আচ্ছাদিত থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গ্রহটির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, ঐ মেঘের স্তরে আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। কিন্তু কোন জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেনের নিদর্শন ঐ বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না। ঘন মেঘের আচ্ছাদন থাকাতে গ্রহটির আহ্নিক গতির হিসাব করাও খুব কঠিন ব্যাপার। মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ করে যতটা জানা গেছে, তাতে বলা যায় শুক্রগ্রহ পৃথিবীর তুলনায় অনেক আস্তে আস্তে ঘোরে, যার ফলে 14 ঘন্টায় সেখানে হয় 1 দিন। শুক্রগ্রহের ঘন মেঘের আচ্ছাদনটির বিষয়ে আরও নূতন খবর পাবার আশায় 1959 সালে জন ষ্ট্রং ও তাঁর সহকর্মীরা একটি বেলুনে যন্ত্রপাতিসহ মানুষকে পাঠালেন পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় 80,000 ফুট উর্ধ্বে। স্বভাবতঃই এই পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে আমাদের বায়ুমণ্ডলের শোষণের হাত থেকে মুক্ত ছিল। এই গবেষণায় মনে হয়েছিল যে, শুক্রগ্রহের উচ্চ বায়ুমণ্ডলে হয়তো জলীয় বাষ্পের চিহ্ন আছে। শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশের খবর সংগ্রহের আরও চেষ্টা হতে থাকে। অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে গবেষণা করে দেখা গেল, ঐ রশ্মিও মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করতে পারে না। তবে ঐ গবেষণা মেঘের স্তরে 40 কিলোমিটার উর্ধ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার খবর দিল, যা হলো −39° সেন্টিগ্রেড। এরপর বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে গবেষণার চেষ্টা করা হলো। 1956 সালে মেয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা 3·15 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, ঐ বেতার-তরঙ্গ মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করে পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রার খবর দিতে পারছে। জানা গেল ঐ তাপমাত্রা হবে 327° সেন্টিগ্রেড। এরপর 4 মিলিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে গবেষণা করে জানা গেল যে, নিম্ন বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হবে প্রায় 117° সেন্টিগ্রেড এবং তা এত ঘন যে, বেতার-তরঙ্গ পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুস্তরটিকে মিলিমিটার বেতার-তরঙ্গটি ভেদ করতে পারে না। 1962 সালের অগাস্ট মাসে আমেরিকার কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত মেরিনার-2 নামে কৃত্রিম উপগ্রহটি নানাবিধ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বহন করে নিয়ে শুক্র-গ্রহের রহস্য উন্মোচন করলো। মেরিনার-2 শুক্র-গ্রহের প্রায় 22,000 মাইলের মধ্যে পৌঁচেছিল এবং যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, শুক্রগ্রহের দিন ও রাত্রির সীমারেখায় তাপমাত্রা হলো প্রায় 425° সেন্টিগ্রেড এবং জলের কোন চিহ্নও সেখানে নেই বলে মনে হয়। অপর পক্ষে, মেঘের তাপমাত্রা অনেক গুণে কম, অর্থাৎ মাঝামাঝি উচ্চতায় হবে −35° সেন্টি-গ্রেড এবং আরও বেশী উচ্চতায় হবে প্রায় −50° সেন্টিগ্রেড। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, শুক্রগ্রহ কতকগুলি বিষয়ে যদিও পৃথিবীর সঙ্গে তুলনীয়, তবুও পৃষ্ঠদেশের কাছে ঐ নিদারুণ

তাপমাত্রা কোন রকম জীবনধারণেরই অনুপযোগী। এই ধারণাটা আরো জোরালো হলো 1967 সালের অক্টোবর মাসে, যখন রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ ভেনাস-4 ঐ মেঘের আচ্ছাদনকে একেবারে ভেদ করে গিয়ে শুক্রগ্রহের উপর খুব আস্তে আস্তে অক্ষত অবস্থায় অবতরণ করলো। ভেনাস-4 কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় 15 গুণ ঘন এবং গ্রহটির জমিতে তাপমাত্রা 277° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাস্তবিকই শুক্রগ্রহে কোন রকমের জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

সৌরমণ্ডলের বাকী গ্রহগুলির মধ্যে বুধগ্রহ হলো সূর্যের সবচেয়ে নিকটে এবং তার উপর আবার সেটি সব সময় একটা পিঠই সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকে। তাই ঐ পিঠের তাপমাত্রা 350—450° সেন্টিগ্রেডের মত হবে। তাছাড়া বুধগ্রহের মাধ্যাকর্ষণও খুব দুর্বল। এমতাবস্থায় কোন রকম বায়ুমণ্ডলই শুক্রগ্রহ ধারণ করে রাখতে পারে না। এসব কারণে সেখানে কোন রকম জীবের অস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না।

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দুটি বড় গ্রহ বৃহস্পতি ও শনিতে হয়তো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নেই। গ্রহ দুটি সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকায় তাদের তাপমাত্রা হয়তো −100° সেন্টিগ্রেডের কম হবে। যদি সেখানে জল থাকেও, তবে তা নিশ্চয়ই বরফের আকারে থাকবে। তাছাড়া সেখানকার আবহাওয়ায় বিষাক্ত অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহস্পতির গড় ঘনত্বের পরিমাপ থেকে মনে হয় যে, গ্রহটির অন্তঃস্থলে একটা বিরাট পাথুরে কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস আছে। আর শনির গড় ঘনত্ব সূচিত করে যে, সেটির কেন্দ্রীন অনেক ছোট এবং তা হয়তো প্রধানতঃ তরল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম এবং আংশিকভাবে অ্যামোনিয়া ও মিথেন দিয়ে আবৃত। এসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, বৃহস্পতি ও শনিতে সেখানকার আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ অত অল্প তাপমাত্রায় জীব থাকা সম্ভব নয়। আজকাল অবশ্য এই ধারণার কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। 1959 সালে ম্যাকক্লেন এবং স্লোনকার আমেরিকার ন্যাভাল রিসার্চ লেবরেটরী থেকে 84 ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে 10 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে গবেষণা করে দেখেন যে, বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের নীচে তাপমাত্রা প্রায় 17° সে. থেকে 587° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হতে পারে। তাই বৈজ্ঞানিক আর্থার ক্লার্ক মনে করেন যে, বৃহস্পতিগ্রহে যদিও উচ্চ বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া খুবই কম, নীচের দিকে পৃষ্ঠদেশের আবহাওয়া অনেক গরম—এমন কি, পৃথিবীর চেয়েও গরম হতে পারে। এমতাবস্থায় তাঁর মনে হয় যে, সেখানকার হাইড্রোজেন, মিথেন ও অ্যামোনিয়ার আবহাওয়ায় সৃষ্ট হতে পারে খুব আদিম কালের নিম্ন স্তরের জীব, ঠিক যেমন হয়েছিল পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রথম জীব সৃষ্টির সময়ে।

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো হলো সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরবর্তী গ্রহ। তাই সেখানকার তাপমাত্রা আরও অনেক কম হবে। ইউরেনাস ও নেপচুনের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ মিথেন গ্যাস আছে। প্লুটোর তাপমাত্রা হয়তো −273° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। বলা বাহুল্য −273° সেন্টিগ্রেড হলো সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যার নীচে কোন তাপমাত্রা কখনও নামতে পারে না। স্বভাবতঃই এত কম তাপমাত্রায় প্লুটোতে কোন পদার্থই গ্যাসীয়, এমনকি তরল অবস্থাতেও থাকতে পারে না। এই পরিবেশে কোন জীবের অস্তিত্বের কথা ভাবাই যায় না।

আমাদের সৌরমণ্ডলের যাবতীয় গ্রহের হিসাব-নিকাশ করে এটা বেশ মনে হচ্ছে যে, হয়তো এগুলির মধ্যে আমাদের এই ধরিত্রীরই সৌভাগ্য

হয়েছে আমাদের মত উন্নত স্তরের জীব ধারণ করবার। অন্যান্য গ্রহের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল-গ্রহে হয়তো কোন রকম উদ্ভিদাদি থাকতে পারে, যার চেহারা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর উদ্ভিদ-জগতের তুলনায় অনেক ভিন্ন রকমের হবে। আর অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতিতে খুব আদিম কালের জীব আছে কিনা, তা এখনও বহু গবেষণা-সাপেক্ষ।

আমরা সৌরমণ্ডলের একমাত্র বুদ্ধিমান অধিবাসী হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যই কি আমরা একলা? এই নিয়ে আজ জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। তবে কল্পনার গতি পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের আওতায় এই ব্যাপারটিকে আনা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এর প্রধান কারণ হলো দুটি সম্ভাব্য উন্নত স্তরের জীবজগতের অপরিসীম দূরত্ব। এই দূরত্বের হিসাব করতে গিয়ে প্রথমেই বেছে নেওয়া হয় সেই সব তারাকে, যাদের বর্ণালী অনেকটা সূর্যের মত। দ্বিতীয়টি ঐসব তারার চারপাশে সৌরমণ্ডলের মত গ্রহও থাকা প্রয়োজন। তার উপর আবার ঐসব গ্রহের কোন কোনটির পরিবেশ হতে হবে আমাদের পৃথিবীর মত। এই সব নানা দিক দিয়ে বিচার করে হিসাব করলে দেখা যায় যে, আধুনিক দূরবীক্ষণে যত তারা দেখা যায়, তার মধ্যে 10 লক্ষ থেকে 10 হাজার কোটি তারা থাকতে পারে, যাদের গ্রহে বুদ্ধিমান জীব আছে। এথেকে হিসাব করা যায় যে, দুটি সভ্যজগতের গড় দূরত্ব কয়েক শত আলোক-বর্ষের কম নয় এবং সম্ভবতঃ তা হবে কয়েক হাজার আলোক-বর্ষ। তাই এহেন দূরত্বে আলো বা বেতার-তরঙ্গ পৌঁছুতেই হয়তো লেগে যাবে কয়েক হাজার বছর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবজগতের সন্ধানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হলো তারার চারপাশে গ্রহের অস্তিত্ব। এখন পর্যন্ত কোন উপায় জানা নেই, যার সাহায্যে কোন একক তারার চারপাশের গ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে। তবে কতকগুলি যুগ্মতারা আকাশে দেখা যায়, যারা পরস্পরের চারপাশে আবর্তিত হয়ে থাকে। তারা দুটির এহেন গতিবিধির তারতম্য লক্ষ্য করে প্রমাণ করা গেছে যে, ঐ যুগ্ম-তারার গ্রহ আছে, আর সেই গ্রহই তারার গতিবিধিকে আংশিকভাবে প্রভাবিত করছে। মাত্র দশ আলোক-বর্ষ দূরের এহেন দুটি যুগ্ম-তারা 61-সিগনি এবং 70-অফিউসি। এদের প্রত্যেকটিরই যে নিজস্ব গ্রহ আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ গবেষণায় এহেন একটি তারার জগতে পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দির থেকে বেতার-সঙ্কেত পাঠানো হয়েছে। প্রায় 10 আলোক-বর্ষ দূরের এই তারার রাজ্য থেকে প্রেরিত ঐ সঙ্কেতের প্রতিধ্বনি বা কোন রকম উত্তর পেতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

কেবলমাত্র উন্নত স্তরের জীবের কথা না ভেবে যদি উচ্চ-নিম্ন নির্বিশেষে যে কোন রকম জীবের কথা ধরা যায়, তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হুয়াঙের মতে, ঐ রকম জীবের সংখ্যা আমাদের নিজস্ব বিশ্বেই আছে হয়তো প্রায় দুই কোটি। বলা বাহুল্য, আমাদের বিশ্ব বলতে বোঝা যায় অগণিত তারার একটি সমন্বয়, যা এককভাবে নিজ কেন্দ্রের চারপাশে ঘুরে থাকে। আমাদের সূর্যস্বরূপ তারাটি ঐ কেন্দ্রের প্রায় 30,000 আলোক-বর্ষ দূরে থেকে নিজস্ব গ্রহরাজ্য নিয়ে তারার সমন্বয়টির একটি হয়ে অংশ গ্রহণ করে ঐ সামগ্রিক ঘূর্ণনে। এই ঘূর্ণায়মান তারার সমন্বয়টিই হলো আমাদের বিশ্ব, যা রাত্রির চন্দ্রবিহীন আকাশে দেখা যায় ছায়াপথের আকারে। এহেন বিশ্ব, সারা মহাবিশ্বে যতদূর দূরবীক্ষণের নাগালে আসে, তার মধ্যে আছে প্রায় 1 হাজার কোটি।

সমগ্র মহাবিশ্বে অসংখ্য সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলা যায়—তাদের পারস্পরিক দূরত্ব। কারণ ঐ যোগাযোগের জন্যে বেতার বা বেতারের আলোক-তরঙ্গ সংস্করণ লেসার ব্যবহার করলেও যেখানে সময় লাগবে হয়তো কয়েক হাজার বছর, সেখানে কোন মানুষের অভিযান করাটা একেবারে অবাস্তব মনে হবে—এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কোন যানের গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি করা যায়, তাহলে আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে অভিযাত্রীর সময়ের মাপকাঠি পৃথিবীর তুলনায় অনেক বড় হয়ে যাবে, যার ফলে সে বহু দিনই নবীন থেকে যাবে, সহজে বৃদ্ধ হবে না বা মরবে না। হিসাবে দেখা গেছে, যদি কোন দিন কোন যানের গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা 99 ভাগ করা যায়, তাহলে যানটির অভিযানের সময় অনুযায়ী দশ আলোক-বর্ষ দূরের এরিডানি নামক তারার রাজ্যে পৌঁছুতে লাগবে মাত্র তিন বছর, যদিও পৃথিবীর সময় অনুযায়ী ঐ যাত্রার সময় মনে হবে 20 বছর দীর্ঘ। অনেকে ইতিমধ্যেই তত্ত্বগতভাবে দেখিয়েছেন যে, শক্তিশালী আলোক-রশ্মির সাহায্যে ফোটন রকেট নামে এমন যান তৈরি করা সম্ভব, যার গতিবেগ আলোর গতি-বেগের কাছাকাছি হতে পারে। তবে এই রকম দ্রুতগতিসম্পন্ন যান তৈরি করলেও আর একটি সভ্যজগতের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছুবার উপযোগী আয়ু কোন মানুষের থাকা সম্ভব মনে হয় না। তাছাড়া যদি তাও সম্ভব হতো, পৃথিবীর মানুষ কখনই এত দীর্ঘায়ু হতে পারে না, যাতে একজনের জীবদ্দশায় ঐ অভিযানের ফলাফল জানতে পারতো। এমতাবস্থায় মানুষকে হয়তো রোবট বা যন্ত্রমানবের সাহায্য নিতে হবে, তারার রাজ্যে সভ্যজগতের সন্ধানে। বস্তুতঃ যন্ত্রমানব হলো একটি খুব উঁচুদরের কম্পিউটারবিশেষ। আগামী দিনের পারমাণবিক কম্পিউটার এই ব্যাপারে একটা বিরাট ধাপ এগিয়ে দিতে পারে। সম্প্রতি অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক মনে করেন, আলোর চেয়েও দ্রুতগতির সৃষ্টি করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে তারার রাজ্যে অভিযান হয়তো একদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

পৃথিবীর বাইরে দ্বিতীয় কোন সভ্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগ ও সেখানে অভিযান করবার পথে এই সব বড় বড় বাধার কথা ভেবে এক এক সময় মনে হয় যে, ঐ দ্বিতীয় সভ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনটা বোধ হয় আর কোনদিন হবে না। কেউ কেউ ভাবলেন—না, এমনও তো হতে পারে—এই সব জগতের এমন কোন কোনটি আছে, যাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। সেখানকার সভ্যতর জীব নিশ্চয় আমাদের মত অপেক্ষাকৃত কম উন্নত সভ্যতার খোঁজে আন্তজাগতিক যোগাযোগের কথাকে ভাবনার গণ্ডী পেরিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করেছে। অতএব খুঁজে দেখা যাক, বহির্জগতের অতিমানবের বার্তাবহনকারী কোন সঙ্কেত আমরা পৃথিবী থেকে ধরতে পারি কিনা। ধরতে গিয়ে প্রথম সমস্যা হলো কোন্ মিটারে সঙ্কেত আসতে পারে, সে বিষয়ে অনুমান করতে গিয়ে। কেন না, ঐ মিটার বা বেতারের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যটা ঠিক কত, তা না জানলে তেমন শক্তিশালী গ্রাহক-যন্ত্র বা রেডিও তৈরি সম্ভব হবে না। পদার্থবিদ ককনি ও মরিসন ভাবলেন যে, অন্য জগতের অতিমানবেরা নিশ্চয়ই জানে 1420 মেগাসাইকেল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে মহাশূন্যের হাইড্রোজেন পরমাণু একটা ক্ষীণ বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ করে। বস্তুতঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক হঠাৎ উল্টে গেলেই ঐ রকম বিকিরণ আশা করা যায়। ঐ বিকিরণ ধরবার উদ্দেশ্যে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের খুব শক্তিশালী বেতার

গ্রাহক-যন্ত্র ইতিমধ্যেই তৈরি করতে হয়েছে। তাই অন্য জগতের অতিমানবও এই কথা বুঝতে পেরে হয়তো ঐ 1420 মেগাসাইকেলেই সঙ্কেত পাঠাবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ড্রেক ওজমা নামক একটি পরিকল্পনার কাজ সুরু করলেন এবং চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী একটি গ্রাহক-যন্ত্র তৈরি করলেন। কিন্তু ঐ যন্ত্রে কোন সঙ্কেতই ধরা পড়লো না। কেউ কেউ অবশ্য বললেন, অতিমানবের জগৎ হয়তো ভাবতে পারে না, 1420 মেগাসাইকেলে যখন হাইড্রোজেন পরমাণুর বিকিরণ ধরে মহাশূন্যের হাইড্রোজেন নিয়ে গবেষণা করতে হয়, তখন আর সেই একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে আমাদের গবেষণার বাদ সাধতে যাবে না। তাই সম্ভবতঃ অন্য কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে সঙ্কেত পাঠাতে পারে। এই বিষয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

বস্তুতঃ ঐ রকম বেতারে সঙ্কেত পাঠাতে হলে অতিমানবের দেশের প্রেরক-যন্ত্রটির যতটা শক্তি বিকিরণ করতে হবে, তার পরিমাণ হলো অন্ততঃ 1 হাজার কোটি মেগাওয়াটের 1 হাজার কোটি গুণ (1 মেগাওয়াট=1000 কিলোওয়াট)। এই শক্তির তুলনায় পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী যত শক্তি সৃষ্টি করা গেছে, তার পরিমাণ হলো 30 লক্ষ মেগাওয়াট। আগামী 20 বছরে ঐ শক্তির পরিমাণ হয়তো দ্বিগুণ করা যাবে এবং আগামী 200 বছরে হয়তো দাঁড়াবে 300 কোটি মেগাওয়াট। এর চেয়েও বেশী শক্তি সৃষ্টি করতে গেলে তা পৃথিবীতে বসে সৃষ্টি করা নিরাপদ হবে না। তাই সে ক্ষেত্রে হয়তো মানুষকে পৃথিবীর বাইরে কোথাও ঐ শক্তির সৃষ্টি করতে হবে। কালক্রমে আমাদের কোন প্রতিবেশী গ্রহের সবটাকে ব্যবহার করে পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগের উপযোগী শক্তি আহরণ করা অসম্ভব হবে না। অপরপক্ষে কোন অতিমানবের জগৎ ইতিমধ্যেই ঐ পরিমাণ শক্তি সৃষ্টি করে থাকবে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অ্যামেবার্তসুমিয়ানের মতে—মহাবিশ্বে এমন অতিমানবের জগৎ থাকতে পারে, যেখানে ইতিমধ্যেই এত বিপুল শক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের চাহিদার তুলনায় 1 হাজার কোটি গুণ বেশী। এহেন শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেখানকার অতিমানব জীবজগৎ ধারণের উপযোগী সুবিশাল কৃত্রিম গ্রহ সৃষ্টি করতে পারবে। এমন কি, নিজেদের তারার জগতের গ্রহগুলিকে ভেঙ্গে গড়ে, তাদের গতিবিধি ও অবস্থান বদলে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে পারে। ঐ শক্তির সাহায্যে তারা ক্রমে নিজের তারকা-জগৎ ছেড়ে অন্য তারকা-র জগতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এইভাবে ক্রমে তার নিজ বিশ্বের সব কয়টি উপযুক্ত তারার রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এসব ঘটতে সময় লাগবে হয়তো কয়েক কোটি বছর। বস্তুতঃ পৃথিবীতেও আমরা দেখে থাকি যে, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জীবনধারণের সবচেয়ে উপযোগী জীবই বেঁচে থাকে এবং চারদিকে তার বংশবিস্তারের চেষ্টা করে। তাই সে সব অতিমানব যে তার বংশকে নিজ ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডী পেরিয়ে সব কয়টি তারার রাজ্যে বিস্তারের চেষ্টা করবে না—একথা ভাববারও কোন কারণ নেই। তবে এই কথাও ধরে নেওয়া ঠিক হবে না যে, সমগ্র মহাবিশ্বের প্রতিটি সভ্যজগৎই একনাগাড়ে উন্নতির পথে যাবে। কেন না, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অভিশাপগুলিও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যার ফলে অনেক সময় সভ্যতা হঠাৎ অনেকটা পিছিয়ে—এমন কি, লোপ পেয়ে যেতে পারে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক স্ক্লভস্কির মতে, ঐ অভিশাপের কারণ হতে পারে পারমাণবিক শক্তির অপপ্রয়োগ, বংশবৃদ্ধি লোপ, মানুষের জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান ধারণের ক্ষমতার অতিরিক্ত অগ্রগতি অথবা মানুষের সৃষ্ট কোন

কৃত্রিম জীবনের ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের দানবসুলভ ক্রিয়াকলাপ। সর্বশেষে, কোন অগ্রগামী সভ্যতা হয়তো তার রাজ্য বিস্তারের আর চেষ্টা না করে তাদের নিজেদের জীবনধারার নানাবিধ উন্নতির দিকেই নজর দিতে পারে। তবে এহেন প্রচেষ্টা—স্ভক্লির মতে, সভ্যতার অবনতির পরিচায়ক। আর বহু সভ্যজগৎই থাকা সম্ভব, যারা এই অবনতির পথ এড়িয়ে চলবে। বলা বাহুল্য, আমাদের পৃথিবীতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের অপপ্রয়োগজনিত সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কথা মাঝে মাঝে উঠছে। তবে জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অধ্যক্ষ সার লভেলের মতে, আধুনিক কালে মহাশূন্যে গবেষণার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে পাল্লা দেবার মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটাই হয়তো তাদের পারমাণবিক বিস্ফোরণের অভিশাপ থেকে রক্ষা করবে

মহাবিশ্বের অগণিত সভ্যজগতের কথা ভেবে মনে হয়, কি বিচিত্র এই সৃষ্টি। নতুন করে আর একবার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টিকর্তা কি জীবজগৎ ধারণের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে দেবার উদ্দেশ্যেই মহাবিশ্ব রচনা করেছেন, না জীবজগৎই বিরাট বিশ্বের মাঝখানে তার উপযুক্ত স্থান বেছে নিয়েছে? এইভাবে হতভম্ব হয়ে ক্ষণিকের জন্যে চেয়ে চেয়ে অবশেষে মনে হয়—সৃষ্টি-রহস্য কোনদিনই হয়তো উন্মোচিত হবে না। আমরা শুধুমাত্র জানবার চেষ্টা করে যাব। কারণ ঐ চেষ্টা হলো একান্তই সহজাত। তবে এই চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, আমাদের তুলনায় অতি ছোট বা অতি বড়—এই দুয়েরই ধারণা করাটা হয়তো একই রকম কঠিন। তাই দেখা যায় যে, পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন—এই সব মৌলিক কণিকার পর্যবেক্ষণে একটা ন্যূনতম অনিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে হয়তো ঐ ক্ষুদ্রতম অংশের বৃহত্তম সমাবেশের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে একটা অনিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ তা কখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না। অতএব এই মহাবিশ্ব তথা তার সমগ্র জীবজগৎকে সম্পূর্ণভাবে জানবার হয়তো কোন আশা নেই। তবে কি সৃষ্টিকর্তা ইচ্ছা করেই আমাদের বুদ্ধিকে এমন সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, যাতে কোন দিনই তাঁর সৃষ্ট রহস্য ভেদ করতে না পারি! আর এখানে এসেই প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকের অনন্ত জিজ্ঞাসা হঠাৎ যেন ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়, পরক্ষণেই হয়তো সে আবার স্বভাবসিদ্ধভাবে ছুটে চলে অজানার রহস্যসন্ধানে।

সঞ্চয়ন

মঙ্গলগ্রহের ধূলিঝড়

মার্স-2 এবং মার্স-3-এর আন্তগ্র্হ অভিযান থেকে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সেই সকল তথ্যের ভিত্তিতে উপনীত কতকগুলি সিদ্ধান্তের কথা দু-জন সোভিয়েট বিজ্ঞানী—ভি. মোরোজ এবং এল. ক্সানফোমালিতি ইজভেস্তিয়ায় লিখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, মঙ্গলগ্রহ মিহি ধূলিকণায় ঢাকা। সমুদ্রাঞ্চলও ধূলিকণায় ঢাকা, তবে সে ধূলিকণা আর একটু মোটা। ওখানে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদ বেশী হয়। মনে করা হচ্ছে যে, ধূলিঝড়ের সময় এই অঞ্চলের ধূলিকণা উপরে উঠে আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে যায় এবং গ্রহের উপরি-ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরণের ধূলিঝড় গত অক্টোবরের প্রথম দিকে সুরু হয়েছিল এবং সেই ঝড় তিন মাস চলেছিল।

সূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে ছড়াতে থাকে। সে জন্যে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, ঝড় ওখানে দীর্ঘস্থায়ী হয় না অর্থাৎ যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছিল, তখন সেখানে স্থায়ী বাতাস ছিল না। যে বাতাস মাটি থেকে ধূলিকণা উপরে তোলে, তা সম্ভবতঃ এই ব্যাপারটার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাহিত হয়। তারপর শান্ত আবহাওয়ায় সেই ধূলিকণা অনেকক্ষণ ঝুলে থাকে।

এই ধূলিঝড় সৃষ্টির অর্থ হলো গ্রহের আবহাওয়ায় মেঘের সৃষ্টি। কিন্তু এই মেঘ অস্থায়ী। এই মেঘ শুক্রগ্রহের মেঘের মত নয়। শুক্র গ্রহে একটি স্থায়ী মেঘস্তর বিদ্যমান।

আরও বলা হয়েছে যে, মঙ্গলগ্রহের মেঘের উপরের প্রান্ত খুব উঁচু। সে উচ্চতা 8-10 কিলোমিটারের কম নয় এবং এই মেঘের উচ্চতা সব জায়গায় একরকম নয়। উঁচু জায়গায় তার উচ্চতা কম আর নীচু জায়গায় বেশী।

শুক্রগ্রহের আবহাওয়া এবং মেঘ সূর্যালোকের পক্ষে অনেকটা স্বচ্ছ। তাতে 'হট্ হাউসে'র ফল হয়—মাটি খুব তেতে যায়। মঙ্গলগ্রহে ধূলিঝড়ের সময় কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে জানা গেছে যে, তখন বিপরীত ব্যাপারই ঘটে। গ্রহের তাপ নির্গমনে মেঘের স্তর কিছুটা স্বচ্ছ হয় এবং সূর্যালোকের হ্রস্ব তরঙ্গে তার চেয়ে বেশী স্বচ্ছ হয়। এই ক্ষেত্রে মাটি তেতে ওঠে না বরং ঠাণ্ডা হয়। আর আমরা 'হট হাউসে'র বিপরীত প্রতিক্রিয়া পাই। ধূলিঝড়ের সময় মাটির তাপ 20-30 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নীচে নেমে যায়। ঝড় থেমে যাবার পর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ধূলিঝড়ের সময় মাটি ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু আবহাওয়া গরম থাকে, কারণ তা যথেষ্ট পরিমাণে সৌর বিকিরণ আত্মসাৎ করে।

ধূলিঝড়ের সময় এবং ধূলিঝড়ের পরে আবহাওয়ায় জলীয় উপাদান সামান্যই থাকে। এই উপাদান পৃথিবীর আবহাওয়ার উপাদানের চেয়ে 2000 গুণ কম। ধূলিঝড়ের সময় এবং ধূলিঝড়ের পরে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়ার আর্দ্রতা খুব কমে যায়। এই ব্যাপারটা আকস্মিক কিনা অথবা এর সঙ্গে অন্য কিছুর যোগাযোগ আছে কিনা, বিজ্ঞানীরা তা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। মঙ্গলগ্রহে জলের অস্তিত্বের বিষয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

এই কথা সকলেরই জানা আছে যে, মঙ্গলগ্রহে তরল জলের অস্তিত্ব নেই। জল হয় জমে যায়,

নয় তো ফুটতে থাকে। তবু তুলনামূলকভাবে মঙ্গল গ্রহের সাম্প্রতিক জলহাওয়া অন্য রকম হতে পারে। এর চাপ এবং তাপ বেশী ছিল। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, জলহাওয়ার প্রকৃতিতে এই রকম বিরাট পরিবর্তন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা

আট বছর আগে 1964 সালের 31শে জুলাই আমেরিকার অ্যাপোলো নামে চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ সুরু হয়েছিল। 1972 সালের ডিসেম্বর মাসে তিনজন মহাকাশচারীসহ অ্যাপোলো-17 নামে মহাকাশযানটি চন্দ্রাভিমুখে প্রেরিত হবে এবং এই পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

তবে গ্রহান্তর যাত্রায় চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রস্তুতি চলেছে বহুকাল ধরে। এরই প্রস্তুতি হিসাবে প্রথমতঃ রেঞ্জার-7, এর পর 1965 সাল থেকে 1968 সালের মধ্যে রেঞ্জার-8 ও রেঞ্জার-9, পাঁচটি সার্ভেয়ার এবং পাঁচটি লুনার অরবিটার নামে যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী মহাকাশযান চন্দ্রলোকে প্রেরণ করা হয়। এই সকল উপগ্রহের সাহায্যে সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠের—এমন কি, চাঁদের যে দিক পৃথিবী থেকে দৃষ্টিগোচর হয় না, সে দিকেরও আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে সার্ভেয়ারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের মৃত্তিকা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে।

খুব কাছে থেকে তোলা চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রায় এক লক্ষ আলোকচিত্র এই সকল স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে এবং এই সকল আলোকচিত্রের ভিত্তিতেই মানুষের চন্দ্রপৃষ্ঠের অবতরণের স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

তারপরেই চলেছে, কি ধরণের মহাকাশযানে মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে যাত্রা করবেন, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাছাড়া এই সুদীর্ঘ যাত্রার জন্যে মহাকাশচারীদেরও তৈরি করবার কাজ চলে এবং তাদের নিয়ে চলে নানা রকমের পরীক্ষা।

প্রথমত: 1961 সালে একজন মানুষের জন্যে তৈরি মার্কারী মহাকাশযানে একজন মহাকাশচারীকে মহাশূন্যাভিমুখে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর কক্ষপথের অর্ধেক পরিক্রমা করেই তিনি ফিরে আসেন। 1962 ও '63 সালে পর পর চারবার ঐ যানেই মহাকাশচারীরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তারপর আসে দু-জন যাত্রীবাহী জেমিনি মহাকাশযানের পালা। 1965 থেকে 1966 সালের মধ্যে জেমিনি মহাকাশযানে মার্কিন মহাকাশচারীরা দশ বারেরও বেশী পৃথিবী পরিক্রমা করেন। জেমিনী মহাকাশযানই অ্যাপোলোযানের পথ রচনা করে।

1964 সালের অক্টোবর মাসে অ্যাপোলো-7 মহাকাশযানটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাত্রীসহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। মহাকাশচারীরা ঐ যানে পৃথিবী পরিক্রমায় 11 দিন কাটান। এর দু-মাস পরেই তিনজন যাত্রীসহ অ্যাপোলো-8-এর সাহায্যে মানুষ প্রথম চাঁদের খুব কাছে যায় এবং চাঁদের কক্ষপথে থেকে 10 বার চাঁদকে পরিক্রমা করে ফিরে আসে।

তারপর চান্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। 1969 সালের মার্চ মাসেই অ্যাপোলো-9-এর মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে থেকেই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঐ বছরেরই মে মাসে যাত্রীবাহী অ্যাপোলো-10 মহাকাশযানটিকে চন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করা হয়—চান্দ্রযানটি চন্দ্রপৃষ্ঠের খুবই কাছে আসে। এ ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের মহড়া।

এর দু-মাস পরে 1969 সালের জুলাই মাসে অ্যাপোলো-11-এর দু-জন মহাকাশচারী প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে প্রেরণ করা হয় অ্যাপোলো-12-কে। ঐ যাত্রায় পূর্বের তুলনায় মহাকাশচারীরা বেশ কিছু বেশী সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে অতিবাহিত করেন।

1970 সালে অ্যাপোলো-13 অভিযানে দুর্ঘটনা ঘটে, অক্সিজেন আধারে গোলযোগ দেখা দেয়, মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ না করেই পৃথিবীতে ফিরে আসেন।

1971 সালে অ্যাপোলো-14 ও অ্যাপোলো-15 পরিকল্পনা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। অ্যাপোলো-15-এর মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত মোটরগাড়ী নিয়ে যান। এবারেও অ্যাপোলো-16 অভিযানের মহাকাশচারী ইয়ং ও ডিউক এই ধরণের একটি লুনার রোভিং ভিহিকলে চড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে তথ্যাদি ও নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন।

16ই এপ্রিল (1972) অ্যাপোলো-16 তিনজন মহাকাশ অভিযাত্রীকে নিয়ে চন্দ্রাভিযান সুরু করে এবং অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হবার পর 27শে এপ্রিল পৃথিবীতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। 1972 সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যাপোলো-17 অভিযানের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রাভিযান পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটবে।

এর পরে পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাতায়াতের পথ সুগম করা ও পরিবহন সমস্যা সমাধান করাই হবে মার্কিন মহাকাশ পরিকল্পনার লক্ষ্য। মহাকাশে সুদীর্ঘকাল মানুষ থাকতে পারে কি না, সেই বিষয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে। কারণ গ্রহান্তরে যেতে হলে মহাশূন্যে দীর্ঘকাল থাকতে হবে—এই উদ্দেশ্যে মহাকাশে গবেষণাগার বা 'স্কাই ল্যাব' স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে—1973 সালে এটি চালু হবার কথা এবং 1978 সাল পর্যন্ত পৃথিবী থেকে মহাকাশে যাতায়াতের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলবার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নিউটন

প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনকে কোন সুনির্দিষ্ট ধারায় বিশ্লেষণ করা যায় না। প্রতিভা সব সময়েই অদ্ভুত, অনেকটা আপন খেয়ালের মধ্যেই এর জন্ম। সপ্তদশ শতকের নিউটনকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান-জগতে যে বিরাট প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছিল, তা যে কি পরিমাণে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও বৈপ্লবিক, আমরা বর্তমানে সে সব ধারণার সঙ্গে প্রথম থেকেই পরিচিত থাকায় তার অসাধারণত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো না।

Pascal, Galois এবং Hamilton প্রমুখ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মত নিউটন কিন্তু তাঁর বাল্যকাল থেকেই প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে প্রকাশিত হন নি। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ছিলেন লেখাপড়ায় কিছু পরিমাণে অলস প্রকৃতির ছাত্র। তাঁর বিশেষ সমাদর হতো বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে। কারণ তিনি তাদের নিত্য নতুন খেলার সামগ্রী উপহার দিতে পারতেন। তাছাড়া বাল্যাবস্থায় তাঁর

---

* বিজনারায়ণ মহাবিদ্যালয় ; ইটাচুনা, হুগলী

বিশেষ ঝোঁক ছিল—বায়ুর গতিবেগ নির্ণয়, বায়ু-চালিত যন্ত্র তৈরি, সূর্যঘড়ি ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এসব ঘটনা তাঁর প্রতিভার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ করেছিল কিনা, তা আমরা বলতে পারি না। যন্ত্রপাতির প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বরাবরই। স্কুল জীবনের শেষের দিকে বা কলেজ জীবনের প্রথম থেকেই নিউটনের জীবনে সবকিছু জানবার একটা প্রবল ইচ্ছা দেখা যেত। Euclid-এর জ্যামিতি তাঁর কাছে অত্যন্ত সহজ বোধ হতো, তিনি তা পাশে সরিয়ে রেখে Descarte-এর

সার আইজ্যাক নিউটন
জন্ম—25শে ডিসেম্বর, 1642
মৃত্যু—20শে মার্চ, 1727

মধ্যে মনের খোরাক খুঁজে পান এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে Descarte-এর জ্যামিতিক তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করেন। তাঁর জানবার ইচ্ছা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে—গণিতশাস্ত্র, আলোকতত্ত্ব, সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য কৌতূহল দৃষ্ট হয়।

নিউটনের একটি বিশেষ ধারণা ছিল যে, এই জগতে ঈশ্বর নানা গোপনীয় তত্ত্ব লুকিয়ে রেখেছেন। যে আগ্রহী, তার কাছেই সে সকল তত্ত্ব উদ্ভাসিত হবে। নিউটনের এরূপ ধারণার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই যে, তিনি নিজেই অনেকটা এই প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ আবিষ্কারই তিনি নিজে প্রকাশ করতে উৎসাহী ছিলেন না, বন্ধুদের বিশেষ চাপে পড়েই তিনি তা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। John Maynard Keynes বলেছেন—Newton parted with and published nothing except under the extreme pressure of friends। প্রসঙ্গত: Euclid সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। Euclid-ই জ্যামিতিকে প্রথম সুসংবদ্ধরূপে প্রকাশ করেন। যে জ্যামিতি আমরা স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত পড়ি, তার অধিকাংশই মূলত: Euclid-এর জ্যামিতি। Euclid-এর জ্যামিতি নিয়ে তিনি সারাদিন খাতা-পেনসিল নিয়ে কি সব লেখা ও আঁকাতে ব্যস্ত থাকতেন এবং সেই সব কাগজ তাঁর টেবিলের তলায় গুঁজে রাখতেন। অপরকে দেখা-বার বা প্রকাশ করবার জন্যে তিনি মোটেই আগ্রহ বোধ করতের না। এই আত্মমগ্নতা তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু এসব কিছুই তাঁকে বিচলিত করতো না। শোনা যায়, তাঁর ছেলেই সেই সব তত্ত্বসমম্বিত কাগজ-পত্র পরে যথাযথরূপে প্রকাশ করেছিলেন এবং তার ফলে গণিত-জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল।

1665 খৃষ্টাব্দে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়, নিউটন তখন চলে যান তাঁর জন্মস্থান উলসথরপে। নির্জনপ্রিয়তা নিউটনের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। 2-3 বছর জন্মস্থানে কাটিয়ে তিনি যখন ফিরে আসেন, বয়স তখন তাঁর 24 বছর। এই কয়েক বছরের মধ্যে

বিজ্ঞানের তিনটি বিভিন্ন দিকে তিনি তিনটি নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন। সাদা আলোকরশ্মির মধ্যে বিভিন্ন বর্ণবৈচিত্র্য (Nature of white light), পৃথিবীর উপরে ও বাইরে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের সূত্র ও তার ব্যাখ্যা (Universal gravitation and its consequences) এবং Differential and integral culculus প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। নিউটনের জীবনের এই 2-3 বছরের অধ্যায়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই বলেছেন—"All this was in the two plague years of 1665 and 1666, for in those days I was in the prime of my age for invention and minded mathematics and philosophy more than at any time since"। তাঁর আবিষ্কারসমূহ যে যুগান্তকারী, তা বোঝাতে গিয়ে E. N. Andrade বলেছেন—Einstein's innovations were less revolutionary to his time than Newton's were to his। আরও আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে নিউটন তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন, প্রকাশ করবার তাগিদ অনুভব করেন নি। বেশ কয়েক বছর বাদে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ Leibniz যখন প্রকাশ করেন যে, তিনি এক নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন। তখন নিউটনের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছিল বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাতেই প্রকাশিত হয় যে, নিউটনই সর্বপ্রথম সেই গাণিতিক প্রক্রিয়া (Differential and integral calculus) আবিষ্কার করেছেন। Hook এবং Halley নামে নিউটনের দুই বন্ধু ছিল। Hook-এর নামের সঙ্গে আমরা স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমেই পরিচিত। Hooks's law অধ্যয়ন করতে হয় বিজ্ঞানের ছাত্রদের। Halley ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি নানা দেশ ঘুরে দেখতেন এবং চেষ্টা করতেন যদি নতুন কিছু বিজ্ঞান-জগতে দেওয়া যায়। Halley-ই প্রথম নিউটনকে অভিকর্ষণজনিত সূত্রের আবিষ্কারকরূপে জগতের কাছে প্রকাশ করেন। Hook, Halley এবং তাঁদের আর এক বন্ধু—এই তিনজনে মিলে আলোচনা করছিলেন যে, কিভাবে সূর্যের চারদিকে গ্রহের গতির একটি যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাঁদের চিন্তার বিষয় ছিল, কি রকম বলের দ্বারা সূর্য গ্রহকে আকর্ষণ করলে গ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমা করতে সক্ষম হবে। Hooks বলেন—আমি এর উত্তর দেব। Wren তখন বলেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে পারলে আমি তোমাকে চল্লিশ শিলিং পুরস্কার দেব। যাহোক, Hooks-এর উত্তর সম্বন্ধে কোন ঘটনা জানা নেই, তবে এটা জানা গেছে, Halley একদিন বেড়াতে বেড়াতে নিউটনের কাছে গিয়ে তাদের উপরিউক্ত আলোচনার কথা প্রকাশ করায় নিউটন্ বলে ওঠেন—সূর্য ও গ্রহকে উভয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলের দ্বারা আকর্ষণ করলে গ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে পরিক্রম করবে। Halley অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে ওঠেন—তুমি কিভাবে এটা জানলে? নিউটন উত্তর দেন—কেন? আমি এটা অঙ্কের মাধ্যমে বের করেছি। Halley যখন তা দেখতে চাইলেন, নিউটন তখন বললেন তাঁর কাগজপত্রগুলির মধ্যে কোথাও সেটা আছে, কিছুদিন সময় পেলে তিনি তা পুনরায় করে দিতে পারেন। এমনি ভাবেই হঠাৎ তাঁর আবিষ্কারের কথা জানা গেছে। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ Principia লিখতে Halley তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিউটনের জীবনে উল্লেখযোগ্য নাম হলো Issac Borrow, যিনি নিউটনের প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি দেন। তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন নিউটনের মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোকতত্ত্ব সম্পর্কে

তিনিই নিউটনকে উৎসাহিত করেছিলেন। নিউটনের প্রতি তার বিশ্বাস ও প্রীতি এত গভীর ছিল যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অত্যন্ত সম্মানিত Lucasian chair-এর পদটি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন এবং নিউটন সেই পদে অধিষ্ঠিত হন।

নিউটনের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি জগতের কাছে হঠাৎ প্রকাশিত হলেও এগুলির কোনটিই নিউটন হঠাৎ আবিষ্কার করেন নি। প্রতিটি বিষয়েই তাঁকে গভীর চিন্তা করে তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। তাঁর একটা বিশেষ গুণ ছিল, কোন কিছু উপলক্ষ্য করে যদি কোন চিন্তা তাঁর মনে জাগতো, সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত তাঁর চিন্তাস্রোত শুদ্ধ হতো না। এই বিশেষ গুণই নিউটনকে নির্জনতাপ্রিয় করে তুলেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—I keep the subject of my enquiry constantly before me and wait till the first dawning opens gradually by little and little into a full and clear light। নিউটন ছিলেন প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ, তিনি তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বকে গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে প্রকাশ করতেন। যে প্রচলিত গল্প আমরা শুনে আসছি—আপেলের নিম্নগতি দেখে নিউটনের পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত বলের আবিষ্কারের কথা, সেই বিষয়ে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন—বাগানে বসে তিনি ভাবছিলেন কোন্ শক্তি বলে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এমন সময় আপেলটির নিম্নাভিমুখী গতি তাঁকে সচেতন করিয়ে দেয় যে, এই সেই বল, যা চাঁদকে পৃথিবীর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করতে সহায়তা করছে এবং দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এভাবেই তাঁর চিন্তার গতি এক সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। নিউটন সেই অভিকর্ষজনিত বলের গাণিতিক ব্যাখ্যা পরে দিয়েছেন।

জগতের ইতিহাসে নিউটনের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব খুব কমই হয় বলা চলে। উদাসীনতা, চিন্তার গভীরতা, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রভৃতি গুণ ছিল নিউটনের এবং মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন মহান। অগাধ পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও নিউটন বলেছিলেন—আমি এখনও জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বসে নুড়ি সংগ্রহ করছি, আমার সামনে রয়েছে অনাবিষ্কৃত সত্যের বিরাট সমুদ্র। নিউটনের মত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই কথা বলা যে কিরূপ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, তা বলে বোঝানো যায় না। মনে হয় শুধুমাত্র এই কয়টা কথাই তাঁর বৈজ্ঞানিক সকল আবিষ্কারকে ছাপিয়ে মানসিক রূপকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করছে।

কৃষি-সংবাদ

রাসায়নিক পদ্ধতিতে শোধিত চীনাবাদামের বীজ রোগ প্রতিরোধ করে

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, চীনাবাদামের বীজ পোঁতবার আগে অরগ্যানোমারকিউরিয়াল কমপাউণ্ড (Organomercurial compounds) দিয়ে শোধন করে নিলে চীনাবাদামের কলার রট (Collar rot) এবং সীড রট (Seed rot) রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এক রকম ছত্রাক মাটিতে জন্মাবার ফলে চীনাবাদামে এই রোগ হয়।

বীজ শোধনের জন্যে সেরেসান অথবা এগ্রোসান জি. এন. (Ceresan or Agrosan G. N.—প্রতি 400 ভাগ বীজের সঙ্গে এক ভাগ রাসায়নিক) অথবা শতকরা 75 ভাগ থিরাম (Thiram—প্রতি 250 ভাগ বীজের সঙ্গে শতকরা এক ভাগ রাসায়নিক) অথবা ক্যাপটন 1 : 300 ভাগ (1 : 300) অনুপাতে ব্যবহার করা উচিত।

পটাশ প্রয়োগে তামাকের ভাল ফলন

গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, হেক্টার প্রতি 150 থেকে 300 কেজি. পটাশ প্রয়োগে তামাকের গাছ ভালভাবে বেড়ে ওঠে আর পাতার মানও হয় উঁচু।

পটাশিয়াম সালফেটের মাধ্যমে পটাশ সমমাত্রায় দু-বার দিতে বলা হয়েছে। মোট পটাশের এক ভাগ গাছ পোঁতবার আগে আর বাকী ভাগ গাছের শিকড় শক্ত হবার পর।

তামাক চাষে পটাশ কম হলে গাছের পাতা কুঁচকে গিয়ে তার চারপাশ হলদে হয়ে যায়। ফলে তামাক পাতার মান হয় খুব নীচু স্তরের।

উচ্চ ফলনশীল জলদি জাতের রেড়ী

তামিলনাডুর কৃষি বিভাগের বিজ্ঞানীরা টি. এম. ভি. আই. জাতীয় রেড়ী থেকে আর. সি.-1377 নামের এক রকম নতুন জাতের জলদি রেড়ী উদ্ভাবন করেছেন।

এই জাতীয় রেড়ী প্রতিকূল আবহাওয়াতেও 75 থেকে 100 দিনের মধ্য হেক্টার প্রতি প্রায় 1,750 কেজি. ফলন দিতে সক্ষম। ধানকাটার পর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত এই রেড়ী চাষের পক্ষে উপযুক্ত সময়।

এই রেড়ীর বীজে শতকরা প্রায় 53 ভাগ তেল পাওয়া যায়। তাছাড়া সব রকম মাটি ও আবহাওয়াই এই আর. সি.-1377 রেড়ী চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

পোকামাকড়ের হাত থেকে আলু সংরক্ষণ

জমির মাটি অলড্রিন, ডাইঅলড্রিন অথবা ফোরেট গ্র্যানুয়েলস দিয়ে শোধন করে নিলে নিমাটোড অথবা কাটুই পোকা আলুর ক্ষতি করতে পারে না।

আলু বোনবার আগে জমির মাটিতে যদি শতকরা 5 ভাগ অলড্রিন গুঁড়া (Aldrin dust) হেক্টার প্রতি 25 কেজি. হারে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তবে কাটুই পোকা ধ্বংস করা সহজ হয়। আর প্রতি হেক্টারে যদি শতকরা 5 থেকে 10 ভাগ ডাইএলড্রিন গুঁড়া (Dieldrin) 25 থেকে 30 কেজি. অনুপাতে অথবা শতকরা 10 ভাগ ফোরেট গ্র্যানুয়েলস 62·5 কেজি হারে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে নিমাটোড বা অন্য জাতীয় পোকাও সহজে নষ্ট হয়।

[কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি-মন্ত্রণালয় (শাস্ত্রী-ভবন, নতুন দিল্লী) কর্তৃক প্রচারিত]

বিজ্ঞান-সংবাদ

ছুরির বদলে লেসার রশ্মি

আজকাল পাহাড় কাটাতে, খনি থেকে হীরা তুলতে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উন্নত করতে এবং আঙ্গুরগুচ্ছ কাটবার কাজে লেসার রশ্মি ব্যবহৃত হচ্ছে। চাঁদের দূরত্ব নিরূপণেও এই রশ্মি সাহায্য করে। বিখ্যাত সোভিয়েট বিজ্ঞানীদ্বয় আর. কেভেৎস্কি এবং এন. গামালেয়া এই কথা বলেছেন।

তাঁরা বলেছেন যে, দৃষ্টিসংক্রান্ত কোয়ান্টাম জেনারেটর সৃষ্টি হবার সময় থেকেই ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে লেসার রশ্মির ব্যবহার শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, এই রশ্মি বিশেষ কতকগুলি কাজে আশ্চর্য রকম ফলপ্রদ। সোভিয়েট চক্ষু-চিকিৎসকেরা ওডেসার ভি. পি. ফিলাতোভ ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য চক্ষু-চিকিৎসা কেন্দ্রে চোখের টিউমার নষ্ট করবার জন্যে এবং অন্যান্য চক্ষুরোগের চিকিৎসায় লেসার রশ্মি ব্যবহার করেন।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, লেসারের সাহায্যে টিউমার নষ্ট করা। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, লেসার রশ্মি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে টিউমারের কোষগুলিকে নষ্ট করা যায়। 1969 সালে লেসারের সাহায্যে চিকিৎসার জন্যে প্রথম কেন্দ্র রাশিয়ায় স্থাপিত হয়। এখানে জটিল এবং অন্যান্য সব রকমের টিউমারেরই চিকিৎসা করা হয়।

এই সময়ের মধ্যে 250 জনেরও বেশী রোগী এই কেন্দ্রে চিকিৎসিত হয়েছে এবং বিশেষ লেসার পদ্ধতিতে এই চিকিৎসা করা হয়েছে। এই বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসবার সময় হয় নি। তবে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এক ধরণের টিউমারের চিকিৎসায় লেসার পদ্ধতি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

লেসার রশ্মির জৈব কার্যকারিতা শুধু যে কোষের ক্ষেত্রেই সুফলপ্রদ তা নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সুফল প্রদান করে। এসব গবেষণার ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং দেহযন্ত্রের রূপান্তরসংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যাবে।

লেসার রশ্মি রুগ্ন কোষগুলিকে অক্ষত রাখে এবং ফলে রক্তপাত সবচেয়ে কম হয়। এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে। শল্য-চিকিৎসকেরা সেই দিনের স্বপ্ন দেখছেন, যেদিন রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার সম্ভব হবে।

হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ের নতুন পদ্ধতি

লাটভিয়ার স্বাস্থ্যনিবাস জারমালার ডাক্তারেরা হৃদ্‌রোগ নির্ণয় এবং হৃদ্‌রোগের চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। তার একটি হলো বায়োটেলিমেট্রি অর্থাৎ দূর থেকে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া, যেমন—মস্তিষ্ক, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের প্রাণপ্রবাহ প্রভৃতি রেকর্ড করা।

এই পদ্ধতিতে এক মাইল দূর থেকেও ডাক্তারেরা রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের উপর গভীরভাবেই লক্ষ্য রাখতে পারেন। রোগীর বুকের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরণের বস্তু বেঁধে দেওয়া হয়, তাতে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন লক্ষণ ধরা পড়ে। সেই সব তথ্য তারপর একটি সুবহ বেতার-প্রেরক যন্ত্রের বায়োঅ্যাম্পলিফায়ারে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বেতার যন্ত্রটি রোগী নিজেই বহন করেন। সেখান থেকে বেতার সংকেতগুলি

গবেষণাগারের বেতার কেন্দ্রে এসে পৌঁছয়। এভাবে রোগী এবং ডাক্তারের মধ্যে দু-মুখো যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়ে থাকে।

হাঁটা, দৌড়ানো এবং অন্যান্য প্রকারের কায়িক পরিশ্রমের সময় রোগীর অবস্থা কি দাঁড়ায়, এই নতুন পদ্ধতিতে ডাক্তারেরা তা আরো সঠিক-ভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

অসংখ্য গবেষণার ভেতর দিয়ে এই তথ্য জানা গেছে যে, হাঁটা, ছোটা প্রভৃতি কায়িক পরিশ্রম হৃৎপিণ্ডের পক্ষে উপকারী। অবশ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী এই সব কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কায়িক পরিশ্রম করলে সুরুতে অবশ্য হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, শেষের দিকে পরিশ্রম সত্ত্বেও সেই স্পন্দন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে আসে। একথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে, নির্দিষ্ট কায়িক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থাও চালিয়ে যেতে হবে।

বন্যায় বেঁচে থাকবার উপযোগী ধানগাছ উৎপাদনের উদ্যোগ

ম্যানিলার ইণ্টারন্যাশন্যাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে ডাঃ ববার্ট এফ স্যাণ্ডলারের তত্ত্বাবধানে এক বিশেষ ধরণের ধানগাছ উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে। এই সকল গাছ বন্যার জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, ডুবে যাবে না এবং এর ডাটা হবে খুবই শক্ত ও মজবুদ। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধক এবং প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্ম অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই জন্মাতে পারে এরকম সঙ্করজাতীয় খাদ্যশস্যের চারা উৎপাদনের চেষ্টাও তারা করছেন। খাদ্যসম্পদ বাড়াবার ব্যাপারে এই সকল গবেষণার ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ খুবই উপকৃত হবে। আমেরিকার বেসরকারী জনহিতকর সংস্থা ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থ-সাহায্যে এই গবেষণাগারের সকল কাজকর্ম সম্পন্ন হচ্ছে।

আবর্জনা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

কোন এক সময়ে হয়তো সূর্যরশ্মি অথবা পরমাণু থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। তবে সেটা অনেক দূরের কথা। তার আগে আমাদের হাতের কাছে যে সকল সহজ-লভ্য উপাদান রয়েছে, সেগুলি কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যেতে পারে। ময়লা ও আবর্জনাকে একাজে লাগানো যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়ায় কম্বাশ্চন পাওয়ার কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ময়লা ও আবর্জনাকে কাজে লাগানো সম্পর্কে গত চার বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। তারা আবর্জনাকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে গ্যাস টারবাইন চালাতে পেরেছেন এবং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করেছেন। বর্তমানে আবর্জনাকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি কারখানা তৈরি হচ্ছে। ঐ কারখানায় প্রতিদিন 40 টন আবর্জনা ব্যবহৃত হবে এবং তা থেকে উৎপন্ন হবে 1000 কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি। পুরাপুরি চালু হবে ঐ কার-খানায় প্রতিদিন 400 টন আবর্জনা থেকে 15000 কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা

সৌরমণ্ডলে আর একটি নতুন গ্রহের সন্ধান

গ্রাহাম কনরয় (বৃটিশ) নামে চৌদ্দ বছর বয়স্ক স্কুলের এই ছাত্রটি সৌরজগতের প্লুটো নামক গ্রহ থেকে অধিকতর দূরত্বে একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছে এবং গ্রহটির নাম দিয়েছে Poseidon। কিন্তু রেডিও-টেলিস্কোপ ও কম্পিউটারের সাহায্যে সঠিকভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সূর্য থেকে 7.179 মিলিয়ন মাইল দূরত্বে সৌরজগতে এরূপ একটি 10ম গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দিয়েছেন— 'Planet-X' এবং তাদের হিসাবমত গ্রহটি শনিগ্রহের চেয়ে তিন গুণ বড়। অত বড় হওয়া সত্ত্বেও ছায়াপথের তারকাগুলির ঔজ্জ্বল্যের দরুণ পৃথিবী থেকে সেটি প্রায়ই অদৃশ্য থেকে যায়।

মজার খেলা

নীচে পাঁচটি সারিতে কতকগুলি সংখ্যা দেওয়া আছে। তোমার কোন বন্ধুকে বলা হলো তার বয়স যত বছর, সেই সংখ্যাটি কোন্ কোন্ সারিতে আছে, তোমাকে বলবার জন্যে। ধরা যাক বন্ধুর বয়স 17 বছর। 17 সংখ্যাটি ক সারি এবং ঙ সারিতে আছে। বন্ধুটি তোমাকে সারিগুলি জানাতে তুমি ক সারির প্রথম সংখ্যা এবং ঙ সারির প্রথম সংখ্যা যোগ করে বন্ধুর বয়স বলে দেবে। 31 বছরের মধ্যে যে কোন বয়স এই সারিগুলি থেকে একই ভাবে বলে দেওয়া যাবে। (ধরা যাক 19। ক খ ও ঙ সারিতে সংখ্যাটি আছে ; সুতরাং $1+2+16=19$)।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
1	2	4	8	16
3	3	5	9	17
5	6	6	10	18
7	7	7	11	19
9	10	12	12	20
11	11	13	13	21
13	14	14	14	22
15	15	15	15	23
17	18	20	24	24
19	19	21	25	25
21	22	22	26	26
23	23	23	27	27
25	26	28	28	28
27	27	29	29	29
29	30	30	30	30
31	31	31	31	31

সংখ্যাগুলি বিশেষ ভাবে সাজাবার পদ্ধতি তোমরা নিজেরাই বের করতে পার। এর ব্যাখ্যা পরবর্তী কোন সংখ্যায় আলোচনা করবো। তবে ইতিমধ্যে তোমরা 1 থেকে 31 পর্যন্ত সংখ্যাকে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখে দেখ তো কোন নিয়ম বের করতে পার কিনা।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সৌরকলঙ্ক

আমাদের পৃথিবী থেকে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের সূর্যের সমগ্র দেহটাই 864,000 মাইল ব্যাসযুক্ত একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড—কোথাও বিন্দুমাত্র তরল বা কঠিন পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। তথাপি সূর্যদেহ কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন নয়। সূর্যের কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় 20,000,000 ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় 1,000,000,000 গুণ বেশী—ফলে গ্যাসীয় কণাগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, যে কোন গাঢ় তরল পদার্থও তার কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সাধারণভাবে সমগ্র সূর্যের গড় ঘনত্ব হলো জলের ঘনত্বের দেড়গুণ। সূর্যের ভর হলো 2×10^{27} টন বা 2×10^{33} গ্রাম অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী, (পৃথিবীর ভর = $6{\cdot}1 \times 10^{27}$ গ্রাম বা $6{\cdot}1 \times 10^{21}$ টন)। সূর্য-কেন্দ্র থেকে 700,000 কিঃ মিঃ উপরে অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বের 300 কিঃ মিঃ গভীরতাবিশিষ্ট অতি উজ্জ্বল স্তরকে বলে আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফিয়ার, যার কাজ হলো আলো ও তাপ সরবরাহ করা। ছয় হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার দৃশ্যমান এই পৃষ্ঠদেশের চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের এক-শ' ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব সূর্যের কেন্দ্রস্থলের সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের কি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া আলোকমণ্ডলের বাইরে আছে হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম ও হিলিয়াম দিয়ে গড়া বর্ণমণ্ডল বা ক্রোমোস্ফিয়ার—যা খালি চোখে দেখা যায় না। তবে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের চারধারে এই বর্ণমণ্ডলকে লাল চাকার মত দেখায়। এরও পরে, শেষ অংশ হলো বিশাল ছটামণ্ডল বা করোনা। খুব ক্ষীণ এর আলো, কিন্তু তাপমাত্রা অত্যধিক—বিজ্ঞানী এড্‌লেনের পরীক্ষা অনুসারে প্রায় 1,000,000 ডিগ্রী সেলসিয়াস। ছটামণ্ডলের ছটাগুলির বিন্যাস সূর্যের চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত—আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী পর্যন্ত; অর্থাৎ বলা যায় আমরা সূর্যের মধ্যেই ডুবে আছি। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ছটাগুলির বিন্যাস সব সময় এক রকম থাকে না। এই হলো সূর্যদেহের মোটামুটি গঠনশৈলী।

সৌরপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান হলো সৌরকলঙ্ক। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে (অর্থাৎ প্রায় 188 খৃঃ থেকে 1608 খৃঃ পর্যন্ত) চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বর্ষানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীতে সূর্যের সাদা দেহের উপর কালো কালো দাগ সৃষ্টির উল্লেখ আছে। 1371 খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার নিকোলোভস্কির ঘটনাপঞ্জীতে স্পষ্টভাবে সৌরকলঙ্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এরপর এলো দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা টেলিস্কোপ—সূর্যের কলঙ্ক পর্যবেক্ষণের পালা। টেলিস্কোপ প্রথম গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন—এটাই বেশীরভাগ লোকের ধারণা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলিওর আগে হান্স লিপারশে নামে

হল্যাণ্ডের এক চশমা-নির্মাতা 1608 সালে প্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের কথা শুনে বছর তিনেক পরে গ্যালিলিও উন্নত ধরণের দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র হলো দূরের জিনিষ অনুসন্ধান করবার প্রথম চাবিকাঠি। অবশ্য আজকাল
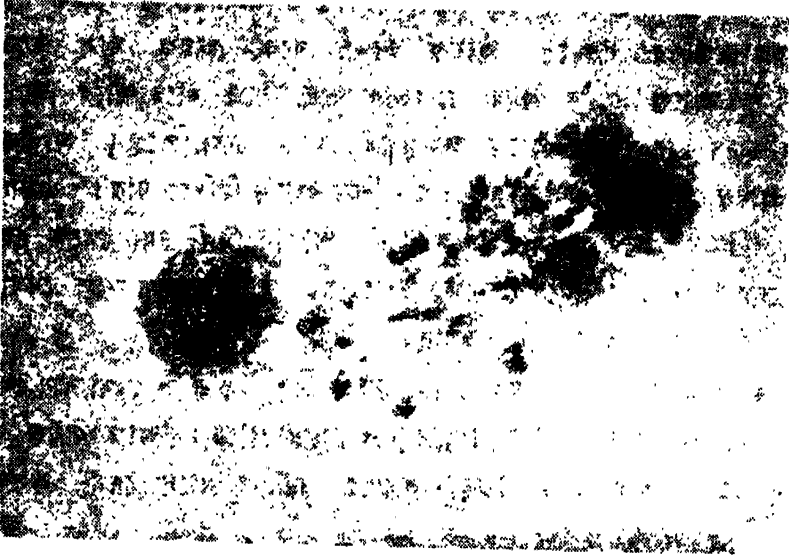
সৌরকলঙ্ক

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে, যার ফলে মানমন্দির বা কোন পরীক্ষাগারে বসে বহু দূরের গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে এই সকল উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে।

সূর্যদেহে সাদা আলোকমণ্ডলের গায়ে ছোট-বড় কালো কালো কলঙ্কগুলি হলো আসলে সৌরপৃষ্ঠের বিরাট বিরাট গহ্বর। সূর্যদেহে মাঝে মাঝে প্রবল ক্রিয়াশীল অঞ্চল সৃষ্টির দরুণ এই কলঙ্কগুলি দেখা দেয়। এদের তাপমাত্রা আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রার চেয়ে বেশ কিছুটা কম হলেও চৌম্বক শক্তি কিন্তু প্রচণ্ড। প্রত্যেকটি কলঙ্ক দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়—ভিতরের গভীর কালো অংশটি হলো প্রচ্ছায়া আর তার চারদিকে ঘেরা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল অংশটি হলো উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া সমগ্র কলঙ্কটির মাত্র এক পঞ্চমাংশ স্থান দখল করে—বাকী সবটুকু হলো উপচ্ছায়া। পৃথিবী থেকে দেখলে তাই মনে হয় যেন সূর্যের শরীরের উপর একটি গভীর ক্ষত, যার বাইরের অংশটি অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ।

সৌরকলঙ্কের পরিমাপ করা হয় তার সংখ্যা বা আয়তন দিয়ে। গত কয়েক শতাব্দী

ধরে প্রতিদিনের সৌরকলঙ্কের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করা হয়ে আসছে। 1840 খৃঃ বিজ্ঞানী স্বাবে দেখান যে, প্রায় এগারো বছর পর পর সৌরকলঙ্কের পরিমাপ বাড়ে বা কমে, যাকে বলা হয় সৌরচক্র। সূর্যদেহে কলঙ্কের পরিমাণ বাড়লে সূর্য অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও অশান্ত হয়ে ওঠে। ফলে সূর্য থেকে সব রকম বিকিরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। আর কলঙ্কের সংখ্যা কমলে ফল হয় ঠিক উল্টো অর্থাৎ সূর্যদেহ শান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

সৌরকলঙ্কগুলির পরমায়ু কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস হতে পারে। সৌরপৃষ্ঠের পূর্ব প্রান্তে এদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, পরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মধ্যরেখা অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্তে অবলুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। আবার কিছুদিন পরে পূর্ব প্রান্তে দেখা দেয় এবং একইভাবে পশ্চিম প্রান্তে মিলিয়ে যায়। এভাবে কয়েক-বার সূর্যকে পরিক্রমা করে। সৌরকলঙ্কের এই আপাত পরিক্রমা থেকে বোঝা যায়, সূর্যও আমাদের পৃথিবীর মত নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে। গবেষণার ফলে দেখা গেছে— এই ঘূর্ণনের বেগ প্রায় সাতাশ দিনে একবার।

সৌরকলঙ্কগুলির আকৃতি খুব ছোট থেকে এত বড় হতে দেখা যায় যে, একাধিক পৃথিবী তার মধ্য দিয়ে পাশাপাশি অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। আজ পর্যন্ত যত সৌর-কলঙ্ক দেখা গেছে, তার মধ্যে 1947 সালের এপ্রিল মাসে দেখা কলঙ্কটি হলো সবচেয়ে বড়।

সৌরকলঙ্ক দেখা দিলে তার প্রভাব আমাদের পৃথিবীতেও এসে পড়ে। যার ফলে কলঙ্ক বৃদ্ধির সময় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়নের সৃষ্টি হয় (Magnetic storm)। চৌম্বকীয় উপাদানগুলির বিচ্যুতি, বিনতি ও অনুভূমিক চৌম্বক প্রাবল্যের আকস্মিক ও প্রবল পরিবর্তনকে বলা হয় চৌম্বক ঝড়। এই পরিবর্তন একসঙ্গে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে নানা জায়গায় পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে রাশিয়ার এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, সৌরকলঙ্ক তথা সৌরবিকিরণ বৃদ্ধির সময় হৃদ্‌রোগে আক্রমণের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সৌরকলঙ্ক সৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বিজ্ঞানী ব্রুক্‌সের মতে, সৌরচক্রের চরম অবস্থায় সমগ্র পৃথিবীর তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায় এবং এরূপ অবস্থায় ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিপাতের আধিক্য ঘটে। কেন সৌরকলঙ্কের সৃষ্টি হয়—কেনই বা এগারো বছর পর্যায়ক্রমে সৌরকলঙ্কের পরিমাণ বাড়ে বা কমে—এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও অস্পষ্ট।

সূর্য এবং পৃথিবীর বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন—ফলে 1957-58 সালে 'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের' সৃষ্টি হয়েছিল—যখন সূর্য ছিল বিক্ষুব্ধ অর্থাৎ সৌরচক্রের চরম অবস্থায়। পরে 1963-64 সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বর্ষ'—সূর্য তখন একেবারে শান্ত—অর্থাৎ সৌরচক্রের অবম অবস্থা। এর পরে 1967-68 সালে কলঙ্কগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে

উঠেছে। বর্তমানে পুনরায় অধমের দিকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আবহমণ্ডলের বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহে ব্রতী। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সৌর-কলঙ্কসহ সৌরদেহের বিচিত্র সব রহস্যের অবগুণ্ঠন উম্মোচিত হবে।

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ; মেদিনীপুর

পারদর্শিতার পরীক্ষা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মে '72 সংখ্যায় তোমাদের দশগুণোত্তর পদ্ধতি ছাড়াও যে অন্যভাবে সংখ্যা গণনা করা যায়, তা বলা হয়েছে এবং দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতির যোগ, বিয়োগ ইত্যাদির সঙ্গে তোমরা পরিচিত হয়েছ। এবার পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি ও দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমে একটু আলোচনা করা যাক।

পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনা কেমন হবে, তা তোমরা অনুমান করতে পারছো নিশ্চয়ই।

পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে ক্রমিক সংখ্যা—0 1 2 3 4 10 11 12…

ঐ সংখ্যাগুলি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে—0 1 2 3 4 5 6 7…

দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সংখ্যা গণনায় 9-এর পরবর্তী সংখ্যাদ্বয়কে 10, 11 না বলে অন্য কোন চিহ্ন দিয়ে সূচিত করতে হবে, কারণ এই পদ্ধতিতে 10, 11 এই সংখ্যাদ্বয় দশগুণোত্তর পদ্ধতির 12, 13 সংখ্যা বোঝাবে। কাজেই আমরা লিখবো

দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি—1 2 3 4 5 6 7 8 9 দ এ 10

ঐ সংখ্যাগুলি দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে—1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

এবার প্রশ্নের পালা। তোমাদের মধ্যে যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নীচের পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, গণিতে তার পারদর্শিতা খুব বেশী বলতে হবে। ঐ সময়ের মধ্যে 4টি, 3টি বা 2টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে গণিতে পারদর্শিতা যথাক্রমে বেশী, একটু বেশী বা মাঝারি।

1. নীচে পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতির কয়েকটি যোগ এবং গুণ দেওয়া আছে। উত্তরগুলি আলাদাভাবে পাশেই দেওয়া আছে। সঠিক ক্রম অনুসারে উত্তরগুলি সাজাও।

(ক) 1+4= 14

(খ) 4+3= 13

(গ) 2×4= 12

(ঘ) 3×3= 10

(ঙ) 4×4= 31

2. দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 333, পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে সেই সংখ্যা হচ্ছে

(ক) 2313

(খ) 2133

(গ) 2331

3. পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 333, দশ গুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হচ্ছে

(ক) 91

(খ) 92

(গ) 93

4. দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতির কয়েকটি যোগ ও গুণ নীচে দেওয়া আছে। উত্তরগুলি আলাদাভাবে পাশেই লেখা আছে। সঠিক ক্রম অনুসারে সাজিয়ে দাও।

(ক) 5+6= 1দ

(খ) 9+9= 28

(গ) এ×2= 16

(ঘ) 4×8= এ

(ঙ) 5×7= 2এ

5. দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে যে সংখ্যা 334, দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতিতে তা হলো

(ক) 239

(খ) 23এ

(গ) 23দ

(উত্তর 373 নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ

উদ্ভিদ মাটি থেকে জল আর বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে সূর্যের আলোকে পাতার সবুজ কণার সাহায্যে পাতায় খাবার তৈরি করে। কিন্তু কয়েক জাতীয় বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ আছে, যেগুলি কীট-পতঙ্গ শিকার করে দেহপুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করে। কীট-পতঙ্গদের ফাঁদে বন্দী করে শিকারী উদ্ভিদেরা তাদের পরিপাক গ্রন্থি-নিঃসৃত জারক রসের সাহায্যে হজম করে তাথেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত কীট-পতঙ্গভুক উদ্ভিদ আছে, তাদের চারটি গোত্রে (Family) বিভক্ত করা যায়। যথা—

(1) সারাসেনিয়েসী (Sarraceniaceae), (2) নেপেনথেসী (Nepentheceae), (3) ড্রোসেরেসী (Droseraceae) এবং (4) লেনটিবুলারিয়েসী (Lentibulariaceae)।

সারাসেনিয়েসী—এই গোত্রের সারাসেনিয়া নামক উদ্ভিদটি কীট-পতঙ্গভুক্ হিসাবে উল্লেখযোগ্য। উত্তর আমেরিকা, বৃটিশ গায়েনা ইত্যাদি জায়গায় এরা জন্মায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এদের পাওয়া যায় না।

কীট-পতঙ্গ ধরবার জন্যে এদের পাতা বিশেষভাবে তৈরি হয়। পাতাগুলি গুচ্ছাকারে থাকে এবং কতকটা ঘটির মত হয়। ঘটির উপরিভাগ উজ্জ্বল বর্ণের হয় এবং মুখের কাছে মধু (Nectar) থাকে, যার ফলে পতঙ্গেরা আকৃষ্ট হয়। ঘটির

সারাসেনিয়া

গলার মধ্যে নিম্নাভিমুখী কতকগুলি রোম থাকে। সুতরাং ছোট ছোট পোকামাকড় ভিতরে ঢুকে পড়লে আর বেরুতে পারে না। ঘটির মধ্যে এক ধরণের রস সঞ্চিত হয়। এই রসে প্রোটিন হজম করবার এনজাইম থাকে। উদ্ভিদগুলি এই এনজাইমের সাহায্যে ঘটির ভিতরে বন্দী পোকা-মাকড়ের দেহ হজম করে।

নেপেনথেসী—এই গোত্রের উদ্ভিদগুলি কলস-উদ্ভিদ নামে খ্যাত। এদের একটি মাত্র গণ (Genus) আছে, যেমন—নেপেনথেস (Nepenthes)। ভারতের একমাত্র আসামে খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এদের পাওয়া যায়। এরা গুল্ম, আরোহী অথবা পরাশ্রয়ী হতে পারে। বৃন্তের খানিকটা অংশ চ্যাপ্টা হয়ে পাতার কাজ করে এবং খানিকটা অংশ আকর্ষের কাজ করে। আর ফলকটি কলসে পরিবর্তিত হয়। এই কলসের মুখে একটি ঢাক্‌না থাকে, কিন্তু এই ঢাক্‌না খোলা অথবা বন্ধ করা যায় না।
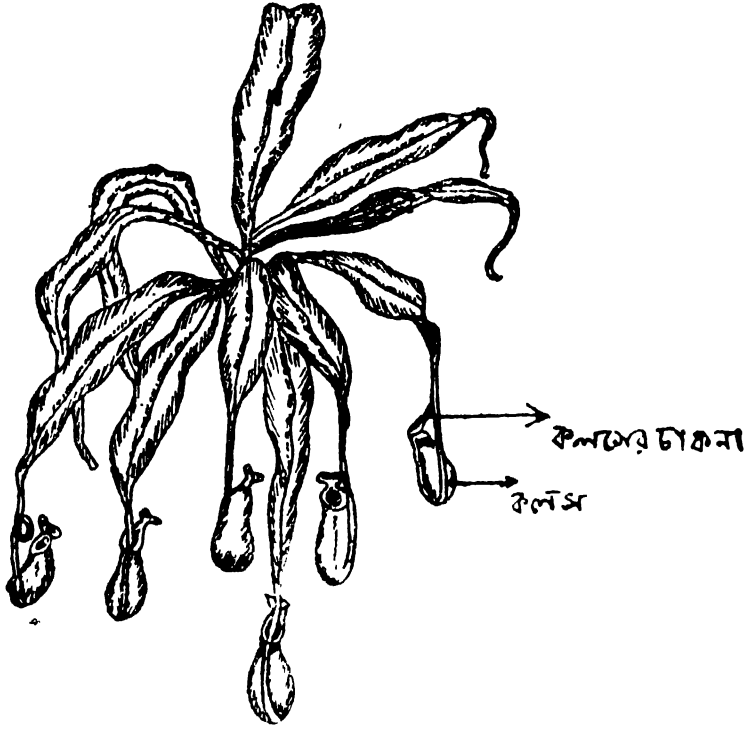
কলস উদ্ভিদ

কলসের ভিতরের দেয়াল অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং এতে প্রোটিন পরিপাক করবার এনজাইম ক্ষরিত হয়। কীট-পতঙ্গ কলসের পিচ্ছিল এবং বক্র দেয়ালের জন্যে ভিতরে পড়ে আঠালো রসে আটকে যায়। পরে একই ভাবে এরা শিকারকে পরিপাক করে। এই কলসগুলির মধ্যে অনেক সময় মৃত পোকা-মাকড় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ড্রোসেরেসী—এই গোত্রে কতকগুলি গণ আছে। এগুলি পতঙ্গ ধরবার ব্যাপারে সুদক্ষ; যেমন—ড্রোসেরা (Drosera), ডায়োনিয়া (Dionoea), অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা (Aldrovanda), পিঙ্গুইকিউলা (Pinguicula) ইত্যাদি।

ড্রোসেরা—আমাদের দেশে এগুলিকে সূর্যশিশির বলা হয়। এরা সাধারণতঃ শুষ্ক স্থানে জন্মায়। শীতের সময় ধানক্ষেত এবং তার আশেপাশে এগুলিকে দেখা যায়।

এদের আকার ক্ষুদ্র গুল্মের মত। পাতাগুলি গুচ্ছাকার এবং লাল্‌চে রঙের। পাতাগুলি গোলাকার এবং উপরের দিকে প্রচুর গ্রন্থিরোম থাকে। এই গ্রন্থিরোমকে কর্ষিকা বলে। এই কর্ষিকা থেকে এক ধরণের আঠালো রস নিঃসৃত হয়। এই আঠালো রসের উপর সূর্যের আলো পড়ে শিশির বিন্দুর মত ঝক্‌ঝক করে। এই জন্তেই

সূর্যশিশির

এই উদ্ভিদগুলির নাম সূর্যশিশির। এই উজ্জল জলীয় পদার্থে আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় কর্ষিকার উপরে এসে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ষিকাগুলি গুটিয়ে গিয়ে পতঙ্গগুলিকে ধরে ফেলে। আঠালো রসের মধ্যে প্রোটিন পরিপাক করবার এনজাইম থাকে এবং এই ভাবে এরা পতঙ্গের দেহ থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

ডায়োনিয়া—ইংরেজীতে এদের বলে ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ (Venus flytrap)। আমাদের দেশে এদের পাওয়া যায় না। এরা জন্মায় উত্তর আমেরিকায়।

ডায়োনিয়ার পাতাগুলিও গুচ্ছাকারে থাকে। বৃন্তগুলি পক্ষল হয়। পাতার আগার দিকে মাঝখানে একটি খাঁজ থাকে এবং কিনারায় খোঁচা খোঁচা রোম থাকে। যখনই কোন পোকা এসে পাতার আগার দিকে বসে, তখনই পাতার দুইদিক মুড়ে যায় এবং শক্ত রোমগুলি দাঁতে দাঁতে বসে যায় ঠিক ইঁদুর-ধরা কলের মত। এই রোমগুলির মূলে এক ধরণের গ্রন্থি থাকে। যখনই কোন কিছু ধরা পড়ে, তখনই গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে অন্যান্য পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদের মতই শিকারকে পরিপাক করে ফেলে।

অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা—এগুলিকে সাধারণতঃ মালাকা ঝাঁঝি বলা হয়। আমাদের দেশের

পুকুর, খাল ও ডোবায় জলজ উদ্ভিদ হিসাবে এগুলিকে পাওয়া যায়। এরা মূলহীন উদ্ভিদ। এদের পাতাগুলি কতকটা ক্ষুদ্রকায় ডায়োনিয়া পাতার মত। বৃন্তগুলি অল্প পক্ষল হয়
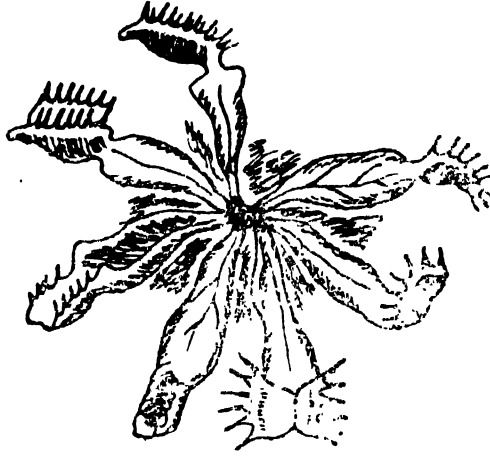
ডায়োনিয়া

এবং কিনারায় ছোট ছোট শক্ত রোম থাকে। পাতার আগার দিকটা গোলাকার, মাঝের অংশ খাঁজকাটা এবং কিনারা দন্তুর (Dentate) হয়। যখনই কোন পতঙ্গ এসে

অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা
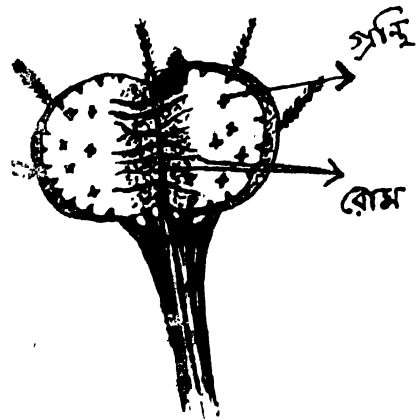
অ্যালড্রোভ্যাণ্ডা পাতার অগ্রভাগ বড় করে দেখানো হয়েছে

পাতার আগার দিকে বসে, তখনই পাতাটি দু-দিক থেকে মুড়ে যায় এবং পতঙ্গটি ধরা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত পতঙ্গটি পরিপাক না হয়, ততক্ষণ পাতাটি মুড়ে থাকে।

পিঙ্গুইকিউলা—ইংরেজীতে একে বাটার ওয়ার্ট (Butter Wort) বলে। এদের সাধারণতঃ ইউরোপে পাওয়া যায়। এই জাতের একটি মাত্র গাছ হিমালয়ে 11000 থেকে 13000 ফুট উপরে জন্মাতে দেখা যায়। এরা সূর্যশিশিরের মত ক্ষুদ্রকায় হয়। পাতাগুলি সূর্যশিশিরের মত গুচ্ছাকার কিন্তু বৃন্ত এবং কর্ষিকা থাকে না। পাতার
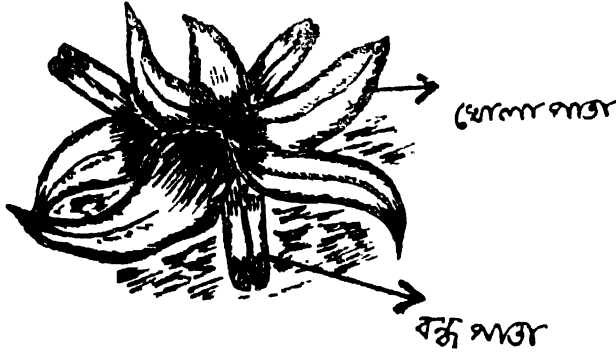
পিঙ্গুইকিউলা

উপরে দুই প্রকারের রোম জন্মায়। একটি সবৃন্তক আর একটি অবৃন্তক। সবৃন্তক রোম থেকে এক রকম আঠালো রস এবং অবৃন্তক রোম এক ধরণের এন্‌জাইম নিঃসৃত হয়। যখনই কোন পতঙ্গ উড়ে এসে পাতার উপরে বসে, তখনই তারা আঠালো রসে জড়িয়ে যায় আর পাতাটির দু-প্রান্ত মুড়ে গিয়ে পোকাটিকে ধরে ফেলে দেহসাৎ করে।

লেনটিবিউলারিয়েসী—এই গোত্রের একটি গাছ কীট-পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ হিসাবে
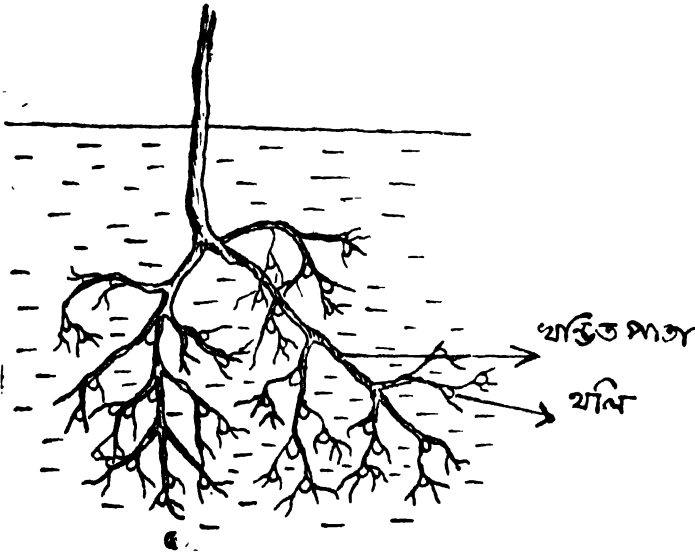
ইউট্রিকিউলারিয়া

উল্লেখযোগ্য, যথা:—ইউট্রিকিউলারিয়া (Utricularia)। ইংরেজীতে এদের 'ব্লাডার

ওয়ার্ট' (Bladder Wort) বলা হয়। এগুলি আমাদের দেশে খানা, ডোবা, পুকুর, ইত্যাদি জায়গায় জন্মায়। এরাও এক ধরণের ঝাঁঝি। এরা মালাকা ঝাঁঝির মত জলের উপরে ভাসে। এগুলি মূলহীন উদ্ভিদ। এদের পাতাগুলি জলের নীচে এত বেশী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকে যে, মূলের মত মনে হয়। প্রচুর পাতা থলিতে রূপান্তরিত হয়। থলিগুলির ভিতরের দেয়ালে কিছু পরিপাক গ্রন্থি থাকে। থলিতে একটি ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রের মুখে একটি কপাটিকা (Valve) থাকে। একে বাইরে থেকে
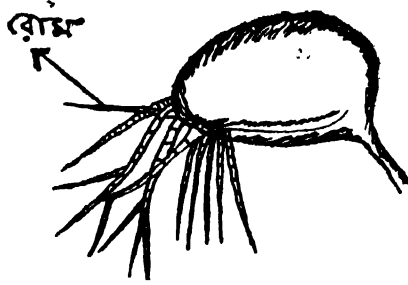
ইউট্রিকিউলারিয়ার একটি থলিকে বড় করে দেখানো হয়েছে

খোলা যায়, কিন্তু ভিতর থেকে খোলা যায় না। শাখান্বিত রোম অথবা শক্ত রোম ছিদ্রটির চারপাশে এবং কপাটিকার উপরে ও পরে থাকে। ক্ষুদ্র কোন জলজ পোকা কপাটিকার উপরের রোমগুলি ঠেললে কপাটিকাটি খুলে যায়। পোকাটি তখন থলির ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু জলও ওর মধ্যে ঢুকে যায়। ভিতরের ওই জলের চাপে কপাটিকাটি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে পোকাটি আর বেরোতে পারে না। তখন উদ্ভিদটি আস্তে আস্তে গ্রন্থি-রসের সাহায্যে শিকারকে পরিপাক করে।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের তুলনায় মানুষের জ্ঞান অতি সামান্য। বিচিত্র ধরণের অসংখ্য উদ্ভিদ মানুষ আবিষ্কার করেছে, আবার অনাবিষ্কৃতও রয়েছে উদ্ভিদ ও রয়েছে প্রচুর। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বিচিত্র ধরণের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ আবিষ্কৃত হবে।

গোপালচন্দ্র দাস*

* উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ; রামপুরহাট, বীরভূম

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) 10
   (খ) 12
   (গ) 13
   (ঘ) 14
   (ঙ) 31

[

	দশগুণোত্তর পদ্ধতি	পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতি
$1+4=$	5	10
$4+3=$	7	$12\ (=1\times5^1+2\times5^\circ)$
$2\times4=$	8	$13\ (=1\times5^1+3\times5^\circ)$
$3\times3=$	9	$14\ (=1\times5^1+4\times5^\circ)$
$4\times4=$	16	$31\ (=3\times5^1+1\times5^\circ)$]

2. 2313

[দশগুণোত্তর পদ্ধতিতে 333

$= 2\times5^3+3\times5^2+1\times5^1+3\times5^\circ$

$\equiv$ 2313 (পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে)

অথবা গত মাসে প্রদত্ত অন্য পদ্ধতি অনুসারে

$$\begin{array}{r|l} 5 & 333 \\ \hline 5 & 66-3 \\ \hline 5 & 13-1 \\ \hline 5 & 2-3 \\ \hline & 0-2 \end{array}$$

$\therefore$ $333\equiv2313$ (পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতিতে)

3. 93

[পঞ্চগুণোত্তর পদ্ধতির সংখ্যা

$333\equiv3\times5^2+3\times5^1+3\times5^0$

$=75+15+3$

$=93$]

4. (ক) এ
   (খ) 16
   (গ) 1দ
   (ঘ) 28
   (ঙ) 2এ

[	দশগুণোত্তর পদ্ধতি	দ্বাদশগুণোত্তর পদ্ধতি
5+6=	11	এ
9+9=	18	16($=1\times12^1+6\times12^0$)
এ×2=	22	1দ($=1\times12^1+10\times12^0$)
4×8=	32	28($=2\times12^1+8\times12^0$)
5×7=	35	2এ($=2\times12^1+11\times12^0$)]

5. 23দ

[দশগুণোত্তর পদ্ধতির 334

$=2\times12^2+3\times12^1+10\times12^0$

$\equiv$23দ]

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. ভাত ও রুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক পুষ্টিকর ?

সন্দীপ গুপ্ত, সুদীপ্ত সরকার (বীরভূম)

প্রশ্ন 2. উদ্ভিদের খাদ্য ও পরিপাকক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

দীপ্তি আচার্য, কলিকাতা-34

উত্তর 1. আমাদের অনেকেরই ধারণা, ভাত অপেক্ষা রুটি অধিক পুষ্টিকর। কিন্তু তুলনামূলকভাবে চাল ও গমের উপাদানের বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে, চাল গম অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। আমরা যে পদ্ধতিতে ভাত রান্না করি, তাতে চালের পুষ্টিকর উপাদানগুলির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। ঢেঁকিছাটা চাল কলেছাটা চাল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। চাল ও গম মূলতঃ শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য, যা আমাদের শরীর গঠনে অপরিহার্য। এই শ্বেতসার গমের তুলনায় চালেই বেশী থাকে। শ্বেতসার ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, লৌহ ইত্যাদি ধাতব পদার্থ দুটিতেই প্রায় সমান পরিমাণে পাওয়া যায়। গমে প্রোটিনের পরিমাণ চাল অপেক্ষা বেশী। কিন্তু চালের প্রোটিন গমের প্রোটিনের তুলনায় সহজে হজম হয়। কাজেই প্রোটিনের পরিমাণে পার্থক্য থাকলেও পুষ্টির দিক থেকে উভয়েই সমান।

শ্বেতসার বাদে চাল বা গমে অন্যান্য উপাদানগুলি থাকে ঠিক খোসার নীচে। গমের আটায় এই উপাদানগুলি খোসার সঙ্গে অধিকাংশই বাদ পড়ে যায়। কিন্তু সিদ্ধ-চালে এই উপাদানগুলি খোসা থেকে চালের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে চালে পুষ্টিকর

উপাদানগুলির অধিকাংশই বজায় থাকে। ভাতের ফেনের সঙ্গে কিছু পুষ্টিকর অংশ বেরিয়ে আসে। একারণে ফেন না ফেলে ভাত রান্নার অভ্যাস করা দরকার।

উত্তর 2. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব প্রাণীই তাদের জীবনধারণের জন্যে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদেরা তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করে মাটি ও বায়ুমণ্ডল থেকে এবং নিজ দেহের অভ্যন্তরেই এই রাসায়নিক উপাদানগুলিকে তাদের খাদ্যোপযোগী করে তোলে। উদ্ভিদের খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মৌলিক পদার্থগুলি হচ্ছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম, পটাশিয়াম ও লোহা ইত্যাদি। এদের মধ্যে উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য পদার্থগুলি পায় মাটি থেকে।

উদ্ভিদের যে কোন অংশেই কম বা বেশী পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন পাওয়া যায়। উদ্ভিদকোষে এগুলি অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে। এই অদ্রবণীয় পদার্থগুলি আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদদেহের এক অংশ থেকে অপর অংশে সঞ্চালিত হয়। দ্রবণীয় অবস্থায় এগুলি সহজেই উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে লাগে। উদ্ভিদের খাদ্যগুলি বিশ্লিষ্ট হবার কাজে বিভিন্ন প্রকার কোষনিঃসৃত এনজাইম বিভিন্ন পর্যায়ে অনুঘটকের কাজ করে। প্রাণীদেহে খাদ্যবস্তুর পরিপাকক্রিয়া শরীরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংঘটিত হয়, কিন্তু উদ্ভিদদেহে পরিপাকক্রিয়া যে কোন স্থানে সংঘটিত হতে পারে।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

শোক-সংবাদ

পরলোকে অনিলকুমার ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের রীডার ডক্টর অনিলকুমার ভট্টাচার্য গত 6ই মে তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য 1944 সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে রসায়নশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 1946 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি বিজ্ঞান কলেজে ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে উদ্ভিজ্জ রসায়ন বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং সেই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। উদ্ভিজ্জ রসায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণার জন্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1954 সালে প্রেমচাঁদ

রায়চাঁদ বৃত্তি এবং 1956 ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

1956 সালে ডক্টর ভট্টাচার্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. আর. গোল্ডফার্বের অধীনে গবেষণা করেন। তিনি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সেখানে র‍্যাগ-উইডের পরাগবাহিত 'হে-ফিবার'-এর অধিবিষের সূত্র আবিষ্ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে এই ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ডক্টর ভট্টাচার্য কর্কট রোগ সম্পর্কেও সেখানে গবেষণা করেন।

1959 সালে স্বদেশে ফিরে এসে ডক্টর ভটাচার্য সুরেন্দ্রনাথ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন এবং 1963 সালে তিনি জৈব রসায়ন বিভাগের রীডার নিযুক্ত হন। তিনি এই বিভাগে একটি দক্ষ গবেষক ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলেন, যাঁরা তাঁর অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্রকতিজ উপাদান টার্পিন, কুমারিন, উপক্ষার ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর 25টিরও বেশী মৌলিক গবেষণা-পত্র স্বদেশে ও বিদেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সদালাপী, সহৃদয় এবং অমায়িক। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রীতি-মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র 49 বছর এবং তিনি তাঁর স্ত্রী বেথুন কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর অনিমা ভট্টাচার্য ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

চিঠিপত্রের বিভাগ : একটি বিজ্ঞপ্তি

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়-করণ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকায় একটি 'চিঠিপত্রের বিভাগ' খুলিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে চিঠি আহ্বান করা হইতেছে। প্রতিটি চিঠির একটি উপযোগী শিরোনাম দেওয়া প্রয়োজন এবং চিঠির আয়তন মোটামুটিভাবে 400 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। চিঠির প্রকাশ এবং আবশ্যকবোধে উহার অল্পবিস্তর পরিবর্তন সম্বন্ধে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অভিমতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

চিঠিপত্র পাঠাইবার ঠিকানা—প্রধান সম্পাদক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | জুলাই, 1972 | সপ্তম সংখ্যা

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় একটি সার্বিক বিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়নের প্রস্তাব সম্প্রতি বিবেচিত হচ্ছে। বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টা অবশ্য নতুন নয়; বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রচারের সঙ্গে এটা, বলা বাহুল্য, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রায় দেড়শো বছর আগে যখন বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের বই ও পত্রিকাদির প্রকাশ সুরু হয়, তখন থেকেই কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দের প্রচলন হতে থাকে। সুপরিকল্পিতভাবে পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে; 'চলন্তিকা', 'বিজ্ঞান ভারতী' ইত্যাদি গ্রন্থেও পারিভাষিক শব্দের তালিকা সংযোজিত আছে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে পরিভাষা রচনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 'গবেষণা' ও 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা' পত্রিকা প্রভৃতি কয়েকটি বেসরকারী সংস্থাও পরিভাষা প্রণয়নে উদ্যোগী আছেন। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন বোর্ড গত 6/7 বছরে ভূগোল, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি পরিভাষা-কোষ প্রকাশ করেছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চা, বিশেষতঃ উচ্চ মানের বিজ্ঞানশিক্ষার

জন্যে প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দের এখনো প্রভূত অভাব রয়েছে। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করায় বিজ্ঞানের পাঠ অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে ওঠে।

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরগুলিতে পঠন-পাঠন প্রবর্তন করা হবে বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিছু দিন আগে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আমরা আশা করি, পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই এই ধারা অনুসৃত হবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা করা হচ্ছে। আবার বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার তো অবশ্য-কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ পরিভাষা প্রণয়নের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই পরিভাষায় একদিকে যেমন বহু বিদেশী পারিভাষিক শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ চয়ন করা বা গঠন করার সম্ভাবনা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাছাই বেশ কিছু বহুল-প্রচলিত বিদেশী শব্দকেই বাংলা শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।)

গত 12ই জুন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইয়ুসুফ আলি যখন কলকাতায় মহাকরণে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বৈঠকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ, কয়েকটি শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রকাশনা-সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলা ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে মিলিত হন, তখন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় একটি সার্বিক ও বিশদ বিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষা প্রণয়ন করবার ব্যবস্থা করা হোক। পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের অধিবাসীদের মাতৃভাষা যখন একই, তখন বিজ্ঞানের একটি পরিভাষাই উভয় দেশে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা স্বীকার করে এটি গ্রহণে সম্পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমরা আশা করবো, পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় শীঘ্রই এমন একটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে, যাতে উভয় দেশের বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ বাংলা পরিভাষা প্রণয়নের কাজটি অদূর ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

জয়ন্ত বসু

জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও বাংলা সাহিত্য

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার আগে পর্যন্ত বিদেশের কাছে ভারত প্রধানতঃ ধর্মকর্ম ও দর্শনচর্চার দেশরূপেই পরিচিত ছিল। যদিও আচার্য জগদীশচন্দ্রের বহু আগেও ভারতবর্ষে বহু প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে এবং আজও বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে কয়েকজন ভারতসন্তান উচ্চাসন লাভ করেছেন, তথাপি আজকের দিনেও বহির্জগৎ ভারতের কাছে বিজ্ঞানবার্তা অপেক্ষা ধর্মের বাণী শোনবার প্রত্যাশা বেশী করে। একজন সাধারণ ভারতীয়ের বৈজ্ঞানিক ধারণা দূরে থাক, বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী পর্যন্ত নেই। আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে কোন বস্তুকে বিচার করতে শিখি নি। এই স্বভাব আমাদের শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও পঙ্গু করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ সে জন্যে বলেছেন, "বড়ো অরণ্যে গাছ-তলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই ঝরে ঝরে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"[1]

দর্শন ও অধ্যাত্মবিদ্যার দেশ বলে ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানচর্চার রেওয়াজ ছিল না, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বজ্ঞান ও আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও বিজ্ঞানের আলোচনা যথেষ্ট পাওয়া যায়। তারপর দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ধারা দীর্ঘদিন রুদ্ধ ছিল। জাতীয় জীবনে যে সর্বগ্রাসী অবক্ষয় আমাদের গ্রাস করেছিল, এটা তারই একটা লক্ষণ। এদেশে ইংরেজ আগমনের পর ইংরেজ শাসকদের হাতেই ভারতবাসীর বিজ্ঞান শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। এর পিছনে ছিল রাজা রামমোহনের মত আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর মনীষীদের প্রচেষ্টা। 1813 সালের চার্টারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথম এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে, তখন রাজা রামমোহন প্রমুখ দেশীয় মনীষীরা সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থন করেন। দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার এই সুরু। সে সব ইতিহাসের অনেক কিছুই আজ অদ্ভুত শোনাবে। প্রথমতঃ অদ্ভুত হচ্ছে, তখনকার বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিদেশীয়দের অভিমত। ভারতবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে, একথা স্থির হবার পর তার মাধ্যম কি হবে, স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠলো। 1835 সালে মেকলে বাংলাসহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার দাবী উপেক্ষা করে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। মেকলের মতে, এই সকল ভারতীয় ভাষা "Contain neither literary nor scientific information, and are moreover, so poor and crude that until they are enriched from some other quarter it will not be easy to translate any valuable work in them."[2] তখনকার

1. ভূমিকা, 'বিশ্বপরিচয়'।

2. দ্রষ্টব্য সাহিত্য সংখ্যা—দেশ, 1971—পৃঃ 133

বাংলা ভাষার অবস্থা অবশ্য সত্যই খুব একটা উন্নত ছিল না। কিন্তু আজ আর সে দিন নেই। বর্তমান ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে অন্ততঃ বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থা মেকলের পূর্বোক্ত অভিমতের সঙ্গে মিলবে না। বাংলা ভাষা আজ তার সাহিত্যসমৃদ্ধি আর প্রসাদগুণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে স্বীকৃত। আজকের যুগে আমরা বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি যে, এই ভাষায় সুষ্ঠু বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব। আজ আমরা এই কথাও বলতে পারি যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য আজ শতাধিক বছরের প্রাচীন। আরও অনেক বিষয়ের মত এই ব্যাপারেও পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন। 1821 থেকে 1824 সালের বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর পরিচালিত বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদ কৌমুদীতে 'শব্দতত্ত্বে প্রতিধ্বনি', 'চুম্বকের ধর্ম', 'বেলুনের বিবরণ' ইত্যাদি নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নিবন্ধ রচনা করেছেন। 1840 সালে তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে নিয়মিতভাবে এই কাজ সুরু করেন প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষয়কুমার দত্ত। আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, অক্ষয়কুমারের বাংলায় বিজ্ঞানবিষয়ক রচনায় ব্রতী হবার পিছনের কারণটা। অক্ষয়কুমার আশঙ্কা করেছিলেন—ইংরেজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর ইংরেজের ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রভাব পড়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো ভারতবাসীর আত্মপরিচয় দেবার মত নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি বলে কিছুই থাকবে না। সে জন্যে ভারতীয়দের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যেই তিনি সব কাজে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তারপর বহু যুগ কেটে গেছে—দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক অক্ষয়কুমারের পর বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ প্রমুখ লেখকেরা বাংলায় ' বিজ্ঞান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। অক্ষয়কুমারের আশঙ্কাও আজ অমূলক, তাঁর মতের সঙ্গেও বোধ হয় আজ কারও মত মিলবে না। আজ যুগের প্রয়োজনেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সুরু হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক স্থাপিত ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দেশীয় পদ্ধতিতে বিজ্ঞানচর্চার কাজ করেছে। বর্তমানে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং আরও কোন কোন গোষ্ঠী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও অধ্যাপক কুদরৎ-ই-খুদা প্রমুখ বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে বিজ্ঞান শিক্ষা বাঞ্ছনীয়, এই কথা রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল প্রমুখ বহু মনীষীই স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগে সেটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। এখনকার যুগে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রিয় করেও তুলতে হবে। তা না হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের স্বভাবগত হবে না। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, বিজ্ঞানকে প্রিয় করতে হলে তার ভাষাকে সাহিত্যরসে অভিসিঞ্চিত করতে হবে, নচেৎ তা কারোর হৃদয়গ্রাহী হবে না। ইংরেজী বা অন্য ভাষার বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার হুবহু অনুবাদ করলেই চলবে না—সে ক্ষেত্রে হয়তো তা বোধগম্য হবে, কিন্তু আকর্ষণীয় হবে না। বিজ্ঞানের আবেদন আজ পাঠকের মস্তিষ্কের কাছেই শুধু নয়, তার হৃদয়ের কাছেও পৌঁছে দিতে হবে। এই আবেদনের জন্যেই 'জনপ্রিয় বিজ্ঞানের ভাষাকে আকর্ষণীয় সাহিত্যরসপুষ্ট করতে হবে।

অথচ আজ যে সব প্রতিষ্ঠান বা পত্রিকা-গোষ্ঠী বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার ব্রত নিয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ এই কথাটা বুঝতে চান না।

তাঁরা বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সাহিত্যধর্মী অংশগুলি নির্মমভাবে ছেঁটে-কেটে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস পান। তাঁদের হয়তো ধারণা, বিজ্ঞানের মহলে রস-সাহিত্যের অনুপ্রবেশ ঘটলে বিজ্ঞানের কৌলীন্যের হানি ঘটবে। কিন্তু এই ধরণের গা বাঁচিয়ে চলবার মনোভাব শিক্ষা-জগতে শুধু হাস্যকরই নয়, ক্ষতিকরও বটে। বাংলা ভাষায় এযাবৎ যে সকল মনীষী বিজ্ঞান প্রচার করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই তা সরস সাহিত্যের মাধ্যমে করেছেন। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বাঙালী লেখকের বিজ্ঞান রচনার খণ্ডিত অংশবিশেষ চয়ন করছি। এতে দেখা যাবে—জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনায় তাঁরা সকলেই সাহিত্যিক ভাষা, উপমা, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদির অকুণ্ঠ সাহায্য নিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার প্রথম উল্লেখযোগ্য লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের আগ্নেয়গিরি প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃত করছি। মনে রাখতে হবে, এটা প্রথম যুগের ভাষা। আলোচ্য অংশে ভাষার সরলতা, সাবলীল গতিভঙ্গী ও সরসতা লক্ষ্যণীয়: "...আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখাদি নির্গত হওয়াকে ঐ গিরির অগ্ন্যুৎপাত বলে। ঐ অগ্ন্যুৎপাত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। উহা দর্শন করিলে চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হয়।...যখন কোন আগ্নেয় পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত সমুদ্র ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, তখন পূর্বোক্ত প্রকারে উৎক্ষিপ্ত বস্তুসমুদয় জলের উপর পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপে কত কত দ্বীপ ও সমুদ্রস্থিত পর্বতের উৎপত্তি হইয়াছে। চীনরাজ্যের কিছু পূর্বে জাপান সাগরে 'গন্ধকদ্বীপ' নামে এক দ্বীপ আছে, তাহা এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা যে কহিয়া থাকেন, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বাগ্নি নামে অগ্নিবিশেষ আছে, একথা সমুদ্রস্থিত কোন আগ্নেগিরির অগ্নিদৃষ্টে কল্পিত হইয়া থাকিবে।"

এবার বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিজ্ঞান রহস্যের' খুব বেশী বিক্রয় না হলেও সেটা তাঁর রচনার মান সূচিত করে না। যথাসম্ভব কম পরিভাষা ব্যবহার করে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্বকে সুন্দর বাংলায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর আলোক সম্পর্কিত রচনার কিছু অংশ: "ইথর নামক বিশ্বব্যাপী আকাশীয় তরল পদার্থের পরমাণু সমষ্টির তরঙ্গবৎ আন্দোলনই আলোক। সেই গতিবিশিষ্ট পরমাণু সকলের সঙ্গে নয়নেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আলোক অনুভূত হয়। "

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান রচনাগুলিতে সর্বপ্রথম এক নূতন স্বাদ পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেগুলি ছিল বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সুন্দর সমন্বয়। সর্বোপরি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটি দার্শনিক। আচার্য ত্রিবেদীর 'ফুল' সম্পর্কিত রচনার একটি সাহিত্য-রসাল অংশ: "পৃথিবীর শোভা গাছ, আর গাছের শোভা ফুল। ফুল কে না ভালবাসে? অমন সুন্দর দ্রব্য আর কিছু আছে কি? লোক ফুলে ঘর সাজায়, ফুলের মালা পরে, ফুলের অঞ্জলি দিয়া দেবতার পূজা করে। এক আধারে এত রূপ, এত গন্ধ, এত রস আর কোথাও দেখা যায় কি?" ফুলের জন্মের পর তার বিকাশ ও মৌমাছি ইত্যাদির পদবাহিত রেণুর সাহায্যে তার বংশবৃদ্ধির ঘটনাকে রামেন্দ্রসুন্দর অপূর্ব সাহিত্যিক উপমায় প্রকাশ করেছেন: "পাপড়িগুলি বস্তুতঃ ফুলের অলঙ্কার, এই অলঙ্কার পরিয়া ফুল যেন পতঙ্গদিগকে আকর্ষণ করে। পতঙ্গ আসে নিজের কাজে মধুর জন্ম, ফুল তাহাদের দ্বারা আপন কাজ সাধিয়া লয়।"

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবধর্মে কবি হলেও তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানানুরাগ আমাদের মুগ্ধ করে। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে 'বিশ্ব-

পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে নানারকম হাড়ের কঠিন নামগুলি বিভীষিকা সৃষ্টি করলেও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ এই কঙ্কালের মধ্যে দেখতে পেলেন অকালমৃতা এক অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ীকে। এই মানসনায়িকাকে নিয়েই তাঁর 'কঙ্কাল' গল্প, যার পিছনে কারণস্বরূপ হয়ে আছে বিজ্ঞান শিক্ষার সেই নরকঙ্কালটি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন—"জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।···ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।··অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।"

একইভাবে আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনে দেখতে পাই তাঁর সাহিত্যরসগ্রাহিতা ও শিল্পবোধ তাঁর বিজ্ঞানসাধনাকে আদৌ ব্যাহত করে নি। বরং যে ছেলেটি একদিন মহাকাব্যের বীর কর্ণের দুঃখে বিচলিত হতো বা প্রকৃতি রাজ্যে বাধাহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো, তার সেই ভাব-প্রবণতা ও সংবেদনশীলতাই হয়তো ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে "চেতনারাজ্যের বাইরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে" তার অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি নিজেও এসব প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সার্থকভাবে মিলতে পারে। একের রাজ্যে অন্যকে অপাংক্তেয় করে রাখা অর্থহীন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বিজ্ঞান ও রস-সাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে, জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক, সেইজন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটতো। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা···"। বিজ্ঞান ও সাহিত্য যে পরস্পর সহায়ে বিকশিত হতে পারে, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের এই অপরূপ মৈত্রীই তার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য যে পরস্পর সহায়ক শুধু নয়, উভয়ে একই সত্যের সাধনা—তা সব মনীষীই উপলব্ধি করেছেন। জগদীশচন্দ্র তাই বিজ্ঞান-জগতের লোক হয়েও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব[4] গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। এই বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্ব দৃষ্টান্ত[5] স্মরণ করিয়ে দিয়ে জগদীশচন্দ্র বলছেন—"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁর হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না।···বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব সাধনার সঙ্গে তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায়, সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন।··· বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।··" রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—"কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে।"

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানের কৌলীন্য-হানি হবার কোনই আশঙ্কা নেই; বরং তাকে যদি জনপ্রিয় হতে হয়, তবে তাকে সরস সাহিত্যের দ্বার দিয়েই জনপ্রিয়তার মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে এবং সহজবোধ্যতাই জন-প্রিয়তার একমাত্র চাবিকাঠি নয়, বিজ্ঞানকে হৃদয়-গ্রাহীও করতে হবে। জনপ্রিয় বিজ্ঞান হবে

4. ময়মনসিংহ অধিবেশন
5. রাজশাহী অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ

একাধারে সহজ এবং সরস। আজকের যুগে, বিশেষ করে আমাদের দেশে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের গুরুত্বের কথা অনস্বীকার্য। জনপ্রিয় হতে হলে আজ বিজ্ঞানের ভোজ্যকে যে সাহিত্যের রসে ডুবিয়েই শিক্ষার্থীদের পাতে পরিবেশন করতে হবে, সে কথা আজ উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।"[6]

সাহিত্যের অধিকারকে পাঠকের হৃদয়ের দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত করেই যে কোন তত্ত্বকে হৃদয়ে অনুপ্রবেশ লাভ করতে হবে, এই কথা আজ জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রচারকদের উপলব্ধি করতেই হবে। পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রেও সহজবোধ্যতার অতিরিক্ত হৃদয়গ্রাহীতার প্রয়োজন আছে। হৃদয়ই যে কোন বিদ্যার স্থায়ী আসন এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানেরও;—কারণ একথা আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, সেই আচার্য জগদীশের ভাষায়: "দেবী সরস্বতীর যে নির্মল শ্বেতপদ্ম, তাহা সোনার পদ্ম নহে, হৃদয় পদ্ম।"

6. ভূমিকা, বিশ্বপরিচয়

তেজস্ক্রিয়তা

মনোরঞ্জন বিশ্বাস*

আজ বিজ্ঞানের যে সব নব নব দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, তার অনেকের গোড়ার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে—কোন আকস্মিক ঘটনাই তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রধান সূত্র। তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারও ঠিক এমনি এক আকস্মিক ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, 1896 সালে। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী বেকারেল তখন ফ্লুরেসেন্স (Fluoresence) সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন কাজের শেষে গবেষণাগারে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে তিনি কিছু প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রেখে দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ ড্রয়ারের মধ্যে আগে থেকেই কাগজে জড়িয়ে রাখা ছিল কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেট। বেশ কয়েক দিন পর বেকারেল ড্রয়ার থেকে ফটোপ্লেটগুলি বের করে যখন ব্যবহার করতে গেলেন, তখন নতুন ধরণের কিছু কিছু দাগ ঐ ফটোপ্লেটগুলিতে দেখতে পেয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ফটোপ্লেটের ঐ স্পষ্ট দাগগুলি বেকারেলকে বেশ ভাবিয়ে তুললো। ড্রয়ারের ভিতর কিভাবে আলোকরশ্মি প্রবেশ করে ফটোপ্লেটগুলিতে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে—এই চিন্তাই তাঁর নিকট প্রবল হয়ে দেখা দিল। অনেক যুক্তিতর্ক ও অনুসন্ধানের পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, একমাত্র ঐ খনিজ পদার্থ থেকে কিছু অজানা রশ্মি বেরিয়ে ফটোপ্লেটের সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলেই ঐরূপ দাগের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে হয়েছিলও তাই এবং ঐ অজানা রশ্মিই পরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি হিসাবে বিজ্ঞানে আত্মপ্রকাশ করলো।

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ; কলিকাতা-53

শুধু তাই নয়, যে সব পদার্থ থেকে ঐসব বিশেষ বিশেষ রশ্মি পাওয়া গেল, তাদের নাম দেওয়া হলো তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radioactive substance)। তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার এই রকম আকস্মিক হলেও এপর্যন্ত অনেকগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে; যেমন—রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদি।

উল্লিখিত ঐ সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বাভাবিক-ভাবেই প্রকৃতিতে বিদ্যমান। তাছাড়া কিছু কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ গবেষণাগারেও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে; যেমন—রূপা ও ইণ্ডিয়ামকে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে তেজস্ক্রিয় রূপা ও ইণ্ডিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়। প্রকৃতিতে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Natural radioactive substance) আর গবেষণাগারে যেগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, সেগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Artificial radioactive substance)। সাধারণতঃ ভারী পদার্থগুলির পরমাণুর কেন্দ্রীন (Nucleus) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তাথেকে তড়িতা-বিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকাধারা নির্গত হতে থাকে—একেই আমরা তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity) বলে থাকি।

তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আজ কম-বেশী কিছু না কিছু অনেকেরই জানা। তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন—যে সব শক্তিশালী রশ্মি তেজস্ক্রিয় পদার্থের কেন্দ্রীন থেকে বেরিয়ে আসে, সেগুলি মোটামুটিভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আলফা রশ্মি (α-ray), দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বিটা রশ্মি (β-ray) এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে গামা রশ্মি (γ-ray)। এরা শুধু নামেই নয়, অনেক বিষয়েই একে অন্য অপেক্ষা ভিন্ন এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। আলফা ও বিটা রশ্মি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দুই ধরণের কণা আর গামা রশ্মি হলো বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ। এই সব অদৃশ্য রশ্মি আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে, নতুন এই সব রশ্মি রন্টগেন রশ্মি (X-rays) জাতীয় কোন এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি, কিন্তু পরে এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হলেন যে, এই অদৃশ্য রশ্মি রন্টগেন রশ্মি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং পদার্থের কেন্দ্রীন থেকেই নির্গত হয়। রন্টগেন রশ্মির উৎসস্থল কিন্তু কেন্দ্রীন নয়। বিজ্ঞানীরা আরও লক্ষ্য করলেন যে, পদার্থের ভৌত অবস্থা যাই হোক না কেন, ঐ সব রশ্মি নির্গমনের কোন তারতম্য হয় না। শুধু তাই নয়, এই রশ্মি নির্গমনের ফলে অনেক মৌলের কেন্দ্রীনও নতুন কেন্দ্রীনে রূপান্তরিত হয়। আলফা কণার কথাই ধরা যাক—আলফা কণাকে সাধারণতঃ হিলিয়াম (He^4) কেন্দ্রীন বলা হয়। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যখন আলফা কণা নির্গত হয়, তখন তার পারমাণবিক নম্বর (At. no -Z-) দুই একক এবং পারমাণবিক ভার (At. Wt.) চার একক কমে যায় এবং ঐ পদার্থটি নতুন একটি পদার্থে রূপান্তরিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আলফা কণার আধান ধনাত্মক; কিন্তু এর মান ইলেকট্রন-আধানের (4.8×10^{-10} e.s.u) প্রায় দ্বিগুণ (9.3×10^{-10} e.s.u)। বিটা কণা নির্গমনের ফলে পদার্থের পারমাণবিক নম্বর এক একক বেড়ে গেলেও পারমাণবিক ভারের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয় না এবং এর আধান ইলেকট্রনের আধানের সমান ও সমধর্মী। এসব দিক দিয়ে গামা রশ্মি বেশ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। গামা রশ্মি নির্গমনের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পারমাণবিক নম্বর বা পারমাণবিক ভারের কোন পরিবর্তন হয় না। গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এই কেন্দ্রীনের রশ্মিকণা যখন বিভিন্ন পদার্থের মধ্য

দিয়ে গমন করে, তখন এদের ভেদকারী ক্ষমতা (Penetrating power) হয় ভিন্ন ভিন্ন। বিটা কণার এই ক্ষমতা আলফা কণার ক্ষমতা অপেক্ষা এক-শ' গুণ বেশী হলেও গামা রশ্মির ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম। এই দুই-একটি ধর্ম ছাড়া আরও যে সব স্বাতন্ত্র্য এদের মধ্যে আছে, তা দেখেই এগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনে নিতে বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না।

আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির ধর্ম ও গুণাগুণ যাই হোক না কেন, ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি কিন্তু কোন অংশেই কম নয়। তাই এই সব মারাত্মক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করাও বেশ বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও অনেক দিন থেকেই এসব রশ্মি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে। আলফা ও বিটা কণার চেয়ে গামা রশ্মির ভেদকারী ক্ষমতা বেশী হওয়ায় এবং আরও অন্যান্য কারণে মানবদেহের উপর এর প্রভাব অনেক বেশী ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীরা এসব বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও এই মারাত্মক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং মানব কল্যাণে অনেক সুফল উপহার দিচ্ছেন। মনে হয় এদের মধ্যে শক্তিশালী গামা রশ্মির অবদানই সবচেয়ে বেশী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গামা রশ্মির ভেদকারী ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী, তাই যখন কোন উৎস থেকে গামা রশ্মি নির্গত হয়, তখন এই রশ্মিকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত রাখা বেশ কষ্টকর। এর গতি আলোর গতির (3×10^{10} সেঃ মিঃ প্রতি সেকেণ্ডে) সমান হলেও সাধারণ পদার্থের মধ্য দিয়ে অনায়াসেই ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং যাবার সময় আয়নিতও করে থাকে। তবে সীসা, পারদ প্রভৃতি উচ্চ পারমাণবিক নম্বরযুক্ত পদার্থের (Heavy elements) সাহায্যে একে অতি সহজেই বশে আনা যায়। গবেষণাগারে তাই গামা রশ্মির উৎসের চতুর্দিকে সীসার (-Z--82) আবরণ দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এসব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও রশ্মিবিকিরণ গবেষণাগার (Radiation laboratory) সম্পূর্ণ নিরাপদ করা সম্ভব নয়। কোন সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই এই সব গবেষণাগার দীর্ঘকাল নিরাপদ স্থান হতে পারে না। হিসাব করে দেখা গেছে যে, সাধারণভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রতি সপ্তাহে এক-শ' মিলি রন্টগেন অপেক্ষা অধিক ডোজ গ্রহণ করে এই সব গবেষণাগারে কাজ করা আদৌ নিরাপদ নয়। এসব গবেষণাগারে কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া একান্ত কর্তব্য। রন্টগেন বিকিরণ পরিমাপক একক: যতটা বিকিরণ স্বাভাবিক অবস্থায় এক গ্র্যাম বায়ুকে 1.6×10^{12}টি আয়নে পরিণত করে, তাকেই এক 'রন্টগেন' বলা হয়। বলা বাহুল্য মিলি রন্টগেন এক রন্টগেনের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতিরিক্ত মাত্রায় ডোজ জীবদেহে নানা বিপর্যয় ডেকে আনে—এই বিকিরণের সুদূরপ্রসারী বিপদের কথা আরও ভয়াবহ। অতিরিক্ত ডোজে আক্রান্ত ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরেরও নানা বিপদের আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, প্রতি সপ্তাহে এক-শ' ডোজের কম ডোজও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয়। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, সব রকম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে সব চিকিৎসক রেডিওলজিষ্ট, তাঁদের আয়ু অন্যান্য চিকিৎসকের তুলনায় গড়ে পাঁচ বছর কম। এর একমাত্র প্রধান কারণ হিসাবে মারাত্মক বিকিরণকেই দায়ী করা হয়েছে, যার সংস্পর্শে রেডিওলজিষ্টদের জীবনের অনেক সময় কাটাতে হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, গামা রশ্মির গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান, কিন্তু এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট। বিভিন্ন শক্তির গামা রশ্মি নিয়ে হিসাব করে দেখা গেছে যে, 1×10^{-8} সেন্টি-

মিটার থেকে 10^{-10} সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গগুলিই (Electromagnetic waves) গামা রশ্মি; অর্থাৎ রন্টগেন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা গামা রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আরও ক্ষুদ্রতর। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ছোট হবার ফলে কম্পাঙ্ক অনেক বেশী। শক্তি কণাকে $h\nu$ দ্বারা প্রকাশ করে সহজেই এর কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা সম্ভব। মনে রাখা দরকার যে, h-এর মান ধ্রুবক। (h-কে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয়, যার মান $6{\cdot}62\times10^{-27}$ আর্গ-সেকেণ্ড)। কাজে কাজেই কম্পাঙ্ক যত বেশী হবে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত গামা কোয়ান্টাম শক্তিও তত বেশী হবে।

আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মিকণা শক্তিশালী ও মারাত্মক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর বিভিন্ন ব্যবহারিক দিককে আদৌ উপেক্ষা করা যায় না। এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে রেডিওঅ্যাকটিভ ট্রেসারের (Radioactive-Tracer) কথা। প্রসঙ্গতঃ এই ট্রেসার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করা যেতে পারে। RaB, RaD, ThB, প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি সীসার আইসোটোপ, যদিও সীসা নিজে একটি স্থিতিশীল (Stable) মৌল। যদি সীসার তেজস্ক্রিয় মৌলের (মনে করা যাক RaD) কোন একটি আইসোটোপকে সীসার সঙ্গে মেশানো যায়, তাহলে এই মিশ্রণ ট্রেসার হিসাবে কাজ করবে এবং সামান্যতম সীসা, যা সাধারণভাবে বা অন্য কোনভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, এই ট্রেসারের সাহায্যে তা অতি সহজেই নির্ণীত হয়। আধুনিক কালে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আইসোটোপ ট্রেসারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রে এর যথেষ্ট গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডিফিউশন (Diffusion) সংক্রান্ত গবেষণায় এবং দ্রবণের দ্রাব্যতা (Solubility) নির্ণয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিকিৎসাবিদ্যায় এই পদ্ধতির প্রয়োগে অনেক দুরারোগ্য রোগকে সারিয়ে তোলাও সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ সিফিলিস (Syphilis) রোগের চিকিৎসায় RaE-কে নির্দেশিকা (Indicator) হিসাবে ব্যবহারের উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া জৈব রসায়নের গবেষণায় এর ব্যাপক প্রয়োগ রসায়নবিদ্‌দের নিকট নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা না বললে আলোচনা খুবই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, রেডিয়াম থেকে নির্গত রশ্মি চর্মের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও বিভিন্ন চর্মরোগ নিরাময়ের জন্যে এই রশ্মিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া কোবাল্টের (Co^{60}) ব্যবহার চিকিৎসাবিদ্যায় নতুন যাদু এনে দিয়েছে। কমবেশী স্থায়ী ঔজ্জ্বল্যে রেডিও-থোরিয়ামের ব্যবহারও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে। এসব সত্ত্বেও আগামী দিনে আরও নতুন নতুন চমক এনে আমাদের সভ্যতায় তেজস্ক্রিয়তা নতুন ভাবে স্থান করে নেবে—এই আশায় বিজ্ঞানীরা সর্বত্র গবেষণা করে চলেছেন। আমরা সেই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি।

অধ্যাপক ডিরাক ও তাঁর ইলেকট্রন-পজিট্রন তত্ত্ব

শ্রীধ্রুব মাজিত*

তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার দিকপাল, পরমাণু তত্ত্বের দিশারী, ইলেকট্রনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং সর্বোপরি ধনাত্মক ইলেকট্রনের আবিষ্কর্তা পল অ্যাড্রিয়েন মরিস ডিরাক (Paul Adrien Maurice Dirac) ইংল্যাণ্ডের বৃষ্টল শহরে 1902 সালের 8ই অগাষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ছেলেবেলায় বৃষ্টলের মারচেণ্ট ভেঞ্চারারস সেকেণ্ডারী স্কুলে তাঁর স্কুলজীবন সুরু হয়। তারপর বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1921 সালে তিনি ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। অতিরিক্ত অঙ্ক শেখবার আগ্রহের জন্যে তিনি বৃষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়েই আরও দুই বছর গণিতশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করেন। গণিতের প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণ প্রথম থেকেই ছিল, তাই কেম্ব্রিজের সেণ্ট জন কলেজে তিনি গণিত নিয়েই গবেষণা সুরু করে দেন এবং সেখান থেকেই 1926 সালে পি.-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। সে বছরেই তিনি সেণ্ট জন কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। ঠিক এই সময়টিতে অধ্যাপক ডিরাক তাঁর সমৃদ্ধ মৌলিক গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও অত্যন্ত মূল্যবান দুটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন—প্রথমটি Quantum Theory of Electron (1928) এবং দ্বিতীয়টি The Principles of Quantum Mechanics (1930)। প্রথমটি যখন রচনা করেন, তখন তাঁর বয়স 26 বছর এবং পরেরটি করেন 28 বছর বয়সে। 1932 সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবিদ্যার লুকাসিয়ান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 1933 সাল একটি গৌরবজনক বছর, কারণ সেই বছরের 12ই ডিসেম্বর তিনি শ্রডিংগারের সঙ্গে যুক্তভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

1937 সালে কুমারী মার্গিট ভিগ্‌নারের সঙ্গে অধ্যাপক ডিরাকের বিবাহ হয়। মার্গিট হলেন বুদাপেষ্টের বিখ্যাত দেশত্যাগী হাঙ্গেরীয় পদার্থবিদ্‌ ইউগেনি ভিগ্‌নারের বোন। কুমারী মার্গিটের পিতামাতা বুদাপেষ্টের অধিবাসী ছিলেন। ডিরাক Royal Society-র সভ্য নির্বাচিত হন 1930 সালে, এবং পরবর্তী কালে সেখানকার রাজকীয় পদক ও কপ্‌লে পদক (Copley Medal) লাভ করেন। ডিরাককে গবেষণার জন্যে বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছে। এক সময় তিনি এবং হাইসেনবার্গ একত্রে বিশ্বের অনেক দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন।

ডিরাকের গবেষণার বিষয়বস্তুর বেশীর ভাগ অংশ গণিত এবং কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার তত্ত্বগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলেও তা গভীরতার দিক থেকে যেমন অতলস্পর্শী, দুরূহ গণিতের জন্যে তা আবার তেমনি জটিল। সে জন্যে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে, স্বল্প পরিসরে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আলোচনা করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি আবার বেশ বিপজ্জনক কাজও বটে। কারণ এতে ভুল বোঝবার যথেষ্ট অবকাশ থাকে।

1925 সালে হাইসেনবার্গের কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা (Quantum Mechanics) আবিষ্কারের ঠিক পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে ডিরাকের কাজ

*ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা-32

সুরু হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা তখন বেশ অপরিণত অবস্থায়, এই সময় তিনি কোয়ান্টাম-গুলির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এমন এক তরঙ্গ-বলবিদ্যার (Wave Mechanics) প্রবর্তন করেন। ডিরাক কর্তৃক প্রবর্তিত তরঙ্গ-বলবিদ্যার সুবিধা হলো এই যে, এর সাহায্যে কণাগুলিকে (Quantum) একই সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় অথবা আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও আলোচনা করা চলে। তাঁর এই নতুন তরঙ্গ-বলবিদ্যার সাহায্যে ইলেকট্রনের স্পিনের (Spin) অস্তিত্ব সম্পর্কেও তিনি নিঃসন্দেহ হন। এর আগে ইলেকট্রনের স্পিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারেন নি।

তাছাড়াও তিনি তরঙ্গ সমীকরণটিকে এমন সহজ ও সরলভাবে দুট সমীকরণে ভাগ করেছিলেন, যার দুটি অংশ থেকেই আলাদা আলাদা সমাধান পাওয়া সম্ভব। এই সমীকরণ দুটির একটির সমাধান তো অত্যন্ত চমকপ্রদ—সেটি হলো ধনাত্মক ইলেকট্রনের (Positive-electron) অস্তিত্বের নির্দেশ। প্রথম দিকে এই নিয়ে তাঁকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল; কারণ তখন পর্যন্ত সবারই ধারণা ছিল যে, ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট (Positively charged) সব কণাই পরমাণুর ভারী অংশ অর্থাৎ কেন্দ্রক (Nucleus) গঠন করে মাত্র। তাই প্রথম দিকে তরঙ্গ সমীকরণের এই চমকপ্রদ সমাধান তাঁকে ভাবিয়ে তুললেও পরের দিকে এটাই পরমাণু পদার্থ-বিদ্যার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। পরবর্তী কালে অ্যাণ্ডারসন (1932) এবং ব্ল্যাকেট ও অকহিলিনি (1933) পরীক্ষালব্ধভাবে পজিট্রনের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। এখন তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি ডিরাকের ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রনের (Positron) অস্তিত্বের কথা, যেমন তত্ত্বগতভাবে—পরীক্ষালব্ধভাবেও তেমনি তার অস্তিত্ব দেখানো সম্ভব।

বস্তু সম্পর্কে পদার্থবিদ্দের পরীক্ষালব্ধ ধারণা হলো এই যে, সেগুলি বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম কণা দিয়ে তৈরি। এক-এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম কণাগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে সব বিষয়ে অনুরূপ। এর সূক্ষ্ম কণাগুলি আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণার সাহায্যে তৈরি। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক-এক শ্রেণীর কণাগুলিও আবার পরস্পরের সঙ্গে সব বিষয়ে অনুরূপ। সুতরাং পদার্থ গঠনকারী সূক্ষ্ম কণাগুলিকে মিশ্রিত কণা বলা যেতে পারে। কিন্তু এই মিশ্র কণাগুলি ছাড়াও কিছু কিছু কণা আছে, যেগুলি মোটেই মিশ্র নয়—এমন কি, সেগুলিকে কোন অবস্থায় মিশ্র কণারূপে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এই ধরণের কণাগুলিকে মৌলিক কণা (Fundamental particle) বলা হয়।

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে মনে হতে পারে—এই মহাবিশ্বের সব বস্তুর সৃষ্টি হয়তো কেবলমাত্র একটি মৌলিক কণার দ্বারাই হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষালব্ধ সত্য হলো, এই মৌলিক কণার অস্তিত্বের সংখ্যা আরও অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, বর্তমান যুগে মৌলিক কণার সংখ্যাবৃদ্ধি রীতিমত ভীতিপ্রদ। অবশ্য তেমন ভয় পাবার কোন কারণ নেই—কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, মৌলিক কণাগুলির সঙ্গে মিশ্র কণাগুলির কোন স্পষ্ট পার্থক্য দেখানো সহজ কাজ মোটেই নয়। সে জন্যেই কোন আধুনিক পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ব্যাখ্যা পাবার জন্যে ধরে নেওয়া হয় যে, কণাগুলির উদ্ভাবন এবং ধ্বংস সম্ভব। সুতরাং যদি দেখা যায়, কোন একটি কণা অপর একটি কণা থেকে বেরিয়ে আসছে—তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারবো যে, দ্বিতীয় কণাটি একটি মিশ্র কণা এবং প্রথমটি একটি সৃষ্ট কণা। আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, মৌলিক এবং যৌগিক কণাগুলির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

অধ্যাপক ডিরাক মৌলিক কণাগুলির মধ্যে

আবার যেগুলি সহজ শ্রেণীর, সেগুলির মধ্যে দুই-একটির সম্পর্কেই ভেবেছেন বেশী। সহজ শ্রেণীর কণা বলতে আমরা বুঝি—

(1) ফোটন (Photon) বা আলোক কণা (Light quanta), যেগুলি দিয়ে আলোক গঠিত হয়েছে।

(2) ইলেকট্রন (Electron) এবং ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন (পজিট্রনগুলিকে দেখলে মনে হবে, সেগুলি যেন ইলেকট্রনের দর্পণ-প্রতিবিম্ব, যদিও ইলেকট্রনিক চার্জে তারা পরস্পরের বিপরীত)।

(3) প্রোটন (Proton) এবং নিউট্রন (Neutron), যেগুলিকে আমরা ভারী কণাও বলতে পারি।

এগুলির মধ্যে ফোটন কণাগুলির আচরণ এতই সরল যে, সেগুলির গুণাবলীকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ না করেও অনায়াসেই কোন একটি তত্ত্বগত ছকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। অপর দিকে প্রোটন এবং নিউট্রনের আচরণ এতই জটিল যে, সেগুলির জন্যে কোন নির্ভরযোগ্য তত্ত্বের বনিয়াদ তখন পর্যন্ত গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। (ইদানীং অবশ্য এই বিষয়ে অগ্রগতি আশাতীত)। তাই ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক ইলেকট্রনের ধর্ম চিত্তাকর্ষক বলেই হোক অথবা সেগুলি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে বলেই হোক, অধ্যাপক ডিরাক কিন্তু ইলেকট্রন ও পজিট্রন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেকখানি প্রসারিত করে দিয়েছেন।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে—কেবলমাত্র তত্ত্বের দ্বারাই মৌলিক কণাগুলির সমস্ত ধর্ম নির্ধারণ করা সম্ভব কিনা? উত্তরে বলা যায়—অবশ্যই সম্ভব। এখানে সাধারণ কণা বলবিদ্যার (General quantum mechanics) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যার সাহায্য নিয়ে আমরা যে কোন বস্তুকণার গতির (Motion) ব্যাখ্যা করতে পারি এবং সুবিধা হলো এই যে, কণাগুলির গতি সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় তাদের ধর্ম যে কি ধরণের, তা না জানা থাকলেও কোন অসুবিধা হচ্ছে না। অবশ্য সাধারণ কণা বলবিদ্যা ততক্ষণই আমাদের সাহায্য করতে পারবে, যতক্ষণ কণাগুলি কম গতিতে থাকবে; অর্থাৎ কণাগুলির গতির সঙ্গে আলোকের গতির (3×10^{10}Cm/Sec) কোন তুলনা করা যেন না চলে। কারণ এর ফলে আপেক্ষিকতাবাদের সমস্যা দেখা দেবে। কণাগুলির মৌলিক ধর্ম আলোচনা করবার পক্ষে আপেক্ষিক কণা বলবিদ্যা (Relativistic quantum mechanics) বেশ অসুবিধাজনক। কারণ ঐ বলবিদ্যা খুব বেশী গতিসম্পন্ন কণার ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রয়োগ করা চলে। সুতরাং এই কথা বলা যেতে পারে যে, যখন সহজ শ্রেণীর মৌলিক কণাগুলির বিভিন্ন গুণাবলী আলোচনা করবার জন্যে সাধারণ কণা বলবিদ্যা থেকে আপেক্ষিক কণা বলবিদ্যার সাহায্য নেওয়া হয়, তখন ঐ কণাগুলির গুণাবলীর ক্ষেত্রেও কিছু সীমাবদ্ধতা স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে। এভাবেই সম্পূর্ণ তত্ত্বগত উপায়ে কণাগুলির গুণাবলী সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

এখন আলোচনা করে দেখা যাক, কেবলমাত্র ইলেকট্রনের স্পিন ধর্ম (Spin properties) আলোচনা করেই কিভাবে একই স্পিনসম্পন্ন ধনাত্মক ইলেকট্রন অথবা পজিট্রনের অস্তিত্ব অনুভব করা যেতে পারে। এই আলোচনার সুরুতে আমরা আপেক্ষিক প্রাচীন বলবিদ্যার (Relativistic classical mechanics) কোন একটি কণার গতিশক্তি W (Kinetic energy) এবং তার ভরবেগ p_r (Momentum) ($r=1, 2, 3$) সংযোজনকারী সমীকরণটি মনে করা যাক—

$$\frac{W^2}{C^2}-p_r^2-m^2c^2=0 \quad \text{—(1)।}$$

এটির সাহায্যে আমরা কণা বলবিদ্যার একটি তরঙ্গের সমীকরণ (Wave equation) পেতে পারি। এখন উপরের সমীকরণটির বাঁ-দিকের অংশকে যদি তরঙ্গ চিহ্ন Ψ (Wave function)-এর উপর অপারেট (Operate) করানো হয় এবং W ও p_r-কে যথাক্রমে $ih\frac{d}{dt}$ ও $-ih\frac{d}{dx_r}$ এই দুটি অপারেটর (Operator) হিসাবে কল্পনা করা হয়, তবে সমীকরণটি দাঁড়ায় এই রকম—

$$\left[\frac{W^2}{C^2} - p_r^2 - m^2c^2\right]\Psi = 0 \quad \text{—(2)}$$

কণা বলবিদ্যার একটি প্রয়োজনীয় দাবী হলো—এর তরঙ্গ সমীকরণগুলিকে (Wave mechanics) অপারেটর W বা $\frac{d}{dt}$-র সঙ্গে একটা রৈখিক (Linear) সম্পর্ক বজায় রাখতেই হবে, যদিও এই সমীকরণে আমরা তা পাচ্ছি না।

তাই এটিকে পরিবর্তিত করতে হবে এমন একটি সমীকরণে, যা গতিশক্তি W (K. E)-তে এবং কণার ভরবেগ p_r (Momentum)-এর সঙ্গে রৈখিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং একই সঙ্গে সমীকরণটি যেন আবার আপেক্ষিকতায় অপরিবর্তিত (Relativistic invariance) থাকে।

ধরা যাক, সমীকরণটি এই ধরণের—

$$\left[\frac{W}{C} - \alpha_r p_r - \alpha_0 mc\right]\Psi = 0 \quad \text{—(3)}$$

উপরের সমীকরণটিতে চারটি নতুন ভেরিয়েবল (Variable) বা পরিবর্তনশীল সংখ্যা α_r, α আছে, যেগুলি তরঙ্গ চিহ্নের (Wave function) উপর অপারেট করতে পারে। এখন আমরা মনে করি যে, ভেরিয়েবল বা পরিবর্তনশীল সংখ্যাগুলি নীচের এই সর্তগুলিকে মেনে চলে—

$\alpha_\mu^2 = 1$, $\alpha_\mu\alpha_\nu + \alpha_\nu\alpha_\mu = 0$

(যখন $\mu \neq \nu$ এবং $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$)

এছাড়া ঐ নতুন পরিবর্তনশীল সংখ্যা α গুলিকে গতিশক্তি W (K. E.) এবং ভরবেগ p-এর সঙ্গে পরস্পর বিনিময় (Commute) করা যাবে। পরিবর্তনশীল সংখ্যা (Variable) α গুলির এই বিশেষ গুণের জন্যে 3নং সমীকরণটিকে অনেকাংশে 2নং সমীকরণটির সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। আর যদি 3নং সমীকরণকে বাঁ-দিক থেকে $\left(\frac{W}{C} + \alpha_r p_r + \alpha_0 mc\right)$ দিয়ে গুণ করা হয়, তাহলে তো সেটি সম্পূর্ণরূপেই 2নং সমীকরণে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এই নতুন পরিবর্তনশীল সংখ্যা α গুলি ইলেকট্রন সম্পর্কে দুটি তথ্যের সন্ধান দেয়। একটি হলো ইলেকট্রনের স্পিনজনিত কৌণিক ভরবেগ (Spin angular momentum), যেটির মান (Magnitude) অর্ধেক কোয়ান্টামের সমান। দ্বিতীয়টি হলো, ইলেকট্রনের চৌম্বক ভরবেগ (Magnetic momentum), যেটি কৌণিক ভরবেগের (Angular momentum) বিপরীতমুখী একটি বোর ম্যাগনেটনের (Bohr magneton) সমান। তত্ত্বগত এই ফলাফলগুলি পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত যে, এগুলি প্রথমে Spectroscopy-র সাহায্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পাওয়া গিয়েছিল, পরে সেগুলিকে তত্ত্বের দ্বারা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

এবার সমীরকরণগুলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা চলতে পারে; যেমন—এদের সাহায্য নিয়ে ধনাত্মক ইলেকট্রন বা পজিট্রন সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায় কিনা? 1নং সমীকরণটির সাহায্যে গতিশক্তি W (K. E.)-র দুটি মান পাওয়া যায়। (এক) গতিশক্তি W (K. E.) ধনাত্মক হলে তার মান mc^2-এর চেয়ে বেশী হবে। (দুই) গতিশক্তি W (K. E.) ঋণাত্মক হলে তার মান $-mc^2$-এর চেয়ে কম হবে। কিন্তু যেহেতু যে কোন কণার গতিশক্তি W (K. E.) সর্বদা ধনাত্মক

মানের, সে জন্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সমীকরণটি দুই প্রকার গতির কথা ব্যাখ্যা করে—যার একটির সম্পর্কে আমরা অবহিত। দ্বিতীয় প্রকারের গতিটি ভারী অদ্ভুত ধরণের। ইলেকট্রনের স্পিন আছে বলে এবং আপেক্ষিক তরঙ্গ সমীকরণের সঙ্গে গতিশক্তি W (K. E.) রৈখিক সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়েই এই নতুন পরিবর্তনশীল ∝ গুলিকে আনা হয়েছে। কম শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন অথচ সেগুলি তীব্র গতিসম্পন্ন। এগুলির এই তীব্র গতি (Speed) রুদ্ধ করতে হলে ঐ কম শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলিকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনে পরিণত করতে হবে। এটি অধ্যাপক ডিরাকের একটি মূল্যবান আলোকপাত। এটিকে আমরা অপরিপূর্ণ ঋণাত্মক শক্তির অবস্থা (Negative energy state) বা খুব সংক্ষেপে গর্ত (Hole) বলতে পারি। এই গর্তগুলিতে যে শক্তি থাকে তা ধনাত্মক মানের, কারণ এই গর্তগুলিতে ঋণাত্মক শক্তির ঘাটতি থাকে। উপরের সমীকরণে ঋণাত্মক শক্তির অস্তিত্ব থাকায় যে অসুবিধা, ঐ অসুবিধার দ্বারাই বেশ নির্ভরযোগ্যভাবে গর্তগুলির সঙ্গে 'ধনাত্মক ইলেকট্রন' বা পজিট্রনের পার্থক্য করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বস্তুত: এই গর্তগুলিকে এক-একটি সাধারণ কণার (Ordinary particle) মত ধরে নেওয়া চলতে পারে। এখন আমরা তত্ত্বগত ধারণা দিয়ে একটি ধনাত্মক শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের কথা ভাবি, যেটিকে একটি গর্তে ফেলে দিয়ে গর্তটিকে ভরিয়ে তুলতে পারি। (উদাহরণ স্বরূপ বলা চলতে পারে—হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্সে যে গর্তগুলিতে ওষুধের শিশিগুলি ঢোকানো থাকে, সেগুলি আমরা দেখেছি। ধরা যাক, এক-একটি লাইনে 10টি শিশি ঢোকাবার জন্যে গর্ত আছে অথচ সেখানে শিশি রাখা আছে মাত্র একটি, তাও লাইনের বাঁ-দিকের শেষ গর্তটিতে। এখন শিশিটিকে ঐ গর্ত থেকে তুলে তার ডান দিকের গর্তে রাখলাম, আবার সেখান থেকে তুলে তার ডান দিকের গর্তে রাখলাম—এভাবে শিশিটিকে একেবারে ডান দিকের শেষ গর্তটিতে রাখতে গেলে আমরা দেখতে পাব, শিশিটির গতি বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে অথচ ঐ গর্তগুলির গতি কিন্তু ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে অর্থাৎ শিশির গতির বিপরীত দিকে গর্তগুলি সরে যাচ্ছে—যেন শিশি ও গর্ত দুটি বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ)। এই অবস্থায় যে শক্তি নির্গত হবে, তা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের (Electromagnetic wave) আকারেই নির্গত হবে। এই কথাটিতে আমরা এমন একটি পদ্ধতির আভাস পেলাম, যে পদ্ধতিতে একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে এবং এর বিপরীত পদ্ধতিতে আবার তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের দ্বারা একটি ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রনের জন্ম হওয়া সম্ভব। পরীক্ষাগারে এগুলি পরীক্ষা করে দেখাও গেছে।

ইলেকট্রন-পজিট্রন তত্ত্ব সম্পর্কে যা বলা হলো, তা পরীক্ষালব্ধ ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতে পারে—ঠিক এই ধরণের একটা তত্ত্ব তো প্রোটনগুলির ক্ষেত্রেও হতে পারে। এর উত্তর হলো—হ্যাঁ হতে পারে, যদি আমরা ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটনের কথা কল্পনা করতে পারি। যেগুলি কিনা সাধারণ ধনাত্মক তড়িদাহিত প্রোটনের দর্পণ-প্রতিবিম্বের মত। কিন্তু কথা হলো—স্টের্ন (Strern) তাঁর গবেষণা থেকে প্রোটনের স্পিন চৌম্বক মোমেন্ট (Spin magnetic moment) সম্বন্ধে এমন সব পরীক্ষালব্ধ তথ্য পেয়েছেন, যা প্রোটন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নতুন তত্ত্বকে বেশ গোলমালে ফেলে দিতে পারে। যেহেতু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রোটন বেশী ভারী, সেহেতু স্বাভাবিক কারণেই মনে হয় প্রোটনের জন্যে কোন নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন, যা আরও বেশী জটিল। যদি কল্পনা করে নেওয়া

হয় যে, ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটনের অস্তিত্ব সম্ভব এবং ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটনগুলি নিখুঁৎভাবে পরস্পরের বিপরীত (যদিও ঋণাত্মক প্রোটন তৈরি করা যে খুব কঠিন কাজ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।), তবুও একটা অসুবিধা থেকেই যায়, সেটা হলো প্রোটনের ভর (Mass) বেশী, কারণ ভর মানেই তো বেশী শক্তির ব্যাপার।

যদিও 1955 সালে বিপরীত-প্রোটনের (Anti-proton) অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম এমিলিও সেগরী, ওয়েন চেম্বারলিন প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণা থেকে। তাঁরা অবশ্য অধ্যাপক ডিরাকের প্রত্যেক শ্রেণীর আহিত কণাগুলির জন্যে বিপরীত আধানবিশিষ্ট কণা শ্রেণী থাকতে পারে'—এই তত্ত্বটিকে ভিত্তি করেই অগ্রসর হলেন এবং বিপরীত-প্রোটনের সাক্ষাৎ পেলেন।

তরল হিলিয়াম সম্পর্কে কয়েকটি কথা

অরবিন্দ দাশ*

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির মধ্যে প্রথমেই হিলিয়ামের নাম করা যায়। চাপ প্রয়োগে সব গ্যাসকেই সহজে তরলে পরিণত করা যায়, কিন্তু হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন তরলীকরণের ব্যবস্থা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। তরল অবস্থায় হিলিয়ামের কয়েকটি আচরণ একেবারেই স্বতন্ত্র এবং সে অবস্থায় এই গ্যাসকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য তরল পদার্থ থেকে তরল হিলিয়ামের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এস্থলে কিছু আলোচনা করা হলো।

তরল হিলিয়াম প্রস্তুতি

জুল ও টমসন গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে যে পরীক্ষা করেছিলেন, তা Porous-plug experiment নামে খ্যাত। এই জাতীয় পরীক্ষায় জুল ও টমসন দেখেছিলেন—বাতাস, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের প্রসারণের ফলে উষ্ণতা হ্রাস পায়, আবার হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের প্রসারণের ফলে উষ্ণতা সামান্য বৃদ্ধি পায়। চাপ পরিবর্তনের ফলে উষ্ণতার এই পরিবর্তনকে Joule-Thomson effect বলে; আর প্রবহমান প্রক্রিয়াজাত গ্যাসের চাপ পরিবর্তনের সঙ্গে তার উষ্ণতা পরিবর্তনের হারকে জুল-টমসন প্রভাবাঙ্ক (Coefficient) বলা হয়। দেখা গেছে—প্রকৃত গ্যাসসমূহ, যেগুলি ভ্যান-ডার ওয়ালস সমীকরণ মেনে চলে, সেগুলির ক্ষেত্রে প্রভাবাঙ্কের মান হবে—

$$K = \frac{1}{C_p}\left(\frac{2a}{RT} - b\right),$$

যেখানে a ও b হলো ভ্যান-ডার ও ওয়ালস্ ধ্রুবক, R=গ্যাস ধ্রুবক, C_p=স্থির চাপে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ। তাই বলা যায়—প্রভাবাঙ্ক $\left(\frac{2a}{RT} - b\right)$-এর সঙ্গে সমানুপাতিক। হিলিয়ামের বেলায় a-এর মান মাত্র 0·034 বায়ু-লিটার ^{2}/মোল^2; অতএব সাধারণ উষ্ণতাতেই $\frac{2a}{RT} < b$ (এক্ষেত্রে b-এর মান 0·0236 লিটার/মোল)। এভাবে প্রভাবাঙ্কের মান ঋণাত্মক হয় এবং গ্যাস প্রসারণের ফলে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উষ্ণতা যদি এমনকম হয় যে, $\frac{2a}{RT} > b$, তখন K ধনাত্মক হয় এবং প্রসারণের জন্যে শীতল হয়।

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণমিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়; নরেন্দ্রপুর, 24 পরগণা।

তাই প্রত্যেকটি গ্যাসের বেলায় এমন একটি উষ্ণতা রয়েছে, যেখানে $\frac{2a}{RT}-b=O$ এবং স্থির চাপ-বিভেদে যে উষ্ণতায় কোন গ্যাসের জুল-টমসন প্রভাবাঙ্কের মান শূন্য হয়, তাকেই উৎক্রমনাঙ্ক (Inversion temperature, Ti) বলা হয়, অর্থাৎ $Ti=\frac{2a}{Rb}$; যেমন হিলিয়ামের বেলায় এর মান মাত্র −240° সেঃ। সম্ভবতঃ যে কোনও বস্তু অপেক্ষা হিলিয়ামের ঘনীভবন উষ্ণতা (Condensation temperature) সর্বাপেক্ষা কম। তরল হিলিয়াম উৎপাদন তাই এক বিরাট সমস্যা। 1808 খৃষ্টাব্দে জুল-টমসন প্রভাবের দ্বারা ক্যামারলিং ওনস (Kamerlingh Onnes) তরল হিলিয়াম উৎপন্ন করেন। তিনি অবশ্য গ্যাসকে আগেই উৎক্রমনাঙ্কের নীচে হাইড্রোজেনের দ্বারা শীতল করে নিয়েছিলেন।
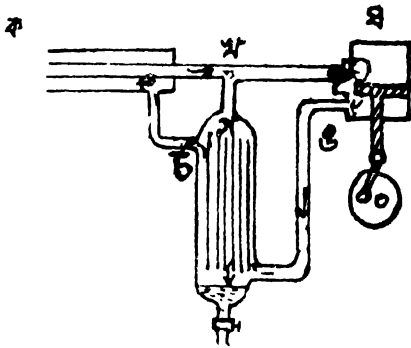
1নং চিত্র

আধুনিক কালে ক্লড-পদ্ধতিতে (Claude process) বাতাসকে তরল করে তাথেকে হিলিয়াম পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। 1নং চিত্রে এই পদ্ধতি বোঝানো হলো। বিশুদ্ধ বায়ু (CO_2 ও জলীয় বাষ্পহীন) 40 গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে সংনমিত করে (Compressed) পরে শীতলীকৃত প্যাঁচানো নলের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয় (চিত্রে দেখানো হয় নি)। এর পর উল্লিখিত বায়ুকে ক নলের মধ্য দিয়ে চালিত করলে খ স্থানে এসে দুটি প্রবাহে বিভক্ত হয়। প্রধান প্রবাহটি ঘ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। সেখানে প্রসারিত হবার সময় পিস্টনকে ঠেলে দেয়। এই বাইরের কাজ (External work) সম্পাদনের সময় তা শীতল হয়। তখন ঐ শীতলতর বায়ু ঙ-নলের ভিতর দিয়ে চালিত হয়ে শীতককক্ষ (Condenser) গ-এর ভিতর সঞ্চারিত হয়। আবার খ থেকে গৌণ-প্রবাহটি সোজাসুজি গ কক্ষে প্রবেশ করে এবং জুল-টমসনের নিয়মানুযায়ী অধিকতর শীতল হয়। এবার উভয় প্রবাহ একত্রে মিলিত হয়ে চ-এর ভিতর প্রবেশ করে। সেখান থেকে ক চিহ্নিত পথে প্রবেশ করে এবং পরে আবার সংনমিত হয়। এইভাবে চক্রাকারে কয়েক বার ঘুরলেই বায়ু সহজেই শীতল হয়। এই তরল বায়ুতে যে সমস্ত উপাদান রয়েছে, সেগুলির স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য নিম্নরূপ :

He,—268·83° সে.; Ne,—245·92° সেঃ; N,—195·7° সে.; Ar,—185·84° সে.; O,—182·9° সেঃ; Kr,—151·7° সে.; Xe,—108·9° সে.; তাই সহজেই এই উপাদানগুলিকে পৃথক করা সম্ভব।

তরল হিলিয়ামের দুই দশা (He-I ও He-II)

1927 খৃষ্টাব্দে কিসম ও উল্‌ফ্‌কী (Keesom & Wolfke) তরল হিলিয়াম সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেন। এটিই একমাত্র মণ্ডল (System), যার বেলায় একই তরল পদার্থ দুটি দশায় অবস্থান করতে পারে। দশা দুটিকে He-I ও He-II-নামে অভিহিত করা হয়েছে।

$$\text{He-II} \rightarrow \text{He-I}$$
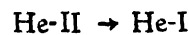
(তরল) (তরল)

—এই পরিবর্তন তাপ শোষণের দ্বারা সাধিত হয়। 38 মিমি. চাপে এই পরিবর্তনের সংক্রান্তি উষ্ণতা (Transition temperature) হলো

ল্যামডা বিন্দুও (λ-বিন্দু) বলে (2নং চিত্র)। এই বিন্দুতে তরল হিলিয়ামের কতকগুলি ভৌত-
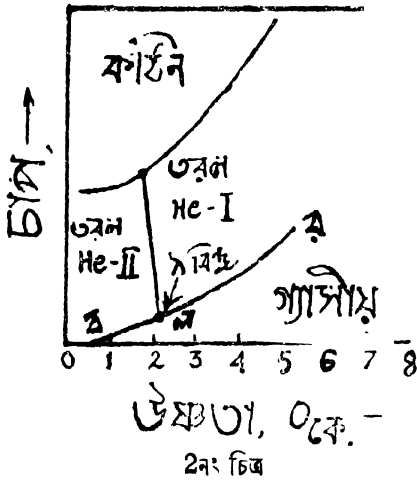
2নং চিত্র

ধর্মের বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। সংক্রান্তি উষ্ণতার উপরে (ল র) যে তরল হিলিয়াম থাকে, তা He-I, আর এই উষ্ণতার নীচে (ল ব) তরলটির দ্বিতীয় রূপকে He-II বলা হয়। H-I সাধারণ তরলের মত আচরণ করে, অর্থাৎ এর ভিতর পারমাণবিক ধর্ম রয়েছে, তাই একে কোয়াণ্টাম-তরল (Quantum fluid) বলে। He-II-এর কিন্তু জুরি নেই ; এর অদ্ভুত প্রকৃতির জন্যে একে অতি-তরল (Super fluid) বলা হয়।

দুই প্রকার তরল হিলিয়ামের সান্দ্রতার (Viscosity) পার্থক্য একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, λ-বিন্দুতে সান্দ্রতার হঠাৎ পরিবর্তনের দরুণ He-II-এর সান্দ্রতার মান He-I-এর সান্দ্রতার মানের এক-দশমাংশ। 1938 খৃষ্টাব্দে অ্যালিন, মিসনার ও ক্যাপিট্জা (Allen, Misner and Kapitza) তরল He-II-এর প্রবাহ সম্পর্কিত এক চমকপ্রদ পরীক্ষার উল্লেখ করেন। খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সান্দ্রতাঙ্কের মান 10^{-9} সি. জি. এস. একক হয় (সান্দ্রতাঙ্কের এই মান অস্বাভাবিক মানের)। তাছাড়া He-II-এর একটি অত্যাশ্চর্য ধর্ম দেখা যায়। বস্তুটিকে কোন পাত্রে ধরে রাখা কঠিন, কারণ বস্তুটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাত্রের গা বেয়ে উপর দিকে উঠে বের হয়ে যায়। কেউ কেউ তরল He-II-এর এই ধর্মকে পদার্থের একটি ভিন্ন অবস্থা (Different state of matter) বলে বর্ণনা করেছেন। অতি প্রবহনশীলতার এই ঘটনাকে দেখাবার জন্যে ডন্ট ও মেণ্ডেলসন (Daunt and Mendelssohn) 3নং চিত্রে (ক) প্রদর্শিত নীচের দিক বন্ধ টিউব (অ) নিয়ে বন্ধ মুখটি তরলে ডুবিয়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে টিউবের ভিতরে ও বাইরে তরলের উচ্চতা একই হয় এবং এই আংশিক পূর্ণ টিউবটিকে উপরের দিকে তুলতে থাকলে তা আবার খালি হতে থাকে এবং তরল থেকে সম্পূর্ণ তুলে নিলে টিউবের ভিতরের তরলকে বাইরে গড়িয়ে যেতে দেখা যায় (আ)।

এই প্রসঙ্গে তরল হিলিয়ামের আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। λ-বিন্দুর ঠিক নীচে এর অতি উচ্চমানের তাপীয় পরিবাহিতা (Thermal conductivity) দৃষ্ট হয় (প্রায় 190 সি. জি. একক) এবং সাধারণ তাপমাত্রায় যে সকল পদার্থ খুবই তাপ পরিবাহী, তরল He-II তাদের অপেক্ষাও প্রায় এক-শ' গুণ তাপ-পরিবাহী। এই তাপ পরিবাহিতা দেখাবার জন্যে অ্যালেন ও জোন্স্ (Allen and Jones) একটি মজার পরীক্ষা করেন। 3নং চিত্র (খ)-এর ই-তে প্রদর্শিত একটি টিউব নেওয়া হয় এবং তার নীচের দিকে এমারি পাউডারের দ্বারা ভর্তি থাকে। এই অংশে আলো পড়লে ই-এর উপর দিক থেকে ফিন্কি দিয়ে তরল পদার্থটি বেরুতে থাকে। এভাবে যতক্ষণ আলো ফেলা হয়,

হতে থাকে। এই তরল স্তম্ভের উচ্চতা কয়েক সেন্টিমিটার হতে পারে।

তরল হিলিয়ামের ব্যবহার

হিমায়ক হিসাবে তরল হিলিয়ামের ব্যবহার খুবই পরিচিত। এর সাহায্যে সর্বাপেক্ষা কম উষ্ণতায় (0°-5°কে.) শীতলীকরণ সম্ভব। কয়েকটি

(4) তরল হিলিয়াম উষ্ণতায় শীতলীকৃত বহু ধাতু, সঙ্কর-ধাতু ও যৌগ অতি-পরিবাহিতা (Super-conductivity) প্রদর্শন করে এবং এই ঘটনাকে উচ্চমানের চুম্বক গঠনের কাজে ব্যবহার করে সেগুলিকে কম্পিউটার যন্ত্রে ক্রায়োট্রোন (Cryotron) ও ক্রায়োসার (Cryosar) হিসাবে প্রয়োগ করা হয়।
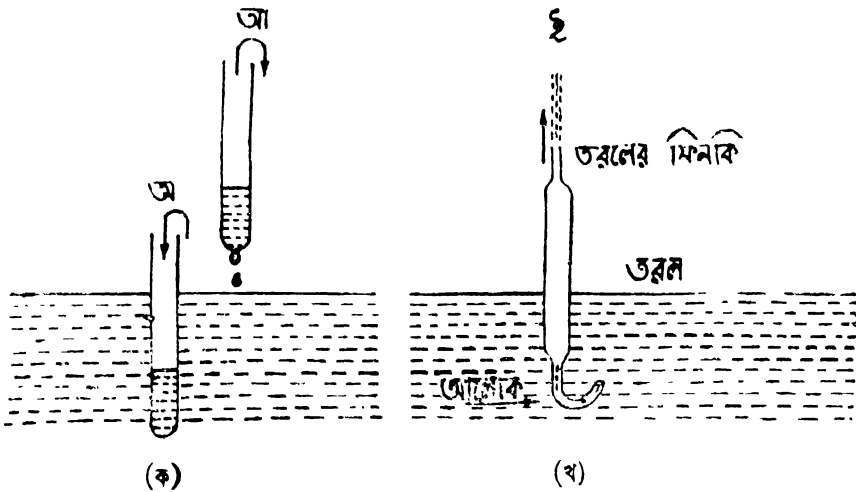
3নং চিত্র

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিতে তরল হিলিয়ামের ব্যবহার খুবই চমকপ্রদ। যেমন—

(1) বুদ্বুদ-কক্ষে (Bubble chamber) খুব উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কণার নিশানার কাজে;

(2) গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফীতে চলমান মাধ্যম হিসাবে;

(3) মেসার (MASER) ও লেসারে (LASER) তরল হিলিয়ামের উষ্ণতা রক্ষা করতে; (উদাহরণস্বরূপ, এণ্ডোভারে টেলষ্টার স্টেশনে যে মেসারটি আছে, তা তরল হিলিয়ামের দ্বারা শীতলীকৃত; সেটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সঙ্কেত সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে)।

তরল হিলিয়ামের ব্যবহার নিশ্চয় এখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না! ভবিষ্যতে আরও যে সব নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হবে, সেখানেও নিষ্ক্রিয় শীতলকারী বিকারক (Inert cooling agent) হিসাবে তার ব্যবহার হবে বলে আশা করা যায়। এভাবে গ্যাসটি আসলে নিষ্ক্রিয় হলেও আধুনিক কালে তার গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ব্যবহার এক অপূর্ব বিস্ময়। তাছাড়া তরল হিলিয়ামের (He-II) অতি প্রবহনশীলতার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের যে দিক খুলে গেছে, তার বিস্তার কতদূর—তা কে জানে!

ভারতে ভূতত্ত্বের ভূমিকা

ডাব্লিউ. ডি. ওয়েস্ট

সমস্ত উন্নত দেশেই জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ভূ-বিজ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু ভারতবর্ষে এই স্বীকৃতি এসেছে ধীরে ধীরে। প্রধানতঃ ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দেশের খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের দায়িত্ব বহন করে আসছে। প্রথম দিকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ছিল কয়লা; কাজেই ভূতত্ত্ব সমীক্ষা পর্ষদের প্রথম কাজই ছিল বিভিন্ন কয়লাখনি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা। এই পথেই কয়লাখনিশিল্পের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং দেশের খনিজ শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আজও দখল করে আছে এই কয়লাশিল্প। উৎপাদিত খনিজ পদার্থের মোট মূল্যের 58% ভাগ হচ্ছে কয়লা। পরবর্তী কালে ভূতত্ত্ব সমীক্ষার কর্ম প্রয়াসের বহুমুখী প্রসার ঘটেছে এবং লোহা, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি ধাতুর আকরিক, অভ্র, সোনা ও লবণের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর তৃতীয় প্রাচীনতম সংস্থা (বৃটিশ ও ক্যানাডীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা পর্ষদ ইতিপূর্বেই চালু হয়েছিল) হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এটি একটি ক্ষুদ্র বিভাগে সীমিত ছিল। এই সময় ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ের খনিজ সম্পদের আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌দের কাজের মর্যাদা স্বীকৃতি পায়। সেই সময় থেকেই এই বিভাগটিকে প্রসারিত করবার কাজ সুরু হয়। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের বৈচিত্র্যে সেই প্রসার আরও ত্বরান্বিত হয়। পূর্বে দেশের সমস্ত ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল এই ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার উপর। গত ত্রিশ বছরে এই ধরণের আরও অনেক স্বয়ংসম্পূর্ণ সহোদর প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে—যারা সবাই ভূ-বিজ্ঞানীদের কাজের উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে ভারতীয় খনি ব্যুরো, তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন, জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন, পরমাণু শক্তি কমিশনের পারমাণবিক খনিজ বিভাগ এবং রাজ্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগগুলি উল্লেখযোগ্য।

ভূ-বিজ্ঞানের এই বিরাট প্রসারের চিত্র থেকে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উত্থাপিত হতে পারে—এসব থেকে আমাদের দেশের কি লাভ ঘটেছে? এক কথায় এর জবাব দিতে হলে খনিজ পদার্থ থেকে জাতীয় আয় গত দশ বছর কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—1960 সালে 130 কোটি 80 লক্ষ টাকা থেকে 1969 সালে 361 কোটি 70 লক্ষ টাকা, শতকরা 170 ভাগ।

ভূতত্ত্ব সমীক্ষার প্রথম শতকে ভূ-বিজ্ঞানীর সংখ্যা স্বল্প হলেও তাঁদের কাজ ছিল অভিনব। ভূ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে এই কাজের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার কথা আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হচ্ছে ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের বিভিন্ন মহাদেশে হিমযুগের (Upper carboniferous ice-age) স্বীকৃতির কথা। এই স্বীকৃতিই পরবর্তী কালে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন দক্ষিণ মহাদেশের ধারণার জন্ম দেয় এবং এথেকেই মহাদেশের স্থানচ্যুতি বিষয়ক তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। 1897 খৃষ্টাব্দে আসামের

বিরাট ভূমিকম্পের সমীক্ষায় যে তিনটি প্রধান ধরণের ভূমিকম্প তরঙ্গের আবিষ্কার হয়েছিল, তাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আবিষ্কার এক-দিকে যেমন পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠনের বিষয়ে আলোকপাত করেছে, অপরদিকে তেমনি খনিজ তৈল অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞানীদের কাছে গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য বহন করে এনেছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই সব আবিষ্কারের গুরুত্ব ছিল সমধিক। কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানীজের আকরিক, পেট্রোল, বক্সাইট, লোহার আকরিক এবং পোর্সেলীন শিল্প এই আবিষ্কার থেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না যে, এই কর্মকাণ্ডের সবটাই সাধিত হয়েছে আধুনিক উন্নত মানের যানবাহন প্রচলনের আগে; দুর্গম খনিঅঞ্চলের পর্যবেক্ষণে তখন শুধুমাত্র গরুর গাড়ী, উট আর হাতীই ছিল একমাত্র সহায়ক।

খনিজ পদার্থগুলি পৃথিবীতে এলোপাথাড়ি-ভাবে ছড়ানো নেই। কোন দেশে তাদের অব-স্থিতির সঙ্গে সেই দেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন ধরা যাক—কয়লা। প্রধানতঃ প্রাচীন উদ্ভিদ-জগতের ধ্বংসাবশেষজাত এই পদার্থটিকে ভারতবর্ষের পুরাকালীন নদী-পথের ধারে ধারেই বেশী পাওয়া যায়—দামোদর উপত্যকা এর একটি সুন্দর উদাহরণ। একই কারণে ভূস্তরের অপেক্ষাকৃত কমবয়সী যে সব অঞ্চলে শিলাস্তর অবনমিত হয়ে আছে—সেখানেই খনিজ তেল থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে; তাই ভারতবর্ষে আসাম ও পাঞ্জাবের নবীন শিলাস্তরে এবং কাম্বে উপসাগরে খনিজ তেল পাওয়া যায়। আবার পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গলিত ধাতুগুলি যেখানে নানারকম তোলপাড়ের ফলে ভূস্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে জমাট বেঁধেছে, সেখানেই ধাতু বা অভ্র ইত্যাদি বিভিন্ন খনিজ পদার্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্যে ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের অবক্ষয়ে অনেকখানি গভীর অংশ উন্মোচিত হয়েছে, সেসব অঞ্চলেই বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হিমালয় প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের যথেষ্ট ক্ষয় সাধিত হয় নি, সেখানে খনিজ পদার্থের অবস্থিতি খুবই বিরল।

খনিজ সম্পদে ভারতের অবস্থা বুঝতে হলে মোটামুটি তিনটি ভাগে একে পর্যালোচনা করা যেতে পারে: (1) প্রয়োজনাতিরিক্ত খনিজ সম্পদ, (2) পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ এবং (3) অপেক্ষাকৃত কম খনিজ সম্পদ। নীচে প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থগুলিকে এই তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হলো:

(1) যে সমস্ত খনিজ পদার্থ প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে রয়েছে:

কয়লা	কেওনাইট
ফেল্‌স্পার	ম্যাগ্‌নেসাইট
ইলমেনাইট	ম্যাঙ্গানিজের আকরিক
লোহার-আকরিক	অভ্র স্টিয়াটাইট

(2) যে সমস্ত খনিজ পদার্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়:

অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক	জিপ্‌সাম
ব্যারাইট্‌স্	লবণ
ক্রোমাইট	সোরা
সোনা	

যে সমস্ত খনিজ পদার্থের ঘাটতি রয়েছে :

অ্যাসবেস্টস	সীসার আকরিক	রূপার আকরিক
তামার আকরিক	নিকেলের আকরিক	গন্ধক
হীরা	পেট্রোলিয়াম	টিনের আকরিক
গ্র্যাফাইট	ফস্‌ফেট	দস্তার আকরিক

পৃথিবীর কোন দেশই নিজেকে তার প্রয়োজনীয় খনিজ সম্ভারের দিক থেকে পুরাপুরি আত্মনির্ভরশীল বলে দাবী করতে পারে না। সেদিক থেকে পূর্বোক্ত ছকটি দেখে আমাদের দেশের খনিজ সম্পদের চেহারা মোটামুটি সন্তোষজনকই বলা চলে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখতে হবে, অনেক খনিজ পদার্থ, যেমন বক্সাইটের (অ্যালুমিনিয়াম আকরিক) পর্যাপ্ত পুঁজি থাকা সত্ত্বেও ঐ সব খনিজ পদার্থ থেকে ধাতু উৎপাদনের বর্তমান হার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম।

1963 সালে ভারতবর্ষে মোট 370 কোটি টাকার খনিজ পদার্থ আহরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাইরে রপ্তানী করা হয়েছে 44% ভাগ, যার অর্ধেকটাই হয়েছে লোহার আকরিকের দরুণ। অপর পক্ষে ঐ একই বছরে ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে মোট 121·3 কোটি টাকার খনিজ পদার্থ আমদানী করেছে। দেখা যাচ্ছে, দেশের মোট খনিজ পদার্থ উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ বিদেশ থেকে আমদানী করতে ব্যয় হচ্ছে। এথেকে উৎপাদনের স্বল্পতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা । ভারতবর্ষে সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে বিহার হচ্ছে খনিজ সম্পদে সবচেয়ে সমৃদ্ধ—সারা দেশের মোট খনিজ পদার্থ উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশের সরবরাহকারী। এর পরেই রয়েছে পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশের স্থান।

এই দেশে উৎপাদিত খনিজ পদার্থের মোট মূল্যের 95% ভাগই আসে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ থেকে। সেগুলি হচ্ছে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লোহার আকরিক, ম্যাঙ্গানিজের আকরিক, চুনাপাথর এবং অভ্র। এর কয়েকটি সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হলো।

কয়লা

1950-51 সালে যেখানে দেশের কয়লার উৎপাদন ছিল 340 লক্ষ টন, আজ তা দাঁড়িয়েছে প্রায় 710 লক্ষ টনে, প্রায় সবটাই দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মীর্জাপুর ও সিধি জেলার সিংগ্রাউলি কয়লাখনি অঞ্চলে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাস্তর আবিষ্কার। ভূতত্ত্ব সমীক্ষা কর্তৃক আবিষ্কৃত এই 134 মিটার পুরু কয়লাস্তরে প্রায় 500 কোটি টাকা মূল্যের 19 লক্ষ টন কয়লা বর্তমান। এই আবিষ্কারের ফলে এই অনুন্নত অঞ্চলটিকে তাপ-বিদ্যুৎ পরিচালিত বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব হবে। পাথরক্ষীরায় পেঞ্চ ও কান্হান উপত্যকা কয়লাখনি অঞ্চলে, কোরবা খনিঅঞ্চলে এবং তালচের কয়লাখনিতে ইতিমধ্যেই তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ সুরু হয়েছে। একটি কয়লাজাত সারশিল্পও তালচের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রেলগাড়ীই কয়লার মুখ্য গ্রাহক। কিন্তু ক্রমাগত ডিজেল ও বৈদ্যুতীকরণের ফলে রেলে কয়লার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। 1963-64 সালে 188 লক্ষ টন থেকে 1969-70 সালে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 162 লক্ষ টন। অবশ্য রেলপথে উন্নত মানের কয়লার ব্যবহার হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে ভালই হয়েছে, কারণ দেশে উন্নত মানের কয়লার সঞ্চয় খুব সীমিত। একই কারণে বিদেশের বাজারে কয়লা রপ্তানী করাও বিশেষ সম্ভবপর

হয়ে ওঠে না। উঁচু মানের কয়লা ছাড়া রপ্তানী সম্ভব নয়। কিন্তু কয়লার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্পের সমৃদ্ধির জন্যে অন্যান্য অনুন্নত মানের কয়লার উৎপাদনের হার বাড়াবারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভালভাবে ধুয়ে নেবার ব্যবস্থা করে অনুন্নত মানের কয়লাগুলিকে উন্নত করা সম্ভব। আশার কথা, ইতিমধ্যেই দেশে 11টি কয়লা ধোলাই করবার কেন্দ্র চালু হয়েছে।

লোহার আকরিক

গত শতাব্দীর শেষাশেষি সর্বত্র রেলপথ প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে লোহার আকরিকের অনুসন্ধান ত্বরান্বিত হয়। 1867 খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনে সর্বপ্রথম লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এতে স্থানীয় আকরিককে কাঠের জ্বালানী দিয়ে সংস্কার করা হতো। কিন্তু ভূতত্ত্ব সমীক্ষা তখনই রাণীগঞ্জ অঞ্চলে উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বসুর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনিই মধ্যপ্রদেশের বৈলাদিলা এবং রাজহারাতে লোহার আকরিকের সঞ্চয়ের কথা জানান। 1903 খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব সমীক্ষা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ময়ূরভঞ্জের সমৃদ্ধ লৌহখনি অঞ্চল আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই জামশেদপুরের প্রথম মারুৎচুল্লীটি 1911 সালে কাজ করা সুরু করে এবং এর উপরেই টাটাদের সমস্ত সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা কালে প্রমথনাথ বসুর সমীক্ষার সূত্র ধরে ভারতীয় খনিবিজ্ঞান সংস্থা এবং ভূতত্ত্ব সমীক্ষা যৌথভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে রাজহারা এবং বৈলাদিলা অঞ্চলে উঁচু মানের লোহার আকরিকসমৃদ্ধ খনির সন্ধান পান। রাজহারার আকরিক থেকে ভিলাই ইস্পাত কেন্দ্রে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে আর বৈলাদিলার আকরিক জাপানে রপ্তানী করা হয়। পরে বিশাখাপত্তনমে নির্মীয়মান ইস্পাত কেন্দ্রে বৈলাদিলার আকরিককে সংস্কার করা হবে। বর্তমানে এই শিল্প ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ হয়ে উঠেছে। মনে হয়, উঁচু মানের আকরিকে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ অনায়াসেই পৃথিবীর প্রধান লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে স্থান করে নিতে পারত।

ম্যাঙ্গানিজের আকরিক

ভারতবর্ষে ম্যাঙ্গানিজের আকরিকের অস্তিত্ব প্রথম লক্ষ্য করা হয় 1829 সালে নাগপুরে। কিন্তু এর প্রথম আহরণ সুরু হয় অনেক পরে, 1891 সালে। সে সময় রেলের কন্ট্রাক্টরেরা রেলপথে বিছাবার পাথর ভাঙতে গিয়ে খুব ভারী একধরণের পাথর পেয়ে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এগুলিই ছিল ম্যাঙ্গানিজের আকরিক।

ভারতবর্ষে ম্যাঙ্গানিজের আকরিক উৎপাদনের শিল্প তার উৎপাদনের অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী করে থাকে এবং সেজন্যে বাইরের বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর একে নির্ভর করে চলতে হয়। 1907 সালের মধ্যেই ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের উৎপাদক হয়ে ওঠে। 1912 সাল পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু তার পরেই দুটি বিশ্বযুদ্ধে এই শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অবশ্য অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। 1953 সালে ভারত আমেরিকাকে 19 লক্ষ টন আকরিক সরবরাহ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে। ভারতের মোট আকরিক উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় পশ্চিমের ছিন্দারা জেলা থেকে নাগপুর ও ভাণ্ডারা হয়ে পূর্বের বালাঘাট জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পরিধিতে। দুঃখের বিষয়, এই অঞ্চলগুলি প্রধান বন্দর থেকে এত দূরে অবস্থিত যে, পরিবহন ক্ষমতা মেটাতে গিয়ে খনিজগুলিকে অত্যন্ত চড়া দামে

বাইরের বাজারে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় অসুবিধা হচ্ছে—সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, গাবোন এবং অস্ট্রেলিয়ায় ম্যাঙ্গানিজের আকরিকের দ্রুত উৎপাদনের ফলে ভারতকে তার অগ্রণী ভূমিকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। ভাবলে দুঃখ হয়, গুজরাটের পাঁচমহলে শিবরাজপুরের বৃহৎ খনি, যা মাত্র কয়েক বছর আগেও বছরে এক লক্ষ টন হিসাবে আকরিক উৎপাদন করতো, তা আজ প্রায় পরিত্যক্ত। এথেকে বোঝা যায়, ম্যাঙ্গানিজ-আকরিকের অবস্থা খুব ভাল নয়। ভূতত্ত্ব সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, বর্তমানে রপ্তানী ও দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রয়োজনীয় আকরিকের মোট পরিমাণ প্রায় 27 লক্ষ টন। 1980-'89 সালের মধ্যে এই পরিমাণ 40 লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই হারে হিসাব করলে বর্তমান খনিজগুলির মোট পুঁজিতে পাঁচ-শ' বছরের সঙ্কুলান হবে।

এই অবস্থার প্রতিকার হিসাবে (আরও অনেক খনিজ পদার্থ, যা বহুল পরিমাণে বাইরে রপ্তানী করা হয়, যেমন অভ্র, সেগুলির বেলায়ও এটা প্রযোজ্য) আরও বেশী পরিমাণে আকরিককে অর্ধসমাপ্ত বা সমাপ্ত পণ্যের উৎপাদনে লাগানো উচিত; যেমন—লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ব্যাটারী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানের আকরিকের জন্যে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ। ভারতীয় শিল্পপতিরা ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। বর্তমানে দেশে সাতটি ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রকল্প চালু রয়েছে।

তেল

আজকাল শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যবহৃত শক্তির অনেকটাই পাওয়া যায় তেল থেকে। কোন কোন দেশে রেলপথে ব্যাপকভাবে ডিজেল ইঞ্জিন চালু করে দেখা গেছে, এক টন ডিজেল (যার দাম দেড় টন কয়লার দামের সমান) 7 টন পর্যন্ত কয়লা বাঁচাতে পারে। W.B. Metre দেখিয়েছেন, আমেরিকার মত যে দেশে প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়, সেখানেও দেশের মোট শক্তির জোগানের 73% আসে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে।

অন্যান্য খনিজ পদার্থের মতই ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা তেল অনুসন্ধানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এর পরামর্শ অনুযায়ী 1867 সালের মধ্যে আসামে ছয়টি তেল-কূপের কাজ শেষ হয়। খুব বেশী তেল পাওয়া না গেলেও এটাই ছিল সুরু। 1914 সালের পরে এই অঞ্চলে তেলের অনুসন্ধান সুরু করে আসাম অয়েল কোম্পানী। এই কোম্পানীর মুখ্য ভূ-বিজ্ঞানীদের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই।

দীর্ঘদিন যাবৎ আসামের ডিগবয়ের পার্বত্য খনিটিই ভারতের যাবতীয় খনিজ তেলের প্রয়োজন মিটিয়েছে। অবশ্য প্রকৃত প্রয়োজনের খুব অল্প অংশই এই তেলের খনি থেকে পূরণ করা সম্ভব হতো। এর পরে ভূ-পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নাহারকাটিয়া ও মোরান—এই দুটি লুকানো তেলের খনির সন্ধান পাওয়া গেল। একই পদ্ধতিতে পশ্চিম বঙ্গ এবং গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলেও তেলের অনুসন্ধান করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের ছবি কিছুটা হতাশাব্যঞ্জক হলেও গুজরাটে বিজ্ঞানীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন।

এই অনুসন্ধানের ফলে 1948-49 সাল নাগাদ গুজরাটে খনিজ তেল সঞ্চিত করে রাখবার উপযোগী ভূস্তরের হদিশ পাওয়া গেল। 1955 সালে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন গঠিত হবার পর 1958 সালে গুজরাটের কাম্বে উপসাগর অঞ্চলে প্রথম তেল-কূপ খনন করে তেল ও গ্যাস দুই-ই পাওয়া যায়। 1960 সালে নর্মদা উপত্যকার দক্ষিণে আঙ্কলেশ্বর অঞ্চলে আর একটি বিস্তীর্ণ তেল-সমৃদ্ধ অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। এভাবে

গুজরাটের খনিজ তেলের শিল্পটি ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার অনুসন্ধানের ফলে জন্মলাভ করে এবং তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পরিপুষ্ট হয়। পর্ষতের এই কৃতিত্বের কথা উপলব্ধি করতে W.B. Metre দেখিয়েছেন যে, তেল অনুসন্ধানের প্রথম দিকে যেখানে পর্ষতে 50 জন ভূ-বিজ্ঞানী, 40 জন ভূ-পদার্থবিদ্ এবং মাত্র কয়েকজন খনন-বিশেষজ্ঞ ছিলেন, 1967 সালে সেখানে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় 2,000। এই বারো বছরের মধ্যে তাঁরা প্রায় 500-এরও বেশী তেল-কূপ খনন করেছেন এবং 60%-এরও বেশী ক্ষেত্রে তাঁদের খনন ফলপ্রসূ হয়েছে।

পাললিক শিলা-সমৃদ্ধ বিভিন্ন অঞ্চলেও একই ধরণের অনুসন্ধান চালানো হয়েছে; যেমন—গাঙ্গেয় উপত্যকা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের আশা সফল হয় নি, তেলবাহী স্তরের কোন অস্তিত্বই এখানে মেলে নি। পশ্চিম রাজস্থান, কাবেরী উপত্যকা এবং পশ্চিম উপকূলের ধার বরাবর অনুসন্ধানের কাজ এখনও যথেষ্ট অগ্রসর হয় নি—ফলে সেগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা এখনো সম্ভব নয়।

1937 সালে ব্রহ্মদেশ এবং তার দশ বছর পরে পাকিস্তান বিভক্ত হবার আগে পর্যন্ত এই তিনটি দেশের তেল-উৎপাদন মোট প্রয়োজনের অর্ধেকটা পূরণ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্তান বিভক্ত হবার পরে ডিগবয়ের তেলের খনিটি সারা ভারতের প্রয়োজনের মাত্র 8% পূরণ করতে সক্ষম হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এবং গুজরাটে তেলের সন্ধান পাওয়ার পর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং 1960 সাল থেকে 1959-এর মধ্যে তেলের উৎপাদন 15 গুণ বেড়ে যায় এবং ঐ একই সময়ে প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বেড়ে যায় পাঁচ গুণ। কিন্তু মুস্কিলের কথা, পেট্রোলিয়াম এবং তার উপজাত যৌগের ব্যবহারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে—বছরে প্রায় 10% হারে। তেলে স্বনির্ভর হতে হলে ভারতবর্ষকে আরও নতুন তেলের উৎস খুঁজে বের করতেই হবে। বর্তমানে দেশে প্রতি বছর 95 কোটি টাকারও বেশী মূল্যের প্রায় 10,000 টন তৈল আমদানী করতে হয়। দেশের মোট আমদানীর অঙ্কের প্রায় অর্ধেকটাই এভাবে ব্যয় হয়ে যায়।

খনিজ তেলের এই প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, এতে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে নির্ভর করছে, অপরদিকে তেমনি বাইরের আমদানী বন্ধ হলে দেশের জরুরী সঙ্কটের সম্ভাবনাও রয়েছে।

জল

আমাদের সমস্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে জলই বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ এবং পশুর জীবনধারণের জন্যে তো বটেই, শস্যোৎপাদন ও শিল্পের ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান এই জলের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করা তাই ভূ-বিজ্ঞানীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েক বছর আগে তদানীন্তন সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী ডক্টর কে. এল. রাও দেখিয়েছিলেন যে, সারা দেশে গড়ে 45" বৃষ্টিপাতে কমবেশী 300 কোটি একর-ফুট জল পাওয়া যায়। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ বাষ্পীভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাগালের বাইরে চলে যায়, এক-পঞ্চমাংশ মাটিতে শোষিত হয় এবং বাকী প্রায় অর্ধেক অংশ প্রবাহিত হয়ে নদীতে মেশে। এই শেষ অর্ধেকের আবার এক-তৃতীয়াংশকে মাত্র আমরা জলাধার ও খালের সাহায্যে সেচের কাজে লাগাতে পারি।

মাটি বৃষ্টির জলের যে, এক-পঞ্চমাংশ শুষে নেয়, ডক্টর রাও দেখিয়েছেন তার অর্ধেকটা মাটির উপরের স্তরে শোষিত হয়ে গাছপালা জন্মাতে সাহায্য করে। বাকী অর্ধেকটা চুঁইয়ে চুঁইয়ে তলার স্তরগুলিতে চলে যায়। ডক্টর রাওয়ের

হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে 1000 ফুট গভীরতা পর্যন্ত সঞ্চিত জলভাণ্ডারের পরিমাণ 3000 কোটি একর-ফুট—সারা দেশে বৃষ্টিপাতের প্রায় দশ গুণ। সহজেই বোঝা যাচ্ছে এই বিরাট জল-সম্পদের সামান্য অংশও ব্যবহার করতে পারলে সেচ ব্যবস্থার খুবই উন্নতি সাধিত হতে পারতো—বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে নদীনালার কোন সুবিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে এই জলের মাত্র শতকরা এক ভাগ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খরায় নদীনালা খালবিল সব শুকিয়ে যেতে পারে, অতিরিক্ত বর্ষায় বন্যা বা জলস্ফীতিও হতে পারে। কিন্তু মাটির নীচের জলের ব্যাপারে এসব অসুবিধার সম্ভাবনা নেই। এ এক অদ্ভুত ব্যাঙ্ক, টাকা ধার দিয়েই চলেছে অথচ তার নিজের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হচ্ছে আপনাআপনি।

শিল্পের ক্ষেত্রেও মাটির নীচের জলের গুরুত্ব ভূপৃষ্ঠের জলের চেয়ে কম নয়। ধরা হয়, এক টন ইস্পাত তৈরি করতে 60,000 গ্যালন জলের দরকার। আর ঐ ওজনের কাগজ তৈরি করতে দরকার 85,000 গ্যালন জল। যোজনা কমিশন মাটির নীচে সঞ্চিত জলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই বিষয়ে দেশের বিভব নির্ধারণে যত্নবান হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে 1954 সালে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র কারিগরী সহযোগিতা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এক অনুসন্ধান প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্পের অন্তর্গত 15টি অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে যে সব সুফল পাওয়া গেছে, তার মধ্যে জয়সলমীর জেলার মরুভূমিতে একটি পরিষ্কার জলাধারের অবস্থান নির্ণয় এবং নর্মদা উপত্যকার শিলাস্তরে প্রচুর সঞ্চিত জলের উদ্ঘাটন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাটির নীচে সঞ্চিত জলভাণ্ডারের উপযুক্ত অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, ভূতাত্ত্বিক—সকলেরই একযোগে কাজ করা উচিত।

ধাতুসমূহের জন্যে বিমান-সমীক্ষা

এই নিবন্ধের প্রথম অংশে সংযোজিত তালিকা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়—ভারতবর্ষে তামা, সীসা, দস্তা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর আকরিকের ঘাটতি রয়েছে। এই সব প্রয়োজনীয় ধাতু-আমদানীতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

এই সব ধাতুর আকরিক অনুসন্ধানের জন্যে USAID একটি বিমান-চালিত ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের সমীক্ষায় আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। চুম্বক, তড়িৎ-চুম্বক এবং বেতার-নির্ভর যন্ত্রের সহযোগিতায় এই সব সমীক্ষা খুব তাড়াতাড়ি অনেক বিরাট অঞ্চলের প্রাথমিক কাজ শেষ করতে পারে। এই সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে ভূত্বকের উপর সরাসরি অনুসন্ধান চালানো তখন সহজতর হয়ে ওঠে। অবশ্য এই পদ্ধতির অসুবিধা হলো, এতে খনিজ পদার্থকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায় না, কেবল ভূত্বকের ভৌত ধর্মের তারতম্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয়।

1965 সালে খনিজ পদার্থের বিমান-চালিত সমীক্ষার জন্যে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এখন ভূতত্ত্ব সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। 1967 সালের জুন মাস থেকে এই বিভাগ 'Operation Hardrock' নামে একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে তিনটি নির্বাচিত অঞ্চলে সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যায়। এই তিনটি অঞ্চল হলো রাজস্থানের দক্ষিণ অংশ, কুদ্দাপা বেসিনের পূর্বাঞ্চল এবং বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের অংশবিশেষ (সিংভূমের তাম্রখনি অঞ্চল নিয়ে)।

এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে 20টি ক্ষেত্রকে খনন করে যাচাই করবার জন্যে নির্বাচন করা হয়েছে। বিহার এবং রাজস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তামার আকরিক এবং রাজস্থানের ভিলওয়ারা জেলায় সীসা, দস্তা ও রূপার মিশ্র খনিজের

সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়াও বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত জলের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

সম্প্রতি একটি ফরাসী সংস্থার সঙ্গে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং মহীশূরের 80,000 বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে বিমান থেকে সমীক্ষা চালাবার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এর ফলাফল সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন। [কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক অধিবেশনে মূল সভাপতির ভাষণের সারাংশ।]

অনুবাদক: রমাপ্রসাদ সরকার

ছয় জন যাত্রীবাহী হোভারক্র্যাফ্‌ট্

লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীতে হাল্কা ধরণের সীল্যাণ্ড হোভারক্র্যাফ্‌ট্ (SH2) দেখা যাচ্ছে। এই হোভারক্র্যাফ্‌ট্ যে কোন জায়গায় চলবার উপযোগী। বাইর দরিয়া, তটভূমি, তৃণভূমি, উপলাকীর্ণ বেলাভূমি, কর্দমাক্ত সমতলভূমি প্রভৃতি যে কোন স্থানের উপর দিয়ে এই যান অনায়াসে চলতে পারে। পরিচালনের ব্যয়ও খুব কম। ফলে উদ্ধারকার্যে, বিভিন্ন শিল্পে এই হোভারক্র্যাফ্‌ট্
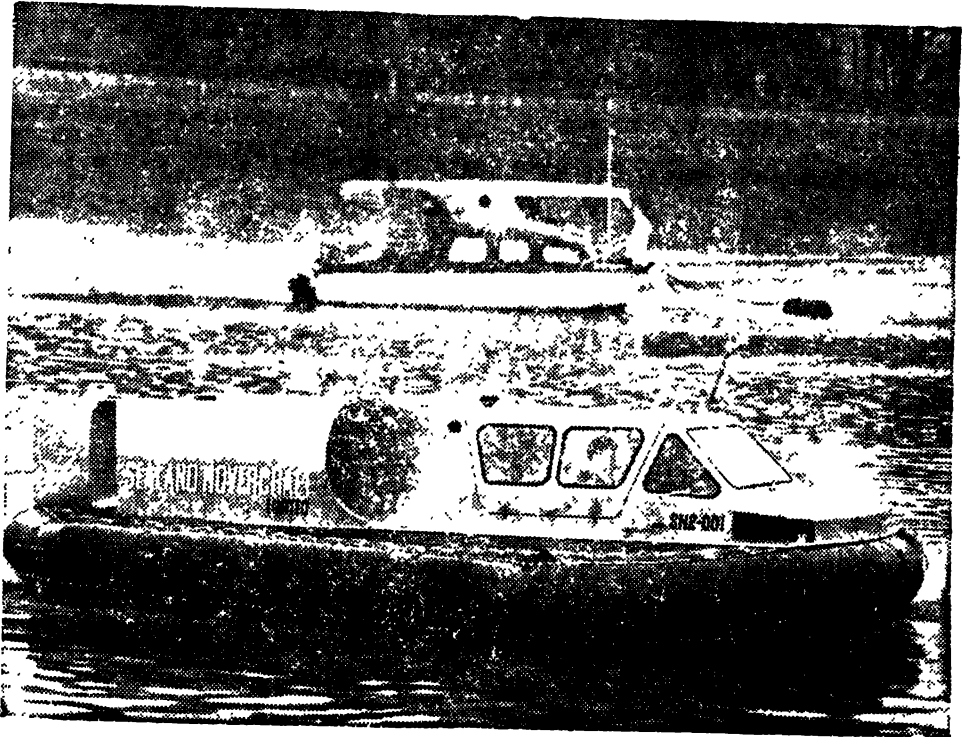
খুবই কাজে লাগবে। এটি অন্যান্য হোভারক্র্যাফ্‌টের মত নয়। SH2 হোভারক্র্যাফ্‌ট্-এর প্রোপেলারের পাখা ছোট হওয়ায় এবং কলকব্জাগুলি খোলের ভিতরে থাকায়—এটি 45 নট (Knot) গতিবেগেও নিঃশব্দে ধাবিত হতে পারে। এর 40 বর্গফুট কেবিনে পাঁচজন যাত্রী ও একজন পরিচালক বেশ আরামেই পরিভ্রমণ করতে পারে কিংবা মাল, যন্ত্রপাতি ও মাল্লাসহ মোট 1,200 পাউণ্ড ভার বহন করতে এটি সক্ষম।

আইনস্টাইন-তত্ত্ব

অরুণচন্দ্র গুহ

ইউক্লিড কর্তৃক প্রবর্তিত জ্যামিতিক নিয়মানুসারে খাতার পাতায় জ্যোতিষ্কপুঞ্জের সোজা ও সরল রেখায় পরিমাপ করা চলে। সোজা লাইন টেনে আলোর বিকিরণ ও গতিবেগ বোঝানো চলে; কিন্তু বিশ্বের বক্রতাহেতু আলোর গতিবেগের সঙ্গে অমিল এসে পড়ে। কারণ জ্যোতিষ্কপুঞ্জই বিশ্বকে বক্র করে রেখেছে, বক্র পথেই আলোর গতি ও বিকিরণ যদিও সোজা ও সরল মনে হয়। মহাবিশ্ব সর্বতোভাবেই বক্র ও গোলাকার। এখানে সময় ও দূরত্ব বক্রতার সামিল। আইনস্টাইন কর্তৃক প্রবর্তিত মহাকাশের এই সব নব তথ্য এবং তথ্যজনিত আকর্ষণের প্রবল প্রভাব নিউটন সূত্রকে বহুলাংশে অচল করে দিল। সেখানে এলো আইনস্টাইন-সূত্রের চতুর্থ মাপকাঠি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে যুক্ত হলো কালের মাপ (Space-Time Continuum)। মহাবিশ্বে বক্রস্থানের পরিমাপে কালের ভূমিকা, যেখানে কাল গতিবেগের সঙ্গে মিল রেখে চলবে। আইনস্টাইনের নব আবিষ্কৃত (1) বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং (2) সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিজ্ঞান-জগতে দুটি সিংহদ্বার।

প্রথমটিতে আমরা পাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর রাজ্য, যা বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অপরটিতে পাই মহাবিশ্বের মহাকর্ষীয় বল (Universal gravitational force), যেখানে বৃহৎ নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের রাজ্যে একে অন্যকে আকর্ষণ করে চলেছে। আবার প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম মতবাদ ও আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় বল প্রায় সমসাময়িক। এই কোয়ান্টাম মতবাদ অর্থাৎ শক্তি থেকে বস্তু, বস্তু থেকে শক্তির নির্গমন, আইনস্টাইন-তত্ত্বে এসে যায়। আইনস্টাইনের দীর্ঘ 25 বছরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, উপরিউক্ত দুটি তথ্যের দ্বারা একটি সমীকরণ ও একীকরণ সূত্রের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে একটি সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ করা।

বিশ্বে নিরপেক্ষ কেউ নয়, থাকাও হয়তো সম্ভব নয়। একটি নীহারিকার সমগ্র নক্ষত্র পরিবার একই নীহারিকার কেন্দ্রীয় আকর্ষণজনিত মহাকর্ষের বেড়াজালে আবদ্ধ। সূর্য যে দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সঙ্গে একই কেন্দ্রীয় নীহারিকার শক্তিতে চালিত হয়ে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলেছে, সেখানে আছে গতির ঐক্য ও আবর্তনের ঐক্য। বিশ্বে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই, আছে মহাকর্ষজনিত ঐক্যবদ্ধতা, সংহতি ও স্থিতিস্থাপকতা। নিউটনের সূত্রগুলি যখন আলোর গতি নির্ধারণে অক্ষম হলো, তখনই এলো আইনস্টাইন-তত্ত্ব, যা সত্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হলো। আইনস্টাইন দেখালেন যে, বিভিন্ন দ্রষ্টার কাঠামোর আপেক্ষিক গতি অনুসারে এক কাঠামোর সঙ্গে অন্য কাঠামোর স্থান ও কালের মাপ পরিবর্তিত হয়ে যায়, যদিও যার যার নিজের কাঠামোর মাপ ও সময় এক অপরিবর্তনীয় সত্য বলে মনে হয়। আমাদের এই মানসিক সহজাত ভ্রান্তি কাটালেন তিনি। তিনি বললেন, আপেক্ষিক গতির জন্যে এক কাঠামোর তুলনায় অন্য কাঠামোর স্থানের দৈর্ঘ্যের সঙ্কোচন ঘটে এবং সময়ও মন্থর হয়ে যায়। তিনি বললেন, আমাদের স্থান ও কালের পরিমাপক যন্ত্রগুলি (Rigid Rod and clock

measurement) আপেক্ষিক গতির তালে তালে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ছোট ও সময়ের দিক থেকে মন্থর হয়ে যায়। এই উক্তিসমূহের নিহিতার্থ হলো—বিশ্বরূপ মহাসমুদ্রে চলমান কোটি কোটি জ্যোতিষ্কপুঞ্জের গতিবেগ এবং দূরত্ব একটি ক্রমিক সঙ্কোচনে আবদ্ধ।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ালো—বিশ্বের সব স্থানই কি সঙ্কোচনের বেড়াজালে আবদ্ধ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরে বলা চলে—বিশ্বে মহাকর্ষ ও মহাবিকর্ষরূপ উভয় শক্তিই কার্যকরী। এখানে একদিকে আছে সৃষ্টি ও জন্মপর্বের মহালোড়ন-জনিত বিস্ফোরণ, সংঘর্ষ ও সংঘাতজনিত ক্রম-বর্ধমান বিশ্বস্ফীতি। বিশ্বদিগন্ত ও আমাদের ছায়াপথ থেকে বহু দূরে বিশ্বের যে ক্রমস্ফীতি চলেছে সৃষ্টিজনিত মহাসংঘাতের মহালোড়নে, সেখানে আছে মহাবিকর্ষের প্রবল ও ভয়ঙ্কর রূপ। আবার আমাদের ছায়াপথ নীহারিকায় আছে মহাকর্ষের প্রবল প্রতাপ। মহাকর্ষের প্রবল টানে আমাদের ছায়াপথ নীহারিকায় সমগ্র নক্ষত্র পরিবারে ক্রমিক সঙ্কোচন একটি মহাসত্য। ক্রমিক সঙ্কোচনই আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার স্বরূপ ও সত্তা। এই স্বরূপ ও সত্তা একমাত্র সম্ভব আমাদের ন্যায় অতি প্রাচীন, প্রবীন ও স্থিতিস্থাপকতাপূর্ণ ছায়াপথ নীহারিকায়।

দূরদূরান্তে বিশ্বক্ষেত্রসমূহে চলেছে সৃষ্টির আদি-পর্বজনিত মহাসংঘাত ও মহালোড়নে মহাবি-কর্ষের ভয়ঙ্কর রূপ—মহানাদের উত্তাল তরঙ্গে। সেখানে চলেছে সৃষ্টিপর্বের ক্রমস্ফীতিজনিত ক্রমবর্ধমান বিশ্বের এক নূতন অধ্যায়। অপর দিকে, আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা মহাকর্ষের দ্বারা ক্রমিক সঙ্কোচনে আমাদের স্থিতিস্থাপকতা-পূর্ণ বিশ্বখণ্ডে এনেছে সঙ্কোচনজনিত মৃত্যুর পদধ্বনি। ক্রমিক সঙ্কোচনেই গতির মন্থরতা ও স্তব্ধতায় আসে মহামিলনে মৃত্যু। বিশ্বের এটাই অমোঘ বিধান যে, ক্রমস্ফীতিতেই বিশ্বের জন্ম ও সৃষ্টিপর্বের আহ্বান। অপর দিকে ক্রমসঙ্কোচনেই বিশ্বের ক্রমবিকাশের স্থিতিপর্বের সাম্য, শান্ত, সংহতিপূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা। আর এই স্থিতিপর্বই ক্রমিক সঙ্কোচনে বিশ্বের ক্রমবিকাশে মৃত্যুপথ যাত্রী। সমগ্র বিশ্ব একই সময়ে একদিকে সৃষ্টিজনিত সংঘাত, বিস্ফোরণের মহালোড়নে আলোড়িত, অন্যদিকে স্থিতিস্থাপকতাপূর্ণ সাম্য, শান্ত ও সংহতি-পূর্ণ নীহারিকাসমূহে সঙ্কোচনজনিত ক্রমিক সঙ্কোচনে এক মহামিলনে মৃত্যু। এখানে আইনস্টাইনের একীকরণ ও সমীকরণ সূত্র কিরূপে কার্যকরী হওয়া সম্ভব? সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আমরা জানি, বস্তু ও অবস্তুতে এত বিরোধ যে, বস্তু অবস্তুর সংস্পর্শে আসামাত্রই উভয়ে এক ভীষণ সংঘাতজনিত বিস্ফোরণে একত্রিত হয়ে যে মহাশক্তির সৃষ্টি করে, তা হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে শত গুণ অধিক শক্তিশালী। আমরা যেমন ধনাত্মক প্রোটনকে ঋণাত্মক প্রোটনরূপে ভাবতে পারি না, ঠিক তদ্রূপ ঋণাত্মক ইলেক-ট্রনকে ধনাত্মকরূপে ভাবতে পারি না। কারণ আমাদের এই স্থিতিস্থাপকতাপূর্ণ প্রাচীন ছায়াপথ নক্ষত্রলোকে তা বর্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু সেই বিপরীতধর্মিতাই ছিল আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার সৃষ্টিপর্বের সংঘাত ও মহালোড়ন-জনিত অতীত অধ্যায়। বিশ্বদিগন্তে যে নব আবিষ্কৃত কোয়াসার ও দূরদূরান্তের নীহারিকা-সমূহে যে সংঘাত, বিস্ফোরণ ও অন্তর্দাবানলের মহাবর্ত ও মহালোড়ন চলেছে সৃষ্টিপর্বের প্রারম্ভিক প্রয়োজনে, সেখানে যে বিপরীতধর্মী অণু-পরমাণুর সমাবেশ ও আলোড়ন নেই, সেটা সম্ভবতঃ অবিশ্বাস্য। সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের বীজ কখনই এক নয়, এক হওয়া সম্ভবও নয়, বিপরীতধর্মী হওয়াই স্বাভাবিক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রাকৃতিক দৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত ঐক্যের ব্যাখ্যায় আসা যাক—"Uniformity is the rigorous law of Nature". কিন্তু প্রশ্ন

আসে, ঐক্য কার? অগ্নিদগ্ধ লৌহখণ্ডকে কামারশালে হাতুড়ীর আঘাতে যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে, তার সঙ্গে সেই পরিণত লাঙ্গল প্রভৃতি অস্ত্রাদির রূপ ও রঙের মিল আছে কি? প্রথম বর্ষার আগত নদীসমূহের উত্তাল তরঙ্গসমন্বিত স্রোত-ধারার সঙ্গে হেমন্ত ও বসন্তের নদীর স্রোত-ধারার মিল আছে কি? সৃষ্টির ঐক্যজনিত নিয়ম বিশ্বস্থিতি পর্বে অচল, স্থিতিপর্বের নিয়ম লয়পর্বে প্রায় অচল। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিশ্বের ক্রমবিকাশেই ঘটে থাকে। একই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন খণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় চলেছে। বিশ্বের সৃষ্টিপর্ব চলে মহাবিকর্ষজনিত প্রসবিনী শক্তির মাধ্যমে - ক্রমস্ফীতিতে সম্প্রসারণ। সেখানে স্থিতিপর্বের সাম্য ও সংহতির কোন বালাই নেই। আছে মহালোড়ন। বিশ্বের সেই আদি সৃষ্টিপর্বের সংঘাতজনিত শক্তিতে সৃষ্টির বীজরূপে অণু-পরমাণুর বিপরীতধর্মিতা আশা করা যায় —মহোত্তাপে। মহোত্তাপে পরমাণুসমূহ বিপরীত পথে চলে; যেমন—আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা-তেই নীল ও নীলাভ নক্ষত্রসমূহ 100 সে. থেকে 150 সে. কোটি সেন্টিগ্রেড তাপে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের মিলনের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় হাইড্রোজেন হিলিয়ামে অবিশ্রান্তভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে অতি সহজভাবে। সরল সূর্যদেহে ঐ একই হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়ামে পঞ্চাশ লক্ষ বছরে, কার্বন ও নাইট্রোজেনের ন্যায় অনুঘটকের বিশেষ সাহায্য। এই বিরাট বৈষম্যের একমাত্র কারণ উত্তাপের হ্রাস। বিশ্বদিগন্তে ও দূরদূরান্তে কোয়াসারসমূহে ও নীহারিকায় তাপমাত্রা অন্তত: দুই হাজার কোটি ডিগ্রি, সেখানে সংঘাতজনিত প্রসবিনী শক্তি এক মহাবিকর্ষের মহাশক্তিতে বিশ্বকে সম্প্রসারিত করে চলেছে। বিশ্বের স্থিতি পর্ব চলেছে সাম্য, শান্ত, সংহত ও স্থিতি-স্থাপকতামূলক মহাকর্ষজনিত ক্রমিক সংকোচনে—আমাদের ন্যায় অতি প্রাচীন, প্রবীন ছায়াপথ নীহারিকায়। যেখানে ক্রমিক সংকোচনে লয়পর্বে সর্বপ্রকার সমান্তরিক রেখা বা জ্যোতিষ্কপুঞ্জ 'এক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য' মহামিলনে গতির স্তব্ধতায় এনে দেবে মহামিলনে মৃত্যু বা বিনাশ। বিশ্বের এটাই অমোঘ অব্যর্থ পরিণতি। এটাই ক্রমবিকাশে ক্রমপরিণতির ধারা।

এই বিশ্বে কেউ নিরপেক্ষ নয়, বিশ্বে কেউ স্বাধীন নয়। বিশ্বের অনন্ত জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যে কোন মহাশক্তির অধীন, তা সে মহাকর্ষই হোক বা অজানা মহাবিকর্ষই হোক। এখানেই আইনস্টাইন তত্ত্বের আপেক্ষিকতাবাদ নিহিত—যেখানে এক দিকে আকর্ষণে সংযোগ ও সংযুক্তির ক্রমপরিণতি ক্রমসংকোচনে, অন্য দিকে বিয়োগ বা বিযুক্তি-মূলক বিকর্ষণে বিভাজন ও ক্রমস্ফীতি। সংযোগ ও সংযুক্তিতে ক্রমসংকোচনই বিশ্বের একমাত্র রূপ নয়—সত্য নয়, বিশ্বের অপর সত্য ও অপর রূপ বিযুক্তি ও বিয়োগের দ্বারা বিভাজনের ক্রম-স্ফীতিতে। বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্র-জগৎ ও নীহারিকাসমূহ উপরিউক্ত দুটি শক্তির যে কোন একটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে বাধ্য।

যে কোন নীহারিকার গতি ও বেগ, যে কোন নক্ষত্রের গতি ও বেগ ঐ কেন্দ্রীয় নীহারিকার মহাশক্তিতে হয় সঙ্কুচিত কিংবা প্রসারিত। সংকোচনই বিশ্বের শেষ কথা নয়, কারণ স্থিতি-পর্বই বিশ্বের একমাত্র অধ্যায় নয়। এখানে একই সঙ্গে চলেছে—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়জনিত ক্রম-স্ফীতি ও ক্রমসংকোচন। সময় ও দূরত্ব এই বিশ্বে শুধু সঙ্কুচিতই হয় না, ক্রমস্ফীতির দ্বারা সময় ও দূরত্ব হয় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম। বিশ্বের ব্যাপ্তি, বিস্তৃতি ও প্রসারণ বর্তমান বিশ্বে অধিক কার্যকরী মহাবিকর্ষের প্রবল প্রতাপে।

আমাদের নীহারিকার দশ হাজার কোটি নক্ষত্রকে সংহত, সংযত ও একীভূত করে রেখেছে

ঐ নীহারিকার কেন্দ্রীয় অভিকর্ষ শক্তি। আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার যে মহাকর্ষের প্রবল প্রতাপ ও প্রাধান্য, একে বিশেষভাবে সাহায্য করছে ধনাত্মক মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray)। ঐ মহারশ্মি তার ধনাত্মক রশ্মির অবিশ্রান্ত বর্ষণের দ্বারা আমাদের ছায়াপথ নীহারিকা বা দ্বীপ-বিশ্বে (Island Universe) একটি মহাকর্ষমূলক শক্তিকে বিশেষভাবে সাহায্য করছে। সেখানে আমাদের সমগ্র নীহারিকা পরিবার নক্ষত্রপুঞ্জসহ এই ধনাত্মক রশ্মির বেড়াজালে আবদ্ধ ও সংহত। আইনস্টাইনের অভিকর্ষীয় শক্তির (Gravitational Field Theory) ব্যাখ্যায় আসা যাক। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তথ্যের উপরই এটি প্রতিষ্ঠিত। একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে যেরূপ যে কোন অস্থির বস্তু (Oscillating mass) অভিকর্ষীয় তরঙ্গ (Gravitational waves) সৃষ্টিতে সক্ষম, ঠিক সেরূপ একটি অস্থির বৈদ্যুতিক কণার আক্রমণে ঐ ক্ষেত্রে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব। এই অভিকর্ষীয় তরঙ্গ, যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গেরই অংশবিশেষ, তার শ্রেষ্ঠ সহায়ক ঐ মহাজাগতিক রশ্মি। মহাজাগতিক রশ্মি তার ধনাত্মক রশ্মির দ্বারা মহাকর্ষের প্রভাব ও প্রাধান্যকে স্থায়ী ও সংহত করছে আমাদের ছায়াপথ নীহারিকায় তড়িৎ-চুম্বকীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে। ঐ রশ্মি তার প্রভাব প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিস্তার করে চলেছে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের ন্যায়। প্রতিটি পরমাণুই একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনসমন্বিত একটি ক্ষুদ্রতম চুম্বক। যে কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে এরা চুম্বকত্ব লাভে সক্ষম। মহাজাগতিক রশ্মিরূপ ধনাত্মক রশ্মি ছায়াপথ নীহারিকায় একটি তড়িৎ-চুম্বকীয় রশ্মিরূপে কাজ করে এবং প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর প্রভাব বিস্তার করে মহাকর্ষীয় শক্তিরূপেও কাজ করে। মহাকর্ষীয় শক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশ আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার ধনাত্মক মহাজাগতিক রশ্মির সর্বগ্রাসী আকর্ষণমূলক চরিত্রবৈশিষ্ট্যে। এখানে বস্তু ও অবস্তুর (Matters and anti-matters) কল্পনা করা অসম্ভব—স্থিতিপর্বের সর্বব্যাপক স্থিতি, সাম্য ও সংহতি একটি ক্রমিক সঙ্কোচনের রূপ নিয়েছে এখানে। একমাত্র আদি সৃষ্টিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই বস্তুর অবস্তু সৃষ্টি সম্ভব, যেখানে প্রসবিনী শক্তিতেই বিকর্ষণজনিত ক্রমস্ফীতি ও সম্প্রসারণ হয়, যেমন বিশ্বদিগন্ত ও দূর দূরান্তের নীহারিকায় হয়ে থাকে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বীজ সম্পূর্ণ আলাদা—বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রয়োজনের তাগিদে।

'অনন্ত' নক্ষত্রের 'অনন্তযাত্রা' অনন্ত পথে, তা সে যতই সমান্তরিক ও দূরত্বপূর্ণ হোক, সময়ের উন্মুক্ত ময়দানে ক্রমবিকাশে একই ক্রম-সঙ্কোচনে আসতে বাধ্য। কারণ, বিশ্বের চরম পরিণতি ক্রমিক সঙ্কোচনে—মহামিলনে মহামৃত্যু।

আইনস্টাইনের বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার—বস্তুর অবস্থাবিশেষে শক্তিতে রূপান্তর অর্থাৎ শক্তি ও বস্তু একই উপাদানের অবস্থান্তর। অবস্থা-বিশেষে দেহান্তরের দ্বারা অবস্থান্তর। আমরা এমন কোন শক্তির কথা কল্পনা করতে পারি না, যেখানে শক্তি কোন দেহধারণ না করে অবস্থান করছে; যেমন—বৈদ্যুতিক শক্তি, চৌম্বক শক্তি ও আলোক শক্তি। আধারেই শক্তির বিকাশ। আধারবিহীন শক্তি আমাদের কল্পনার অতীত। শক্তির আধার ও অবস্থিতি বস্তুতে, অর্থাৎ শক্তির বিকাশ বস্তুতে। বস্তুর সংজ্ঞা হচ্ছে শক্তির সমাবেশ; যেমন—লোহা, সীসা, তামা, দস্তা ও জল। এদের অণু-পরমাণুর সংযুক্তিজনিত শক্তির সমাবেশে লৌহখণ্ড, তাম্রখণ্ড, দস্তাখণ্ড ও জলের পরিমাণ। শক্তিই প্রধান ও আদিভূতা, পরমাণু থেকে অণু, অজৈব থেকে জৈব। পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু রূপান্তরিত হয়ে যে পারমাণবিক শক্তি নির্গত হয়, তা কয়লার রাসায়নিক শক্তির অনুপাতে ত্রিশ লক্ষ থেকে দু-কোটি চল্লিশ লক্ষ গুণ বেশী। পারমাণবিক

শক্তিই পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটন ও নিউট্রনকে ঘনীভূত স্থিত অবস্থায় রেখেছে। কেন্দ্রের ঘনীভূত শক্তি প্রোটন পরস্পরকে বিকর্ষণ করলেও পারমাণবিক শক্তি কোটি কোটি গুণ অধিক বলে আমাদের বিশ্বখণ্ডে আকাশ, বাতাস ও দৃশ্যমান বস্তু-জগতে স্থিত ও সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে। যে কোন পদার্থের সম্পূর্ণ এক গ্র্যাম বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে আড়াই কোটি কিলোওয়াট ঘন্টা শক্তির সমান হয়। ঐ দৃশ্য একমাত্র জীবন্ত ও কার্যকরী হয়ে চলেছে বিশ্বদিগন্তে, কোয়াসারে ও দূর দূরান্তের নীহারিকায় সৃষ্টির আদিপর্বে—এমন কি, অতিকায় শান্ত নীল তারকাসমূহে ঐ প্রসবিনী শক্তিজনিত মহা সৃষ্টিশক্তির বিকাশ। আইনস্টাইনের এটি এক বিপ্লবাত্মক মতবাদ, যেখানে বস্তু ও শক্তি এক ও অভিন্ন সত্তা। কিন্তু মহান বৈজ্ঞানিকের বিশ্বের সমীকরণ ও একীকরণ তত্ত্ব বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে কতদূর সত্য, তা বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষাসাপেক্ষ। কারণ ক্রমস্ফীতিজনিত বিশ্বের বিশাল খণ্ডে যে প্রসবিনী শক্তিরূপে অত্যধিক বিস্ফোরণে, সংঘাতে ও গতিবেগে অত্যধিক চঞ্চলতা ও অস্থিরতা, তার সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র ছায়াপথ বিশ্বখণ্ডে স্থিতিপর্বের সাম্য, শান্ত ও সংহত পরিবেশের মিল কোথায়? বিশ্বের দূরত্ব ও সময়কে কোন একটি সাধারণ তথ্যে বাধা চলে না। বিশ্বের দূরত্ব ও সময় একটি অস্থিরতা-চক্রে ক্রমস্ফীত ও ক্রমবর্ধমান। অস্থির উড়ন্ত পাখীর গতির যেরূপ পরিমাপ করা চলে না, তদ্রূপ চলমান বিশ্বের গতির পরিমাপ চলে না, বিশেষতঃ সেই গতি যখন দ্বিতীয় এক অস্থির গতির উপর নির্ভরশীল। এই ডিম্বাকৃতি বা প্রায় বৃত্তাকার বিশ্ব স্পষ্টভাবে একটি তড়িৎ-চুম্বকের ন্যায় ব্যবহার করছে—মহাকর্ষ ও মহাবিকর্ষ শক্তিদ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধে। এখানে একদিকে সৃষ্টির আদি পর্বের মহাবিকর্ষের ভয়ঙ্কর রূপ, অন্যদিকে স্থিতিপর্বের সাম্য ও সংহতি। মানুষের জীবনে যেরূপ শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যু, বিশ্বের ক্রমবিকাশেও নক্ষত্র ও নীহারিকায় ঐ একই ক্রমিক জীবন ও মৃত্যু। শৈশব ও যৌবনের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের সঙ্গে প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের ধীরতা, স্থিরতার কোন তুলনাই চলে না।

এখন প্রশ্ন উঠেছে—ডপ্‌লার তথ্যের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে। কোয়াসার ও অতিকায় শান্ত, নীল তারকাসমূহ যে অত্যধিক পরিমাণে লাল রঙের দিকে অপসরিত হয়, তার মূলে শুধু তাদের গতিবেগই দায়ী, না এদের অত্যধিক কেন্দ্রীয় অভিকর্ষীয় শক্তি সমভাবে দায়ী? আমাদের চিরপরিচিত নীহারিকায় যে নূতন কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে 3C, 273, তার দূরত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে এক বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও ঐ পুরাতন নক্ষত্রটি নূতন কোয়াসাররূপে পরিচিত হলো, তার লাল অপসরণ অর্থাৎ পৃথিবীবিমুখী গতি অত্যধিক, যা শুধু তার নিজস্ব গতিবেগ কিংবা দূরত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। এখানে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে, তার অত্যধিক কেন্দ্রীয় অভিকর্ষ শক্তির প্রাবল্য লাল অপসরণ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ কিনা? অথবা তার দূরত্ব আমাদের ছায়াপথ নীহারিকার বহু পশ্চাতে? যদি কেন্দ্রীয় অত্যধিক অভিকর্ষীয় শক্তি ঐ লাল অপসরণে কার্যকর হয়, তাহলে আইনস্টাইনের আর একটি তথ্যের গভীর সত্যতার প্রকাশ পাবে, যা আজ পর্যন্ত অবিদিত। তিনি বলেছেন, নক্ষত্রদেহের অত্যধিক কেন্দ্রীয় অভিকর্ষ শক্তি তার আলো ও তাপ নির্গমনে বাধা দেবে। শুধু তাপ ও আলো বাধাপ্রাপ্ত হবে না, অত্যধিক অভিকর্ষ শক্তি হয়তো প্রকাশিত হবে অন্য রূপে—যেমন এখানে লাল অপসরণের বৃদ্ধিতে। এই সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি ; হয়তো বৈজ্ঞানিকদের এই সন্দেহ সত্যে পরিণত হবে এবং মহান বৈজ্ঞানিকের আর একটি তথ্যের অপরূপ স্বকীয়তা ও স্বরূপ প্রকাশ পাবে অকল্পনীয়ভাবে।

পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা

শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল*

1945 সাল, 6ই অগাস্ট—সকাল 8-15 মিঃ। হঠাৎ নীল-বেগুনী রঙের তীব্র আলোর ঝলক। আর তার পরেই প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটলো হিরোসিমায় আর তার ফলে যে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হলো, তার বর্ণনা দেওয়া কষ্টকর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু-লক্ষ লোক মারা গেল, কত লোক বিকলাঙ্গ হলো তার ইয়ত্তা নেই। কি যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা খানিকটা বোঝা যাবে, যাঁরা ঐ অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন এবং আজও বেঁচে আছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টাকেশি ইটো সেদিন ছিলেন স্কুলের ছাত্র। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছু?

তিনি বললেন, বেশ মনে আছে—আগুন জ্বলছে, যেদিকে তাকানো যায়—শুধু আগুন। সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে মানুষগুলি ছুটছে, গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে গায়েই ঝুলছে। …কিন্তু বিশ্বাস করুন—কোন সোরগোল ছিল না। মাত্র কয়েক মিনিট, তারপর ক্রমে আর্তনাদ উঠলো, যার তুলনা নেই।

সকাল 8-15 মিঃ। রাত্রে এবং সকালে একটা কারখানায় কাজ করি। হঠাৎ নীল আলোর ঝলক দেখে চমকে উঠলাম। যেখানে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের মধ্যেই ছিল কারখানাটি। ছুটে গেলাম ফটকের দিকে …কিন্তু ফটকে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনে সব কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। বহু লোক কারখানা ঘরের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো, দেয়াল ধ্বসে পড়লো, ছাই উড়ে গেল।…দূরে দেখতে পেলাম, পাহাড়ের ওদিকে রক্তবর্ণের বাষ্পপুঞ্জ পৃথিবী থেকে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

এই বোমার চেয়েও বহু শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা তৈরি হয়েছে। এই বোমার ধ্বংসলীলা হিরোসিমার বোমার বিধ্বংসী ক্ষমতার 1000 গুণ বেশী। অ্যাটম বা পরমাণু বোমার শক্তির সীমা আছে, কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার শক্তি যত খুসী বাড়ানো যায়।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—পরমাণু বোমার আকার তো খুব বড় নয়, তাহলে ঐ অল্প পরিমাণ মশলা থেকে এমন প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যায় কি করে? পাওয়া যেতে পারে—কেন না, আইনস্টাইন বলেছিলেন, যদি বস্তুর এক কণাও ধ্বংস হয়, তবে তাথেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া সম্ভব। তাঁর মতে, বস্তুকে শক্তিতে এবং শক্তিকে বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। তাঁর বিখ্যাত সমীকরণটি হলো—

$$E = mc^2$$

E = Energy, m = mass, c = velocity of light

E = শক্তি, m = ভর এবং c = আলোর বেগ।

এই সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1 গ্র্যাম মাত্র ভর থেকে 9×10^{20} আর্গ শক্তি পাওয়া যাবে। এর অর্থ এই যে, এই পরিমাণ শক্তি দিয়ে 30,000,00) টন ওজনকে থেকে 1000 ফুট উপরে তোলা যাবে যে কোন

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ; মেদিনীপুর।

বস্তুকে ধ্বংস করে এরকম শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমরা দেখবো, কোন্ বস্তুকে সহজে ধ্বংস করা যায়। তাই বলে কেউ মনে করবেন না যে, আইনষ্টাইনের সমীকরণ দেখা মাত্র বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বোমা তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করবার জন্যে এই সমীকরণ তাঁদের সাহায্য করেছিল কেমন করে এই বোমা তৈরি হয়েছিল এখন সে কথাই বলছি।

1938 সালে জার্মেনীতে O. Hahn এবং Strassman সবচেয়ে ভারী প্রাকৃতিক পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তাঁরা ইউরেনিয়াম কেন্দ্রককে (Nucleus) নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে দেখলেন, ঐ কেন্দ্রক নিউট্রন গ্রহণ করে দুটি প্রায় সমায়তনের হাল্কা পরমাণু ($_{56}Ba^{145}$ এবং $_{36}Kr^{94}$) তৈরি করে। তাঁদের মতে, বিক্রিয়াটি হয় এই ভাবে—

$$_{92}U^{238}+{}_0n^1\rightarrow {}_{92}U^{239}\rightarrow {}_{56}Ba^{145}+{}_{36}Kr^{94}+3.{}_0n^1.$$
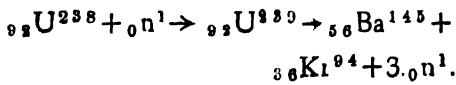
এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি নির্গত হয়। এখন যেহেতু উৎপন্ন Ba এবং Kr-এ স্বাভাবিক $_{60}Ba^{145}$ এবং $_{40}Kr^{94}$-এর চেয়েও নিউট্রন বেশী আছে, সেহেতু এই বিক্রিয়ায় কিছু নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। সাধারণতঃ এর সংখ্যা তিনটি, তাছাড়াও বেশ কিছু শক্তিশালী গামা-রশ্মি বেরিয়ে আসবে। 1939 সালে Meitner এবং Prof. O. R. Erish এই পরীক্ষা আবার করে দেখলেন যে, Hahn এবং Strassman-এর কথাই ঠিক। তাঁরা এই প্রক্রিয়ার নাম দেন ফিসন (Fission) এবং আইনস্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে দেখালেন যে, প্রতি ফিসনে 200 Mev শক্তি উৎপন্ন হয়। তাহলে ইউরেনিয়াম শক্তির অফুরন্ত উৎস হতে পারে।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, প্রকৃতিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তাতে কোন কাজ হয় না। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে দুটি Isotope ($_{92}U^{235}$ এবং $_{92}U^{238}$) আছে। U^{238}-এর পরিমাণ হলো 99·3% এবং U^{235}-এর পরিমাণ হলো মাত্র ·7%। এর মধ্যে U^{235} ফিসনের উপযুক্ত। এখন যদি কিছু U^{235}-কে কম শক্তিসম্পন্ন নিউট্রনের (Thermal neutron) দ্বারা আঘাত করা হয়, তাহলে ফিসন হবে এবং কিছু শক্তি ও কয়েকটি নিউট্রন বেরিয়ে আসবে। এই নিউট্রন আবার আশেপাশের কেন্দ্রককে আঘাত করে ফিসন ঘটাবে। তার ফলে যে নিউট্রন বেরিয়ে আসবে, তা অনুরূপ উপায়ে ফিসন ঘটাতে থাকবে এবং প্রচুর শক্তি নির্গত হবে। এই ভাবে একটা শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) হবে। যদি এই ভাবে এক পাউণ্ড U^{235}-এ ফিসন ঘটানো হয়, তাহলে যে শক্তি পাওয়া যাবে, তা দিয়ে 1MW শক্তির বিদ্যুৎ এক বছর ধরে সরবরাহ করা যাবে একটি মাত্র নিউট্রন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। কিন্তু এই শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া ততক্ষণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ ইউরেনিয়ামের একটা ন্যূনতম ভর থাকে। কেন না U^{235}-এর পরিমাণ খুব কম হলে ফিসনের ফলে উৎপন্ন নিউট্রন অন্য কোন কেন্দ্রককে আঘাত করবার আগেই U-এর টুক্রা থেকে বেরিয়ে যাবে। শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া হবার জন্যে কমপক্ষে যতটা U^{235} প্রয়োজন, তাকে বলা হয় critical mass বা ন্যূনতম ভর। U^{235}-এর ন্যূনতম ভর 1 k.g.। এই 1 k.g. U^{235}-এ ফিসন হতে সময় লাগে মাত্র 10^{-6} সেকেণ্ড। U^{235} বা $_{94}Pu^{239}$-এর ভর ন্যূনতম ভরের কম হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

প্রকৃতপক্ষে পরমাণু বোমা দুই টুক্রা U^{235} বা Pu^{239}, যাদের প্রত্যেকের ভর ন্যূনতম ভরের কম, কিন্তু উভয়ের যুক্ত ভর ন্যূনতম ভরের একটু বেশী। যখন এই দুই টুক্রাকে দূরে রাখা হয়, তখন কোন বিস্ফোরণ হয় না। কিন্তু যখন যান্ত্রিক উপায়ে একত্রিত করা হয়,

তখন তাদের ভর ন্যূনতম ভরের একটু বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাইক্রো সেকেণ্ডের মধ্যে ফিসন হয়ে প্রচুর শক্তি (8.2×10^{20} আর্গ) বেরিয়ে আসে এবং তাপমাত্রাও হঠাৎ হয় 10^7°C; আর চাপ বেড়ে যায় স্বাভাবিক চাপের কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত তাপ এবং চাপ সৃষ্টির ফলে বিস্ফোরণ হতে বাধ্য। এর পর বাতাস তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি আশেপাশের অঞ্চলে উড়িয়ে নিয়ে যায়। এই ভস্মরাশি প্রাণী-জগতের পক্ষে গুরুতর ক্ষতিকারক। হিরোসিমার বোমার ক্ষমতা ছিল প্রায় 20,000 টন T. N. T-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান অথচ এর জন্যে প্রয়োজন হলো মাত্র 1k.g. U^{235}। এখন হয়তো অনেকে ভাবছেন যে, 2k.g. U^{235} দিয়ে বোমা তৈরি করলে কি আরও বেশী শক্তিশালী হবে? উত্তর—না। কেন না, 10^{-8} সেকেণ্ডে 1k.g. U^{235}-এ ফিসন হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে; সুতরাং বাকী অংশ কোন কাজেই আসবে না। তাহলে পরমাণু বোমা তৈরি করতে হলে বেশ কিছু U^{235} প্রয়োজন। কিন্তু আগেই বলেছি U^{235} আছে মাত্র ·7% এবং তাও U^{238}-এর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং U^{235}কে আলাদা করতে হবে। পৃথক করবার দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ামের কণাগুলি তীব্র গতিতে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (Electric Field) মধ্য দিয়ে চালানো হয়। ভারী U^{238} কণাগুলি সোজা চলে যাবে, কিন্তু হাল্কা U^{235} কণাগুলি ক্ষেত্রের (Field) প্রভাবে বেঁকে গিয়ে ক্ষেত্রের ধারে ধারে জমে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে U-কে ইউরেনিয়াম হেক্সা-ফ্লোরাইড (UF_6) গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই গ্যাসকে এক প্রকারের খুব সূক্ষ্ম ফিল্টারের মধ্য দিয়ে চালানো হয়। এতে হাল্কা U^{235} কণাগুলি ফিল্টারের মধ্য দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু U^{238} যেতে পারবে না।

এভাবে আলাদা করা যায় বটে, তবে এত কম যে, বোমা তৈরির প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে লাগলেন—বেশী পরিমাণ U^{238} থেকে বোমা তৈরির কোন মশলা তৈরি করা যায় কি না। তখন তাঁরা U^{238}-কে সম্পূর্ণ এক নূতন পদার্থ—প্লুটোনিয়ামে ($_{94}Pu^{239}$) পরিণত করলেন। এই Pu^{239} ধীর এবং দ্রুত দুই রকম নিউট্রনেই ফিসন হয়। আর এই Pu^{239} প্রচুর পরিমাণে পাবার জন্যে তৈরি হলো অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর।

হিরোসিমার বোমায় U^{235}-এর একটি টুকরাকে টার্গেট করা হয়েছিল, তার মাঝে একটা গর্ত করা ছিল। U^{235}-এর দ্বিতীয় টুকরাকে কামার করে প্রথমটির গর্তে প্রবেশ করানো মাত্র যুক্ত ভর ন্যূনতম ভরের বেশী হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরিত হলো।

নাগাসাকিতে যে বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা Pu^{239} (প্লুটোনিয়াম) দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। প্লুটোনিয়ামকে একটি গোলাকার পাত্রে রেখে তার চারদিকে ডিনামাইটজাতীয় সাধারণ বিস্ফোরক দিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল, যাতে বাইরের পদার্থ বিস্ফোরিত হলে, বিস্ফোরণের শক্তি পাত্রের ভিতরের দিকে চাপ দিতে পারে। বিস্ফোরণের চাপে Pu-এর টুকরাটির আয়তন কমে যায় এবং ভরও ন্যূনতম ভরের একটু বেশী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথমে Pu^{239}-এর ভর ন্যূনতম ভরের সামান্য একটু কম থাকে।

কিন্তু এর চেয়েও এক হাজার গুণ শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার কথায় আসা যাক। পরমাণু বোমা যে প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়, H-বোমা তৈরি হয় তার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ায়। যখন কোন দুটি হাল্কা বস্তুর পরমাণুকে সজোরে সংযুক্ত করা হয়, তখন ভারী পরমাণু গঠিত হয়

এবং কিছু তর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় Fusion (Fission-এ একটি ভারী পরমাণুকে ভেঙে দুটি হাল্কা পরমাণু করা হয়)। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপের কারণও এই ফিউসন (Fusion)। সূর্যের ভিতরে ক্রমাগত দুটি হাল্কা হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে ভারী হিলিয়াম পরমাণু তৈরি করে এবং প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হয়। এথেকেই H-বোমা তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু H-বোমার ফিউসন ঘটাতে প্রথমেই বহু ডিগ্রীর (10^7°C) উত্তাপ দরকার। এই প্রচণ্ড উত্তাপ পাওয়া যেতে পারে একমাত্র পরমাণু বোমা থেকে। হাইড্রোজেন ছাড়াও হাল্কা বস্তু হিসাবে deuterium এবং tritium দিয়ে H-বোমা তৈরি করা যেতে পারে। যে সব Fusion বা তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়ার (Thermo-nuclear reaction) সাহায্যে H-বোমা তৈরি করা যায়, তা হলো—

$$1\,D^2+1\,D^2 \rightarrow 2\,He^3+{}_0n^1+3{\cdot}25\text{ Mev.}$$

$$1\,D^2+1\,D^2 \rightarrow 1\,T^3+1\,H^1+4\text{ Mev.}$$

$$1\,D^2+1\,T^3 \rightarrow 2\,He^4+{}_0n^1+17{\cdot}6\text{ Mev.}$$
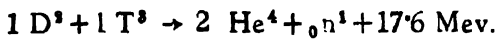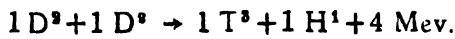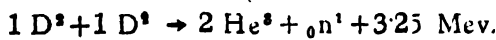
এদের মধ্যে সর্বশেষের বিক্রিয়াটি ঘটে 10^{-6} সেকেণ্ডে। সে জন্যে সাধারণতঃ H-বোমা তৈরির উদ্দেশ্যে deuterium ($1D^2$) এবং tritium ($1T^3$) ব্যবহার করা হয়।

প্রথমে পরমাণু বোমাকে একটি উপযুক্ত পাত্রে রেখে তার চারদিকে D^2 এবং T^3 দিয়ে ভর্তি করা হয়। এবার একটি ট্রিগারের সাহায্যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে তার উত্তাপে বাইরের হাল্কা পদার্থের পরমাণু যুক্ত হয়ে ভারী পদার্থের পরমাণু তৈরি করে এবং প্রচণ্ড তাপ এবং চাপের সৃষ্টি হয়। 1954 সালে আমেরিকা যে H-বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, তার ক্ষমতা ছিল 2000,000 টন T.N T-এর সমান। এই ধরণের বোমার বিস্ফোরণের সময় তাপ হয় প্রায় 10^{20}cal/gm/sec. অর্থাৎ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন জিনিষ পুড়ে ছাই হয়ে উড়ে যেতে পারে। এই বোমার শক্তি অসীম হবার কারণ পরমাণু বোমার মত এখানে ন্যূনতম ভরের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যত খুশী মশলা নেওয়া যায়।

এই বোমাকে আরও মারাত্মক করা যেতে পারে যদি একে কোবাল্টের আস্তরণ দিয়ে আবৃত করা হয়। H-বোমা এমন মারাত্মক যে, একে বলা হয় নরক বোমা (Hell Bomb) বা কোবাল্ট বোমা। H-বোমার বিস্ফোরণের সময় যে নিউট্রন বেরিয়ে আসে, তা কোবাল্টকে আঘাত করে একপ্রকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Co^{60}) তৈরি করে। যার ক্ষমতা রেডিয়ামের 320 গুণ। যদি বোমায় এক টন $1D^2$ থাকে। তবে 250 পাউণ্ড নিউট্রন অর্থাৎ 15000 পাউণ্ড Co^{60} তৈরি করে, যার ক্ষমতা 2400 টন রেডিয়ামের সমান। Co^{60}-এর হাফ-লাইফ-পিরিয়ড 5 বছর অর্থাৎ 5 বছর পরে এর পরিমাণ হবে 1200 টন, 10 বছর পরে 600 টন এবং এভাবে চলতে থাকবে; অর্থাৎ মাত্র 1 টন $1D^2$ দিয়ে 50 বছর ধরে ধ্বংসলীলা চালানো যাবে। বোমার প্রচণ্ড উত্তাপে এগুলি বাষ্প হয়ে যায় এবং বাতাসের সাহায্যে বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে থিতিয়ে পড়ে। এরপর গাছ এবং পশুদের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে ক্যান্সার, লিউকেমিয়া প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে। এর পরবর্তী কালে যাদের জন্ম হয় তারাও নিস্তার পায় না, বেশীর ভাগ শিশুই বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে অথবা মারা যায়।

সোভিয়েট বিজ্ঞানী কাপিৎসা বলেছেন, হাইড্রোজেন বোমার শক্তিকে অনন্তকাল ধরে প্রায় বিনামূল্যে সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখানেও বোমার সাহায্যে সমুদ্রের জলকে 10^7 °C-এ নিয়ে যাওয়া হবে। জলের হাইড্রোজেন পরমাণুকে যদি কিছুক্ষণ এই তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হয়, তবে দুটি H-পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি ভারী হিলিয়াম পরমাণু হবে। এই সময় যে গামা রশ্মি বেরিয়ে আসবে, তা আবার আর একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ধ্বংস করবে। ফলে আরও প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যাবে। এভাবে তাপ পরমাণু বিক্রিয়া চলতে থাকবে—যতক্ষণ না প্রতিটি হিলিয়াম পরমাণু কার্বন পরমাণুতে পরিণত হয়। চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে আবার এনে দিতে হবে সমুদ্রের জল, যার বৃহৎ অংশই হচ্ছে হাইড্রোজেন। এভাবে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং তাপ-বিদ্যুতের এক অনন্ত ভাণ্ডারের কাজ সুরু হবে।

প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পরমাণু বোমা বা H-বোমা তৈরি করে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত করা উচিত কিনা—সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তবে এই বোমার শক্তি নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কাজেই লাগানো উচিত।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পুরনো কাগজ থেকে কাঠ ও আবর্জনা থেকে কাগজ

সংবাদ পত্রের কাগজ তৈরি হয় কাঠ থেকে। এটি খুবই মূল্যবান বস্তু। পুরনো কাগজ ফেলে দেবার অর্থই অপচয়। পুরনো সংবাদ পত্রকে পুনরায় কাঠের মত বস্তুতে রূপান্তরিত করবার একটি প্রক্রিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ওয়েস্টিং হাউস রিসার্চ লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা প্লাষ্টিকের পরিত্যক্তাংশের সঙ্গে সংবাদ পত্র মিশিয়ে এই বস্তুটি প্রস্তুত করেছেন। এজন্যে এই মিশ্রিত উপাদানকে স্ফুটনাঙ্কেরও উপরে উষ্ণতার মধ্যে রাখতে হয়। তারপর প্রচণ্ড চাপের সাহায্যে ঐ মিশ্রিত উপাদানের খুব শক্ত ও মজবুত চাদর তৈরি করা হয়। ঐ বস্তুটি আসবাবপত্র নির্মাণ এবং আভ্যন্তরীণ দেয়াল-সজ্জায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

আমেরিকার সেণ্ট রেগিস পেপার কোম্পানী এই প্রথম ময়লা ও আবর্জনা থেকেও কাগজের উপাদান বের করে নিয়ে তা দিয়ে কাগজ তৈরি করেছেন।

ভারত মহাসাগরে ভারতের স্থান পরিবর্তন

প্রচলিত মত এই যে, ভারত একদা দক্ষিণ গোলার্ধের এক বিশাল মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ভারত, আফ্রিকা, অ্যাণ্টার্টিকা বা কুমেরু অঞ্চল এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ছিল সেই মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত—পরস্পর সংলগ্ন। প্রায় 15 কোটি বছর পূর্বে ঐ সকল দেশ পৃথক হয়ে যায়, উপমহাদেশ ভারতও ঐ সময়ে ঐ সকল এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ঐ সকল দেশ কি ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সরে যাচ্ছে, তার কারণ কি—সে সকল বিষয় আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ক্রিপ্স্ ইনস্টিটিউশন অব ওশ্যানোগ্রাফি তথ্যানুসন্ধানে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্যে বিজ্ঞানীদের ভারত মহাসাগরের তলদেশের বহু দূর পর্যন্ত খনন করে শিলা, প্রস্তর ও পলল সংগ্রহ করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে ঐ ইনস্টিটিউশনের ঐ কাজের জন্যে নির্মিত গ্লোমার চ্যালেঞ্জার নামে যন্ত্রপাতিসমন্বিত তথ্যানুসন্ধানী জাহাজটি সিংহলের কলম্বোতে

পৌঁচেছে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশে খননকার্য চালানো সম্পর্কে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ক্রিপস্ ইনস্টিটিউশন অব ওশ্যানোগ্র্যাফির একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

স্ক্রিপস্ ইনস্টিটিউশনের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর জন. জি. স্লেটার ও অষ্ট্রেলিয়ার বেডফোর্ড পার্কের ফ্লিণ্ডার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্রিস্টো-ফার ভ্যাণ্ডার বর্চের তত্ত্বাবধানে ভারত মহা-সাগরে এই খননকার্য চালানো হবে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভারত উপমহাদেশ ভারত মহাসাগরে সরতে সরতে বর্তমানে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে নিম্ন-লিখিত তিনটি অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে—ভারত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলে সমুদ্রতলে অবস্থিত সুদীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ শৈলশ্রেণী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহানা এবং হোয়ার্টন অববাহিকা। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী হিমালয় পর্বত থেকে যাত্রা করে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে এবং ঐ ছুটি নদীর মোহনায় প্রচুর পলিমাটি এসে জমেছে। ভারত ও এশিয়া ভূখণ্ডের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই একদা হিমালয় পর্বতের সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলেন, ঐ সকল নদী কর্তৃক হিমালয় পর্বত থেকে বয়ে নিয়ে আসা ঐ পলল পরীক্ষা করে এই সংঘর্ষ ও পর্বত সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

ভাইরাসের বর্ণসঙ্কর

সংক্রামক জটিল রোগের সৃষ্টি কি ভাবে হয়? কোন কোন ভাইরাস দেহের মধ্যে কি করে বহুদিন পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে? সোভিয়েট ইউনিয়নের চিকিৎসা-বিজ্ঞানসংক্রান্ত অ্যাকাডেমির ভাইরোলজি বিষয়ক ইভানোভ্স্কি ইনস্টিটিউটে যে গবেষণার কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তা এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে।

এটা দেখা গেছে যে, একটা ভাইরাস যখন দেহকোষের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তা দেহ-কোষকে তার স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য করে। তার ফলে ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন উৎপন্ন করে এবং তারা ভাইরাস কণা সৃষ্টি করে। এই ভাইরাস-কণা একেবারে ভাইরাসের মত। ভিক্টর ঝ্দানোভ, কেলিক্স ইয়েরশোভ এবং লিওনিদ উরিভিয়েভ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, দেহকোষে প্রবিষ্ট ভাইরাসের অনুরূপ ভাইরাস ছাড়াও এই পদ্ধতিতে তথাকথিত বর্ণসঙ্কর ভাই-রাসের সৃষ্টি হয় এবং তার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এদের বিশিষ্ট রকমের জৈব এবং রাসায়নিক উপাদান আছে, যা মূল থেকে আলাদা। যেমন এদের উপর সিরামের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। অথচ এসব তথাকথিত ভাইরাস যথেষ্ট সংক্রামক।

ভাইরাসের জৈব সমন্বয়ের এই নতুন তত্ত্ব—মানবদেহের ভিতরে যে পদ্ধতি কাজ করছে, তার সারমর্ম সম্পর্কে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করছে।

ক্ষুদ্রকায় নারকেল গাছ

পৃথিবীর জনসাধারণের খাদ্যপুষ্টির ভিত্তি হলো মাত্র ডজনখানেক কৃষিলব্ধ গাছপালা, অন্যান্য সমস্ত গাছপালার ভূমিকা হলো অপ্রধান। বিশেষ করে বিশ্বের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে এমন শত শত গাছ-পালা আছে, যেগুলির চাষ-আবাদ করা যেতে পারে। গ্রীষ্মমণ্ডল এবং উপগ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিদ-জগতে কৃত্রিম গাছপালার যে চাষ হয়েছে, তাতে বেশ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে এবং খুব ভাল ফলও পাওয়া গেছে। পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক ডক্টর হাইনজ্ ক্রসার ত্রিনিদাদে যে কৃষিকাজ করছেন, তার প্রথম ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমানে নারকেল গাছ নিয়ে যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে, তা রীতিমত চমকপ্রদ।

নারকেল বিশ্বের প্রতিটি দশ জনের মধ্যে এক জন অধিবাসীর প্রোটিন সরবরাহের প্রধান উৎস। দশ থেকে কুড়ি মিটার উঁচু এই নারকেল গাছ থেকে নারকেল হাতে সংগ্রহ করতে হয়, কিন্তু জীবনের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এত সময় ব্যয় করে এত উঁচু থেকে নারকেল সংগ্রহের কাজ সম্বন্ধে অনুৎসাহের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভেনিজুয়েলা পলিনেশিয়া থেকে শুকনো নারকেল আমদানী করে থাকে। প্রোফেসর ক্রসার 20 বছর ধরে ল্যাটিন আমেরিকায় গবেষণা করে নূতন আশার আলোক দেখতে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্রাকার নারকেল গাছ জন্মাতে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন। এই সব গাছের নারকেল খুবই কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়। এগুলির আরও কয়েকটি গুণ হলো, গ্রীষ্মমণ্ডলের ঝড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং নারকেল গাছ যে ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে মরে যায়, তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া।

এই ক্ষুদ্রকায় নারকেল গাছগুলি ছাড়াও অধ্যাপক ক্রসার এক ধরণের ব্রেজিলিয়ান তৈলযুক্ত জঙ্গলী নারকেল এবং দক্ষিণ আমেরিকার গুইলেলিমাইলিসের কাঁটাশূন্য পাম ফল নিয়ে গবেষণা করে নূতন সম্ভাবনার খোঁজ করছেন। এই সব গাছগুলির চাষ-আবাদ করে খুব ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক ক্রসার ও তাঁর ভেনিজুয়েলার সহকর্মীরা 1964 সাল থেকে তাপ বিকিরণ বন্ধ করে প্রোটিনসমৃদ্ধ রসালো লিউপাইন ফলগুলির মধ্যে পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করছেন। জার্মান গবেষকদের মতে, প্রোটিনসমৃদ্ধ চিক-শুঁটিগুলির মধ্যেও এই পরিবর্তন আনা সম্ভব, যদিও এই ফলগুলির মধ্যে এমন বিষ আছে, যা মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই শুঁটির চাষ করা হয়।

পুস্তক-পরিচয়

জীবনের বিস্ময়—সুনির্মল রায়, সুশ্বেতা বিশ্বাস, রাধাকান্ত মণ্ডল। প্রকাশক—বিদ্যা-ভারতী, 8/C, টেমার লেন। কলিকাতা-9; মুল্য তিন টাকা।

আধুনিক বিজ্ঞানের যে বিভিন্ন দিকগুলি আমাদের পুরাতন ধারণার যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে, জীব-বিজ্ঞান তাদের অন্যতম। নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল রহস্যের চেয়ে আরও জটিল যেন জীবনের রহস্য, তা ধরা পড়েছে গত কয়েক দশকের মধ্যে। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান সম্পর্কে বাংলায় সহজপাঠ্য বই সহজে চোখে পড়ে না। আলোচ্য পুস্তকখানি সে অভাব কিছুটা পূরণ করবে।

গত দুই দশকে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে, তাতে গবেষণাগারে হয়তো এই শতকেই জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। কথাটা এই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য মনে হবে। জীবনের বিস্ময় বইটি আমাদের সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

বইটি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। জীবনের সংজ্ঞা থেকে আরম্ভ করে জীবনের জন্ম, পৃথিবীর প্রথম প্রাণ কি করে এলো—প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সে

সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা রয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধানে নতুন কোন মতবাদ ইতিমধ্যে প্রচারিত হয় নি। তাই এই অংশটি গতানুগতিক মনে হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাণিজগতের বিবর্তন বিবৃত হয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে জীবজগতের বৈচিত্র্য ও জীবজগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে। এই দুটি অধ্যায় পড়ে জীবজগৎ সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য আহরণ করা যায়। এই অংশে—পুরুষ মৌমাছিদের তেরো হাজার চোখ থাকে, উড়ুক্কু মাছ, চোর পাখী, পেটুক শামুক, পাথরখেকো কুমীর, নারকেলপাড়া বানর, গরুপোষা পিঁপড়ে, বিষাক্ত ব্যাং প্রভৃতি সম্পর্কে নানা প্রকার কৌতুকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন জীবের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনাও যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগাবে।

সপ্তম অধ্যায়ে জীবকোষ সম্পর্কিত আলোচনায় জিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, জিনের রদবদল—এমন কি, খোরানার আবিষ্কার পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। এই অধ্যায়টিতে আধুনিকতম আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে। অষ্টম অধ্যায়ে মন, বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সম্পর্কে আধুনিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোচনা রয়েছে। কম্পিউটার কি মস্তিষ্কের বিকল্প হতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরও এই অংশে পাওয়া যাবে। নবম অধ্যায়ে জীব-বিজ্ঞান গবেষণার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা শুধু জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই ক্ষান্ত নন। পরীক্ষাগারে মানবশিশুর জন্ম দেওয়া যায় কিনা, ক্লোনিং, কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত, নতুন নতুন ফসল ফলানো সম্ভব কিনা, মানুষের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা, নীরোগ অবস্থায় শতাধিক বছর বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা—ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই অংশটিকে প্রযুক্তি জীব-বিজ্ঞান বা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং আখ্যা দেওয়া যায়।

একদা আইনস্টাইন জড় ও শক্তির যে তুল্যমূল্যতা আবিষ্কার করেছিলেন, তারই প্রকাশ দেখা গেল ফিসন ও ফিউসন বোমার ধ্বংসলীলায়। আবার তার কল্যাণকর প্রয়োগ হলো নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরে। বিশুদ্ধ জীব-বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে প্রসূত যে জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়টি সবেমাত্র শৈশবে পা দিয়েছে তার প্রয়োগ শুভ বা অশুভ দুই-ই হতে পারে। নবম অধ্যায়ে সেই উভয় ইঙ্গিতই পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে পৃথিবীর বাইরে জীবনের সন্ধান সম্পর্কে আলোচনায় বহির্জগতে জীবন-সন্ধানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও সম্ভাবনার কথা বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম ও নবম অধ্যায় সাধারণ পাঠকের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে। দশম অধ্যায়ে পৃথিবীর বাইরে জীবন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যে সব তথ্য জানা গেছে, তার কিছু বিবরণ থাকলে ভাল হতো।

বইটি ছোটদের জন্যে লেখা হলেও বয়স্কদের জানবার মত অনেক কিছুই রয়েছে। কাগজ ও ছাপা চলনসই, তবে এরকম বইয়ের ছাপা ও অঙ্গসৌষ্ঠব আর একটু উন্নত হলে উপহারযোগ্য হতে পারতো। জীব-বিজ্ঞানের সহজ ও জটিল বিভিন্ন বিষয় বোধগম্য সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বলে লেখকেরা ধন্যবাদার্হ।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : সপ্তম সংখ্যা

সমুদ্রের তলদেশে ব্যবহারের জন্যে অভিনব বাতি

সমুদ্রের তলদেশে ব্যবহারের জন্যে বৃটেনে অল্প ব্যয়ের এক প্রকার কোয়ার্ট্জ্-হ্যালোজেন বাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অন্যান্য বাতিতে যে সব রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং বৈদ্যুতিক অন্তরকের ব্যবস্থা থাকে—এতে তা নেই। এর জন্যে মাত্র 24 ভোল্ট কারেন্টের প্রয়োজন। 10,000 ফুট জলের তলায় এই বাতি ব্যবহার করা যায়, যদিও পরীক্ষায় দেখা গেছে—ভারী ধরণের এই বাতি সমুদ্রের তলদেশে 24,000 ফুটের কাছাকাছি পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী। বোরোসিলিকেট কাচের একটা শূন্য আচ্ছাদনের মধ্যে এই বাতির প্রকৃত আলোকউৎসটি নিরাপদে থাকে এবং 1000 ঘন্টা পর্যন্ত এই বাতি আলো দিতে পারে। সমুদ্রের তলায় উদ্ধারকার্য, নৌ ও সমুদ্রতত্ত্বসম্বন্ধীয় কাজেই প্রধানতঃ এই বাতি ব্যবহৃত হবে বলে আশা করা যায়।

মাকড়সা

মাকড়সা অ্যারাক্‌নিডা শ্রেণীর (Arachnida) অন্তর্ভুক্ত সন্ধিপদ প্রাণী। পৃথিবীতে প্রায় 30,000 বিভিন্ন জাতের মাকড়সা আছে। সাধারণ কীট-পতঙ্গ ও মাকড়সার মধ্যে পার্থক্য অনেক। কীট-পতঙ্গের দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর—এই তিন ভাগে বিভক্ত। মাকড়সার দেহ কিন্তু শিরোবক্ষ এবং উদর—এই দু-ভাগে বিভক্ত। মাকড়সার ক্ষেত্রে শির বা মস্তক এবং বক্ষ নিয়ে একত্রে শিরোবক্ষ গঠিত। কীট-পতঙ্গের তিন জোড়া পা থাকে, কিন্তু মাকড়সার আছে চার জোড়া পা। তাছাড়া কীট-পতঙ্গের মত এদের পুঞ্জাক্ষি থাকে না। মাকড়সার মাথার উপরে ও সম্মুখের দিকে চারটি করে দুপাশে মোট আটটি সরল চোখ থাকে। কীট-পতঙ্গের জীবনচক্রের মত এদের জীবনচক্রে কীড়া বা পুত্তলি প্রভৃতি অবস্থা নেই। ডিম ফুটে বেরোবার পর এদের অবিকল পূর্ণবয়স্ক মাকড়সার মতই দেখায়, কেবলমাত্র আকারে ছোট থাকে।

সাধারণতঃ যে সব মাকড়সা আমাদের নজরে পড়ে, তাদের বেশীর ভাগই জাল বোনে। তারা জাল পেতেই শিকার ধরে। বিভিন্ন প্রজাতির বেশীর ভাগ স্ত্রী-মাকড়সাই থলির (Cocoon) ভিতর ডিম পাড়ে। কেউ কেউ ডিমের থলি নানাভাবে দেহের সঙ্গে আটকে রেখে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। অনেকে আবার ডিমের থলি গাছপালা, দেয়াল, ঘরের বেড়া প্রভৃতির গায়ে আটকে রেখে সতর্কভাবে পাহারা দেয়। কোন কোন প্রজাতির স্ত্রী-মাকড়সা ডিমের থলিটিকে উদরের পশ্চাদ্দেশে সংলগ্ন করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবার পর তারা মায়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

মাকড়সার শরীরের পশ্চাদ্ভাগে চার থেকে ছয়টি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত সূতা তৈরির যন্ত্র (Spinnerets) আছে। এদের সাহায্যেই মাকড়সা জাল তৈরি করে। মাকড়সার উদরস্থিত সূতা তৈরির গ্রন্থি (Spinning gland) থেকে নির্গত রস এই সূতা তৈরির যন্ত্রগুলির মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের সংস্পর্শে সূক্ষ্ম সূতায় পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, মাকড়সার জালে কি করে কীট-পতঙ্গ আটকায়? মাকড়সার জালের সূতাগুলি এক রকমের আঠালো পদার্থের দ্বারা আবৃত থাকে। মাকড়সা তার পায়ের নখ দিয়ে জালের সূতা বেয়ে অতি দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। কীট-পতঙ্গ এই জালের সংস্পর্শে এলেই আঠায় আটকে যায়। জাল বোনবার সময় বা জালে পড়া শিকারকে বন্ধন করবার সময় অতি সূক্ষ্ম বাঁকানো নখের সাহায্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অতি সহজেই এরা সূতার গা বেয়ে চলাফেরা করে। জাল তৈরির পর মাকড়সা জালের উপরেই আড়ালে ওৎ পেতে বসে থাকে। কীট-পতঙ্গ এই জালে আটকে গেলে এরা সঙ্গে সঙ্গেই টের পায় এবং দ্রুতগতিতে শিকারের কাছে ছুটে আসে। তারপর

এক সঙ্গে ফিতার মত করে অনেক সুতা ছেড়ে শিকারকে ভালভাবে জড়িয়ে ফেলে। যদি শিকার খুব শক্তিশালী হয় এবং মাকড়সার পক্ষে তাকে আয়ত্ত করা সম্ভব না হয়, তবে শিকার নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত এরা নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করতে থাকে এবং যথাসময়ে শিকারকে সুতা জড়িয়ে বন্দী করে ফেলে।

উল্লেখযোগ্য যে, মাকড়সার মুখের কাছে দুটি তীক্ষ্ণাগ্র চোয়াল থাকে। এই নখর-সদৃশ চোয়ালের অগ্রভাগে ছোট ছিদ্র আছে। মাকড়সা যখন শিকারের দেহে এই তীক্ষ্ণাগ্র যন্ত্রটি ফুটিয়ে দেয়, তখন মাকড়সার বিষগ্রন্থির রস ঐ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে শিকারের দেহে প্রবেশ করে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই শিকার নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মাকড়সা তখন ধীরে ধীরে শিকারের দেহের রস চুষে খেয়ে খোলসটা ফেলে দেয়।

সব মাকড়সা কিন্তু শিকার ধরবার জন্যে একই রকমের জাল তৈরি করে না। কোন কোন মাকড়সা ঘরের দেয়ালের কোণে জাল পাতে। আমাদের দেশের পরিচিত তাঁতীবৌ মাকড়সা শিকার ধরবার জন্যে লোকালয়ের আশেপাশে বাগানে জাল পেতে তার উপর চুপটি করে বসে থাকে। কয়েক জাতের মাকড়সা লম্বালম্বি ভাবে জাল বুনে শিকার ধরে। কোন কোন জাতের মাকড়সা ভূমির সমান্তরাল ভাবে চাঁদোয়ার মত জাল পাতে। কাঁকড়া-মাকড়সা (Crab spider) নামে এক-জাতের মাকড়সা ফুলের পাঁপড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মত সামনের পা দুটি তুলে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। কীট-পতঙ্গ মধুর লোভে ফুলের উপর বসলেই তাকে ধরে ফেলে।

আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্ল্যাক উইডো নামে কালো রঙের এক জাতের মাকড়সা দেখা যায়। সেগুলির দংশন নাকি বিষাক্ত, কিন্তু আমাদের দেশে প্রধানতঃ রেলগাড়ীর কামরায় এই রকমের অনেক মাকড়সা দেখা যায়—সেগুলির দংশন কিন্তু তেমন বিষাক্ত নয়। এই মাকড়সার দেহ প্রায় আধ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটি গোলাকার বর্তুলের মত। অনেকের ধারণা, এই মাকড়সা স্বভাবতঃ হিংস্র নয়, বিপদে পড়লেই পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু বাচ্চাদের পাহারা দেবার সময় কেউ বিঘ্ন ঘটালে এরা তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে।

কয়েক জাতের মাকড়সা জাল বোনে না, দূর থেকে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে শিকার ধরে। আমাদের দেশে এরূপ কয়েক জাতের মাকড়সা দেখা যায়, এদের বলা হয় নেকড়ে মাকড়সা। জলের উপর বা জলের কাছাকাছি বিচরণ করে—আমাদের দেশে এরূপ অনেক মাকড়সা আছে, যারা সুবিধা পেলেই জল থেকে মাছ শিকার করে খায়। ভয় পেলে এই মাকড়সা জলের নীচে ডুবে গিয়ে আত্মগোপন করে। ডিম পাড়বার সময় হলে মিলনের পর এই জাতের স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। অ্যামাজনের জঙ্গলে এক জাতের বড় মাকড়সা

আছে, যারা ছোট ছোট ইঁদুর, গিরগিটি ও পাখী প্রভৃতি শিকার করে। এদের বিষের প্রকোপে কোন কোন চর্মরোগ হতে দেখা যায়। আমাদের দেশেও ছোট ছোট টিকটিকি, চামচিকা, পাখী প্রভৃতি শিকার করে খায়, এরূপ কয়েক জাতের মাকড়সার কথা জানা গেছে।

শ্রীশঙ্করলাল সাহা

মজার খেলা

(ব্যাখ্যা)

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গত জুন সংখ্যায় যে 'মজার খেলার' কথা বলা হয়েছিল, তাতে পাঁচটি সারিতে বিভিন্ন সংখ্যা সাজাবার পদ্ধতির বিষয় এখন আমরা আলোচনা করবো। প্রথমে দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে ঐ সংখ্যাগুলি লিখে ফেলা যাক।

$$
\begin{aligned}
1 &\equiv 1\\
2 &\equiv 10\\
3 &\equiv 11\\
4 &\equiv 100\\
5 &\equiv 101\\
6 &\equiv 110\\
7 &\equiv 111\\
8 &\equiv 1000\\
9 &\equiv 1001\\
10 &\equiv 1010\\
11 &\equiv 1011\\
12 &\equiv 1100\\
13 &\equiv 1101\\
14 &\equiv 1110\\
15 &\equiv 1111\\
16 &\equiv 10000\\
17 &\equiv 10001\\
18 &\equiv 10010
\end{aligned}
$$

$19 \equiv 10011$

$20 \equiv 10100$

$21 \equiv 10101$

$22 \equiv 10110$

$23 \equiv 10111$

$24 \equiv 11000$

$25 \equiv 11001$

$26 \equiv 11010$

$27 \equiv 11011$

$28 \equiv 11100$

$29 \equiv 11101$

$30 \equiv 11110$

$31 \equiv 11111$

এইবার 'মজার খেলায়' প্রদত্ত পাঁচটি সারি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখিত সংখ্যাগুলির ডান দিক থেকে প্রথম স্থানে যেগুলিতে 1 আছে (যেমন 1, 3, 5 ইত্যাদি), সেগুলিকে 'ক' সারিতে লেখা হয়েছে ; ডান দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে যেগুলিতে 1 আছে, সেগুলি রয়েছে 'খ' সারিতে ; এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে যেগুলিতে 1 আছে, সেগুলিকে রাখা হয়েছে যথাক্রমে 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' সারিতে। পাঁচটি সারিতে বিভিন্ন সংখ্যা নির্দিষ্ট করবার পদ্ধতি তাহলে বোঝা গেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে সংখ্যা সাজাবার কারণটা কি? 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত সারির একেবারে প্রথমে রয়েছে যথাক্রমে 1, 2, 4, 8 ও 16, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে যেগুলি হলো 1, 10, 100, 1000 ও 10000। 1 থেকে 31-এর মধ্যে যে কোন সংখ্যা উপরিউক্ত একটি সংখ্যা অথবা ঐ সংখ্যাগুলির কয়েকটির যোগফলের সমান ; যেমন $19 \equiv 10011 = 10000 + 10 + 1$; সুতরাং 19-কে লিখতে হবে 1, 10 ও 10000-এর সারিতে অর্থাৎ 'ক', 'খ' ও 'ঙ' সারিতে—তাহলে ঐ তিনটি সারির প্রথম সংখ্যাগুলি যোগ করলে, বলা বাহুল্য, 19 পাওয়া যাবে। অতএব বোঝা যাচ্ছে, দ্বিগুণোত্তর পদ্ধতিতে লিখিত যে কোন সংখ্যার ডান দিক থেকে সুরু করে বিভিন্ন স্থানে 1-এর অবস্থান অনুযায়ী সংখ্যাটিকে যথাযথ সারির অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

তাপ-ফটোগ্রাফি

আলোর সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র উত্তাপের সাহায্যে ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব। ফটোগ্রাফ তোলবার অত্যাশ্চর্য এই সর্বাধুনিক পদ্ধতির নাম থার্মোগ্রাফি। থার্মোগ্রাফির সাহায্যে আজকাল ফটো তোলা হচ্ছে, নানারকম জটিল রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে—শিল্পোৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করা যাচ্ছে এবং শত্রুর বিপদজ্জনক মারাত্মক অস্ত্রকে আগে থেকে জেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। থার্মোগ্রাফিতে বিশেষভাবে নির্মিত ক্যামেরার দরকার। এই ক্যামেরায় শুধুমাত্র বস্তুর তাপ ধরা পড়ে—বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি নয়।

প্রায় এক-শ' সত্তর বছর আগে বৃটিশ বিজ্ঞানী সার উইলিয়াম হার্সেল আবিষ্কার করেন যে, সূর্যকিরণ যখন প্রিজমের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন বর্ণালীর অন্যান্য অংশের চেয়ে ইনফ্রারেড অংশের তাপ কিছুটা বেশী হয়। ফটোগ্রাফির প্লেট এই তাপ বিকিরণের স্থানে বেশ অনুভূতিশীল। অবশ্য সে সময়ে বর্ণালীর এই তাপ-বৈষম্য নিয়ে ফটোগ্রাফ নেবার ব্যাপারটা বিশেষ কাজে লাগানো হয় নি।

থার্মোগ্রাফিতে তাপকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সেই বিদ্যুৎকে পরিবর্ধিত করে বিশেষ একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের মধ্যে পাঠানো হয়। বাল্বের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ধরা পড়ে। তাথেকেই ইনফ্রারেড তাপ বিকিরণের উত্থান ও পতন বোঝা যায়।

রঙীন থার্মোগ্রাফির প্রচলন বেশী—কেন না, এতে রংগুলিকে আলাদাভাবে পরিষ্কার বোঝা যায়। রংগুলিকে তাপের তারতম্য অনুসারে এভাবে নির্বাচন করা হয়—সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত স্থানের জন্যে লাল ও কমলা রং, হলুদ ও সবুজ রং মাঝারী রকম তাপের জন্যে এবং নীল ও কালো রং ঠাণ্ডা জায়গার জন্যে। এদের ছবি রঙীন ফিল্মে ওঠে। আজকাল উড়োজাহাজের সূক্ষ্মতম যন্ত্রাংশ এবং ইলেকট্রনিক সার্কিট থার্মোগ্রাফির সাহায্যে সুন্দরভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। চাঁদের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশকে পৃথিবী থেকে থার্মোগ্রাফির সাহায্যে পরিষ্কার দেখা যায়। এছাড়া ক্যান্সার, করোনারি থম্বোসিস ও অন্যান্য অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে থার্মোগ্রাফিকে খুব বেশী কাজে লাগানো হচ্ছে।

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

* রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ; কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সেলুলোজ

উদ্ভিদদেহের কোষ-প্রাচীরের একটি মূল্যবান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ। অঙ্গার-আত্তীকরণ (Photosynthesis) প্রণালীর দ্বারা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বনের সঙ্গে জলের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহে প্রথমে গ্লুকোজ এবং শেষে তাথেকে সেলুলোজ তৈরি হয়। পাট, খড়, তুলা, পশম প্রভৃতি সবই প্রধানতঃ সেলুলোজে গঠিত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, সেলুলোজ হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের একটি যৌগিক পদার্থ। কাঠ যখন জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন এর সেলুলোজ দগ্ধ হয়ে তাপ উৎপাদন করে। আবার এই উদ্ভিদদেহের সেলুলোজ ভূগর্ভস্থ চাপ ও তাপে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে কয়লায় পরিণত হয়।

সেলুলোজ নিষ্ক্রিয় পদার্থ। ক্লোরিন, লঘু অ্যাসিড বা ক্ষারের সঙ্গে সেলুলোজের কোনরূপ বিক্রিয়া হয় না। এই জন্যে ফিল্টার কাগজ সেলুলোজ থেকে তৈরি হয়। উদ্ভিদের দেহ থেকে সেলুলোজকে কষ্টিক সোডা বা ক্যালসিয়াম সালফাইট দিয়ে নিষ্কাশিত করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন শিল্পে সেলুলোজ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সেলুলোজ থেকেই কৃত্রিম রেশম, পশম, কাগজ এবং নানা প্রকার প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি তৈরি হয়।

সেলুলোজ থেকে কৃত্রিম রেশম তৈরি করতে হলে প্রথমে সেলুলোজকে কষ্টিক সোডার দ্রবণে মিশাতে হবে। তাহলে সেটা নরম ও চক্‌চকে হবে। ঐ নরম সেলুলোজকে কার্বন ডাইসালফাইডের দ্রবণে মিশালে এক প্রকার তরল পদার্থ পাওয়া যাবে, যাকে সেলুলোজ ভিস্‌কস (Viscose) বলা হয়। তারপর ঐ পদার্থটাকে অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের মধ্যে নিয়ে পাম্পের দ্বারা চাপ দিলে উক্ত পদার্থের সূক্ষ্ম ধারা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে এসে পড়ে এবং এভাবেই চক্‌চকে সেলুলোজ তন্তু তৈরি করা হয়। এই তন্তুই হচ্ছে কৃত্রিম রেশম। এই পদ্ধতিকে বলে ভিস্‌কস (Viscose) পদ্ধতি। সেলোফেন (Cellophane) বা স্বচ্ছ কাগজ এই প্রণালীতেই তৈরি করা হয়ে থাকে। এই কাগজ পাত্‌লা পাতের মত প্রস্তুত করা হয়। সেলোফেনের মূল পদার্থ পিণ্ডের সঙ্গে নানাপ্রকার রং মিশিয়ে বিভিন্ন রঙের সেলোফেন কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই সেলোফেন কাগজ চকোলেট, সিগারেটের বাক্স, নানাপ্রকার খাদ্যবস্তুর মোড়ক তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

সেলুলোজ থেকে একপ্রকার প্লাষ্টিক পাওয়া যায়, যাকে সেলুলয়েড বলা হয়। নাইট্রো-সেলুলোজ ও অ্যালকোহলের সঙ্গে কর্পূরের রাসায়নিক ক্রিয়ায় সেলুলয়েড (Celluloid) তৈরি হয়। প্রস্তুত করবার সময় সেলুলয়েড প্রথমে নরম, সাদা ও জেলীর মত দেখায়, পরে ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হয়ে যায়। সেলুলয়েড দিয়ে ফটোগ্রাফির ফিল্ম, চিরুণী, ছুরির বাট, কৃত্রিম আইভরি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।

শ্রীঅশোককুমার নিয়োগী

পারদর্শিতার পরীক্ষা

পদার্থবিদ্যায় তোমরা কে কেমন পারদর্শী, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে যে উত্তরগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক বলতে হবে। অন্ততঃ 3টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পদার্থবিদ্যায় পারদর্শিতা মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। 4টি বা 5টি প্রশ্নের উত্তর সঠিক হলে পারদর্শিতা যথাক্রমে বেশী বা খুব বেশী।

1. কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের নীচে নিয়ে গেলে তার ওজন

(ক) বেড়ে যায়

(খ) কমে যায়

(গ) একই থাকে

2. সূর্য থেকে তাপ যে প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তা হলো

(ক) পরিবহণ

(খ) পরিচলন

(গ) বিকিরণ

3. কোন চশমার লেন্সের ক্ষমতা (Power) যদি -4 ডাইঅপ্টার হয়, তাহলে লেন্সটি

(ক) অবতল ; ফোকাস-দূরত্ব = 4 মিটার

(খ) অবতল ; ফোকাস-দূরত্ব = 25 সেন্টিমিটার

(গ) উত্তল ; ফোকাস-দূরত্ব = 4 সেন্টিমিটার

4. একটি তামার তারের দৈর্ঘ্য L ও প্রস্থচ্ছেদ A ; তারটির বৈদ্যুতিক রোধ হচ্ছে 1Ω (ওহ্‌ম্)। ঐ তারের দৈর্ঘ্য 2L ও প্রস্থচ্ছেদ 2A হলে সেটির রোধ হতো

(ক) 1Ω

(খ) 2Ω

(গ) 4Ω

5. শূন্যস্থানে কোন বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 30 মিটার হলে তার কম্পাঙ্ক হচ্ছে সেকেণ্ডে

(ক) 10^5

(খ) 10^7

(গ) 10^9

(উত্তরের জন্যে 439নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

চোখের কথা

চোখ মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। মানুষের চোখকে ক্যামেরার মত যন্ত্র বলা যেতে পারে। করোটির সম্মুখভাগে গোলাকার কোটরের মধ্যে চক্ষুগোলক (Eye-ball) দুটি অবস্থিত। চক্ষুগোলকের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চির মত। এই চক্ষুগোলক দুটি কোটরের মধ্যে কিছুটা ঘুরতে পারে। চক্ষুগোলকের চারদিকে একটি শ্বেত আবরণ থাকে। এই আবরণকে শ্বেতমণ্ডল (Sclera) বলা হয়। শ্বেতমণ্ডল পেশীসমূহের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের অংশকে বলা হয় কোরয়েড (Choroid)। চোখের সম্মুখে শ্বেতমণ্ডল স্বচ্ছ ও কিছুটা স্ফীত। এর নাম অচ্ছোদপটল বা Cornea। অচ্ছোদপটলের পশ্চাতে একটি উত্তল (Convex) লেন্স থাকে। লেন্সটি বিভিন্ন মাংসপেশীর দ্বারা ভিতরের অংশের সঙ্গে সংযুক্ত। পেশীর সাহায্যে এর বক্রতা পরিবর্তিত করা যায় আবার বক্রতা পরিবর্তিত হলে ফোকাস-দূরত্বও পরিবর্তিত হয়। লেন্স ও অচ্ছোদপটলের মধ্যে একটি পাতলা পর্দা এবং পর্দার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে।
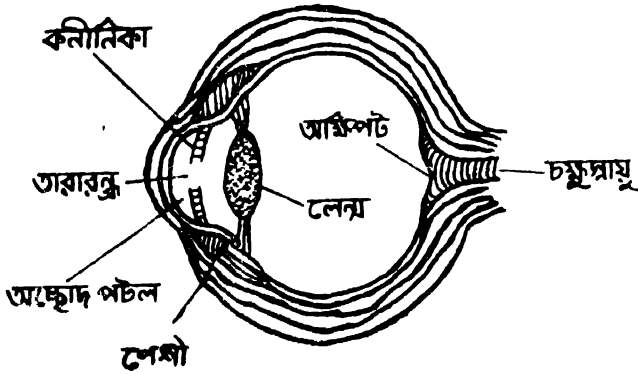
1নং চিত্র
চোখের কয়েকটি প্রধান অংশ

পর্দাটির নাম কনীনিকা বা Iris এবং ছিদ্রটির নাম তারারন্ধ্র বা Pupil। পেশীর সাহায্যে তারারন্ধ্রকে ছোট অথবা বড় করা যায়। কনীনিকা বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে এবং চক্ষুর তারার রং বোঝাতে কনীনিকার রংকেই বুঝায়। এটি নীল, কালো বা খয়েরী রঙের হতে পারে।

লেন্স ও কনীনিকার মধ্যবর্তী অংশ অ্যাকোয়াস হিউমার (Aquous humour) নামক এক প্রকার তরল পদার্থের দ্বারা পূর্ণ থাকে। লেন্সের পশ্চাতের অংশ ভিট্রিয়াস হিউমার (Vitreous humour) নামক আর এক প্রকার তরল পদার্থের দ্বারা পূর্ণ থাকে।

চোখ থেকে কতকগুলি স্নায়ু (Optic nerve) বের হয়ে কোরয়েডের কিছু অংশ পর্যন্ত যুক্ত থেকে অক্ষিপট বা Retina নামক একটি পর্দার সৃষ্টি করেছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় অক্ষিপট চোখের লেন্সের যথাযথ ফোকাস-দূরত্বে অবস্থান করে। আমরা যখন কোন দূরের জিনিষের দিকে তাকাই, তখন সেই বস্তু থেকে আগত রশ্মিসমূহ অক্ষিগোলকের উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরিত হয়ে অক্ষিপটে জিনিষটির ক্ষুদ্র একটি উল্টো সদ্‌বিম্বের সৃষ্টি করে। তখন চক্ষুস্নায়ু এই অনুভূতিকে মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। ফলে বস্তুটিকে দেখতে পাবার অনুভূতি জাগে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চোখের মধ্যে উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হলেও বস্তুটিকে আমরা সর্বদা সোজা দেখতে পাই। বিশেষ মানসিক অবস্থার (Mental interpretation) জন্যেই এটা সম্ভব হয়।

যখন আমরা দূরের জিনিষ ছেড়ে নিকটের জিনিষের দিকে তাকাই, তখন লেন্সের বক্রতা ও ফোকাস-দূরত্ব এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, তখনও অক্ষিপটের উপর প্রতি-বিম্বের সৃষ্টি হয় এবং আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। চোখের এই ক্ষমতাকে উপযোজন (Accomodation) বলা হয়। অবশ্য যদি বস্তুটি ও চোখের মধ্যে দূরত্ব 25 সেন্টিমিটার বা প্রায় 10 ইঞ্চির কম হয়, তাহলে বস্তুটিকে আর স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। এই দূরত্বকে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব বলা হয়।
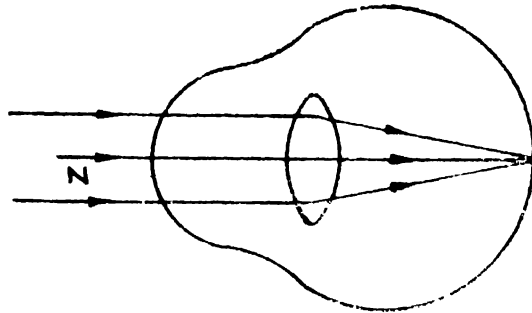
2নং চিত্র

মানুষের চোখের সাধারণ দোষগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—দীর্ঘ দৃষ্টিশক্তি (Long sight বা Hypermetropia), খর্ব দৃষ্টিশক্তি (Short sight বা Myopia), অ্যাষ্টিগ্‌মেটিজম (Astigmatism), হেটারোফরিয়া (Heterophoria), বর্ণান্ধতা (Colour blindness)।

কেউ কেউ চোখের দোষের জন্যে নিকটের জিনিষ স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। এর কারণ চক্ষুগোলকের একপ্রকার দৃষ্টিদোষ, যার নাম Long sight বা Hyperme-

tropia। চোখের লেন্সের বক্রতা কমে গেলে ফোকাসের দূরত্ব (Focal length) বেড়ে যায়। ফলে দূরবর্তী বস্তু থেকে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ সাধারণ চোখের ন্যায় (2নং চিত্র) অক্ষিপটে মিলিত হয় না, অক্ষিপটের পিছনে মিলিত হয় (3নং চিত্র)। ফলে বহু দূরে অবস্থিত (এমন কি, অসীমে অবস্থিত) কোন বস্তুকে দেখতে হলে চক্ষুর উপযোজন প্রয়োজন, যাতে চোখের লেন্সের বক্রতা, তথা ফোকাস-দূরত্ব উপযুক্তভাবে পরিবর্তিত করে অক্ষিপটের উপর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা যায়। সাধারণ চোখের
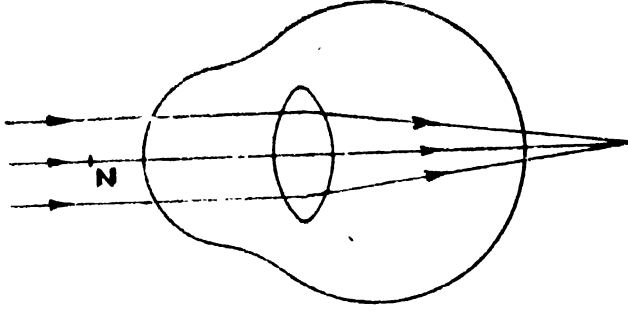
3নং চিত্র

ক্ষেত্রে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব N (3নং চিত্র)। বস্তু ক্রমশঃ চোখের দিকে অগ্রসর হয়ে N´ বিন্দুতে উপস্থিত হলে চোখের উপযোজন ক্ষমতা ক্লান্ত হয়, ফলে স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বের পূর্বে বস্তুকে দেখা যায় না। ফলে N´ ও চোখের মধ্যে অবস্থিত বস্তু ঐ চোখে দেখা যায় না ; অর্থাৎ স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব বেড়ে যায়।

চোখের এই ত্রুটি দূর করে সামনের জিনিষ দেখতে হলে একটি অতিরিক্ত উত্তল লেন্সের প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ ঐ চোখের সাহায্যে N বিন্দুতে অবস্থিত (4নং চিত্র)
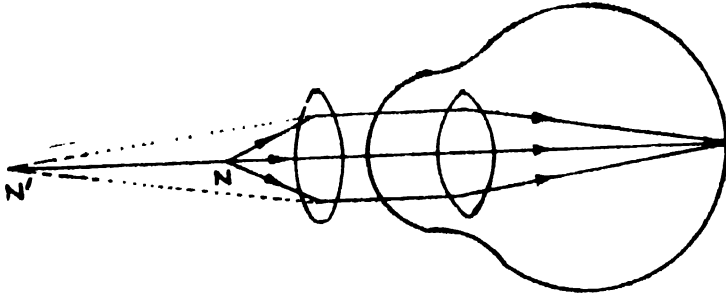
4নং চিত্র

কোন বস্তুকে দেখলে লেন্স N´ বিন্দুতে ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবে অর্থাৎ প্রতিবিম্ব ত্রুটিপূর্ণ চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বে সৃষ্টি হবে—ফলে বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যাবে।

কেউ কেউ আবার চোখের দোষের জন্যে নিকটের জিনিষ দেখতে পায়, কিন্তু দূরের জিনিষ দেখতে পায় না। এর কারণ চোখের স্বল্প দূরত্বের দৃষ্টিদোষ (Short sight বা Myopia)। চক্ষুগোলকের বক্রতা বেড়ে গেলে ফোকাস-দূরত্ব কমে যায়। ফলে দূরবর্তী বস্তু থেকে আগত সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ চোখের লেন্সে প্রতিসরিত হয়ে অক্ষিপটের
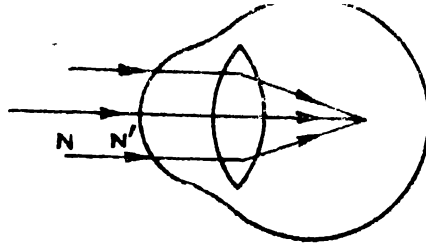
5নং চিত্র

সম্মুখে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে (5নং চিত্র), কিন্তু স্বাভাবিক চোখে অক্ষিপটে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় (2নং চিত্র)। কোন বস্তু যদি অসীম দূরত্ব থেকে চোখের দিকে অগ্রসর হয়, তবে প্রতিবিম্বও অক্ষিপটের দিকে অগ্রসর হয়। বস্তু F বিন্দুতে পৌঁছুলে প্রতিবিম্ব ঠিক অক্ষিপটের উপর সৃষ্টি হবে; অর্থাৎ F বিন্দু হলো এই ত্রুটিপূর্ণ চোখের স্পষ্ট দর্শনের দীর্ঘতম দূরত্ব। বস্তু যদি চোখের দিকে আরও অগ্রসর হয়, তবে চোখের উপযোজন প্রয়োজন। কিন্তু বস্তু যখন স্বাভাবিক চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বের (N বিন্দু) সামনে N′ বিন্দুতে এসে পৌঁছুবে, তখন চোখের উপযোজন ক্ষমতা ক্লান্ত হয়ে যাবে। সুতরাং এই ত্রুটিপূর্ণ চোখ কেবল F ও N′-এর মধ্যে অবস্থিত বস্তু দেখতে পাবে।
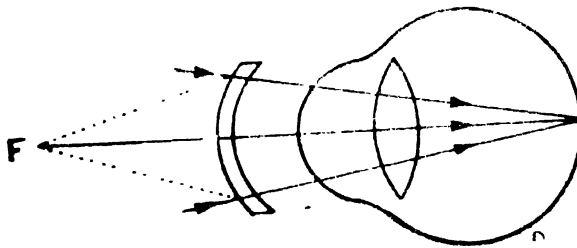
6নং চিত্র

চোখের এই দোষ দূর করে দূরের জিনিষ দেখতে হলে একটি অতিরিক্ত অবতল (Concave) লেন্সের প্রয়োজন। ত্রুটিপূর্ণ এই চোখের সাহায্যে অসীমে অবস্থিত কোন বস্তুকে দেখলে লেন্স F বিন্দুতে ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করবে (6নং চিত্র) অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ চোখের স্পষ্ট দর্শনের দীর্ঘতম দূরত্বে সৃষ্টি হবে, ফলে বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

কেউ কেউ আবার চোখের দোষের জন্যে উলম্ব ও অনুভূমিক বস্তুর মধ্যে কোন একটিকে স্পষ্ট দেখতে পায় না। এর কারণ চোখের এক প্রকার দৃষ্টিদোষ, যার নাম অ্যাষ্টিগ্‌মেটিজম। চোখের অচ্ছোদপটলের উলম্ব ও অনুভূমিক অংশের অসমান বক্রতার জন্যে এই দোষের সৃষ্টি হয়। অচ্ছোদপটলের বক্রতা অসমান হয়ে ছ-রকম ফোকাস-দূরত্বের সৃষ্টি করে। ফলে বস্তুর উলম্ব ও অনুভূমিক অংশকে চোখ একই সঙ্গে দেখতে পায় না।

চোখের এই দোষের প্রতিকার করে কোন বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে হলে একটি চোঙাকৃতি (Cylindrical) লেন্স ব্যবহার করতে হবে। এই লেন্স অচ্ছোদপটলের ছুই অংশের ছুই রকম ফোকাস-দূরত্বকে একটি ফোকাস-দূরত্বে পরিণত করে। যদি চোখের এই ক্রটির সঙ্গে সর্ট সাইট বা লং সাইটের ক্রটি থাকে, তবে উভয় ক্রটি প্রতিকারের জন্যে স্ফেরো-সিলিণ্ড্রিক্যাল (Sphero-cylindrical) লেন্সের প্রয়োজন।

অনেকে আবার দূরবর্তী কোন একটি বস্তুকে ছুটি পৃথক বস্তু হিসাবে দেখেন। চোখের এই দোষের নাম হেটারোফরিয়া (Heterophoria)। ছুই চোখের উপযোজন ক্ষমতা বিভিন্ন হবার ফলে এই দোষের সৃষ্টি হয়। চোখের এই ক্রটি দূর করবার জন্যে প্রিজ্‌মেটিক লেন্সের প্রয়োজন। এই লেন্স ছুটি প্রতিবিম্বকে একত্রিত করে একটি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করায় বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

অনেকের চোখ কোন বিশেষ বর্ণের তারতম্য নিরূপণে অক্ষম। চোখের এই দোষকে বলা হয় বর্ণান্ধতা বা Colour blindness। কোন কোন লোক চোখের এই দোষের জন্যে এক বা একাধিক বর্ণকে কালো বর্ণ হিসাবে দেখে। এর কারণ কোন বিশেষ রঙের স্নায়ুতন্তুর অভাব অথবা অক্ষমতা। যেমন কোন ব্যক্তির অক্ষিপটের লাল তন্তু যদি অনুপস্থিত অথবা নিষ্ক্রিয় হয়, তবে ঐ ব্যক্তি লাল বর্ণ দেখতে পাবে না, লাল বস্তুকে তার কালো বলে মনে হবে।

চোখের বিভিন্ন প্রকার দোষেয় প্রতিকার করে স্পষ্টভাবে কোন কিছু দেখবার জন্যে চশমায় বিভিন্ন ধরণের লেন্স ব্যবহার করা হয়। ক্রটিপূর্ণ চোখে দূরের ও সামনের বস্তু দেখবার জন্যে চশমায় বিভিন্ন ফোকাস-দূরত্বের ছুটি উত্তল লেন্স এক সঙ্গে যুক্ত করা থাকে। এই বলা হয় বাইফোকাল লেন্স। ছুটি লেন্সকে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যে, চশমার নীচের দিকে কম ফোকাস-দূরত্বসম্পন্ন লেন্স থাকে ও উপরের দিকে বেশী ফোকাস-দূরত্বসম্পন্ন লেন্স থাকে। ফলে চশমার নীচের দিক দিয়ে পড়াশুনা করা যায়, অর্থাৎ সামনের জিনিষ দেখা যায় এবং উপরের দিক দিয়ে দূরের জিনিয দেখা যায়।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ঘোড়ই

উত্তর

(পারদাশতার পরীক্ষা)

1. (খ)

[বস্তুগুলির ভর m, পৃথিবীর ভর M এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে ভূপৃষ্ঠে বস্তুটির ওজন

$$w = \frac{GmM}{R^2}, \qquad (1)$$

যেখানে G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

ধরা যাক, বস্তুটিকে ভূপৃষ্ঠের নীচে P বিন্দুতে (চিত্র দ্রষ্টব্য) নিয়ে যাওয়া হলো। এক্ষেত্রে ভূগোলকের সম্পূর্ণ অংশের বদলে কেবলমাত্র চিহ্নিত অংশের অভিকর্ষজনিত বল বস্তুটির উপর কাজ করবে। চিহ্নিত অংশের ভরকে M´ এবং ভূকেন্দ্র O থেকে P বিন্দুর দূরত্ব OP-কে R´ ধরলে বস্তুটির ওজন হবে
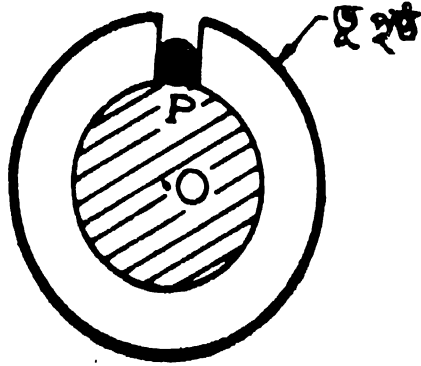
$$w = \frac{GmM'}{R^2} \qquad (2)$$

কিন্তু

$$\frac{M'}{M} \quad \frac{R'^3}{R^3}$$

সুতরাং

$$w = \frac{GmMR'}{R^3} = \left(\frac{R'}{R} \right) w \qquad (3)$$

যেহেতু $R' < R$, অতএব $w' < w$। 3নং সূত্র থেকে বোঝা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের নীচে কোন বস্তুর ওজন ভূকেন্দ্র থেকে তার দূরত্বের সমানুপাতিক।]

2. (গ)

[সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে জড় মাধ্যম এতই কম যে, একে সম্পূর্ণ শূন্যস্থান (Vacuum) হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এখানে একমাত্র বিকিরণ প্রক্রিয়াতেই তাপ সঞ্চালন সম্ভব।]

3. (খ)

[চশমার উত্তল (অভিসারী) লেন্সের ক্ষমতার চিহ্ন ধনাত্মক এবং অবতল (অপসারী) লেন্সের ঋণাত্মক ধরা হয়।

লেন্সের ক্ষমতা $P = \frac{1}{f}$ ডাইঅপ্টার (Dioptre)

যেখানে f হচ্ছে মিটারে ফোকাস-দুরত্ব।

সুতরাং $f = \frac{1}{P}$ মিটার।]

4. (ক)

[তারের রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক এবং প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক। অতএব L ও A, উভয়েই দ্বিগুণ হলে রোধ একই থাকবে।]

5. (খ)

[কোন বেতার তরঙ্গের কম্পাঙ্ক f ও শূন্যস্থানে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ হলে

$$f\lambda = c,$$

যেখানে c হলো শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগ (সেকেণ্ডে 3×10^8 মিটার)। λ জানা থাকলে এই সূত্র থেকে সহজেই f নির্ণয় করা যায়।]

কৈশিক নলে জল ওঠবার রহস্য

একটা পাত্রে খানিকটা জল নিয়ে তাতে একটা কৈশিক নল (Capillary tube) আংশিকভাবে ডোবালে দেখা যাবে যে, কৈশিক নলে আপনা থেকেই জল উঠছে আর এই কৈশিক নল যত সরু হবে, নলের মধ্যে জলস্তম্ভের দৈর্ঘ্যের পরিমাণও তত বেশী হবে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা হয়তো অনেকেই পরিচিত। এখন দেখা যাক, কৈশিক নলে কিভাবে জল ওঠে।

একটা কাচের কৈশিক নল যখন জলে ডোবানো হয়, তখন জলের অণু কাচের অণুর সংস্পর্শে আসামাত্রই কাচের অণু চারদিক থেকে জলের অণুকে আকর্ষণ করে cohesive force-এর দ্বারা। এই টানে পড়ে জলের অণুর উপরের দিকে ওঠা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। তাই জলস্তম্ভ কৈশিক নল বেয়ে আস্তে আস্তে উপরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই আকর্ষণ বলের পরিমাণ হচ্ছে $\frac{2T}{r}$

T = জলের তলটান

r = কৈশিক নলের আভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ

আমরা জানি কৈশিক নলের অভ্যন্তরে জলস্তম্ভের ওজন, hpg

h = পাত্রের জলতল থেকে নলের মধ্যস্থিত জলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য

p = ঘনত্ব

g = অভিকর্ষীয় ত্বরণ

এই জলস্তম্ভের ওজন তো নিশ্চয়ই নীচের দিকে ক্রিয়া করবে। অতএব জলস্তম্ভ ততক্ষণই নল বেয়ে উপরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, যতক্ষণ না ঐ দুটি বিপরীতমুখী বলের পরিমাণ সমান হয়। যেই মাত্র $\frac{2T}{r} = hpg$ হবে, তখন কৈশিক নলে জল ওঠা থেমে যাবে।
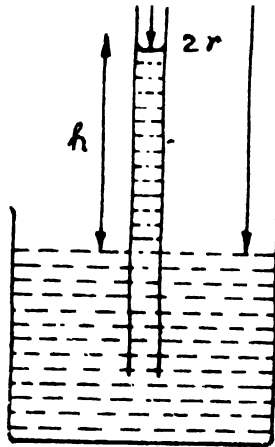
1নং চিত্র

বায়ুমণ্ডল কিন্তু যথারীতি পাত্রের জলের উপর নিম্নমুখী চাপ দিচ্ছে, যা কৈশিক নলের জলে সমান হারে সংবাহিত হচ্ছে এবং নলের মধ্যে জলস্তম্ভের উপরে প্রযুক্ত বায়ুর চাপ তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। সে জন্যে জলের ঊর্ধ্বগমনে বায়ুমণ্ডল অতিরিক্ত কোন প্রকার বল প্রয়োগ করতে পারছে না। তাই মুখ্যতঃ জলের তলটানের ফলেই জল উপরে উঠছে। এই হলো কৈশিক নলে জল ওঠবার রহস্য।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কৈশিক নলের কাচ যদি মোটা হয়, তাহলে কি কৈশিক নলে বেশী জল উঠবে? না, তা নয়। কারণ জলের অণুর সংস্পর্শে যে কাচের অণুগুলি থাকে, কেবল সেগুলিই সক্রিয় হয় মাত্র।

আর কৈশিক নলটি যে কাচেরই হতে হবে, এমন নয়—কারণ জল ওঠবার ক্ষেত্রে নল যে পদার্থে তৈরি, সেই পদার্থের অণু এবং নলের অভ্যন্তরস্থ তরলের অণুর মধ্যে আকর্ষণ কার্যকরী হয়।

আর একটি মজার ব্যাপার এই যে, হঠাৎ খাতায় কালি পড়ে গেলে ব্লটিং পেপার কালির উপর চেপে ধরলেই ব্লটিং পেপার কালি শোষণ করে নেয়। আসলে ব্যাপারটা ঘটে এই রকম—ব্লটিং পেপারে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, সেগুলি এক-একটা কৈশিক নলের মত কাজ করে। যেই মাত্র ব্লটিং পেপার কালির উপর চেপে ধরা হলো, অমনি কালি ঐ কৈশিক নল বেয়ে উপরে উঠে গেল আর আমরা দেখলাম ব্লটিং পেপার কালি শোষণ করে নিল।

শ্রীসুশীলকুমার নাথ

অঙ্কের ম্যাজিক

ম্যাজিক? হ্যাঁ ম্যাজিকই বটে! তবে অঙ্কের ম্যাজিক। যা দিয়ে তোমরা আশেপাশের বন্ধুদের একেবারে অবাক করে দিতে পার। এর জন্যে কি করতে হবে তা মন দিয়ে শোন।

(1) তুমি তোমার এক বন্ধুকে তোমাকে না দেখিয়ে তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা লিখতে বল। তারপর তুমি বললে সংখ্যাটি উল্টাও এবং আগের সংখ্যাটি থেকে বাদ দাও। (অবশ্য এই উল্টানো সংখ্যাটি যদি বড় হয়, তবে বুঝতেই পারছ বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে)। বন্ধুকে এবার বিয়োগ ফলের তিনটি সংখ্যার মাঝখানের অঙ্কটি বাদ দিয়ে হয় বাঁ-দিকের অঙ্কটি, নয় তো ডানদিকের অঙ্কটি বলতে বল। তখন তুমি পুরা বিয়োগ ফলটা অনায়াসেই বলতে পারবে। এতে তোমার বন্ধু সত্যই অবাক হয়ে যাবে। সে কি করে হলো জানতে চাইলে তুমি সহজ করে তাকে এই ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে।

মনে কর বন্ধু বিয়োগ ফলের বাঁ-দিকের অঙ্ক তোমাকে বললো 1, তখন তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে যে, ঐ বিয়োগ ফল হবে 198; অথবা যদি ডান দিকের অঙ্ক বলে 8, তবেও তুমি বলে দেবে যে, ঐ বিয়োগ ফল হবে 198 ($321-123=198$)। তুমি কি করেই বা বললে এটা? বলছি শোন। কোন সংখ্যা উল্টো লিখে সেই সংখ্যা থেকে বাদ দিলে সব সময় বিয়োগ ফলের মাঝখানের অঙ্ক 9 থাকে। তোমার বন্ধু তোমাকে ডান দিকে যে কোন অঙ্ক বলুক না কেন, তখন তুমি 9 থেকে ঐ বলা অঙ্ক বাদ দেবে এবং সেটাই ঐ বিয়োগ ফলের বাঁ-দিকের অঙ্ক; অর্থাৎ যদি ডান দিকে বলে 8, (মাঝখানে তো 9 আছেই) তবে বাঁ-দিকের অঙ্ক হবে ($9-8$) বা 1 এবং সম্পূর্ণ বিয়োগ ফলটি হবে 198, যেটা তোমার বন্ধুর বিয়োগ

ফলের সঙ্গে মিলে যাবে। আর যদি বাঁ-দিকের অঙ্ক হয় 1, তবে ডান দিকের অঙ্কটি হবে (9−1) বা 8। তাহলে তুমি ডানদিকের বা বাঁ-দিকের অঙ্কটি জেনে পুরা বিয়োগ ফলটা বলতে পারবে। তেমনি যদি বলে ডানদিকের অঙ্ক 9, তবে বাঁ-দিকের অঙ্কটি হবে (9−9) বা 0। সুতরাং বিয়োগ ফলটি হবে 099, যেমন 332−233=099।

(2) এবারে একটা যোগ করবার কায়দা দেখ। প্রথমে একটা সাদা কাগজে তোমার এক বন্ধুকে এক, দুই, তিন, চার বা তারও বেশী যে কোন অঙ্কের একটা সংখ্যা লিখতে বল। তারপর খুব বুদ্ধি এবং চিন্তার ভান করে ঐ সংখ্যার অনেকটা নীচে একটা দাগ দিয়ে একটা যোগফল বসাবে, যেটা তোমার বন্ধু যত অঙ্কের সংখ্যা লিখেছে, তার চেয়ে এক অঙ্ক বেশী। এভাবে যোগফল বসাবার পর বন্ধুকে তার প্রথম সংখ্যার অঙ্কের সমান অঙ্কের আর একটি সংখ্যা প্রথম সংখ্যাটির ঠিক নীচে লিখতে বল। তারপর তুমিও মন থেকে চিন্তা করে আর একটি ঐ একই অঙ্কের সংখ্যা ঐ সংখ্যাদ্বয়ের নীচে বসাও। আবার বন্ধুকে ঠিক একই অঙ্কের সংখ্যা ঐ সংখ্যাত্রয়ের নীচে বসাতে বলে তুমিও অপর একটি ঐ অঙ্কের সংখ্যা ঐ সংখ্যাচতুষ্টয়ের পরে বসাও। এই উপরের পাঁচটি সংখ্যা যোগ করলে দেখতে পাবে, গোড়াতেই তোমার দেওয়া যোগফল ঐ পর পর বসানো পাঁচটি সংখ্যার যোগফলের সমান হবে। এতে তোমার বন্ধু ভাববে, তুমি বুঝি মন্ত্র দিয়ে যোগটা করে দিলে এবং সে মন্ত্রটা শিখতে চাইবে। তখন তুমি সাধারণভাবে ব্যাপারটা খুলে বলবে।

মনে কর, তোমার বন্ধু লিখলো দুই অঙ্কের সংখ্যা 77। তুমি চট্ করে তোমার বন্ধুর দেওয়া সংখ্যা থেকে 2 বিয়োগ করে এই বিয়োগ ফলের সংখ্যার সামনে 2 বসাও, তবে সেটাই হবে তোমার দেওয়া যোগফল, যেটা তুমি সংখ্যার নীচে অনেকটা ফাঁক দিয়ে লাইনের নীচে বসাবে (অর্থাৎ 275)। এবার তোমার বন্ধু বললো 52। সেটা 77-এর নীচে বসাও। তখন তোমার বসানো সংখ্যাটি হবে (99−52) বা 47। এটাকে 52-এর নীচে বসাও। আবার বন্ধু বললো 55 ; সেটা 52-এর নীচে বসাও। এবার তোমার বসানো সংখ্যাটি হবে (99−55) বা 44, যেটা 55-এর নীচে বসাবে ; অর্থাৎ তোমার বন্ধুর প্রথমের লেখা সংখ্যাটি যে অঙ্কের (2) হবে, সেই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা (99) থেকে বন্ধুর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার বলা সংখ্যাগুলি বাদ দিলে তোমার দেওয়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সংখ্যা পাওয়া যাবে। আর বসানো সংখ্যা পাঁচটি যোগ করলে তোমার দেওয়া পূর্বের যোগফলের সঙ্গে মিলে যাবে। এটি এবং অনুরূপ আরো দুটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো। এই উদাহরণগুলি ছাড়াও তুমি এভাবে আরও যে কোন অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটে কিনা পরীক্ষা করতে পার।

	প্রথম উদাহরণ	দ্বিতীয় উদাহরণ	তৃতীয় উদাহরণ
বন্ধু প্রথমে বলল,	77	929	5326
,, দ্বিতীয় বারে বললো,	52	554	3299

তোমার ,, ,, দেওয়া সংখ্যা৷ (99 − 52) = 47 (999 − 554) = 445 (9999 − 3299) = 6700

বন্ধু তৃতীয় বারে বসালো: 55 212 5467

তোমার তৃতীয় বারে দেওয়া সংখ্যা:

(99 − 55) = 44 (999 − 212) = 787 (9999 − 5467) = 4532

তোমার দেওয়া যোগফল: 275 2927 25324

শ্রীভক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্য

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. অক্সিন কি ?

দেবব্রত মুখার্জী ; আসানসোল

প্রশ্ন 2. বিভিন্ন গ্রহের ভর কিভাবে মাপা যায় ?

তপন দাস, সুজন চক্রবর্তী ; লিলুয়া

উত্তর 1. উদ্ভিদের দেহকোষে সাধারণতঃ যে সমস্ত উত্তেজক রস বা হর্মোন তৈরি হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে একটির নাম অক্সিন। উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিসাধনের ক্ষেত্রে অক্সিনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অক্সিন সাধারণতঃ উদ্ভিদের কচিপাতা, ফুল, ফুলের বোঁটা, মুকুল ইত্যাদিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। উদ্ভিদদেহে উৎপন্ন প্রধান অক্সিন জাতীয় পদার্থগুলির মধ্যে অক্সোনোলোনিক অ্যাসিড, অক্সেনট্রিওলিক অ্যাসিড, ইন্‌ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

অক্সিন শুধুমাত্র উদ্ভিদের পুষ্টির ব্যাপারেই সহায়তা করে না—দেহকোষের বৃদ্ধি, কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক, দেহকোষের শ্বেতসারের হাইড্রোলিসিস প্রভৃতি ঘটাবার ব্যাপারে—এমন কি, উদ্ভিদের শ্বাসকার্য চালাবার ব্যাপারেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

জীবকোষে দুই ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিড পাওয়া যায়—ডি. এন. এ এবং আর. এন. এ। উদ্ভিদকোষে অক্সিন এই দুটি অ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিনের সংশ্লেষণ করে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে অক্সিনের সমধর্মী কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করেছেন; যেমন—ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড। আইসোপ্রোপাইল ফিনাইল কার্বামেট ইত্যাদি। কৃষিক্ষেত্রে আগাছা ধ্বংস করবার ব্যাপারে এদের কাজে লাগানো যায়। প্রথমোক্ত রাসায়নিক পদার্থটি আনারস গাছের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই গাছে ফুল ধরানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অক্সিনকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করে কলা, আপেল ইত্যাদি ফলকে দ্রুত পাকানো, পরাগ-সংযোগ ছাড়া টোম্যাটোর ফুল থেকে ফল তৈরি করা, তুলা গাছ থেকে তুলা মাটিতে ঝরিয়ে দিয়ে সহজে তুলা সংগ্রহ করা সম্ভব। অক্সিনের সঠিক প্রয়োগে ধান ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এগুলি ছাড়াও অক্সিনকে বিভিন্নভাবে বহু কাজে লাগানো হচ্ছে। এই কারণে অক্সিন সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কৌতুহল ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীদেরও অক্সিন সম্পর্কিত গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

উত্তর 2. সাধারণতঃ কোন একটি গ্রহের উপগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে গ্রহের ভর মাপা হয়ে থাকে। গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান r এবং তাদের ভর যদি যথাক্রমে M ও m হয়, নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র থেকে তাদের মধ্যে

পারস্পরিক আকর্ষণী বল $=G\frac{Mm}{r^2}$

G হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

আবার উপগ্রহটি উপবৃত্তাকার পথে আবর্তিত হবার সময় কেন্দ্রাতিগ

$$\text{শক্তি}=\frac{mv^2}{r}$$

যেখানে v হচ্ছে উপগ্রহটির বেগ। এই আকর্ষণী বল ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর সমান।

অতএব　$G\frac{Mm}{r^2}=\frac{mv^2}{r}$

অর্থাৎ　$M=\frac{1}{G}v^2r$

v এবং r জানা থাকলে গ্রহের ভর M এই সূত্র থেকে নির্ণয় করা যায়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

চন্দ্রদেহের গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য

হিউস্টন থেকে 7ই জুন এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ, ভূকম্পন যন্ত্রে যে সব তরঙ্গ ধরা পড়েছে, তাতে জানা যায়, পেঁয়াজের মত কতকগুলি স্তর দিয়ে চন্দ্রগর্ভ গঠিত হয়েছে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর গর লাথাম 6ই জুন বলেন, গত মাসে একটি উল্কাপিণ্ড চন্দ্রদেহ ভেদ করে 965 কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এর ফলে চন্দ্রদেহে যে কম্পন সুরু হয়, ভূকম্পন যন্ত্রে তাই ধরা পড়েছে। অ্যাপোলো মহাকাশচারীরা ওই যন্ত্রটি চাঁদে রেখে এসেছিলেন। চাঁদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্তরে যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তা পরীক্ষা করে ডক্টর গর লাথাম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, চন্দ্রত্বকের ঘনত্ব 61 কিলোমিটার—ভূত্বকের প্রায় দ্বিগুণ। চাঁদের উপরের দিকে যে সব পাহাড় রয়েছে, তা নীরেট পাথর দিয়ে তৈরি বলে মনে হয়। ওই সকল পাহাড়ের তলদেশে মাটির মত জিনিষের একটি স্তর রয়েছে। মহাকাশ সংস্থা ডক্টর লাথামের গবেষণালব্ধ একথা ঘোষণা করে।

ডক্টর লাথাম বলেন, চন্দ্রের কম্পন-তরঙ্গের গতির হার চন্দ্রদেহের অভ্যন্তরে 61 কিলোমিটার গভীরে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। এতে বোঝা যায়, চন্দ্রগর্ভের নীচের দিকে একটি আবরণ রয়েছে। এরপর কম্পন-তরঙ্গ 965 কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

চন্দ্রের গভীরতম তলদেশে যে আবরণ রয়েছে, সেখানে কম্পন-তরঙ্গের গতি সেকেণ্ড প্রতি 8 কিলোমিটার। পৃথিবীর গভীরতম তলদেশের ভূকম্পন-তরঙ্গের গতির হারও একই রকম। চন্দ্রের অভ্যন্তর ভাগের গঠন সম্পর্কে এই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল।

ডক্টর লাথাম আরও জানান, অ্যাপোলো-14-এর মহাকাশচারীরা যে স্থানে অবতরণ করেছিলেন, তার 14 কিলোমিটার উত্তরে উল্কাপিণ্ডটি চন্দ্রদেহে আঘাত করে। ডক্টর লাথাম মনে করেন, উল্কাপিণ্ডটির ব্যাস ছিল 1·8 মিটার।

কৃত্রিম দুধ আবিষ্কার

কলম্বাস, ওহিও থেকে 2রা জুন এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—কলকাতার ছাত্র শ্রীকুলবীর সাভারওয়াল সয়াবীন, প্রোটিন, খনিজ দ্রব্য এবং জলের মিশ্রণে কৃত্রিম দুধ উৎপন্ন করে আমেরিকান অয়েল কেমিষ্ট সোসাইটির 1972 সালের শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করেছেন।

ওহিও ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য-বিজ্ঞান ও পুষ্টিবিদ্যার স্নাতক শ্রীসাভারওয়াল বলেন, যদিও এই দুধের গন্ধ গরুর দুধের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ধরণের, তথাপি তাঁর বিশ্বাস, সকলেই এই দুধ ব্যবহার করবে। এই কৃত্রিম দুধের সঙ্গে মোষের দুধ মিশ্রিত করে সাধারণ মাখনযুক্ত দুধ প্রস্তুত করা যাবে।

শ্রীসাভারওয়াল বলেন, ভারতে যে মোষের দুধের প্রচলন আছে, তাতে মাখনের হার খুবই বেশী—সাড়ে ছয় শতাংশেরও অধিক। কিন্তু সরবরাহ চাহিদার উপযুক্ত না হওয়ায় গুঁড়া দুধ মিশিয়ে ঐ দুধে মাখনের হার সাড়ে তিন শতাংশ নামিয়ে 'টোন্‌ড্' দুধরূপে যোগান দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, সয়াবীন মিশ্রণ ব্যবহার করলে আমদানী গুঁড়া দুধের চেয়ে কম খরচে দুধ প্রস্তুত করা যাবে।

অ্যাপোলো-16-র চন্দ্রাভিযানে সংগৃহীত তথ্য

পূর্বে যে সব চন্দ্রাভিযান চালানো হয়েছে এবং যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, সে সব তথ্যের ভিত্তিতেই অ্যাপোলো-16-র চান্দ্রযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের স্থান নির্ধারিত হয়েছিল। চন্দ্রের নিরক্ষবৃত্তের 298 কিলোমিটার দক্ষিণে পূর্বাঞ্চলের উচ্চতম স্থানে চান্দ্রযানটি অবতরণ করেছিল। এই স্থানটির নামকরণ করা হয় ডেকার্টে অঞ্চল। এখানে যে সব চান্দ্রশীলা চন্দ্রগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েছে, সেগুলির বয়স 350 কোটি বছরেরও বেশী। প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে, বিশেষ করে চন্দ্র ও পৃথিবী সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞানের প্রসারই ছিল এবারের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এত বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতিসহ এর আগে আর কোন অ্যাপোলো-যান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় নি। একটি আলট্রা-ভায়োলেট ক্যামেরা স্পেকট্রোস্কোপও ঐ সকল যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল। এর সাহায্যে পৃথিবী সহ বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্রের দশ হাজারেরও বেশী আলোকচিত্র গৃহীত এবং পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। পৃথিবীর নিকটে এবং বহু দূরে প্রচুর পরিমাণে পুঞ্জীভূত হাইড্রোজেন রয়েছে। এই হাইড্রোজেন মেঘের হদিস এই ক্যামেরা স্পেকট্রোমিটারের অদৃশ্য অতিবেগুনী আলোর সাহায্যে পাওয়া গেছে।

এবারের অভিযানের আর একটি বৈশিষ্ট্য মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক-রে ডিটেক্টর নামে একটি যন্ত্র চন্দ্রযানের বাইরের দিকে যুক্ত ছিল। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য সন্ধানের চেষ্টা করা হয়। এই রশ্মি আলোর গতিতে চন্দ্রবক্ষে প্রচুর পরিমাণে ঝরে পড়ছে। কিন্তু পৃথিবীর উর্ধ্বাকাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে, তা এগুলিকে টেনে নেয়। ফলে মহাকাশেই এই সকল কণা থেকে যায়। মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রে এই সকল কণা সংগৃহীত হয়। মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে আসেন। বিজ্ঞানীরা ঐ সকল কণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলতে পারবেন—কি কি উপাদানে এই সকল কণা গঠিত, কি পরিমাণ শক্তিতে ও গতিতে সেগুলি চন্দ্রবক্ষে এসে পড়ছে।

অ্যাপোলো-16 মূল যানে পৃথিবী থেকে দুটি ছোট বাক্সে করে জীবাণু নিয়ে যাওয়া হয় এবং চন্দ্রলোক থেকে সেগুলিকে ফিরিয়েও আনা হয়। জীবন্ত প্রাণীর উপর মহাজাগতিক পরিবেশে মহাজাগতিক রশ্মির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরীক্ষা ও গবেষণার জন্যে বাক্স দুটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই পরীক্ষা-পদ্ধতির নাম বায়োস্ট্যাক—জার্মান বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতির উদ্ভাবক।

এই অভিযানে মহাকাশচারীদ্বয় চন্দ্রপৃষ্ঠে তিন দিন অবস্থান করে নানা পরীক্ষা সম্পাদন করেছেন। এই অভিযানে চন্দ্র সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে অমূল্য মনে করছেন। আবার অ্যাপোলো-16 অভিযান বিজ্ঞানীদের মনে বেশ কিছু ধাঁধারও সৃষ্টি করেছে। সেগুলি হলো—অবতরণ স্থলের নিকটবর্তী কেইলি সমতলভূমি এলাকার চৌম্বক ক্ষেত্রটি অপ্রত্যাশিতরূপে শক্তিশালী। ডেকার্টে এলাকা থেকে সংগৃহীত একটি শিলা, চন্দ্রের নীচু এলাকা থেকে অ্যাপোলো-14 ও 15-র অভিযানে সংগৃহীত শিলার চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে বিজ্ঞানবিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রদান

গত 24শে মে ৺ প্রাণতোষ ঘটকের বৈঠকখানা রোডের বাসভবনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর 50তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্যে বিজ্ঞানবিষয়ক শতাধিক পত্র-পত্রিকা দান করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী শ্রীঘটকের কন্যা কুমারী নন্দিনীর হাত থেকে এই উপহার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জয়ন্ত বসু এবং সহ-কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন।

শোক-সংবাদ

পরলোকে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ 28শে জুন কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

অধ্যাপক মহলানবীশ 1893 সালের 29শে জুন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 1912 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

বি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। 1914 এবং 1915 সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে অঙ্কশাস্ত্রের ট্রাইপস (প্রথম ভাগ) এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের ট্রাইপস পরীক্ষায় (দ্বিতীয় ভাগ) সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং কিংস কলেজের সিনিয়র রিসার্চ স্কলারশিপ লাভ করেন। 1915 সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজেপদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং 1922 সালে ঐ বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। 1945 সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন। কিছুকাল ঐ কলেজের অধ্যক্ষের কাজ (1945-48) করেন। 1948 সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এমেরিটাস অধ্যাপক' হন।

কলিকাতায় আবহাওয়াতত্ত্ব বিভাগের তিনি মিটিওরোলোজিষ্ট ছিলেন (1922-26)। 1941 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগ স্থাপিত হলে তিনি উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে নিযুক্ত হন এবং 1945 সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1945 সালে তিনি লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ-আর-এস) নির্বাচিত হন। 1931 সালে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপনের পর থেকে 1964 সাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ও ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেন। 1950 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। 1949 সালে তিনি ভারত সরকারের পরিসংখ্যান বিষয়ক অবৈতনিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন এবং 1955 সালে ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। 1957 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 1961 সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথাক্রমে ডি. এস-সি. ও দেশিকোত্তম উপাধি প্রদান করেন। 1968 সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্ম বিভূষণ' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। 1945 সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়েলডন মেডেল ও প্রাইজ লাভ করেন। তাছাড়া তিনি দেশে-বিদেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন। তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন।

1933 সালে প্রকাশিত 'সংখ্যা' নামক সংখ্যাতত্ত্ববিষয়ক ভারতীয় পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। 1921 সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি মূল সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন (1921-31)।

পরিসংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর অনেক গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি ইংরেজী ও বাংলায় অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক (1961) প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে অধ্যাপক মহলানবীশ সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন. তাঁর পাশে উপবিষ্ট (ডান দিক থেকে)—অনুষ্ঠানের সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং কর্মসচিব অধ্যাপক শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ।

প্রতিষ্ঠা-দিবস সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | অগাষ্ট, 1972 | অষ্টম সংখ্যা

নিবেদন

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান আদর্শ গ্রহণ করিয়া 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহারই স্মারকরূপে প্রতি বৎসর যথারীতি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইতেছে। বর্তমান বৎসরেও গত 29শে জুলাই আমরা যথা-যোগ্য মর্যাদাসহকারে এই প্রতিষ্ঠা-দিবসোৎসব পালন করিয়াছি। এই অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান প্রতিষ্ঠা-দিবস সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচার আজ আর অসম্ভব কল্পনা নহে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বর্তমান 1972 সাল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র রজত জয়ন্তী বর্ষ। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাসে ইহা এক অনন্য-সাধারণ দৃষ্টান্ত।

যাঁহাদের সাহচর্য ও সহায়তায় এই অভিনব ইতিহাস রচিত হইয়াছে—আজ প্রথমেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। পথ বন্ধুর, পাথেয় অপ্রচুর, কিন্তু আমাদের উৎসাহ অদম্য, বিশ্বাস অফুরন্ত।

অতীতে আমরা বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছি, হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায় তাহা অতিক্রমও করিয়াছি। কিন্তু বাধাবিঘ্ন যে একেবারেই নির্মূল হইয়াছে তাহা নহে; তাহা হইতেও পারে না। চলার পথে বাধা তো আসিতেই পারে! সেই বাধা অতিক্রম করিয়া যাওয়াই আমাদের সাধনা; তাহাতেই আমাদের সিদ্ধি।

আজ এই শুভ মুহূর্তে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র লেখক, পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহক সকলকেই জানাই আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিবাদন। প্রার্থনা করি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র নব নব সাফল্যমণ্ডিত অব্যাহত অগ্রগতি।

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

বর্তমান বছরে কলিকাতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এরই মধ্যে বেশ কতকগুলি বিজ্ঞান-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এদের মধ্যে বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেণ্ট পলস্ স্কুল, সায়েন্স ফর চিলড্রেন সংস্থা, সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ দায়িত্ববশতঃ প্রথম ও শেষোক্ত প্রদর্শনী দুটির প্রতিটি মডেল বেশ ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলাম। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যন্ত্রপাতি ও কার্যকর মডেলের মাধ্যমে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয় এবং প্রদর্শিত অধিকাংশ কার্যকর মডেলের নির্মাণকুশলতা ও উচ্চ মান দেখে বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পরীক্ষা ব্যবস্থায় নানা কারণে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশের উদ্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরণের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন শুধুমাত্র প্রশংসনীয়ই নয়, নৈরাশ্যের মধ্যে আশার আলোসঞ্চারীও বটে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন এবং লেবরেটরীতে হাতে-কলমে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার যথাযথ সুযোগ পেয়ে বর্তমানে ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সেই অনেকে বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞ ও উৎসাহী শিক্ষকদের সান্নিধ্য ও অনুপ্রেরণা লাভ করলে এরা অনেক সময় পাঠ্য-সূচীর বহির্ভূত বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বিশেষ উদ্যম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি-পালন করতে স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত পরিবেশ এবং যথোপ-যুক্ত ব্যবস্থার অভাবে এসব উদ্যম সফলতার আলো দেখতে পায় না। বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান (N.S.T.S.) এবং জগদীশ বসু জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান (J.B.N.S.T.S) প্রতিযোগিতায় সঙ্গত কারণেই প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে কোন না কোন একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করতে হয়। নিজ নিজ শিক্ষায়তনে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে স্বভাবতঃই এরা সাহায্যের জন্যে কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের পরিচিত উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করে নেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিকাল মিউজিয়াম, সায়েন্স ফর চিল্‌ড্রেন এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 'হাতে-কলমে বিভাগে' বা হবি সেণ্টারে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কার্যকর মডেল তৈরির সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে অনেক ছাত্র উপকৃত হয়েছে এবং হচ্ছে। অবশ্য এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে গ্রামাঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা একেবারেই বঞ্চিত। উপরন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সব মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা খুবই অপ্রতুল।

স্কুল-কলেজ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের দ্বারা আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর গুরুত্ব সম্বন্ধে কারোর মনে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। হাতে-কলমে কাজ করা, পরস্পরের

মধ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু ও সৃজনশীল মনোভাব গড়ে ওঠে—তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধিত হয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে 'বিজ্ঞান প্রতিভা অনুসন্ধান'—এই মহৎ কাজটি আরো সহজে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। একথা ভুললে চলবে না যে, এরাই হবে ভবিষ্যতে সার্থক বিজ্ঞানী, যাদের অফুরন্ত কর্মশক্তি ও সৃজনী প্রতিভার ফলে দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং বিশ্ব-বিজ্ঞানের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজে সুচিন্তিত পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে হবে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত তথাকথিত প্রাকটিক্যাল ক্লাশ ছাড়াও কিছুটা বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি ছাত্রই যাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষা বা প্রকল্প নিজ নিজ পছন্দানুযায়ী করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ স্কুল-কলেজের আর্থিক সঙ্গতি এতই শোচনীয় যে, উপযুক্ত লেবরেটরী বা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ছাত্রদের উৎসাহ বর্ধন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্যার আংশিক সমাধান একমাত্র সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাতেই সম্ভব বলে মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ গত পয়লা জুলাই রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে 'সায়েন্স ফর চিলড্রেন' সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনী উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার (ডি. পি. আই.) উদ্বোধনী ভাষণের সারমর্ম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন—"সরকার চায় গোষ্ঠীগতভাবে এই প্রচেষ্টা যত বেশী গড়ে ওঠে ততই ভাল। বিজ্ঞান-শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করা এর সাহায্যে সহজতর হবে। উপযুক্ত উদ্যোক্তাদের সরকার সাহায্য করতে প্রস্তুত।" (দেশ, শনিবার 15ই জুলাই, 1972 সমরজিৎ করের 'বিশ্ব বিজ্ঞান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শিক্ষা অধিকর্তার সময়োপযোগী এই আশ্বাসবাণী ও সাধু ঘোষণার প্রতি প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য শেষ করছি।

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

কোয়ান্টামবিদ্যা সৃষ্টির মূলে যে ধ্রুবকটির অবদান অপরিহার্য, সেই ধ্রুবকটির নাম হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। h প্রতীক দিয়ে এই ধ্রুবকটি চিহ্নিত করা হয়। এই ধ্রুবকটি আবিষ্কৃত হয় 1900 খৃষ্টাব্দে; আবিষ্কর্তা ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। h একটি অত্যাবশ্যক ভৌত ধ্রুবক। পদার্থবিদ্যায় সুবিধার জন্যে অনেক সময় -h- প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এই -h-কে ডিরাক-h (Dirac-h) বলা হয়, এবং এর মান হলো $\frac{h}{2\pi}$

অর্থাৎ -h- = $\frac{\text{প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক}}{2\times\frac{22}{7}}$।

কোন বিকিরণের কম্পনাঙ্কের সঙ্গে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকটি গুণ করলে শক্তির একটি কোয়ান্টাম পাওয়া যায়। এই কোয়ান্টামকে শক্তিকণা বলা যেতে পারে। যদি বিকিরণের কম্পনাঙ্ক ν হয়, তাহলে এক একটি কোয়ান্টাম বা শক্তিকণার শক্তিমাত্রা হবে $h\nu$। তাপ-কম্পনের একটি কোয়ান্টামকে ফোনন (Phonon) এবং আলোক-কম্পনের একটি কোয়ান্টামকে ফোটন (Photon) বলা হয়। এই কোয়ান্টামের ধারণা বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্কের আগে সৃষ্ট সব ধারণা থেকে সম্পূর্ণ নতুন ও আলাদা। আগেকার নিরবচ্ছিন্ন শক্তির ধারণাকে প্রতিস্থাপন করে বিজ্ঞানী প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টামের ধারণা দিয়েই বিকিরণের সূত্র আবিষ্কার করেন, যা বিকিরণের ক্ষেত্রে পরীক্ষালব্ধ সমস্ত ফলাফল সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে শক্তি কেবলমাত্র কোয়ান্টামের আকারে বিকিরিত হতে পারে কিংবা বলা যেতে পারে—কোন নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্কের সমস্ত শক্তি কতকগুলি শক্তির একক দিয়ে গঠিত এবং এই এককগুলির প্রত্যেকটি হলো এক-একটি কোয়ান্টাম। এটাই হলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব তথা প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্রের মূল কথা। আধুনিক বিজ্ঞান এই কোয়ান্টামের ধারণার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়েই আইনষ্টাইন আলোকতাড়িতিক ক্রিয়া এবং কম্পটন এক্স-রে'র অসমঞ্জস (Incoherent) বিক্ষেপণ নিখুঁৎভাবে ব্যাখ্যা করেন। এসব থেকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকটিও কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি অত্যাবশ্যক ধ্রুবকরূপে পরিগণিত হয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় সূত্রে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক স্পষ্টভাবে জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

(1) হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিতে:—অনিশ্চয়তা নীতিটি হলো—একই সঙ্গে একটি কণার অবস্থান ও ভরবেগ সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে কণার অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয়ের ভুল বা অনিশ্চয়তার গুণফল কখনও প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকমানের কম হতে পারে না, বড়জোর সমান হতে পারে। হাইজেনবার্গের সূত্রটি হলো, $\Delta x, \Delta P_x \geqslant h$.। Δx ও ΔP_x হলো, যথাক্রমে অবস্থান ও একই সঙ্গে ভরবেগ নির্ণয়ের অনিশ্চয়তা বা ভুল।

(2) দ্য-ব্রগ্‌লির বস্তুকণার তরঙ্গ-প্রকৃতি সূত্রে:—যদি কোন m ভরবিশিষ্ট v বেগে ধাবিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে সংযুক্ত তরঙ্গের

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (λ): $\frac{\text{প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক}}{\text{ভরবেগ}}$। একরূপ তরঙ্গকে

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।

গু-রগ্‌লি তরঙ্গ বা বস্তু-তরঙ্গ বলে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা বস্তু ও তরঙ্গের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আলাদা সত্তা হিসাবে গণ্য করি। কিন্তু বলা যেতে পারে, h আবিষ্কারের ফলে বস্তু ও তরঙ্গ যে একই সত্তার দুটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র, তা প্রমাণিত হলো। অতএব h-কে সমস্ত বস্তু-কাঠামোর মূল উপাদান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

(3) নীলস্‌বোরের পরমাণু মডেলে :—নীলস্‌-বোরের মতে, কোন পরমাণুর মডেলে ধনাত্মক আধানযুক্ত ভারী নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি বৃত্তাকার কক্ষপথে (যেগুলি কোয়াণ্টাম সর্ত মানে) প্রদক্ষিণরত। বোরের তত্ত্বানুযায়ী কোন পরমাণুর কোন নির্দিষ্ট ইলেকট্রন-কক্ষপথের ব্যাসার্ধ h-এর বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আণুবীক্ষণিক জগতে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের অবদান অত্যাবশ্যক, অর্থবহ এবং পরীক্ষালব্ধ। অবশ্য ক্ল্যাসিক্যাল নয়; তাই পরোক্ষ উপায়ে এর মান নির্ধারণ করতে হয়। h-এর মান নির্ধারণের পরোক্ষ উপায়ের কয়েকটির উল্লেখ করা হলো।

(1) প্ল্যাঙ্কের বিকিরণ সূত্র (কালো বস্তু বা আদর্শ বিকিরকের ক্ষেত্রে) থেকে h-এর মান পাওয়া যায়।

(2) আলোক-তাড়িতিক ক্রিয়া—আলোক-তাড়িতিক ক্রিয়া হলো—যদি $h\nu$ শক্তিবিশিষ্ট কোন আলোক-কণা বা ফোটন ধাতব পাতের উপর আপতিত হয়, তাহলে পাতটির উপরিতল থেকে ইলেকট্রন নির্গত হবে—যাকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রন। আপতিত ফোটনটির শক্তির কিছু অংশ প্রথমতঃ ইলেকট্রনটিকে পাত থেকে মুক্ত করবে এবং বাকী অংশটুকু ইলেকট্রনকে গতিশক্তি দেবে, অর্থাৎ একটি ফোটনের শক্তি $= h\nu =$ ইলেকট্রনকে পাত থেকে মুক্ত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি $(W) +$ ইলেকট্রনটির গতিশক্তি $(\frac{1}{2}mv^2)$, যেখানে m হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর এবং v তার গতিবেগ (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

1নং চিত্র
আলোক-তাড়িতিক ক্রিয়া
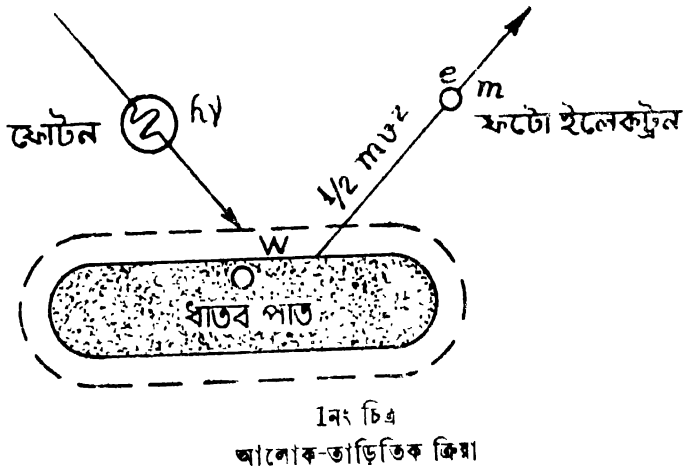
তত্ত্বে h-এর কোন ভূমিকা নেই। আণুবীক্ষণিক জগতের ব্যাপার বলেই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান প্রত্যক্ষ কোন পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব

কোন ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রন বহিষ্করণের জন্যে ফোটনের একটি ন্যূনতম শক্তিমাত্রা থাকতে হবে; সে জন্যে অতিবেগুনী রশ্মি বা এক্স-

রশ্মি ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানী মিলিকান আলোক-তাড়িতিক ক্রিয়ার কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন এবং h ও ইলেকট্রন-আধানের অনুপাত নির্ণয় করেন। এই অনুপাতে ইলেকট্রন-আধানের মান জানলে h-এর মান সহজেই পাওয়া যায়।

(3) রিডবার্গ ধ্রুবক :—বোরের হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর তত্ত্বে একটি ধ্রুবকের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় রিডবার্গ ধ্রুবক (R)।

এই ধ্রুবকটির তত্ত্বগত মান হলো $R = \frac{[illegible]}{Ch^3}$, যেখানে e ও m যথাক্রমে ইলেকট্রনের আধান ও ভর এবং c হলো আলোর গতিবেগ। R-এর

2নং চিত্র
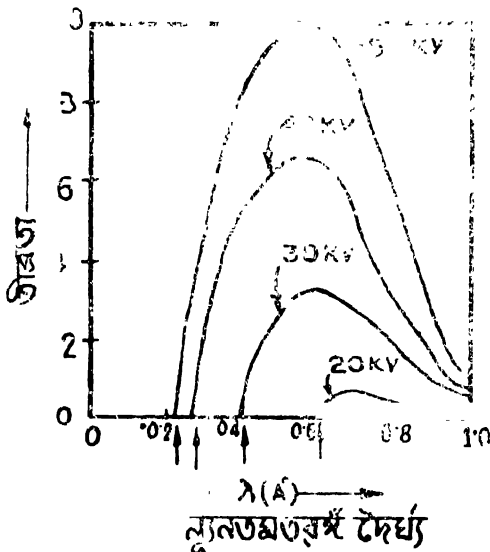
নানা টিউব ভোল্টেজে টাংস্টেনের নিরবচ্ছিন্ন এক্স-রশ্মি বর্ণালী। ন্যূনতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা টিউবের ভোল্টেজের উপর নির্ভরশীল। Å—অ্যাংষ্ট্রম (=10^{-8} সে. মি.), hv—কিলোভোল্ট।

মান পরীক্ষালব্ধ বর্ণালী বিশ্লেষণে পাওয়া যায়। সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণে সব কিছুর লব্ধ মান বসিয়ে h-এর মান জানা যায়।

(4) এক্স-রশ্মির নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর ন্যূনতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা ব্যাখ্যা করতে বিজ্ঞানী ডুনে এবং হান্ট এর সূত্র হলো : $eV = h\nu_{max}$। এখানে V—এক্স-রে টিউবে ব্যবহৃত বিভব, ν_{max}—নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর ঊর্ধ্বতম কম্পনাঙ্ক; (ন্যূনতম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য = আলোর গতিবেগ)। সুতরাং ইলেকট্রনের আধান e এর মান জানলে h-এর মান সহজেই নির্ধারণ করা যায় (2নং চিত্র)।

নানা উপায়ে মোটামুটি নির্ভুলভাবে পাওয়া এই ধ্রুবকটির মান হলো 6.6252×10^{-27} আর্গ-সেকেণ্ড বা 6.6252×10^{-34} জুল সেকেণ্ড। আমাদের বিশ্বে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকটির মান নির্দিষ্ট অর্থাৎ h একটি শাশ্বত ধ্রুবক।

যদি এমন কোন নূতন বিশ্বের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান আমাদের জানা মানের তুলনায় অনেক কম, (মনে করা যাক, 6.6×10^{-68} জুল সেকেণ্ড), তাহলে সেখানকার অধিবাসীদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আমাদের চিন্তাধারার তুলনায় কেমন হবে? h-এর এত ক্ষুদ্র মানের জন্যে সেই নতুন বিশ্বে সমস্ত ঘটনাকে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা হবে, অর্থাৎ সেই বিশ্বটাই ক্ল্যাসিক্যাল হয়ে দাঁড়াবে। সেই নতুন বিশ্বে বস্তু ও তরঙ্গ—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বা। নিউটনীয় বলবিদ্যা সর্বত্র প্রযোজ্য হবে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোন দিনই আবিষ্কৃত হবে না। পারমাণবিক বর্ণালী এত ঘনসন্নিবিষ্ট হবে যে, তা বিচ্ছিন্ন রৈখিকের পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতীয়মান হবে। অবশ্য এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক কেবল দৃষ্ট ঘটনাকেই পরিবর্তিত করছে, দর্শক বা মাপজোখের যন্ত্রপাতিকে নয়। কিন্তু দর্শক বা মাপজোখের যন্ত্রপাতির দিকটা যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, সেগুলির আকৃতি অকল্পনীয়ভাবে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে অথচ ভরের কোন পরিবর্তন হয় নি। কারণ হিসাবে বলা যায়, পরমাণুর ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ

h-এর বর্গের সঙ্গে সমানুপাতিক। সুতরাং h-এর মান খুব কম হলে পরমাণুর আকৃতি এত ছোট হয় যে, তারা আরও বেশী ঘনসন্নিবিষ্ট হয়। তবে কোন বিশ্বে এত বেশী স্তরের জীবিত কোন ক্ষুদ্রতম প্রাণীর অবস্থান বেশ কষ্টকল্পিত। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কোয়ান্টাম ধারণা দিয়ে কোন সূত্র পাওয়ার পর সেই সূত্রে h-এর মান যদি শূন্যের দিকে সীমিত করা যায়, তবে তার ক্ল্যাসিক্যাল সূত্র পাওয়া যায়।

অন্য দিকে, যদি কোন বিশ্বে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবকের মান খুব বেশী হয়, (ধরা যাক, $h = 6 \cdot 6 \times 10^{3}$ জুল সেকেণ্ড), তাহলে সেই বিশ্বে সাধারণ মিস্ত্রী থেকে সুরু করে ইঞ্জিনীয়ার পর্যন্ত সবাইকে কোয়ান্টাম তত্ত্ব জানতে হবে। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্র চোখে দেখা ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হবে কোয়ান্টাম সূত্র দিয়েই। ক্ল্যাসিক্যালের ধারণা সেই বিশ্বাসীদের থাকবে না বললেই হয়। প্রতিনিয়ত তারা একই সত্ত্বার বস্তু ও তরঙ্গরূপ প্রত্যক্ষ করবে। অবশ্য এখানেও দর্শক ও দর্শনীয় বস্তুর আকৃতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না ধরে নেওয়া হচ্ছে। যদি তা না ধরা হয়, তাহলে সব কিছু ঘটনা আমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে রূপকথার মত শোনাবে।

খেলনা ইলেক্ট্রো-রকেট

ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব টয় রিটেলার্স কর্তৃক নির্মিত মোটর কার 'ইলেকট্রো-রকেট নামে একটি খেলনা মোটর। ব্যাটারীর সাহায্যে পরিচালিত অটোচার্জারের প্লাগের সঙ্গে লাগিয়ে
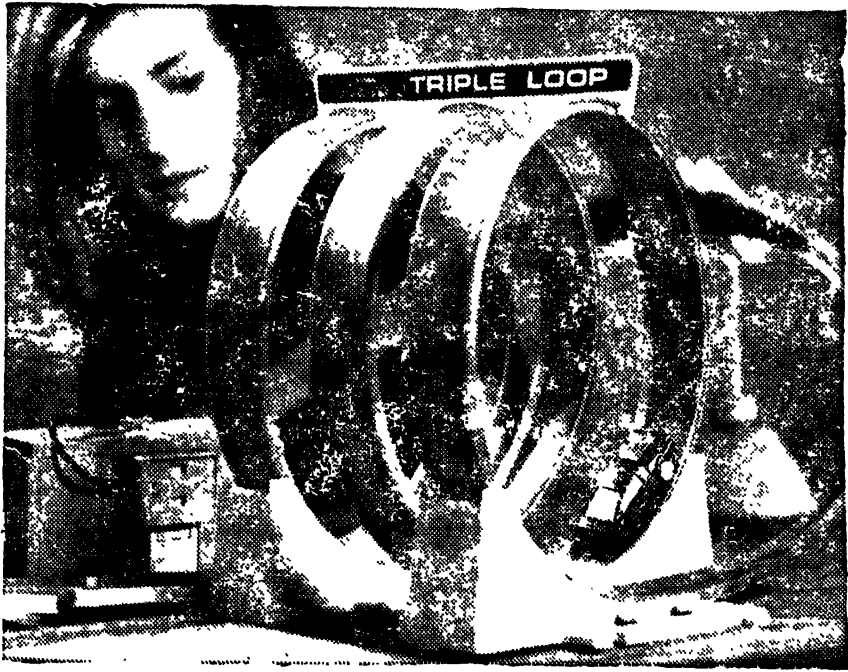
দিলেই পাওয়ার সেলের সাহায্যে ইলেক্ট্রো-রকেটটি অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড গতিতে চলতে থাকে।

অপ্‌টিক্যাল গ্লাস

অশোক চক্রবর্তী ও অরবিন্দ দাশ*

যে সকল কাচ আলোক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, সেগুলিকে আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাচ বা অপ্‌টিক্যাল গ্লাস (Optical glass) বলা হয়। বস্তুতঃ আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি কাচের ব্যবহার ছাড়া করা প্রায় অসম্ভব। অপ্‌টিক্যাল গ্লাস সম্পর্কে আলোচনা কাচশিল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সাধারণ কাচ ও অপ্‌টিক্যাল গ্লাস—পৃথিবীতে যে সকল পদার্থের ব্যবহার অত্যন্ত প্রাচীন, সেগুলির মধ্যে কাচ অন্যতম। মিশরীয়েরা খৃষ্টের জন্মের 5000-6000 বছর পূর্বে কারুকার্যখচিত কাচের ব্যবহার জানতো। মধ্যযুগে ভেনিসেই ছিল কাচ তৈরির একচেটিয়া কারখানা। তখনও জার্মেনী কিংবা ইংল্যাণ্ডে কাচ তৈরির কোনও কারখানা ছিল না। পরে ষোড়শ শতাব্দীতে এর পত্তন হয়। বিজ্ঞান-জগতে যারা এখন শীর্ষে, যেমন—আমেরিকা, সেখানে কাচ তৈরির প্রথম কারখানা হয় মাত্র 1608 খৃষ্টাব্দে। অপর পক্ষে, আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন যুগেও যে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাদিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাচ বলতে আমরা একটি কঠিন, স্বচ্ছ অথচ ভঙ্গুর পদার্থকে বুঝি—অবশ্য অস্বচ্ছ কাচের ধারণাও আমাদের আছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কাচের সংজ্ঞা নিম্নরূপে দেওয়া যেতে পারে—

কাচ একটি কঠিন, অতি শীতলীকৃত তরল পদার্থ, যার কোন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নেই এবং এর সান্দ্রতা (Viscosity) এত উঁচু—যার ফলে সেটা কেলাসে পরিণত হতে পারে না। রাসায়নিকভাবে কাচ হলো অনুদ্বায়ী অজৈব অক্সাইড (প্রধানতঃ ক্ষারীয় ও মৃৎক্ষারীয় ধাতুর), বালি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি। কাচ নির্দিষ্ট অবয়বহীন (Amorphous) পদার্থ।'

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের কথায় আসা যাক। সাধারণ কাচের চেয়ে এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো—

(ক) এর রাসায়নিক সংযুক্তি এমন হওয়া দরকার, যাতে প্রয়োজনীয় আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধর্মের (Optical properties) সৃষ্টি করে এবং কম সান্দ্রতাবিশিষ্ট হয়; (খ) এই জাতীয় কাচ প্রস্তুতির সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন কোন যৌগ কেলাসে পরিণত না হয়—এমন কি, অনেকক্ষণ ধরে কোমলায়ন (Annealing) করলেও, (গ) কাচের যেন নিজস্ব কোন বর্ণ না থাকে এবং তার বিচ্ছুরক ক্ষমতাও থাকবে না; (ঘ) কাচে যেন বুদ্‌বুদ না থাকে এবং কাচ যেন বিশেষ ধরণের ত্রুটিমুক্ত হয়, (ঙ) এই জাতীয় কাচের পৃষ্ঠদেশ যেন দীর্ঘকাল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ুর প্রভাবে থেকেও অবিকৃত থাকে।

প্রস্তুতি—কাচ তৈরির কাঁচামালকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—সিলিকা (SiO_2); ক্ষারীয় (Alkaline) পদার্থ; এবং ক্ষার ভিন্ন অন্যান্য ক্ষারকীয় (Basic) পদার্থ। এগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সিলিকা—সিলিকার প্রধান উৎস হলো

* রসায়ন বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়; পোঃ নরেন্দ্রপুর, 24-পরগণা

বালি। এই বালি আবার সিলিকাময় শিলার অবক্ষয়ের ফলে পাওয়া যায়। এই বালিকে প্রথমে জল এবং পরে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করবার পর শুকিয়ে গুঁড়া করা হয়। বালি নানাজাতীয় হতে পারে। বিভিন্ন ধরণের কাচ তৈরি করতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বালির ব্যবহার দেখা যায়; যেমন— অপ্‌টিক্যাল গ্লাস নির্মাণে কোয়ার্টজ্‌ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় বালিতে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের অক্সাইড থাকতে পারে। তবে এগুলি ক্ষতিকারক অবিশুদ্ধি নয়, কিন্তু লৌহ যৌগের উপস্থিতি (অধিক মাত্রায় থাকলে) ক্ষতিকারক। তাই এর মাত্রা 0·015%-এর নীচে থাকা দরকার। যে কোয়ার্টজ্‌ ব্যবহৃত হয়, তাকে এমনভাবে গুঁড়া করা হয়, যাতে কণার আকৃতি খুব মিহি ও সমতাসম্পন্ন হয় এবং তাতে যেন কোন পাথর-জাতীয় পদার্থের অনুপ্রবেশ না ঘটে।

ক্ষারীয় পদার্থ—ক্ষার হিসাবে প্রধানতঃ সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের যৌগ, যেমন—সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম কার্বোনেট, পটাসিয়াম নাইট্রেট, সোহাগা (Borax) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। সোডিয়াম কার্বোনেট খুব সস্তা ও সহজপ্রাপ্য। তাই এর প্রচলন খুব বেশী। সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহারের আর একটা দিকও আছে যথা—জারক দ্রব্য হিসাবে এবং অতি ছোট বুদ্‌বুদ (Seeds) দূরীকরণে। আবার পটাসিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করলে কাচের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য বাড়ে। সুতরাং অপ্‌টিক্যাল গ্লাস নির্মাণে এর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। পটাসিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করলে এটি বিগালক দ্রব্য (Fluxing agent) ও জারক দ্রব্য হিসাবে কাজ করে। সোহাগা কাচে সোডিয়াম অক্সাইড ও বোরন অক্সাইড সরবরাহ করে। উচ্চ প্রতিসরণাঙ্ক ও নিম্ন-বিচ্ছুরণ ক্ষমতা-সম্পন্ন কাচ তৈরিতে এর ব্যবহার হয়। তাছাড়া এটি কাচের রাসায়নিক স্থায়িত্ব বাড়াতে ও প্রসরণাঙ্ক কমাতে সাহায্য করে।

অন্যান্য ক্ষারকীয় পদার্থ—কাচ নির্মাণে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের অক্সাইড ভিন্ন লেড, বেরিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইডও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলি অপ্‌টিক্যাল গ্লাসের প্রয়োজনীয় উপাদানও বটে। নীচে এগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হলো—

লেডের অক্সাইড সাধারণতঃ লিথার্জ বা রেড লেড হিসাবে যোগ করা হয়। এতে কাচের ঘনত্ব ও প্রতিসরণাঙ্ক বেড়ে যায়। বেরিয়াম অক্সাইড, এর সালফেট অথবা কার্বোনেট থেকে পাওয়া যায়। এই অক্সাইড কাচের ঔজ্জ্বল্য, ঘাতসহনশীলতা, স্থিতিস্থাপকতা ও স্থায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়। ক্যালসিয়ামের অক্সাইড, এর যৌগ, যেমন—কার্বোনেট, সালফেট থেকে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ক্যালসিয়াম অক্সাইড কাচ তৈরির একটি প্রধান ও আবশ্যিক উপাদান। এটা কাচের রাসায়নিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। খুব বেশী পরিমাণে এর ব্যবহার কিন্তু কাচের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ তাতে কেলাস গঠনের সম্ভাবনা থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে দিলে কাচের তাপীয় পরিবাহিতা, কোমলায়ন উষ্ণতা, যান্ত্রিক শক্তি, তাপ-সহিষ্ণুতা, ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসারণাঙ্কও কমে যায়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগ্‌নেসাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি আকরিক থেকে পাওয়া যায় এবং অল্প ব্যবহারে কাচ তৈরির কাচামাল সহজেই গলে। ফেলস্পার ও ক্রায়োলাইটকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। এটি কাচে কেলাস সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে ও সহজে গলতে সাহায্য করে। অল্প পরিমাণে ব্যবহারের ফলে কাচের সান্দ্রতা, কাঠিন্য, স্থায়িত্ব,

স্থিতিস্থাপকতা, প্রাসর্বতা, ঔজ্জ্বল্য, অ্যাসিড-প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া এটা সমসত্ত্বতার (Homogenous) উন্নতি করে, প্রসারণাঙ্ক, কোমলায়ন উষ্ণতা কমায়। জিঙ্ক হোয়াইট (ZnO) সাধারণতঃ রসায়নাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির কাচ প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়। অধাতব অক্সাইড, আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড কাচ-প্রস্তুতিতে ব্যবহার করলে এগুলি বুদ্বুদ দূরীকরণে সাহায্য করে।

কাচ উৎপাদনে আর একটি অপরিহার্য উপাদান হলো কালেট (Cullet)। পুরনো ভাঙা কাচকে কালেট বলা হয়। একে নূতন কাচ প্রস্তুতের সময় কাঁচামালের সঙ্গে ব্যবহার করলে বিগালক দ্রব্য হিসাবে কাজ করে।

উল্লিখিত যৌগসমূহের সংমিশ্রণে কাচ তৈরি করতে গেলে প্রথমে কি রাসায়নিক গঠনের কাচ তৈরি করা হবে, তা স্থির করা হয় এবং রাসায়নিক গণনা করে কি পরিমাণে কোন্ যৌগ দিতে হবে, তাও নির্ধারণ করা হয়। অপ্‌টিক্যাল গ্লাস তৈরির কাজে সোডিয়াম কার্বোনেট, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, বালি ছাড়া যে সব যৌগ আলোক-বিজ্ঞান সম্পর্কিত ধর্মের সৃষ্টি করে, সেগুলিকেও মেশানো হয়। সমস্ত মিশ্রণ একসঙ্গে অথবা মিশ্রণের প্রত্যেকটি উপাদান ভালভাবে গুঁড়া করে নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশানো যেতে পারে।

অপ্‌টিক্যাল গ্লাস তৈরি করা হয় পাত্রচুল্লীতে (Pot furnace)। পাত্রটি দেখতে মুছির (Crucible) মত। মুছিটি প্লাটিনাম কিংবা নির্ধারিত উচ্চমানের বিশুদ্ধ কাদা (Selected high purity clay) দিয়ে তৈরি। প্রথমে খালি পাত্রটিকে চার-পাঁচ দিন ধরে তাপ প্রয়োগ করা হয়। এই সময় তাপমাত্রা হয় 1900° ফা.। তারপর তা গলন চুল্লীতে (Melting furnace) স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাপমাত্রা 2600° ফা.। যখন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এই তাপমাত্রা বজায় থাকে, তখন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও কালেট একসঙ্গে যোগ করা হয়। উপাদানগুলি দেবার পূর্বে প্রত্যেকটি কাঁচামালের বিশুদ্ধতার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়। এটাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সেগুলির পরিমাণের যেন তারতম্য না হয়। তারপর ঐ উচ্চ তাপমাত্রায় সেগুলি গলতে সুরু করে এবং তখন সমস্ত গলিত পদার্থটিকে একটি মাটির তৈরি ফাঁপা নলের সাহায্যে নাড়ানো হয়—প্রথমে দ্রুতগতিতে এবং পরে আস্তে আস্তে। সঙ্গে সঙ্গে সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত যৌগগুলি কাচে পরিণত হয়। সদ্য প্রস্তুতকরা কাচ, চুল্লী থেকে বের করবার পূর্ব মুহূর্তে ফাঁপা নলটি অপসারিত করা হয়।

পাত্রটি চুল্লী থেকে বাইরে আসবার পর তাপীয় অন্তরক আবরণ (Thermally insulated jacket) দিয়ে আবৃত করা হয়। এখানে ধীরে ধীরে কাচ ঠাণ্ডা হয় এবং বৃহৎ নিরেট টুক্‌রাগুলি (Chunks) ভেঙে যায়। পাত্রটিও ভেঙে ফেলা হয় (মাটির পাত্র ব্যবহার করলে)। তখন নিরেট কাচের টুক্‌রাগুলি আরও ছোট করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে কোনও পরিদৃশ্যমান অবিশুদ্ধতা থাকলে তা বাদ দেওয়া হয়। এখন এই কাচের টুক্‌রাগুলিকে অপ্‌টিক্যাল গ্লাস হিসাবে ব্যবহারের জন্যে বিভিন্ন রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। সেগুলিকে গরম ছাঁচপ্রস্তুতির (Hot-molding) পদ্ধতিতে ইস্পাত ও সিরামিক ছাঁচে একটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট রূপ-বিশিষ্ট এই জাতীয় কাচ ঠাণ্ডা হবার পর তার পৃষ্ঠদেশে কোনও ত্রুটি (Surface defect) এড়াবার জন্যে তাকে প্রায় সমান প্রতিসরণাঙ্ক (Refractive index) বিশিষ্ট কোনও তরলে ডোবানো হয়। এবার কোমলায়িত হবার পরে পৃষ্ঠদেশ পালিশ করে কাচকে ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

আধুনিক কালে এই জাতীয় পদ্ধতির যে

উন্নতি হয়েছে, তা হলো—প্ল্যাটিনাম পাত্র-চুল্লীর ব্যবহার। বস্তুতঃ একবার কাচ তৈরির পর প্ল্যাটিনাম পাত্রের কোন ক্ষতিই হয় না, অধিকন্তু অতি উচ্চ তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ (90%) কাচ পাওয়া সম্ভব হয়। তবে কাচের মত একটি সস্তা শিল্পের জন্যে প্ল্যাটিনামের ব্যবহার বিত্তশালী রাষ্ট্রগুলির পক্ষেই সম্ভব। তাই এর অধিক প্রচলন হওয়া কঠিন।

কংক্রিটের রেলপথ

একটানা ঢালাই কংক্রিটের উপর তৈরী রেল লাইনে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা হলে লাইনের দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, লাইনের সংরক্ষণ ব্যবস্থাও তেমনি সহজ হতে পারে।

ছবিতে বৃটিশ রেল গবেষণা কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক পরিকল্পিত এবং সংগঠিত এরূপ একটি কংক্রিটের রেলপথে স্থাপিত ট্র্যাকের উপর পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালিয়ে দেখা

হচ্ছে। যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে এই কংক্রিটের রেলপথ সর্বত্র এমন নিখুঁৎভাবে সমতা রক্ষা করে বসানো হচ্ছে যে, ট্রেন চলবার কালে বা বাঁক নেবার সময় যাত্রীরা সামান্যতম ধাক্কা বা অন্য কোন রকম অসুবিধাই অনুভব করবে না।

এম-এইচ-ডি জেনারেটর—ভবিষ্যতের শক্তির উৎস

মৃণালকান্তি সাহা*

সূচনা

সভ্যতার উষালগ্নেই মানুষের জিজ্ঞাসু মন অনুভব করলো শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং তার পর সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। আজ বিংশ শতাব্দীর চলমান জীবনধারার সক্রিয় অংশীদার হিসাবে আমরা চতুর্দিকে শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করছি। তাই এই শক্তি, যার অনুপস্থিতিতে আজকের কর্মমুখর জীবন স্থবির হয়ে যেত, তার উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে। আবার কখনও বা মনে হয়, যদি শক্তির ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ হয়, তবে কখন ও কোন্ অবস্থায় সভ্যতার সচল গতি নিরুদ্ধ হবে? তবে এটা আশাপ্রদ যে, আজ আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সোপান বেয়ে আধুনিকতার চরম পর্যায়ে উপনীত। তাই কখনও শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা করে শঙ্কিত হই না। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা, এই সকল সমস্যা নিরসনের জন্যে অতন্দ্রভাবে নিরলস গবেষণায় নিরত আছেন দেশবিদেশের বহু নিবেদিত-প্রাণ বৈজ্ঞানিক, যাঁদের অসাধারণ চিন্তাধারায় ফলস্বরূপ আমরা শক্তির আরো রোমাঞ্চকর উৎসের সন্ধান পাব। তখন হয়তো বা পৃথিবী নূতন রূপে আরো রূপবতী হয়ে উঠবে। তাই যদিও শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নই, তবুও জীবনধারণের অন্যতম প্রাথমিক উপাদান শক্তির উৎস সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন জেনারেটরে টারবাইনের ঘূর্ণন। টারবাইন ঘূর্ণনের শক্তির উৎস সাধারণতঃ তিন রকম—(1) জলশক্তি, (2) রাসায়নিক শক্তি ও (3) পারমাণবিক শক্তি।

জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি—এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। যে সকল নদী বর্ষার জলের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, সে সকল ক্ষেত্রে অনাবৃষ্টির বছরে যথেষ্ট অনর্থ ঘটে ও শক্তির উৎপাদন ব্যাহত হয়। আবার রাসায়নিক শক্তির উৎস সাধারণতঃ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম এবং সমগ্র পৃথিবীতে এর সঞ্চয় সীমিত। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখা দিচ্ছে, তাতে একদিন না একদিন পৃথিবীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির অকুলান ঘটবে।

পারমাণবিক শক্তির উৎস পরমাণুর কেন্দ্রকের বিভাজন। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়, তা যেমন অপরিমেয় তেমনি এর উৎকর্ষ সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের নির্দ্বিধায় বলতে হয়, জ্বালানী হিসাবে পারমাণবিক জ্বালানীর উৎকর্ষ যতই থাকুক না কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এর সঞ্চয়ও অফুরন্ত নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত, যাতে অন্য কোন উপায়ে অফুরন্ত শক্তির যোগান পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে আধুনিকতম সংযোজন হলো নিয়ন্ত্রিত তাপ পারমাণবিক সংযোজন (Controlled thermo-nuclear fusion)। সংক্ষেপে বলা চলে, প্রচণ্ড তাপমাত্রায় দুটি হাল্কা পরমাণুর কেন্দ্রক জুড়ে দিলে

*ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

কিছুটা বস্তুভার বিনষ্ট হয়ে তৈরি হয় প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু প্রচণ্ড এই তাপ বীক্ষণাগারে উৎপাদনের জন্যে আমাদের চলে যেতে হবে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা—প্লাজ্‌মায়। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্‌মার অন্তর্নিহিত রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হলো একদিন বর্তমান বিজ্ঞানের নূতন কুশীলব—এম-এইচ-ডি জেনারেটর বা ম্যাগ্‌নেটো-হাইড্রোডায়নামিক জেনারেটর। আশা করা যায়, অচিরাৎ বিজ্ঞান-জগতের জয়ধ্বনি ঘোষণা করে এম-এইচ-ডি জেনারেটর পৃথিবীর সমস্ত পাওয়ার ষ্টেশনে স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করবে। বর্তমান পৃথিবীতে যুগপৎ নিয়ন্ত্রিত তাপ-পারমাণবিক সংযোজন ও এম-এইচ-ডি জেনারেটরের সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিচার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে উপযোগিতার মাপকাঠির বিচারে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে এম-এইচ-ডি জেনারেটর, যা নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মূল তত্ত্ব

তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে এম-এইচ-ডি জেনারেটর এবং সাধারণ ঘূর্ণায়মান জেনারেটরের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য নেই। আমরা জানি,
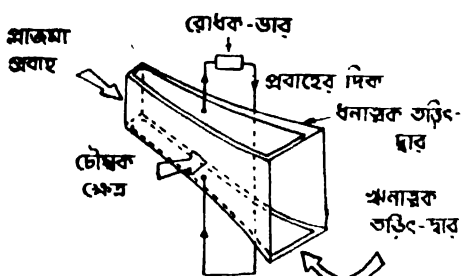
1নং চিত্র

কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি পরিবাহী রেখে তাকে যদি নাড়ানো যায়, তবে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলরেখার পরিবর্তন ঘটে এবং এর মধ্যে তড়িচ্চুম্বকীয় বিভবের আবেশ হয়। এই তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগই সাধারণ জেনারেটরের নীতি। কিন্তু এম-এইচ-ডি জেনারেটরে পরিবাহী, যা চৌম্বক ক্ষেত্রকে ছেদ (Cut) করে, তা হলো আয়নিত গ্যাস-প্লাজ্‌মা। যখন এই প্লাজ্‌মা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তড়িচ্চুম্বকীয় বিভবের আবেশ হয়। এই আবিষ্ট বিভব চৌম্বক ক্ষেত্র এবং প্লাজ্‌মা-প্রবাহ উভয়েরই সঙ্গে সমকোণে নত থাকে (1নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এবার যদি দুটি তড়িদ্দ্বার যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করে রোধক-ভারের (Load resistant) মাধ্যমে তড়িৎ-বর্তনী পূর্ণ করা হয়, তবে ঐ তড়িচ্চুম্বকীয় বিভবের দরুণ বর্তনীর মধ্যে প্রবাহ ঘটবে, যার দ্বারা ফলপ্রসূ কাজ সম্পন্ন করা যাবে। তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এম-এইচ-ডি জেনারেটরে কোন টারবাইনের প্রয়োজন নেই, যা অন্য সকল জেনারেটরের ক্ষেত্রে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

কার্যকারিতা

সাধারণতঃ তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে অপারমাণবিক জ্বালানী ব্যবহার করলে জেনারেটরের কার্যকারিতা দাঁড়ায় শতকরা 35% এবং পারমাণবিক জ্বালানী ব্যবহার করলে কার্যকারিতা হয় 33%। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকতম পর্যায়ে পৌঁছে টারবাইন ও জেনারেটর সমন্বিত ব্যবস্থার নানারকম উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও এদের কার্যকারিতা শতকরা 40 ভাগের বেশী করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এম-এইচ-ডি জেনারেটর বর্তমান পৃথিবীতে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ সাধারণ অবস্থাতেই এর কার্যকারিতা 60%। আশা করা যায়, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের যৌথ প্রচেষ্টায় এর কার্যকারিতা 80%-এর অধিক করা যাবে।

উপযোগিতা ও সুবিধা

(1) প্রথম ও সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো

এম-এইচ-ডি জেনারেটরে কোন টারবাইনের প্রয়োজন হয় না; সরাসরি পরিবাহীর প্রবাহের দ্বারা শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।

(2) সাধারণভাবে যদিও এম-এইচ-ডি জেনারেটরে ডি. সি. শক্তি উৎপাদনের সুবিধা, তবুও সামান্য যান্ত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, যেমন থাইরিসটর ইনভারটারের (Thyristor Inverter) প্রয়োগে ডি. সি. শক্তিকে এ. সি. শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

(3) আবার দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে এম-এইচ-ডি জেনারেটরে সরাসরি এ. সি. শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। যেমন—(ক) অল্টারনেটিং ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের প্রয়োগে অথবা (খ) প্লাজ্‌মা-প্রবাহের ধর্ম ও অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে।

সীমাবদ্ধতা ও অসুবিধা

(1) এম-এইচ-ডি জেনারেটরে ব্যবহৃত প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা প্রচণ্ড হবার দরুণ এর মধ্যে আয়ন ও বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এই কারণে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা সাধারণতঃ কম হয়। এই বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বাড়াবার উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ শতকরা 1 ভাগের কম পটাসিয়াম, সিজিয়াম বা অনুরূপ কোন পদার্থ মেশানো হয়, যাতে গ্যাসটির আয়নিত হবার গতি সহজেই ত্বরান্বিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে সীডিং (Seeding) বা বীজ-বপন।

এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা বিকল্প পন্থা হিসাবে গ্যাসের পরিবর্তে যথেষ্ট পরিবাহিতা সমন্বিত গলিত ধাতু ব্যবহারের কথা চিন্তা করছেন। তাঁদের ধারণা, গলিত ধাতু ব্যবহার করলে এম-এইচ-ডি জেনারেটর অনেক অল্প তাপমাত্রা ও দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রেও সক্রিয় থাকবে।

(2) এম-এইচ-ডি জেনারেটরে আরও একটি প্রধান অসুবিধা হলো প্রচণ্ড তাপসহনক্ষম নালী (Duct) তৈরি করা, কারণ ঐ নালীর মধ্য দিয়েই প্রচণ্ড তাপমাত্রায় প্লাজ্‌মা-প্রবাহ ঘটবে। তদুপরি এই প্লাজ্‌মা খুব ক্ষারধর্মী। বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে আমাদের গোচরীভূত সকল বস্তুই গ্যাসের পরিবাহিতার জন্যে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় পৌঁছুবার বহু পূর্বেই গলে যায়। এক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, প্রচণ্ড তাপক্ষতির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে আমাদের নালী ও প্লাজ্‌মার তাপমাত্রার পার্থক্য খুবই সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন।

(3) এম-এইচ-ডি জেনারেটরে ব্যবহৃত তড়িদ্দ্বারগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, এগুলিকে আরও কঠিনতর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। সাধারণ উপাদানে তৈরি তড়িদ্দ্বার ক্ষয়কারী প্লাজ্‌মার সম্মুখীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। অতএব তড়িদ্দ্বারগুলিকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে কার্যকর রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী আরও লাস্যময়ী হয়ে উঠছে, সৃষ্টিরহস্য ক্রমশঃই হচ্ছে উন্মোচিত। পরমাণুর গহ্বরে সঞ্চিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ফলে মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হচ্ছে। আবার এম-এইচ-ডি পদ্ধতিতে আরও কার্যকরভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হলে তা হবে আমাদের গৃহস্থালী কাজের সক্রিয় অংশীদার এবং নূতন পৃথিবী গড়বার কাজে মানুষ আরও ঘনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করবে। আমরা সে দিনের জন্যে অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

হিমোগ্লোবিন

স্বপনকুমার রায়চৌধুরী

হিমোগ্লোবিন শব্দটির সঙ্গে সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতির জন্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের রক্তের রং লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন একটি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যার প্রধান কাজ শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করা এবং বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীরের বাইরে বের করে দেবার জন্যে ফুস্‌ফুসে পৌঁছে দেওয়া।

কোন কোন অমেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীরেও হিমোগ্লোবিন আছে (যেমন—কেঁচো)। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন রক্তরসের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে রক্তকণিকার মধ্যে এই পদার্থটি থাকে।

হিমোগ্লোবিন একটি যুগ্ম প্রোটিন। এর একটি অংশ প্রোটিন এবং অপর অংশ প্রোটিন নয়—এমন পদার্থের দ্বারা গঠিত। অন্যান্য অনেক প্রোটিনের মত হিমোগ্লোবিনও একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত। অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চারটি সাব-ইউনিট তৈরি করে। এদের দুটিকে বলা হয় α সাব-ইউনিট এবং অপর দুটিকে বলা হয় β সাব-ইউনিট। হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন অংশের নাম গ্লোবিন এবং অ-প্রোটিন অংশের নাম হিমি (Heme)। হিমি একটি লৌহঘটিত যৌগিক পদার্থ।

হিমোগ্লোবিনের অণুর ওজন 64 000, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে 64A°, 55A° এবং 50A° (1A°=0·0000001 mm)। প্রত্যেকটি সাব-ইউনিটের মধ্যে একটি করে হিমি অণু এমনভাবে সজ্জিত যে, α এবং β সাব-ইউনিটের অণুগুলি পরস্পরের খুব কাছে অবস্থিত থাকে। সাধারণভাবে অক্সিজেন শোষিত অবস্থায় α থেকে α, β থেকে β এবং α থেকে β সাব-ইউনিটের দূরত্ব যথাক্রমে 36A°, 33·4A° এবং 25A°। হিমোগ্লোবিনের মধ্যে যখন অক্সিজেন থাকে না, তখন β সাব-ইউনিটের মধ্যে অবস্থিত হিমি অণুর দূরত্ব 7A° বেড়ে যায়।

হিমোগ্লোবিনকে সংক্ষেপে বলা হয় Hb। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনকে বলা হয় HbA, অক্সিজেন শোষিত অবস্থায় একেই বলা হয় HbAO। আগেই উল্লেখ করেছি, হিমোগ্লোবিন α এবং β সাব-ইউনিটে বিভক্ত; α এবং β সাব-ইউনিট দুটি গঠিত হয়েছে যথাক্রমে 141টি এবং 146টি অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা। অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলি পর্যায়ক্রমে সজ্জিত আছে। মানুষের হিমোগ্লোবিনের α এবং β সাব-ইউনিটের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির পর্যায়ক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

	অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা	প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড	ষষ্ঠ অ্যামিনো অ্যাসিড	শেষ অ্যামিনো অ্যাসিড
α	141	ভ্যালিন	অ্যাসপারটিক	আর্জিনিন
β	146	ভ্যালিন (Valine)	গ্লুটামিক (Glutamic)	হিস্টাডাইন (Histadine)

প্রোটিন অণুগুলির পর্যায়ক্রমের সামান্য হেরফের হিমোগ্লোবিনের স্বাভাবিক কাজ-কর্মের যথেষ্ট পরিমাণ হেরফের ঘটাতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ সিকল সেল অ্যানিমিয়ার (Sickle cell anemia) কথা বলা যেতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের β ইউনিটে ষষ্ঠ অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুটামিকের পরিবর্তে ভ্যালিন থাকে। এই ধরণের হিমোগ্লোবিনকে বলা হয় HbS। এই হিমোগ্লোবিন স্বাভাবিক পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করতে পারে না।

আরো একটি রোগের কথা বলা যেতে পারে, যেখানে β ইউনিটের ষষ্ঠ অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে রয়েছে লাইসিন। এই হিমো-গ্লোবিনেরও অক্সিজেন শোষণ করবার ক্ষমতা অনেক কম।

ত্রুটিযুক্ত জিনের উপস্থিতিই ত্রুটপূর্ণ হিমো-গ্লোবিন শরীরের মধ্যে তৈরি হবার প্রধান কারণ। ভ্রূণ অবস্থায় লিভার, প্লীহা এবং লম্বা হাড়ের মজ্জাই হিমোগ্লোবিনের উৎপত্তিস্থল। পূর্ণবয়স্ক মানুষের বুকের পাঁজর এবং অন্যান্য লম্বা হাড়ের মজ্জার মধ্যে অবস্থিত রেটিকিউলোসাইট নামক কোষগুলি হিমোগ্লোবিনের জন্ম দেয়। ভ্রূণের হিমোগ্লোবিনের (HbF) সঙ্গে পূর্ণবয়স্ক মানুষের হিমোগ্লোবিনের কিছু তফাৎ আছে। HbF-এর মধ্যে দুটি α সাব-ইউনিট এবং দুটি Ξ (2α 2Ξ) থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষের হিমোগ্লোবিন—2α, 2β।

ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় Ξ-সাব-ইউনিট থাকে, পরে এর জায়গা নেয় γ-সাব-ইউনিট। γ-সাব-ইউনিট জন্মের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হিমোগ্লোবিনের অন্যতম উপাদান হিসাবে কাজ করে। জন্মের পর থেকে γ-এর বদলে β সাব-ইউনিট তৈরি হতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্তে খুব সামান্য পরিমাণ δ সাব-ইউনিটও থাকে।

সুস্থ মানুষের শরীরে লোহিত কণিকার আয়ু 120 দিন। মৃত লোহিত কণিকা রাসায়নিক-ভাবে ভেঙে যায় এবং প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন লোহিত কণিকা তৈরি হয়ে শূন্য স্থান পূরণ করে। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া। হৃৎপিণ্ডের রক্ত যখন ফুস্ফুসে আসে, তখন প্রায় 100mm. Hg অক্সিজেন চাপ তার উপর পড়ে এবং লোহিত কণিকার মধ্যস্থিত চাপ থাকে 40mm Hg। ফলে অক্সিজেন লোহিত কণিকার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। সাধারণতঃ প্রতি 100ml. রক্তের 20ml. অক্সিজেন ধারণের ক্ষমতা আছে। ফুস্ফুসের মধ্যে CO_2 লোহিত কণিকা থেকে বেরিয়ে যাবার কারণ, এই গ্যাসের কোষ-অভ্যন্তরস্থ চাপ থেকে বাইরের চাপ কিছুটা কম।

পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রতি 100ml রক্তে 14·5mg হিমোগ্লোবিন থাকে। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম-বেশী হবার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের অক্সিজেন শোষণ করবার ক্ষমতা কম-বেশী হয়ে থাকে। আবার বাইরের বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণের সঙ্গে শরীরের মধ্যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণের যোগাযোগ রয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, যারা উঁচু পাহাড়ের উপর বসবাস করে, তাদের শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ উল্লেখ-যোগ্যভাবে বেশী। এদের শরীরে প্রতি 100ml. রক্তে 17-18mg. হিমোগ্লোবিন থাকে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, উঁচু জায়গায় অক্সিজেনের চাপ অপেক্ষাকৃত কম, সুতরাং বেশী পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করবার জন্যে বেশী পরিমাণ হিমোগ্লোবিনের একান্ত প্রয়োজন।

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর

মিনতি চক্রবর্তী

আমরা জানি, সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল আর সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে সামাজিক কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর বা পরিবর্তন। পূর্বপুরুষের কাল থেকে প্রচলিত সংস্কৃতি অনুসরণ করে কোনও সমাজ বা গোষ্ঠী এগিয়ে যেতে পারে না, কালের পরিবর্তনে বস্তুভিত্তিক জীবনযাত্রার যেমন পরিবর্তন ঘটে, ঠিক তেমনিভাবে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও অনিবার্য হয়ে ওঠে, শুধু এর গতি ও দিকের প্রভেদ ঘটে।

কোন কোন সমাজ-বিজ্ঞানী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে পৃথক বলে গণ্য করেন। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সামাজিক গঠন ও সম্পর্কের পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অর্থ হলো সমাজের কৃষ্টিগত রূপের পরিবর্তন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই পরিবর্তন এত নিবিড়ভাবে এক সূত্রে বাঁধা যে, এদের প্রভেদের কোন প্রয়োজন হয় না।

কি কি উপায়ে এবং কিসের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, সেটা এবার আলোচনা করা যাক।

(1) আবিষ্কার

কোনও ঘটনা বা সম্পর্কের বিষয় নতুন করে জ্ঞান লাভকে বলা হয় আবিষ্কার (Discovery)। মানুষ এইভাবে আবিষ্কার করেছিল যকৃতের কর্মপদ্ধতি, রক্তসঞ্চালন প্রণালী ও তাদের বিভিন্ন কার্যকারণ তত্ত্ব। যখনই কোন আবিষ্কারকে মানবসমাজে প্রয়োগ করা হয়, তখনই ঘটে সামাজিক পরিবর্তন। যখন এই প্রযুক্তিবিদ্যাকে উন্নততর করবার জন্যে তার জ্ঞানের পরিধিকে বৃদ্ধি করা হয়, তখন সামাজিক পরিবর্তনের আকার হয় আরও বৃহৎ। উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কারের ফলে আমরা আজ আর টাইফয়েড জ্বরে মাসের পর মাস বিছানায় শুয়ে কষ্টভোগ করি না বা অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ হতে দিই না। দুর্ঘটনায় পড়ে আজ যদি কোনও ব্যক্তির দেহ থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত ঘটে, আমরা আজ সেই ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করে তার দেহে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ করতে সক্ষম। এই রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে প্রমাণিত হয় আবিষ্কার এক মাধ্যম—যার প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

(2) উদ্ভাবন

সংস্কৃতির পুরাতন মৌলিক উপাদানের নতুন ব্যবহারকে বলা হয় উদ্ভাবন (Invention)। উদ্ভাবনকে পার্থিব উদ্ভাবন (Material invention) ও সামাজিক উদ্ভাবন (Social invention)—এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়। পার্থিব উদ্ভাবনের মধ্যে পড়ে বস্তুকেন্দ্রিক দ্রব্যসম্ভার ; যেমন—তীর ও ধনুক, টেলিফোন, উড়োজাহাজ প্রভৃতির আবিষ্কার আর সামাজিক উদ্ভাবনের মধ্যে পড়ে সংবিধানযুক্ত শাসনতন্ত্র (Constitutional Government), সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রভৃতি। বর্তমানে বৃহত্তর কলিকাতার উন্নতিসাধনের জন্যে কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা (Calcutta Metropolitan Development Authority)

যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তা সামাজিক উদ্ভাবনের মধ্যে পড়ে।

উদ্ভাবন এক নিয়ত গতিশীল ও সামাজিক পদ্ধতি, যা সমাজের রূপান্তর, উন্নতি ও পুনর্যোজনার ধারাবাহিকতা উৎপন্ন করতে সাহায্য করে।

(3) প্রসারণ

যখন এক সংস্কৃতি অপর আর এক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে, তখন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে রূপান্তর ঘটে, তাকে বলা হয় প্রসারণ (Diffusion)। প্রতিটি সমাজেই অধিকাংশ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে প্রসারণের মাধ্যমে। প্রসারণ ঘটে সমাজের অভ্যন্তরে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পারস্পরিক সংস্পর্শে। অধিকাংশ জটিল সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) অনেক হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে ক্রমে বসতি স্থাপন করেন। হিন্দু বিবাহে প্রচলিত যে আচারানুষ্ঠান, তার মধ্যে কিছু কিছু অনুষ্ঠান দু-দেশের পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আবার এও লক্ষণীয় যে, কোনও কোনও অনুষ্ঠান পারস্পরিক সংস্পর্শের ফলে সৃষ্টি হয়ে এমন এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, যার অর্থ প্রকৃত অনুষ্ঠানের অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্রসারণ এক দ্বিমুখী ধারা। যখনই দুই সংস্কৃতি পারস্পরিক সংস্পর্শে আসে, সরল ও ক্ষুদ্র সংস্কৃতি জটিল ও বৃহৎ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের নিকট থেকে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করে, আবার দ্বিতীয় সংস্কৃতিটিও প্রথমটির দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়। তবে বলা বাহুল্য সরল ও ক্ষুদ্র সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিবর্তন আসে বেশী। উদাহরণস্বরূপ সমাজে যখন ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল, ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকেরা সব সময়েই তাদের প্রভুদের নিকট থেকে কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করতো এবং নিজেদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রায়শঃই ভুলে যেত। উড়িষ্যায় বসবাসকারী কোল উপজাতিসমূহ পূর্বে জঙ্গলে উৎপন্ন ফলমূল ও কন্দের উপরই শুধু নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তারা হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে আসবার দরুণ ক্ষেতে লাঙ্গল ব্যবহার করে ধান উৎপন্ন করে চাল খেতে শিখেছে।

প্রসারণ অনেক সময় প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারার রূপান্তর ঘটায়। প্রতিটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আকৃতি, কাজ ও অর্থ আছে। যখন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রসারণ ঘটে, তখন এই আকৃতি, কাজ ও অর্থের রূপান্তর ঘটতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপীয়েরা ভারতে এসে যখন ভারতীয় তামাক গ্রহণ করেছিল, তখন তারা একটি নলের মধ্যে ভরে এই তামাক ব্যবহার করতো, যা ছিল অনেকটা ভারতীয় নলের মত। এইভাবে তারা আকৃতিকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্য আকৃতিও অনুসরণ করেছিল ; যেমন—সিগারেট, জর্দা ও নস্য। কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করেছিল তামাকের কাজ ও অর্থ। ভারতীয়েরা তামাক ব্যবহার করতো উৎসবের আচার বা আতিথেয়তার অঙ্গ হিসাবে। ইউরোপীয়েরা প্রথমে তামাক গ্রহণ করতো ঔষধরূপে এবং পরে ব্যক্তিগত সন্তোষের জন্যে বা সামাজিকতা হিসাবে। হিন্দুরা বর্তমানে কোন কোন প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস খাদ্যের এক অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাচীন কালে শাস্ত্রে নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী পশু বা প্রাণী বধ করা হতো তাদের পশুজীবন থেকে মুক্তি দেবার জন্যে এবং কোনও দেবতার সামনে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে তাদের বলি দিয়ে সেই মাংস গ্রহণ করা হতো দেবতার প্রসাদ হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে মাংস ভক্ষণ করা হয়ে থাকে সম্পূর্ণ খাদ্যের অঙ্গ হিসাবে।

পরিবর্তনের কারণ

আবিষ্কার, উদ্ভাবন এবং প্রসারণ হলো সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম ও পদ্ধতি। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের কারণ কি, তা জানতে হলে আমাদের আগে জানতে হয় কারণ কাকে বলে? কারণ হলো এমন এক সর্ত, যা ভবিষ্যৎসূচক কোনও ফলাফল বা পরিণতি উৎপন্ন করতে যথেষ্ট। কারণ ছাড়া কোনও কাজই হতে পারে না। সামাজিক পরিবর্তনে কোনও পরিবর্তনই সাধারণতঃ একটিমাত্র কারণের জন্যে হয় না। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ শুধু চরিত্রহীন বা মাতাল স্বামী বা স্ত্রীর জন্যে হতে পারে না, সেখানে একাধিক কারণ থাকতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জৈবিক (Biological)। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, সভ্যতার পরিবর্তনের হার জাতির জৈবিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ নিয়ে আবার মতভেদ আছে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, গত 25,000 বছরের মধ্যে মানব-গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ জৈবিক পরিবর্তন এত প্রবল নয় যে, এক জাতি (Race) থেকে অন্য জাতির জৈবিক গঠনের প্রভেদ হবে। যাহোক, সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হলো।

(ক) ভৌগোলিক আবহাওয়া—ভৌগোলিক আবহাওয়া সামাজিক পরিবর্তনের এক বিশেষ কারণ। বিভিন্ন ভৌগোলিক বিপর্যয় ও অন্যান্য কারণে যখন মানুষের স্থানান্তর ঘটে, তখন মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ দেশ বিভাগের ফলে যে সব উদ্বাস্তু এদেশে এসেছেন, তাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি হয়তো পূর্ব বঙ্গে থাকাকালীন বৃহৎ জমির মালিক ছিলেন ও চাষ-আবাদ পরিচালনা করতেন, কিন্তু সেই একই ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করবার পর জমির মালিকানা হারিয়ে কোনও এক স্বল্প বেতনের চাকুরীতে নিযুক্ত হলেন। ফলে ঘটলো তাঁর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিবর্তন।

(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি—স্বল্প জনসংখ্যার বসতি যখন অধিক ঘন বসতিতে পরিণত হয়, সেই সমাজের আতিথেয়তার পদ্ধতি, বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক গঠন, উৎপাদনের কৌশল প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। অধিক জনসংখ্যার চাপে সমাজে কি ধরণের সমস্যা ও তা থেকে কি রকমের সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, তা বর্তমান যুগে আমাদের দেশে নিত্য চোখে পড়ে। 1951 সালে ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা ছিল 2 কোটি 49 লক্ষ 97 হাজার 9 শত 42 (2,49,97,942)। আর 1961 সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যা দেখা যায় 3 কোটি 49 লক্ষ 26 হাজার 2 শত 79 (3,49,26,279); অর্থাৎ দশ বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে এক কোটির মত। এই অধিক জনসংখ্যার চাপে স্থানের অভাব, চাকুরীর অভাব, খাদ্যের অভাব, শিক্ষা সমস্যা, যানবাহন সমস্যার জন্যে সমাজে যে সব সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তা আমাদের অতি পরিচিত।

(গ) সমাজের গঠন—রক্ষণশীল সমাজে যেখানে বয়স্ক ও বৃদ্ধদের অধিকতর প্রাধান্য ও সম্মান দেওয়া হয়, সেই সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের হার খুবই কম। যে সমাজের সংস্কৃতি খুব বেশী পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি সাংস্কৃতিক মৌলিক উপাদান খুব শক্তভাবে একে অপরের সঙ্গে গাঁথা ও নির্ভরশীল, সেখানেও সামাজিক পরিবর্তনের হার খুব কম, কিন্তু যে সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা খুব বেশী, সেই সমাজের সামাজিক পরিবর্তনের হার খুব বেশী ও ত্বরান্বিত।

(ঘ) স্বাতন্ত্র্য ও সংস্পর্শ—যে গোষ্ঠী এক নির্জন

স্থানে জঙ্গলে বা পাহাড়ের পাদদেশে বাস করে, যেখানে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্পর্শের কোনও সম্ভাবনা নেই, তাদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনও প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু সেই একই গোষ্ঠী যখন লোকালয়ে বিভিন্ন মানবসমাজের সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিম বঙ্গে শহরের কাছাকাছি যে সব সাঁওতাল উপজাতিসমূহ বসবাস করে, তাদের সামাজিক পরিবর্তনের মাত্রা গ্রামের অভ্যন্তরে নির্জন স্থানে বসবাসকারী সাঁওতাল উপজাতিসমূহের সামাজিক পরিবর্তনের মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশী।

(ঙ) মনোভাব ও মূল্যায়ন—সমাজ তার গোষ্ঠীভুক্ত মানবসমাজের মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। যে সমাজ খুব বেশী শ্রদ্ধা করে অতীতকে, বয়স্কদের সম্মান করে ও আদেশ পালন করে, পূর্বাধিকার দেয় প্রাচীন আচারানুষ্ঠানকে, সেই সমাজের পরিবর্তন যদি ঘটে, তা খুব অনিচ্ছাকৃতভাবে।

কিন্তু একটি পরিবর্তনশীল সমাজের সাধারণতঃ পরিবর্তনের দিকে অন্য রকম মনোভাব থাকে। সেই সমাজ তাদের চিরাচরিত সংস্কৃতির উপর সদাসন্দিগ্ধ। এই রকম মনোভাব নতুন জিনিষ গ্রহণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গভীর সাড়া জাগায়।

মনোভাব ও মূল্যায়ন সামাজিক পরিবর্তনের পরিমাপ ও গতির পরিমাপ ঘটায়। কোনও সমাজই সমভাবে গতিশীল হতে পারে না এবং সমাজের মূল্যায়ন স্থির করে কোন্ ক্ষেত্রে তা উদ্ভাবন ঘটাবে ও কোন্ ক্ষেত্রে নয়। প্রতিটি সমাজের সাংস্কৃতিক ভিত্তি (Cultural base) স্থির করে কোনও নতুন আবিষ্কার বা উদ্ভাবনকে মূল্য দিতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি বায়বীয় বোমা, হাইড্রলিক পাম্প, শীতাতপের যন্ত্র, হেলিকপ্টার, মেসিনগান, মিলিটারী ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অঙ্কন করে তার কার্যকারণ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। কিন্তু সে যুগের সমাজ উন্নত ধাতু, ইন্ধন, পিচ্ছিলকারক পদার্থ প্রভৃতির অভাবে তাঁর প্রতিভাশালী কারিগরী দক্ষতাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে নি।

(চ) প্রয়োজন ও জ্ঞান—সমাজের স্বীকৃত প্রয়োজনের প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সমাজের সঙ্কটকাল সমাজের নতুন প্রয়োজন স্থির করে ও তাকে স্বীকৃতি দেয়। তবে সব প্রয়োজনই যে গ্যারান্টিপ্রদত্ত জিনিষ তা নয়, যেমন—বর্তমান যুগে আমাদের প্রয়োজন ক্যান্সার রোগমুক্তির জন্যে উপযুক্ত ঔষধ বা তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, আমরা এগুলি তৈরি করতে সক্ষম হবো। এগুলি তৈরি করবার জন্যে যে জ্ঞান ও কৌশলের প্রয়োজন, তাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক ভিত্তি। সুতরাং উদ্ভাবন বা আবিষ্কারের মাতা হয়তো প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে এক জ্ঞানরূপী পিতার দরকার, যে সাহায্য করবে এই প্রয়োজন মেটাতে ও তার উপযুক্ত মূল্য দিতে।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কিসের মাধ্যমে ও কি কি কারণে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে আমরা সমাজের এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁচেছি, যেখানে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি, দেশের যুবসমাজের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভ ও অসন্তোষের ছায়া। তারা চায় দেশের এই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে। এই অবস্থা যে বিনা কারণে হয়েছে তা নয়, বছরের পর বছর বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যুবসমাজ আজ বিক্ষুব্ধ। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশে সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তা কতদিনে এবং কি ভাবে হবে, তা আমাদের লক্ষ্য করবার বিষয়।

মোটর ইঞ্জিনের যুগান্তর

প্রণবকুমার দাস

মোটর গাড়ীর মধ্যে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, তাকে অন্তর্দহন ইঞ্জিন (Internal combustion engine) বলা হয়। এই ইঞ্জিনে থাকে একটি ধাতব চোঙ বা সিলিণ্ডার এবং একটি পিষ্টন। তেল ও বাতাসের মিশ্রণ সিলিণ্ডারে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দহনের ফলে যে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়, তার দরুণ পিষ্টনটির সামনে ও পিছনে পর্যায়ক্রমিক গতি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পিষ্টনের পর্যায়ক্রমিক সামনে-পিছনের গতিকে ইঞ্জিনের ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌ট্‌ ও সংযোজক দণ্ডের সাহায্যে ঘূর্ণায়মান গতিতে পরিবর্তিত করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি ফেলিক্স্‌ ওয়াঙ্কেল (Felix wankel) নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী একটি অন্তর্দহন ইঞ্জিনের কার্যপদ্ধতির নমুনা প্রদর্শন করেছেন, যাকে গতিসম্পন্ন করবার পদ্ধতি পিষ্টন ইঞ্জিনের পদ্ধতির চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আবার সমশক্তিসম্পন্ন এই দুই রকম ইঞ্জিনের পারস্পরিক তুলনা করলে দেখা যায়—একটি ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন ওজনে পিষ্টন ইঞ্জিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও আয়তনে অনেক ছোট।

যদিও 1954 সালে ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়েছিল, তথাপি 1960 সালের শেষ পর্যন্ত এটি আদৃত হয় নি।

কিন্তু 1970 সালে যখন আমেরিকান কংগ্রেসে মুক্ত বাতাস ও মোটর গাড়ীর বিমুক্ত গ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হলো তখনই হঠাৎ এই ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন তাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো।

1960 সালের গোড়ার দিকে আমেরিকার মোটর গাড়ী উৎপাদক সংস্থাগুলি ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের উৎপাদন ও অন্যান্য অসুবিধা দূর করবার জন্যে চেষ্টা সুরু করে এবং অবশেষে ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলে। 1971 সাল থেকে জাপানের মোটর গাড়ী উৎপাদক সংস্থা Toyo-Kogyo Co. Ltd, ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনযুক্ত Mazda গাড়ী প্রস্তুত করে।

ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনে মূল দুটি ঘূর্ণায়মান অংশ থাকে—(1) একটি ত্রিভুজাকৃতির রোটর (Rotor) এবং (2) মূল স্যাফ্‌ট্‌ (Shaft)। ইঞ্জিনের রোটর-টিকে রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের (Reciprocating engine) পিষ্টনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই রোটরটি বাতাস ও পেট্রোলের মিশ্রণ গ্রহণ করে তাকে চাপ দেয়। এর পর এই মিশ্রণে যখন বিস্ফোরণ ঘটে, তখন মিশ্রণটি আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং রোটরটিতে শক্তি সঞ্চার করে। পরবর্তী অংশে এই বিস্ফোরিত গ্যাস রোটরের প্রকোষ্ঠ থেকে বিমুক্ত হয়
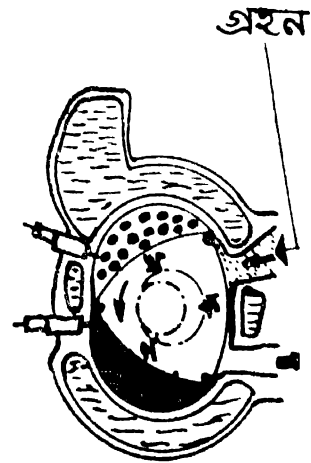
1নং চিত্র—(ক) রোটরের এই অবস্থায় ইঞ্জিন থেকে গ্যাস বিমুক্ত হচ্ছে এবং বাতাস

ও পেট্রোল মিশ্রণ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করছে। (খ) অবস্থানে মিশ্রণের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। (গ) দহন সুরু থেকেই মিশ্রণের আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

2নং চিত্র—(ক) অবস্থানের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্যাস-মিশ্রণের প্রবেশ তখনও অব্যাহত আছে, (খ) অবস্থান আরও চাপের সৃষ্টি করছে, (গ) অবস্থানের সর্বোচ্চ আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ এই দুটি হলো আয়তন বৃদ্ধির চরম অবস্থা এবং গ্যাস নির্গমনের স্থান পুরাপুরি মুক্ত।

3নং চিত্র—(ক)স্থানে তখনও বাতাস ও পেট্রোল মিশ্রণ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করছে এবং আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, (খ) সর্বাপেক্ষা কম আয়তনে অবস্থান এবং সবচেয়ে বেশী চাপ এখানে হচ্ছে। এই অবস্থায় স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারী প্লাগগুলির (Spark plugs) সাহায্যে মিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করা হয়, (গ) অবস্থানের আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং গ্যাস বিমুক্ত হচ্ছে।

4নং চিত্র—(ক) অংশ তার সর্বোচ্চ আয়-তনের স্থানে এসেছে এবং বাতাস ও পেট্রোল মিশ্রণের প্রবেশপথ বন্ধ হবার মুখে, (খ) অবস্থান আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দাহ্য গ্যাসের চাপ রোটরের উপর ক্রিয়া করছে, (গ) অবস্থানে গ্যাস বিমুক্ত হচ্ছে।

রোটরের কেন্দ্রস্থলে একটি গীয়ার (Gear) থাকে, যা মূল স্থাফ্‌টের একটি গীয়ারের সঙ্গে যুক্ত। রোটরের ঘূর্ণনের ফলে মূল স্থাফ্‌টের ঘূর্ণন সুরু হয় অর্থাৎ মূল স্থাফটে এভাবে শক্তি সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনে তাছাড়া অনেক ঘূর্ণনক্ষম অংশ থাকে কিন্তু সেগুলির সংখ্যা সমান অশ্বশক্তি-সম্পন্ন রেসিপ্রোকেটিং অর্থাৎ পিষ্টন ইঞ্জিনের ঘূর্ণনক্ষম অংশের সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, একটি আমেরিকান 195 অশ্বশক্তি-সম্পন্ন V-8 ইঞ্জিনের 1029টি অংশ আছে, যার 388টি অংশ গতিশীল। এর ওজন 270 কেজি এবং আয়তন 425 ঘন ডেসিমিটার। অপর দিকে, একটি 185 অশ্বশক্তির ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের 633টি অংশ

আছে এবং তার মধ্যে 154টি মাত্র গতিসম্পন্ন। এই ইঞ্জিনের ওজন 107·5 কেজি ও আয়তন 140 ঘন ডেসিমিটার; অর্থাৎ এক-কথায় বলা যায় যে, একটি ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের আয়তন প্রায় সমান অশ্বশক্তির একটি রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের তুলনায় প্রায় $\frac{1}{3}$ অংশ এবং ওজনে প্রায় অর্ধেক। আবার দেখা যায়—একটি রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনের পিষ্টন প্রতিবারেই দিক পরিবর্তনের সময় পূর্ণ স্থির অবস্থায় আসে এবং সামনে-পিছনে যাতায়াতকারী গতিকে ঘূর্ণায়মান গতিতে পরিবর্তন করবার জন্যে সংযোজনকারী দণ্ড ও ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌টের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটি ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধিজনিত শক্তি সব সময়েই উৎপন্ন হয়, ফলে রোটরের ঘূর্ণনক্ষম গতি পাওয়া যায় এবং তা প্রত্যক্ষভাবে মূল স্যাফটে সঞ্চালিত হয়। রোটরের একটির পুরা ঘূর্ণনের ফলে মূল স্যাফ্‌টে তিনবার শক্তির প্রভাব দেখা যায় (প্রতি তলের জন্যে একবার)। কিন্তু রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনে একবার পুরা ঘূর্ণনে একবার মাত্র শক্তির প্রভাব দেখা যায়। এই সুবিধার জন্যে বলা যেতে পারে যে, একটি ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের ফ্লাই-হুইলের ওজন সমান অশ্বশক্তির পিষ্টন ইঞ্জিনের ফ্লাই-হুইলের ওজনের চেয়ে কম হবে।

1968 সালে ইউনিভার্সিটি অফ মিচিগান —কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পক্ষ থেকে কার্টিস-রাইটকে (Curtiss-wright) ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন সম্বন্ধে পরীক্ষা চালাবার ভার দেওয়া হয়। পরীক্ষায় জানা যায় যে, একটি বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন থেকে নির্গত গ্যাস ভীষণ ধূমান্বিত হয় এবং পিষ্টন ইঞ্জিনের চেয়ে দ্বিগুণ হাইড্রোকার্বন, সমপরিমাণ কার্বন মনোক্সাইড ও অপেক্ষাকৃত কম নাইট্রোজেনের অক্সাইড পাওয়া যায়। অবশেষে কার্টিস-রাইট গবেষক দল ঘোষণা করেন যে, ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন উৎপাদন ব্যয়বহুল।

তবুও বলা যেতে পারে যে, ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিন রেসিপ্রোকেটিং অর্থাৎ পিষ্টন ইঞ্জিনের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

195 অশ্বশক্তির রেসিপ্রোকেটিং ইঞ্জিনযুক্ত একটি মোটর গাড়ী ও 185 অশ্বশক্তির ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনযুক্ত একটি মোটর গাড়ীর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায়—(1) প্রারম্ভিক অবস্থান থেকে ত্বরণ—ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনে 95 কিঃ মি/ঘঃ পাওয়া যায় 13·6 সেকেণ্ডে এবং পিষ্টন ইঞ্জিনে 95 কিঃ মিঃ/ঘঃ পাওয়া যায় 17·9 সেকেণ্ডে। (2) সর্বোচ্চ গতি—ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনে 170·3 কিঃ মিঃ/ঘঃ এবং পিষ্টন ইঞ্জিনে 150·2 কিঃ মিঃ/ঘঃ।

সম্প্রতি আমেরিকার একটি মোটর উৎপাদক সংস্থা ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনযুক্ত মোটর গাড়ী তৈরী করেছে এবং তাতে দেখা যায় যে, এই গাড়ীগুলি স্বচ্ছন্দে ঘণ্টায় 110 কিঃ মিঃ চলতে পারে যদিও গাড়ী চলবার সময় ইঞ্জিনে সেলাই কলের আওয়াজের মত একটা শব্দ হয়ে থাকে।

তবে ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনযুক্ত মোটর গাড়ী ও পিষ্টন ইঞ্জিনযুক্ত মোটর গাড়ী চালাবার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই বরং গাড়ী সংরক্ষণের খরচ ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের বেলায় অনেক কম।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে, আগামী দশকে অন্তর্দহন ইঞ্জিনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে, সে সম্বন্ধে ইঞ্জিন-উৎপাদকেরা নিঃসন্দেহ।

নদী-সমীক্ষা

শৈলেশ দাশ

কোন নদীকে ভালভাবে জানতে গেলে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে বিশদভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে, যেমন—

(1) নদীটি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কি পরিমাণ জল প্রবাহিত হচ্ছে, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় discharge।

(2) বিভিন্ন সময়ে নদীটির জলের গতিবেগ কিরূপ।

(3) নদীটির বিভিন্ন গভীরতায় যে সব কাদা, মাটি, বালি পরিবাহিত হয়ে আসে, সেগুলির আকৃতি-প্রকৃতি এবং পরিমাণ কিরূপ।

(4) নদীটির বিভিন্ন স্থানে গভীরতা কিরূপ এবং তা কি হারে পরিবর্তিত হচ্ছে।

(5) নদীটির দু-পাশের স্থলভূমির আকৃতি এবং অবস্থা কিরূপ।

(6) নদীটির জলের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য কি? যদি এই কয়েকটি বিষয়ে যথাযথভাবে কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান চালানো যায়, তবে তা থেকে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে—

(ক) ওই বিশেষ নদীটিতে কি পরিমাণ বন্যা আসতে পারে এবং তার প্রাবল্য কি রকম হবে।

(খ) নদীটিতে কোথাও চড়া (Silting) পড়ছে কিনা অথবা কোথাও খাদের সৃষ্টি হচ্ছে কি না।

(গ) নদীটি থেকে চাষের জন্যে খাল কেটে জল সরবরাহ সম্ভব কি না অথবা ঐ জলে চাষের পক্ষে উপযুক্ত কিনা?

(ঘ) নদীটিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা?

(ঙ) বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বাঁধ প্রস্তুত করতে হবে তার আয়তন কেমন হবে।

(চ) নদীটির কোন্ কোন্ স্থান দিয়ে স্টীমার বা অন্য কোন বৃহৎ জলযান যাতায়াত করতে পারবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন নদীর সম্বন্ধে কয়েক বছর ধরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো হলে তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের দেশে কৃষি-বিপ্লব ঘটাতে গেলে তাই যেমন চাষোপযোগী জমির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জমির পাশে পাশে কৃত্রিম খাল সৃষ্টির। ভারত সরকার তাই এখন নদী সম্বন্ধে গবেষণার উপর জোর দিয়েছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় হরিণঘাটায় অবস্থিত River Research Institute-এ এই সংক্রান্ত ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নদীসংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষাগুলি কিভাবে করা হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, নদীতে কি পরিমাণ জল প্রবাহিত হচ্ছে, তা জানা দরকার। নদীর যে স্থানের জলপ্রবাহের কথা আমরা জানতে চাই, সেই স্থানে নদীর প্রস্থকে কয়েকটি ভাগে ভাগ (Segmentation) করা হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রস্থ অনুযায়ী বিভাগের সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কমানো হয়ে থাকে। যেমন—

প্রস্থ	বিভাগের সংখ্যা
120 ফুটের উপরে	11
50-120 ফুঃ	9
15- 50 ফুঃ	5
15 ফুঃ	3

ধরা যাক, নদীর যে স্থানটির জলপ্রবাহের কথা জানা দরকার, তার প্রস্থ AB-কে নিয়ে 1নং চিত্র অনুযায়ী চার ভাগে A1, 12, 23 এবং 3B ভাগ করা হলো।

বেগ মাপবার জন্যে সাধারণতঃ কারেন্ট মিটার ব্যবহার করা হয়।

ধরা যাক—a, b, c, d বিন্দুতে গড় গতিবেগ পাওয়া গেল যথাক্রমে v_1, v_2, v_3 এবং
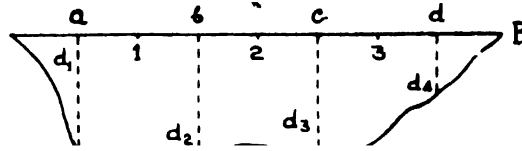
1নং চিত্র

এবার A1, 12, 23 এবং 3B এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে a, b, c এবং d-তে নদীর জলের গভীরতা মাপা হলো। গভীর নদীর ক্ষেত্রে এর জন্যে echo sounding পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। গভীরতার পরিমাণ যদি যথাক্রমে d_1, d_2, d_3 এবং d_4 হয়, তাহলে নদীর ঐ জায়গার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল মোটামুটি গাণিতিক সমীকরণে এভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—

মোট প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল $= \Sigma(A1)\, d_1 + (12)\, d_2 + (23)\, d_3 + (3B)\, d_4$

A1, 12, 23, 3B এই সকল দূরত্ব সাধারণতঃ Sextant যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয়ে থাকে।

সমীকরণে জলপ্রবাহ অর্থাৎ discharge কে এভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে—

জলপ্রবাহ = (ঐ স্থানে নদীর মোট প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল) × নদীর জলের গড় গতিবেগ।

নদীর ঐ স্থানে জলের গতিবেগ জানতে হলে সাধারণতঃ যে সব স্থানে জলের গভীরতা মাপা হয়েছে, সেই সব স্থানে বিভিন্ন গভীরতায় জলের গতিবেগ মাপা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ 0·2, 0·4, 0·6, এবং 0·8 গভীরতায় জলের গতিবেগ মেপে নিয়ে তার গড় নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে গতি-

v_4, তাহলে জলপ্রবাহ বা discharge-এর সমীকরণটি এভাবেও লেখা যেতে পারে—

$$\text{Discharge} = \Sigma(A1)d_1v_1 + (12)d_2v_2 + (23)d_3v_3 + (3B)d_4v_4$$

এভাবে যদি নদীর কোন স্থানে অন্ততঃ-পক্ষে প্রত্যেক মাসে দু-বার করে জলপ্রবাহ মাপা যায়, তাহলে জানতে পারা যাবে, ঐ বিশেষ জায়গা দিয়ে সারা বছরে নদীর জলপ্রবাহের কি হারে পরিবর্তন হতে পারে। তেমনি যদি নদীর বিভিন্ন স্থানে একই ভাবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, তাহলে সারা বছরে নদীতে বিভিন্ন সময়ে জলপ্রবাহের বিষয় অবগত হওয়া যাবে। উপরের সমীকরণ থেকে আমরা জানতে পারি, প্রতি সেকেণ্ডে কি পরিমাণ জল প্রবাহিত হচ্ছে (সাধারণতঃ এই পরিমাণকে কিউসেকে প্রকাশ করা হয়)। সুতরাং তা থেকে আমরা সারা বছরে জলপ্রবাহের পরিমাণও বের করতে পারবো। কোন একটি বিশেষ নদীর কোন বিশেষ স্থানে সারা বছরে কিভাবে জলপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে, তা 2নং চিত্রে দেখানো হলো। এখন সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বলা যায় যে, নদীতে জলপ্রবাহের পরিবর্তনের সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসা কাদা, মাটি ও বালির

(এগুলিকে আমরা বলবো উপাদান) পরিমাণের পরিবর্তন হয়ে থাকে। এখন এসব উপাদানের বিভিন্ন ব্যাস অনুযায়ী বৈজ্ঞানিকেরা এগুলির নামকরণ করেছেন, যেমন—

2নং চিত্র

বালি—মোটা 1·0—·20mm, মাঝারী ·20—·05mm, মিহি ·05—·02mm

পলি—মোটা ·02—·005mm, মিহি ·005—·002mm

কাদা—·002—·001mm, অতিরিক্ত কাদা (Super clay)—·001-এর নীচে।

ভারতে সাধারণতঃ তলানীকে (Sediment) তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হলো—

তলানী—মোটা ·20mm-এর উপরে, মাঝারী ·20—·07mm, মিহি ·075mm-এর নীচে।

কোন নদীতে যে তলানী বয়ে চলেছে, তাকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; যেমন—

(1) ভাসমান ভার—যে সমস্ত তলানী বেশী সময় ধরে জলে ভাসমান অবস্থায় থাকে; অর্থাৎ নদীর তলদেশের সংস্পর্শে আসে না।

(2) তলদেশের ভার—তলানীর যে অংশ নদীর তলদেশ ঘেঁষে চলে। সাধারণতঃ জলের বেগে এই সব তলানী নদীর তলদেশে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

নদীর তলানী ভার (Sediment load) জানতে হলে নীচের সমীকরণটি ব্যবহার করতে হবে।

Sediment load=Sc (Sediment concentration) × d (discharge)

Sc=Sediment in gm/litre of water.

সমীকরণটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তলানীর ভার জানতে গেলে প্রথমে আমাদের তলানীর ঘনীভবনের হার জানা দরকার। এজন্যে প্রথমতঃ নদীর বিভিন্ন গভীরতা থেকে পলিথিনের বোতলের সাহায্যে জলের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তারপর নমুনা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত যে কোন প্রক্রিয়ায় পলির ঘনত্ব বের করা হয়। এই সব প্রক্রিয়া ভাসমান ভারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে—

(1) ডিক্যান্টেশন (Decantation) অথবা বিকার (Beaker) পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ পিপেট, সিলিণ্ডার, থার্মোমিটার, রবার প্যাড প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

(2) সিভ্ পিপেট (Sieve pipette) পদ্ধতি—কয়েকটি প্রমাণ সিভ্ (Standard sieve), অংশাঙ্কিত সিলিণ্ডার (Graduated cylinder), পিপেট, থার্মোমিটার, স্টপ ওয়াচ এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়।

(3) হাইড্রোমিটার (Hydrometer)—বিশেষভাবে প্রস্তুত এবং ·995—1·050 আ. গু.

(Sp. gr.) অংশাঙ্কিত হাইড্রোমিটার, সিলিণ্ডার, থার্মোমিটার, স্টপ ওয়াচ প্রভৃতি এতে ব্যবহার করা হয়।

(4) বটম উইথড্রয়াল টিউব (Bottom withdrawal Tube অথবা B. W. Tube)—B. W. Tube, চুল্লী, ডেসিকেটরস, ব্যালেন্স প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়।

নমুনা সংগ্রহ করবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পরীক্ষা করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আগেই বলেছি, জলপ্রবাহের যে স্থান থেকে ঘনীভূত তলানী সংগ্রহ করা হয়েছে, তা জানা আকৃতির কণাগুলির শতকরা হার জানা যাবে। যদি কণার আয়তন এবং ক্রমবর্ধনশীল শতকরা হারের লেখচিত্র আঁকা হয়, তাহলে তা হবে নিম্নরূপ (3নং চিত্র)।

এই লেখচিত্র থেকে নদীর তলদেশের কণাসমূহের সর্বোচ্চ এবং গড় ব্যাসের বিষয় জানা যাবে এবং তাথেকে অনেক তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হবে।

এই সকল গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা করে আমাদের এই নদীমাতৃক দেশকে চিরসবুজ রাখবার জন্যে নিম্নোক্ত

3নং চিত্র

থাকলে তলানীর ভারের পরিমাণ জানতে পারা যাবে। অতএব এথেকে প্রতি দিনে এবং প্রতি বছরে গড়ে কি পরিমাণ তলানী জলের সঙ্গে বয়ে চলেছে এবং নদীর কর্মক্ষমতার উপর তার কতখানি প্রভাব পড়তে পারে, তা বলা যেতে পারে।

এবার নদীর তলদেশের তলানীর ভার (Bed load) বিষয় জানবার জন্যে প্রথমে বিশেষভাবে নির্মিত Sampler-এর সাহায্যে নদীর তলদেশ থেকে কিছু পরিমাণ তলানী সংগ্রহ করা হয়। তারপর সাধারণত: Purics Siltometer-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ করে নদীর তলদেশের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া সম্ভব হবে।

(1) কোন্ নদীতে কোন্ সময় কি রকম সতর্কতা অবলম্বন করলে তার প্রবাহকে ঠিক রাখা সম্ভব।

(2) নদী থেকে যে সব খাল কাটা হবে, তার কার্যকারিতা যেন প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট হয়।

(3) খালের জল যেন চাষোপযোগী হয়।

(4) নদী থেকে যে বাঁধ প্রস্তুত হবে, গবেষণার ভিত্তিতে তার আকার ও আয়তন বিচার করতে হবে।

মাটির নাইট্রোজেন বন্ধন

সমীরকুমার গুপ্ত*

মাটির নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাসিয়ামের সঙ্গে গাছপালার গভীর সম্পর্ক। অন্যান্যের মত নাইট্রোজেন মাটির বিভিন্ন জীবাণুর (Microbe) ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অনবরত পরিবর্তনশীল। গাছ-পালার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণিত কোষের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কোষেরই অপরিহার্য উপাদান প্রোটিন—নাইট্রোজেনঘটিত একপ্রকার যৌগিক পদার্থ। তাই মাটির নাইট্রোজেনের ভাণ্ডারে কোন কারণে নাইট্রোজেনের ঘাট্‌তি পড়লেই মাটির উর্বরতা কমে আসে। ফলে যে কোন শস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয় অথচ মাটির নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগের অত্যধিক দ্রবণীয়তা ও বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ায় গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে পরিণতির ফলে নাইট্রোজেনের এক বিরাট অংশ গাছপালার ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে থাকে। কাজেই নাইট্রোজেন বন্ধনের (Nitrogen fixation) প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

প্রকৃতিতে রাসায়নিক ও প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক পৃথকভাবে নাইট্রোজেনের যে সব পরিবর্তন ঘটছে, সেগুলিকে নিয়েই নাইট্রো-জেন-চক্র (Nitrogen cycle) গঠিত। বিষয়টি কিছুটা বুঝিয়ে বলা দরকার। বাতাসের গ্যাসীয় এই মৌলিক নাইট্রোজেনকে মাটির কিছু কিছু জীবাণু স্বাধীনভাবে অথবা মটরজাতীয় (Leguminous plant) গাছপালার মূলের শুঁটিতে থেকে জৈব জটিল নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিনে পরিবর্তন করতে পারে। পদ্ধতিটিকে সামগ্রিকভাবে মাটির নাইট্রোজেন বন্ধন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে নাই-ট্রোজেনের বন্ধনস্থল মাটি নয়—ওই বিশেষ ধরণের জীবাণুর কোষসমূহ। জীবজন্তু বা মানুষ খাদ্য হিসাবে নিয়ত গাছপালার প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড গ্রহণ করে। পরে পরিপাক ও পুষ্টির সময় দেহের এন্‌জাইমের সাহায্যে তা ভেঙ্গে গিয়ে সরল অবস্থায় উপনীত হয় এবং ভগ্ন সরল অংশগুলিকে অন্য এনজাইমের সাহায্যে জুড়ে অধিকতর জটিল প্রোটিন তৈরি করে। মৃত্যুর পরে গাছপালা বা জীবজন্তুর মৃতদেহের জটিল প্রোটিনকে নতুন করে ভাঙতে সুরু করে অন্য রকমের জীবাণু। ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায় সম্পূর্ণ অজৈব যৌগিক অ্যামোনিয়া। জৈব প্রোটিন থেকে অজৈব নাইট্রোজেনে, অর্থাৎ অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তন করবার ব্যাপারটাকে বলা যায় অজৈবায়ন (Mineralization)। পাশাপাশি বিপরীতমুখী ঘটনাটি অর্থাৎ নাইট্রো-জেন আত্তীকরণ (Assimilation) নাইট্রোজেন-সাম্যের এক উল্লেখযোগ্য ধাপ। এদিকে কিছু কিছু জীবাণু ইতিমধ্যেই অ্যামোনিয়াকে জারিত করে প্রথমে নাইট্রাস অক্সাইড, পরে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করে ফেলে। এদের বলে নাইট্রিফাইং জীবাণু (Nitrifying bacteria)। ধানগাছ খুব অল্প বয়সে মাটি থেকে অ্যামোনিয়া অবস্থায় নাইট্রোজেন নিতে পারে, তবে বেশীর ভাগ গাছ নাইট্রেট অবস্থায় গ্রহণ করে। এই টানা-পোড়েন বা বৃষ্টির জলে গুলে নাইট্রোজেনের কিছু অংশ গাছপালার ব্যবহারের বাইরে চলে যায়। তবে মাটির উর্বরতার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়ার গ্যাসীয় নাইট্রোজেনে পরিণতি। এর মূলে আছে এক ধরণের

* মৃত্তিকা রসায়ন, ফলিত রসায়ন বিভাগ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়াকলাপ, যাদের বলা হয় Denitrifying bacteria। এ হলো নাইট্রোজেন-চক্রের কাঠামো অর্থাৎ প্রাকৃতিক নাইট্রোজেনের সাম্য অবস্থার মোটামুটি বৈশিষ্ট্য।

আজকের জীবাণু-বিজ্ঞানীদের যা কিছু কৌতূহল মাটির ওই নাইট্রোজেন বন্ধন এবং এই ব্যাপারের অংশীদার ওই উভয় গোষ্ঠীর ব্যাক্টিরিয়াকে ঘিরে। এর কারণও অমূলক নয়। গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করবার ব্যাপারটা বিজ্ঞানী হাবারের পূর্বে রাসায়নিক শিল্পে এক অলঙ্ঘনীয় বাধা বলে বিবেচিত হতো—অথচ কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া তাদের কোষে এই পদ্ধতিকে অনায়াসে সম্ভব করছে। প্রথম ক্ষেত্রের জীবাণুগুলি অর্থাৎ যারা স্বাধীনভাবে বায়ুর নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে, তাদের বলা হয় Non-Symbiotic এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রের জীবাণুগুলি শীমজাতীয় (Legume) উদ্ভিদের মূলের গুঁটিতে থাকা অবস্থায় নাইট্রোজেন ধারণ করতে পারে। এই ধরণের জীবনযাত্রাকে বলা হয় মিথোজীবিতা (Symbiosis)। শীমজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও নিরক্ষীয় অঞ্চলের কিছু কিছু স্বাভাবিক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মিথোজীবিতা দেখা যায়; যেমন—পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের Casurina, উত্তর আমেরিকার বনাঞ্চলের Ceanothus বা ক্যানাডার Shepherdia প্রভৃতি উদ্ভিদ। কিন্তু মূল পার্থক্য ব্যাক্টিরিয়ার প্রকৃতিগত। শীমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে থাকে Rhizobium শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া। অন্যান্য উদ্ভিদের মূলের ব্যাক্টিরিয়ার Rhizobium-এর কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে ইতিমধ্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করতে সুরু করেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল সার উৎপাদনের ব্যবস্থা আজও মানুষকে ব্যাক্টিরিয়ার নাইট্রোজেন বন্ধনের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। শীমজাতীয় উদ্ভিদের মূলের গুঁটিতে নাইট্রোজেন বন্ধনের সম্পর্কের বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন 1888 খৃষ্টাব্দে Hellriegel এবং Wilfarth এবং আরও পঞ্চাশ বছর পরে তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেনের সাহায্যে ধরা পড়ে যে, গুঁটিগুলিই ব্যাক্টিরিয়ার নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার। Symbiotic বা Non-Symbiotic নাইট্রোজেন বন্ধন—উভয় ক্ষেত্রেই কৌশল ও পদ্ধতিগত বিষয় মোটামুটি এক।

নাইট্রোজেনবিহীন মাধ্যমে জীবাণুকে (ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে Jensen's medium আর নীল-সবুজ শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে Dey's medium) কৃত্রিম উপায়ে জন্মিয়ে ওই মাধ্যমে কোন উপরি নাইট্রোজেন পাওয়া যায় কিনা লক্ষ্য করে ঠিক করা যায়, জীবাণু নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম কি না?

ক। ব্যাক্টিরিয়া—কিছু কিছু ব্যাক্টিরিয়া বাতাসের সরল কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে রাসায়নিক শক্তি বা আলোক শক্তির সাহায্যে দেহের শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে। এই শর্করাজাতীয় খাদ্যের ভাঙন (শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায়) পরে ব্যাক্টিরিয়ায় জীবনীশক্তি সরবরাহ করে। প্রথম শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়াকে রসায়ন সংশ্লেষী (Chemoautotroph) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়াকে আলোক সংশ্লেষী (Photoautotroph) বলা হয়।

নাইট্রোজেন সংরক্ষণী রাসায়নিক সংশ্লেষী—Methanobacillus omelianskii.

নাইট্রোজেন সংরক্ষণী আলোক সংশ্লেষী—Chlorobium, Chromatium, Rhodomicrobium, Rhodospirillum.

তাছাড়া কিছু ব্যাক্টিরিয়া মাটির জটিল

কার্বন যৌগ থেকে শর্করাজাতীয় খাদ্য তৈরি করে। তাদের বলা হয় Heterotroph। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম ব্যাক্টিরিয়া হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলো—Achromobacter, Aerobacter, Azotobacter, Azotomonas, Bacillus polymyxa, Beijerinekia, Clostridium, Pseudomonas ইত্যাদি।

খ। নীল-সবুজশ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ (Blue-green algae)—নাইট্রোজেন বন্ধনকারী উদ্ভিদ হিসাবে এরা এক নতুন সংযোজন। মূলতঃ বাংলা দেশের ডক্টর প্রাণকুমার দে, ডক্টর লক্ষ্মীনারায়ণ মণ্ডল, বেনারসের ডক্টর আর. এন. সিং এবং টোকিওর ডক্টর ওয়াতনোবের মূল্যবান গবেষণায় নীল-সবুজ শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদের নাইট্রোজেন বন্ধনের শক্তি ধরা পড়ে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Anabaena, Aulosira, Calothrix, Cylindrospermum, Nostoc, Tolypothrix। আজ পর্যন্ত নাইট্রোজেন বন্ধন সম্পর্কে যত মৌলিক গবেষণা হয়েছে, তার বেশীর ভাগই হয়েছে Azotobacter নিয়ে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, Azotobacter নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নজীর। এরা এককোষী ব্যাক্টিরিয়া। এদের কোষের আকার যথেষ্ট বড় এবং ব্যাক্টিরিয়া-জগতের অন্যান্যদের চেয়ে এদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর। সাধারণতঃ প্রতি গ্র্যাম সরল শর্করাজাতীয় খাদ্য ব্যবহার করে এরা পাঁচ থেকে কুড়ি মিলিগ্র্যাম নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। Azotobacter প্রজাতির অন্তর্গত পাঁচটি সদস্য উল্লেখযোগ্য, যেমন—Azotobacter chroococcum, Azotobacter beijerinekii, A. vineland, A. microcytogenes, A, agilis ইত্যাদি। সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মাটিতে Azotobacter chroococcum-এর প্রাধান্য দেখা যায়। আবার Beijerinekii শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া অম্লাত্মক মাটিতেও নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বর্মা, ভারত, ইন্দোচীন, দঃ আমেরিকা, সুরিনাম, উঃ অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার উষ্ণ অঞ্চলেও এদের দেখা যায়। অথচ J. Ruinen নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এদের খুঁজে পেয়েছিলেন কোন কোন গাছের পাতার গায়ে বা Phyllosphere-এ।

অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জীবন-চক্রকে সম্পূর্ণ করতে পারে যে সব ব্যাক্টিরিয়া, তাদের বলা হয় Anaerobes। এদের বিপরীত ধর্মীদের বলে Aerobes। তাই Azotobacter, Beijerinekia-কে বলা হয় Aerobes। Anaerobes-এর দলে এক উল্লেখযোগ্য নজীর Clostridium শ্রেণীর সদস্যেরা। এরা বেশীর ভাগই গাছের মূলে ভিড় করে। অম্লাত্মক থেকে ক্ষারকীয় মাটির মূলীয় স্তরে (Rhizosphere) পাওয়া যায় Clostridium pasteurianum বা C. butyricum।

বাংলাদেশের মত বৃষ্টিভেজা আর্দ্র জমিতে বা যে সব নীচু জমিতে বৃষ্টির পর জল দাঁড়িয়ে যায়, সেখানে অক্সিজেন গ্যাসের অভাবে Azotobacter মেলা ভার। তাই সংগৃহীত নাইট্রোজেনের সবটুকু পাওয়া যায় নীল-সবুজ শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ থেকে। বাংলা দেশের ধানী জমিতে পাওয়া যায় Aulosira, Anabaena, Anabaenopsis, Cylindrospermum, Nostoc, Tolypothrix ইত্যাদি। তবে এদের বন্ধন পদ্ধতি খুবই মন্থর। এই ধরণের শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ বা মটরজাতীয় উদ্ভিদের মূলের রাইজোবিয়াম শ্রেণীর জীবন-চক্রের এক বিস্ময়কর সাদৃশ্য—পাশাপাশি আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) ও নাইট্রোজেন বন্ধন। প্রথম ক্ষেত্রে উভয় প্রক্রিয়া চলে একই কোষের সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রথম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মটরজাতীয় উদ্ভিদ বা পোষক (Host) আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়া চলে রাইজোবিয়াম কোষের অভ্যন্তরে।

এতক্ষণ নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো। এবার দেখা যাক, পারিপার্শ্বিক কোন্ কোন্ অবস্থা পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করতে পারে। জীবাণুর বেঁচে থাকবার জন্যে চাই নাইট্রোজেনঘটিত সংক্ষিপ্ত যৌগ। তাই ওরা যদি সরাসরি কোন নাইট্রোজেন যৌগ মাটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পেয়ে যায়, তাহলে স্বভাবতঃই বায়বীয় নাইট্রোজেন বন্ধনে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। তাই নাইট্রোজেন ঘাটতির মাটিতে পদ্ধতিটি যত সক্রিয় ও সহজ, নাইট্রোজেন পূর্ণ মাটিতে কিন্তু ততটা নয়। কোন কোন গবেষকের মতে, মলিবডিনাম, আয়রন বা ক্যালসিয়াম পদ্ধতিটির গতি প্রভাবিত করতে পারে। তবে বিশেষ কিছু কিছু ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ভ্যানাডিয়ামের বদলে মলিবডিনাম, আর ষ্ট্রনসিয়াম ক্যালসিয়ামের বদলে ব্যবহার করা যায়। মাটির উল্লেখযোগ্য ফস্‌ফরাস ঘাটতি কোন কোন সময় Azotobacter বা Blue-green algae-র জীবন-চক্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নাইট্রোজেন বন্ধনকারীদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব—এক রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাসকে জীবাণু-কোষের মধ্যে জটিল যৌগে পরিবর্তন, যা ফলিত রসায়নের ক্ষেত্রে রসায়নবিদ্‌দের এক সমস্যাসঙ্কুল ইতিহাস। হয়তো নাইট্রোজেনেজ নামে এন্‌জাইমের এই ক্ষেত্রে কোন অবদান থাকতে পারে। আবার যে সব ব্যাক্টিরিয়া নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, তারা হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে হাইড্রোজেনেজ এন্‌জাইমের দ্বারা। কিন্তু হাইড্রোজেনের উপস্থিতি নাইট্রোজেন গ্রহণ পদ্ধতিকে মন্থর করে। তাই হাইড্রোজেনেজ ও নাইট্রোজেনেজ এন্‌জাইমের উপস্থিতির ব্যাপারটা স্বভাবতঃই কিছুটা গোলমেলে হয়ে যায়। কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেছেন যে, অচলাবস্থার অবসানে উভয় এন্‌জাইম এক সাধারণ এন্‌জাইমের অবস্থান্তর মাত্র।

পরের ধাপটুকু আরো সমস্যাসঙ্কুল। বায়বীয় নাইট্রোজেনের জটিল প্রোটিনে পরিবর্তন—সমগ্র পদ্ধতিটির মাধ্যমিক সংযোগস্থল কোন্‌টি? অর্থাৎ কোথায় অজৈব শেষ যৌগ জৈব কার্বনঘটিত যৌগের সঙ্গে মেলে? এই প্রসঙ্গে ফিনিশীয় প্রবীণ বিজ্ঞানী Virtanen বলেন—হাইড্রক্সিল অ্যামিন'। এর বিরুদ্ধে অভিমতের কারণ—হাইড্রক্সিল অ্যামিন নিজে জীবকোষে বিষক্রিয়া ঘটায়। কিন্তু তাঁর মন্তব্য—অতি অল্প পরিমাণে এর বিষক্রিয়াকে আমল দেওয়া যায় না। কিন্তু জার্মান বিজ্ঞানী Wilson বা মার্কিনী বিজ্ঞানীBurris-এর ধারণা—অ্যামোনিয়াই কার্বনঘটিত যৌগের সঙ্গে শেষ পর্যায়ে বিক্রিয়া ঘটায়। এই ধারণার স্বপক্ষে অন্ততঃ নিম্নোক্ত যুক্তি দেখানো যায়—

1. নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়ার কোষে বাইরে থেকে অ্যামোনিয়ার যৌগ দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহৃত হয় সম্পূর্ণ বিক্রিয়ায় অথচ নাইট্রোজেন এন্‌জাইমের ক্রিয়ার জন্যে কোন বিরতির প্রয়োজন হয় না।

2 তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে তেজস্ক্রিয়তার সবটাই ধরা পড়ে অ্যামোনিয়ায়।

যাহোক আজ পর্যন্ত মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ধারণায় দেখা যায়, বায়বীয় নাইট্রোজেন থেকে গঠিত অ্যামোনিয়া সংযুক্ত হয় শর্করাজাতীয় খাদ্যের সরলীকৃত অংশ α—Ketoglutamic acid-এর সঙ্গে—উৎপন্ন হয় এক অ্যামিনো অ্যাসিড Glutamic acid অর্থাৎ ব্যাক্টিরিয়ার কোষের প্রোটিন তৈরির প্রথম ধাপ সুরু। অ্যামোনিয়া গঠিত হবার পরের অংশগুলি সরাসরি পরীক্ষায় ধরা পড়ে—অবশিষ্ট সবটুকুই অনুমানভিত্তিক।

কৃষিকার্যের ইতিহাসে বহু প্রাচীন কাল থেকেই শস্যের আবর্তন (Crop Rotation), অর্থাৎ দুটি মূল শস্যের মাঝখানে শীমজাতীয় উদ্ভিদ রোপণের প্রথা চলে আসছে। এর অন্তর্নিহিত কারণ শীমজাতীয় উদ্ভিদের শুঁটির সাহায্যে মাটির নাইট্রো-

জেন ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করবার চেষ্টা। আবার জমিকে কিছুদিন অনাবাদী ফেলে রাখবার পিছনেও ছিল নাইট্রোজেন ঘাটতিকে Azotobacter শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে কিছুটা মেটাবার চেষ্টা। আজকে নতুন করে বিষয়টাকে ঘিরে সোরগোলের কারণ—কোন কোন রুশ বিজ্ঞানীর এক বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত। সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইয়োরোপের কিছু কিছু জীবাণু-বিজ্ঞানীর গবেষণা প্রমাণ করে যে, মাটিতে বাইরে থেকে সক্রিয় Azotobacter জাতীয় জীবাণু মিশিয়ে দিলে মাটির নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা বেশী। প্রাথমিক স্তরে মেশানো Azotobacter জীবাণুর কৃত্রিম প্রজননকে ব্যাক্টিরিয়ার সার (Bacterial fertilizer) বলা হয়। যে সব শস্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আংশিক সত্য, তা হলো—আলু, বীট, আখ, কফি, টোম্যাটো, গাজর প্রভৃতি।

স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ পরিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন নূতন ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ

সম্প্রতি ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সমর্থনে পোলেরন ইনস্ট্রুমেন্ট লিঃ কর্তৃক পাঁচ লক্ষ গুণ পরিবর্ধন শক্তিসম্পন্ন MR 60 নামে এক প্রকার নূতন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। দেহকোষের উপর যৌন-হর্মোনের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণার উদ্দেশ্যে লণ্ডন মেডিক্যাল স্কুলের সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে এই নূতন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে।
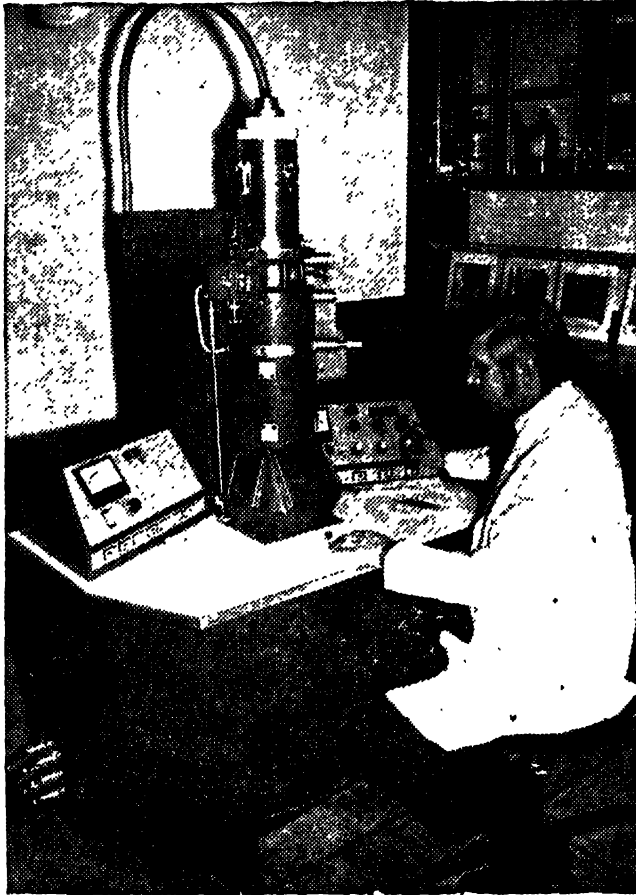
সঞ্চয়ন

1973 সালের শেষে পায়োনিয়ার-10-এর বৃহস্পতিগ্রহের এলাকায় পৌঁছুবার কথা

গত 2রা মার্চ, 1972 আমেরিকার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের কেপ কেনেডী থেকে 551 পাউণ্ড ওজনের পায়োনিয়ার-10 নামে একটি যাত্রীবিহীন স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ বৃহস্পতিগ্রহের অভিমুখে প্রেরিত হয়। গত 15ই জুলাই, 1972 থেকে এই উপগ্রহটি মহাকাশে এক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে উল্কাবলয়ের বেড়াজালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারলে 1973 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পায়োনিয়ার-10 বৃহস্পতির কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুবে।

এর আগে মানুষের তৈরি আর কোন উপগ্রহই মহাকাশের ঐ এলাকায় পৌঁছয় নি। এই বলয়ে আছে বিভিন্ন আকৃতির উল্কা ও উল্কাকণা। সূর্য থেকে পৃথিবী যতখানি দূরে অবস্থিত, তারও আড়াই গুণ দূরে রয়েছে এই উল্কাবলয়। এই বলয় অতিক্রম করে যেতে পায়োনিয়ার-10-এর লাগবে সাত মাস, অর্থাৎ 1973 সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এই দুরধিগম্য পথ তার পাড়ি দেবার কথা। এই সকল উল্কার কোন কোনটি এত বৃহৎ যে, এদের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব 800 কিলোমিটার বা 500 মাইল। ক্ষুদ্র গ্রহের মত এই সকল বিরাট প্রস্তরখণ্ড ছাড়া শিলাখণ্ড এবং ক্ষুদ্র কণার মত অসংখ্য উল্কা ঐ এলাকায় প্রতি সেকেণ্ডে বারো মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বৃহৎ নয়—অতি ক্ষুদ্র উল্কাকণার আঘাতেই পায়োনিয়ার-10 ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

মহাকাশযাত্রীদের সৌরমণ্ডলীর বৃহত্তর এলাকায় গ্রহলোক ছাড়িয়ে মহাকাশ সফরের দিক থেকে পায়োনিয়ার-10-এর এই উল্কাবলয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রার তাৎপর্য অপরিসীম।

এই বিপদসঙ্কুল যাত্রায় পায়োনিয়ার-10 অক্ষতভাবে এই বলয় অতিক্রম করে বৃহস্পতির দিকে অগ্রসর হতে পারলে প্রমাণিত হবে যে, ভবিষ্যতে মহাকাশযাত্রীদের পক্ষেও পৃথিবী থেকে মহাশূন্য যাত্রা হবে বাধাহীন। মানুষ ইচ্ছা করলেই গ্রহলোক ছাড়িয়ে সেই পথে যাত্রা করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে।

আর যদি তা নাই হয়, এই বলয়ের জন্যে পায়োনিয়ারের গতি যদি রুদ্ধ হয়ে যায় অথবা সেই আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে মানুষের পক্ষেও অতি দূর মহাকাশের অনন্ত পথ আপাততঃ রুদ্ধ হয়ে যাবে—সৌরমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ চক্রের মধ্যেই মানুষ ও তার যন্ত্র বদ্ধ হয়ে থাকবে—যেমন ছিল মানুষ পনেরো বছর আগে, মহাকাশ যুগ সুরু হবার পূর্বে। তখন পর্যন্ত সে পৃথিবীর আবহ-মণ্ডলের মধ্যেই ছিল বন্দী, পৃথিবীর অভিকর্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে নি।

পায়োনিয়ারের পথে এই উল্কা বলয়ের বাধা যদি দুরতিক্রম্যই হয়, তবে তাতে প্রমাণিত হবে—মহাকাশ-বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের এই বাধা অতিক্রম করবার জন্যে উন্নততর সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করতে হবে।

তবে পায়োনিয়ার-10 প্রচণ্ড বেগে চলেছে বৃহস্পতির দিকে। পৃথিবী থেকে যাত্রার এগারো ঘণ্টার মধ্যেই সে চাঁদের কক্ষপথ ছাড়িয়ে চলে গেছে। সে স্থলে মার্কিন মহাকাশচারীদের চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছুতে লেগেছিল তিন দিন।

1972 সালের 25শে মে মঙ্গলের কক্ষপথ ছাড়িয়ে সে চলেছে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে। মনুষ্যসৃষ্ট কোন বস্তু আজ পর্যন্ত মহাকাশের এই দূরতম প্রান্তে পৌঁছয় নি।

1973 সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বৃহস্পতির কাছাকাছি পৌঁছে সেখান থেকে পায়োনিয়ার-10-এর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঐ গ্রহের আলোকচিত্র তুলে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবার কথা। বৃহস্পতিই সৌরমণ্ডলীর বৃহত্তম গ্রহ। তারপর পায়োনিয়ার-10 যাবে সৌরমণ্ডলীর প্রান্তসীমায় এবং কালক্রমে সেই সীমানা ছাড়িয়ে মহাশূন্যে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে রয়েছে এই উল্কাবলয়। বিজ্ঞানীরা বরাবরই এই এলাকাকে দুরতিক্রম্য বলে মনে করে এসেছেন। তাঁরা অবশ্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই উল্কাবলয়কে একটা খুব বড় বাধা বলে স্বীকার করেন না। পায়োনিয়ার-10-এর পথের এই বিপদ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। ঐ বলয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 1831টি বৃহত্তম উল্কার পরিক্রমণ পথের সন্ধান করেছেন। তাছাড়া অনেকের ধারণা, ঐ বলয়ে 1.6 কিলোমিটার বা 1 মাইল ব্যাসের 50000 উল্কা রয়েছে। তবে 150 মাইল দূর থেকে পায়োনিয়ার-10-এর কোন বৃহৎ—এমন কি, 30 ফুট ব্যাসের কোন উল্কাকণার ছবি তোলবার [illegible] সম্ভাবনা নেই।

অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন আধ মিলিমিটার ব্যাসের কোন উল্কাকণার আঘাতেও পায়োনিয়ার-10-এর সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকলেও এই সকল কণা মহাকাশের বহু বিস্তৃত এলাকায় ছড়ানো রয়েছে। তাই অতি ক্ষুদ্র এক মিলিমিটারের চার ভাগের এক ভাগ যার ব্যাস—এরকম উল্কাকণার সংস্পর্শে হয়তো পায়োনিয়ার-10 আসবে না।

পায়োনিয়ার-10-এ এগারো প্রকার স্বয়ংক্রিয় তথ্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। 1973 সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ঐ সকল যন্ত্রপাতির আওতার মধ্যে কোন উল্কাকণা এসে পড়লে তার আকৃতি, গতিবেগ নিরূপণ এবং আলোকচিত্র গ্রহণ এবং বেতারে পৃথিবীতে প্রেরণের জন্যে বিজ্ঞানীরা ব্যবস্থা করেছেন। এই বলয়টি রয়েছে 17 কোটি 50 লক্ষ মাইল স্থান জুড়ে আর এর গভীরতা হচ্ছে 5 কোটি মাইল। সুতরাং ঐ বলয় পেরিয়ে যাবার উপযোগিতার উপরেই কোন মহাকাশযানের ঐ বলয়ের অপর প্রান্তিক তথ্যানুসন্ধান নির্ভর করছে।

প্রধানতঃ বৃহস্পতি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পায়োনিয়ার-10 দু-বছরের অভিযানে মহাকাশে প্রেরিত হলেও বহু বিজ্ঞানীর ধারণা—ঐ উপগ্রহটির যাত্রাপথে উল্কাবলয় সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে স্বীকৃত হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

গত 29শে জুলাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব ভবনে 'কুমার প্রমথনাথ রায়' কক্ষে বিশিষ্ট সুধীজন, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের উপস্থিতিতে পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকবার কথা ছিল; কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় বলে তিনি উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁর স্থলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অনুষ্টুপ ও কিশোর কল্যাণ পরিষদের সভ্য-সভ্যারা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং কুমারী শাশ্বতী শেঠ সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পরিষদ সভাপতিকে মাল্যদান করেন। এরপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ তাঁর নিবেদন পাঠ করেন ('কর্মসচিবের নিবেদন' বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান যুগে আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। বিজ্ঞানের বলেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ এত উন্নতি লাভ করেছে। আর আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে তেমন সচেতন হতে পারেন নি বলেই আমরা তাঁদের তুলনায় আজও অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। আমাদের দেশে আজ যে বিজ্ঞান-চর্চা চলছে, তা প্রধানতঃ শহরমুখী। গ্রামের মানুষের কাছে আমরা বিজ্ঞানকে আজও পৌঁছে দিতে পারি নি। এর কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের কথা আমরা এতদিন তেমন-ভাবে প্রচার করি নি। আজ আমরা উপলব্ধি করেছি, দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতির জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ছাড়া গত্যন্তর নেই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘ 24 বছর ধরে বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে যে বিভিন্ন কর্মপন্থা বাস্তবে রূপায়িত করেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন যে, গ্রামাঞ্চলেও এই ধরণের কর্মধারার প্রসার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু তাঁর ভাষণে বলেন, দেশের জন-সাধারণের কাছে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই 25 বছর আগে বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞানের কথা প্রচারের জন্যে আমরা এক সময় সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। সরকার তখন বলেছিলেন, আমরা এই কাজের দায়িত্ব নিচ্ছি, বিজ্ঞান পরিষদ অন্য সব কর্মপন্থা নিয়ে বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তুলুন। এক সময় আমরা যখন মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞান-চর্চার কথা বলেছিলাম। তখন নানা মহল থেকে আমাদের উপহাস ও সমালোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু আজ অনেকে আমাদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, দেশের দ্রুত উন্নতির জন্যে সাধারণ মানুষের কাছে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান শুধু মারণাস্ত্র তৈরি করে না, সাধারণ মানুষের কল্যাণেও বিজ্ঞান অনেক কিছু কাজ করেছে আজ যে আমাদের

দেশে সবুজ বিপ্লব কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে, তার মূলেও রয়েছে বিজ্ঞান।

বিচারপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, বিংশ শতাব্দীকে বলা হয়েছে বিজ্ঞানের যুগ। দেশের উন্নতির জন্যে সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের পরিচিতি ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য এটা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্ভব নয়। তাঁরা বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা নেই বললেই চলে। তাঁরা আরও বলেন যে, বিজ্ঞান এখন আন্তর্জাতিক; সে জন্যে ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ভাষায় তা আবদ্ধ থাকতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এমন এক যুগ ছিল যখন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারে'র উদ্যোগে আয়োজিত "ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন।

মাতৃভাষার মাধ্যমেই করা সম্ভব। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার কেবল সম্ভবই নয়, তা স্বাভাবিকও বটে। এতে বিজ্ঞানের জাতীয় ভিত্তি দৃঢ়তর হবে এবং তাতে বিজ্ঞান শুধু কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। এর দ্বারাই বিজ্ঞানবোধ ও বিজ্ঞানদৃষ্টি ব্যাপক হয়ে দাঁড়াবে। এই পন্থায় দেশের বিজ্ঞান-প্রতিভার নব নব উন্মেষ ঘটবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, বাংলা

করেছিল। জাপান, জার্মেনী, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি তাঁদের নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা করে না। বিজ্ঞানকে যথার্থ ক্রিয়াশীল এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও ভাবধারাকে দেশের নিকট গ্রহণযোগ্য করতে হলে তাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। (সভাপতির সম্পূর্ণ ভাষণ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে)।

ভাষণ শেষে বিচারপতি শ্রীমুখোপাধ্যায় পরি-

ষদ কর্তৃক পরিচালিত 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারে'র উদ্যোগে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। (এই প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিবরণ বর্তমান সংখ্যায় 'বিবিধ' অধ্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে।)

অনুষ্ঠানের শেষে পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জয়ন্ত বসু অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি, সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সমবেত সুধী-মণ্ডলীকে পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাকে পৌরহিত্য করিবার আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে নিতান্ত সম্মানিত করিয়াছেন।

1948 সালে এই বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বিগত 24 বৎসর ধরিয়া এই পরিষদ বিজ্ঞানের সেবা করিয়া আসিতেছে। এই সেবা বিজ্ঞান-জগতে এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা, সমাজকে বিজ্ঞানসচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা—ইহাই পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার জন্য এই পরিষদ নিয়মমত কতকগুলি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে আছে বিজ্ঞানের ইতিহাস, নূতন আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী ও কীর্তি, যাহা মানুষের জীবন ও সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার সম্যক আলোচনা ও ঐতিহ্যময় কীর্তি ও কর্মতত্ত্ব প্রচার প্রভৃতি এই পরিষদের প্রধান কর্তব্য। তাহার সঙ্গে আছে, আর একটি বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি—একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করা এবং তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন ও প্রচার, বিজ্ঞানের পাঠাগার স্থাপন, বৈজ্ঞানিকদের ব্যক্তিগত আলোচনার ব্যবস্থা, বিজ্ঞান সম্মেলন ও প্রদর্শনী ব্যবস্থা করা—এই পরিষদের কর্ম ও লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীকে বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের যুগ। দেশের উন্নতির জন্য সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের পরিচিতি ও বিজ্ঞানমনোবৃত্তি সৃষ্ট করা একান্ত আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ইহা মাতৃভাষার মাধ্যমে সম্ভব। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার শুধু সম্ভবই নহে, তাহাই স্বাভাবিক। তাহাতে বিজ্ঞানের জাতীয় ভিত্তি দৃঢ়তর হইবে এবং তাহাতে বিজ্ঞান শুধু কতকগুলি মুষ্টিমেয় লোকের ভিতর আবদ্ধ থাকিবে না। ইহার দ্বারাই বিজ্ঞানবোধ ও বিজ্ঞানসৃষ্টি ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইবে। এই পন্থায় দেশের বিজ্ঞান-প্রতিভার নব নব উন্মেষ ঘটিবে।

ইংরেজী শাসনতন্ত্রে বাংলা দেশে বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, শিক্ষা ও প্রচার কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় হইত। সেই সকল শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কেহ কেহ পরবর্তী যুগে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই সকল দেশের বিজ্ঞানের আবিষ্কার অনুসরণ ও অনুশীলন করিয়াছেন। কিন্তু সেই যুগের এবং সেই যুগদৃষ্টির এক আমূল পরিবর্তন

হওয়া একান্ত আবশ্যক আজিকার পরিস্থিতিতে। এই পরিবর্তনের প্রধান অন্তরায় হইল একটি মানসিক ভাব। আমাদের কেহ কেহ মনে করেন যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। তাহারা বলেন, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা আরো বলেন যে, বিজ্ঞান এখন আন্তর্জাতিক। সেই জন্ম ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ভাষায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এমন এক যুগ ছিল যখন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতের চারিটি বেদে সকল বিজ্ঞানের মূল সূত্র ও তাহার ভাষ্য রহিয়াছে। এই চারিটি বেদে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শিশুবিদ্যা এবং আরো অনেক বিজ্ঞানের কথা রহিয়াছে। তখন কেহ বলে নাই যে, ভারতীয় বা প্রাদেশিক ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়বস্তু হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ আরো আধুনিক। সকল দেশ ও সকল জাতি আধুনিক বিজ্ঞান তাহাদের নিজেদের মাতৃভাষায় অধ্যয়ন ও আলোচনা করে। জাপান, জার্মানী, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশ তাহাদের নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়া বিজ্ঞানশিক্ষা করে না। বিজ্ঞানকে যথার্থ ক্রিয়াশীল করিতে হইলে ও বিজ্ঞান মনোবৃত্তিকে ও বিজ্ঞানভাবধারাকে দেশের নিকট গ্রাহ্য করিতে হইলে—তাহাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রচার করিতে হইবে। তৃতীয় কারণ হইল—ইহা একটি সঙ্কীর্ণ ভাবধারা যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রচার হইতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে, বাংলা ভাষায় সরলভাবে সকল বিষয় সম্যক ও সুচারুরূপে প্রকাশ করা যায়। ইহার উদাহরণস্বরূপ বাংলা ভাষায় যে সকল বৈজ্ঞানিক পুস্তক গত 10 বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলি অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, এই আধুনিক বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করিবার বিপুল শক্তি ও সামর্থ্য বাংলা ভাষায় আছে।

সেই জন্ম আমি মনে করি যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন ও প্রচার করা এই পরিষদের একটি বিশিষ্ট আদর্শ ও অবদান। জাতিকে যদি বিজ্ঞানসচেতন করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষকে বিজ্ঞানে অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছাইয়া পড়িবার যদি কোন এক কারণ নির্ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি বলিব, সেই কারণ হইল বিজাতীয় ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও অধ্যয়ন। বাংলা দেশে বহু প্রতিভা রহিয়াছে। যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পরিবেশন করা যায়, সেই প্রতিভাকে বিজ্ঞান আকর্ষণ করিবে।

বর্তমান জীবনের গতি, স্পন্দন ও উন্নতি বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্ম এইরূপ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমি তাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে এই বাৎসরিক অধিবেশনে আমার স্বাগত জানাই।

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন করছি। অদ্যকার এই সভায় যোগদান করে আপনারা বিজ্ঞান পরিষদের জনকল্যাণমূলক ও দেশগঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি যে ঐকান্তিকতা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই অনুষ্ঠানে মহাধর্মাধিকরণের মুখ্য ন্যায়াধিপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা যুগপৎ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করছি। শ্রীমুখোপাধ্যায় কেবল একজন খ্যাতনামা আইনবিদ্‌ই নন—শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত এবং এই সকল ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহদানও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তার জন্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের আদর্শ রূপায়ণের প্রচেষ্টাকে কিভাবে আরও সার্থক এবং লোকপ্রিয় করা সম্ভব, সে বিষয়ে তিনি আমাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করবেন—আমরা এই আশা পোষণ করছি।

এই অনুষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অনিবার্য কারণ বশতঃ উপস্থিত থাকতে পারছেন না, তাঁকে আজই বিশেষ জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে। তাঁর স্থলে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রধান অতিথি হিসাবে পেয়ে আমরা অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি এবং বিশেষ আশান্বিত হয়েছি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ হিসাবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সুপরিচিত। আমরা শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাছ থেকে বহু কিছুর প্রত্যাশী—তার মধ্যে শিক্ষা এবং সরকারী কাজের সর্বস্তরে অবিলম্বে বাংলা ভাষার প্রচলন এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার ও প্রসারে সরকারের নির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা ও রূপায়ণ বর্তমানে অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা। বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা কিভাবে অধিকতর বাস্তবমুখী, লোকগ্রাহ্য ও ব্যাপক করা সম্ভব—সেই সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে সুচিন্তিত ও রূপায়ণসাধ্য পরামর্শাদি লাভ করলে আমরা অনুগৃহীত হবো।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার বিস্তার অতীব প্রয়োজন এবং একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই যে তা করা সম্ভব—এই প্রতীতি থেকেই বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও বিজ্ঞানানুরাগীদের প্রচেষ্টায় এবং জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে 1948 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। জনসাধারণের মধ্যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারসাধনই বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ। এই আদর্শ পালনের জন্যে ঐ ভাষায় বিজ্ঞানসম্পর্কিত সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান সম্মেলন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা প্রভৃ

কর্মপন্থা নির্ধারিত আছে। গত চব্বিশ বছর যাবৎ পরিষদ এই রূপ কর্মপন্থা যথাসাধ্য বাস্তবায়িত করবার জন্যে সচেষ্ট রয়েছে।

কার্য-বিবরণী

আলোচ্য বছরে (1971-72) পরিষদ তার আদর্শানুযায়ী কি কি কাজ বাস্তবায়িত করতে পেরেছে এবং কিরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে, সে বিষয়ে পরিষদের কার্যবিবরণী এখন আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

1948 সালের সূচনা থেকেই বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—তা আপনারা জানেন। বর্তমানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার রজত-জয়ন্তী বর্ষ চলছে। এই উপলক্ষে পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় সুশোভিত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও আলোচনা বিজ্ঞান-সংবাদ, প্রশ্ন ও উত্তর, কৃষি-সংবাদ প্রভৃতি—বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদি জ্ঞান ও বিজ্ঞানে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে নানা প্রবন্ধ, মজার খেলা, পারদর্শিতার পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। বর্তমান পত্রিকার প্রকাশ সংখ্যা 2,700 কপি। নিছক বিজ্ঞানের একটি মাসিকের পক্ষে এই সংখ্যা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয়।

বিগত ছয় বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা বহু তথ্যবহুল প্রবন্ধ ও আকর্ষণীয় চিত্রের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হয়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে। শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বৈশিষ্ট্য ও সাধারণের কাছে এর উপযোগিতা লক্ষ্য করে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রতি বছর 1400 সংখ্যা শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ক্রয় করে এই রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট পরিষদ কৃতজ্ঞ। কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, পত্রিকাটির প্রচার ও প্রসারের এইরূপ সরকারী আনুকূল্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ আবেদন—সরকারী ও সরকারের সাহায্যপুষ্ট বেসরকারী বিভিন্ন উচ্চ ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরী বিদ্যায়তন এবং গ্রন্থাগারসমূহে বাংলা ভাষায় একমাত্র বিজ্ঞান মাসিক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বাধ্যতামূলক গ্রাহকীকরণের ব্যবস্থা করলে পরিষদের আদর্শ রূপায়ণের পথ প্রশস্ততর হবে, এই বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পাঠ্যপুস্তক সমিতির সুপারিশানুযায়ী সম্প্রতি কুচবিহার জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ এবং পুরুলিয়া জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ তাদের অধীনস্থ প্রাথমিক, উচ্চ ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' গ্রাহকীকরণের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত মার্চ ('72) মাসের পর থেকে কুচবিহার জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ আমাদের আবেদন সত্ত্বেও গ্রাহকীকরণের আদেশের পুনর্নবীকরণ করেন নি। ফলে একমাত্র কুচবিহার জেলাতেই আমাদের পত্রিকার এক হাজার পঞ্চাশ কপি বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে। তবে নদীয়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গ্রাহকসংক্রান্ত নিয়মাবলী সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার জন্যে পত্র দিয়েছেন এবং আমরাও যথাসময়ে তার উত্তর প্রেরণ করেছি। ফলাফল এখনও আমাদের গোচরে আসে নি। আমাদের আবেদন এই যে, জেলা বিদ্যালয় পর্ষদের অধীনস্থ প্রতিটি বিদ্যালয়কে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার

গ্রাহক করবার ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যে সাধনের পথ আরও ত্বরান্বিত করা হোক।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে 1943 সাল থেকে প্রতি বছর পত্রিকা প্রকাশন খাতে পরিষদ 3,600 টাকা পৌনঃপুনিক অর্থসাহায্য পাচ্ছে। কিন্তু গত চব্বিশ বছরে প্রকাশনের বিভিন্ন স্তরে মূল্য-বৃদ্ধির ফলে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সে জন্যে আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের কাছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশন খাতে বার্ষিক পৌনঃপুনিক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দশ হাজার টাকা (10,000·00) মঞ্জুর করবার জন্যে আবেদন করেছিলাম। অতীব দুঃখের বিষয়, তা মঞ্জুর হয় নি। 1943 সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশন খাতে বার্ষিক 3,600 টাকা সাহায্য মঞ্জুর হয়েছিল, তা আজও বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নি অথচ পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পত্রিকাখাতে আয় সেই তুলনায় আদৌ বৃদ্ধি পায় নি। পত্রিকার আয়ের অন্যতম উৎস বিজ্ঞাপন, কিন্তু সেই বিজ্ঞাপন বাবদ আয়ও আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সুতরাং সরকারী পৌনঃপুনিক বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে পত্রিকাটিকে আরও আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় করা বর্তমানে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা আশা করি—পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বর্তমান জনপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের এই আবেদন বিবেচনাপূর্বক পত্রিকাখাতে বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধির সুপারিশ করবেন।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশখাতে আলোচ্য বছরে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষৎ (CSIR) পাঁচ হাজার টাকা এবং শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা (NCERT) তিন হাজার পাঁচ শত টাকা অনুদান দিয়েছেন। এই সব সংস্থার কাছে পরিষদ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষদ আশা করে—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিয়মিত প্রকাশন, বিশেষতঃ এর মান উন্নয়নের জন্যে এই সব সংস্থা তাঁদের প্রদেয় বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করবেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তাদের সকলকেই আমি বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই সকল সাহায্য সত্ত্বেও পত্রিকাটিকে আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করবার পথে প্রধান অন্তরায় হলো আর্থিক অনটন। এই সব কারণে আপনাদের প্রতি বিশেষ আবেদন—পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, দানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারে আপনারা আন্তরিক সচেষ্ট হোন, যাতে আমরা আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতায় পত্রিকাটিকে আরও লোকরঞ্জক, শিক্ষাপ্রদ ও আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করিতে পারি।

বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ

লোকরঞ্জক পুস্তক :—জনসাধারণকে বিজ্ঞান-মুখী ও বিজ্ঞানসচেতন করবার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক পুস্তক প্রকাশ পরিষদের একটি অন্যতম প্রধান কাজ। এই সব পুস্তক প্রকাশের ব্যয়ের তুলনায় অল্প মূল্যে বিক্রয় করা হয়। পুস্তক প্রকাশের মোট ব্যয়ের অর্ধেক সরকারী ভর্তুকী হিসাবে পাবার ফলে এরূপ স্বল্পমূল্যে পুস্তক বিক্রয় করা সম্ভব হয়; অবশ্য সরকারী ভর্তুকী সকল পুস্তকে পাওয়া সম্ভব হয় না।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এযাবৎ মোট ত্রিশটি লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ করেছে। আলোচ্য বছরে অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর মহাশয়ের রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা "বিদ্যুৎপাত সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা" পুস্তকের আকারে প্রকাশিত

হয়েছে। ঐ বক্তৃতামালার অধ্যাপক মহাদেব দত্ত কর্তৃক প্রদত্ত রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতার বিষয়বস্তু "বোস-সংখ্যায়ন" পুস্তকরূপে প্রকাশের পথে। এছাড়া শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র রায়ের 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন' পুস্তকটির প্রকাশের কাজও চলছে।

আমাদের সমুদয় পুস্তকের একমাত্র পরিবেশক হচ্ছেন বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ওরিয়েণ্ট ল ম্যান্স। তবে পরিষদের সদস্যগণ বিজ্ঞান পরিষদ কার্যালয় থেকে যথারীতি শতকরা পঁচিশ ভাগ কমিশন বাদে পুস্তক ক্রয় করতে পারেন।

পাঠ্য পুস্তক:—পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী উচ্চ ও উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এবং খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ম্যাকমিলান কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 'বিজ্ঞান বিকাশ' নামক পাঠ্যপুস্তকটি গত তিন বছরে প্রায় বত্রিশ হাজার চার-শ' কপি বিক্রয় হয়েছে এবং এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তক এবং পরিভাষা রচনার কথা প্রায়শঃই সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শানুযায়ী এই সব প্রচেষ্টায় আমরা আনন্দিত এবং এই বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পরিষদ সর্বদাই আগ্রহী। তবে দুঃখের বিষয়—বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে এযাবৎ সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাছ থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ করা হয় নি, অথচ অতীতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকা গৌরবজনক।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনগণকে আগ্রহান্বিত ও সুযোগদানের উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও একটি পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে, তবে অর্থাভাব ও স্থানাভাবের জন্যে একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। 1969 সালে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হবার পর বেলেঘাটানিবাসী পরলোকগত ব্যারিষ্টার অমরেন্দ্রনাথ বসুর পরিবারের দানের অর্থে পাঠাগারটিকে নবরূপে পরিচালনা করা হচ্ছে; 1970 সাল থেকে পাঠাগারটি 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি' পাঠাগাররূপে অভিহিত হয়েছে। পাঠাগারটিতে বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্রাদি নিয়মিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে 'ভারতের উন্নতিতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ' সম্পর্কে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে অদ্যকার সভাতেই পরে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

পরিষদের গ্রন্থাগারটিকেও নানাভাবে সুসমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মোট এগারো হাজার টাকা দানের অর্থের দ্বারা বর্তমান বছরে গ্রন্থাগারে দাতার ইচ্ছানুসারে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক বিভাগ প্রবর্তন করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্যে যথোপযুক্ত অনুদান মঞ্জুর করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

গত 24শে মে স্বর্গতঃ প্রাণতোষ ঘটকের বৈঠকখানা রোডের বাসভবনে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তাঁর 50তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্যে বিজ্ঞানবিষয়ক শতাধিক পত্রপত্রিকা দান করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ৺ঘটকের কন্যা কুমারী নন্দিনীর হাত থেকে এই উপহার আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে

পরিষদের কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জয়ন্ত বসু এবং সহ-কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

বক্তৃতা ও আলোচনা

(i) 1971 সালের 19শে জুন পরিষদ ভবনে অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়—'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ' শীর্ষক দশম বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন। (ii) গত 31শে জুলাই (1971) পরিষদ ভবনে স্বামী শঙ্করানন্দ 'মহেঞ্জোদারো ও প্রাচীন আর্য সভ্যতা' বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন এবং এই সঙ্গে সিন্ধু-সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক বৈদিক বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে চিত্রাবলীও প্রদর্শিত হয়। (iii) গত 8ই এপ্রিল ('72) পরিষদ ভবনে ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় "সৃষ্টি রহস্য ও ক্রমবিবর্তনবাদ" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। (iv) গত 1ই জুলাই (1972) শুক্রবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত একাদশ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা স্লাইড সহযোগে প্রদান করেন ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মস্তিষ্ক ও মন'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি যে, পরিষদের আজীবন সদস্য অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পরলোকগত পিতা শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের নামে বার্ষিক লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রদানের জন্যে পরিষদকে চার হাজার টাকা দান করেছেন। এই অর্থবাবদ প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা প্রতি বছর 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে।

গত 23শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 59তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে বিজ্ঞান পরিষদ ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-কক্ষে "মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা" ও "জ্যোতির্বিজ্ঞানী যোহানেস্ কেপ্লারের চতুঃশত আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়; সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। "মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা" বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ডক্টর কুদরত-ই খুদা, ডক্টর শামসের আলি এবং এখানকার শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীসমরজিৎ কর প্রমুখ। কেপ্লারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন অধ্যাপক গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্তৃক আয়োজিত পুস্তক প্রদর্শনীতেও বিজ্ঞান পরিষদ অংশ গ্রহণ করেছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সহযোগিতার জন্যে তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

গত 12ই জুন ('72) পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলির উপস্থিতিতে কলিকাতার মহাকরণে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় শিক্ষা আধিকারের বিশেষ আমন্ত্রণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর জয়ন্ত বসু, শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন হাজরা উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে ডক্টর জয়ন্ত বসু প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলা দেশের একই ভাষা বিধায় বাংলায় সার্বিক ও বিশদ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুতের জন্যে উভয় দেশের যৌথ উদ্যোগে একটি পরিভাষা সমিতি গঠন করা সমীচীন। এর ফলে একই বাংলা পরিভাষা উভয় বাংলায় প্রচলনের সুবিধা হবে। আনন্দের কথা—এই প্রস্তাব গ্রহণে বাংলা দেশের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমরা আশা করি, পশ্চিম বঙ্গ

সরকার ও বংলা দেশ সরকারের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রস্তাবটি শীঘ্রই কার্যকর করা হবে। এই বিষয়ে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবার জন্যে বিজ্ঞান পরিষদ আগ্রহান্বিত।

হাতে-কলমে বিভাগ

পরিষদের হাতে-কলমে বিভাগে বিজ্ঞানের সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি প্রভৃতি কাজের সুযোগ-সুবিধা আছে। অনিবার্য কারণবশতঃ কিছুদিন যাবৎ বিভাগটিকে নিয়মিত খোলা রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। যাহোক বর্তমানে বিভাগটির কাজ আবার স্বাভাবিকভাবে চলছে।

পরিষদ ভবন নির্মাণ

1969 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদ ভবনের ভূগর্ভতল ও প্রথম তলের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার, কুমার প্রমথনাথ রায় চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট, পরলোকগত অধ্যাপক নীরেন রায় এবং অন্যান্য দাতাদের দানে এই নির্মাণকার্য সম্ভব হয়েছে। এযাবৎ যাঁরা পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে দান করেছেন, তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পরিষদের দ্বিতল ও ত্রিতল নির্মাণকল্পে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বর্তমান বছরের মে মাসে এক লাখ টাকা পরিষদকে দান করেছেন। আমরা এর জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে বিশেষ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

উপসংহার

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প সমৃদ্ধিই জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নিয়ামক। সে জন্যে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের আদর্শ নিয়েই বিজ্ঞান পরিষদ তার সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি পরিচালিত করছে। দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। আর সেই সঙ্গে আমরা নিশ্চিতভাবে এই বিশ্বাস রাখি যে, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুদৃঢ় ও ব্যাপক হয়ে উঠবে এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

পরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

কলিকাতা
29 জুলাই, 1972

বিজ্ঞান-সংবাদ

কৃত্রিম নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরির অভিনব ব্যবস্থা

ক্যান্সারজাতীয় রোগের আক্রমণের দরুণ শল্য-চিকিৎসার ফলে যাদের নাসিকা বা কর্ণ-চ্ছেদন করা হয়েছে অথবা যারা বিকৃত মুখ, চোখ, নাসিকা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা দৈহিক কোন অস্বস্তি বোধ না করলেও তাদের অধিকাংশেরই মানসিক অশান্তি থাকে—তারা হীনমন্যতায় ভোগে। মার্কিন চিকিৎসকেরা তাদের এই অশান্তি দূর করে তাদের স্বাভাবিক ও সুন্দর করে তোলবার কৃত্রিম ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। পোলিভিনাইল ক্লোরাইড নামে এক প্রকার উপাদানের সাহায্যে তাঁরা এদের জন্যে কৃত্রিম মুখ, নাসিকা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করছেন। রোগীর শরীর ও মুখের রং, মুখের দাগ এবং লাবণ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল রেখে ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করা হয়। সেগুলি যখন রোগীর মুখে লাগানো হয়, তখন এগুলি আসল না নকল, তা বুঝতেই পারা যায় না।

ডাঃ ডোয়াইট জে. ক্যাসলবেরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ক্যান্সার রোগীদের জন্যে পোলিভিনাইল ক্লোরাইড বা প্লাস্টিক দিয়ে কৃত্রিম জিহ্বা, তালু এবং দাঁতও তাঁরা তৈরি করেছেন। ইনি আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোস্থোডনটিক্স লেবরেটরীর প্রধান। ঐ গবেষণাগারেই এই প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এই সকল কৃত্রিম অঙ্গ এক বছর পর্যন্ত অবিকৃত থাকে, সূর্যালোক বা জল-বৃষ্টিতে এগুলির তেমন কোন ক্ষতি হয় না। তবে এক বছর পরে পুরনোটি ফেলে দিয়ে আবার নূতন কৃত্রিম অঙ্গ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাদের দেহের নাক, কান, জিহ্বা বা গালের কোন অংশ কৃত্রিম, তারা ঐ কৃত্রিম অঙ্গ পরে সাঁতার কাটতে, ঝরণা-ধারায় স্নান করতে বা প্রসাধন করতে পারেন।

ডাঃ ক্যাসলবেরী গত পাঁচ বছরের মধ্যে প্রায় এক হাজার রোগীর দেহে নূতন কৃত্রিম অঙ্গ জুড়ে দিয়েছেন। তরল প্লাস্টিককে ধাতব ছাঁচ থেকে ঢালাই করবার পর সেটিকে রং করা হয় ও শুকানো হয়ে থাকে। এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যেই নূতন অঙ্গ তৈরি হয়ে যায়। সুতরাং হাসপাতালে শল্য-চিকিৎসা বিভাগে কোন রোগী ভর্তি হবার পর তার যদি কোন অস্ত্রোপচার হয় এবং কোন অঙ্গ ছেদন করা হয়, তবে নূতন কৃত্রিম অঙ্গ তার দেহে সংযোজনের জন্যে হাসপাতাল থেকে পাওয়া যায়।

নিউইয়র্কের মেমোরিয়েল হাসপাতাল, মেরিল্যাণ্ড বেথেসডার ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, টেক্সাসের হিউস্টনস্থিত টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয় এবং লস্ এঞ্জেলেস্‌স্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

ডাঃ ক্যাসলবেরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সিল্কসেন আর একটি প্লাস্টিকের উপাদান। এই কাজে এটি পোলিভিনাইল ক্লোরাইডের চেয়েও উপযোগী। তিনি সিল্কসেন নিয়ে বর্তমানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। মহাকাশযানকে প্রাকৃতিক আবহাওয়া থেকে রক্ষা করবার জন্যে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ-সংস্থা কর্তৃক এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

লিউকেমিয়া রোগীর রক্ত পরিস্রুতির যন্ত্র

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রক্ত পরিস্রুত করবার একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। লিউকেমিয়া রোগে

যারা ভোগে, তাদের রক্তকণিকায় থাকে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্বেতকণিকা। তাই তাদের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যও গুরুতর ব্যাধির কারণ হয়ে থাকে। তাদের রক্ত পরিস্রুতির ব্যাপারে এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে।

বর্তমানে ওষুধপত্রের সাহায্যে এই অতিরিক্ত শ্বেতকণিকা নষ্ট করা হয়ে থাকে। কিন্তু রক্তের মৃত কোষকে বের করে দেবার ও শোধন করবার যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানবদেহে রয়েছে, ভেষজ প্রয়োগের ফলে তা ব্যাহত হয়। কোন কোন চিকিৎসকের অভিমত এই যে, এতে রোগের অবস্থা গুরুতর হয়ে থাকে।

দুধ থেকে মাখন যেভাবে পৃথক করা হয়, রোগীর অস্বাভাবিক শ্বেতকণিকাগুলিকেও এই যন্ত্রের সাহায্যে সেভাবে পৃথক করা হয়। তারপর ঐ রক্তের সঙ্গে রক্তদাতাদের সুস্থ রক্ত মিশিয়ে রোগীর দেহে তা পুনরায় প্রবেশ করানো হয়।

অস্বাভাবিকভাবে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই দেখা দেয় জ্বর, বেদনা, ক্লান্তি ও রোগের অন্যান্য উপসর্গ—রোগীর দেহ সংক্রামক ব্যাধির ভাইরাস ও জীবাণুর আক্রমণের উপযোগী হয়ে পড়ে। কারণ ঐ সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মত যথেষ্ট পরিমাণ সুস্থ শ্বেতকণিকা রোগীর দেহে থাকে না।

গুরুতর লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীর কয়েক সপ্তাহ বা মাসের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। তবে বর্তমানে বহু রকমের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা প্রয়োগ করলে রোগী কয়েক বছর টিকে থাকতে পারে। পুরাতন বা ক্রনিক লিউকেমিয়ায় যারা ভুগছেন, যথোপযুক্ত চিকিৎসা হলে তারাও বহুকাল বেঁচে থাকতে পারেন।

এই রোগে মাঝে মাঝে সঙ্কট দেখা দেয়। ঐ সময়ে শ্বেতকণিকার বৃদ্ধির মাত্রা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। তখনই ঐ যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়।

সম্প্রতি ফ্লোরিডার আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি আয়োজিত একটি আলোচনা সভায় মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রবার্ট এ. গুড ঐ যন্ত্রটির কথা বলেন এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসা-প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণায় তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন ডাঃ রিচার্ড গ্যাটি ও ডাঃ বি. জে. কেনেডি।

হৃদ্‌রোগাক্রমণের পূর্বাভাস জ্ঞাপনের অভিনব যন্ত্র

একটি ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র সর্বদা হৃদ্‌স্পন্দনের খোঁজ-খবর রাখে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার কোন ত্রুটি দেখা গেলে যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে রোগীকে সতর্ক করে দেয়। আমেরিকায় যে সকল হৃদ্‌রোগী নানা কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, তারা পরীক্ষামূলক-ভাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করছেন। যন্ত্রটি দেখতে একটি ক্ষুদ্র ট্রানজিস্টর রেডিও বা সিগারেট প্যাকেটের মত।

এই যন্ত্র ব্যবহারের আর একটি বড় সুবিধা এই যে, রোগীকে সতর্ক করে দেবার পর রোগী তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে টেলিফোনে তার অবস্থা জানাতে তো পারেনই, তাছাড়া টেলিফোনের রিসিভারটি রোগীর হৃদ্‌সংলগ্ন ঐ যন্ত্রের কাছে ধরলেই তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও তার চিকিৎসক পুরাপুরি জেনে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে টেলিফোনে এই যন্ত্রটি যে সকল তথ্য পরিবেশন করবে, তা উদ্ধারের জন্যে চিকিৎ-সকের কাছে বিশেষ সাজসরঞ্জাম রাখা প্রয়োজন। চিকিৎসক ইচ্ছা করলে তার টেলিফোন রিসি-ভারটিকে একটি যন্ত্রের সঙ্গে যোগ করে দিয়ে রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার সঠিক চিত্র পেতে পারেন।

ক্যালিফোর্নিয়ার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন যে, হৃদ্‌স্পন্দনের ক্রিয়া অস্বাভাবিক হবার পরেই মারাত্মক হৃদ্‌রোগের

আক্রমণ হয়ে থাকে। সুতরাং অস্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দনের ক্রিয়া যথাসময়ে পরিলক্ষিত হলেই রোগী সতর্ক হয়ে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে এবং রোগীর প্রাণরক্ষা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন—42 বছরের (ক্যালিফোর্নিয়ার কুপারটিনোর) মেলভিন রেমস নামে এক ব্যক্তি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া, হৃদ্‌স্পন্দনের অবস্থা ঐ যন্ত্রের সাহায্যে টেলিফোনের মাধ্যমে ষ্ট্যানফোর্ড কেন্দ্র থেকে ফিলিপাইনসের ম্যানিলায় জানানো হয়।

ম্যানিলা থেকে ঐ হৃদ্‌স্পন্দনের সম্পূর্ণ খবর আবার টেলিফোনযোগে স্ট্যানফোর্ড কেন্দ্রের চীফ কার্ডিওলোজিস্ট ডাঃ ডোনাল্ড সি. হ্যারিসনের নিকট প্রেরণ করা হয়। ঐ সংবাদের আদান-প্রদান কিছুটা হয়েছিল বার্তাবহ উপগ্রহের মাধ্যমে।

ডাঃ হ্যারিসন দেখাতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে কোন চিকিৎসকের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা যেতে পারে। রোগীর হৃদ্‌স্পন্দন এবং ডাঃ হ্যারিসের নিকট ম্যানিলা থেকে পুনরায় প্রেরিত তথ্যের মধ্যেও কোন পার্থক্য ছিল না।

এই যন্ত্রটির নাম ভেন্ট্রিকিউলার ইম্পাল্‌স্ ডিটেক্টর অ্যাণ্ড অ্যালার্ম। ক্যালিফোর্নিয়ার ডাবলিনস্থিত পাদিউ ডিনামিক্স ইনকর্পোরেট কোম্পানী এই যন্ত্রটি তৈরি করেছেন। এটিকে পকেট বা কোমরবন্ধনীতে রাখা যায়। দুটি ক্ষুদ্র সেন্সর রোগীর বুকের কাছে থাকে। সেন্সর দুটি তার দিয়ে ঐ যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

চিঠি-পত্র

বাংলায় বিজ্ঞান

(1)

মহাশয়,

বর্তমানে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার মোটেই যথেষ্ট নয় অথচ একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

অথচ বিশ বছর আগে সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান বিষয়ে যা আগ্রহ ছিল, আজ তার চেয়ে বহু গুণ বেড়েছে সন্দেহ নেই। আজকের দিনে সব মানুষের কৌতূহল—দুরন্তগতি রকেট কি ভাবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে মহাকাশযানকে পাঠিয়ে দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে! আকাশবাণীতে যখন খবর প্রচার হয় বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে যখন খবর পাই—অমুক তারিখে আমেরিকা কি রাশিয়া অমুক কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করেছে—ঠিক তখনি সকল স্তরের মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—কি সেই বস্তু? কিভাবে তৈরি? কি ভাবে কাজ করে? কি জন্যে পাঠানো হচ্ছে?

তারপর? তারপর আর কি—কোন পত্রিকা স্টলে খোঁজ করে যখন বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায়, মনের জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর সেখানে নেই, হতাশ হয়ে তখন ফিরে আসতে হয়। বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা যে আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তার একটি অন্যতম কারণ—উপযুক্ত লেখার অভাব।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আরো জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আমার ধারণা—যদি বাংলা ভাষায় উচ্চমানের বিজ্ঞান প্রচারের পাশে পাশে আজকের দিনে বিজ্ঞানে যা ঘটছে, তার বর্ণনা

ও তার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা উপযুক্ত ডায়াগ্রাম ও ছবির সাহায্যে সাধারণ মানুষের বোঝবার উপযোগী করে ছাপা হয়—তাহলে বিজ্ঞান-শিক্ষার চাহিদা আরো বাড়বে। এই ধরণের চেষ্টা অবশ্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বা ঐ ধরণের দু-একটি পত্রিকায় হচ্ছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।

বিজ্ঞানের নানা প্রশ্ন স্বভাবতঃই ছোট-বড় সবার মনে জাগে আর সেই প্রশ্নের উত্তর আমাদের আজ দিতে হবে সহজ ও সরলভাবে, যেমন—আজকের দিনের চিকিৎসাশাস্ত্রের কি কি উন্নতি হচ্ছে, সমুদ্রে আরো উন্নততর গবেষণা কিভাবে চালানো হচ্ছে। আজকে যুদ্ধে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তা কিভাবে তৈরি হয়—ইত্যাদি নানা জিনিষ প্রচারের জন্যে এগিয়ে আসতে হবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারোদ্যোগী বিজ্ঞানীদের—তাঁদেরই এই গুরু দায়িত্ব বহন করতে হবে।

তবে একটা কথা প্রত্যেক লেখককে মনে রাখতেই হবে—তাহলো লেখার মধ্যে এমন কিছু জিনিষ রাখা চলবে না, যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই পাঠকের নেই। তবে সে জন্যে বিজ্ঞানের প্রতি পদক্ষেপেই যে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, নূতন চিন্তাধারার সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলি এড়িয়ে না গিয়ে সে সম্পর্কে সহজ ব্যাখ্যা ও আলোচনা পাঠকদের বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে হবে।

সর্বশেষে 'চিঠি-পত্র বিভাগ' খোলবার জন্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করি।

ইতি
শ্রীসমরেশ মণ্ডল
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান), হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, জেলা—বীরভূম।

(2)

মহাশয়,

(ক) বাংলা ভাষায় গবেষণাপত্র প্রকাশ—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অবদান অপরিমেয়। আজ পঁচিশ বছর ধরে এই পত্রিকা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের একান্ত প্রিয়। প্রয়োজনের তাগিদে আজ বিজ্ঞানচর্চা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দরকার হয়ে পড়েছে উচ্চতর বিজ্ঞান-শিক্ষার। মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ, বিজ্ঞান-সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি ব্যাপারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাপত্র (Research paper) প্রকাশের জন্যে বাংলা ভাষায় কোন পত্রিকা নেই। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' বাংলা ভাষায় অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান পত্রিকা। কাজেই আমি পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীকে অনুরোধ করছি যে, এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় অন্ততঃ একটি করে যদি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, তাহলে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ উপকৃত হবে এবং পত্রিকার জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পাবে।

['গবেষণা' নামক পত্রিকায় বাংলায় মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করেছে; অবশ্য এর প্রকাশ এখনো পর্যন্ত নিয়মিত করা সম্ভব হয় নি।—সম্পাদক মণ্ডলী]

(খ) বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার—বর্তমানে পত্র-পত্রিকায় এবং বেতারে বিজ্ঞান প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করবার সুযোগ ছাত্র-ছাত্রীদের নেই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কাজেই পরিষদ যদি বছরে অন্ততঃ একবার করে প্রতি বিষয়ের (যথা পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীব-বিজ্ঞান ইত্যাদি) উপর আলাদা আলাদা সেমিনারের ব্যবস্থা করেন, তাহলে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক—এমন কি, বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণ আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা এবং বিতর্ক করবার সুযোগ পাবেন।

ইতি
অরিন্দম ঘোষ
9/G, শহীদ ক্ষুদিরাম রোড, ডাকঘর—বজবজ, জেলা—24 পরগণা।

কৃষি-সংবাদ

গমের ফসলে দস্তার প্রভাব

পাঞ্জাবে বেশীর ভাগ চাষীর মুখেই আজকাল ফসলে দস্তার অভাবজনিত রোগের কথা শোনা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে তাঁরা কখনও এই বিচিত্র রোগ সমস্যার সম্মুখীন হন নি বা এই বিষয়ে কিছু শোনেন নি। বেশীর ভাগ চাষীরই ধারণা এই যে, ফসল উৎপাদনের নতুন কৃষি-কৌশল, অর্থাৎ উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রচলন এবং অধিকতর মাত্রায় রাসায়নিক সারের প্রয়োগই এর জন্যে প্রধানত: দায়ী। আসল কথা এই যে, চাষীরা সম্ভবত: জানেন না যে, নতুন উচ্চ ফলনশীল জাতের সর্বোচ্চ ফলনের জন্যে কেবলমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাশ—এই তিনটি মুখ্য উপাদানই যথেষ্ট নয়—এদের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে দস্তা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডিনাম, বোরন প্রভৃতি গৌণ উপাদানের প্রয়োগও বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিশুদ্ধ রাসায়নিক সারে গৌণ উপাদানের মিশ্রণ থাকে না। সে জন্যে এই সারের বহুল প্রয়োগে ফসলে গৌণ উপাদানের অভাব ক্রমশ:ই বেড়ে উঠছে। এর ফলে চাষীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে—একদিকে তাঁরা উচ্চ ফলনশীল জাতের গম চাষ করে আশাপ্রদ ফল লাভে আগ্রহী আবার অন্যদিকে এর ফলে যে নতুন সমস্যা ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তার জন্যেও শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই সময় চাষীদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্যে ভূমি-বিশেষজ্ঞদের উপযুক্ত পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজন।

গত দু-বছর ধরে চাষীদের কাছ থেকে প্রায়ই এই অভিযোগ শোনা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস এবং পটাশ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও গমের আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাচ্ছে না। ফলনের এই অসাফল্যের সঠিক কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে এসব কৃষি জমিগুলি পরিদর্শন করে অভাবের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে, দস্তার অভাবই রোগের জন্যে দায়ী।

হেক্টর প্রতি 50 কি. গ্রা জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করে গমের ফলনে শতকরা 76 ভাগ পর্যন্ত (2 থেকে 10 কুইন্টাল / হেক্টর) উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়া গেছে, যাথেকে নীট লাভের পরিমাণ হচ্ছে—হেক্টর প্রতি 154 থেকে 1,000 টাকা।

সুতরাং দস্তার অভাবের কারণ এবং ফসলে তার বিশিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে চাষী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। তাহলে তাঁরা উপযুক্ত সময়ে এর প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

দস্তার অভাবের লক্ষণ—দস্তার সরবরাহ যথাযথ না হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলনের পরিমাণ ও গুণগত অবনতি ঘটে এবং গাছে অভাবের বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই লক্ষণগুলি সম্বন্ধে ঠিকভাবে জানা থাকলে উপযুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গমে দস্তার অভাবের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা নীচে বলা হলো।

প্রথমে গাছের উপর দিকের তৃতীয় পাতাগুলিতে অনিয়মিত পাণ্ডুর ছোপ্ দেখা দেয় এবং পাতার মাঝখানে সাদা পচনশীল ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পচনশীল স্থানগুলি ক্রমশ: তীব্র ও একাভীভূত হয়ে পাতাগুলি মাঝখান থেকে শুকিয়ে

যায়। এরপর স্বভাবতঃই পাতাগুলির উপরকার অংশ শুকিয়ে ঝরে পড়ে।

দস্তার অভাবের কারণ

1. গৌণ উপাদান প্রয়োগের অভাব; 2. উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রবর্তন; 3. ফসল কাটার নিবিড়তার বৃদ্ধি; 4. বিশুদ্ধ রাসায়নিক সারের প্রয়োগ; 5. জৈব সারের অপ্রাচুর্য; 6 মাটির অন্তর্নিহিত শক্তি অভাব, 7. প্রান্তীয় জমির চাষ।

গমে দস্তা প্রয়োগের প্রভাব নির্ধারণের জন্যে 1969-'70 এবং 1970-'71 সালে কয়েকবার পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয়। এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল থেকে দেখা গেছে, 1969 '70 সালে গমের ফলন প্রতি হেক্টরে 2·0 থেকে 13·0 কুইন্টাল পর্যন্ত বেড়েছে, অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাশ প্রয়োগের চেয়ে শতকরা 13·0 থেকে 75·6 ভাগ বেশী এবং গড়ে হেক্টর প্রতি 5 কুইন্টাল বেশী উৎপাদন পাওয়া গেছে। 1970-'71 সালে গমের ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রতি হেক্টরে 0·4 থেকে 13·0 কুইন্টাল পর্যন্ত হয়েছে; অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও পটাশের প্রয়োগের তুলনায় শতকরা 1·3 থেকে 64·5 ভাগ বেশী এবং গড়ে হেক্টর প্রতি 6·9 কুইন্টাল বেশী। এই দু-বছরেই পাতায় ছিটিয়ে দস্তা প্রয়োগ করবার চেয়ে মাটিতে প্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া গেছে। তাছাড়া আরও দেখা গেছে যে, দস্তা প্রয়োগ করা হলে প্রায় এক সপ্তাহ আগেই ফসল তোলা যেতে পারে।

দস্তা নিয়ন্ত্রণের উপায়

1. যে জমিতে আগের বছরে দস্তার অভাব দেখা গেছে, সেখানে নতুন করে ফসল বোনবার আগে প্রতি হেক্টরে 50 কি. গ্রা. জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রয়োগ প্রায় তিন বছরের জন্যে যথেষ্ট।

2. যদি ফসল বোনবার আগে জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ না করা যায় এবং পরে ফসলে দস্তার অভাবের লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে জিঙ্ক সালফেট সমপরিমাণ শুক্‌নো মাটির সঙ্গে মিশয়ে চাপান দিতে হবে এবং জমিতে নিড়ানী দিয়ে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

3. শতকরা 0·5 ভাগ প্রশমিত জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ স্প্রে করে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রতি হেক্টর জমির উপযোগী জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ তৈরি করবার জন্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলির প্রয়োজন—

(ক) জিঙ্ক সালফেট	—	5.0	কিগ্রা।
(খ) অপ্রশমিত চুন	—	2.5	কিগ্রা।
(গ) জল	—	1.000	লিটার

জমিতে চাষ দেবার পরেই এই দ্রবণ 15 দিন অন্তর দু-তিন বার করে স্প্রে করতে হবে।

দস্তা প্রয়োগে সতর্কতা

1. মাটিতে দস্তা প্রয়োগ করবার আগে মাটি পরীক্ষা করে দেখা অথবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া দরকার।

2. যদি মনে হয় যে, মাটিতে দস্তার অভাব আছে, তাহলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সহকারী সম্প্রসারণ বিশেষজ্ঞের (ভূমি-বিজ্ঞান) সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।

3. গৌণ উপাদানের অভাব ও আধিক্যজনিত বিষাক্ততার মধ্যবর্তী ব্যবধান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সেই জন্যে গৌণ উপাদানের অপরিকল্পিত প্রয়োগ বিশেষ বিপজ্জনক হতে পারে।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি-ভবন, নতুন দিল্লী কর্তৃক প্রচারিত]

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত

অনেকের ধারণা, ঘন মেঘ হলেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। কিন্তু সব ঘন মেঘেই বৃষ্টি হয় না। মেঘের মধ্যে বাদল মেঘ থেকেই সাধারণতঃ বেশী বৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বাদল মেঘ থেকে যখন প্রাকৃতিক নিয়মে বৃষ্টিপাত হয় না, তখন কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়, সে কথাই এখানে আলোচনা করবো। এর পিছনে গবেষণার অন্ত নেই এবং তাতে কয়েকটি উপায়ের কথাও জানা গেছে। যাহোক, কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি-পাতের কথা বলবার আগে মেঘ আর বৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাথমিক কিছু কথা বলা দরকার।

সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল প্রভৃতির জল উত্তপ্ত হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প বাতাসের চেয়ে হাল্কা। কাজেই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হলে বাতাস আরও হাল্কা হতে থাকে। হাল্কা বাতাস উপরে উঠে যায় আর ভারী বাতাস নীচে নেমে আসে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বাতাস যতই উপরে ওঠে, ততই প্রসারিত হয় এবং প্রসারণের ফলে বাতাস আরও ঠাণ্ডা হতে থাকে। উঠে-যাওয়া বাতাসের জলীয় বাষ্প উপরের ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়। তারপর ছোট ছোট জলকণার রূপ নেয়। এই জলকণাগুলি একসঙ্গে মিলে মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘ আরও ঠাণ্ডা হলে জলকণাগুলি বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হয়ে মাটিতে নেমে পড়ে। কিন্তু মেঘ ঠাণ্ডা হবার আগে ঝড় উঠলে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়, ফলে বৃষ্টিও পড়ে না। আগেই বলেছি, সব মেঘে বৃষ্টি হয় না। আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে মেঘকে চারভাগে ভাগ করা হয়—অলক মেঘ, স্তূপ মেঘ, স্তর মেঘ ও বাদল মেঘ। শেষোক্ত মেঘ থেকে বেশী বৃষ্টি হয়। যাহোক, কৃত্রিম উপায়ে জলকণাগুলিকে একত্রিত করে বৃষ্টিপাত ঘটাবার চেষ্টা সম্পর্কে অনেকে বলেন,

মেঘের ভিতর যদি হঠাৎ কোন বড় ধরণের বিস্ফোরণ ঘটানো যায় বা ধাক্কা দেওয়া যায়, তাহলেই জলকণাগুলি একসঙ্গে জমে গিয়ে বৃষ্টির ফোঁটার আকারে নেমে আসতে পারে। এই কারণেই মেঘ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তারই নিকটবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাছাড়া বিদ্যুৎ-চমকানোকে বৃষ্টিপাত ঘটাবার অন্যতম কারণও বলা হয়।

স্বাভাবিক বৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখা যায়, যখন মেঘের ভিতর জলকণাগুলি জমে বড় আকার ধারণ করে, মেঘের উষ্ণতাও তখন কমে যায়। তখনই বৃষ্টিপাত হয়। কাচ বা ধাতুর গ্লাসে যদি কিছু বরফজল রাখা হয়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে গ্লাসের গায়ে বাইরের দিকে জলের বিন্দু জমতে দেখা যায়। কারণ গ্লাসের চারদিকে যে বাতাস থাকে, তাতে জলীয় বাষ্পও আছে, সেই বাষ্প ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে জলবিন্দুতে পরিণত হয়। ঠিক এভাবে মেঘকে কোন প্রকারে ঠাণ্ডা করতে পারলেই মেঘের মধ্যের জলকণাগুলি বড় বড় জলবিন্দুতে পরিণত হয় আর তারই ফলে হয় বৃষ্টি। সুতরাং মেঘকে ঠাণ্ডা করাই হলো প্রধান কাজ।

1946 সালে আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ভিন্সেন্ট জে. শেফার কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত ঘটাবার ব্যাপারে একটি উপায় আবিষ্কার করেন। মেঘের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাকে জলবিন্দুতে রূপান্তরিত করবার জন্যে তিনি $-40^{\circ}C$ উষ্ণতাবিশিষ্ট শুষ্ক বরফ (Dry ice) ব্যবহার করবার কথা বলেছেন। যে মেঘ থেকে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, সেই মেঘের উপর আকাশযান থেকে শুষ্ক বরফের টুকরাগুলি ছড়িয়ে দিতে হবে। ফলে জলকণাগুলি এই ঠাণ্ডা জিনিষের সংস্পর্শে এসে জমে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় বড় জলবিন্দুর আকার ধারণ করে নীচে নেমে আসবে। শুষ্ক বরফটা আসলে সাধারণ বরফ নয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে ঠাণ্ডা করলে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। একে আরও ঠাণ্ডা করলে শুষ্ক কঠিন পদার্থে পরিণত হয়ে শুষ্ক বরফের সৃষ্টি করে। এটি বরফের মত দেখতে হলেও এর উষ্ণতা বরফের চেয়েও কম।

এই ব্যবস্থাটি ব্যয়বহুল বলে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে আরও উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে থাকে। কারণ আকাশযান থেকে শুষ্ক বরফ ফেলা বিশেষ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই মেঘে আঘাতের মধ্য দিয়ে জলবিন্দু সৃষ্টির জন্যে হাইড্রোজেন বেলুনের সঙ্গে সিলভার আয়োডাইড মিশ্রিত গান পাউডার দিয়ে মেঘের দিকে ছেড়ে দিতে হয়। তারপর মেঘের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটালে সিলভার আয়োডাইডের কণাগুলি মেঘের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৃষ্টিপাতের সূচনা করে।

উপরের দুটি উপায়ই কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘের ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য। গরম মেঘের জন্যে উপায়টা ভিন্ন প্রকৃতির। আমেরিকায় ডক্টর ল্যাংম্যুরের নেতৃত্বে যে পরীক্ষা চালানো হয়, তাতে মেঘের উপর ঠাণ্ডা জল স্প্রে করে দিতে হয়। ডক্টর বাওয়েন প্রায় একই রকম উপায়ে সফলতা লাভ করেছেন। কলকাতার ডক্টর ব্যানার্জী ও তামিলনাড়ুর ডক্টর সেথুরমন মনে

করেন, জলটা যদি ঠাণ্ডা হয়, তাহলে মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়তে দেরী হয় না। তবে ঠাণ্ডা বরফ-জল হলে ঐ কাজ আরও ত্বরান্বিত হয়।

অন্য একটা উপায় গরম মেঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে জলাকর্ষী পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিকে ব্যবহার করতে হয়; যেমন—ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের কথা বলা যায়। সাধারণ লবণে এই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সামান্য পরিমাণে থাকবার ফলে বর্ষাকালে লবণকে জলসিক্ত অবস্থায় দেখা যায়। তাহলে মেঘের ভিতর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা তার অভাবে লবণকে মিহি করে ছড়িয়ে দিলে জলীয় বাষ্পকে নিয়ে নিজেও জলে পরিণত হয়। ফলে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। তাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয় বেশী। স্বাভাবিক-ভাবে যখন বৃষ্টিপাত হয় না, তখন কিছুটা ব্যয়ের ঝুঁকি নিতে পারলে প্রয়োজনমত বৃষ্টিপাত ঘটানো সম্ভব হতে পারে।

শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী

ক্ষুধার উৎস

ক্ষুধা পায় কেন? এই সহজ সরল প্রশ্নের উত্তরে তোমরা বলবে, পেট খালি থাকলে ক্ষুধা পায় আর পেট ভর্তি থাকলে পায় না কিংবা হয়তো আরও একটু টেক্‌নিক্যাল বা বিজ্ঞান-ঘেঁষা উত্তর দেবে—পাকস্থলীর শূন্যতা ক্ষুধার উদ্রেক করে। কিন্তু সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে—ক্ষুধার অনুভূতির সঙ্গে উদর-পূর্তি বা শূন্যগর্ভ পাকস্থলীর কোন সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হতে পারে। তাহলেও জেনে রাখ, জীবদেহে ক্ষুধার অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে স্নায়বিক পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে—মস্তিষ্কের অন্যতম স্নায়ুকেন্দ্র হাইপো-থ্যালামাসের পাশে যে দুটি স্নায়ুকোষসমষ্টি রয়েছে, সেগুলি ক্ষুধা তৃপ্ত করে বলে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্র নামে অভিহিত। অনুরূপ আরও দুটি স্নায়ুকোষের সমষ্টি রয়েছে, যেগুলি ক্ষুধার অনুভূতি জাগ্রত করে বলে সেগুলিকে বলা হয় ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্র। যখন ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়, তখন জীবদেহের সর্বত্র স্নায়ুতে ক্ষুধার অনুভূতি তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং খাদ্য গ্রহণের ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়ে সারা দেহে পরিতৃপ্তির অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে।

ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষার সময় বৈদ্যুতিক উপায়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্র ও ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্র দুটির যে কোনটিকে কৃত্রিম উপায়ে খুশীমত উত্তেজিত করা হয়। ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্রকে কৃত্রিম উপায়ে ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করে দেখা গেছে, ইঁদুরটি স্বাভাবিক অবস্থার

তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে আহার করে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই বৃহদাকৃতি লাভ করে। একইভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্রকে ক্রমাগত উদ্দীপ্ত করে দেখা গেছে, প্রচুর পরিমাণ আহার্য সামনে থাকা সত্ত্বেও শূন্যগর্ভ পাকস্থলী নিয়েও ইঁদুরটি আহারে বিস্ময়কর অনিচ্ছা প্রকাশ করে। শুধু তাই নয়, হাইপোথ্যালামাসের দু-পাশের ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্র যদি সাবধানে মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সূচ প্রবেশ করিয়ে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়ে ইঁদুরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ইঁদুরটি প্রায় সর্বক্ষণের জন্যে ক্ষুধার্ত হয়ে সর্বভুক্ হয়ে ওঠে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ওজনে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। একই ভাবে ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্র দুটি নষ্ট করে দিয়ে দেখা গেছে, প্রায় স্থায়ীভাবেই তার আহারে অনিচ্ছা দেখা যায়।

পরীক্ষা থেকে বেশ বোঝা যায়, ক্ষুধার অনুভূতি বা খাদ্যগ্রহণের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে উল্লিখিত দুটি কেন্দ্র থেকে প্রেরিত স্নায়বিক ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—তা হলো এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্র দুটির কোন্‌টি কখন কি কারণে উত্তেজিত হবে? সেটা নির্ভর করে রক্তের গ্লুকোজ-সমতার উপর। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি।

আমাদের আহার্যের অধিকাংশই কার্বোহাইড্রেট-সমৃদ্ধ এবং এই কার্বোহাইড্রেট পরিপাক-ক্রিয়ার মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে গ্লুকোজের সৃষ্টি করে। এজন্যে খাদ্যগ্রহণের পর রক্তের গ্লুকোজ বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির কেন্দ্রকে উদ্দীপ্ত করে। একই ভাবে— ক্রমাগত অনাহারের ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং পরিণামে ক্ষুধা-উত্তেজক কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হয়। বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন যে, রক্তের গ্লুকোজ-সমতাই ক্ষুধার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে; অর্থাৎ রক্তে গ্লুকোজের হ্রাস-বৃদ্ধি কেন্দ্র দুটিকে যথাযথভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

অপর একটি পরীক্ষায় গ্লুকোজের সঙ্গে সোনার এক বিষাক্ত যৌগ, যার রাসায়নিক নাম গোল্ড থায়োগ্লুকোজ, মিশিয়ে পরীক্ষাধীন প্রাণীকে খাইয়ে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্রের স্নায়ু-কোষগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। দেহের অন্যান্য কোষের তুলনায় এই কোষগুলির গ্লুকোজের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকায় কোষগুলি গ্লুকোজের সঙ্গে সোনার বিষাক্ত যৌগটিকেও গ্রহণ করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি কেন্দ্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার অনুভূতি সারা দেহের স্নায়ুতে জাগিয়ে তোলে।

ক্ষুধার অনুভূতির উৎস ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের গবেষণা এখনো চলছে। এমন দিন হয়তো সত্যই আসবে, যখন ক্ষুধা আর মানুষের তেমন কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করবে না। ক্ষুধার অনুভূতিটাই সে দিন মানুষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

পারদর্শিতার পরীক্ষা

রসায়নে তোমার পারদর্শিতা কেমন, তা বোঝবার জন্যে নীচে 5টি প্রশ্ন দেওয়া হলো। প্রতিটি প্রশ্নে 20 নম্বর আছে। এক-একটি প্রশ্নে যতগুলি ভাগ আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই সমান নম্বর। উত্তর দেবার জন্যে মোট সময় 6 মিনিট। এই সময়ের মধ্যে তুমি যত নম্বর পাবে, সেই অনুযায়ী রসায়নে তোমার পারদর্শিতা বুঝতে হবে।

নম্বর	পারদর্শিতা
80 থেকে 100	খুব বেশী
60 থেকে 79	বেশী
40 থেকে 59	চলনসই
20 থেকে 39	কম
0 থেকে 19	খুবই কম

1. নীচে ডান দিকে মৌলিক পদার্থের যে প্রতীকগুলি দেওয়া আছে, সেগুলির কোন্‌টি বাঁ দিকের কোন্ শূন্য স্থানে বসবে ?

ক)	B, C, N, O,—	In
খ)	Fe, Co, Ni,—, Zn	Au
গ)	Ag, Cd,—, Sn, Sb	F
ঘ)	—, Hg, Tl, Pb, Bi	Cu

2. যে দুটি পদার্থের সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া আছে, সে দুটির সম্পূর্ণ নাম ও সংকেত কি ?

ক) DDT

খ) TNT

3. নীচে বাঁ দিকে কয়েকটি পদার্থের নাম এবং ডান দিকে কয়েকটি সংকেত দেওয়া আছে। কোন্ পদার্থের সংকেত কোন্‌টি ?

ক)	গ্লুকোজ	C_2H_5OH
খ)	বোরাক্স	$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$
গ)	সাধারণ অ্যালাম	$Na_2B_4O_7,10H_2O$
ঘ)	অ্যাল্‌কোহল (ইথাইল)	$CH_3COOC_6H_4COOH$
ঙ)	অ্যাস্পিরিন	$C_6H_{12}O_6$

4. প্রয়োজনমত উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলির সমতা বিধান করো।

ক) $CaO + P_2O_5 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$

খ) $C_{12}H_{22}O_{11} + O_2 \rightarrow H_2O + CO_2$

গ) $KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Mn_2O_7 + H_2O$

ঘ) $FeCr_2O_4 + K_2CO_3 + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + K_2CrO_4 + CO_2$
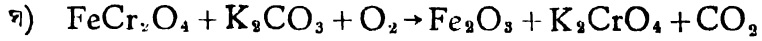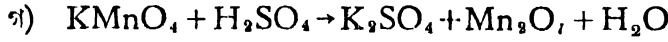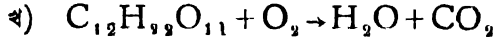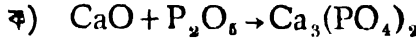
5. নীচে বাঁ দিকে কয়েকটি আকরিকের নাম এবং ডানদিকে কয়েকটি ধাতুর নাম দেওয়া আছে। কোন্ আকর থেকে কোন্ ধাতুটি নিষ্কাশন করা হয়?

ক) ক্যাল্‌কো-পাইরাইট	লোহা
খ) ক্যালামিন	ম্যাগ্‌নেসিয়াম
গ) ডোলোমাইট	দস্তা
ঘ) বক্সাইট	তামা
ঙ) হিমেটাইট	অ্যালুমিনিয়াম

(উত্তরের জন্যে 506নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

শব্দোত্তর তরঙ্গ

শব্দোত্তর তরঙ্গের আবিষ্কার ও তার অবদান এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। শব্দ সৃষ্টি করতে হলে শব্দ সৃষ্টিকারী উৎসের কম্পনের প্রয়োজন। কম্পাঙ্কের বিভিন্ন মানের জন্যে বিভিন্ন রকমের শব্দের সৃষ্টি হয়। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গ, যা মানুষের শ্রুতিগোচর নয়, তাকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic waves বা Supersonic waves)। এই কম্পাঙ্ক প্রতি সেকেণ্ডে 20,000-এর বেশী হলে ঐ শব্দ মানুষের কানে ধরা পড়ে না; অর্থাৎ মানুষের কানের পক্ষে শব্দ-তরঙ্গের শ্রুতিসীমা (Audibility limit) সেকেণ্ডে 20,000। সুতরাং সেকেণ্ডে 20,000-এর বেশী কম্পাঙ্কের শব্দই শব্দোত্তর তরঙ্গ।

বিশেষ প্রক্রিয়ায় কোয়ার্টজ্‌ কৃষ্ট্যালের দ্রুত স্পন্দন ঘটিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায়। তবে সাধারণভাবে কয়েক মিলিমিটার বাহুযুক্ত সুরশলাকার (Tuning fork) কম্পনেও শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। আধুনিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেকেণ্ডে 5×10^8 কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং শব্দোত্তর তরঙ্গের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো

$\lambda = \frac{v}{n} = \frac{33000}{5\times10^{8}}$ সেন্টিমিটার $=6{\cdot}6\times10^{-5}$ সেন্টিমিটার $=6600$ অ্যাংস্ট্রম, যা দৃশ্য আলোক রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সমান। শব্দোত্তর তরঙ্গের ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্যে একে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানা প্রয়োজনীয় কার্যে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

শব্দোত্তর তরঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের ন্যায় সরলরেখায় চলাচল করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই তরঙ্গ কাজে লাগিয়ে সমুদ্রে ডুবোজাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা হতো। তাছাড়া এই তরঙ্গের প্রতিফলনের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের তলদেশে পাহাড়ের অবস্থান কিম্বা সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সরলরেখায় যায় বলে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে এই শব্দ-তরঙ্গ ছেড়ে দিলে সোজা চলে যাবে এবং কোন প্রতিবন্ধকের গায়ে ধাক্কা লাগলে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসবে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ জীবাণু ধ্বংসের কাজেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জীবাণুর দেহে এই তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এই কারণে বিভিন্ন রোগের জীবাণু ধ্বংস করবার জন্যে এই তরঙ্গের ব্যবহার করা হয়। বহুবিধ পানীয়, যথা—জল, দুধ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত (Sterilize) করবার জন্যে এর প্রয়োগ করা হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। কয়েকটি পদার্থ, যেগুলি জলে দ্রবণীয় নয়, এই তরঙ্গের সুষ্ঠু প্রয়োগে সেগুলিকে জলে দ্রবণীয় করা যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয়। কর্পূর জলে দ্রবণীয় নয়। ফলে মানবদেহে এর ইনজেক্সন দেওয়া যায় না; কিন্তু অবদ্রব অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে মানবদেহে এর ইনজেক্সন দিতে গেলে একে দ্রবণীয় করা প্রয়োজন। এই কার্যে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেক ওষুধ প্রস্তুতিতে শব্দোত্তর তরঙ্গ খুবই উপযোগী।

মৎস্য-শিকারে আজকাল শব্দোত্তর তরঙ্গের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, মাছের পেটের মধ্যে যে বায়ুপূর্ণ থলি থাকে, তা শব্দোত্তর তরঙ্গের উত্তম প্রতিফলক। কাজেই প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে বোঝা যায়, মাছের ঝাঁক কত গভীরে আছে এবং কোন্ দিকে যাচ্ছে।

সম্প্রতি কাপড়-জামা ময়লামুক্ত করতে শব্দোত্তর তরঙ্গকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই তরঙ্গের সাহায্যে অতি অল্প সময়ে কাপড়-জামা সহজে ময়লামুক্ত করা যায়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে জল ও তেল বা জল ও পারদ মেশানো যায়, যা অবদ্রব নামে পরিচিত। এই তরঙ্গ কোন তরলে চাপের বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে, ফলে দুটি অদ্রবণীয় পদার্থকে দ্রবণীয় করতে পারে। কাজেই তেলের সূক্ষ্ম কণিকাগুলি জলের কণিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যায়। এভাবে জলের সঙ্গে প্রোটিন ও ল্যাক্টোজ সমন্বিত স্নেহজাতীয় পদার্থের স্বাভাবিক অবদ্রব হলো দুধ।

কোন ধাতুর গঠনে কোন খুঁৎ বা ফাটল থাকলে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে তা নির্ণয় করা যায়। এতদ্ব্যতীত এর সাহায্যে পদার্থের ভৌত ধর্মও নির্ণয় করা সম্ভব এবং কোন পদার্থকে পরিষ্কার করা এবং কঠিন পদার্থে ছিদ্র করা যায়।

সমুদ্রজলের মধ্য দিয়ে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে সমুদ্রের নীচে বেতার যোগাযোগ সম্ভব হয় না। কিন্তু ডুবোজাহাজ বা ডুবুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করবার প্রয়োজন আছে। এই কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে পলিমারের অণুকে (Polymerized molecule) মৌলিক অংশসমূহে বিভক্ত করা যায়। এই তরঙ্গের সাহায্যে শ্বেতসারের শৃঙ্খল কয়েক টুক্রায় বিভক্ত হয় এবং ধোঁয়াকে ঘনীভূত করা যায়। ফলে ধোঁয়ার বড় বড় কণা আর বাতাসে ভাসতে পারে না। সুতরাং এই তরঙ্গের সাহায্যে ধোঁয়া ও ধূলিকণা থেকে বাতাসকে মুক্ত করা যায়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে তরলে নিমজ্জিত দণ্ডকে উত্তপ্ত করা যায়। এই তরঙ্গ কোন তড়িৎ-বিশ্লেষক কোষের (Electrolytic cell) মধ্য দিয়ে পাঠালে ধাতুর সূক্ষ্ম কণা ক্যাথোডে জমা হবার পরিবর্তে তরলে ভাসতে থাকবে এবং ক্রমশঃ কণাগুলি বড় হতে থাকবে ও পাত্রের তলায় সঞ্চিত হবে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে ধাতুর কলয়েড দ্রবণও প্রস্তুত করা যাবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, শব্দোত্তর তরঙ্গ বিজ্ঞান-জগতে এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়, চিকিৎসাশাস্ত্রে, শিল্পে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় কাজে শব্দোত্তর তরঙ্গের বিস্ময়কর অবদানের কথা অনস্বীকার্য।

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. ক) F

   খ) Cu

   গ) In

   ঘ) Au

[ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী কয়েকটি মৌলিক পদার্থের প্রতীক প্রত্যেক সারিতে পর পর সাজানো আছে।]

2. (ক) ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন : $(ClC_6H_4)_2\ CHCCl_3$

   (খ) ট্রাইনাইট্রোটলুইন : $C_6H\ (CH_3)(NO_2)_3$

3. (ক) গ্লুকোজ : $C_6H_{12}O_6$
   (খ) বোরাক্স : $Na_2B_4O_7, 10H_2O$
   (গ) সাধারণ অ্যালাম : $K SO_4, Al_2(SO_4)_3, 24H_2O$
   (ঘ) অ্যাল্‌কোহল (ইথাইল) C_2H_5OH
   (ঙ) অ্যাস্‌পিরিন : $CH_3COOC_6H_4COOH$

4. (ক) $3CaO + P_2O_5 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2$
   (খ) $C_{12}H_{22}O_{11} + 12O_2 \rightarrow 11H_2O + 12CO_2$
   (গ) $2 KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Mn_2O_7 + H_2O$
   (ঘ) $4 FeCr_2O_4 + 8K_2CO_3 + 7O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8K_2CrO_4 + 8CO_2$

5. (ক) ক্যাল্‌কো-পাইরাইট—তামা
   [ক্যাল্‌কো-পাইরাইট হচ্ছে $CuFeS_2$]
   (খ) ক্যালামিন—দস্তা
   [ক্যালামিন হচ্ছে $ZnCO_3$]
   (গ) ডোলোমাইট—ম্যাগ্‌নেসিয়াম
   [ডোলোমাইট হচ্ছে $MgCO_3, CaCO_3$]
   (ঘ) বক্সাইট—অ্যালুমিনিয়াম
   [বক্সাইট হলো Al_2O_3, H_2O এবং $Al_2O_3, 3H_2O$ এর মিশ্রণ]
   (ঙ) হিমেটাইট—লোহা
   [হিমেটাইট হচ্ছে Fe_2O_3]

হাইড্রোজেন থেকে ধাতু

ধাতু থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা খুবই সহজ। ধাতুর ভিতর সামান্য একটু অ্যাসিড ঢাললেই তাথেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন থেকে ধাতু তৈরির কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগে। কারণ সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেন একটি গ্যাসীয় পদার্থ এবং এই গ্যাসকে কঠিন ধাতুতে পরিণত করবার কাজটিও নেহাৎ সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। তথাপি রাশিয়ার হাই প্রেসার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে চলেছেন।

মৌলিক পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেনের পরমাণুই সবচেয়ে সরল। এর পরমাণুর মধ্যে আছে মাত্র একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন। এই দুই পরমাণুর সংযোগে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়। হাইড্রোজেন গ্যাসকে খুব নিম্ন তাপমাত্রায় অর্থাৎ -253° সেন্টিগ্রেডে তরল এবং -259° সেন্টিগ্রেডে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ কঠিনে পরিণত করা যায়। এই

অবস্থায় ইলেকট্র'নের সঙ্গে পরমাণুর সুদৃঢ় যোগ থাকবার ফলে এই কঠিন হাইড্রোজেন বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে না। হাই প্রেসার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য হলো, সাধারণ উষ্ণতায় কেবলমাত্র চাপ দিয়ে হাইড্রোজেনকে কঠিন ধাতুতে পরিণত করা—যে ধাতু সুন্দর ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারবে। এর জন্যে প্রায় তুই মিলিয়ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দরকার। রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এক মিলিয়ন বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই ধরণের চাপ উৎপন্ন করেছেন 'সক্ ওয়েভ' পদ্ধতিতে। আশা করা যায়, এই উপায়ে অল্প দিনের মধ্যেই প্রচুর হাইড্রোজেন তৈরি করা যাবে। হাইড্রোজেন ধাতু তৈরি হলে ডায়নামো এবং মোটরের আকার অনেক ছোট করা যাবে এবং ট্রান্সমিসনে শক্তি অপচয়ও অনেকখানি রোধ করা সম্ভব হবে।

পার্থসারথি চক্রবর্তী*

* রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

তাপ সঞ্চালন

গ্রীষ্মকালে বরফের খুব আদর। দোকানে বরফ কিনতে গেলেই দেখা যায়, দোকানদার কাঠের গুঁড়া সরিয়ে বরফ কেটে দেয়। কিন্তু তখনই একটা প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে, বরফ কাঠের গুঁড়া দিয়ে ঢাকা থাকে কেন? গরম কাপড় পশমী কাপড়ে তৈরি হয় কেন? চায়ের কাপ সাদা মসৃণ হয় কেন? তাপ সঞ্চালন কাকে বলে—জানা থাকলেই আমরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবো।

তাপ সঞ্চালন কথাটি তুটি কথার সমন্বয়—তাপ ও সঞ্চালন। এখন তাপ কাকে বলে, সেই প্রশ্ন আলোচনা করা যাক। একটা ঠাণ্ডা জলের পাত্রে কিছু গরম জল ঢাললে দেখা যায়, ঠাণ্ডা জল গরম হয়ে ওঠে। আবার একটা গরম জলের পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল ঢাললে গরম জলের তাপমাত্রা কমে যায়। এখন আমরা বলতে পারি—যখন ঠাণ্ডা জলে গরম জল ঢালা হয়, তখন ঠাণ্ডা জল গরম জল থেকে তাপ নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার যখন গরম জলে ঠাণ্ডা জল ঢালা হয়, তখন গরম জল তাপ বর্জন করে ঠাণ্ডা হয়। সুতরাং তাপের সংজ্ঞা আমরা এইভাবে দেব—তাপ এমন একটা শক্তি, যা গ্রহণে বস্তু উত্তপ্ত হয় এবং যা বর্জনে বস্তু শীতল হয়। সঞ্চালন কথাটির অর্থ গমন। তাহলে তাপ সঞ্চালন কথাটির পুরা অর্থ হলো তাপের গমন।

তাপ তিন প্রকারে উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানে গমন করতে পারে। যেমন—(1) পরিবহন (Conduction), (2) পরিচলন (Convection) এবং (3) বিকিরণ (Radiation)। এইবার এক একটি বিষয় আলোচনা করা যাক।

(1) পরিবহন—একটি লোহার তারের এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত আগুনের ভিতর রাখলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, হাতে ধরা প্রান্ত বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কেন এমন হলো? আগুনের সংস্পর্শে যে সব বস্তুকণা রয়েছে, আগুন সেগুলিকে প্রথমে তাপ-শক্তি দেয়। এই উত্তপ্ত বস্তুকণাগুলি সেই তাপ পরবর্তী শীতল বস্তুকণাকে দেয়। এই কণাগুলি আবার পরবর্তী কণাগুলিকে তাপ দেয়। এইভাবে লোহার তারের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তাপ পৌঁছায়। কিন্তু বস্তুকণাগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। তাহলে পরিবহন কাকে বলে? যে প্রণালীতে একই পদার্থের উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানে অথবা উষ্ণ পদার্থ থেকে তৎসংলগ্ন শীতলতর পদার্থে তাপ সঞ্চারিত হয়, কিন্তু পদার্থের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে না, সেই প্রণালীকে উত্তাপের পরিবহন বলা হয়।

(2) পরিচলন :—একটি ফ্লাস্কের জলের ভিতর একটু নীল রং ফেলে দেওয়া হলো। ফ্লাস্কের তলা ধীরে ধীরে গরম করা হলো। আগুনের নিকট ফ্লাস্কের তলায় রঙীন জল প্রথমে গরম, প্রসারিত ও হাল্কা হয়ে ফ্লাস্কের মাঝখান দিয়ে উপরে ওঠে। উপরের শীতল ভারী রং-শূন্য জল ফ্লাস্কের গা বেয়ে তলার শূন্য স্থানের দিকে আসে। অতএব ফ্লাস্কের ভিতর দুটি জলস্রোতের সৃষ্টি হয়—একটি ঊর্ধ্বমুখী এবং একটি নিম্নমুখী। সমস্ত জল যতক্ষণ একই উষ্ণতায় না আসে, ততক্ষণ এরূপ চলে। এখানে জলের অণুগুলি গরম হয়ে অন্যত্র সরে গিয়ে তাপ পরিচালনা করে। তাহলে পরিচলনের সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি—যে প্রণালীতে পদার্থের অণুগুলিই উষ্ণতর স্থান থেকে শীতলতর স্থানে গমন করে তাপ নিয়ে যায়, সেই প্রণালীকে পরিচলন বলে।

(3) বিকিরণ—সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে আসে। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের মাঝে রয়েছে শূন্য মাধ্যম। তবে কি করে সূর্য থেকে তাপ পৃথিবীতে আসে? এই তাপ পরিবহন বা পরিচলন, কোন প্রণালীতেই আসে না। এই তাপ আসে বিকিরণ প্রণালীতে। তাহলে বিকিরণ প্রণালীর সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি—যে প্রণালীতে তাপ কোন মাধ্যমের সাহায্য না নিয়ে বা মাধ্যম থাকলে মাধ্যমকে উত্তপ্ত না করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে, সেই প্রণালীকে বিকিরণ বলে।

পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রণালীর পার্থক্য :—

(1) পরিবহন ও পরিচলন প্রণালীতে তাপ কোন জড় মাধ্যমেরই মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। বিকিরণে তাপ কোন মাধ্যমের সাহায্য না নিয়েই কেবল শূন্যের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। (2) পরিবহন ও পরিচলনে মাধ্যমের উষ্ণতার পরিবর্তন হয়, কিন্তু বিকিরণে মাধ্যম থাকলেও মাধ্যমের উষ্ণতার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। (3) পরিবহনে মাধ্যমের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে না। পরিচলনে মাধ্যমের অণুগুলি স্থান পরিবর্তন করে। বিকিরণে তরঙ্গ গতির উৎপত্তি হয়। (4) পরিবহন ও পরিচলন মন্থর প্রণালী,

বিকিরণ খুব দ্রুত প্রণালী। (5) পরিবহন ও পরিচলন প্রণালীতে তাপশক্তি বক্র বা সরল পথে গমন করে। বিকিরণ প্রণালীতে তাপশক্তি কেবল সরল পথে গমন করে।

এবার আসা যাক প্রথমোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে। বরফ কাঠের গুঁড়া দিয়ে ঢাকা থাকে কেন? বরফ কাঠের গুঁড়া দিয়ে ঢাকা থাকে, তার কারণ কাঠ তাপের কু-পরিবাহী। তাই বাইরের তাপ কাঠ ভেদ করে বরফে যেতে পারে না। ফলে বরফ গলে না। গরম কাপড় পশমী কাপড়ে তৈরি হয় কেন? কারণ পশমের আঁশ কুঞ্চিত বলে পশমের পোশাকের মধ্যে কিছুটা বায়ু আবদ্ধ থাকে এবং বায়ুর তাপ পরিবহনের ক্ষমতা কম হওয়ায় দেহের তাপ এই পোশাকের বাইরে সহজে আসতে পারে না; সে জন্যে শরীর বেশ গরম থাকে। চায়ের কাপ সাদা ও মসৃণ হয় কেন? বস্তুর পৃষ্ঠদেশ যত বেশী মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়, তত বেশী তাপ প্রতিফলিত করে এবং তত কম তাপ শোষণ করে। তাই সাদা ও মসৃণ কাপে চা রাখলে কাপের মসৃণ পৃষ্ঠ খুব কম তাপ চা থেকে গ্রহণ করে। ফলে চা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

কাঞ্চনপ্রকাশ দত্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. সৌরব্যাটারী কি?

প্রদীপ্ত সরকার—সাহেবগঞ্জ।

প্রশ্ন 2. ঘর্ম কি?

পুলক দত্ত; সৌমেন সাধু—মধুপুর।

উত্তর 1. যে যন্ত্রের মাধ্যমে সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়—তাকে বলা হয় সৌরব্যাটারী। সাধারণতঃ এতে খুব সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক মিশ্রিত সিলিকনের কেলাস থাকে। এই জাতীয় সিলিকন কেলাসে ইলেকট্রনের সংখ্যা খাঁটি সিলিকন কেলাসের তুলনায় বেশী। এর কারণ, সিলিকন ও আর্সেনিকের যোজ্যতা যথাক্রমে 4 ও 5। ইলেকট্রনের সংখ্যার আধিক্যের জন্যে আর্সেনিক মিশ্রিত সিলিকনকে বলা হয় n-টাইপ। এই n-টাইপ সিলিকন কেলাস থেকে তৈরি কোন পাতের একপৃষ্ঠে যদি বোরনের প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে বোরনের যোজ্যতা 3 হবার দরুণ ঐ পৃষ্ঠে ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায় এবং কিছু ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়—এদের বলা হয় 'হোল'। এই বোরনের প্রলেপযুক্ত সিলিকনকে বলা হয় p-টাইপ। কাজেই পাতটির একদিকে p-টাইপ ও অন্যদিকে n-টাইপ অর্থাৎ সমগ্র পাতটি একটি p-n জংশনে পরিণত হয়, যার p অঞ্চলে কম সংখ্যক ইলেকট্রন ও অধিক সংখ্যক হোল এবং n-অঞ্চলে থাকে অধিক সংখ্যক ইলেকট্রন।

সূর্যরশ্মি p-n জংশনের উপর এসে পড়লে ঐ অঞ্চলে ইলেকট্রন ও হোল তৈরি হয়। স্বাভাবিক কারণে হোলগুলি n-অঞ্চলের দিকে ও ইলেকট্রনগুলি p-অঞ্চলের দিকে যায়। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধান ও হোল ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হওয়ায় p-অঞ্চলে ধনাত্মক ও n-অঞ্চলে ঋণাত্মক তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়। ঐ দুই অঞ্চলের মধ্যে পরিবাহী তার জুড়ে দিলে আমরা তড়িৎ-শক্তি পেতে পারি।

অধিক সংখ্যক পাত্‌ ব্যবহার করে আমরা অধিক বিদ্যুৎশক্তি পেতে পারি। মহাকাশ-যান ও কৃত্রিম উপগ্রহে এই সৌর ব্যাটারীর ব্যবহার খুবই সুবিদিত।

উত্তর 2. যে কোন মানুষের শরীর থেকে ঘর্ম নিঃসরণ হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘর্ম নিঃসরণের কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ঘর্ম নিঃসরণের মাধ্যমে আমাদের শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ, জলীয় পদার্থ ও অম্লত্বের মাত্রার সমতা রক্ষা, দেহত্বকের সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্য সংঘটিত হয়।

শরীর ত্বকের নীচে অবস্থিত স্বেদগ্রন্থি থেকে এই ঘর্ম নিঃসরিত হয়ে থাকে। ত্বকের মধ্যে রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে স্বেদগ্রন্থির কেন্দ্র উত্তেজিত হয় ও ঘর্ম নিঃসরিত হয়। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে ঘর্ম নিঃসরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। বাইরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, শারীরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মানসিক উত্তেজনা, শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে স্বেদ-গ্রন্থির উত্তেজনা বাড়ে। মানুষের দেহ থেকে দৈনিক প্রায় 1 থেকে 7/8 লিটার ঘর্ম নির্গত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক পরিমাণে ঘর্ম নিঃসরিত হয়।

ঘর্ম লবণাক্ত ও অম্লজাতীয় পদার্থ। উপাদানের দিক থেকে বিচার করলে এর শতকরা প্রায় 99 ভাগ জল ও বাকী অংশ ইউরিয়া, কিছু শর্করজাতীয় পদার্থ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, সালফেট, ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড, সোডিয়াম ফস্‌ফেট প্রভৃতি জৈব-অজৈব এবং কিছু তৈলাক্ত পদার্থ।

শ্যামসুন্দর দে*

ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

বিবিধ

একাদশ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 14ই জুলাই (1972) অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত একাদশ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা স্লাইডসহযোগে প্রদান করেন ডক্টর বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মস্তিষ্ক ও মন'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বার্ষিক লোকরঞ্জক বক্তৃতার জন্যে বিজ্ঞান পরিষদে অর্থ দান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য অধ্যাপক শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরলোকগত পিতা শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর একটি লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার জন্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে চার হাজার টাকা দান করে বিজ্ঞান পরিষদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারে'র উদ্যোগে আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগারে'র উদ্যোগে 'ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ' সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়েছিল। অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত—এই তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে নিয়ে প্রতিযোগিতার বিচারক মণ্ডলী গঠিত হয়। সংযোগকর্তা ছিলেন বিজ্ঞান পরিষদের 'গ্রন্থাগার ও পাঠাগার উপ-সমিতি'র আহ্বায়ক ডক্টর ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত।

বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রতিযোগিগণ পুরস্কৃত হন।

1. শ্রীসুভাষচন্দ্র পালিত ··· প্রথম পুরস্কার (100 টাকা)
2. শ্রীনারায়ণচন্দ্র রাণা··· দ্বিতীয় পুরস্কার (75 টাকা)
3. শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল ··· তৃতীয় পুরস্কার (50 টাকা)
4. শ্রীত্রিদিবরঞ্জন মিত্র··· সান্ত্বনা পুরস্কার (25 টাকা)
5. শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস··· সান্ত্বনা পুরস্কার (25 টাকা)

গত 29শে জুলাই '72 তারিখে বিজ্ঞান পরিষদের চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন।

ভ্রম সংশোধন—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গত জুলাই সংখ্যায় 'অঙ্কের ম্যাজিক' শীর্ষক রচনায় প্রথম অংশে যা বলা হয়েছে, তা সাধারণভাবে সঠিক হলেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে (46/1বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-19) ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটি হলো যখন বিয়োগফলের তিনটি অঙ্কই একেবারে শূন্য হয় (অর্থাৎ নির্বাচিত সংখ্যার প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক যখন একই)। গণিতে এই ধরণের ঘটনাকে 'trivial case' বলা হয় এবং সাধারণতঃ তা আলোচনার যোগ্য বলে মনে করা হয় না। তবে এখানে বিশেষ ক্ষেত্রটিকে বাদ দেবার জন্যে মূল রচনার (1) চিহ্নিত অংশের কেবল প্রথম বাক্যটির সঙ্গে কয়েকটি কথা সংযোজন করা দরকার, যাতে সংশোধিত বাক্যটি হবে—

"তুমি তোমার এক বন্ধুকে তোমাকে না দেখিয়ে তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা লিখতে বল—সংখ্যাটির প্রান্তিক দুটি অঙ্ক যেন একই না হয়।"

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'পূর্ণিমা'—ভারতের সর্বপ্রথম দ্রুতগতিসম্পন্ন পরমাণু-চুল্লী
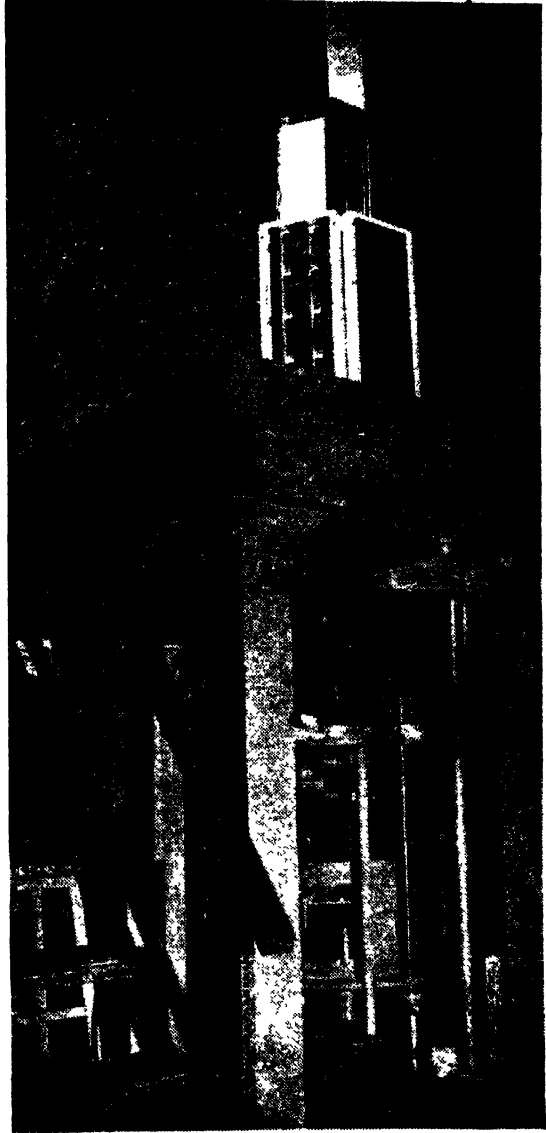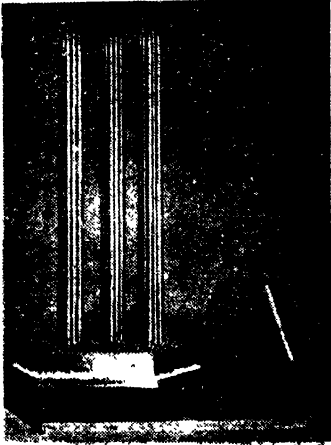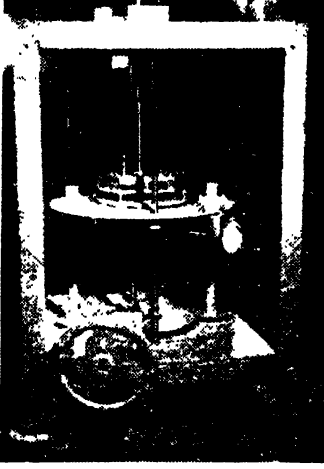
ট্রম্বেস্থিত পরমাণু-চুল্লী পরিবারের এই নূতন সদস্যটি সম্প্রতি সক্রিয় হয়েছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে এর পার্থক্য—এটি দ্রুতগতিসম্পন্ন : 100 কিলো-ইলেকট্রন ভোল্টেরও বেশী শক্তিশালী দ্রুত-গতির নিউট্রন দ্বারা অধিকাংশ শৃঙ্খল-বিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জ্বালানী প্রস্তুতকারক দ্রুতগতিসম্পন্ন পরমাণু-চুল্লী (Fast Breeder Reactor) সম্পর্কিত প্রাথমিক গবেষণাদির উদ্দেশ্যে এটি নির্মিত হয়েছে।

ছবিটির ডান দিকে 'পূর্ণিমার' সম্পূর্ণ অংশ দেখা যাচ্ছে। বাম দিকের নীচে—নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত নির্মিত 11 মিলিমিটার ব্যাসের জ্বালানী কীলকগুলি. একদিকে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ; কীলকগুলির মধ্যে রয়েছে প্লুটোনিয়াম অক্সাইড জ্বালানী। বাম দিকের উপরে—চুল্লীর অন্তরতম পাত্রে (Core) জ্বালানী কীলকগুলি প্রবেশ করাবার ব্যবস্থা।

('নিউক্লিয়ার ইণ্ডিয়া', 10/10-11 থেকে ছবিটি নেওয়া হয়েছে।)

রজত জয়ন্তী সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ   সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1972   নবম-দশম সংখ্যা

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে

মাতৃভাষা শিক্ষা বিস্তারের সর্বোত্তম সহায়—এই কথা বহু মনীষী বহুবার বলিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সহজে স্থান করিয়া লইতে পারে নাই। ইংরেজী আমাদের মজ্জাগত হইয়াছিল, তাই অতীতে যখনই উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে বাংলা ভাষার কথা উঠিত—তখনই একদল মহা কোলাহল সুরু করিয়া দিতেন। তাঁহাদের আপত্তি প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সামর্থ্য বিষয়ে। আশ্চর্যের কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেদীপ্যমান প্রতিভার আলোতেও ইঁহাদের চক্ষু উন্মিলীত হয় নাই।

বাংলা ভাষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে মুখ্যতঃ স্যার আশুতোষের অনমনীয় সঙ্কল্পের ফলে। বাংলা ভাষায় স্নাতকোত্তর পরীক্ষা আজ আর কাহারও বিস্ময় উদ্রেক করে না। এই ভাষা আজ আর অবজ্ঞার বস্তু নহে। সাহিত্য-সমৃদ্ধি আর প্রসাদ গুণে আজ ইহা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত। বর্তমান যুগে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, এই ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞান-চর্চা সম্ভব। বর্তমানে এই কথাও বলা যায় যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার ঐতিহ্য আজ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত এই বিষয়েও অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন। কিন্তু বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত হওয়া সত্ত্বেও—পঠন-পাঠনাদি এখনও সর্বস্তরে ইহার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। ভাষার দৈন্যের প্রশ্ন আজ অবান্তর। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব বিশ্লেষণের ক্ষমতায় বাংলা ভাষার সামর্থ্য বর্তমানে সংশয়াতীত। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একদা যাঁহারা বাংলা ভাষাকে প্রবেশাধিকার দিতে ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদেরই পুরাতন অসার যুক্তি কেহ কেহ উদ্‌গীরণ করিয়া প্রশ্ন করিতেন—বাংলা ভাষায় মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা কি সম্ভব? পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিতবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারিভাষিক শব্দগুলি যতদিন না বাংলায় ভাষান্তরিত হইতেছে, ততদিন অন্ততঃ এই বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই সমীচীন নহে কি? ইঁহাদের সংশয় যে নিতান্তই অমূলক—তাহা তো বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনার পথিকৃৎদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতেই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। বঙ্গ-ভাষানুরাগী বহু চিন্তাশীল, বহু

মনীষী বহুবার এই সংশয় অপনোদন করিয়া স্ব স্ব অভিমত উপস্থাপিত করিয়াছেন; তথাপি সংশয়বাদীদের সংশয় দূরীভূত হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চা ও প্রচারের জন্য একটি সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাহারই সার্থক রূপায়ণ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। 1948 সালের 25শে জানুয়ারী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে অবস্থিত রামমোহন লাইব্রেরীর বক্তৃতাকক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় এবং ঐ মাসেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংশয়বাদীরা তখন বিদ্রূপের বাঁকা হাসি হাসিয়াছিলেন, হয়তো ভাবিয়াছিলেন—কয়েকটি বাংলা বিজ্ঞান পত্রিকা তো ইহার পূর্বে দেখিলাম—স্থায়ী হইল না; কেহ বা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, কেহ বা কয়েক বৎসর টিকিলেও শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুতরাং ইঁহাদের এই নতুন প্রচেষ্টার পরিণতিও অন্য আর কি হইতে পারে?

সংশয়বাদীদের সমুদয় জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এক্ষণে পঞ্চবিংশতিতম, তথা রজত জয়ন্তী বর্ষ অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার ইহা অপেক্ষা প্রবলতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সঙ্কল্প যদি আন্তরিক হয়—অকৃত্রিম আগ্রহ ও অনলস উদ্যমে সিদ্ধি আসিবেই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করেন—মাতৃভাষা, তথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে বঙ্গ ভাষাভাষীদের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার সম্ভব এবং বাংলাভাষী জনসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞান শিক্ষার ইহাই সহজতম মাধ্যম। বিগত চব্বিশ বৎসর যাবৎ দুইটি প্রধান কর্তব্য সম্পাদনে আমরা নিরলস চেষ্টা করিয়া আসিতেছি—একদিকে কুশলী বিজ্ঞান লেখকের সন্ধান, অন্যদিকে শিক্ষার মান নির্বিশেষে পাঠকমণ্ডলীর সম্প্রসারণ। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, গবেষক মাত্রেই বাংলা ভাষায় কুশলী লেখক নাও হইতে পারেন, অথচ তাঁহাদের গবেষণালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বক্তব্য বাংলা ভাষায় প্রকাশের দীর্ঘ অনভ্যাসজনিত জড়তা বা সঙ্কোচ তাঁহারা সকলেই হয়তো প্রথম চেষ্টাতে অতিক্রম করিতে পারেন না; 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এই বিষয়ে সর্বদাই তাঁহাদের প্রতি সকল প্রকার উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। অনাবশ্যক জটিলতা বর্জন করিয়া বক্তব্য বিষয় যাহাতে স্বল্প শিক্ষিত, কি উচ্চ শিক্ষিত—সকল পাঠকই বুঝিতে পারেন এবং ঐ বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হন—তাহার প্রতিও আমরা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। লোকরঞ্জক অথচ তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধাদি কিভাবে আরও আকর্ষণীয় করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে—তাহাও আমাদের সতত চিন্তার বিষয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'কে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিজ্ঞান পত্রিকায় পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের নিকট হইতে সুচিন্তিত মতামত ও সক্রিয় সহযোগিতা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

শতাব্দীর একপাদ অতিক্রান্ত প্রায়। পঁচিশ বৎসর মহাকালের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র হইলেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকার ইতিহাসে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ইহা এক অভূতপূর্ব সাফল্য বলা যাইতে পারে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র বর্তমান রজত জয়ন্তী সংখ্যা এই সাফল্যেরই স্মারক। যাঁহাদের অনুপ্রেরণায়, আনুকূল্যে, পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আন্তরিক সহযোগিতায় এই সাফল্য অর্জিত হইয়াছে—আজ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র রজত জয়ন্তী বর্ষে তাঁহাদিগকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বর্তমান রজত জয়ন্তী সংখ্যা বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকমণ্ডলীর পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী*

আজ 25 বছর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলাভাষীদের সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং যথাসময়ে এই প্রতিষ্ঠানের একটা প্রামাণিক ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হবে। প্রামাণিক ইতিহাসের উপাদান প্রকাশিত তথ্য থেকেই গ্রহণ করা যাবে, কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না, যদি তার জন্মকথা আমাদের অজানা থেকে যায়। এর স্বপক্ষে কবির ভাষায় বলা যায় "আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে; যেমন—সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে বিকেল বেলায় সল্‌তে পাকানো"। এই জন্মকাহিনী আমি না লিখলে হয়তো অপ্রকাশিত থেকে যাবে। অথচ আমার মনে হয়, পরিষদের আদর্শকে বুঝতে হলে এই মুহূর্তে বিশেষ করে আমাদের তা জানবার প্রয়োজন আছে।

1946 সাল—চারদিকে হিংসা, দ্বেষ ও প্রতিশোধের নিঃশ্বাস বইছে। অভাবনীয় ঘটনা ঘটছে। দ্রুতবেগে প্রবাহিত ঘটনাক্রমকে কেউই রোধ করতে পারছে না। ঋষির বাণী বা কবির ক্রন্দনও শোনা যাচ্ছে না। কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে না, এর পরিণাম কোথায়? ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে, সবাই ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন দেখছে। ভাবছে এই অপ্রত্যাশিত এবং অহেতুক রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা যেন স্বাধীনতা পাবার দাম—প্রসববেদনার মতই অলঙ্ঘনীয়। তাই সব সত্ত্বেও চতুর্দিকে আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছে, হয়তো এবার এই উপমহাদেশে শান্তি আসবে; ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান নতুন ও সুষ্ঠু ইতিহাস গড়ে তুলবে এই স্বাধীন উপমহাদেশের। 1905 সালের বঙ্গ বিচ্ছেদে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁরা ভারত বিচ্ছেদের শোকে মর্মাহত। নবীনেরা ভাবছে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যে স্থানে এসে পড়েছে, তাতে হয়তো এর চেয়ে আর কোন সুষ্ঠু সমাধান নেই এবং এটা এমন কিছু ভয়াবহ হবে না, যদি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। কারণ ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্রের উত্থান-পতন হয়েছে, বেশীর ভাগ সময়েই এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, কিন্তু কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক থেকে সর্বদাই ভারতবর্ষ এক ছিল এবং এখানেই ভারতীয় সভ্যতার মূল ও শক্তি। কূটনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ থেকে অনেকেরই আশঙ্কা হয়েছিল যে, পাকিস্তান হয়তো ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির মূলচ্ছেদ করবে। ব্যক্তিগত-ভাবে আমার মনে হয়েছিল—সেটাই হবে ভারত বিভাগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। 1971 সালের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই আশঙ্কাও অমূলক। এই উপমহাদেশের জনসাধারণ তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের বন্ধন কাটাতে চায় না এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক সুস্থ মনোভাবের সৃষ্টি করতে পারলে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের অধিবাসীরা হয়তো আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তা হলেই দেশে প্রকৃত শান্তি আসবে।

* Loyola College, Montreal,
Quebec, Canada

স্বাধীন দেশের এই নতুন পরিবেশে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতির ভার নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকেই মনে করতেন যে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সার-ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তবে অনেক কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে; শুধু প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে আবর্জনাগুলিকে স্থায়ী করলে চলবে না। দেশকে গড়ে তুলতে হলে ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং দেশের সময়কালীন প্রয়োজনীয়-তার কথা মনে রেখে আমাদের কার্যকরী কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। বিদেশ থেকে আমাদের অনেক কিছুই গ্রহণ করতে হবে, অথচ তাদের ভুলচুকগুলির দিকে যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। বর্তমান বিশ্বসভ্যতার বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় উপাদান দেশোপযোগী করে আয়ত্ত করতে হবে এবং অনিষ্টকর উপাদান বর্জন করতে হবে। ভারতবর্ষের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে শিল্পোত্তর সভ্যতার আদর্শের প্রকৃত মিলনেই সম্ভবতঃ মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সুতরাং প্রধান সমস্যা এই যে, আমাদের কিভাবে এগুতে হবে, যাতে আমাদের আদর্শের রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে, তা ঠিক করা। কাগজকলমে অনেক ভাল 'প্ল্যান' আমাদের দেশে তৈরি হয়ে থাকে, অথচ কদাচিৎ তা কার্যকরী হয়। এর প্রধান কারণ আমাদের জনসাধারণের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী। দেশকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের সবাইকে নূতনভাবে ভাবতে হবে—একটা নতুন 'রেনেসাঁ' আনতে হবে, যেমন এসেছিল বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। 1947 সালে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের। আমরা অনেকেই উপলব্ধি করেছিলাম যে, এই সময় সবচেয়ে বড় কাজ দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। স্বভাবতঃই এই কাজের ভার, পরিকল্পনা ও তাকে রূপ দেবার ভার প্রধানতঃ বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের।

এই আবহাওয়ার ভিতর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের জন্ম। 1947 সালের অক্টোবর মাস। জলপাইগুড়িতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মিলনের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আমরা অনেকেই তাঁর সঙ্গে জলপাইগুড়িতে যাই এবং কি ভাবে শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারেন, কি উপায়ে দেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ছাত্র ও শিক্ষকদের দ্বারা সংগ্রহ করা যায়, এই নিয়ে ভাবছি। কলকাতায় ফিরে এসে অধ্যাপক বসুর ঘরে এ নিয়ে ঘরোয়া সেমিনার হয় এবং অনেক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ মাঝে মাঝে যোগদান করে আমাদের কাছে তাঁদের মতামত জ্ঞাপন করতেন। ইতিমধ্যে একদিন অধ্যাপক বসু আমাকে ডেকে বললেন যে, ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে যে মাসিক পত্রিকা তাঁর তত্ত্বাবধানে বহুদিন যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল, তা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। তিনি জানতে চাইলেন যে, আমরা এই পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি কিনা। এর উত্তরে আমি নিবেদন করি যে, শুধু পত্রিকা প্রকাশ করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। আমাদের প্রয়োজন—একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের, যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিটিউশন বা ফরাসী অ্যাকাডেমীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। অবশ্য এই বিরাট পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তবুও আমরা একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি এই আদর্শকে সামনে রেখে এবং আমার আশা এই যে, দেশের বর্তমান আব-হাওয়ায় আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। অবশ্য সবাই এই পরিকল্পনা খুব ভাল বিবেচনা করলেও

অনেকেই এত বড় স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করেন, বরং শুধু পত্রিকা প্রকাশেই আমাদের স্বল্প ক্ষমতা নিয়োজিত করতে উপদেশ দেন। আমি কিন্তু এই সঙ্কোচ গ্রহণ করতে সম্মত হই নি। আমি তখন অধ্যাপক বসুকে বলি যে, আপনি যদি আমাদের পুরোভাগে থাকেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের স্বপ্নকে রূপ দেবার প্রাথমিক চেষ্টায় সফল হবো। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের জন্যে যে নিবেদনপত্র আমরা ছাপাই এবং যে ভাবে আমরা তার সাড়া পাই—(ভারতবর্ষে যত বাঙালী বিজ্ঞানী ছিলেন প্রায় সবাই আমাদের উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং সভ্য হয়েছিলেন)—তা সত্যই আমাদের আশাতীত ছিল। আমাদের আশা আরও বেড়ে গিয়েছিল, কারণ পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আমাদের প্রচেষ্টা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং পরিষদের উদ্বোধন দিবসে (25 জানুয়ারী, 1948) কলকাতার বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সার্বজনিক উপস্থিতিতে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রথম সংখ্যায় কর্মসচিবের নিবেদনে লিপিবদ্ধ আছে, পরিষদ কি আশা ও কর্মপন্থা নিয়ে তার জীবনযাত্রা আরম্ভ করে। আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার প্রাক্‌কালে তার একটা নিরপেক্ষ হিসাব-নিকাশের (Objective stock-taking) প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক বসুর তত্ত্বাবধানে ও অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আজ সর্বত্র পরিচিত, ভারত ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের নিকট থেকে নিয়মিত উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য (দুঃখের বিষয় যৎসামান্য) পেয়ে আসছে এবং পরিষদের নিজস্ব ভবনও নির্মিত হয়েছে। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা জানেন 25 বছর একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে শুধু বাচিয়ে রাখাও কি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাভাষীরা এর জন্যে অধ্যাপক বসু ও শ্রীভট্টাচার্যের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তবুও স্বীকার করতে হবে যে, পরিষদ তার কার্যক্রমের খুব অল্পই বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছে। এর অবশ্য অনেক কারণ আছে। কিন্তু আজ ভাববার সময় এসেছে, এসব বাধা কি ভাবে অতিক্রম করা যায়। ভাববার কথা, পরিষদের পত্রিকা কেন অনুরূপ বিদেশী পত্রিকার সমপর্যায়ে উঠতে পারছে না। মিউনিক, লণ্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটনে যে সব বিজ্ঞানের মিউজিয়াম আছে, সেরূপ একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় এখনও গড়ে উঠতে পারে নি কেন? বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালার এত অভাব কেন? যথোচিত সর্বসম্মত পরিভাষা এখনও সৃষ্ট হলো না কেন? বাংলাভাষায় কয়টা বিজ্ঞানবিষয়ক (ছাত্রদের উপযোগী এবং বিশেষজ্ঞদের উপভোগ্য) চলচ্চিত্র ও টেলিভিসন-চিত্র সৃষ্ট হয়েছে? প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন নিয়মিতভাবে হচ্ছে কি?

এই সুযোগে আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মকর্তাদের এবং সারা দেশ জুড়ে এর শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধ করছি—তাঁরা যেন এই বিষয়গুলি ভেবে দেখেন এবং এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে সবিশেষ চেষ্টা করেন, নইলে দেশকে গড়ে তোলবার জন্যে উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে। অবশ্য প্রথম এবং সবচেয়ে বড় বাধা অর্থ। এই কাযগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে পরিষদের নিজস্ব কর্মী চাই এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্যের জন্যে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হবে।

1972 সালে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিষদের আরও অনুকূলে এসেছে। বাংলাদেশের ছাত্রেরা বাংলাভাষা ও সোনার বাংলার

জন্যে প্রাণ দিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙালীদের মধ্যে বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করবার কাজে তাদের সাহায্য অতিশয় ফলপ্রসূ হবে এবং বাংলাদেশের সরকার পরিষদের আদর্শকে রূপায়িত করবার জন্যে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। ভেবে দেখুন পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের সরকার বার্ষিক কত অর্থ ব্যয় করছেন শিক্ষা ও প্রচারের জন্যে; কিন্তু এ সবই ব্যর্থ হবে, যদি পরিষদের আদর্শ ফলপ্রসূ না হয়। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই সরকারের শিক্ষা ও প্রচার বিভাগের কিছুটা অংশ পরিষদের কাজে ব্যয় করবার জন্যে দেশবাসী ন্যায্য দাবী করতে পারেন। সরকারের যথোচিত সাহায্য ও সমর্থন পেলে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (যথা—UNESCO, Ford Foundation) থেকেও অর্থ প্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে, অবশ্য যদি পরিষদের কর্মকর্তাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকে।

এই নতুন পরিস্থিতিতে আমার অনুরোধ এই যে, পরিষদের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের সরকার এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিয়মাবলীর যথোচিত পরিবর্তন করে এটাকে বাঙালীদের একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করবেন। আমাদের যে স্বল্প ক্ষমতা, তাতে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে এরূপ দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার চেষ্টা করা অনুচিত, কারণ পরিষদের আদর্শ সমগ্র বাংলাভাষীর সেবা।

"* * * পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষায় আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"

"* * * অথচ জাপানি ভাষায় ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এপর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

"* * * বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেই জন্যই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-যে, একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের কলাও জায়গা নাই * * *।"

—রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন—পৌষ, 1322 বঙ্গাব্দ)

সিলিকা, সিলিকন, সিলিকোন

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত*

সিলিকা, সিলিকন, সিলিকোন। এও এক জাতীয় ধাতুরূপ, তবে ভিন্ন অর্থে। প্রাকৃতিক সম্পদ হলো সিলিকা, তাথেকে সিলিকন ধাতু বের করতে হয়। সিলিকন থেকে সিলিকোন-গোষ্ঠীর রাসায়নিকসমূহ তৈরি করা হয়।

সিলিকা হলো সিলিকন ধাতু ও অক্সিজেন গ্যাসের এক দৃঢ়বদ্ধ যৌগিক, যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের যৌগিক জল। পৃথিবীতে এই সিলিকা বিচিত্র রূপে ও অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিকেরা যে এতাবৎ প্রায় নব্বইটি ধাতব, অর্ধধাতব ও অধাতব স্থায়ী মৌলের সন্ধান পেয়েছেন, তার মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকন (তাদের মৌলিক ও যৌগিক অবস্থান সব মিলিয়ে) পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। উপরের বায়ুমণ্ডলসমেত পঁচিশ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত জল, মাটি নিয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বা ভূত্বক ধরা হয়। সিলিকন ও অক্সিজেন এই পৃষ্ঠদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। অক্সিজেনের পরিমাণ সিলিকনের দেড়গুণ (Si 28, O 46 পার্সেন্ট)। সমস্ত সিলিকনই অক্সিজেনের সঙ্গে যৌগিক অবস্থায় আছে সিলিকা অথবা অন্য ধাতুর সিলিকেট হয়ে।

পরীক্ষার দ্বারা অন্ততঃ এগারো রকম কেলাসিত ও অকেলাসিত বিভিন্ন অন্তর্গঠনের সিলিকা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার মধ্যে প্রধান তিন প্রকার কেলাসিত রূপ—কোয়ার্ট্‌জ, ট্রাইডিমাইট ও ক্রস্টোবালাইট—ভূ-বিদ্যার্থীদের সুপরিচিত। পৃথিবী কোন এক অতীতে ধীরে ধীরে শীতল হবার সময় তার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রার ভিন্নতা অনুযায়ী এক এক জাতীয় সিলিকা-কেলাসের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ভূতত্ত্ববিদ্ কদাচ সিলিকাকে প্রকৃতির থার্মোমিটার বলেন, যেহেতু এই সকল ইতস্ততঃ অবস্থিত কেলাসের রূপ ও বিস্তৃতি দেখে এক প্রাক্-মানবীয় যুগের তাপমাত্রা কোথায় কেমন ছিল, তা আজও অনুমান করা যায়।

স্বচ্ছ কোয়ার্ট্‌জ প্রায় নির্মল সিলিকা। ধারালো ও গোলাকৃতির স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ কোয়ার্ট্‌জ-পাথর অসংখ্য দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে, অগভীর নদীগর্ভে বা অন্য খনিজের সঙ্গে। বৃষ্টির জল ও নদীর স্রোতে কোয়ার্ট্‌জ শিলা বিশ্লিষ্ট ও চূর্ণিত হলে কালক্রমে বালির উৎপত্তি হয়। প্রায় বর্ণহীন ও এক সাইজের বালি, কাচ ও পোর্সিলেন শিল্পের বিশেষ উপযোগী। সাধারণ বালি যাবতীয় নির্মাণকার্যে (প্লাস্টার অথবা কংক্রীট জমাতে) প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অকেলাসিত (জলে ঈষৎ দ্রবণীয়) সিলিকাও প্রাণ সৃষ্টির ক্রমবিকাশে প্রকৃতির কাজে লেগেছে। জলে-স্থলে প্রাণ সৃষ্টির আদিযুগে এক আদিম প্রাণকোষে পঞ্জরের মত এই সিলিকা কোষের দেহকে আকৃতি দিয়েছিল। ডায়াটম নামক এক ধরণের জলজ উদ্ভিদের অগণিত কঙ্কালরূপে সেই অকেলাসিত সিলিকা কোন কোন সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে এখনও পাওয়া যায় এবং নানা কাজেও লাগে। তাছাড়া চাল, গম ইত্যাদির খোলায়, পাকা বাঁশের গাঁটে গাঁটে, পাখীর পালকে এই অকেলাসিত অথচ কঠিন সিলিকা তাদের আবশ্যকীয় দৃঢ়তা দিয়ে থাকে।

সিলিকায় গঠিত রত্নরাজির কথা আপাততঃ

* ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল লেবরেটরি, পুণা

বাদ দিলে প্রাকৃতিক কেলাসিত সিলিকাগুলির মধ্যে কোয়ার্ট্‌জের ব্যবহার সমধিক। বিশুদ্ধ স্বচ্ছ কোয়ার্ট্‌জ-কেলাসের এমন অনেকগুলি আভ্যন্তরিক বিশেষত্ব আছে, যার জন্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালন, অতিবেগুনী অদৃশ্য আলোর পরিবহন প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাজে লাগে। নির্দিষ্ট মাপমত পুরু করে কাটা স্বচ্ছ ত্রুটিহীন কোয়ার্ট্‌জের চাকৃতি থেকে নির্দিষ্ট একটিমাত্র মাপের রেডিও-তরঙ্গ আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া যায়; তাই রেডিও-ট্রান্সমিটারে, বিশেষতঃ ভ্রাম্যমান মিলিটারি বাহনের ট্রান্সমিটারে এর বহুল ব্যবহার। কোন এক তরঙ্গে পাঠানো সঙ্কেতে শত্রুপক্ষ যদি গোলমালের সৃষ্টি করে, তখন অন্য কোয়ার্ট্‌জ চাকৃতির সাহায্যে তার চেয়ে ছোট বা বড় তরঙ্গে সঙ্কেত পাঠাতে হয়। এজন্যে অনেকগুলি ভিন্ন স্থূলতার কোয়ার্ট্‌জ-চাকৃতি এই রকম বাহনের ট্রান্সমিটার যন্ত্রে বসানো থাকে। আবার কোয়ার্ট্‌জের প্লেট এমনভাবেও কাটা যায়, যার এক পাশে চাপ পড়লে অন্য পাশে বিদ্যুৎ পরিচালিত হয়। আঘাতপ্রসূত বিস্ফোরণ ঘটাতে (যেমন রকেটে) কোয়ার্ট্‌জের এই ধর্ম বিশেষ বিশেষ সামরিক অস্ত্রে লেগেছে। রেডার ও অন্যান্য নির্দেশক যন্ত্রেও এর বিস্তর ব্যবহার। অদৃশ্য অতি-বেগুনী আলো কোয়ার্ট্‌জের প্রিজম বা লেন্সের

চিত্র—1 ক চিত্র—1 খ
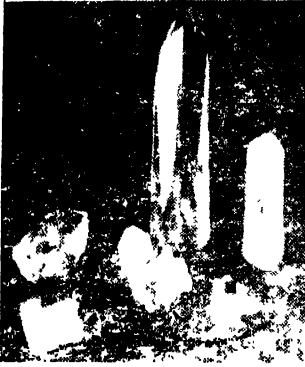
চিত্র: 1 ক—ভূপৃষ্ঠে আহরিত কিছু কোয়ার্ট্‌জের স্বাভাবিক কেলাস।
1 খ- ডায়াটম কঙ্কালে বিচিত্র গড়নের (অকেলাসিত) সিলিকা (অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট)

মধ্য দিয়ে অনায়াসে প্রতিসরিত হয়। সুতরাং কাচের বদলে এরকম কাজে কোয়ার্ট্‌জের প্রিজম বা লেন্সের ব্যবহার অনেককাল যাবৎ প্রচলিত। শ্রবণাতীত শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদনে কোয়ার্ট্‌জ প্লেটের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

কোয়ার্ট্‌জ ও অন্যান্য সকল সিলিকাই সিলিকন ধাতুর অক্সাইড; যেমন—কার্বনের অক্সাইড কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস অথবা হাইড্রোজেন গ্যাসের অক্সাইড জল। সিলিকা থেকে সিলিকন ধাতু পেতে হলে তাকে এমন কোন বস্তু মিশিয়ে উত্তপ্ত করতে হবে, যার প্রতি অক্সিজেনের আকর্ষণ তীব্রতর। কার্বন (কয়লা, কোক ইত্যাদি) দিয়ে এই বিজারণ সাধিত হয় ইলেকট্রিক চুল্লীতে, যার অক্সিজেনমুক্ত অভ্যন্তরে তাপমাত্রা 1700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম নয় (লোহা গলে 1300 ডিগ্রিতে)। প্রায়শঃই এই রকম চুল্লীতে সিলিকার সঙ্গে কিছু লৌহ অক্সাইড মিশিয়ে দেওয়া হয় (যেমন—মহীশূর প্রদেশের ভদ্রাবতী

স্থিত কারখানায়)। তখন সিলিকনের বদলে উৎপন্ন হয় ফেরোসিলিকন ধাতুসঙ্কর, ইস্পাত-শিল্পে যার ব্যাপক ব্যবহার। মোটামুটি প্রতি টন ষ্টীল তৈরিতে গড়ে প্রায় এক কিলো সিলিকন লাগে, বিশেষ বিশেষ ষ্টীলে এর চেয়ে অনেক বেশী লাগে।

উপরিউক্ত ব্যবহারের তুলনায় বিশুদ্ধ সিলিকন মৌলের ব্যবহার পরিমাণে নগণ্য। নায়েগ্রা প্রপাতে উৎপন্ন প্রচুর এবং সস্তা জল-বিদ্যুতের সাহায্যে খাঁটি সিলিকন যখন শিল্পদ্রব্য হিসাবে প্রথম উৎপাদন করা হয়েছিল, তখন শিল্পের বাজারে তার কোন ক্রেতা পাওয়া যায় নি। আজ বিশুদ্ধ সিলিকনের ব্যবহার বর্তমান যুগের এক ঐতিহাসিক সাফল্য। এই সাফল্যের মূল কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

খাঁটি সিলিকন ঠিক পুরাপুরি একটা ধাতু নয়, আবার পুরাপুরি গন্ধক বা ফস্‌ফরাসের মত অধাতুও নয়। অর্ধধাতু (Mettaloid) বললে ঠিক হয়, কারণ এর বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা যে কোন ধাতুর তুলনায় অনেকখানি কম। এই রকম অর্ধ-ধাতুর একটা বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে উপযুক্ত পান মিশিয়ে এতে ইচ্ছানুযায়ী বিশেষ রকমের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা আরোপ করে দেওয়া যায়। এই রকম পান-মেশানো সিলিকন-কেলাসের পাতলা চাকৃতিকে নানা-রকমের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে রেক্টিফায়ার (ডায়োড) অথবা অ্যাম্‌প্লিফায়ার (ট্র্যানজিস্টর) রূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আগে এই রকম কাজে বড় বড় বস্তুখণ্ডের ব্যবহার ছিল, এখন সিলিকন এবং অন্যান্য অর্ধধাতুর প্রয়োগ-কৌশলে যন্ত্র-গুলি ক্রমশঃই মিনিসাইজ ও স্বল্পতায় হয়ে আসছে।

এক কিলোগ্রাম পরিশুদ্ধ সিলিকন থেকে মোটামুটি হাজার পাঁচেক ডায়োড, ট্র্যানজিস্টর ইত্যাদির খণ্ডপত্রী কেটে বের করা যায়। সুতরাং এই পরম বিশুদ্ধ সিলিকনের উৎপাদন পরিমাণে বেশী নয়—পৃথিবীর সকল দেশ মিলিয়ে মাত্র কয়েক শত টন হতে পারে। এই সিলিকনে অবাঞ্ছিত খাদ কোটিতে এক ভাগেরও কম হওয়া চাই। সুতরাং প্রস্তুত-পদ্ধতি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য।

বাজার-চলতি সিলিকন প্রস্তুত করবার পদ্ধতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কার্বনের দ্বারা নিষ্কাশিত এই সিলিকন আন্দাজ 98% খাঁটি, তাকে অক্সিজেন, কার্বন ইত্যাদি খাদ থেকে নির্মুক্ত করতেই হয়। প্রথমে ক্লোরিন গ্যাস অথবা হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উত্তপ্ত এই অনির্মল সিলিকনের গুঁড়ার মধ্যে চালিয়ে একে সিলিকনের এক তরল উদ্বায়ী যৌগিকে পরিণত করা হয় এবং শীতল আধারে তাকে সংগ্রহ করা হয়। এই এক প্রক্রিয়াতেই অধিকাংশ খাদ ও ময়লা কঠিন অবস্থায় পাত্রে পড়ে থাকে। পরে সেই তরল যৌগিকটিকে বারংবার আংশিক পাতনের সাহায্যে প্রকৃষ্টরূপে শোধন করা হয়। শেষে অন্য এক তাপসহনক্ষম যন্ত্রসজ্জায় এই তরল যৌগিকের উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাস অথবা বাষ্পায়িত যশদ (দস্তা) ধাতুর ক্রিয়া ঘটিয়ে অতি বিশুদ্ধ সিলিকনের ছোট ছোট কেলাসের গুচ্ছরূপে ফিরে পাওয়া যায়।

ট্র্যানজিস্টর তৈরি করতে হলে এই কেলাসের গুচ্ছকে পুনরায় গলিয়ে তাথেকে সমসত্ত্ব কেলাসের পিণ্ড (যার মধ্যে সিলিকন পরমাণুর দল এক অখণ্ড ও ক্রমপর্যায়ে সাজানো আছে; যদিও বাইরে থেকে দেখতে পলকাটা কেলাসের মত নয়) বানাতে হয়। তার জন্যে বর্তমানে শিল্পে দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। জোক্রাল্‌স্কি (Czochralsky) পদ্ধতিতে গলন্ত সিলিকনের কুণ্ড থেকে সিলিকনের একটি বীজকেলাসকে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে উপরে টেনে তোলা হয়। তৎসহ কেলাসটিকে আস্তে আস্তে ঘোরালে আরো ভাল। কেক্-

ও গোলে (Keck and Golay) পদ্ধতিতে ছাঁচে-বানানো একটি সিলিকনের দণ্ডকে বেত্রদণ্ডের মত খাড়া রেখে প্রথমে তলার দিকে চক্রাকারে উত্তাপ লাগিয়ে তাকে আংশিকভাবে গালিয়ে আনা হয়, যার ঠিক নীচেই একটি বীজকেলাস লাগানো থাকে। তারপর তাপশিখাকে যন্ত্রের

যে সিলিকন-কেলাসের মধ্যে P-N-P অথবা N-P-N জংশন তৈরি করা গেল, তাকে পাত্‌লা করে কেটে কেলাসপত্রী (Wafer) বানানো এবং সেই একরত্তি টুক্‌রাটিকে সযত্নে উপযুক্ত ফ্রেমে বা থাপে এঁটে বসানো হয়। এই হলো ট্র্যানজিস্টর, মিনিয়েচার অ্যাম্‌প্লিফায়ার।

চিত্র—2 ক চিত্র—2 খ

2 ক—জোক্রালস্কি পদ্ধতিতে সমসত্ত্বভাবে কেলাসিত সিলিকন পিণ্ড, যার কাটা পত্রী (Wafer) থেকে ট্র্যানজিস্টর ইত্যাদি তৈরি হয়।

2 খ—দেশলাই-কাঠির পাশে একটি অনাবৃত সিলিকন-পত্রী (কালো চৌকা অংশ) ট্র্যানজিস্টর ; তার পাশে কোষবদ্ধ সম্পূর্ণ ট্র্যানজিস্টর।

সাহায্যে অতি ধীরে ধীরে উপর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। উভয় পদ্ধতিতেই বীজ-কেলাসে সংলগ্ন গলিত সিলিকন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হবার সময় বীজকেলাসের সঙ্গে সমসত্ত্ব বৃহত্তর কেলাসে পরিণত হতে থাকে।

কিভাবে এবং কোন্ অবস্থায় উপযুক্ত পান মিশ্রণের দ্বারা সমসত্ত্ব সিলিকন-কেলাসে N এবং P (নেগেটিভ ও পজিটিভ) স্তরসমূহের সৃষ্টি করা হয়, তার বর্ণনা এখানে দেওয়া গেল না। আসলে, বিভিন্ন কাজের উপযোগী P-N জংশন অর্ধ-ধাতুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে রচনা করা হয়। তবে এটুকু বলা বলা যায় যে, কোন ত্রিযোজী মৌলের মিশ্রণে P-টাইপ এবং পঞ্চ-যোজীর মিশ্রণে N-টাইপ সিলিকন উৎপন্ন হয়।

যে সকল যন্ত্রতন্ত্রে সিলিকনের টুকিটাকি নিত্য ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে পড়ে : রেডিও, টেলিভিসন, কম্পিউটার, বেগপরিবর্তী মোটর, পরিচালিত মিজাইল, বিদ্যুৎ জেনারেটর, অবলোহিত রশ্মির লেন্স, সূর্যালোক ব্যাটারী ইত্যাদি। তিন থেকে পাঁচ মাইক্রন (মিলিমিটারের সহস্রাংশ) মাপের অবলোহিত রশ্মি-তরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্রপাতিতে এর ব্যবহার প্রশস্ত। উপযুক্ত সিমেন্টের সাহায্যে সিলিকনের প্লেট জোড়া দিয়ে ইচ্ছামত আকার ও আয়তনের গ্রাহক যন্ত্র বানানো হয়। এই কাজের জন্যে সমসত্ত্ব কেলাস থেকে কাটা সিলিকনের প্লেট না হলেও কাজ ভালই চলে। সূর্যালোক ব্যাটারীতে সূর্যালোকের অবলোহিত রশ্মি সিলিকনের দ্বারা

বিদ্যুতে পরিণত হয়। যে সকল জনবিরল অঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ নেই, সেখান থেকে রেডিও বা টেলিফোন যোগে সংবাদ পাঠাতে এই ব্যাটারী অনেকখানি কাজে লাগে।

সিলিকোন নামে যে বস্তুবর্গ অভিহিত, তারা সিলিকার মত নিসর্গজাত পদার্থ নয়; রাসায়নিক ক্রিয়াকৌশলে মানুষের চেষ্টায় এরা সংসিদ্ধ, সংশ্লিষ্ট। পরিভাষায় বাচনে এদের বলা হয় সিলিকনের জৈব যৌগিক, যদিও জীব-জগতে এদের কোন একটিরও অস্তিত্ব ছিল না। জৈব অর্থে বস্তুতঃ এরা সিলিকনের কার্বনঘটিত nard) যৌগিক (অসংখ্য জৈব যৌগিক প্রস্তুতির কাজে)। জৈব ধাতব যৌগিকের মধ্যে সিলিকোন যৌগিক আশ্চর্য রকম স্থিতিশীল, হিম ঠাণ্ডা (−50°C) থেকে উচ্চ তাপমাত্রায় (250°C) এরা নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। তাই আধুনিক যুগে এদের দ্বারা বিবিধ অভূতপূর্ব প্রয়োজন মিটছে। বছরের পর বছর এদের প্রয়োগ-ক্ষেত্র এবং চাহিদার পরিমাণ এখন বেড়েই চলেছে।

অন্যূন পঞ্চাশ থেকে এক শত রকমের সিলিকোনের দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে চলছে। সিলিকোন তেল, সিলিকোন রঞ্জন, সিলিকোন

চিত্র—3 ক

চিত্র—3 খ
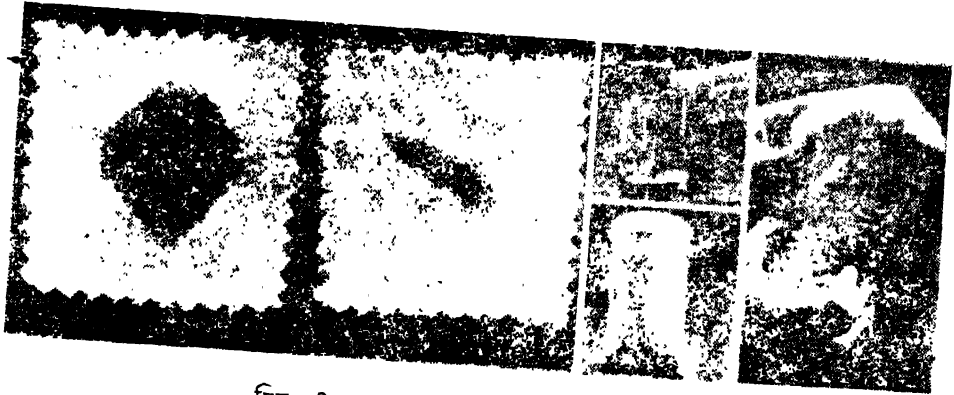
3 ক—অ্যাসিটেট রেয়ন কাপড়ের টুক্‌রা দুটিতে এক এক ফোঁটা কালি পড়েছে; ডানদিকের টুক্‌রায় উপযুক্ত সিলিকন লাগানো।

3 খ—ফোম রবারের মত সিলিকোন রবারের ফোম। −70° থেকে +250° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত এর নমনীয়তা বজায় থাকে। এটি দীর্ঘস্থায়ী ও রোদ-জল সহনক্ষম।

যৌগিক, অর্থাৎ এদের প্রত্যেক অণুতে চতুর্যোজী সিলিকন পরমাণুর অন্ততঃ এক এক দিকে (সচরাচর দুই দিকে) তারা কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। এই জাতীয় কার্বন পরমাণুযুক্ত নানারকম ধাতব যৌগিক আজকাল শিল্প প্রচেষ্টার নানা কাজে লাগছে; যথা—সীসা টেট্রা-ইথাইল (মোটর গাড়ীর পেট্রোলে মিশাল হিসাবে), টাইটেনিয়াম জীগ্‌লার (Zeigler) যৌগিক (পলিথিন শিল্পে অনুঘটকরূপে), ম্যাগ্‌নেসিয়াম গ্রিগ নার্ড (Grig- রবার, সিলিকোন আঠা ইত্যাদি—খাঁটি অথবা মিশ্ররূপে। এদের ব্যবহার ট্রান্সফর্মারে, ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে, টায়ার প্রস্তুতিতে, বস্ত্র শিল্পে, রাসায়নিক শিল্পে, ল্যামিনেট ও ফোম শিল্পে, হিমশিখর পর্বতের সানুদেশে ব্যবহৃত যানবাহনে, এরোপ্লেনে, মহাকাশ অভিযানে। জলে বা জলো বাতাসে খারাপ হতে পারে, এমন যে-কোন বস্তুকে অসিক্ত রাখা এদের এক উল্লেখ-যোগ্য ধর্ম। সকল প্রয়োগের পৃথক পৃথক

আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কলকাতায় মেট্রো-আর্ক লিমিটেড নামে একটি উৎসাহী শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের লিখলে আরো খবর এবং সম্ভবতঃ নমুনা ও ব্যবহারিক পরামর্শও পাওয়া যেতে পারে।

সিলিকোন নামধারী বস্তুগুলির রাসায়নিক তথ্য কতকটা জটিল বা জট পাকানো বলা চলে। প্রথম জটিলতাই হলো কোন সিলিকোনের অণুতে একটিমাত্র সিলিকন পরমাণু নেই, আছে অল্প থেকে বহু। সিলিকন পরমাণু চতুর্যোজী। তার মধ্য থেকে যদি দুটি যোগশিরা (Chemical bond) দুটি কার্বন পরমাণুতে লগ্ন হয়, আর দুটি হয় দুই অক্সিজেন পরমাণুতে, তখনই বলতে গেলে সিলিকোন অণুর সূত্রপাত হয়। অক্সিজেন পরমাণু নিজে দ্বিযোজী, এখন তার প্রত্যেকটিতে একটি দ্বি-কার্বনযুক্ত সিলিকন পরমাণু লাগলো, যার বাইরে পড়ে রইলো আগের মত দুটি একবাহুমুক্ত অক্সিজেন পরমাণু, যেখানে আবার অনুরূপ কার্বন ও অক্সিজেনযুক্ত সিলিকন পরমাণু লগ্ন হতে পারে। এইভাবে লম্বা লম্বা চেন গড়ে ওঠে অক্সিজেন ও সিলিকনে···O—Si—O—Si—O—···, যার সিলিকন পরমাণুগুলিতে দুটি করে কার্বনঘটিত গ্রুপ বা যৌগাংশ সংলগ্ন। বলা যায়, আধা জৈব আধা অজৈব এক অণু সমাহার। চার সিলিকনের মালা থেকে লক্ষ সিলিকনের খোলা চেন সিলিকোন সর্বাণু (Polymer) আছে, তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি।

এই রকম স্বতঃবৃত্ত দীর্ঘাকার সর্বাণুর বিষয় আজকাল আর সাধারণের অবিদিত নয়। উদাহরণস্বরূপ রবার, প্লাস্টিক, নাইলন, সেলুলোজ ইত্যাদির কথা বলা যায়। অথচ এদের রাসায়নিক প্রকৃতি সম্পর্কে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বৈজ্ঞানিকেরা ভালমত অবহিত ছিলেন না। সর্বাণুদের মধ্যে আবার সিলিকোনগোষ্ঠী ছিল আধা কার্বনঘটিত (অর্থাৎ জৈব) আর আধা সিলিকন-অক্সিজেন-ঘটিত (অর্থাৎ অজৈব), অতএব রক্ষণশীল জৈব ও অজৈব উভয় রাসায়নিকের গবেষণার গণ্ডীর কিছুটা বহির্ভূত এবং অবহেলিত ছিল। পরে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে বিষয়টির উৎকর্ষের জন্যে এখন উভয়েই মনোযোগী ও সচেষ্ট হয়েছেন।

ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে উল্লেখ করা উচিত যে, বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে ইংরেজ রসায়নবিদ্ কিপিং (Kipping) দীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে অনেকগুলি জৈব সিলিকন যৌগিক প্রস্তুত ও পরীক্ষা করেন। সিলিকোন নামটি তাঁর দেওয়া। শ্রুতিসুখকর বলে সাধারণভাবে তা গৃহীতও হয়েছে, যদিও নামকরণের মধ্যে আবিষ্কারকের এই পদার্থগুলি সম্বন্ধে ধারণার যে আভাস পাওয়া যায়, সে ধারণা এখন আর নেই। কিপিংয়ের গবেষণার দীর্ঘ কাহিনী থেকে এখানেই নিরস্ত হওয়া গেল।

বস্তুতঃ সাম্প্রতিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চাপে, নিত্য নূতন গুরুতর প্রয়োজনের তাগিদে বর্তমান সিলিকোন বস্তুরাজির আবিষ্কার, উৎপাদন ও প্রয়োগ প্রায় একসঙ্গেই সুরু হয়েছিল। এখনও সেই ত্রিধারা প্রবল। শিল্পে বা অস্ত্রসজ্জায় এমন বস্তুরই অবাধ ব্যবহার হওয়া সম্ভব, যা সহজে, কম খরচে এবং একসঙ্গে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষার্ধে যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক সিলিকোন তৈরির নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার ও শিল্পে রূপান্তরিত করেছিলেন, তার মধ্যে অধুনা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক ডক্টর রকাওয়ের (Rochow) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রকাও-পদ্ধতির দ্বারা বর্তমানে বছরে আনুমানিক ষাট-সত্তর হাজার টন নানা রকমের সিলিকোন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তৈরি হয়। এই বার্ষিক উৎপাদন এখনও পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট হারে বেড়েই চলেছে।

অপরিশুদ্ধ সিলিকন থেকে সিলিকোন তৈরি হয়। তবে এক ধাপে হয় না। প্রথমে রকাও-পদ্ধতিতে উত্তপ্ত সিলিকন ও তামার মিশ্রিত চূর্ণের মধ্যে জৈব ক্লোরাইডের বাষ্প চালিয়ে অনেকগুলি ক্লোরিনযুক্ত তরল পদার্থের এক মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই সহজ উদ্বায়ী তরলগুলির ক্রমান্বয় আংশিক পাতনে (যেমন পেট্রোলিয়াম রিফাইনারিতে করা হয়) সর্বাধিক যে অংশ পাওয়া যায়, তার আণবিক সঙ্কেত হলো R_2SiCl_2, অর্থাৎ একটি সিলিকন পরমাণুতে সংলগ্ন ছুটি ক্লোরিন পরমাণু, আর ছুটি কার্বন যৌগাংশ। এটি জৈব-সিলিকন যৌগিক বটে, কিন্তু সিলিকোন নয়। জলের সঙ্গে একে মেশালে ক্লোরিন পরমাণুদ্বয় বিশ্লিষ্ট এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রূপে জলে দ্রবীভূত হবে—ছুই ক্লোরিনের স্থান পূরণ করবে জল থেকে ছুটি অক্সিজেন পরমাণু তখন তেলের মত জলে ভেসে উঠবে। তৈলাংশকে অ্যাসিড মিশ্রিত জল থেকে পৃথক করে অনুঘটকের সঙ্গে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত রাখলে আবশ্যকমত মাপের সর্বাণুবিশিষ্ট সিলিকোন তেল তৈরি হলো।

অনেক সিলিকোনের মধ্যে মিথাইল সিলিকোনের (অর্থাৎ যাদের প্রস্তুতি সুরু হয় সিলিকনের উপর মিথাইল ক্লোরাইড গ্যাস চালিয়ে) চাহিদা সর্বাধিক। এর জন্যে প্রয়োজনীয় প্রধান যে ছুটি কাঁচামাল—সিলিকন (অপরিশুদ্ধ) ও মিথাইল ক্লোরাইড—দেশে তাদের শিল্প চালু হয়েছে। আশা করা যায়, সিলিকন থেকে সিলিকোন শিল্পও অচিরে দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। যত বড় স্কেলে উৎপাদন করলে পড়তা পোষায়, দেশে ততখানি সিলিকোনের চাহিদা এখনও দেখা যায় না। কিন্তু বিদেশে সেই উদ্বৃত্ত সিলিকোন বিক্রয় করতে গেলে সেখানে বড় বড় চালু বিদেশী কোম্পানীগুলির সঙ্গে দরে পাল্লা দিয়ে বিক্রয় করতে হবে। প্রধানতঃ এই অসুবিধার জন্যে স্বদেশী সিলিকোন শিল্পের দ্রুত প্রতিষ্ঠা আটকে আছে।

"গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়, কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল?—কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্ব্বাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূর দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই সুখদুঃখের অংশী, সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোদ্যম হইব না এবং তোমাদের জন্ত জয়লাভ করিব।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

ময়ূর

পাখিদের মধ্যে ময়ূর মানুষের মনকে আকৃষ্ট করেছে সেই আদিমকাল থেকে তার উজ্জ্বল বর্ণসৌন্দর্যে, পেখমতোলা নাচে, বিচিত্র আচরণে ও বাজখাঁই কেকারবে। ধর্মে, সাহিত্যে, কাব্যে, কারুশিল্পে ভাস্কর্যে—কিসে নয়, সবেতেই ময়ূর আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মুঘল সম্রাট শাহ্জাহানের বিশ্ববিশ্রুত ময়ূর সিংহাসন, ময়ূরপঙ্খী নৌজলযান, ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী, হরপার্বতী-পুত্র কার্তিকের বাহন প্রভৃতি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ময়ূর বলতে যা বোঝায়, তা হলো পুং-ময়ূর, যাকে ইংরেজীতে বলে peacock, স্ত্রী-ময়ূরকে অর্থাৎ ময়ূরীকে বলে peahen এবং স্ত্রী ও পুং-ময়ূর উভয়কে বোঝাবার জন্যে peafowl ব্যবহার প্রচলিত, কিন্তু বাংলাতে সে রকম শব্দ দেখি না। তত্রাচ দেবতাদের বহু নামের মতো ময়ূরের একাধিক সংস্কৃত নাম আছে, তার মধ্যে কতকগুলি বাংলায় অল্প-বিস্তর প্রয়োগ দেখা যায় ; যেমন—শিখী, কলাপী, কেকী, সহস্রলোচন প্রভৃতি। অবশ্য এ-সকল শব্দগুলির ব্যবহার কাব্যেই সীমিত।

প্রাণিবিদ্যায় ময়ূর দু'জাতির (species), প্রথমটি ভারতীয় ময়ূর (Indian peafowl), যার বিজ্ঞানসম্মত নাম প্যাভো ক্রিস্টেটাস, (*Pavo cristatus*) ও অপরটি বর্মী ময়ূর (Burmese peafowl) অর্থাৎ প্যাভো মিউটিকাস (*Pavo muticus*)।

ভারতীয় ময়ূর সিন্ধুনদের দক্ষিণে ও পূর্বে 95° দ্রাঘিমা পর্যন্ত ভারতে, নেপালে ও সিংহলে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ে 5000 ফুট উচ্চতায় এদের দেখা মেলে, কিন্তু উত্তর ভারতে সাধারণতঃ নিম্নসমতল ভূমি থেকে 6000 ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বসবাস করে। বর্মী ময়ূরের ভৌগোলিক বিস্তৃতি আসামের উত্তর কাছাড় জেলা, মণিপুর, মিজোরাম (লুসাই পর্বত), বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী ও উচ্চতায় প্রায় 3000 ফুট পর্যন্ত।

এই দু'জাতির ময়ূর চিনবার সহজ উপায় হলো মাথার ঝুঁটি লক্ষ্য করা। ভারতীয় ময়ূরের মাথার ঝুঁটির পালখের উপরিভাগ চামচের মতো অর্ধচন্দ্রাকৃতি (crescent) এবং বর্মী ময়ূরের ঝুঁটি ছুঁচলো। এই ঝুঁটির জন্যে ময়ূরের অপর নাম শিখী।

একেবারে সাদা রংয়ের যে-ময়ূরটি পশুশালায় বা চিড়িয়াখানায় দেখা যায়, সেটি বর্ণসঙ্কর (hybrid) নয়—পরিব্যক্ত (mutant) ময়ূর। তিন রকমের পরিব্যক্তি (mutation) দেখা গেছে ময়ূরের মধ্যে। সবচেয়ে সাধারণ হলো শ্বেতী (albino) ময়ূর। মাঝে মাঝে সাদা কালো রং মিশানো (pied) ময়ূর দেখা যায় এবং দৈবাৎ কালো ডানাওয়ালা ময়ূরের সাক্ষাৎলাভ অসম্ভব নয়।

ভারতের বাইরে ভারতীয় ময়ূরের কথা তিন হাজার বছরের পূর্বেও জানা ছিল। ফিনিসিয়রা মিশরের ফারাওদের ময়ূর এনে দিয়েছিল এবং রাজা সলোমানের নৌবাহিনীও কিছু সংখ্যক ময়ূর নিয়ে গিয়েছিল সেই দেশে। ফারাও ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজাদের প্রাসাদ-উদ্যানের শোভাবর্ধনের

জন্যে গৃহপালিত করে পোষা হতো, অবশ্য তখন ওখানে ওদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু পরে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারত থেকে প্রচুর ময়ূর নিয়ে যান, ফলে গ্রীক ও রোমানরা ময়ূর পোষা রেওয়াজ করেন নিজ নিজ দেশে। তবে ঐ সময় ওদের পোষা হতো রাজরাজড়াদের জাঁকাল ভোজসভায় রুচিকর বিলাসী ডিশের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্যে। পরে এই প্রথা ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, পৌরাণিক যুগে ভারতেও ময়ূরের মাংস খাওয়া প্রচলন ছিল। শোনা যায় সম্রাট অশোক ধর্মাশোক হবার পর ময়ূর হত্যা ও তার মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়। ভারতে যেমন, ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের দেশগুলিতেও তেমনি ময়ূর শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও রূপকথা প্রভৃতিতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ময়ূরের আসল দেশ ভারতবর্ষ হলেও হাঙ্গেরী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ওরা এখন বসবাসে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এক হিসেবে এদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার অবতার বলা যেতে পারে। ভারত থেকে ইউরোপে সদ্যনীত ময়ূরকে বাইরের গাছের উপর বসে রাত কাটাতে দেখা গেছে। এমন কি প্রচণ্ড শীতে বা তুষার পাতে এদের সহজে কাতর হতে দেখা যায় নি।

ময়ূর অরণ্যবাসী। তবে শালজঙ্গল, আগাছার জঙ্গল, চাষ-আবাদ অঞ্চলেই এদের সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। এরা সর্বভুক্, ফুলের পাপ্‌ড়ি, সবরকমের শস্যাদি ও তাদের চারা, কয়েক রকম ডুমুরের মতন বেরী (berries) ফল, পোকামাকড় ও তাদের লার্ভা, কেঁচো, নানা প্রকার কৃমিপর্যায়ের প্রাণী, শামুক, ব্যাং, গিরগিটি—এমন কি সাপও, ছোট ছোট স্তন্যপায়ী প্রভৃতি এদের খাদ্যতালিকাভুক্ত।

ভারতের বহু স্থানে হিন্দুরা ময়ূরকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে ওদের রক্ষা করে। ওদের প্রতি কোন প্রকার ব্যতিচারে সকলেই ক্ষুব্ধ হয়। এমন কি, যে-সকল স্থানে ওদের ঠিক পবিত্র বলে জ্ঞান করে না, সেখানেও ওরা লোকদের শ্রদ্ধার্ঘ্য পায় এবং সহজে নির্যাতিত হয় না। এই সকল স্থানের গ্রামীন বা শহরের যাতায়াতের পথে প্রায় সর্বক্ষণ স্বচ্ছন্দচিত্তে ওদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। পথিকদের দ্বারা তাড়া খেলেও ভ্রূক্ষেপ না করেই সেই পথে চলাফেরা করে। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে এরকম দৃশ্য আজও বিরল নয়।

অপূর্ব অপরূপ বর্ণসৌন্দর্যের অধিকারী হয়েও মানুষের মনকে গাঢ়রূপে অভিভূত করেছে ময়ূর তার পেখমে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'train'। এই পেখমকে অনেকে পুচ্ছ বলে ভুল করেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পুচ্ছ মোটামুটি এক রকমের। যে পালখগুলি দিয়ে ময়ূর পেখম বিস্তার করে সেগুলি তার পৃষ্ঠ-পুচ্ছাবরণী পালখ, প্রাণিবিদ্যার ভাষায় যাকে বলে upper tail-coverts। এই বিচিত্র বর্ণ পেখমের পালখের উপরে থাকে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চক্রাকার চোখ, যার জন্যে ময়ূরের আর এক নাম সহস্রলোচন। ময়ূরের আত্মশ্লাঘাসূচক সৌন্দর্যসচেতনতা এই দীর্ঘ পেখম বিস্তার করে ঘুরে বেড়ানর ঠাটের সময় দেখা যায়। ভলটেয়ার (Voltaire) soul বা আত্মা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন, "I am persuaded that if a peacock could speak he would boast of his soul and would affirm that it inhabited his magnificent tail" (আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হতুম যদি ময়ূর কথা বলতে পারত তাহলে সে নিশ্চয়ই তার আত্মা সম্বন্ধে গর্ব করত এবং তার ঐ দম্ভোক্তি জাঁকাল পেখমের মধ্যে অধিষ্ঠিত বলে সমর্থন করত)। উত্তর-ভারতে পেখম ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ঝরে

পড়ে এবং নূতন পেখমের পালখ তখনই গজাতে সুরু করে, কিন্তু পূর্ণ দৈর্ঘ্য পেতে চৈত্র-বৈশাখ মাস এসে পড়ে। পেখমের দৈর্ঘ্য 5 ফুট 3 ইঞ্চি পাওয়া গিয়েছে। দেহানুপাতে পেখম যে একটু অস্বাভাবিক রকমের বড় সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা ময়ূরের ওজন চার থেকে ছয় সের (অর্থাৎ 3.75 থেকে 5.50 কিলো), আর ময়ূরীর তিন থেকে সাড়ে চার সের (অর্থাৎ 2.80 থেকে 4.20 কিলো)। সাধারণতঃ স্ত্রী-প্রাণিদের ওজন বেশী, কিন্তু ময়ূর তার ব্যতিক্রম। বলা বাহুল্য, পেখমই ময়ূরের ভার বৃদ্ধি করেছে। এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ময়ূরকে টুনটুনির সঙ্গে তুলনা করে 'ভার'-নামক যে মজার কবিতাটি লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করছি—

"টুনটুনি কহিলেন, রে ময়ূর, তোকে
দেখে করুণায় মোর জল আসে চোখে।
ময়ূর কহিল, বটে! কেন, কহ শুনি,
ওগো মহাশয় পক্ষী, ওগো টুনটুনি।
টুনটুনি কহে, এ যে দেখিতে বেআড়া,
দেহ তব যত বড়ো পুচ্ছ তারে বাড়া।
আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিনরাত,
তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।
ময়ূর কহিল, শোক করিয়ো না মিছে,
জেনো ভাই, ভার থাকে গৌরবের পিছে।"

ময়ূর উড়তে পারে যদিও ওড়াটা একটু বেঢপ রকমের। দীর্ঘকাল স্থায়ী উড্ডীয়মান অবস্থায় অথবা বাতাসে ভর করে আকাশে ভেসে থাকতে দেখা যায় না। উড়ে বেড়াবার চেয়ে বলিষ্ঠ লম্বা পদযুগলের সদ্ব্যবহার করে বেশী। ভয় পেলে বা দরকার বোধে প্রথমে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ায়, পরে কাছে-কিনারে উঁচু জায়গায় বা বড় বৃক্ষ থাকলে তার উঁচু ডালে উড়ে গিয়ে বসে। আরও মনোগ্রাহী এই যে, এরা কাঁটা-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পালখের ক্ষতি না করে উড়ে যেতে ও দৌড়তে পারে। সে যা হোক, ময়ূরের রাশীকৃত পালখ ও পেখম সম্ভবতঃ উড়ে বেড়াবার পক্ষে অনুকূল নয়।

অঙ্গে যার বর্ণসমৃদ্ধ রূপের বাহার, প্রকৃতি দেয় নি তাকে সুমিষ্ট সুর-কাকলী। ময়ূরের ডাককে বলে কেকা, আর সেই হিসেবে এরা কেকী নামে খ্যাত। বন-বনানীর নিস্তব্ধতাভঙ্গকারী কেকানিনাদ অরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়ে তোলে, কিন্তু সে পরুষ কণ্ঠস্বর বীরত্বব্যঞ্জক হলেও কেউ মধুর বলবে না। মনে হয় কবিকর্ণও পীড়িত এই কেকারবে। রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় লিখেছেন, "গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে, উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে"। শুধু তাই নয় বর্ষাসমাগমে ময়ূর আবার সরবে পেখম তুলে নৃত্যও সুরু করে দেয়।

প্রকৃতির প্রাণনিকেতন অরণ্যের স্বাভাবিক বসতিতে ময়ূর কতদিন বাঁচে, তা জানা যায় নি, অথচ কৌতূহলের অন্ত নেই আমাদের তা জানবার। অবশ্য পোষা ময়ূরের আয়ুর সাক্ষ্য আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সাধারণতঃ এরা 10 বছর বাঁচে, কিন্তু 40, 50 এমন কি একটির বেলায় 96 বছর বেঁচে থাকবার নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রাণিবিদ্যার কাগজপত্রের ভিতর নথীভুক্ত করা আছে।

এরা যূথচারী, দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। প্রজনন ঋতুতে একটি পুরুষের হারেমে থাকে তিন থেকে পাঁচটি ময়ূরী। পরে তাদের বাচ্চাদের সব নিয়ে এক একটির পরিবারদল গঠিত হয়। ভারতে এদের প্রজননকাল অঞ্চল হিসাবে বসন্তকাল থেকে শরৎকাল পর্যন্ত। প্রণয়প্রার্থী ময়ূরের নৃত্য সুরু হয় অপরূপ ভঙ্গীতে ময়ূরীর মন ভোলাতে। সঙ্গম নিয়ে দু-একটি অবিশ্বাস্য কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ময়ূরের বেয়াড়া লম্বা পেখম অন্যান্য পাখিদের মতন সঙ্গমে অন্তরায় বলে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর ধারণা। সে-ধারণা যে ভুল, সেকথা পক্ষীবিদ্‌রা বলেন। সে যা হোক,

এরা বর্ষা সুরু হলে ঘন লম্বা ঘাসের মধ্যে অথবা ঘন ঝোপের মধ্যে ডিম পাড়ে। দরকারে মাটি আঁচড়ে একটু গর্ত করে নিয়ে সেখানেও ডিম পাড়ে। কখন বা গাছের উপর শকুনির পরিত্যক্ত বাসায়, খড়ের চালায়, এমন কি পরিত্যক্ত বাড়ীর ঘাস গজানো ছাদেও এদের ডিম পাড়তে দেখা গিয়েছে। ডিমের সংখ্যা চার থেকে আট। মাঝে মাঝে এক বাসায় দশ-পনেরটা ডিম থাকাও অসম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমান স্বাভাবিক যে, একই বাসায় দুটি ময়ূরী ডিম পেড়েছে।

সিংহলে শোনা গেছে যে, ময়ূরের চর্বিতে বাত, মচকানো প্রভৃতি অসুস্থতায় নিরাময়তার সুফল পাওয়া গেছে। আরও মজার কথা যে, ময়ূরের পালখের 'চোখ' কলাপাতায় মুড়ে আগুনে ধরিয়ে নিয়ে সেই ধোঁয়া সিগারেটের মতন দিনে বারতিনেক টানলে ইঁদুর কামড়ানোর উপসর্গ থেকে বাঁচা যায়। 'চোখ'ওয়ালা পালখ চোখের রোগেও ব্যবহৃত হয়। চাঁদসীর ডাক্তারীতে ময়ূরের পালখের ব্যবহার আছে। অতীতে ভারতের ভেষজবিদ্যায় ময়ূরের মাংস পথ্য হিসাবে উপকারী বলে উল্লিখিত আছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে যদিও ময়ূরকে বন্দী করে লালিত-পালিত করা হয়েছে, তবু মানুষের সঙ্গে ঠিক তার কুকুর-বিড়ালের মতন অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। বস্তুতঃ অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীর সঙ্গে সহজেই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়, কেন না এরা মুরগী, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর সঙ্গে একত্রে, এমন কি এক পাত্রে, খেতে এবং তাদের সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করতে দ্বিধা করে না। বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় কেউ যে এদের মুরগীর মতন পোষে এমন কথাও জানা যায় নি। মনুষ্যাবাসে ময়ূর প্রতিপালন মুখ্যতঃ গৃহ-উদ্যান অলঙ্করন হিসাবেই করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে ময়ূর পুষেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীমতীনির্মলকুমারী মহলানবিশ তাঁর 'বাইশে শ্রাবণ' বইখানিতে লিখছেন,—

"বাড়ীর পোষা পাখির মধ্যে দুটো ময়ূর ছিল। সকালবেলা খানিকটা সময় তারা খাঁচা থেকে ছাড়া পেতো। তাদের মধ্যে একটা ময়ূরের কাণ্ড দেখে কতদিন হেসেছি। সে বাগানে ঘুরেফিরে বেড়াবার সময় যেই দূরে কোনো চাকরকে দেখতো অমনি তার ভয় হোতো এই বুঝি তাকে আবার খাঁচায় পুরে দেবে। বেচারা ভয় পেয়ে দৌড়ে এসে ঠিক কবির চেয়ারের পিছনের দিকে একটা বাঁধানো উঁচু জায়গায় এসে আশ্রয় নিতো এবং তারপর খুব নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে চাকরটার দিকে চেয়ে থাকতো। ভাবখানা এই যে 'ধরো দেখি এবার কেমন ধরবে?' সে যেন কি করে টের পেয়েছিল যে এই ধবধবে সাদা সৌম্যমূর্তি মানুষটির চেয়ারের পিছনটাই তার পক্ষে একমাত্র নিরাপদ জায়গা। কারণ চাকররা ময়ূরের কাছে এলেই কবি বলতেন, 'রেহাই দে বাপু তোরা পাখিটাকে, ও কেমন নিজের মনে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আমার দেখতে ভালো লাগে। কেন তোরা বেচারাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াস?' একদিন এই রকম অবস্থায় কবি হেসে আমাকে বললেন, 'একটা মজা দেখবে? ঐ চাকরটাকে যতক্ষণ এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবো, ততক্ষণ ময়ূরটা আমার পিছন থেকে নড়বে না।'

তখন শীতকাল। কবি অনেকক্ষণ বাইরে বসে নিজের কাজ করতেন, তারপর স্নানের সময় হলে বাইরের সভা ভঙ্গ হতো। সেদিন চাকরটাকে হুকুম দেওয়া হল যেন সে ওখান থেকে শীগ্‌গির না যায়। পাখিটাও তেমনি ঠায় চুপচাপ বসে রইল। আমি তো দেখে হেসেই অস্থির। কবি বললেন, এই অবোধ জীবগুলো কেমন করে যেন টের পায় যে আমার দ্বারা কোনো অনিষ্ট হবে না, তাই

এমন নির্ভয়ে আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করে।"

মনে হয় এই রকম এক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ময়ূরের দৃষ্টি' নামক গদ্য কবিতাটি লিখেছিলেন 1939 খৃঃ এপ্রিল মাসে। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। যখন লিখতে বসেছেন, তখন…

"আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে
পাশের রেলিংটির উপর।
আমার এই আশ্রয় তার কাছে নিরাপদ,
এখানে আসে না তার বেদরদী শাসনকর্তা
বাঁধন হাতে।
… … …
প্রাণের নিরর্থক চাঞ্চল্যে
ময়ূরটি ঘাড় বাঁকায় এদিকে ওদিকে।
তার উদাসীন দৃষ্টি
কিছুমাত্র খেয়াল করে না আমার খাতা-লেখায়,
করত, যদি অক্ষরগুলো হত পোকা;
তাহলে নগণ্য মনে করত না কবিকে।
হাসি পেল ওর ঐ গম্ভীর উপেক্ষায়,
ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা।
দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য
সমস্ত নীল আকাশে,
… … …
ভাবলুম, মাহেন্দজারোতে
এইরকম চৈত্রশেষের অকেজো সকালে
কবি লিখেছিল কবিতা,
বিশ্বপ্রকৃতি তার কোনোই হিসাব রাখে নি।
কিন্তু, ময়ূর আজও আছে প্রাণের দেনাপাওনায়,
… … …

এরও বছর বারো আগে 1334 সনের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ আর একটি কবিতা রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে। কবিতাটির নাম 'চামেলি-বিতান', সম্পূর্ণ ময়ূরকে উদ্দেশ্য করে লেখা এবং তাতে একটি মুখবন্ধ যোজনা করে দিয়েছেন,—

"চামেলি-বিতানের নিচের ছায়ায় আমি বসতুম—ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়-বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে-অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এযুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।"

সমগ্র কবিতাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অংশ বিশেষ মাত্র উদ্ধৃত করছি:

"ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
… … …
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি,

বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোন খেদ নাই।
তবু আমি খুশী আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস
যদিও, মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস
সুন্দরের দূত তুমি,
এ-ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন,
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান।

তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি—যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।
... ...

এ-হেন অনন্যসাধারণ পাখিকে ভারত সরকার 'জাতীয় পক্ষী' বলে ঘোষণা করেছেন। ময়ূর এখন আমাদের ভারত গৌরব জাতীয় পাখির প্রতীক।

"যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

(বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, বৈশাখ, 1279 বঙ্গাব্দ)

মানব-বিবর্তনের মূল্যায়ন

তারকমোহন দাস*

পৃথিবীর বয়স প্রায় পাঁচ-শ' কোটি বছর। পৃথিবীতে প্রাণের ব্যাপক সূচনা হয় প্রায় 250 কোটি বছর আগে। পৃথিবীর বয়সের শতকরা 50 ভাগ ছিল জীবনহীন, প্রাণীশূন্য। মানুষ এসেছে অনেক দেরীতে, মাত্র পনেরো থেকে বিশ লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাব থেকে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, তার শতকরা 99·9 ভাগ ছিল মানবহীন। মানুষ এসেছে প্রায় সবার পিছনে, সবার শেষে। এই দেরী করে আসা শেষের জনই জীবনের রঙ্গমঞ্চে আজ সকলকে হটিয়ে নাটকের মুখ্য ভূমিকাটির অধিকার নিয়েছে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবের দিন থেকেই এই গৌরব সে পায় নি। দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে এই ভূমিকাটির দখল নেবার জন্যে। মানুষের সভ্যতা বলতে যা বোঝায়, তার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় মাত্র আট-দশ হাজার বছরের পুরনো ইতিহাসের মধ্যে, যার অর্থ হলো, মানুষ যতদিন এসেছে তার শতকরা 99·5 ভাগ সময়ই মানুষ কাটিয়েছে বনে-জঙ্গলে, অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তাদের মতই বন্য জীবনযাপন করে। এই সময় শারীরিক বলে বলীয়ান অন্যান্য প্রাণীর উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নটি তার সামনে ছিল, কিন্তু সমাধান ছিল তার সাধ্যের অতীত। সভ্যতার সূচনা থেকেই এই ক্ষমতা তার ধীরে ধীরে করায়ত্ত হতে থাকে। পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র উদ্ভাবন করে, গৃহ ও জনপদ স্থাপন করে, চাষ-আবাদ সুরু করে নিজের নিরাপত্তা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই এই প্রশ্নটির সমাধান খুঁজে পায়। ঠিক এই সময় থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত জীবনযাত্রা প্রণালী পরিত্যাগ করে চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত এক নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে সুরু করে। কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করতে তাকে আরো দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে যতদিন না আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে, তার চিন্তা যতদিন না যুক্তি ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রকৃতির জটিল রহস্য উন্মোচনে নিয়োজিত হয়েছে। সেই হিসাবে মানুষের সভ্যতার বিস্তার যতদিন হয়েছে, তার শতকরা 90 ভাগই ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের স্পর্শরহিত।

কিন্তু এই শেষের শতকরা 10 ভাগ সময়ের ব্যবধানে অর্থাৎ মাত্র গত তিন-শ' বছরের মধ্যে মানুষ পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক চরিত্রের এত অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এবং প্রকৃতির ভারসাম্য এমন ভাবে বিপর্যস্ত করেছে, যা বিগত 250 কোটি বছরের মধ্যে কোন প্রাণীই কোন যুগে পারে নি এবং যার ফলে 250 কোটি বছরের পুরনো জীব-জগৎ আগামী আরও তত বছর টিকে থাকবে কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মনেই ঘোর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তাই অনেকেই আজ প্রশ্ন তুলেছেন—আমরা কোথায় চলেছি? মানুষ যে পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, তা মানুষকে শেষ পর্যন্ত কোন্ লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে? মানুষের আদৌ কি কোন লক্ষ্য আছে? কোন দিন কোন লক্ষ্য ছিল? তা অন্যান্য প্রাণীদের অপেক্ষা

* কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; কলিকাতা-19

কি স্বতন্ত্র? তা কি উভয়ের পক্ষে মঙ্গলকর? আমরা আজ যে পথ ধরে এখানে এসেছি, যেখানে যাচ্ছি, তা ব্যাপক অর্থে জীবনের উত্তরণের পথ কিনা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্যেই মানুষের ক্রমবিকাশের এক নিরপেক্ষ মূল্য বিচারের আজ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ক্রমবিকাশের মূল্যায়ন করা সত্যই কি সম্ভব? মূল্য কথাটা খুবই আপেক্ষিক। স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে এর মাত্রা আকাশ-পাতাল প্রভেদ হতে পারে। মানুষের ক্রমবিকাশের যদি মূল্য বিচার করতে হয়, তবে এর কালের ব্যাপ্তি হবে অতি ব্যাপক। শুধু আজকের দিন বা আজকের শতাব্দীর কথা ভাবলেই চলবে না, কয়েক কোটি বছর আগের ও পিছনের কথা ভাবতে হবে। তেমনি মানুষের মূল্য বিচারে শুধু মানুষের কথা ধরলেই চলবে না, পাত্র হিসাবে সকল প্রাণীকেই ধরতে হবে, কারণ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সকল প্রাণীরই নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। আর স্থান হিসাবে শুধু পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলই নয়—পৃথিবী ছাড়িয়েও মহাকাশের গ্রহমণ্ডল ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের কথা ভাবতে হবে। আগামী যুগে মানুষের গতিবিধি কতদূর প্রসারিত হবে, তা আজ কেউ জানে না। মোট কথা যিনি একাজে অগ্রসর হবেন, তাঁকে স্থান-কাল ও পাত্রের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ত্রিকালদর্শীর প্রজ্ঞা নিয়ে কাজ করতে হবে। যদিও এই কাজ সুরুর কোন নির্দিষ্ট সূত্র নেই, তবুও এই বিষয়ে যদি কেউ আগ্রহী হন, তাহলে তাঁর একাধিক পথ ধরে অগ্রসর হওয়াই উচিত। প্রথমতঃ দেখতে হবে বিগত কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষের দেহের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কি পরিবর্তন ঘটেছে? তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ কোন্ খাত ধরে কোন্ লক্ষ্যপথে চলেছে? দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে, মানুষের ক্রমবিকাশ অন্যান্য প্রাণীর জীবন ও প্রকৃতির ভারসাম্যকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তৃতীয়তঃ এর প্রভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভবিষ্যৎ ইতিহাস কিভাবে প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে? এসবের সম্ভাব্য পরিণাম যাচাইয়ের মধ্যেই মানুষের ক্রমবিকাশের মূল পর্যায়ের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের ক্রমবিকাশ বলতে মূলতঃ মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশই বোঝায়। মানুষের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, জীবন-পদ্ধতি সবই তার মস্তিষ্কজাত ফল। এই ফলের কতটা খাঁটি, কতটা ভেজাল—তা কোন দিন যাচাই হয় নি, কোন দিন সঠিকভাবে বাছাইও হয় নি, বর্জন তো নয়ই। মানুষ ছাড়া আর কোন মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে মস্তিষ্কের দ্রুত সমবিকাশ ঘটে নি; এটা মানুষের পক্ষে একটা পরম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। মানুষের সমান্তরালে অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে মস্তিষ্কের দ্রুত ক্রমবিকাশ ঘটলে মানুষের সত্যকার একজন প্রতিযোগী থাকতো এবং মানুষের জীবনধারা, তার বুদ্ধি ও চিন্তালব্ধ ফলগুলির বাছাইয়ের মাধ্যমে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যেত।

মানুষের মেরুদণ্ডের গঠন যথেষ্ট উন্নত। তার হাতের গঠনও উন্নত, সে পাঁচ আঙুল ও হাতের তালুর সাহায্যে যত রকম কাজকর্ম করতে পারে, মনুষ্যেতর কোন প্রাণী ততটা পারে না। কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, মানুষের দেহযন্ত্রের সামগ্রিকভাবে অবনতিই ঘটেছে; খুব সম্ভব ভবিষ্যতে আরো ঘটবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে তার যে সব বৈশিষ্ট্য ছিল, তা ব্যবহারের অভাবে অথবা অস্বাভাবিক ব্যবহারের ফলে নষ্ট হতে বসেছে। যেমন—দেহের ত্বক, দন্ত, নখ, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, পরিপাক শক্তি, হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর স্বাস্থ্য, দৈহিক কর্মক্ষমতা এবং রোগ

প্রতিরোধ শক্তি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক দক্ষতা ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ মানুষের ক্রমবিকাশের ফলে অধিকাংশ প্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা-প্রণালী ব্যাহত হয়েছে। ভিনজেনচ্ জিস্ভিলারের (Vinzenz Ziswiler) বিবরণ থেকে জানা যায়, মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বন্য প্রাণীর অবলুপ্তির হার বেড়ে চলেছে, এই হার বর্তমানেই সবচেয়ে বেশী, প্রতি তিন বছর অন্তর ছুট করে বন্য প্রাণী চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে স্তন্যপায়ী পশু, সরীসৃপ, পক্ষী, পতঙ্গ, উদ্ভিদ সবই আছে। ব্যাপকভাবে প্রাণী হত্যার ফলে বহু প্রজাতি অবলুপ্ত হয়েছে। অন্যেরা অবলুপ্ত হয়েছে পরোক্ষভাবে, মানুষের হাতে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হবার ফলে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মানুষ যতদিন অরণ্যবাসী ছিল, ততদিন প্রকৃতির ভারসাম্য মানুষের হাতে বিশেষ বিনষ্ট হয় নি। এই মতবাদের প্রমাণ হিসাবে দেখানো যেতে পারে যে, আজও পৃথিবীর যে সব অঞ্চলে আদিম মনুষ্যগোষ্ঠী বসবাস করে—যাদের হাতে আগ্নেয় অস্ত্র এখনও পৌঁছায় নি, সেখানে অন্যান্য প্রাণী নির্ভয়ে বাস করছে, অন্য দিকে গোটা ইউরোপে চিড়িয়াখানার বাইরে বন্য প্রাণী বলতে আর বিশেষ কিছুই নেই। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই নানারকম অপূর্ব বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যে সময়ের মধ্যে মানুষ লগুড় ত্যাগ করে আগ্নেয় অস্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছে, তা এতই সংক্ষিপ্ত, এতই আকস্মিক যে, ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোন প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব হয় নি মানুষের বিরুদ্ধে জন্মগত কোন উপযুক্ত স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলবার। তাই একান্ত অসহায়ভাবে মানুষের নিত্যনূতন কৌশলের কাছে সকল প্রাণীই দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায়, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি, এমন বহু প্রাণিগোষ্ঠী যুগে যুগে পৃথিবী থেকে স্বাভাবিকভাবেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু যখনই গেছে তখনই তার কোন উন্নত, নিকট বংশধরকে রেখে গেছে প্রতিভূ হিসাবে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রাণীই নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি; কাজেই কোন চিরস্থায়ী ক্ষতিও হয় নি। ডাইনোসরেরা চলে গেছে—গোসাপ, ইগুয়ানাদের রেখে গেছে। কিন্তু মানুষের হাতে আজ যারা লুপ্ত হয়ে গেল, তাদের আর কোন প্রতিনিধি রইলো না, তারা নিঃশেষে হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। এই সকল প্রাণীদের জীবনের সম্ভাব্য স্থায়িত্বকাল কারো ছিল 80 হাজার বছর, কারো এক লক্ষ বছর, কারোর বা তার চেয়েও বেশী, অর্থাৎ মানুষের অপটু হস্তক্ষেপে তারা অবলুপ্ত না হলে অতি দীর্ঘকাল তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতো। এই ক্ষতি তাই চিরস্থায়ী, এই ক্ষতি কোন দিন কোন মূল্যেই পূর্ণ হবে না।

মানুষের সভ্যতার সংঘাতে ও সংযোগে পরিবেশের বহু স্থায়ী পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন ঘটেছে এবং এর পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাটির তলাকার জল, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ গত 100 বছরের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে যে, আগামী 100 বছর পরে এগুলি আর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মানব-সভ্যতার প্রধান উপাদান কৃষি। এরই উপর ভিত্তি করে মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কৃষিকার্যের নাম করে প্রায় প্রত্যেকটি ফসলের চরিত্র মানুষ বদলে ফেলেছে। প্রত্যেকটি ফসলকে ক্রমাগত আরো বেশী পরিমাণে জল দিয়ে এবং আরো বেশী পরিমাণে সার খাইয়ে

তাদের জল ও সার গ্রহণের প্রবণতা অনেক বেশী বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, দূর অতীতে এই সকল শস্য বিনা সেচে, বিনা সারেই জীবনধারণে অভ্যস্ত ছিল। আগামী 100 বছরের মধ্যে মাটির তলাকার জল যখন অনেক কমে যাবে এবং ফসলের চাহিদা যখন বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে, তখন কি হবে? এই প্রশ্নের কোন উত্তর আজও আমাদের জানা নেই।

গত বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ে নি, কিন্তু বিষের উৎপাদন বিশ গুণ বেড়ে গেছে। প্রায় 500টিরও বেশী নানা রকম বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ কৃষি-ক্ষেত্রে কীটনাশক দ্রব্য হিসাবে, ঘুমের ওষুধরূপে, খাদ্যের ভেজাল হিসাবে, প্রসাধন সামগ্রীর উৎপাদনে, কলকারখানা ও মোটর গাড়ীর ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে মানুষ ও জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে। সেই সঙ্গে শান্তি অথবা অশান্তির জন্যে হোক, পৃথিবীর সর্বত্রই তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, সেখান থেকেও নানা রকম ক্ষতিকর পদার্থ পৃথিবীর জলবায়ুকে কলুষিত করে তুলছে। মনুষ্যচরিত্রের স্বাভাবিক অসতর্কতা ও একচক্ষু হরিণের মত একদেশ-দর্শিতার ফলে মনুষ্যসমেত পৃথিবীর সকল প্রাণিগোষ্ঠীই এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই গতি যদি আগামী 50 বছর অবধি অব্যাহত থাকে, তাহলে আগামী শতাব্দীতেই সারা পৃথিবীর দূষিত জলবায়ু স্থায়ীভাবে বিপদসীমা স্পর্শ করবে।

পরিবেশের বিকৃতির জন্যে যে কারণটি প্রধানতঃ দায়ী, তা হলো জনসংখ্যার বৃদ্ধি। জনসংখ্যার ঘনত্ব যেখানে সবচেয়ে বেশী, পরিবেশের বিকৃতি ঘটা বা ঘটবার সম্ভাবনাও সেখানে সর্বাধিক। এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে এটা ঘটেছে। পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীর মধ্যেই এই ধরণের অস্বাভাবিকহারে সংখ্যা বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ প্রজাতির প্রজনন ক্ষমতা অতি বিপুল হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়কর নানারকম বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে তারা জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সমতা বজায় রেখে চলেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। মানুষের মধ্যেও এই সব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে এসেছে, তার শতকরা 99·9 ভাগ সময়ের মধ্যে এই ধরণের কোন সমস্যা ছিল না, তার জন্ম ও মৃত্যুর হারের মধ্যে সমতা বজায় ছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দী হলো মানুষের মৃত্যুর হার হঠাৎ কমে যাওয়ায় এই অস্বাভাবিক হারে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই বিপর্যয়ের জন্যে যদি কোন এক ব্যক্তিকে দায়ী করতে হয়, তবে তাঁর নাম লুই পাস্তুর, তাঁরই আবিষ্কৃত তথ্য অনুসরণ করে মৃত্যুর হার, বিশেষতঃ শিশুমৃত্যুর হার মানুষ অনেক কমিয়ে ফেলেছে, কিন্তু জন্মের হার বিশেষ কমাতে পারে নি। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার এতই অস্বাভাবিক যে, এই হারে যদি বিগত দু-হাজার বছর ধরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতো তাহলে যিশুখৃষ্ট জন্মাবার আগেই পৃথিবীতে আদম-ইভের জন্মাবার প্রয়োজন হতো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল সমস্যা হলো শুধু মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিই নয়, মানুষের গুণ ও উৎকর্ষহানির নিশ্চিত সম্ভাবনা। প্রকৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল, সেখানে বাছাই ও বর্জন ছিল, কিন্তু মনুষ্য সমাজে যা প্রতিযোগিতা আছে, তা নিজেদের মধ্যেই এবং সেখানে বাছাই ও বর্জন নেই বললেই চলে। পৃথিবীর সকল মানুষকেই আমরা রক্ষা করতে চাইছি, সকল মানুষেরই শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই আদর্শ নিয়ে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে বিজয়ীর পাশে বিজিতও টিকে থাকে, সক্ষমের সঙ্গে অক্ষম, সবলের পাশে দুর্বল, জ্ঞানীর পাশে মূর্খ—সকলেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত হারে। অনেকে মনে করেন, এদের মধ্যে বাছাই ও বর্জন না

হলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জিন-পুল (Gene-pool) বিপর্যস্ত হবে—মানুষের বিবর্তনের স্রোত ব্যাহত হবে। যে ভাবে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণে মানুষ আজ অভ্যস্ত হচ্ছে, তাতে সমাজের বুদ্ধিমান, সক্ষম, সৃজনশীল ব্যক্তিরই সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে অক্ষম দুর্বল ও আতুরের সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। এরাই সম্ভবতঃ অদূর ভবিষ্যতে সমাজের সৃজনশীল অংশকে মুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। সে দিন যে মানুষের ইতিহাসে এক ঘোরতর দুর্দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, চিত্রকলা সবই মিথ্যা, মূল্যহীন হয়ে যাবে, মানুষ যদি নিজেই 'খাটো মাপের মানুষে' পরিণত হয়।

মানুষের ক্রমবিবর্তনের আর একটি দুর্ভাগ্য-জনক বিষয় হলো, মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ (Development) সকলের সমান নয়। মানুষে মানুষে আকাশ-পাতাল এই বৈষম্য। মস্তিষ্কের ক্ষমতার এই বৈষম্যই মনুষ্যসমাজে দারিদ্র্য, শোষণ ও অসমতার জনক। মস্তিষ্কের বিকাশ অনেকটাই নির্ভর করে শৈশব অবস্থায় পুষ্টির উপর। সুতরাং অক্ষম, আতুরের ঘরে তদপেক্ষা অক্ষম ও আতুরের সৃষ্টির সম্ভাবনাই বেশী। যাঁরা পপুলেশন বায়োলজি নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের মনোযোগ এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই।

বিগত কয়েক লক্ষ বছর ধরে মানুষের মস্তিষ্কের যে বিস্ময়কর দ্রুত বিবর্তন ঘটেছে, তা অন্য কোন প্রজাতির জীবের মধ্যে ঘটে নি। ক্রমবিকাশের স্রোতে মানুষ প্রকৃতপক্ষে আজ একা, নিঃসঙ্গ যাত্রী, যেটা প্রকৃতির মধ্যে খুবই বিরল ঘটনা। মানুষের আজ সত্যকার কোন প্রতিযোগী নেই, তাই সত্যকার কোন বন্ধুও নেই। অন্য কোন প্রজাতির সঙ্গে সমমানে প্রতিযোগিতা ঘটলে মানুষের জীবনধারা হয়তো অনেক বেশী সুশৃঙ্খল হতো, পোলারাইজ্‌ড্‌ হতো, এক-উদ্দেশ্য-অভিমুখী হতো, তার সুখ, আরাম ও রুচির সংজ্ঞা বদ্‌লে যেত, তার পঞ্চেন্দ্রিয় ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করতো। মানুষের চিন্তালব্ধ ফলগুলিও বাছাই ও বর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার উপযোগী হয়ে উঠতো, মানুষকে অনায়াসে আরো লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীতে টিকে থাকতে এগুলি সাহায্য করতো। সব কিছু বস্তু জোড়াতালি দিয়ে ধরে রাখবার প্রবণতা মানুষের থাকতো না। ক্ষেতের ফসলের মধ্যে আগাছা জন্মালে যেমন ফসল বিনষ্ট হয়, তেমনিই মানুষের চিন্তালব্ধ বিষয়গুলির মধ্যে প্রচুর অপ্রয়োজনীয় বিষয় থাকবার ফলে তার প্রকৃত কার্যকারিতা থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। অজস্র পাথরের নুড়ির মধ্যে মানুষের স্পর্শমণি হারিয়ে গেছে। জীবনের উত্তরণের পথে কোন্ বস্তুটি খাঁটি, কোন্ বস্তুটি ভেজাল, তা নির্ণয় করবার কষ্টিপাথর আজ মানুষের হাতে নেই, তা ছিল তার প্রতিযোগীর হাতে, তার তীক্ষ্ণ নখরে, তার ভয়াল দংষ্ট্রার আঘাতে, সে আজ অনুপস্থিত। প্রতিযোগিতা ছাড়া, নির্বাচন (Selection) ছাড়া ক্রমবিবর্তন অসম্ভব।

মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যেদিন বুদ্ধির বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেই দিনই এই শক্তি তাকে জীবনের ক্রমবিকাশের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে, মূল কক্ষপথ থেকে উৎক্ষিপ্ত করে এক নূতনতর কক্ষে স্থাপন করেছে। সেখানে সে এক নিঃসঙ্গ, মহাশক্তিধর মাতালের মত জীবনের অন্ধ গলিপথে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ঘুরে মরছে। তার মন বিশ লক্ষ বছরের অতীতকে অস্বীকার করতে চাইছে, অথচ তার দেহ ভুলতে পারছে না পূর্ব অভিজ্ঞতাকে। তার দৃষ্টি সামনের দিকে 50-60 বছরের বেশী দূর যাচ্ছে না, অথচ বর্তমানের মধ্যে বার বার খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছে তার উত্তরণের পথের নিশানা। তার গতি আছে লক্ষ্য নেই, তার ক্ষমতা আছে নিয়ন্ত্রণ নেই, তার বুদ্ধি আছে জ্ঞান

নেই। মানুষকে আরো দীর্ঘকাল যদি পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়, তাহলে তার ক্ষিপ্রগতির সঙ্গে স্থির লক্ষ্য, বিপুল ক্ষমতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের মিলন ঘটাতে হবে।

কিন্তু এপর্যন্ত এর জন্যে কোথাও কোন সার্থক প্রচেষ্টা সুরু হয় নি। হয়তো বড় দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সব কিছু ঘটনাই ঘটেছে বড় দেরীতে, ঘটনার প্রস্তুতির জন্যেই সময় ব্যয় হয়েছে বড় বেশী। মানুষের হাতে বিজ্ঞানের বহু হাতিয়ার আজ এসেছে, সভ্যতার একেবারে অন্তিম মুহূর্তে হয়তো জমে উঠবে নাটকের ক্লাইম্যাক্স—ইউ-জেনিক্স (Eugenics) ও বায়ো ইঞ্জিনীয়ারিংএর (Bioengineering) সফল প্রয়োগে হয়তো একেবারে শেষ সময়ে মানুষ চমকপ্রদভাবে কাটিয়ে উঠতে পারবে তার সকল সঙ্কট। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এটা শুধু ভবিষ্যৎ মানুষের জন্যে শুভ-কামনা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ থেকে 100 বছর আগে যদি পৃথিবীর জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে এখানে জীবনের প্রথম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র 50 বছর আগে, মানুষ এসেছে মাত্র ত্রিশ দিন আগে, মানুষের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে মাত্র সাত ঘণ্টা আগে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে মাত্র বিয়াল্লিশ মিনিট আগে। উত্তরোত্তর বর্ধিত গতি নিয়ে জীবনের ক্রমবিকাশের স্রোত বয়ে চলেছে, শেষ মুহূর্তেই ঘটনা ঘটছে মুহুর্মুহুঃ। এই চিত্রের কথা ভাবলে মনে হবে, কেউ যেন লস্ এঞ্জেলেস্ ফিলামনিক অর্কেষ্ট্রা কণ্ডাক্ট করছেন। প্রথমে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে ঐকতান চলছে, তারপর ধীরে ধীরে নিজস্ব গতি সঞ্চয় করে সুর পর্দায় পর্দায় উপর দিকে চড়ছে, ছন্দ দ্রুত থেকে আরো দ্রুত হচ্ছে, আজকের মানুষ তার শীর্ষবিন্দুতে বসে আছে, তার গতি ভবিষ্যতে আরো দ্রুত হবে, তাকে আরো উঁচু পর্দায় চড়তে হবে, পিছনে ফিরে তাকাবার তার কোন অবকাশই নেই—সম্ভবতঃ কোন ক্ষমতাও নেই, নেই কোন স্বাধীনতাও। তার ছন্দ, তার গতি অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টরের কাছে বাধা পড়ে আছে।

কিন্তু কে এই অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টর? একটি চিরন্তন প্রশ্ন। এর কোন উত্তর আজও জানা যায় নি। তা যদি জানা যেত—তাহলে মানব ক্রমবিকাশের মূল্যায়নের সঠিক মাপকাঠিটা পাওয়া যেত, তা আছে ঐ অর্কেষ্ট্রার কণ্ডাক্টরের হাতেই।

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শক করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন—পৌষ, 1322 বঙ্গাব্দ)

দুর্গাপুরের নভোরশ্মি ছত্রিকা-যন্ত্র

শ্রীমৃগাঙ্কশেখর সিংহ*

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার কথা শোনেন নি, এমন কেউ আমাদের মধ্যে আছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই নগরীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একাংশে যে একটি বৃহদায়তনের নভোরশ্মির শক্তি পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবিত ও নির্মিত হয়েছে, সে কথা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। এই অতি সূক্ষ্ম শক্তি-পরিমাপক যন্ত্রের নির্মাণ-কার্যে প্রায় বত্রিশ টনের মত লৌহপাতের প্রয়োজন হয়েছে। ইস্পাত-নগরীর সঙ্গে যন্ত্রের শুধু এটুকুই সম্বন্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, কার্যকরী পদ্ধতি, নির্মাণ-কৌশল, নভোরশ্মির ভরবেগ নির্ধারণ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে এই যন্ত্রের দ্বারা নির্ণীত দুটি বিশেষ তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রয়োজনীয়তা

এই যন্ত্রের দ্বারা কি মাপা যায় এবং কিভাবে মাপা যায়, তা বোঝবার পূর্বে এই পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা কি, সেটা জানবার চেষ্টা করা যাক। এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হলে নভোরশ্মির সঙ্গে পরমাণু-কেন্দ্র বিজ্ঞানের যোগ-সূত্র অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা সবাই জানি যে, পরমাণু-কেন্দ্রের নিউট্রন ও প্রোটন কণাগুলি পরস্পরের মধ্যে এক দুর্দান্ত বলের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট পরিবেশে অবস্থিত রয়েছে। এই বলের প্রভাব কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুত হ্রাস পায়; দূরত্ব কয়েক ফের্মি (1 ফের্মি $=10^{-13}$ সে.মি) হলেই আকর্ষণ অন্তর্হিত হয়। 1935 সালে জাপানী বৈজ্ঞানিক হিডেকি ইউকাওয়া (Hideki Yukawa) এই বলের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে, কেন্দ্রীনগুলির (কেন্দ্রকে অবস্থিত কণাগুলির কেন্দ্রীয় আকর্ষণের মাত্রা সমান বলে এদের নাম nucleon বা কেন্দ্রীন দেওয়া হয়েছে) মধ্যে প্রবল আকর্ষণ উদ্ভূত হয় একপ্রকার ক্ষুদ্র কণা বিনিময়ের মাধ্যমে। তড়িতাবিষ্ট প্রোটন ও নিস্তড়িৎ নিউট্রন নিজেদের ও পরস্পরের মধ্যে একই প্রকার বল অনুভব করে বলে তত্ত্বানুযায়ী এই বল-বিনিময়কারী কণাগুলি পজিটিভ, নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত এবং তড়িৎবিহীন—এই তিন প্রকারেরই হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া পরমাণু-কেন্দ্রের আয়তন ও বন্ধনীশক্তির মাত্রা থেকে ইউকাওয়া গণনার দ্বারা দেখান যে, এই কণাগুলি প্রায় 300 ইলেকট্রনের সমান ভরযুক্ত হবে। ইউকাওয়ার অনুমিত এই নূতন কণা আবিষ্কৃত হয় নভোরশ্মির মধ্যে 1947 সালে। আবিষ্কর্তা অধ্যাপক পাওয়েল (C. F. Powel) এই কণার নাম দেন পাই-মেসন (π-meson) বা সংক্ষেপে পাইয়ন (Pion)। পাওয়েল পজিটিভ ও নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত (π^+, π^-) কণারই শুধু সন্ধান পান এবং তাদের সঠিক ভর পরিমাপ করেন। দেখা যায় যে, সেগুলি 273 ইলেকট্রন-ভরের সমান। আরও 3 বছর পরে তড়িৎবিহীন পাইয়নের (π^0) সন্ধানও পাওয়া যায়। তবে তার ভর কিছুটা কম, 265 ইলেকট্রনের ভরের সমান। নভোরশ্মিতেই সর্বপ্রথম পাইয়নের আবিষ্কার হলেও, এই কণা পরে পরীক্ষাগারে গবেষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব

* রিজিওনাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, দুর্গাপুর-9

হয়েছে এবং পাইয়নের সকল আনুমানিক ধর্ম পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধর্মগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম পাইয়নের অতি সহজেই কেন্দ্রীনের সঙ্গে বিক্রিয়ার অংশগ্রহণ করা, যা ইউকাওয়ার গণনারও মূল সূত্র। কেন্দ্রীন-বলবিদ্যা গবেষণার প্রধান সহায় এই পাইয়ন কণার প্রকৃতি নির্ধারণ। কিন্তু গবেষণাগারে উৎপাদিত পাইয়ন কণার শক্তি 30/40 Gev-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে বিজ্ঞানীদের সুউচ্চ শক্তিসম্পন্ন (40 Gev-এর উপর) পাইয়ন বিক্রিয়ার গবেষণার জন্যে নভোরশ্মির পাইয়নের উপরেই নির্ভর করতে হয়।

কেন্দ্রীনের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়া (Strong interaction) ছাড়াও পাইয়নের আর এক প্রধান ধর্ম এই যে, এই কণাগুলি অতি ক্ষণস্থায়ী। মাত্র 25 nanosecond (1 nanosec $= 10^{-9}$ সেকেণ্ড) গড় জীবন-কাল নিয়ে এগুলি এতদপেক্ষা লঘু মিউ-মেসন অথবা মিউয়ন (μ meson বা muon) কণায় রূপান্তরিত হয়। এর সঙ্গে নিস্তড়িৎ ও ভরহীন নিউট্রিনো কণারও জন্ম হয়। এই রূপান্তর নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুযায়ী সংঘটিত হয়।

·(1)

পাইয়ন কণাপ্রসূত এই মিউয়ন কণার ভর সঠিকভাবে নিরূপণ করাও অধ্যাপক পাওয়েলের আর এক সার্থক গবেষণা। তাঁর পরিমাপ অনুযায়ী দেখা যায়, এগুলির ভর 206 ইলেকট্রনের ভরের সমান। আরও দেখা যায় যে, তড়িতাবিষ্ট পাইয়ন ($\pi^{\pm}$) সম-তড়িৎযুক্ত মিউয়নের জন্ম দেয় বটে, কিন্তু তড়িৎবিহীন পাইয়ন (π^{0}) তড়িৎবিহীন মিউয়নে পর্যবসিত হয় না। অনেক অনুসন্ধানেও কোনও তড়িৎবিহীন মিউয়নের অস্তিত্ব পাওয়া সম্ভব হয় নি। দেখা যায় মিউন-কণাও ক্ষণস্থায়ী। তবে এগুলির গড় জীবন-কাল প্রায় 2200 ন্যানোসেকেণ্ড; অর্থাৎ পাইয়ন অপেক্ষা এক-শ' গুণ বেশী। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এগুলি নিম্নলিখিত সমীকরণ অনুযায়ী ইলেকট্রনে পরিণত হয়।

$$\mu^{\pm} \rightarrow e^{\pm} + \nu + \bar{\nu} \cdots\cdots(2)$$

এক্ষেত্রে ইলেকট্রন ব্যতীত দুটি নিউট্রিনোর উৎপত্তি লক্ষণীয়। যেহেতু পাইয়ন ও মিউয়ন দুই প্রকার কণাই অতি ক্ষণস্থায়ী, সেহেতু নভোরশ্মির যে অংশ কোটি কোটি বছর বিশ্ব-পরিক্রমার পর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তার মধ্যে এই দুই রকম কণার অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। এগুলি নিশ্চয়ই নভোরশ্মির প্রাথমিক (Primary) কণার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির কেন্দ্রীনের সংঘর্ষের ফল। বিভিন্ন পরীক্ষায় নিশ্চিতরূপেই প্রমাণিত হয়েছে যে, নভোরশ্মির প্রাথমিক কণাগুলির শতকরা 95 ভাগই প্রোটন এবং এগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে বার বার কেন্দ্রীয় বিক্রিয়ার ফলে প্রভূত পরিমাণ পাইয়ন ও পরে মিউয়ন ও ইলেকট্রনের জন্ম দেয়। এজন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে (Ground-level) আমরা নভোরশ্মির যে অংশটুকু প্রত্যক্ষ করি, তার প্রায় 70 শতাংশ মিউয়ন। কারণ পাইয়নগুলি ওদের তীব্র বিক্রিয়ার ফলে এবং মিউয়ন অপেক্ষা প্রায় এক-শ' গুণ কম জীবনকালের দরুণ পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছুতেই পারে না। পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত নভোরশ্মির বাকী 30 শতাংশ প্রায় সবটুকুই ইলেকট্রন কণার সমষ্টি। মিউয়ন কণার জীবনকাল শুধু যে পাইয়নের জীবনকালের এক-শ' গুণ বেশী—তাই নয়, এদের কেন্দ্রীনের সঙ্গে বিক্রিয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। বহুবিধ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মিউয়নের কোনরূপ তীব্র বিক্রিয়া (Strong interaction) নেই বললেই চলে। ইলেক্ট্রনের তড়িৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার (Electromagnetic interaction) সহজ সম্ভাবনা থাকায় অত্যুচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন থেকে প্রচুর পরিমাণে কম শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-পজিট্রনের

জন্ম হয়। যেহেতু উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তড়িতান্বিত কণার তড়িৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা ওর ভরের বর্গের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক, সেহেতু মিউয়নের এরূপ বিক্রিয়ার সম্ভাবনা একই শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন অপেক্ষা চল্লিশ হাজার গুণ কম। পাইয়ন থেকে জন্মগ্রহণের পর মিউয়নের শক্তি-ক্ষয় হয় শুধু একটি মাত্র উপায়ে—বায়ুস্তরের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির পরমাণুগুলি আয়নিত করবার কার্যে। এই শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ এতই অল্প যে, যে শক্তি নিয়ে মিউয়ন বায়ুস্তরের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে পাইয়ন থেকে জন্মগ্রহণ করে (1নং সমীকরণ দ্রষ্টব্য), তার প্রায় সবটুকু নিয়েই তা পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছুতে সক্ষম হয়। কেন্দ্রীনের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ার অভাব, অধিক ভরজনিত তড়িৎ-চৌম্বক বিক্রিয়ার স্বল্পতা মিউয়নকে এক বিশিষ্ট কণায় পরিণত করেছে। মিউয়ন 2নং সমীকরণ অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইলেকট্রন-পজিট্রনের জন্ম দিয়ে অন্তর্হিত হয় বটে, কিন্তু এর জীবনকালে শক্তিক্ষয়ের পরিমাণ স্বল্প এবং তা সহজেই গণনা করা যায়। এজন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠে মিউয়নের শক্তি-ছত্রিকা (Energy-spectrum) নির্ণয় করা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বলে পরিগণিত হয়েছে। এই শক্তি-ছত্রিকাকে ক্রমশঃই অত্যুচ্চ মানের শক্তির (Ultra high energy) দিকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলছে। মিউয়নের শক্তি-ছত্রিকা নির্ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য ওদের জন্মদাতা অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন পাইয়নের শক্তি-ছত্রিকা নিরূপণ। আর এই পরবর্তী তথ্যই অত্যুচ্চ শক্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ে সাহায্য করবে। আর একটি বিশেষ তথ্যও মিউয়নের ছত্রিকা নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই নির্ণীত হয়। এটা হলো বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন মিউয়নের পজিটিভ ও নেগেটিভ কণাগুলির সংখ্যানুপাত। এই অনুপাত একই শক্তিক্ষেত্রে পাইয়নের অনুরূপ অনুপাত নির্ণয়ে সাহায্য করবে এবং কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে নূতন তথ্যের সন্ধান দেবে। মিউয়নের শক্তি-ছত্রিকা নির্ধারণের যন্ত্র ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডের ডারহাম ও নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মিত হয়েছে। দুর্গাপুরে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে নির্মিত এই যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে বুদাপেষ্টে অনুষ্ঠিত নভোরশ্মির আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় পঠিত হয়েছে।

কার্যকরী পদ্ধতি

কোনও তড়িতাবিষ্ট কণা চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে লম্বভাবে একই গতিবেগে ভ্রমণ করলে সেটি বৃত্তাকারে ঘূর্ণিত হয়। এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কণার ভরবেগের (Momentum) সঙ্গে সমানুপাতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক হয়। যদি কণার পথ-পরিক্রমার সর্বত্রই চৌম্বক ক্ষেত্রের মান সমান থাকে, তবে চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে এবং বহির্গমনের অব্যবহিত পরে কণাটির গতিপথের দিক সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলেই এর ভরবেগ জানা যাবে। সামান্য গণনা করলেই দেখা যায় যে, কণার ভরবেগ (শক্তির এককে প্রকাশিত) p নিম্নলিখিত সমীকরণ মেনে চলবে।

$$p = \frac{0.03\, BL}{\theta}\ Gev/c \quad \cdots\cdots (3)$$

এস্থলে B = চৌম্বক ক্ষেত্রের মান (Kilogauss এককে)

L = কণাটির চৌম্বক ক্ষেত্রে পথদৈর্ঘ্য (মিটার এককে)

θ = কণাটির দিক পরিবর্তনের মাত্রা (Radian)

[মনে রাখতে হবে অত্যুচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণার ভরবেগ (শক্তির এককে প্রকাশিত) ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য নগণ্য। এক ইলেকট্রন ভরশক্তি = 0.51 Mev এবং মিউয়নের ভরশক্তি = 106 Mev ; 1 Gev = 1000 Mev]

3নং সমীকরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কণার ভরবেগ নির্ণয়ের নিরীক্ষণ-ত্রুটি (Experimental error) চৌম্বক ক্ষেত্রে ওর দিক পরিবর্তন (θ) নির্ণয়ের ত্রুটির উপরেই নির্ভর করবে। কারণ চৌম্বক ক্ষেত্র B এবং তার দৈর্ঘ্য L উভয়ের মান যথেষ্ট বৃহৎ। ফলে ওদের মান নির্ণয়ে ভুলের সম্ভাবনা অল্প। কণার ভরবেগ যত অধিক হবে, দিক পরিবর্তনের মাত্রা ততই অল্প হবে এবং যে ভরবেগে পৌঁছুলে কণার চৌম্বকীয় দিক পরিবর্তন (Magnetic deflection) ওর নিরীক্ষণ ত্রুটির সমান হবে, সেই ভরবেগকে ঐ যন্ত্রের সর্বোচ্চ পরিমাপযোগ্য ভরবেগ (Maximum detectable momentum) বলা হয়। কণাটি ওর আগমন-পথের কোন্ দিকে বাঁকছে, তা লক্ষ্য করলেই ফ্লেমিংসের সূত্রানুযায়ী ওর তড়িতাধান পজিটিভ, কি নেগেটিভ—তাও জানা যাবে।

এখন দেখা যাচ্ছে যে, কোনও তড়িতাবিষ্ট কণার ভরবেগ নির্ধারণের যন্ত্র নির্মাণ করতে হলে মুখ্যতঃ দুটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

1) যথেষ্ট দৈর্ঘ্য (L) সমন্বিত সুষম সুউচ্চ (Uniform and high) চৌম্বক ক্ষেত্রের (B) ভিতর দিয়ে কণাটিকে পরিচালিত করতে হবে—'দিক-পরিবর্তন মাত্রার (θ) বৃদ্ধির প্রচেষ্টা'।

2) কণাটির আগমন ও নির্গমন পথ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করতে হবে—'দিক পরিবর্তনের নির্ভুল পরিমাপ'।

প্রথম দিকে এরূপ যন্ত্র নির্মাণের সময় বিরাট তড়িচ্চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী ফাঁকে বায়ুস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্র কণাটির দিক পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রথমতঃ বায়ুস্থিত ক্ষেত্র সুষম ও সুউচ্চ করতে হলে মেরুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব অধিক করা চলে না, ফলে অতি অল্প সংখ্যক কণাই এই স্বল্পপরিসর স্থানের মধ্য দিয়ে যেতে পারে এবং পরীক্ষার ফল সংখ্যাল্পতা দোষে দুষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ বায়ুস্থিত চৌম্বক ক্ষেত্রের মাত্রা কখনই খুব বেশী করা যায় না। এজন্যে কণার সর্বোচ্চ পরিমাপযোগ্য ভরবেগ (স. প. ভ) 70/80 Gev-র উর্ধ্বে উন্নীত করা যায় না। এই দুটি অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বায়ু পরিব্যাপ্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যবহারে একটি বিশেষ সুবিধা আছে। এক্ষেত্রে কণাটির চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে গমনকালে যে দিক পরিবর্তন হয়, সেটি সম্পূর্ণভাবে চৌম্বক শক্তির দ্বারাই ঘটে থাকে। পরন্তু এই ক্ষেত্র যদি লৌহ-পিণ্ডের মধ্যে প্রবর্তিত করা হয়, তবে ক্ষেত্রের মান খুবই বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু কণার চৌম্বকীয় দিক পরিবর্তন ব্যতীত লৌহপিণ্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দরুণ বিচ্ছুরণের (Scattering) ফলে আরও কি.. দিক পরিবর্তন ঘটে। বায়ুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে গমনকালে কণার বিচ্ছুরণজনিত দিক পরিবর্তন অতি সামান্যই ঘটে এবং তার ভরবেগ সরাসরি 3নং সমীকরণ থেকেই পাওয়া যায়। অধুনা কণার শক্তি-ছত্রিকা উচ্চ মানের শক্তি (1000 Gev. এবং আরও বেশী) অবধি প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে লৌহপিণ্ডের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় কিন্তু কণাটির লৌহপিণ্ডে বিচ্ছুরণজনিত দিক পরিবর্তন কিছু না কিছু থেকেই যায় এবং এই কারণে সরাসরি প্রাপ্ত শক্তি-ছত্রিকার উপর বিচ্ছুরণ-সংশোধন (Scattering correction) প্রয়োজন হয়। গাণিতিক তত্ত্বে জানা যায় যে, বিচ্ছুরণজনিত দিক পরিবর্তন লৌহপিণ্ডের দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক, অথচ চৌম্বক ক্ষেত্রজনিত দিক পরিবর্তন ওর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সমানুপাতিক। অতএব অনাকাঙ্খিত বিচ্ছুরণজনিত দিক পরিবর্তন ও চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তনের অনুপাত লৌহ-পিণ্ডের দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক হবে। সুতরাং এই দৈর্ঘ্য যতই বৃদ্ধি করা যাবে, উপরিউক্ত সংশোধনের মাত্রা ততই কম হবে। নভোরশ্মি শক্তি-ছত্রিকা যন্ত্রের ক্রমোন্নতির

ইতিহাসে দেখতে পাই যে, বিভিন্ন গবেষণাগারে নির্মিত এই যন্ত্রে কেবলই চুম্বকের লৌহপিণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে যাওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুরে এই যন্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় 1966 সালে। তার নির্মাণ-কার্য শেষ হয় 1968 সালে। 1969 সালের গোড়ায় দুর্গাপুরের যন্ত্রটি প্রথম চালু হবার সময় এটাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নভোরশ্মি শক্তি-ছত্রিকা নির্ধারক যন্ত্র ছিল। তার স. প. ভ প্রায় 1000 Gev/c। বর্তমানে আরও বৃহদাকারের যন্ত্র ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে, তার স. প. ভ প্রায় 6000 Gev/c-তে পৌঁচেছে।

নির্মাণ-কৌশল

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শক্তি-ছত্রিকা যন্ত্রের দুটি অংশ আছে।

1) কণার দিক পরিবর্তনকারী সুবৃহৎ চুম্বক।

2) কণার আগমন-নির্গমন পথ নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করবার ব্যবস্থা।

আমরা দুর্গাপুর-যন্ত্রের এই দুটি অংশের পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

চুম্বক-পরিকল্পনা ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সঠিক পরিমাপ

গবেষণাগারে উচ্চ ক্ষেত্রবিশিষ্ট চুম্বক সাধারণতঃ তড়িচ্চুম্বকের দ্বারাই উৎপাদিত হয়। এই চুম্বক নির্মাণে যে লৌহ ব্যবহৃত হয়, তার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম থাকা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা থেকে কয়েকটি বিশেষ ধরণের লৌহপাতের নমুনা সংগ্রহ করে সেগুলির চৌম্বক ধর্ম পরীক্ষা করি। [প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুর্গাপুর কারখানায় লৌহপাত প্রস্তুত করা হয় না] এগুলির মধ্যে যে নমুনাটি সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তার ধাতুগত বিশ্লেষণ নিয়ে দেওয়া হলো।

মৌল	C	S	P	Mn	Si	Fe
শতকরা অংশ	0·062	0·024	0·025	0·351	0·043	বাকী-টুকু

উপযোগিতা নির্ণয়ে প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল এই যে, লৌহপাতটি তড়িৎ-প্রবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে অতি দ্রুত চৌম্বকীয় সম্পৃক্তি (Magnetic saturation) লাভ করবে এবং প্রায় সম্পৃক্ত অবস্থায় সামান্য তড়িৎ-প্রবাহ পরিবর্তনে চৌম্বক ক্ষেত্রের মানের বিশেষ পরিবর্তন হবে না; অর্থাৎ চুম্বকন তড়িৎ-প্রবাহের (Magnetising current I) আংশিক পরিবর্তন $\delta I/I$ এবং এর ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের আংশিক পরিবর্তন $\delta B/B$ এই দুয়ের অনুপাত

$$F=\frac{\delta P/B}{\delta I/I}$$

যথাসম্ভব কম হবে। 1নং চিত্রে F এবং B-এর মান চুম্বকন প্রবাহের মাত্রা I-এর সঙ্গে কিরূপে পরিবর্তন করে, তা দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখতে পাই প্রায় 15 অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে B-এর মান 16 Kilogauss এবং F-এর মান 0.13। রাউরকেলায় প্রস্তুত লৌহপাত চুম্বক নির্মাণে বিদেশীয় গবেষণাগারে অনুরূপ কার্যে ব্যবহৃত লৌহ অপেক্ষা উৎকর্ষের দাবী রাখে।

পরিকল্পনা কালে স্থির হয় যে, দুর্গাপুরের যন্ত্রে এক মিটার দীর্ঘ দুটি লৌহ চুম্বক ব্যবহৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত নমুনানুযায়ী 6′×4′×½″ (ছয় ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া ও আধ ইঞ্চি মোটা) 160 খানি লৌহপাত ক্রয় করা হয়। এর প্রত্যেকটির মাঝখানে 3′×1′ (তিন ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া) গর্ত করে গর্তের চার কোণ সামান্য গোলাকৃতি করা হয়। পরে এগুলি (এগুলির প্রত্যেকটির ওজন প্রায় 200 কেজি) একটির উপর একটি সাজিয়ে 80খানি পাতবিশিষ্ট দুটি বিরাট লৌহখণ্ডে পরিণত করা হয়। এই যন্ত্র স্থাপনার নিমিত্ত পূর্বেই 'মেঝে থেকে ছাদ' 25 ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘরের

মধ্যে বিশেষ ধরণের একটি লৌহ শৈলী (Iron structure) নির্মাণ করা হয়। ঐ লৌহ শৈলীর দুটি স্তরে এই দুই লৌহখণ্ড স্থাপিত করা হয়। লৌহ পাতগুলি পর পর স্থাপিত করবার সময় 'ক' চিত্রে ছাদের কিছু নীচ থেকে প্রথম কাঠের প্ল্যাটফরম AA অবধি দেখা যাচ্ছে। খ চিত্রে এই কাঠের প্ল্যাটফরমের নীচ থেকে দ্বিতীয় প্ল্যাটফরম BB অবধি দেখা যাচ্ছে। দুটি প্ল্যাটফরমের
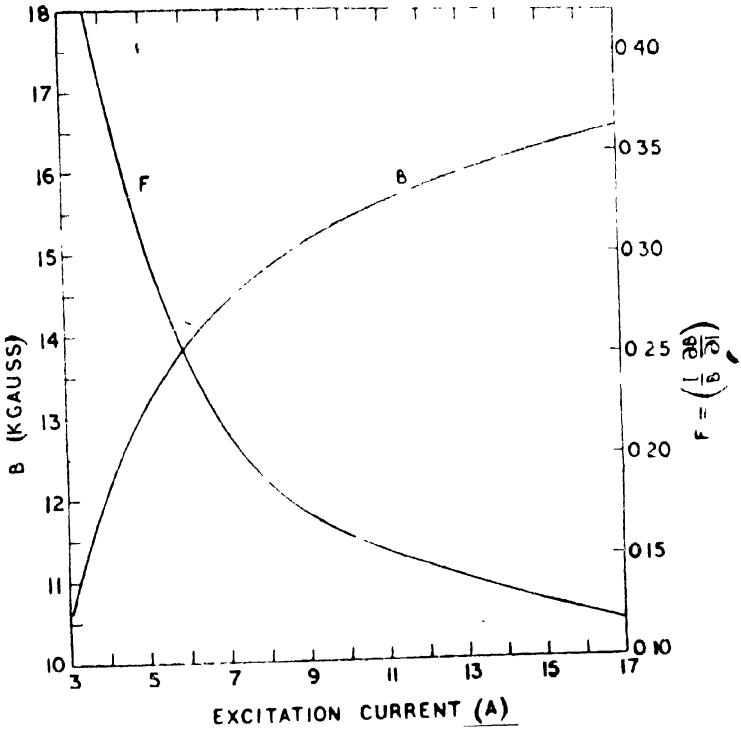
1নং চিত্র—চুম্বকন-প্রবাহের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ও সম্পৃক্তি।

প্রতি 5টি লৌহপাত ঘিরে তার বিভিন্ন স্থান থেকে একটি করে তাম্রকুণ্ডলী বের করে নেওয়া হয় (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বিভিন্ন স্থানে জড়িয়ে রাখা এই তাম্রকুণ্ডলীগুলিকে অনুসন্ধানী কুণ্ডলীরূপে (Search coil) ব্যবহার করা হয়েছে; অর্থাৎ এগুলির সাহায্যে লৌহপিণ্ড চুম্বকিত করবার পর এর ভিতর বিভিন্ন স্থানে কত মানের ক্ষেত্র উৎপাদিত হলো, তা নির্ণীত হয়েছে। সমস্ত যন্ত্রটি স্থাপনার পর কিরূপ দেখতে হয়েছে, তার কিছু আভাস 3নং ক ও খ চিত্রে পাওয়া যাবে। মধ্যে দূরত্ব 8 ফুট। এগুলি যন্ত্রটির চারদিক ঘিরে অবস্থিত আছে। ক চিত্রে উপরের চুম্বকের একাংশ এবং খ চিত্রে উপরের চুম্বকের বাকী অংশ ও নীচের চুম্বকের সমস্তটুকুই দেখানো হয়েছে।

প্রতিটি চুম্বকে 14 S.W.G নম্বরের দুই স্তর তুলার দ্বারা অন্তরিত (Double cotton covered) 600 কের তামার তার জড়ানো হয়েছে। এই তারের মধ্যে 15 অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ-চালনার জন্যে বিশেষ ধরণের সুস্থিত ক্ষমতা সরবরাহকারী

(Stabilised power supply) দুটি ইউনিট-ব্যবহার করা হয়েছে। বহিরাগত ক্ষমতা সরবরাহ শতকরা 10 ভাগ পরিবর্তিত হলেও এই ইউনিট-তার নিখুঁত পরিমাপের উপরেই ওর ভরবেগ পরিমাপের শুদ্ধি (Accuracy) নির্ভর করছে। অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন (1000 Gev/c) কণার
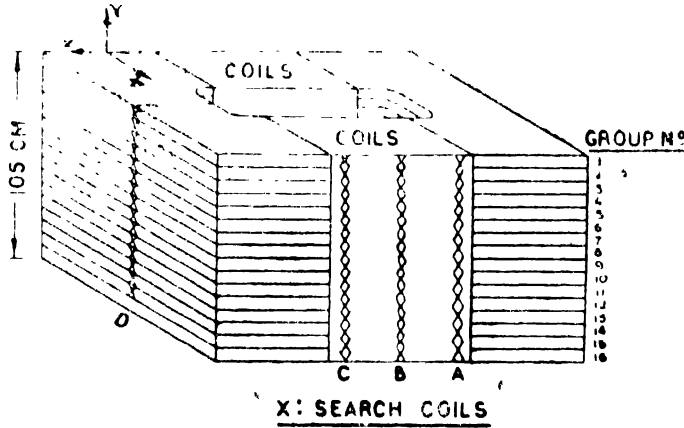
2নং চিত্র—চুম্বকন-কুণ্ডলী ও অনুসন্ধান-কুণ্ডলীসহ একটি চুম্বকের স্কেচ।

গুলিতে শতকরা এক ভাগেরও কম পরিবর্তন হয়। স্থানাভাবে চৌম্বক ক্ষেত্রের সঠিক পরিমাপের বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল না। আদর্শ মিউচুয়াল ইন্ডাকটেন্স ও সঠিক পাঠসমন্বিত ফ্লাক্স মিটারের সাহায্যে এই পরিমাপক্রিয়া অতি যত্নসহকারে সম্পন্ন করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, দুটি চুম্বকের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্রের পার্থক্য শতকরা এক ভাগেরও কম এবং দশ বারো ঘণ্টারও বেশী অবিরাম চালনার পরেও এই ক্ষেত্রের মানে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় না।

চুম্বক দুটির উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি 75সে.মি × 30 সেমি. পরিমাণ স্থানে যে নভোরশ্মি (এক্ষেত্রে মিউয়ন) আপতিত হয়, সেগুলির ভরবেগ নির্ধারণ-কল্পে আগমন-নির্গমনের পথ চিহ্নিত করবার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত উপায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

আপতিত রশ্মির পথ চিহ্নিত করবার ব্যবস্থা

চুম্বকের উপর আপতিত রশ্মির আগমন-পথ থেকে এর নির্গমন-পথ কতটুকু বিচ্যুত হলো, ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি এতই অল্প (< 1 মিমি) যে, এর নির্ভুল পরিমাপ বিশেষ কৌশলসাপেক্ষ। আমাদের যন্ত্রে মিউয়ন কণার পথ চিহ্নিত করবার কাজে 5টি নিয়ন-দীপ্তিনলের (Neon flash tube) ট্রে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি ট্রেতে 120টি নল 8 সারিতে সমদূরবর্তী V আকারের 15টি খাতে (Groove) স্থাপিত করা হয়েছে। এরূপ একটি ট্রের সম্মুখভাগ 4নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দীপ্তিনলগুলি এক মিটার দীর্ঘ এবং 1·8 সে.মি ব্যাসবিশিষ্ট। আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী করবার জন্যে এগুলির সম্মুখ দিক মসৃণ সমতল করা হয়। নলগুলিতে 60 সে.মি পারদ-চাপে নিয়ন গ্যাস ভর্তি থাকে এবং যখনই এর ভিতরে কোনও তড়িতাবিষ্ট কণা প্রবেশ করে, তখনই যৎসামান্য নিয়ন গ্যাস আয়নিত হয়। কণার প্রবেশ মুহূর্তের অত্যল্প সময় পরে (প্রায় 5 মাইক্রোসেকেণ্ড) যদি নলের উপর 4·2 কিলো-ভোল্ট / সেমি মত একটি ক্ষণস্থায়ী তড়িৎ-ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তবে ঐ প্রবিষ্ট কণার দ্বারা

আয়নিত সামান্য গ্যাস নলের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্যাসটিকে আয়নিত করে দেয়। ফলে সম্পূর্ণ নলটি লোহিত বর্ণের এক উজ্জ্বল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়।

যুগ্ম সংখ্যার পাতগুলিতে সাধারণতঃ কোনও বিভব থাকে না। তবে যখনই কোনও তড়িতাবিষ্ট কণা ছত্রিকা-যন্ত্রের সমস্ত দৈর্ঘ্যটুকু (প্রায় 6 মিটার) সোজাসুজি অতিক্রম করে, তখনই
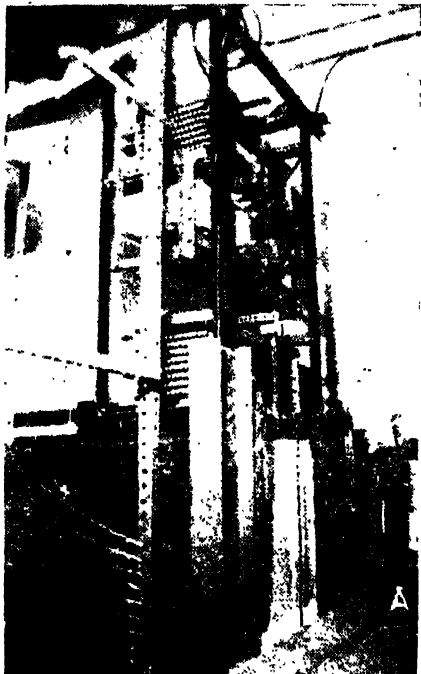
3নং ক চিত্র

3নং খ চিত্র

3নং (ক) চিত্র—ছত্রিকা-যন্ত্রের দক্ষিণ ভাগ—ছাদ থেকে প্রথম কাঠের প্ল্যাটফরম AA অবধি।
3নং (খ) চিত্র—ছত্রিকা-যন্ত্রের দক্ষিণ ভাগ—প্রথম প্ল্যাটফরমের নীচ থেকে দ্বিতীয় প্ল্যাটফরম BB অবধি

8 সারি নলের প্রত্যেক সারির উপরে ও নীচে 75 সে.মি × 30 সে.মি × 1 মি.মি আকারের সর্বসমেত 9টি অ্যালুমিনিয়ামের পাত রাখা আছে। এই 9টি পাতের যুগ্ম ও অযুগ্ম ক্রমিক সংখ্যার (অর্থাৎ 2, 4, 6, 8···এবং 1, 3, 5, 7, 9··· সংখ্যার) পাতগুলি পৃথকভাবে তামার দ্বারা যুক্ত আছে এবং তাদের মধ্যে ব্যবধান 2·8 সেমি রাখা আছে। অযুগ্ম সংখ্যার পাতগুলি সর্বদাই শূন্য বিভবে (Earthed) অবস্থিত থাকে।

এই কণাটির আগমন সংকেত ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থার মাধ্যমে 5 মাইক্রোসেকেণ্ড দেরীতে যুগ্ম পাতগুলির উপর 12 কেভি বিভব প্রক্ষিপ্ত করে। বিভব মাত্রা প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে 12 কেভি অবধি উঠতে কিছু সময় লাগবেই। এই সময় যত অল্প হয়, ততই দীপ্তিনলের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে যে, বিভব প্রভেদের উত্থান কাল (Rise time) 0·7 মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যে থাকাই বাঞ্ছনীয়। দীপ্তিনলগুলি পরপর

এমনভাবে সজ্জিত আছে যে, কোনও তড়িতাবিষ্ট কণা ট্রের মধ্য দিয়ে সরাসরি গমন করলে ঐ ট্রের আট সারি নলের অন্ততঃপক্ষে চার সারির এক বা ততোধিক নল দীপ্তিমান হবে। ট্রেগুলির দুটি প্রথম চুম্বকের উপরে, একটি দুই চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে এবং অপর দুটি দ্বিতীয় চুম্বকের নিম্নে স্থাপিত হয়েছে (6নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রের অবস্থান 3নং ক ও খ চিত্রে দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ ও পঞ্চম ট্রে দুটি সাহায্যে ওর পথচিহ্ন কিরূপভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়, তা 5নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এরূপ একটি আলোকচিত্র থেকে ঐ কণার আগমন ও নির্গমন পথের মধ্যে বিচ্যুতির পরিমাণ কতটুকু, তা কিরূপে নির্ণীত হয়, এখন সেই কথা বলছি। যে V-আকারের খাতগুলির উপর নিয়ন নলগুলি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলির কেন্দ্রবিন্দুর মধ্যে ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম মিলিং মেশিনের সাহায্যে 2.000 সে.মি এই ধ্রুবকে রাখা আছে; অর্থাৎ
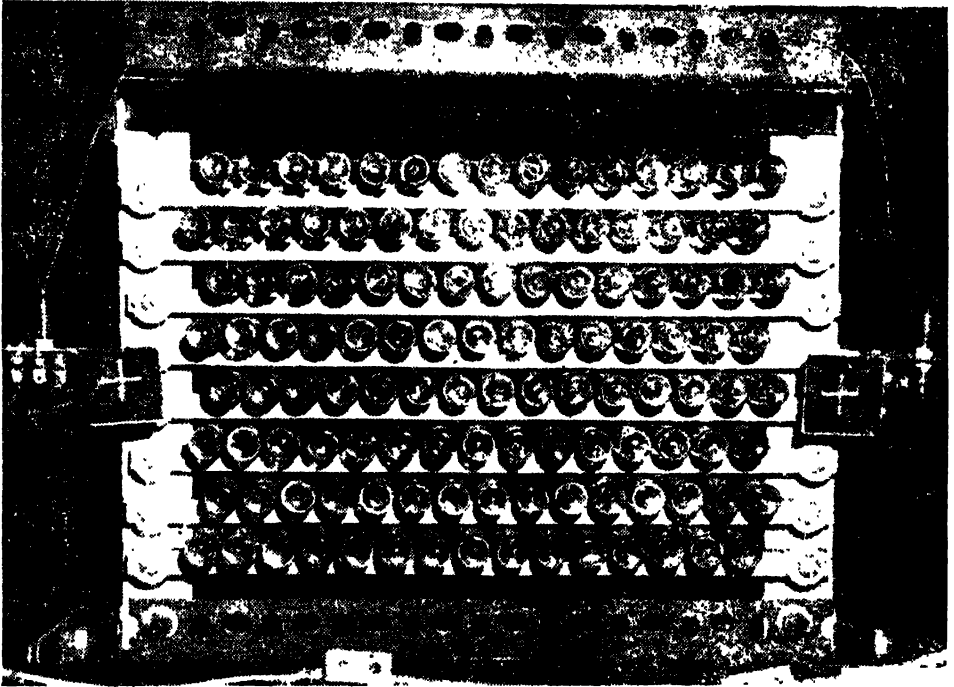
4নং চিত্র—120টি নিয়ন-দীপ্তি-নলসহ একটি নিয়ন-ট্রে।

দ্বিতীয় চুম্বকের নিম্নে অবস্থিত বলে এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে না। পাঁচটি ট্রের দীপ্তিমান সব কয়টি নলেরই আলোকচিত্র একই ফিল্মে নেবার জন্যে কয়েকটি সমতল দর্পণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে (6নং চিত্র)। একটি কণা ছত্রিকা-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সরাসরি গমন করলে নলগুলির দীপ্তির পাশাপাশি দুটি নলের কেন্দ্রবিন্দুর ব্যবধান সর্বত্রই 2.000 সে.মি এবং এটিকেই এক নল ব্যবধান (One tube separation or 1 t. s) বা 1 ন. ব. বলা হয়। আমাদের যন্ত্রে 1 ন. ব. সমান 2.000 সে.মি আর পথবিচ্যুতির পরিমাপ সব ক্ষেত্রেই এই ন. ব.-র-এর এককে প্রকাশ করা হয়।

প্রতিটি সারিতে নিয়ন নলগুলির ক্রমিক সংখ্যা বামে 'এক' থেকে সুরু করে দক্ষিণে 'পনেরো' অবধি চলে গেছে। পরন্তু 4নং চিত্র লক্ষ্য করলে
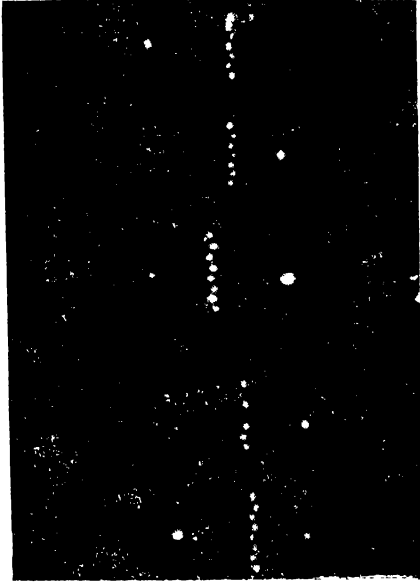
5নং চিত্র—5টি নিয়ন-ট্রের মধ্য দিয়ে গমনকালে একটি মিউয়ন কণার 5টি পথ-চিহ্ন।

দেখা যাবে যে, যে কোনও সারির নল পূর্ববর্তী সারি থেকে কিছুটা সরিয়ে বসানো হয়েছে। প্রতি সারির নলগুলিকে এরূপ ধারাবাহিক ভাবে দক্ষিণে ও বামে সরিয়ে বসানো পথ চিহ্নিত করবার কাজকে ত্রুটিহীন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। পথচিহ্ন নির্দিষ্ট করবার কাজে নিম্নতম ত্রুটি (Minimum error in track location) শক্তি-ছত্রিকা যন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুণ এই ত্রুটি যতই হ্রাস করা যাবে, শক্তি-ছত্রিকার শুদ্ধি ততই বৃদ্ধি পাবে। এই ত্রুটি হ্রাসের প্রথম পদক্ষেপ হলো—5টি ট্রেকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে, প্রত্যেক ট্রের যে কোনও নলের কেন্দ্রবিন্দু অন্য যে কোনও ট্রের ঠিক অনুরূপ নলের কেন্দ্রবিন্দু একই উল্লম্ব রেখায় অবস্থিত থাকবে। এইভাবে ট্রে স্থাপনার জন্যে 5টি ট্রের প্রত্যেকটির চার কোণে ঠিক একই স্থানে চারটি প্লাষ্টিক পাতের উপর 1 mm ব্যাসবিশিষ্ট চারটি ছিদ্র করা হলো। এখানে সর্বোপরি ট্রেকে যথাস্থানে বসিয়ে ওর চতুষ্কোণের চারটি ছিদ্রের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে 0 2 mm ব্যাসের শক্ত নাইলন সুতা বের করে তার অপর প্রান্তে একটি ভারী পিতলের গোলক তৈলপূর্ণ পাত্রে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ট্রেটিকে অতি ধীরে সামান্য চালনা করে এমন অবস্থায় আনা হলো, যাতে নাইলন সুতাগুলি ছিদ্রের দেয়ালে কোথাও স্পর্শ না করে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এইবার দ্বিতীয় ট্রেট বসিয়ে ওর অনুরূপ চারটি ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পূর্বের চারটি নাইলন সুতা প্রবেশ করিয়ে কেবলমাত্র দ্বিতীয় ট্রেটি সামান্য নাড়াচাড়া করে ওলন চারটিকে পুনরায় সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলো। এরূপে পাঁচটি ট্রে সাজাবার পর সব ট্রেগুলি শক্ত করে পূর্বোক্ত লৌহ শৈলীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হলো। ছত্রিকা-যন্ত্র চালনাকালে এই চারটি ওলন সর্বদাই ঝুলানো থাকে এবং প্রত্যহই অতি সূক্ষ্ম সামান্য স্থান পরিবর্তন করে প্রথমে ওলনগুলিকে সম্পূর্ণ উল্লম্ব অবস্থায় আনবার পর কাজ সুরু করা হয়।

ওলনমাফিক ট্রেগুলি সঠিকভাবে স্থাপিত হয়েছে কিনা, তা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। যদি চুম্বক দুটি না চালিয়ে ছত্রিকা-যন্ত্র চালু করে পাঁচটি ট্রেতে কণার পথচিহ্নের আলোকচিত্র নেওয়া হয়, তবে ঐ পথচিহ্নে কেবলমাত্র বিচ্ছুরণজনিত বিচ্যুতি ঘটবে। বিচ্ছুরণজনিত বিচ্যুতির সংখ্যাগত বন্টন (Statistical distribution) তাত্ত্বিক মতে গাউসভিত্তিক (Gaussian) হবে। কারণ এই বিচ্যুতির পজিটিভ কি নেগেটিভ হবার সম্ভাবনা সমান সমান। প্রায় 900 কণার চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতিতে বিচ্ছুরণ-বিচ্যুতি পরীক্ষান্তে

দেখা যায় যে, এদের গড় বিচ্যুতি মাত্র +0.009 ন. ব ; অর্থাৎ 0.018 সে.মি , তাত্ত্বিক মতে এটা শূন্য হওয়া উচিত। যাহোক এই সংখ্যা শূন্যের খুবই নিকটে। অতএব ট্রেগুলির একই উল্লম্বে ব্যবস্থাপনা প্রায় সিদ্ধ হয়েছে।

কণাটি গমন করে, সেই সেই নল দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। কণাটির আগমন-সঙ্কেত প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে তিনটি গাইগার কাউন্টার ট্রের মাধ্যমে। এর প্রত্যেকটি ট্রেতে 4 সে.মি ব্যাস-বিশিষ্ট 70 সে.মি দীর্ঘ 7টি করে কাউন্টার পাশা-
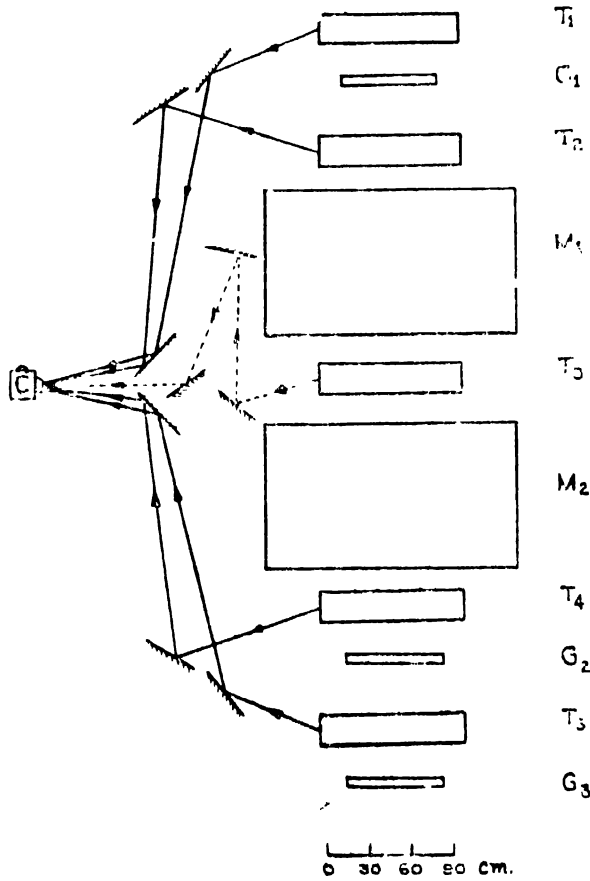
6নং চিত্র—ছত্রিকা-যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের আনুপূর্বিক স্কেচ। T_1, T_2, T_3, T_4, T_5—5টি নিয়ন ট্রে, G_1, G_2, G_3—3টি গাইগার কাউন্টার ট্রে, M_1, M_2—2টি 15 টন চুম্বক, C—ক্যামেরা—সমতল দর্পণের সাহায্যে সব কয়টি ট্রের চিত্র একই সঙ্গে নেওয়া হয়।

আমরা পূর্বে দেখেছি ছত্রিকা-যন্ত্রের মধ্যে মিউয়নের আগমন-সঙ্কেত (Arrival signal) ইলেকট্রনিক্সের সাহায্যে নিয়ন নলের উপর 5 মাইক্রোসেকেণ্ড পরে 12 KV বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি করে। এর ফলেই যে যে নলের মধ্য দিয়ে

পাশি একে অন্যের কিছু উপরে এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে যে, কোনও কণা ট্রের মধ্য দিয়ে গমন করলে কোন না কোন কাউন্টার উদ্দীপিত হবেই। যদি কোন শক্তিসম্পন্ন তড়িতাবিষ্ট কণা ছত্রিকা-যন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত

কাউন্টার ট্রের তিনটিরই ভিতর দিয়ে গমন করে, তবে তা নিশ্চয়ই চুম্বক দুটি ও 5টি নিয়ন ট্রের মধ্য দিয়েও যাবে এবং সেই ক্ষেত্রেই শুধু একটি আগমন-সঙ্কেত সৃষ্টি হবে আর সঙ্গে সঙ্গে ওর পথচিহ্নের আলোকচিত্র নেওয়া হবে। 25 সেমি × 70 সে মি পরিমাণ আনুভূমিক আয়ত ক্ষেত্র প্রতিটি কাউন্টার ট্রে উপস্থাপিত করছে এবং এটাই হলো ছত্রিকা-যন্ত্রের কণা গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র (Acceptance area)। ছত্রিকা-যন্ত্রের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিভিন্ন স্তরে কিরূপে বিন্যস্ত আছে, তা 6নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে T_1 T_2 T_3 T_4 T_5—5টি নিয়ন ট্রে; G_1 G_2 G_3—3টি গাইগার ট্রে; M_1 M_2—2টি চুম্বক। দর্পণের সাহায্যে সব কয়টি নিয়ন ট্রের দীপ্তি কিরূপে একই ক্যামেরাতে প্রবিষ্ট হচ্ছে, তাও এই চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

পথচিহ্নের আলোকচিত্র থেকে ভরবেগ নির্ধারণ করতে হলে 1নং সমীকরণে θ-র মান নির্ণয় করা প্রয়োজন। দিক পরিবর্তন (Anguler deflection) θ-কে সহজেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সমকৌণিক দিকে পথচিহ্নের রৈখিক বিচ্যুতিতে (Linear deflection) রূপান্তরিত করা যায়। এই রূপান্তরের জন্যে ছত্রিকা-যন্ত্রের উল্লম্ব দৈর্ঘ্যের কোন্ কোন্ স্থানে কতখানি ব্যবধানে নিয়ন ট্রেগুলি এবং চুম্বক দুটি স্থাপিত আছে, তা জানা থাকলেই হলো। 6নং চিত্র দেখলেই বোঝা যাবে এই দূরত্বগুলি পরিমাপ করা কিছুই কঠিন নয়। আমাদের যন্ত্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 16·2 Kilogauss এবং এর পূর্ণ দৈর্ঘ্য 2 মিটার। এই পরিমাপগুলি 1নং সমীকরণে উপস্থাপিত করলে ভরবেগ দাঁড়ায়—

$$p = \frac{40.3}{[illegible]} = \frac{80.6}{[illegible]} \text{ Gev/c} \qquad (4)$$

এস্থলে রৈখিক বিচ্যুতি $= \Delta$ ন. ব $= x$ সেমি

5নং চিত্রে একটি কণার পথচিহ্নের আলোকচিত্রের নমুনা দেখা যাচ্ছে। এইরূপ চিত্র থেকে রৈখিক বিচ্যুতি Δ অথবা x নিম্নলিখিত উপায়ে বের করা হয়। 5টি ট্রের সব কয়টি নলকে কৃত্রিম উপায়ে দীপ্তিমান করে একটি নমুনা আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। ঐ চিত্রে ছত্রিকা-যন্ত্রের 600টি নলই দীপ্তিমান। ফিল্ম প্রোজেক্টরের সাহায্যে একটি বোর্ডের উপর এই 600টি প্রজ্বলিত নলের চিত্র প্রক্ষিপ্ত করে সেগুলির ক্রমিক সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বোর্ডটি একটি reference রূপে সংরক্ষিত আছে। এখন আমাদের যন্ত্রে গৃহীত মিউন কণার যে কোনও পথচিহ্নের চিত্র একই প্রোজেক্টরের দ্বারা উপরিউক্ত বোর্ডের উপর প্রক্ষিপ্ত করলেই এই নমুনা পথচিহ্নের প্রজ্বলিত নলগুলি রেফারেন্স চিত্রের কোন্ ট্রের কোন্ কোন্ নলের সঙ্গে সামিল হলো, তাদের ক্রমিক সংখ্যা জানা যাবে। 4নং চিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিয়ন ট্রের মাঝামাঝি, দু-ধারে দুটি '+' চিহ্ন রয়েছে। এই চিহ্ন দুটি সব সময়েই আলোকচিত্রে ফুটে উঠবে। এজন্যে নমুনা পথচিহ্নের আলোকচিত্র reference চিত্রের সঙ্গে মেলানো খুবই সহজ। ঐ '+' চিহ্ন দুটিকে মিলিয়ে দিলেই সেই ট্রের উদ্দীপিত নলগুলি নিজ নিজ ক্রমিক সংখ্যার উপর আপনা-আপনিই পড়ে যাবে। বিভিন্ন সারিতে প্রজ্বলিত বিভিন্ন নলের ক্রমিক সংখ্যাগুলি জানা হলেই একটি ফরমুলার সাহায্যে রৈখিক বিচ্যুতি নল-ব্যবধানের এককে গণনা করা যাবে। নলগুলির ক্রমিক সংখ্যা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হলেও নলগুলির ব্যাসের মান অনুযায়ী রৈখিক বিচ্যুতি নির্ধারণে কিছুটা ভুল থাকবেই। এই ভুলের মাত্রা হ্রাস করতে হলে নলগুলির ব্যাস কমাতে হবে। দুর্গাপুরের যন্ত্রে এই পথচিহ্ন নিরীক্ষণ ত্রুটি (Track location error) অতি যত্নসহকারে গণনা করা হয়েছে। এর মান 0.04 ন. ব অর্থাৎ 0.08 সে.মি।

দুর্গাপুরে উল্লম্ব দিকে আগত মিউয়ন কণার

চূড়ান্ত ছবিকা নির্ধারণে প্রায় 26000 কণার পথচিহ্নের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরি-উক্ত উপায়ে ভরবেগ নির্ধারণের পর কয়েকটি বিশেষ সংশোধনের প্রয়োজন। এই সংশোধন প্রক্রিয়া স্থানাভাবে আলোচনা করা গেল না। এগুলির মধ্যে প্রধান—বিচ্ছুরণজনিত বিচ্যুতির সংশোধন। এই সংশোধন এক বিশদ গাণিতিক তত্ত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। সম্পূর্ণ সংশোধিত ছবিকার রূপ Journal of Physics (London) পত্রিকার August '72 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ছবিকার অনুলেখ (Graph) লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ছবিকা সুরু হয়েছে 5 Gev/c থেকে। এর কারণ এই যে, দুটি এক মিটার দীর্ঘ চুম্বক অতিক্রম না করলে আমাদের যন্ত্রে কোন কণাও ধরা পড়বে না। এতদ্ব্যতীত অপেক্ষাকৃত অল্প ভরবেগবিশিষ্ট কণার দিক পরিবর্তন এতই অধিক হবে যে, সেগুলির একটি বৃহৎ অংশ তৃতীয় গাইগার ট্রের মধ্যে প্রবেশ না করে এর দু-পাশ দিয়ে চলে যাবে। ফলে সেগুলির আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাবে না। অনুরূপে অত্যুচ্চ ভরবেগবিশিষ্ট কণার বিচ্যুতি এতই অল্প হবে যে, সেটা পথচিহ্ন নিরীক্ষণ ত্রুটির প্রায় সমান হবে। এর ঊর্ধ্বে ভরবেগ নির্ধারণের কোনও অর্থ হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দুর্গাপুরের যন্ত্রের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ পরিমাপযোগ্য ভরবেগ যথাক্রমে 5 Gev/c ও প্রায় 1000 Gev/c।

প্রথমেই বলা হয়েছে মিউয়ন কণার শক্তি-ছবিকা নির্ধারণকালে ওদের পজিটিভ ও নেগেটিভ কণাগুলির অনুপাত আমাদের যন্ত্রে অতি সহজেই নির্ণীত হবে। এই অনুপাতকে মিউয়ন কণার আধান-অনুপাত বলা হয়। উপরিউক্ত 26,000 মিউয়নের আধান-অনুপাত (Charge ratio) বিভিন্ন ভরবেগের সঙ্গে কিরূপে পরিবর্তন করে, তার বিশদ-বিবরণ Nuclear Physics (Amsterdam), March, 1972 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই যন্ত্র নির্মাণ, কার্যোপযোগী করা এবং পরে সুষ্ঠুভাবে চালনা করে উপরিউক্ত তথ্য সংগ্রহ করবার কৃতিত্বের অধিকাংশই আমার সুযোগ্য ছাত্র বিমানচন্দ্র নন্দীর প্রাপ্য। যন্ত্র নির্মাণের সুরুতে অরুণকুমার দাস ও কৃষ্ণানন্দ পাল সাহায্য করেছেন। শেষের দিকে মিউয়ন সম্বন্ধে এই যন্ত্রের সাহায্যে আরও কয়েকটি নূতন তথ্যের অনুসন্ধানকল্পে এই গবেষণায় যোগ দিয়েছেন পার্থসখা বসু ও অমলেশ সরকার।

কয়েকটি যন্ত্রাংশ নির্মাণে এবং লৌহপাত-গুলিকে কেটে চুম্বকের উপযোগী করবার কাজে দুর্গাপুরের C. M. E. R. I (Central Mechanical Engineering Research Institute) অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে বাধিত করেছেন। ইংল্যাণ্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক Wolfendale-এর সৌজন্যে নিয়ন নলগুলি, ক্যামেরা, আরও কিছু যন্ত্রাংশ এবং বহু মূল্যবান উপদেশ পাওয়া গেছে। এই যন্ত্র নির্মাণ, পরি-চালনা ও আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুর ব্যয়ভার বহন করেছেন ভারত সরকারের পারমাণবিক গবেষণা কমিশন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাচীন ভারতে বিষ-বিজ্ঞান

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে বিষ তাকে বলে, যা স্বল্প পরিমাণে প্রয়োগ করলে মানুষের শরীর খারাপ হতে পারে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বলতে গেলে যে কোন ওষুধ তার নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী পরিমাণে সেবন করলে বিষের কাজ করতে পারে।

বিষের ব্যবহার প্রাচীনকালে ছিল। এর ভূরিভূরি নিদর্শন আছে। তবে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতে বিষ-বিজ্ঞান বলতে যা বুঝায়, তা ছিল না। দেহতন্ত্রের উপর বিষের ক্রিয়া অনুসারে বিষাক্ত পদার্থের শ্রেণীবিভাগ ছিল না। আধুনিক বিষ-বিজ্ঞান বলতে গেলে সুরু হলো মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন মস্তিষ্ক, হৃদয়, উদর, যকৃৎ, বৃক্ক প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে বিবিধ বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা করা আরম্ভ হলো। তারপর বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ থেকে আসল বিষাক্ত যৌগিকটি নিষ্কাশন ও পরীক্ষা করা হলো। যেমন জানা ছিল আফিম বিষাক্ত পদার্থ। তাথেকে পৃথক করা গেল উপক্ষার মরফিন, যা দেহের যন্ত্রণাবোধ কমিয়ে দেয়, দুশ্চিন্তাবোধ সাময়িকভাবে দূর করে। বিষ সেবনে মৃতের দেহতন্তুতে সঞ্চিত থাকা বিষ আবিষ্কারের প্রণালী উদ্ভাবিত হলো। সেকালে অবশ্য এসব ছিল না। তবে বিষ ছিল, বিষের প্রয়োগও ছিল। বিষাক্ত পদার্থ ব্যাধিহর ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হতো আবার প্রাণহর বিষ হিসাবে প্রযুক্ত হতো।

উদ্ভিদ অথবা প্রাণিজাত জৈব পদার্থ হাজার হাজার বছর টেকে না। অথচ খনিজ বা অজৈব পদার্থ কালকে উপেক্ষা করে টিকে থাকে। তাই অতি প্রাচীনকালে (খৃঃ পূঃ দু-হাজার বছর পূর্বে) খোঁজ পাওয়া গেল অজৈব বিষ, শঙ্খবিষের—যার আধুনিক নাম আর্সেনিয়াস অক্সাইড। এই বিষের আকর হলো লোয়েলিন-জাইট নামক লোহা ও আর্সেনিকযুক্ত খনিজ আকরিক। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পারস্য অঞ্চলে এই আকরিক পাওয়া যেত। আংশিক দগ্ধ লোয়েলিনজাইট আকরিকের টুকরা পাওয়া গেছে মোহেঞ্জোদড়ো খননকালে। এ প্রায় খৃঃ পূঃ দু-হাজার বছর আগেকার কথা। এই আকরিক দহনকালে আর্সেনিয়াস অক্সাইডের শ্বেতচূর্ণ বাষ্পীভূত হয়ে পৃথক হয়ে আসে। তৎকালে এই চূর্ণ তীব্র শঙ্খবিষ বলে পরিচিত হয়েছিল। তামা-আর্সেনিক সঙ্কর ধাতু দিয়ে মোহেঞ্জোদড়োর কামারেরা অস্ত্র গড়তো। তাই তামা-আর্সেনিক আকরিকের দহন সুরু হয়েছিল। অনুমান হয় শঙ্খবিষের বিষক্রিয়া অকস্মাৎ আবিষ্কার হয়েছিল। আর্সেনিকের অন্যান্য যৌগিকের উল্লেখ আছে খৃঃ পূঃ তিন-শ' বছর আগেকার ভারতীয় ও সমসাময়িক গ্রীক গ্রন্থে—চরক, কৌটিল্য, সুশ্রুত, অ্যারিস্টটল, থিয়োফ্রেস্টাস ও পরবর্তী কালে 50 খৃষ্টাব্দে ডায়স্করিডস ও প্লিনির রচনায়। কৌটিল্য বিষ হিসাবে হলুদ বর্ণের হরিতালের উল্লেখ করেছেন, যার আধুনিক নাম আর্সেনিয়াস সালফাইড। সুশ্রুত শঙ্খবিষকে ফেনভস্ম বলে উল্লেখ করেছেন। চরক হরিতাল ও তার সঙ্গে নারেঙ্গী বর্ণের মনঃশিলা বা আর্সেনিক সালফাইডের উল্লেখ করেছেন। আর্সেনিক যৌগিক তৎকালে চর্মরোগে ব্যবহার করা হতো। অবশ্য এর অনেক কাল পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) রসরত্নসমুচ্চয় নামক রাসায়নিক গ্রন্থে

আর্সেনিক যৌগিকসমূহের ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

হরিতাল খনিজ গ্রীস দেশে পাওয়া যেত। গ্রীক ও আরবীয়েরা একথা জানতেন। হিপোক্রেটাসের চিকিৎসা গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক) ক্ষতের চিকিৎসায় হরিতাল প্রয়োগের উল্লেখ আছে। বলতে গেলে আর্সেনিকঘটিত পদার্থের প্রাচীনতম ব্যবহারের পরিচয় মোহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। এখান থেকে অন্য দেশে শঙ্খবিষ প্রচলিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

খনিজ পদার্থের মধ্যে সীসা, তামা, পারদঘটিত যৌগিক বিষাক্ত। মোহেঞ্জোদড়োতে রূপা পাওয়া গেছে, যাতে মিশ্রিত আছে সীসা ও তামা ধাতু। এই রূপার আকরিক পাওয়া যেত বেলুচিস্তানে। সীসা যৌগিক, শ্বেতবর্ণ লেডকার্বোনেট, পারদ যৌগিক সিঁদুর বা রক্তবর্ণ মার্কিউরিক সালফাইড ব্যবহার হতো প্রসাধনে। সীসাঞ্জন, কালো লেড সালফাইড মেশানো হতো চোখের কাজলে। সীসার জন্যে ধীর বিলম্বিত বিষক্রিয়া লক্ষিত হওয়া বিচিত্র নয়, যেমন আজকার দিনে দেখা যায়, মুদ্রণ শিল্পের কর্মীদের মধ্যে।

শুক্ল যজুর্বেদে (আনুমানিক সময় খৃঃ পূঃ 1000) উল্লিখিত ছয়টি ধাতুর মধ্যে সীসার কথা আছে। (সোনা, রূপা, তামা, লোহা, সীসা আর টিন)। অনেককাল পরে (ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে) রসরত্নসমুচ্চয় গ্রন্থে সীসা ধাতু ও রক্তবর্ণের সীসা রঞ্জকের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত আছে। বাগভট্ট (850 খৃষ্টাব্দ) পারদ, অ্যান্টিমনি ও সীসাঘটিত অঞ্জনের উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধযুগে অ্যান্টিমনি সালফাইডঘটিত অঞ্জনের উল্লেখ চরক করেছেন। বাউয়ার পাণ্ডুলিপিতে (চতুর্থ খৃষ্টাব্দ) স্রোতজ অঞ্জনের কথা আছে, যার উপাদান হলো অ্যান্টিমনি সালফাইড, গ্যালিনা, আর্সেনিক সালফাইড, গৈরিক মৃত্তিকা আর পিতলভস্ম। সোমদেব তৎলিখিত রসেন্দ্রচূড়ামণিতে নীলাঞ্জন থেকে অ্যান্টিমনি প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন মিশর ও আরব দেশে অ্যান্টিমনি পরিচিত ছিল এবং সেখান থেকে ভারতে প্রচলিত হয়েছিল। অবশ্য প্রাচীন ভারতে বিষ হিসাবে অ্যান্টিমনি যৌগিকের ব্যবহার জানা ছিল না। মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত অ্যান্টিমনি যৌগিক বেশীমাত্রায় প্রয়োগে প্রাণঘাতী হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিঁদুর মোহেঞ্জোদড়োর যুগে অর্থাৎ বলতে গেলে ইতিহাস-পূর্ব যুগেও জানা ছিল। এমন কি, পরবর্তী কালে পারদ ধাতুর বেচাকেনা সম্পর্কে কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। পারদ-গন্ধক যৌগিককে কৌটিল্য হিঙ্গুল বলেছেন। মনে হয় সিঁদুরের পারসিক নাম হিঙ্গোল থেকে কথাটি এসেছে। অবশ্য পারদঘটিত খনিজ চীনদেশে পাওয়া যেত। সেখান থেকে আরব, পারস্যের পথে তা ভারতে পৌঁচেছিল। আরবীয় জবীর রসকর্পূর বা পারদ ক্লোরাইড যৌগিককে তীব্র বিষ বলেছেন। কৌটিল্য বিষদাতাকে 'রসদ' বলে উল্লেখ করেছেন। বৃন্দ-প্রণীত সিদ্ধ যোগে (দশম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ) উকুন উচ্ছেদের জন্যে পারদ যৌগিকের ব্যবহার বর্ণিত আছে। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীকালে তান্ত্রিকযুগে পারদঘটিত পদার্থের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়েছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হলো স্বাস্থ্য অটুট রাখতে, আয়ু বৃদ্ধিকল্পে কিছু ভেষজ, পারদ যৌগিক সেবন ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত যৌগিক ব্যায়াম অপরিহার্য। তন্ত্রশাস্ত্রে পারদ রস বলে পরিচিত। পারদঘটিত পদার্থের আলোচনা যে গ্রন্থে হলো, তার নাম দেওয়া হলো রসার্ণব, রসরত্নাকর ইত্যাদি। রসশাস্ত্র যাঁরা আলোচনা করলেন, তাঁরা হলেন রসসিদ্ধ। রসরত্নাকর গ্রন্থ প্রণেতা রসসিদ্ধ নাগার্জুন (অষ্টম শতাব্দী খৃষ্টাব্দ) পারদ সালফাইড যৌগিকের প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তিনি রসকর্পূরের

(মার্কিউরিক ক্লোরাইড) বিষক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভারতের আদিম অধিবাসী, এদেশে আর্যদের আগমনের অনেক আগে থেকেই ভূত-প্রেত, হিংস্র জীবজন্তুর—এমন কি, মৃত্যুভয় এড়াবার জন্যে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। নবাগত আর্যেরাও এসবের দেশগত প্রভাব এড়াতে পারে নি। তাই তাদের রচিত অথর্ববেদে (খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী) কিছু না কিছু রোগ দূর করবার মন্ত্রতন্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন, মন্ত্রের প্রভাব কাটাতে পারে সীসা ধাতু। সোনা যে পরে, সে দীর্ঘায়ু হয়। তার উপর হলো ধর্মকর্মে, যাগ-যজ্ঞে সোমরস প্রস্তুত ও পান করবার ব্যবস্থা। উত্তরকালের তন্ত্রশাস্ত্রে এইসব স্মরণাতীত যুগের অন্ধ ব্যবস্থাগুলির প্রাধান্য বজায় রয়ে গেল। উড্রোফের মতে, তৎকালীন তান্ত্রিক হলো একাধারে জ্যোতিষী, চিকিৎসক ও রসসিদ্ধ। তারা অন্তর ও বহির্জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্য অনেকাংশে উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন। এই তান্ত্রিকতার উৎস কি? আদিম যুগে যে বিদেশীয়েরা ভারতভূমিতে এসে চাষ-আবাদ পশুপালন, ইত্যাদি কৃষিগার্হস্থ্য জীবনযাপন করতে লাগলো, তাদের বলা হতো আর্য। আর কতক বিদেশী ভবঘুরে হয়ে ভারত-ভূমিতে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, এক জায়গায় স্থায়ী হলো না। তাদের বলা হতো ব্রাত্য। কালে আর্যদের প্রভাবে কিছু সংখ্যক ব্রাত্য ভবঘুরে জীবন ছেড়ে দিয়ে গৃহবাসী হলো। এবং কালে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেকাংশে আর্যদের সমতুল্য হলো বা কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়িয়েও গেল। এরা বেদের অনুশাসন মানতে চাইলো না। এদের জীবনযাত্রা অনেকটা বাস্তবধর্মী হলো। এরা রাজত্ব স্থাপন করলো নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে প্রচার করলো। ভগবান্ বুদ্ধ (550 খৃঃ পূঃ) এই রকম একজন মহাপুরুষ যিনি বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা, বেদের অনুশাসন মানলেন না, ব্রহ্মণ্যধর্ম উপেক্ষা করলেন। তাঁর পতাকাতলে এল বহু ব্রাত্য—এমন কি, বহু আদিম অধিবাসী, যারা বংশ-পরম্পরায় বেদ, ব্রাহ্মণের প্রভাবে পীড়িত হচ্ছিল। মানুষের তখন অন্ধ কুসংস্কারের অবধি ছিল না। রহস্যাচ্ছন্ন অদ্ভুত উপাসনা-প্রণালী, মন্ত্রতন্ত্র, আত্ম-নিপীড়ন প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সংঘের মুখ চেয়ে সব কিছুর আমূল পরিবর্তন করতে পারেন নি। তিনি নিজে পছন্দ না করলেও সব 'সিদ্ধাই' বন্ধ করতে পারেন নি। তিনি নিজে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বুদ্ধের কিছু নাম-করা শিষ্যও, যেমন ভরদ্বাজ, মণ্ডক প্রভৃতি 'সিদ্ধাই' প্রদর্শন করতেন। বৌদ্ধগ্রন্থ বিনয়পীঠকে এসবের উল্লেখ আছে।

বুদ্ধের তিরোধানের অনেক পরে এই সকল সিদ্ধাই জাগতিক সুখসুবিধাদিতে প্রয়োগের চেষ্টা হলো। ক্রমে তা তন্ত্রের বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদি ক্রিয়ায় পরিণত হলো। বলাবাহুল্য বুদ্ধ স্বয়ং নিষ্ঠাবান ছিলেন। পরবর্তী কালে (700 খৃষ্টাব্দ) সংঘের সব সভ্যদের কাছ থেকে তেমন নিকষ নিষ্ঠা আশা করা যায় নি। তখন কোন কোন বৌদ্ধ নেতা বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত নির্বাণ লাভের চেষ্টায় সময় নষ্ট না করে জাগতিক বা দৈহিক সুখ বাসনায় মন দিলেন। ক্রমে সংঘের নিয়ম সংযম শিথিল হয়ে পড়লো, আর সেই পতিত বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক বলে পরিচিত হলো। এরা পঞ্চ মকার প্রচলন করলো, বললো এছাড়া ইষ্টসিদ্ধি সম্ভব নয়! পুরুষানুক্রমে গুরু থেকে চেলায় তান্ত্রিক রহস্য, উপাসনা-প্রণালী হস্তান্তরিত হতে থাকলো। এ হলো বুদ্ধের তিরোধানের প্রায় আট-শ' বছর পরের কথা। উপাসনা-প্রণালীতে বলা হলো পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের কথা। প্রতি জনে একজন করে শক্তিরূপিণী নারী যুক্ত হলো। এই নিয়ে দশজনে মণ্ডল রচিত হলো। তারপর অকথ্য

অবনতির প্রক্রিয়াদি চললো। প্রলোভনের নেশা কার না আসে? হিন্দুরাও কেউ কেউ এই সব মণ্ডলে আকৃষ্ট হলো। হিন্দু ধর্মাচার অনুষ্ঠানেও বৌদ্ধ তান্ত্রিক পদ্ধতি গৃহীত হলো। বৌদ্ধেরাও পতঞ্জলির যোগ গ্রহণ করলো। বৌদ্ধ শ্রমণ গান্ধার (400 খৃষ্টাব্দ) পাতঞ্জল যোগের প্রভাবে যোগাচার্য ভূমিশাস্ত্র রচনা করলেন। তন্ত্র তত্ত্বের সঙ্গে বশীকরণ, মারণ, উচাটন প্রভৃতি ব্যবহারিক তথ্যের মিলন হলো। ক্রমে সকাম সাধনা পূর্ণভাবে এসে পড়লো। সাংসারিক উন্নতিকল্পে হিন্দুর কালী, দুর্গাপূজা ইত্যাদি শৈবশক্তির উপাসনা ও বৌদ্ধের প্রজ্ঞা দেবীর উপাসনা সমান্তরালে চললো। শ্রমণ অমোঘভগ্র (750 খৃষ্টাব্দ) চীনদেশে বাস করতেন। তিনি ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। তিনি অলৌকিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করতে কবচাদি ধারণের ব্যবস্থা দিতেন। এমনি করে ধীরে ধীরে রহস্যজনক প্রণালীর সঙ্গে জড়িবুটি, নেশা-ভাং সব কিছুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এমন কি, পতঞ্জলি বললেন, সিদ্ধিলাভ পাঁচ রকমে হতে পারে—জন্মজ (শুকদেব, প্রহ্লাদ), মন্ত্রজ বা জপজ (সাধকবৃন্দ), তপোজ (বিশ্বামিত্র), সমাধিজ (যোগীবৃন্দ) আর সর্বশেষে ওষধিজ, যথা—ভাং, মদ ইত্যাদি সেবনে (ঋষি মাণ্ডব্য)।

মদের চেয়ে জনপ্রিয় নেশার বস্তু আর নেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগেও মদ্যপান ভারতে প্রচলিত ছিল। বিবিধ উৎসবে তো বটেই, ধর্ম অনুষ্ঠানেও মদ অপরিহার্য ছিল। উত্তরকালে স্মৃতিশাস্ত্র উচ্চবর্ণ কুলজাতকের মদ্যপান নিষিদ্ধ বিধান দিয়েছিল। তা বোধ করি নেশা করে যদুবংশ ধ্বংস হবার বিষময় ফলের জন্যে।

কুলার্ণবতন্ত্র কিন্তু বামপন্থী। কুলার্ণবে বর্ণিত হয়েছে, লোভের বস্তু, যা সাধারণ মানুষের পতনের কারণ বলে পরিগণিত, তাদেরই মাধ্যমে মানুষকে সিদ্ধিলাভ করতে হবে। সাপের বিষ, আর্সেনিক, অ্যাকোনাইট, আফিম সবই তীব্র বিষ—সেবনে জীবন সংশয়। তন্ত্রমতে এই সব মারাত্মক বিষ, শাস্ত্রমতে প্রস্তুত ও শোধন করে নিলে সঞ্জীবনীর কাজ করে। তন্ত্র বলে, গুরুর উপদেশমত প্রস্তুত সুরা অধ্যাত্ম প্রচেষ্টার সহায় হয়ে থাকে। তেমন সুরাপানে কর্মশক্তি, নিঃশঙ্কতা, সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়। ইষ্ট চিন্তা করতে করতে সুরার নেশায় বুঁদ হয়ে বসলে, ধ্যান জমে ভাল। কেবল সুরা নয়, অন্য মাদক দ্রব্য—সিদ্ধি, ভাং, ধুতুরা সেবনেও ধ্যান গভীর হয়, ইষ্ট দর্শন হয়ে যায়। তাই গাঁজার অপর নাম সিদ্ধি। মদের অন্যতম উপাদান কোহল। কোহলে বহু অজৈব পদার্থ সহজে দ্রবীভূত হয়। তাই দ্রাবকরূপে মদ অতুল্য। মদে ধুতুরা ইত্যাদি মিশিয়ে সেবন করা বা করানো সুবিধা। কৌটিল্য সেব্য মদে ধুতুরা মিশানোর কথা বলেছেন। ধুতুরার উপক্ষার অ্যাট্রোপিন মানুষকে সাময়িক মোহগ্রস্ত করে। এর প্রভাবে মানুষ কোথায় আছে, কি করছে, তা ভুলে যায়। তারই সুযোগ নিয়ে চোরেরা তার জিনিষপত্র সরায়। প্রাচীন ভারতে অ্যাকোনাইট অতিবিষ বলে পরিচিত। সাত হাজার ফুট বা তদূর্ধ্বে পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে অ্যাকোনাইটের ঝোপ জন্মায়। অশ্বারোহী অশ্বের মুখে জাল পরিয়ে দেয়, পাছে অশ্ব মারাত্মক অ্যাকোনাইটের পাতা চিবিয়ে ফেলে, তাতে তার প্রাণহানির সম্ভাবনা। হ্যামিলটন বর্ণনা করেছেন, নেপাল আক্রমণ করলে গুর্খারা কুয়ার জলে অ্যাকোনাইট মিশিয়ে বৃটিশ সৈন্যদের অসুবিধায় ফেলেছিল।

ধুতুরা দেবপূজায় ব্যবহার হয়। গাঁজা, সিদ্ধিও হয়। গাঁজা সেবনে মানুষ সাময়িক স্বপ্নালু হয়ে ওঠে। সে অকারণ আনন্দ অনুভব করে। কোন দেবদেবীর মূর্তি চিন্তা করতে করতে গঞ্জিকা ধূমপান করলে নেশার বশে মনে হয়, সেই ইষ্ট রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাঁজা নানা দেশে নানা নামে পরিচিত। আরব অঞ্চলে

হাসিস, আমেরিকায় মারিহুয়ানা ইত্যাদি অনেক তার নাম। উনবিংশ শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) গাতিয়ে নামক জনৈক ফরাসী হাসিস বা সিদ্ধি সেবন করে কি অনুভব করেছিলেন, তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর মনে হলো যেন তাঁর বোধশক্তি অসাড় হয়ে গেছে, যেন তাঁর দেহ স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তাঁর চারপাশে হাজারে হাজারে তাল-পাতার মত বড় বড় রং-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। বগিথালার মত বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। যেন তিনি দেহপিঞ্জর ছেড়ে বাইরে এসে তাদের মাঝে বসে আছেন। তিনি ভাবলেন বোধ হয় আত্মা এমনি করেই দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। গাতিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, পতঞ্জলি যে ওসধিজ সিদ্ধির কথা বলেছেন, তা বোধ করি এইভাবে অনুভূত হতো। বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার যদি পূজার উপকরণে চলে, সাধারণ্যে তার ব্যবহার এবং অপব্যবহার চলবে না কেন ?

আফিম উদ্ভিজ্জ পদার্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) গোবিন্দাচার্য তাঁর 'রসসারে' আফিমের কথা লিখেছেন। মনে হয় তিনি আফিমকে উদ্ভিজ্জ পদার্থ বলে জানতেন না। তিনি বলেছেন অহিফেন—সাপের ফেনা! আফিমের সর্ববেদনাহরণ গুণের কথা প্রাচীনেরা জেনেছিল। ঔষধে ব্যবহারও করেছিল। খৃঃ পূঃ তিন-শ' বছর আগে থিয়োফ্রেস্টাস আফিমের উল্লেখ করেছেন। আফিম গাছের উৎপত্তি স্থান এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে গ্রীসদেশে আফিমের প্রচলন হয়। আরবীয় হেকিমেরা বেদনানাশক আফিমের ব্যবহার সুরু করে। আরবীয় বণিকেরা নেশার পদার্থ হিসাবে পারস্য, ভারত ও চীনদেশে আফিম চালান করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে (খৃষ্টাব্দ) ইউরোপে আফিম জনপ্রিয় হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও বৃটিশ বণিকেরা চীনদেশে বহুল পরিমাণে আফিমের ব্যবসা সুরু করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের করমণ্ডল উপকূলে আরবেরা আফিম গাছের চাষ করতে সাহায্য করে। উৎপন্ন আফিম তৎকালে ব্রহ্ম, চীন ও শ্যামদেশে চালান যেত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে আগত পর্যটক বার্বোসা গুজরাটের রাজা মামুদ শা ও তাঁর ছেলের আফিমের নেশার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন স্বল্প পরিমাণে আফিম সেবন করতে করতে ছেলেটির এমন অবস্থা হয়েছে যে, সে আর সেবন না করে থাকতে পারে না। আফিম সেবন না করলে সে আর বাঁচবে না। স্পেন দেশীয় মুরেরা আর ভারতীয়েরা আফিম সেবন করে। এমন কি সমাজলাঞ্ছিত ভারতীয় মেয়েরা আফিম সেবনে আত্মঘাতী হয়। তারা আফিম সেবন করে ঘুমিয়ে পড়ে আর জাগে না। মধ্যপ্রদেশের উপজাতিদের প্রসঙ্গে রাসেল বলেছেন, মায়েরা কাজে যাবার সময় শিশুদের আফিম দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যায়। সদ্যোজাত অবাঞ্ছিত শিশু-কন্যাকে এরা আফিম প্রয়োগে হত্যা করে।

শত্রু দমনের জন্যে কৌটিল্য গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। পানীয় মদ্য, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহনের খাদ্য ঘাস, পানীয় জল প্রভৃতিতে বিষ মিশিয়ে দেবার বিধান দিয়েছেন। এমন কি গুপ্তচর হিসাবে সাপুড়ে নিযুক্ত করতেন, যারা হস্তী ও অশ্বশালায়, সৈন্যদের ছাউনিতে বিষধর সাপ ছেড়ে দিয়ে আসতো। সাপুড়েরা স্বল্প পরিমাণে সাপের বিষ সূচিকার সাহায্যে নিজের শরীরে প্রবেশ করাতো। এভাবে ধীরে ধীরে বেশী পরিমাণে সাপের বিষ দেহে প্রবিষ্ট হলেও তারা সহ্য করতে পারতো। তাই সর্পদংশনে মৃত্যু এড়িয়ে যেতে পারতো। গাঁজা, আফিম প্রভৃতি নেশার বস্তুও ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়িয়ে সেবনের ফলে অনভ্যস্ত মানুষ যে পরিমাণ আফিম সেবনে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ সেবনে নেশাখোর অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রাচীন কালে

এই সব ঘটনা অবলম্বনে অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী রচিত হয়ে গেছে। যেমন—বিষকন্যা, শৈশব থেকে তিলে তিলে বিষ সেবনে বয়ঃক্রমে সে এমন অবস্থায় এসে পৌছয়, যখন তার শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রবাহিত বিষাক্ত বায়ু অন্যের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কথিত আছে, গুরু অ্যারিষ্টটল ভারত বিজয়ে অভিলাষী শিষ্য আলেকজাণ্ডারকে এইরূপ ভারতীয় বিষকন্যা সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কৌটিল্য বধের উদ্দেশ্যে নন্দবংশের মন্ত্রী এইরূপ বিষকন্যা লালন করেছিলেন।

আধুনিক বিষ-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতার সঙ্গে সেকালের অগদতন্ত্রের হয়তো তুলনা সম্ভব নয়। তবে প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকে অথর্ব বেদ, উত্তরকালে কৌটিল্য, মহাভারত, চরক, সুশ্রুতের যুগেও জীবন রক্ষা ও সংহারে বিষ প্রয়োগ চলে এসেছে। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বিবিধ বিষের উল্লেখ করেছেন। মহাভারতে বিষহর নামক বৈদ্য শ্রেণীর উল্লেখ আছে। সুশ্রুত সংহিতায় অগদতন্ত্র অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ বিষের বর্ণনা আছে। রাজার নিত্য খাদ্য ও পানীয় পরিবেশনের পূর্বে ভোজ্য দ্রব্য পশুপক্ষীকে স্বল্প পরিমাণে খাইয়ে নিরাপদ বলে পরীক্ষা করে নেবার ব্যবস্থা দিয়েছেন। কল্কে ফুলের বীজকে তিনি অশ্মমার বলে উল্লেখ করেছেন। কুঁচ বা গুঞ্জাফলের বীজকে গবাদি পশুর প্রাণনাশক বলেছেন। আজও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পশুর বীজ হিসাবে এগুলির ব্যবহার হয়। সূক্ষ্ম ওজনে 'রতি' হিসাবে কুঁচের বীজ ব্যবহৃত হতো। একালের মত সেকালেও কল্কে ফুল বাগানের শোভাবৃদ্ধি করতো। ধুতুরা পথপ্রান্তে অনাদরে জন্মাতো। তাই সব বিষফল দুষ্প্রাপ্য ছিল না। নেপাল অঞ্চলে গাঁজা, মিশর অঞ্চলে আফিম সুলভ ছিল। পরবর্তী কালে তো ভারতেই গাঁজা, আফিমের চাষ হতে লাগলো। অল্পপচিত কোহলযুক্ত সুরা বা মদ্য আজও পার্বত্য অধিবাসীরা নিজ গৃহে প্রস্তুত করে থাকে। প্রাচীন ভারতে জীবন ধর্মানুষ্ঠানভিত্তিক ছিল। তাই মনে হয়, পূজানুষ্ঠানে যদি বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত হয়, তবে সাধারণ্যের তা ব্যবহারে আপত্তি কি? ইষ্টসিদ্ধি লাভের অন্যতম উপায় যদি মদ, গাঁজা, ধুতুরা হয়, ক্রমে তার অপব্যবহার, তন্ত্রোক্ত বশীকরণ, মারণ, উচাটন প্রভৃতি এসে জোটে, সে আর বিচিত্র কি? বলা বাহুল্য মানুষ সুমার্জিত সভ্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও প্রবৃত্তিগত লোভ সামলাতে পারে নি। তারই খানিক ইতিহাস বিষের অপপ্রয়োগ!

"যে ভাষা রুশ ভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহাসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাকে বিখ্যাত রুশ রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশ-ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

মনের বিকাশের শারীরবৃত্তিক ভিত্তি

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

মনের কোন উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তবে মন বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে মস্তিষ্ক-ত্বকের সর্বোচ্চ স্তরে ব্যাপকভাবে বর্তমান বেশ কিছুটা অংশের অঙ্গাঙ্গী ক্রিয়া। এমন কি, পূর্ণ-বিকশিত অবস্থায়ও মনের অধিষ্ঠানের কোন বিশেষ একটি স্থান চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং মনের সংজ্ঞা জ্যামিতিতে 'বিন্দু'র সংজ্ঞার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ এর ব্যাপকতা আছে কিন্তু অবস্থান অনির্দিষ্ট।

বংশগত কারণে শিশুর মনের বিকাশের কম-বেশী হয়, এরূপ বলাও যায় না। জিন-এর সঙ্গে মনের নিকট সম্বন্ধের কথা এখনো প্রমাণিত হয় নি। সে কারণেই সদ্যোজাত শিশুর জন্মের পর জীবনের প্রথম সপ্তাহে মনের উন্মেষ সম্পূর্ণ-ভাবেই নির্ভর করে তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের জন্ম-কালীন গঠন এবং কতকটা পরিবেশের উপর। প্রায় তিন মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের অবস্থা অনেকটা স্প্রীংয়ের স্বয়ংক্রিয় পুতুলের মত। এই অবস্থায় তার বোধশক্তি অতি অল্পই থাকে এবং অপরকে নিজের প্রয়োজন বোঝাবার ক্ষমতাও থাকে অতি সীমিত। তবুও সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক কতকগুলি প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action), যেমন—ক্ষুধা, পিপাসা, মল-মূত্র ত্যাগ প্রভৃতির প্রয়োজনে সে কাঁদতে কিংবা উসখুস করতে থাকে এবং ঐ প্রয়োজন না মেটানো পর্যন্ত তার শারীরিক চাঞ্চল্য দূর হয় না। মুখে স্তনের বোঁটা কিংবা অন্য খাবার পেলে কান্না থামিয়ে সে ঐ ভাবেই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ফলে চুষতে কিংবা তা গলাধঃ-করণ করতে থাকে অবলীলাক্রমে। আবার তার খোলা চোখের উপর কোন উজ্জ্বল আলোক ফেললে কিংবা হঠাৎ কানের কাছে কোন তীব্র শব্দ করলে, যথাক্রমে আপনি তার চোখ বুজে যায় কিংবা সে চম্‌কে উঠে মাথাকে শব্দের উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নেয়, যাতে ঐরূপ অপ্রীতিকর শব্দ তার কানে অন্ততঃ কিছুটা কম প্রবেশ করে। এই সকলই তার পক্ষে দেহরক্ষক এবং অনিচ্ছাকৃত হলেও অতি প্রয়োজনীয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া। এরূপ সহজাত বোধগম্যতা এবং তার ফলে সঞ্জাত মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া মনের বিকাশের উৎস। জন্মাবার পর প্রথম মাস-তিনেক এটুকু মাত্রই থাকে তার মানসিকতার অঙ্কুর রূপে। এরই নাম ইদ (Id) অর্থাৎ বংশগতিধারায় প্রাপ্ত জন্মগত অসুসঙ্গত মানসিক প্রবাহের আধার। এরূপ অবস্থায় শিশু কিন্তু নির্জ্ঞান রতিসুখমূলক প্ররোচনা বা পুলক, বেদনা প্রভৃতি প্রভাবিত অবস্থা (যা তৎক্ষণাৎ পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ থাকে না।

ঐ সময়ে সজ্ঞান বোধশক্তি থাকে অতীব সীমিত এবং জাগ্রত অবস্থায়ও শিশুর আত্মবোধ অন্যান্যদের চেয়ে থাকে সম্পূর্ণ পৃথক। তারপর খুব সম্ভব একে একে সংবেদীয় স্নায়ুতন্তুগুলির মায়েলিন-আবরণ গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীরে ধীরে যথাযথভাবে বার বার বহিরাগত উত্তেজনার প্রভাবে তার মস্তিষ্কে কতকগুলি সজ্ঞান অনুভূতির (বিশেষতঃ তার নিজের জননীসংশ্লিষ্ট) ছাপ পড়তে থাকে—কেন না, এই অবস্থায় একমাত্র জননীই একান্তভাবে তার সর্বক্ষণের সঙ্গিনী। এভাবে নিজের প্রয়োজন-সংশ্লিষ্ট নানা চাপ ও জননীর সজাগ

ফলে অগোচরে তাদের নিরসনের ফলে মনের বিকাশ পরবর্তী 'অহম্মন্যতার' (Ego) স্তরে উন্নীত হয়। আগের মানসিক স্তর 'ইদ' এবং পরিবেশের সমন্বয়ের ফলে শিশুর মনে ব্যক্তিত্বের যে অঙ্কুরের স্ফুরণ হয়, তাতেই 'ইদ'-এর প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থাৎ অবাস্তব কিংবা অযৌক্তিক প্রবণতাগুলির রূপান্তর ঘটে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে, নিজের ভিতরকার অনুভূতি ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকটা সজ্ঞান অনুভূতির সমন্বয়ই মানবশিশুর অহম্মন্যতার ভিত্তি।

এক বছর বয়স পর্যন্ত উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গে তার মনের বিকাশের নিকট সম্বন্ধের একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ—কোয়াশিয়রকর নামক বিশিষ্ট পুষ্টিহীনতা রোগে শিশুর অতিকৃশ দেহের সঙ্গে মানসিক উপযুক্ত বিকাশেরও অভাব সব সময়েই দেখা যায়। প্রায় চার বছর বয়স অবধি অপুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিলে বিশেষতঃ তাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব ঘটলে শিশুর যথোপযুক্ত মানসিক বিকাশ ঘটা সম্ভব হয় না।

শিশুর জন্মের পর এক বছরের মধ্যে শিশুর মস্তিষ্কে ক্রমে ক্রমে সজ্ঞান অনুভূতিগুলির সুস্পষ্ট ছাপ পড়তে থাকে। প্রথমে দেহরক্ষামূলক (Protopathic) অনুভূতিগুলির ও পরে সূক্ষ্ম তারতম্যবোধক (Epicritic) সংবেদন-সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্তুগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রথম থেকেই ঐ সঙ্গে নিঃসংজ্ঞ অনুভূতিবাহক তন্তুগুলিও যথাসময়ে অঙ্গসংস্থান ও দেহের ভারসাম্য রক্ষাকল্পে (অর্থাৎ হামাগুড়ি দেওয়া, দু-পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানো এবং 'চলি চলি পা-পা' প্রভৃতি) সক্রিয়তা লাভ করতে থাকে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সজ্ঞান সংবেদনগুলির ছাপ যখন গভীরতর হয়, তখন ঐ পরিচিত অনুভূতিগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটলে শিশু তৎক্ষণাৎ পরিচিত ও অপরিচিত অনুভূতির পার্থক্য বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায় যে, অহর্নিশ সঙ্গিনী জননীসংশ্লিষ্ট অনুভূতিগুলির ছাপই সকলের আগে তার আয়ত্ত হয়। জননীর বেশভূষা, মুখের চেহারা, গলার স্বর—এমন কি, হাতের চুড়ির আওয়াজ এবং অতি কোমল হাতের স্পর্শ, দেহের আরামদায়ক উষ্ণতা প্রভৃতি অতি সহজেই তার বোধশক্তিকে এরূপভাবে সজাগ করে তোলে যে, সে ঐ চিরপরিচিত ব্যক্তিটির সান্নিধ্যে শুধু আরামই লাভ করে না নিজেকে অনেকটা নিরাপদও মনে করে। অবশ্য প্রথম প্রথম জননীর মত একই বেশভূষাধারিণী কেউ কাছে এলে কিংবা তারই মত কারো হাতের চুড়ির স্পর্শে কতকটা বিভ্রান্ত হলেও একবার তার মুখ দেখতে পেলে কিংবা তার হাত বা শরীরের স্পর্শসুখ অনুভব করতে পারলে কখনই তার মনে ঐরূপ ভুল হতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ শিশু জেগে থাকে, এই সকল বার বার পুনরাবর্তিত পরিচিত অনুভূতি ছাড়াও আরো অসংখ্য অনুভূতি সর্বদা, কখনো বা একটানা ভাবে এবং কখনো বা কতকটা সময়ের ব্যবধানে তার সজাগ মস্তিষ্কে আসতে থাকলেও তাদের ছাপ বার বার পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সে কারণেই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না কিংবা একটার উপর আর একটা আরোপিত হয়ে শেষেরটি আগের ক্ষণস্থায়ী ছাপকে মুছে ফেলে। ঐভাবে সহজলভ্য সজ্ঞান অনুভূতিগুলি এবং আয়াসলব্ধ কিংবা সুদূরপরাহত অন্যগুলি যথাক্রমে মস্তিষ্কের আগে থেকে প্রবুদ্ধ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন অংশে (Preconscious and conscious areas) আরোপিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, মায়েলিন-আবরণ গড়ে না উঠলে সংবেদীয় স্নায়ুতন্তুগুলি সক্রিয় হয় না এবং জন্মের পর কয়েক মাসের মধ্যেই ঐভাবে তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঠিক একই ভাবে চৈষ্টিক স্নায়ুতন্তুগুলিও জন্মের পর কয়েক মাস

মায়েলিন-আবরণহীন থাকায় তাদের ক্রিয়া হতে থাকে স্বয়ংক্রিয় বা অনৈচ্ছিকভাবে। এরূপ দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের উৎপত্তিস্থল থেকে ঐরূপ নিরাবরণ তন্তুগুলি প্রায় এক বছর বয়সের আগে, সুষুম্নাকাণ্ডের পুরোশৃঙ্গবর্তী সেলগুলি (Anterior horn cells) পর্যন্ত মায়েলিন-আবরণ লাভ করে না। সে কারণেই শিশু সাত-আট মাস বয়স পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে উঠে দাঁড়াতে কিংবা নয় দশ মাসের আগে হাঁটতে পারে না। একই ভাবে শিশুর মনের বিকাশের প্রথম বাহ্যিক চিহ্ন, তার কথা বলবার প্রয়াস। সে জন্যেই মনে করা হয়, যেহেতু মনুষ্যেতর প্রাণীদের কোন ভাষা নেই, সেহেতু তাদের মন বলেও কিছুই নেই। কারণ একমাত্র ভাষাই, সে মুখের দ্বারাই হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অভিব্যক্তির সাহায্যেই হোক, তার মনের প্রতীক। এক বছর বয়সের আগে প্রায়শ: মানবশিশুরও কথা বা ভাবভঙ্গীর দ্বারা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না বলে এই বয়সকেই মনের বাহ্য প্রকাশের কাল বলে ধরে নেওয়া হয়।

অন্য দিকে ঐ একই সময়ে প্রায় সব কয়টিই বিশিষ্ট এবং সাধারণ সংবেদীয় স্নায়ু মায়েলিন-আবরণে আবৃত হয়ে নিজ নিজ সক্রিয়তা লাভ করাতে তাদের সাহায্যে অনবরত অসংখ্য নানারকমের বহির্জগতীয় উত্তেজনা স্রোত তোড়ে এসে দেহে প্রবেশ করতে থাকে (শুধু দেহ-রক্ষক প্রতিবর্তী ক্রিয়া-সংশ্লিষ্টই নয়, অন্যান্যগুলিও) মোটেই সুসংবদ্ধ বা সুশৃঙ্খলভাবে নয়, অনেকটা অর্ধসম্পন্নভাবে। এগুলির মধ্যে যেগুলি সব সময়ে বার বার আসতে থাকে, তারাই মস্তিষ্কের কোন না কোন বিশেষ অংশে চিরস্থায়ী ছাপের সৃষ্টি করে, কিন্তু যেগুলি কোন কোন সময় কিংবা অনেকটা সময়ের ব্যবধানে প্রবেশ করে অথবা যেগুলি দেহের পক্ষে অপ্রীতিকর কিংবা হানিকর, তাদের ছাপ মোটেই স্পষ্টভাবে বসে না এবং তা অচিরেই লুপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, মায়ের বুকে আরামপ্রদ অবস্থান, তাঁর আদরমিশ্রিত কোমল স্পর্শ, সুমিষ্ট পীযূষধারাযুক্ত পীনপয়োধর অথবা অনুভাবে অত্যন্ত খাদ্যপূর্ণ ফিডিং বটল কিংবা বিকল্প তরল স্বাভাবিক খাদ্যসহ বাটি ও ঝিনুক বা চামচ এবং সময়ে সময়ে তাদের নাড়াচাড়ার সময়ে টুং টাং শব্দ—এসব পরিচিত পরিবেশ প্রতিদিন বার বার তার ইন্দ্রিয়রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়ে যথাস্থানে গভীর চিরস্থায়ী ছাপ এঁকে রাখে। তারা শুধু ঐ সকল নির্দিষ্ট স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে—এমন নয়, অচিরে একে অন্যের সঙ্গে সংযোগী স্নায়ুতন্তুর দ্বারা যুক্ত হয়। সংশ্লিষ্ট তন্তুসহ নবসৃষ্ট কেন্দ্রগুলি মোটেই স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে না, কোন পরিচিত উত্তেজনার আরোপ-মাত্র সক্রিয়ভাবে সাড়া দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে এবং গতিশীলতাই তাদের ধর্ম। সে কারণে যখনই অভ্যস্ত ও পরিচিত উত্তেজনার যে কোনটির পুনরাবির্ভাব ঘটে, শিশু তার ফলটুকু তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করে বুঝতে পারে যে, এবার তার খাবার কিংবা ঘুমিয়ে পড়বার উপযুক্ত সময় হয়েছে। প্রথম প্রথম সুস্পষ্ট পার্থক্যবোধ থাকে না, যেমন মায়ের মত বেশভূষাধারিণী প্রায় একই রকম চেহারার যে কোন মেয়ে কাছে এলে, খাওয়ালে কিংবা ঘুমপাড়ালে সে তাকে নিজের মা বলেই ধরে নেয় ও তার দেওয়া খাদ্যগ্রহণ করে, তাঁরই আরামপ্রদ কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েক মাস বয়স হলেই সমজাতীয় উত্তেজনাকে একে অন্য থেকে বিচার-বিশ্লেষণের ফলে পৃথক করবার ক্ষমতা জন্মায়। সুতরাং ঐ সময়ে সে আসল ও নকলের পার্থক্য বুঝতে পারে। সে তখন সদ্যআগত সংবেদনকে আগের অভ্যস্ত সংবেদনগুলির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলির তুলনামূলক বিচার করে এবং খোপে টিকলে তাকে আসল বলে যেমন গ্রহণ করে আবার তেমনি বিপরীতভাবে খোপে না টিকলে জাল

বা নকল বলে প্রত্যাখ্যান করে। শরীরের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে থ্যালামাস-মস্তিষ্ক-ত্বক চক্রে (Thalamocortical circuit) মস্তিষ্কবৃন্তে অবস্থিত জালিক সংগঠনের উর্ধ্বগামী তন্তুগুচ্ছের এবং পশ্চাতে অবস্থিত দীর্ঘায়ত তন্তুগুচ্ছের (Ascending tracts of the reticular formation and posterior longitudinal bundle) দ্বারা নানাপ্রকারের সংবেদীয় বার্তা বাহিত হওয়াতেই ঐরূপ পার্থক্যবোধের ক্ষমতা জন্মায়।

অবস্থিত 1, 2, 3 চিহ্নিত অংশগুলি (1নং চিত্র) শুধু যে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত, গুণ ও পরিমাণগত ও পার্থক্য-সংশ্লিষ্ট সাধারণ সংবেদীয় অনুভূতিবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—এমন নয়, অধিকন্তু এই সকল বিশিষ্ট স্থানেই সদ্যোজাত শিশুর মনের বীজ সর্বপ্রথমে উপ্ত হয়। যখন মস্তিষ্ক-ত্বকের এই সকল কেন্দ্রের সঙ্গে নিত্য নবোদ্ভূত সংযোগী তন্তুর দ্বারা সম্মুখ পিণ্ডের পুরোভাগে অবস্থিত 9, 10, 11, 12 ও 13 চিহ্নিত অংশগুলির (2নং চিত্র
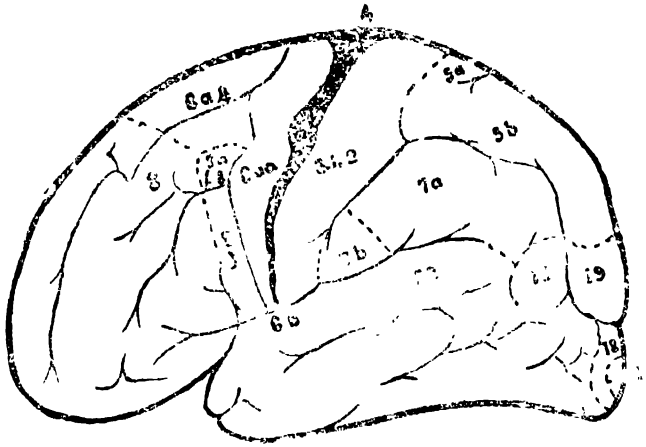
1নং চিত্র
বাঁ-দিকের মস্তিষ্ক-ত্বকে অবস্থিত সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত বহির্ভাগীয় কেন্দ্রসমূহ 1, 2, 3,—সাধারণ সজ্ঞান অনুভূতির কেন্দ্রসমূহ।

তারপরই শিশুর মানসিক বিকাশ, পরবর্তী স্তর 'অহংকার' (Superego) পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময়েই মনে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিভেদে বিচার-বিশ্লেষণের ফলে অভ্যস্ততা কিংবা অনভ্যস্ততা দেখা দেয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গে সে এমন সব উত্তেজনা ও সক্রিয়তা লাভ করতে চায়, যার ফলে সামাজিক রীতি নীতি এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ তার আয়ত্তে আসে এবং সকলের শেষে তার মনে শৃঙ্খলাবোধ ও আদর্শের প্রতি অনুরাগের স্পৃহা জাগে।

বিজ্ঞানী হেড ও তাঁর সহযোগীদের মতে, মস্তিষ্ক-ত্বকের প্যারাইট্যাল পিণ্ডে (Parietal lobe)

সংযোগ ঘটে, তখনই শিশুর মনে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা জন্মায়। নিম্নলিখিত পরীক্ষার ফলেই এরূপ ধারণা প্রমাণিত হয়েছে। মস্তিষ্ক-ত্বকের এই সকল কেন্দ্রের নিম্নবর্তী সংযোগ তন্তুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করলে প্রাণীর মধ্যে যে ব্যবহারিক আচরণের সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটে, তাতে মনে হয় যে, তারা শুধু প্রক্ষোভভিত্তিক উত্তেজনা-প্রবণতার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, কিন্তু যদি দু-দিকেই এরূপ বিচ্ছিন্নতা ঘটে, তাহলে যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করবার অক্ষমতা ঘটে এবং কোন কিছু সম্বন্ধে সম্যক পরিপূর্ণ ধারণা, বিশ্লেষণের দ্বারা বিচার এবং

সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলবার ক্ষমতাও অতিমাত্রায় ব্যাহত হয় এবং ঐ সঙ্গে দূরদৃষ্টি, পূর্বদৃষ্টি এবং যখন যেমনটি করা আবশ্যক, তার ক্ষমতাও লোপ পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহুদিনব্যাপী স্নায়ুগুচ্ছ (3নং চিত্র) এবং জালিক সংগঠনের উর্ধ্ব-গামী তন্তুগুচ্ছের (4নং চিত্র) মাধ্যমে থ্যালামাস-মস্তিষ্ক-ত্বক চক্রে বাহিত হয়ে সংবেদীয় কেন্দ্রগুলিকে সচেতন করে তুলে তাদের মধ্যে সজ্ঞান অনুভূতির
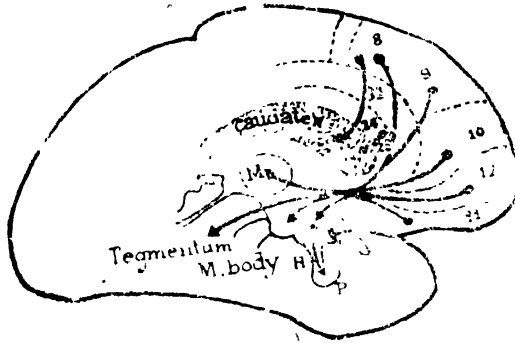
2নং ক চিত্র
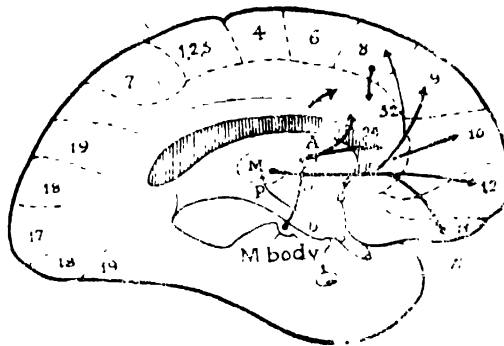
2নং খ চিত্র

দুটি গুরুমস্তিষ্ক (2নং ক ও খ) একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ডান মস্তিষ্ক-ত্বকের অন্তর্দিকের সংযোগী গুচ্ছগুলির দ্বারা যুক্ত মনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, ও 13 সংখ্যক কেন্দ্রসমূহ। H-অধস্থ্যালামাস।

প্রযুক্তির ফলে বিকশিত চিন্তা করবার সাধারণ ক্ষমতা অব্যাহত থাকে, খুব সম্ভব কম বিকশিত নিকটবর্তী অন্যান্য কেন্দ্রের সক্রিয়তার ফলে।

সুতরাং মানবশিশুর পক্ষে সুপ্ত অবস্থা থেকে মনের পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে—দেহের নানা অংশ থেকে সাধারণ ও বিশিষ্ট সংবেদীয় স্নায়ুর দ্বারা বহির্জগৎ থেকে আগত উত্তেজনাসমূহ, সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কবৃন্তে অবস্থিত পশ্চাৎ দীর্ঘায়ত সুস্পষ্ট ছাপ সৃষ্টির উপর। এরই ফলে অনুভূতি-স্মারক যে কেন্দ্রগুলির আবির্ভাব হয়, সেগুলির ক্রমে ক্রমে সংযোগ ঘটে নূতন তৈরি সংযোগ তন্তুর দ্বারা সম্মুখ পিণ্ডের পুরোভাগে অবস্থিত কতকগুলি বিশেষ মননসম্বন্ধীয় কেন্দ্রের। ঐ কেন্দ্রগুলিতেই সাধারণতঃ কোন অনুভূতির সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ ঘটে এবং উপযুক্ত সংশ্লেষণের দ্বারা অন্যান্য অনুভূতির সঙ্গে সুষ্ঠু

সংযোজন ঘটাতে উপযুক্ত পরিকল্পনারও শক্তি জন্মায়। আবার ভাল-মন্দ বিচারের ফলে শৃঙ্খলা-বোধ ও সমাজের চলিত রীতিনীতির প্রতিও সম্ভ্রম জাগে। এই সকলেরই সমন্বয়ে মনে গড়ে ঘটতে থাকে। নিজের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার সত্বেও ভিন্ন লিঙ্গের শিশুর প্রতি তার অকারণে (?) আগ্রহ ও আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এর জন্যে মুখ্যতঃ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে, চোখ

3নং চিত্র
সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কবৃন্তে অবস্থিত পশ্চাৎ দীর্ঘায়ত স্নায়ুগুচ্ছ।

ওঠে কখন কি অবস্থায় কি করতে হবে, যাতে মন ও শরীরের দিক থেকে সব কিছু ভাল হয়। এরূপ পূর্ণ বিকশিত মনের বাহ্য প্রকাশের নামই ব্যক্তিত্ব।

মনের বিকাশের স্তর তবুও এখানেই পূর্ণতা লাভ করে না। অতি ধীরে ধীরে শিশুর নিজের এবং অপরেরও অজ্ঞাতসারে তার মনের আর একটি দিক অর্থাৎ যৌন মানসের অঙ্কুরের উদ্গম হয়, যদিও বাইরে থেকে মোটেই তা টের পাওয়া যায় না। শিশুর পাঁচ বছর বয়সের পর থেকেই তার পোষাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে, খেলাধূলায় এবং আচার-ব্যবহারে যৌন মানসের প্রতিফলন ও কানের সাহায্যে লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা মনে বিশিষ্ট যৌনবোধের উন্মেষের ফলে তার বাহ্য প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু যে বিশিষ্ট মানসিকতা ছিল অঙ্কুর মাত্র, তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের মত সব কয়টি পাঁপড়ি মেলে বিকশিত হয় না—যে পর্যন্ত না তার বিশিষ্ট যৌন গ্রন্থিগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐ যৌনগ্রন্থিগুলির পরিণত অবস্থায় তাদের মধ্যে (পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবে) যে সকল হর্মোন ক্ষরিত হয়, তারাই রক্তের সঙ্গে স্নায়ু ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে, বিশেষতঃ অধস্থ্যালামাসে (Hypothalamus)

বাহিত হয় এবং সেখান থেকে বহির্মুখী সংযোজক তন্তুসমূহের দ্বারা উত্তেজনা-স্রোতকে মস্তিষ্ক-ত্বকের সম্মুখ ও প্যারাইট্যাল পিণ্ডে অবস্থিত ব্যাপক অংশে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে অবস্থিত মনের

৫নং চিত্র
মস্তিষ্কবৃন্তে অবস্থিত জালিক সংগঠনের উর্ধ্বগামী তন্তুসমূহ।

তখনও কতকটা অসম্পূর্ণ বিকাশকে সব রকমে সম্পূর্ণ করে তোলে। সুতরাং জন্মের পর তিন মাস বয়স থেকে কৈশোর পর্যন্ত মনের বিকাশ তিল তিল করে অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

"আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারেন না ; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়*

সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সাধারণের কাছে পরিবেশন অবশ্যই কিছু দুরূহ। এক 'সাধারণের' সঙ্গে অন্য 'সাধারণের' সেই বিবাদ ভঞ্জনের প্রয়াসে এই প্রবন্ধ। সরল গতি-বিজ্ঞান, লেখ (Graph) ও বক্রতল (Curved surface) সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান অনুমান করে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে।

একটি বস্তুখণ্ডের উপর যদি কোন বল প্রযুক্ত না হয় অর্থাৎ যদি তাকে টানা না যায় বা ধাক্কা দেওয়া না হয় অথবা তার কাছাকাছি কোন ভারী বস্তু তাকে মাধ্যাকর্ষণ বলের দ্বারা আকর্ষণ না করে, তাহলে বস্তুখণ্ডটি হয় স্থির থাকবে নতুবা সমবেগে সরলরেখায় ধাবিত হবে—এই কথাটুকু অনেকেরই জানা আছে। এই বস্তুখণ্ডটির সময় (Time) বনাম স্থানচ্যুতির (Displacement) লেখ (Graph) আঁকলে লেখটি একটি সরলরেখা হবে। একটু অন্য ভাষায় কথাটা বলে নেওয়া প্রয়োজন: লেখটি হবে সমতলভূমিতে আঁকা ন্যূনতম পথ (Shortest path)।

যদি বস্তুখণ্ডটির উপর বল প্রযুক্ত হয়, তাহলে কি হবে? তখন বস্তুখণ্ডটি আর সমবেগে সরলরেখায় ধাবিত হবে না, তার ত্বরণ (Acceleration) ঘটবে অর্থাৎ তার গতিবেগ পরিবর্তিত হবে। আলোচনার সুবিধার জন্যে মনে করা যাক যে, যে সরলরেখায় বলের অনুপস্থিতিতে বস্তুখণ্ডটি ধাবিত ছিল, বল সেই সরলরেখাতেই প্রযুক্ত হলো। ফলে বস্তুখণ্ডটির ত্বরণ ঘটলেও সেটি ধাবিত রইলো ঐ একই সরলরেখায়। এইবার বস্তুখণ্ডটির সময় বনাম স্থানচ্যুতির লেখ যদি আঁকা যায়, তাহলে সেটি সরলরেখা হবে না—হবে বক্ররেখা। বক্রতা কোথায় কত, তা নির্ভর করবে বল কোথায় বেশী ও কোথায় কম—তার উপর। বলটি যদি মাধ্যাকর্ষণজনিত হয়, তাহলে সেই বলহেতু বক্রতার একটা বিশিষ্ট রূপ দেখা যাবে—ফলে সময় বনাম স্থানচ্যুতিরও একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যাবে।

এযাবৎ আমরা যখনই লেখ সম্বন্ধে বলেছি, তখনই মনে করা হয়েছে যে, লেখটি সমতল ভূমিতে আঁকা। লেখ বক্রতলেও বা বক্রভূমির (Curved surface) উপরেও আঁকা সম্ভব, যেমন পৃথিবী-পৃষ্ঠবৎ একটি বর্তুলের উপর অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমা (Longitude) অঙ্কিত করে এদের একটির উপর সময় ও অন্যটির উপর স্থানচ্যুতি চিহ্নিত করে লেখ আঁকা যায়। সমতল ভূমিতে আঁকা ন্যূনতম পথ অর্থাৎ সরলরেখা সময় বনাম স্থানচ্যুতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করে বল বিহনে যে সম্বন্ধ ঘটে থাকে। কিন্তু বক্রভূমির উপর ন্যূনতম পথের লেখ সময় বনাম স্থানচ্যুতির অন্য সম্বন্ধ প্রকাশ করবে। সমতলভূমির ন্যূনতম পথ ত্বরণ প্রকাশ করবে না, কিন্তু বক্রভূমিতে আঁকা ন্যূনতম পথ, সময় ও স্থানচ্যুতির যে সম্বন্ধ প্রকাশ করবে, তাতে বস্তুখণ্ডের ত্বরণ প্রকাশ পেতে পারে। (কারো কারো মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—তাই বলা প্রয়োজন যে, বক্রভূমির ন্যূনতম পথ কি? উদাহরণের দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক—বর্তুলের দুটি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম পথ কি? প্রমাণ করা যায় যে, ঐ বিন্দু দুটি ও বর্তুলের কেন্দ্র নিয়ে যে সমতল ক্ষেত্র হবে, সেই সমতল ক্ষেত্র ও বর্তুলের ছেদ (Intersection) যে

---

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজী; খড়্গপুর।

বক্ররেখা বর্তুলের উপর পাওয়া যাবে, সেটিই বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে ন্যূনতম পথ)। বিভিন্ন বক্রভূমি বিভিন্ন ধরণের স্বরূপ প্রকাশ করবে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের কথাগুলি মেনে নিলে একথা বোঝা কঠিন হবে না যে, বক্রভূমি (যার উপর সময় বনাম স্থানচ্যুতির লেখ ন্যূনতম পথে অঙ্কিত হবে) এবং বল যেন দুটি বিকল্প কল্পনা। এদের যে কোনটির সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ রূপায়িত করা যায়। সুতরাং কি অবস্থায় বস্তুর উপর কি বল কার্যকরী হবে না বলে, কি অবস্থায় কি ধরণের বক্রভূমির উপর লেখ অঙ্কিত হবে, তা বললেও প্রায় একই কথা দাঁড়ায়। মনে হতে পারে যে, বক্রভূমির উপর লেখ এঁকে বস্তুখণ্ডের গতিবিধির বর্ণনা অকারণ জটিলতার সৃষ্টি করা মাত্র। এই সন্দেহের নিরাকরণ একটু পরেই হবে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বপূর্ব গতি-বিজ্ঞানের মতে কোন বস্তুখণ্ডের গতি জানতে হলে—জানা প্রয়োজন, তার উপর কি বল প্রযুক্ত আছে। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মতে বস্তুখণ্ডের গতিবিধি জানতে হলে জানতে হবে কি ধরণের বক্রভূমিতে তার সময় বনাম স্থানচ্যুতির লেখ আঁকতে হবে। সুতরাং কত বল কখন কোন বস্তুর উপর কার্যকরী হবে না বলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ভাষায় বলতে হবে, কি রকম বক্রভূমির উপর লেখ অঙ্কিত হবে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা প্রয়োজন যে, 'স্থান-কালের বক্রতা' (Space-time curvature) নামক এক দুর্জ্ঞেয় বস্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বিদ্যমান—এমন ধারণা যদি কারো মনে থাকে, তাহলে তাঁরা মনে করবেন যে, উক্ত বক্রভূমিই সেই বস্তু।

সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়ালো, উক্ত বক্রভূমিটি কি রকম হবে। বল কখন কি হবে, এই প্রশ্নের জবাব আপেক্ষিকতা তত্ত্বপূর্ব গতি-বিজ্ঞানে যে ভাবে দেওয়া হয়েছিল—'বক্রতা কি?' এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সে ভাবে দেওয়া হয় নি। আপেক্ষিকতা তত্ত্বপূর্ব গতি-বিজ্ঞানে বস্তুর গতিবিধি তথা তার স্বরূপ দেখে বলটি অনুমান করা হয়; যথা—গ্রহাদির গতিবিধি দেখে কয়েকটি ব্যবহারিক নিয়ম কেপ্‌লার আবিষ্কার করেন। নিউটন দেখান যে, তাঁর কৃত মাধ্যাকর্ষণ বিধি মেনে নিলে কেপ্‌লারের নিয়মগুলি অবশ্যই পালিত হয়। আপেক্ষিকতা তত্ত্বে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হয়েছে। এর প্রারম্ভ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। প্রারম্ভে ধরে নেওয়া হয়—প্রকৃতির নিয়ম দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ (সুতরাং বক্রতলকে ঠিক বলের বিকল্প হিসাবে নিয়ে আসা হচ্ছে না)। অতঃপর অত্যন্ত জটিল গাণিতিক পথ ধরে অগ্রসর হয়ে স্থান-কালের যে বক্রতার সূত্র আপেক্ষিকতা তত্ত্বে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, প্রায় মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কার্যতঃ এসে পড়ছে, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণজনিত সময় বনাম স্থানচ্যুতি প্রায় পাওয়া যাচ্ছে।

উপরের 'প্রায়' কথাটি একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার। গ্রহাদির গতিবিধি নিউটনীয় মতে যা হওয়া উচিত, সব গ্রহের ক্ষেত্রে তা মিলে গেলেও সূর্যের নিকটতম বুধগ্রহের বেলায় সেটি ততটা মেলে নি। আপেক্ষিকতা-তত্ত্বের মতে যে গতিবিধি পাওয়া গেল, তাতে কিন্তু বুধগ্রহের গতিবিধি যা দেখা যায়, তা সম্পূর্ণ মিলে গেল। তাছাড়াও আলোর সম্বন্ধে দুটি তত্ত্ব অদ্ভুতভাবে মিলে গেছে। 1916 সাল থেকে আইনস্টাইন ও অন্যান্য আপেক্ষিকতা তত্ত্ববিদেরা অঙ্ক কষে বুঝেছিলেন যে, সমুদ্র তরঙ্গের মত বা আলোক তরঙ্গের মত মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গেরও অস্তিত্ব আছে। এই তরঙ্গের সত্যতাও সম্প্রতি প্রায় প্রমাণিত হয়ে এসেছে।

কিন্তু এসব ছাড়াও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটা বিশেষ দান আছে। বহু পূর্ব থেকে আইনস্টাইনের মনে কথাটি ছিল বটে,

কিন্তু জিনিষটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 1940 সালে এবং তারপর পৃথিবীর বহু স্থানে বিশেষতঃ পোলাণ্ডে এই নিয়ে গবেষণা হয়। এই দানটির কথা বলবার জন্যে কিছু ভূমিকা প্রয়োজন।

নিউটনীয় বলবিদ্যায় নিউটনের অন্যতম বিধি আমাদের বলে দেয় বল কি হলে ত্বরণ কি হবে। আবার বল কি অবস্থায় কত ও কোন্ দিকে—সেটা জানবার জন্যে অন্য নিয়মের শরণাপন্ন হতে হবে। অনুরূপভাবে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বক্রতা কি হলে গতি কি হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, গতির লেখ ন্যূনতম পথ। বক্রতা কি, তার জন্যে অন্য নিয়মের শরণ নিতে হয়। বক্রতা জানবার একটা সমীকরণ আছে—একে বলা যাক ক্ষেত্র-সমীকরণ (Field equation)। সুতরাং 'ন্যূনতম পথবিধি' ও 'ক্ষেত্র সমীকরণ' দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর সম্পর্কচ্ছিন্ন বিধি। কিন্তু দুটিই তো প্রকৃতির নিয়ম—এরা সম্পর্কচ্ছিন্ন হবে কেন? এর অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর নিউটনীয় বলবিদ্যায় নেই। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এর উত্তর 1940 সালে সম্যকভাবে পাওয়া যায়—বোঝা যায় যে, উক্ত বিধি ও সমীকরণ সম্পর্কচ্ছিন্ন নয়—এরা আপাতদৃষ্টিতেই মাত্র সম্পর্কচ্ছিন্ন—ক্ষেত্র সমীকরণ থেকে ন্যূনতম পথ-বিধি প্রমাণ করা যায়।

এইভাবে প্রকৃতির নিয়মকে সম্পূর্ণ এক সূত্রে গ্রথিত করেছে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। তবু এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা আছে। মাধ্যাকর্ষণজনিত বল ভিন্ন অন্য বলের নিয়মাবলী আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যে আনা যায় নি। আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বের এই অসম্পূর্ণতা দূর করতে সর্বদাই প্রয়াসী ছিলেন এবং জীবনের শেষ কয়টি বছর বিশেষভাবে শুধু এই চেষ্টাই করেছেন।

"বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রেরই দুইটা অঙ্গ আছে। একটা অঙ্গ পণ্ডিতদিগের জন্য অর্থাৎ খাঁটি বৈজ্ঞানিকের জন্য, যে অংশে ইতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য। কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকিলে মানুষের জীবনযাত্রাই আজকাল অচল হইয়া পড়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীববিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সকল শাস্ত্রেরই মধ্যে খানিকটা অংশ আছে, যাহা সকলের পক্ষেই জ্ঞাতব্য; সেইটুকু না জানিলে কেবল যে মূর্খ বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে হয়, তাহা নহে, সেটুকুর জ্ঞান জীবনরক্ষা ও সংসারযাত্রার জন্যও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোককে বিজ্ঞানের এই ভাগের সহিত পরিচিত করা লোকশিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণের সহিত বিজ্ঞানের এই ভাগের পরিচয় করাইতে হইলে বিজ্ঞানের ভাষাকেও সাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে।"

—আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর

কৃষির প্রয়োজনে জল

অমূল্যধন দেব

জলের নাম জীবন—মানব জীবনের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য—তরু, লতা, গুল্ম সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। কৃষির জন্যে ভাল বীজ, ভাল সার প্রয়োজন, কিন্তু জল বিনা কোনও প্রয়োজনই মিটে না। গাছের তন্তুর মাধ্যমে মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ, শিকড় থেকে পাতায় চলাচল করে গাছকে সমৃদ্ধ করে।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা প্রভৃতির জন্যে বেশ কয়েক বছর খাদ্যের অনটন চলছিল। খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার জন্যে জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের প্রচেষ্টা চলছে, একই জমিতে দু-বার বা তিন বার ফসল ফলাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই ত্বরান্বিত প্রচেষ্টা হরিৎ ক্রান্তি বা সবুজ বিপ্লব নামে অভিহিত। উৎপাদনে উৎকর্ষসাধন তখনই সম্ভব, যখন একই জমিতে, একই চাষে, একই খরচে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বাড়ে। বেশী সার, বেশী জল দিয়ে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা এক কথা, আর যে সার, যে জল আছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে শক্তি বৃদ্ধি করা অন্য কথা। উৎপাদিকা শক্তির (Productivity) উৎকর্ষ একটি গাণিতিক হার (Ratio) এবং এই হার বৃদ্ধি ছাড়া জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। যাঁরা চাষ করেন, তাঁদের জল উত্তোলনের যন্ত্রাদি সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে, যন্ত্রাদি কি করে সংরক্ষণ করা যায় ও কার্যক্ষম রাখা যায়, সেই বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামেই যন্ত্র মেরামত করতে হবে। সবুজ বিপ্লবের অর্থ অধিক সবুজ শস্য রোপণ ও তার ফলন। শুধু ধান, গম নয়—তরিতরকারী, ফল, পশুখাদ্য এই আওতায় পড়ে। অন্যান্য দেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারা যায়, আমাদের অবস্থা কি।

দেশ	হেক্টর প্রতি উৎপাদন (কুইন্টাল)		
	ধান	গম	তুলা
মিশর	50	24	6·4
জাপান	57	24	—
ভারত	16	12	3·2

যেখানে প্রাকৃতিক কারণে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যায়, সেখানে হয়তো জলসেচের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে ধানের চারা রোপণ করতে হয়, সেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হয়। জলসেচ শস্য উৎপাদনের জন্যে আদি কাল থেকেই প্রচলিত। বেদের একটি শ্লোক থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তনূপ্যাঃ
শন্ন সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্ত কূপ্যাঃ।

[জল শুধু পানীয় নয়, শস্য উৎপাদনার্থে জমিতে সেচের জন্যেও এর প্রয়োজন]

জলসেচের ব্যবস্থা কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যেও স্থান পেয়েছে। এই জলসেচের ব্যবস্থা আজও চলছে, তবে প্রযুক্তিবিদ্যা সহযোগে এই সেচকার্য বহুজনের হিতার্থে সহজলভ্য হয়েছে।

ভূ-বারিবিদের (Geo-hydrologist) অনুমান অনুযায়ী, ভূ-অভ্যন্তরের 300 মিটার পর্যন্ত যে জল আছে, তার 20% সেচকার্যের জন্যে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হতে পারে। এই 20% জল ভূ-স্তরের উপরিভাগের জলের 14 গুণ। এতে প্রমাণ হয়, ভূ-নিম্নের বিশাল জল ভাণ্ডার আমরা উত্তোলন করি না। আরও আশ্চর্য, আবাদযোগ্য জমির

মাত্র 16.2% (1969 হিসাব অনুযায়ী) সেচের সুযোগ পায়।

এক দশক আগে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (W. F. O) এক সমীক্ষায় প্রকাশ পায়, সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা, পূর্বঘাট অঞ্চলে তিন-ফসল উৎপন্ন হতে পারে এবং নিবিড় চাষের মাধ্যমে সারা ভারতের খাদ্য উৎপাদন করেও কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে। এই বিষয়ে কে কতটুকু চিন্তা করেছিলেন জানা যায় না, কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়, এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ দেখা যায় নি, এমন কি তেমন প্রচারও হয় নি। বহু শস্য উৎপাদন এবং সবুজ বিপ্লবের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করা বাকী আছে।

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী জলের ব্যবহার অঙ্গ রাজ্যের অধীন। মাটি বৃষ্টির জল শোষণ করে। ভূ-অভ্যন্তরের এই জল (Ground water) তিনটি পর্যায়ে অবস্থান করে—

1. মজা হ্রদ, নদী ও খালের নীচে।
2. বালুকাময় ভূমির নীচে।
3. শিলাস্তরের রন্ধ্রপথে।

ভূ-অভ্যন্তরের জল নির্গমন পথের দিকে ক্ষীণ-ধারায় এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রবাহমান। এই জলের সঞ্চরণশীলতা মাধ্যাকর্ষণ ও পরিবাহীর প্রতিরোধ শক্তির উপর নির্ভর করে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল এই ধারাকে পুষ্ট করে। ভূ-অভ্যন্তরের জল যদি বাধাবন্ধ অতিক্রম করবার অক্ষমতার দরুণ সঞ্চরণশীল না হয়, তবে স্থিতিশীল অবস্থায় (Stagnant) খনিজ লবণের সংস্পর্শে লবণাক্ত হয়। জলের চাপ ও মাটির মধ্যেকার স্তরের ভেদ্যতার (Permeability) উপর জলের গতি নির্ভর করে।

মাটির নীচের জল পেতে হলে, মাটি খুঁড়তে হবে।

কূপ খনন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :

1. খোঁড়া কূপ—মাঠকুয়া, পাতকুয়া।
2. নলকূপ—অগভীর, গভীর।

ঠাসা মাটিতেই, মাটি কেটে কূপ খনন করা সম্ভবপর, এতে কুয়ার পাড় ধ্বসে পড়বার সম্ভাবনা কম। অনেক সময় কংক্রীট বা পোড়া মাটির রিং-এর গাঁথুনির দ্বারা কুয়ার বেড় মজবুত করা হয়। কূপ খননে, গভীর ও অগভীর কূপের পার্থক্য হলো—যদি এক বা ততোধিক অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ করে জল তুলতে হয়, তবে সেই কূপ গভীর, আর যদি কোন অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ না করেই জল পাওয়া যায়, তবে সেই কূপ অগভীর। কত মিটার নীচে জল পাওয়া গেল, তা গভীর-অগভীরের মানদণ্ড নয়।

মাটি খোঁড়বার জন্যে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এই যন্ত্রকে বলা হয় ড্রিল (Drill)। 50mm—750mm ব্যাসবিশিষ্ট গর্ত (Bore hole) এই ড্রিলের দ্বারা খোঁড়া যায়। খননকার্য শেষ হলে গর্তের মধ্যে কেন্দ্রিকভাবে বহিরাবরণ (Casing) পাতা হয়। বহিরাবরণ ও কূপের অন্তর্বর্তী ফাঁক ছোট ছোট পাথরকুচির (6mm—12mm) দ্বারা ভর্তি করা হয়। এই অন্তর্বর্তী ফাঁক সাধারণত: 50mm—100mm চওড়া হয়। বহিরাবরণ ঝালাই (Welding) বা স্ক্রু করে জোড়া লাগানো হয়। ঝালাই করাই প্রশস্ত, কারণ স্ক্রুর প্যাঁচানো অংশ (Thread) সহজেই খারাপ হয়ে যেতে পারে। যে স্তরে জল আছে, সেখানে সছিদ্র ফিল্টার বা জালি পাইপ থাকে। কাদামাটি পাম্প করে তুলে ফেলে দিলে এবং পাথর কুচিগুলি ঠিক ঠিক বসে গেলে পরিষ্কার জল আসবে।

কূপ খননের বিভিন্ন পদ্ধতি হলো—অগভীর কূপের জন্যে—Auger method, Jet method, Driven well method.

গভীর কূপের জন্যে—Direct circulation rotary method, Reverse circulation

rotary method, Percussion method, Cable tool drilling method.

যখন জল পাম্প করা হয়, তখন পাম্প যে পরিমাণ জল নিষ্কাশিত করে, সেই পরিমাণ জল কিছু সময়ের মধ্যেই আবার মাটি চুঁইয়ে কুয়ার মধ্যে এসে জমে এবং জল-শঙ্কুর অবস্থা অপরিবর্তিত রাখে। যদি তা না হয়, তবে এই কুয়া অকেজো হয়ে পড়ে ও জল উৎপাদন ক্ষমতা হারায়। জল না পেলে অনেকে যন্ত্রাংশের দোষ দেন, কিন্তু জল-শঙ্কুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই প্রথম কাজ। পাম্প বসাবার আগে অবশ্যই দেখতে হবে :

1. ভূ-স্তর থেকে জলতল বা জলস্তর (water table) কত নীচে (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

2. জলের স্তর সম্পৃক্ত কি না।

3. জল কত উঁচুতে তুলতে হবে।

4. প্রতি সেকেণ্ডে কত লিটার (L.P.S) উঠবে এবং জল-শঙ্কুর অবস্থা কি রকম দাঁড়াবে। ড্র-ডাউন (Draw-down) লাইন কত নীচে।

5. কূপের ব্যাস।

6. পাশাপাশি দুটি কুয়ার দূরত্ব।

যেখানে হস্তচালিত পাম্প ব্যবহার হয়, সেখানে দুটি কুয়ার ব্যবধান 330 মিটার হতে পারে। যেখানে যন্ত্রচালিত পাম্প ব্যবহার হয়, সেখানে ব্যবধান 1000 মিটার হতে পারে। গভীর নলকূপে জলের গতিবেগ এত বেশী যে, কয়েক কিলোমিটার ব্যবধান থাকলেও এক কুয়ার জল

জল-শঙ্কু ও জলতল

অন্য কুয়ার পাম্প টেনে নিতে পারে। এই সব কারণে যত্রতত্র পাম্প বসানো ঠিক নয়। এজন্যে আইন ও লাইসেন্স দরকার হতে পারে। জলের ড্র-ডাউন-লাইন জলতল বা জল-শঙ্কু নির্দেশ করে এবং এই ড্র-ডাউন লাইনই জলভাণ্ডারের নিয়ামক। প্রারম্ভেই এই বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

5 cm ব্যাস পর্যন্ত নলের জন্যে হস্তচালিত পাম্প ব্যবহৃত হতে পারে। 5 cm-এর বেশী ব্যাসের কুয়ার জন্যে যন্ত্রচালিত পাম্প ব্যবহৃত হয়।

নলকূপের অংশগুলি— 1. বহিরাবরণ বা হাউসিং পাইপ বা Casing—সাধারণতঃ 35 cm ব্যাস (বাইরের পরিমাপ)।

2. সচ্ছিদ্র পাইপ বা ফিলটার—20 cm।

3. টিউব (20 cm)—hot finished seamless or ERW (I. S. 4270.)। লোহার অভাবে প্লাষ্টিক টিউব, rigid PVC (I. S. 2509) ব্যবহৃত হতে পারে।

4. প্লাগ (Bottom plug)— 3 মিটার। প্রতিটি নলকূপ ঘন্টায় 5500—11000 litre জল দিলে 100—200 একর জমিতে সেচ সম্ভব। প্রতিটি নলকূপের সঙ্গে একটি 3-stage টারবাইন পাম্প যুক্ত থাকে এবং বিদ্যুৎ বা ডিজেল ইঞ্জিনে পরিচালিত হয়। 3—5 BHP (Brake Horse Power) মোটর সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। পাম্প করা জল, ক্ষেত্র-অভ্যন্তরে প্রোথিত রি-ইনফোর্স্‌ড্‌ কংক্রীট (R.C) পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। সাধারণতঃ এই পাইপ লাইন 1400 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং প্রতি 80 মিটার অন্তর 10টি ফোয়ারা থাকে। একটি উচ্চশক্তি পাম্প সংযুক্ত নলকূপ 1 বর্গ কিলোমিটার আয়তন জমির জন্যে যথেষ্ট।

বাজারে হরেক রকম পাম্প পাওয়া যায়। আমাদের মানক সংস্থা (I.S.I) যদি জল সেচের জন্যে পাম্পের মান নির্ণয় করে দেন, তবে কোন বিভ্রান্তি থাকবে না। আমাদের প্রয়োগবিদ্যাহীন-চাষী, বিভিন্ন পাম্পের মধ্যে কোন্‌টা সত্যই তাদের পক্ষে কল্যাণকর, তা ঠিক করতে পারেন না। পাম্পের মান নির্ধারিত হলে আরও অনেক সুফল পাওয়া যাবে, যেমন— 1. বিক্রেতারাই প্রাথমিক কোন অসুবিধা দূর করবার ব্যবস্থা করেন; 2. অতিরিক্ত যন্ত্রাংশ তৈরি ও মজুত রাখবার সুবিধা; 3. পল্লী সমবায় কর্তৃক পাম্প তৈরি।

পাম্পের জল নিষ্কাশন cusec হিসাবে পরিগণিত হতো। মেট্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের পর এখন পাম্পের জল LPS (লিটার পার সেকেণ্ড) হিসাবে প্রকাশ করা বিধেয়। পাইপের আয়তন যদি 100 sq. cm ($\pi d^2/_4$) হয় এবং জলের নির্গমন বেগ যদি সেকেণ্ডে 100 cm হয়, তা হলে প্রতি সেকেণ্ডে $100 \times 100 = 10000$ cubic cm জল পাওয়া যাবে। 1000 cc জলের ঘন পরিমাণ 1 litre অথবা ওজন 1 kg। অতএব 10000 cubic cm per sec জল মানে 10 litre per sec বা 10 L.P.S। পাম্পের ক্ষমতা (Capacity) হবে 10 L.P.S। পুরাতন অ-মেট্রিক হিসাবে LPS-এ পরিবর্তনের জন্যে 1 litre = 0·22 gallon—এই নিয়ম ব্যবহার করা যেতে পারে।

জল সেচ পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে যা আবশ্যক, তা হলো বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতা। এই সংস্থাগুলি হলো—Central Ground Water Board, State Ground Water Board, Agro-Industries Corporation প্রভৃতি। তা-ছাড়াও প্রয়োজন—

1. নলকূপ স্থাপনের উপযোগী কাঁচামাল ও যন্ত্রাদি সরবরাহ।

2. নলকূপ চালু রাখবার জন্যে কারিগরী-বিদ্যার প্রয়োগ।

3. নলকূপ স্থাপন ও ব্যবহারকারীদের উপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা। আমরা কৃষি-পণ্ডিত

আখ্যা শুনি, কিন্তু এই পণ্ডিতদেরও অনেক কিছু শিখতে হবে। চাহিদার তুলনায় ও সুযোগের তুলনায় সব ব্যবস্থাই অপ্রতুল। ভারতবর্ষের 5টি কোম্পানী বছরে 60টি Direct circulation drill তৈরি করতে পারে। 3টি কোম্পানী 30টি Reverse circulation drill তৈরি করতে পারে। 4টি কোম্পানী Deep well turbine pump ও 6টি কোম্পানী Air compressor তৈরি করে। 6টি কোম্পানী steel tube তৈরি করে। উৎপাদনকারীদের সামনে কৃষিকার্যের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় মালের কোন দাবী বা পরিকল্পনা নেই। এটা দুঃখজনক।

জল সেচের জন্যে আর্থিক আনুকূল্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়াও বিদেশ থেকে পাওয়া সম্ভব। যেমন—IDA, World Bank, Asian Development Bank, USAID প্রভৃতি। কাজেই অর্থাভাব জল সেচের প্রতিবন্ধক নয়। Reserve Bank-এর আওতায় The Agricultural Refinance Corporation (ARC) আজকাল Land Development Bank, Co-operative Bank, Agricultural Credit Bank, Land Mortgage Bank-কে দাদন দেন। উত্তর প্রদেশে 12টি প্রকল্পের জন্যে ARC 10 কোটির বেশী টাকা সাহায্য দিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে কেন এই রকম সুযোগ নেওয়া হয় না—তা গবেষণার বিষয়। নলকূপের সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করা হলো।

খাল কেটে নদীর জলের দ্বারা সেচ প্রথাও প্রচলিত। খরচের দিক থেকে খালের জল, নলকূপের জল অপেক্ষা সস্তা। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, নলকূপ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করে এবং যে কোন জায়গায় স্থাপন করা যায়, অবশ্য যদি মাটি খুব পাথুরে না হয়। খালের জলের জন্যে তৈরি বাঁধের জলধারণের পরিমাণ, পলিমাটি জমার উপর নির্ভরশীল। মজা নদী, খাল সংস্কার করলে সেচের জলের সুবিধা হয়। মৎস্য-চাষ সম্ভব হয়। বন্যার জল নিকাশ হতে পারে। পাট ধোলাই করবার সুবিধা হয়। অন্য দিকে অগভীর নলকূপ আশে-পাশের পুষ্করিণীর জল টেনে নিতে পারে।

সমুদ্রের লোনা জল শোধন করা ব্যয়সাধ্য। ইজরায়েল সমুদ্র-জল থেকে পটাসিয়াম সল্ট তৈরি করে সার হিসাবে ব্যবহার করে এবং শোধিত জল সেচের কাজে প্রয়োগ করে। লোনা জল থেকেই তাঁরা সোনা ফলাচ্ছে। আমরা আশা করবো ভারতবর্ষেও একদিন সমুদ্রের জলের ব্যবহার আমাদের কৃষিকে সমৃদ্ধ করবে।

[গত বছর Association of Engineers India-র সেমিনারে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেই রেকর্ড থেকে অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্যে Association of Engineers-এর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রসঙ্গে

জয়ন্ত বসু*

বর্তমান বর্ষ যেমন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার রজত জয়ন্তী বর্ষ, তেমনি আবার বিজ্ঞান পরিষদেরও। আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। কেবল পত্রিকার মাধ্যমেই নয়, বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও হাতে-কলমে বিভাগ পরিচালনা, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন প্রভৃতি হরেক রকম কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে গত 24 বছর ধরে বিজ্ঞান পরিষদ একটি অনির্বাণ দীপশিখার মত প্রজ্বলিত আছে। এর আলো কখনো খুব উজ্জ্বল হয়েছে, কখনো কিছুটা স্তিমিত। তবে মূল কথা হচ্ছে, যাঁরা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'না, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের এ রকম একটা প্রতিষ্ঠান 2/4 বছরের বেশী বাঁচতে পারে না', তাঁদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে বিজ্ঞান পরিষদ বেঁচে আছে, বেশ ভালভাবেই বেঁচে আছে এবং আরও ভালভাবে এর বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বিশেষতঃ বছর চারেক আগে পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ার পর একদিকে যেমন পরিষদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বাংলা-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার যে আদর্শ পরিষদ এত দিন প্রচার করে আসছে, ক্রমে ক্রমে তা প্রায় সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষে এর গৌরবময় ঐতিহ্যের পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়, আগামী দিনে পরিষদ যাতে আরও সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে, তার জন্যে একটি ব্যাপক ও নির্দিষ্ট কর্মসূচী রচনা করা একান্তই আবশ্যক বলে মনে হয়। সেই কর্মসূচী সম্পর্কে কিছুটা প্রারম্ভিক আলোচনার জন্যে বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়িগণ যদি এ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতায় একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তবানুগ কর্মসূচী স্থির করা সম্ভব হবে এবং আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সেই কর্ম-সূচী রূপায়ণেও পরিষদ সাফল্য লাভ করবে।

কর্মসূচী সম্বন্ধে প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়, তা হলো এর জন্যে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদী পরিকল্পনা দরকার—আমাদের দেশের জন্যে যেমন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অনেকটা সেই ধাঁচের আর কি! এতে কর্মপ্রচেষ্টার ঈপ্সিত গতিবেগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে এবং কিছু কাল অন্তর অন্তর, ধরুন প্রত্যেক বছরের শেষে, পরিকল্পিত লক্ষ্যের কষ্টিপাথরে পরিষদের অগ্র-গতিকে বিচার করা সম্ভব হবে।

শাখা গঠন

গত 24 বছরে বিজ্ঞান পরিষদের কর্মধারা ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়েছে এবং বাঙ্গালী জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে পরিষদ কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যক্ষ প্রভাব এখনো পর্যন্ত প্রধানতঃ শহর কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পত্রিকা এবং পুস্তকাদির মাধ্যমে মফস্বল বাংলায় পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা খানিকটা বিস্তৃত হলেও

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

সেখানকার মানুষের সঙ্গে পরিষদের তেমন কোন যোগসূত্র গড়ে ওঠে নি। কলকাতার কার্যালয় থেকে এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়—এর জন্যে দরকার মফস্বল শহরে এবং সম্ভব হলে একেবারে গ্রামাঞ্চলেও পরিষদের শাখা গঠন করা, যাতে স্থানীয় অধিবাসীদের সুযোগ-সুবিধা ও চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞানের আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মফস্বল বাংলায় পরিষদের যে সব সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী আছেন, তাঁদেরই, বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তাঁরা পরিষদের কার্যকরী সমিতির সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। কার্যকরী সমিতিও শাখা স্থাপন করা ও শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করবার সুবিধার জন্যে একটি শাখা উপসমিতি গঠন করতে পারেন। আগামী 5 বছরে 5টি না হলেও 2/3টি শাখা স্থাপন করবার পরিকল্পনা বোধ হয় বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশেও অন্ততঃ একটি শাখা খোলবার চেষ্টা করা উচিত বলে মনে হয়।

পত্রিকা ও লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ

এখনো পর্যন্ত পরিষদের বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে 24 বছর ধরে প্রতি মাসে নিয়মিত একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশ করা। এর জন্যে প্রয়োজন একদিকে প্রবন্ধাদি সংগ্রহ ও সম্পাদনার, অন্যদিকে আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহনের; আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে নিছক বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার পক্ষে এগুলি যে কতখানি দুরূহ কাজ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। পত্রিকাটির প্রকাশ অতি অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এর মানোন্নয়নের জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে একে আরও সুখপাঠ্য, আরও জনপ্রিয় করবার জন্যে। আনন্দের কথা, গত কয়েক বছর ধরে খানিকটা পরিকল্পিতভাবে এ ধরণের চেষ্টা হচ্ছে, যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো পত্রিকাটিতে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র বিভাগের সংযোজন। প্রতি বছর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' যেমন 2/3টি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করা হয়, তেমনি আবার প্রত্যেকটি সাধারণ সংখ্যাতেও 2/3টি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়—বিজ্ঞানের একেবারে আধুনিকতম আবিষ্কার এবং জনগণের কৌতূহল অনুসারে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা এই প্রবন্ধগুলি রচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এইরকম আবার নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (যেমন লেসার, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, আণবিক জীববিদ্যা, আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান ইত্যাদি) স্থির করে সেগুলির প্রত্যেকটির বিষয় স্বল্পমূল্যে পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশের জন্যে কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এই ধরণের কিছুটা প্রচেষ্টা আগেও হয়েছে, যার পরিচয় পাওয়া যাবে 'লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালায়'। সুচিন্তিত-ভাবে সময়-সীমিত কর্মসূচী হিসাবে এই প্রচেষ্টা হওয়া দরকার—প্রতি বছর অন্ততঃ 1টি করে আগামী 5 বছরে 5টি এই রকম পুস্তক প্রকাশ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানকোষ ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিবিধ তথ্যের আভিধানিক ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ও পরিভাষা-সম্বলিত 'এনসাইক্লোপিডিয়া' ধরণের একখানি বাংলা কোষগ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা বিজ্ঞান পরিষদ কয়েক বছর আগেই গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ মানুষের কৌতূহল নিরসনের জন্যে যেমন একটি বাংলা বিজ্ঞানকোষের প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে সর্বস্তরে বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার পক্ষে এই কোষগ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হবে। এই গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনা বাবদ প্রয়োজনীয়

অর্থসাহায্যের জন্তে পরিষদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রায় 5 বছর আগে আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু সে আবেদন সফল হয় নি। যা হোক, আবার নতুন করে এজন্তে উদ্যোগ-আয়োজন করা উচিত বলে মনে হয়। কোষ-গ্রন্থটি 4 বা 5 খণ্ডে বিভক্ত করে প্রতি বছর অন্ততঃ এক একটি খণ্ড প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনের কাজটিকে বিজ্ঞানকোষ রচনার প্রথম ধাপ বলা যেতে পারে– পরিভাষা তালিকার শব্দগুলির উপর ভিত্তি করেই তো বিজ্ঞানকোষ রচনা করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও অনুরূপ অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাভাষায় সার্বিক ও বিশদ বিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা রচনার জন্তে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আনন্দের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এই প্রস্তাব যাতে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্তে পরিষদকে উদ্যোগী হতে হবে। গত 24 বছরের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি একত্র সংকলিত করে পরিভাষা রচনার কাজটি ইতিমধ্যে কিছুটা এগিয়ে রাখা যেতে পারে। পত্রিকাটির রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বর্তমান বছরেই কাজটি কি করে ফেলা যায় না?

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

'পরিষদ ভবন' নির্মিত হওয়ার পর গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের জন্তে মোটামুটি স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয়েছে এবং এগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনারও কিছুটা ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এগুলি এখনো আশানুরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থাই অবশ্য এর প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তা সে যাই হোক, গ্রন্থাগারে অনতিবিলম্বে একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা দরকার, যাতে দরিদ্র ছাত্রেরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারে—জনৈক দাতার দানের অর্থে এই বিভাগের প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সংস্থান করা সম্ভব হবে। আর পাঠাগারকে কেন্দ্র করে একটি বিজ্ঞান মজলিস গড়ে তুলতে পারলে খুবই ভাল হয়। সাহিত্যিকদের মজলিসের কথা আমরা শুনেছি এবং তাঁদের সৃজনকর্মে এর ইতিবাচক প্রভাবের সঙ্গেও আমরা কিছুটা পরিচিত। মাসে অন্ততঃ দু'বার বিজ্ঞান মজলিসের বৈঠক করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের নানান বিষয় নিয়ে সেখানে 'আড্ডা' জমে উঠবে। বিশেষ করে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখকদের মিলনস্থল হিসাবে ঐ মজলিস কাজ করবে। নতুন লেখকেরা সেখানে তাঁদের রচনা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখকদের মতামত সংগ্রহ করতে পারবেন। পাঠাগারের উদ্যোগে সম্প্রতি যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল, প্রতি বছর ঐ রকম একটি করে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়; প্রতিযোগিতার পর প্রত্যেকটি প্রবন্ধ মজলিসে আলোচনা করা হবে—এতে প্রবন্ধকারগণ সমেত মজলিসের সকলেই উপকৃত হবেন।

হাতে-কলমে কাজ ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী

পরিষদের নিজস্ব ভবন নির্মিত হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিশোরদের উপযোগী একটি হাতে-কলমে বিভাগ সুরু করা হয়েছে। এই বিভাগের অগ্রগতির অন্তরায় প্রধানতঃ দুটি: (1) প্রয়োজনীয় অর্থের অনটন এবং (2) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহের অভাব। প্রথম অন্তরায় দূর করবার জন্তে NCERT-এর (শিক্ষা

বিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষণের জাতীয় সংস্থা) কাছে বর্তমান বছরে আবেদন করা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নি। তাহলেও এ ব্যাপারে আবার চেষ্টা করা দরকার। তা ছাড়া পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি সরকারী আনুকূল্যের যে আশ্বাস দিয়েছেন, সেটিকেও যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা উচিত। ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার অগাষ্ট সংখ্যায় 'বিজ্ঞান প্রদর্শনী' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করবার জন্যে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবতে হবে; তা ছাড়া তাদের তৈরি মডেল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বছরে অন্ততঃ দু'বার প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। এই সব প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কুল এবং বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান থেকেও মডেল ইত্যাদি আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। কলকাতায় বা আশে-পাশে যে সব স্থানে বিজ্ঞানসম্পর্কীয় দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তু আছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করতে পারলে ভাল হয়। এ জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কাছ থেকে বা অন্য কোন সূত্রে যাতে একটি বাস বা ভ্যান সংগ্রহ করা যায়, সেজন্যে সবিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি এবং শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরিষদের পক্ষ থেকে যে দুটি বিরাট বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, সেই ধরণের প্রদর্শনীর জন্যে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। প্রতি বছর না হলেও 2/3 বছর অন্তর ঐ রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নিতান্তই কাম্য—বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের প্রচেষ্টায় সেগুলি বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বর্তমান বছরে এরূপ একটি প্রদর্শনীর পরিকল্পনা করা হয়েছে, আর্থিক সাহায্যের জন্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের কাছে আবেদনও করা হয়েছে; এই পরিকল্পনা যাতে সফল হয়, সেজন্যে সর্বতোপ্রকারে সচেষ্ট হতে হবে।

পরিষদ ভবন নির্মাণ

পরিষদ ভবনের ভূগর্ভ-তল ও প্রথম তলের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছে 1969 সালের প্রথমার্ধে। আগামী এক বছরের মধ্যে ভবনের দ্বিতলটি সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়—সম্প্রতি এর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হয়েছে। দ্বিতল নির্মিত হওয়ার পর 'কুমার প্রমথনাথ হল'টিকে বক্তৃতা-কক্ষ হিসাবে সুসজ্জিত করতে পারলে ভাল হয়।

আগামী 3/4 বছরের মধ্যে যাতে পরিষদ ভবনের ত্রিতল নির্মিত হয়ে ভবনটি সম্পূর্ণ হয়, তার জন্যে সচেষ্ট হওয়া দরকার। তখন ঐ ভবনে বিজ্ঞানের একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করা যেতে পারে; সেখানে 'হাতে-কলমে' বিভাগের শিক্ষার্থীদের তৈরি সেরা মডেলগুলি সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা থাকবে।

উপসংহার

পরিষদের কর্মসূচীর যে সব বিষয়ে বর্তমানে নতুন করে পরিকল্পনা করা আবশ্যক বলে মনে হয়, সেগুলি সম্পর্কেই বিশেষভাবে এখানে আলোচনা করা হলো। এ ছাড়া বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা ও 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি' বক্তৃতার ব্যবস্থা, আদর্শ মানের বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিজ্ঞান-লেখকদের অনুরোধক্রমে তাঁদের পাণ্ডুলিপির যোগ্যতা বিচার করে সেগুলির প্রকাশ—এই সমস্ত কর্মধারা তো অবশ্যই থাকছে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, 'পরিকল্পনার কথা তো অনেক হলো, কিন্তু কথাকে কি কাজে রূপান্তরিত করা যাবে?' আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়িগণ যদি পরিষদকে

তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করে এর জন্যে কিছুটা সময় ও শ্রম ব্যয় করেন, তাহলে পরিকল্পিত প্রকল্পগুলিকে নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত করা সম্ভব। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে যে কৌতূহল সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে জাগ্রত করতে পারলে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত জনগণের সহযোগিতায় পরিষদের জনকল্যাণকর কর্মসূচী রূপায়িত করা যাবে।

বৃহদাকৃতির টার্কী উৎপাদন

উত্তর ইংল্যাণ্ডের পশু-পাখী উৎপাদক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ট্রিপল সিক্স মেইন লাইন থেকে পাঁচ বছর ধরে পরীক্ষার ফলে চওড়া বুক, শক্তিসম্পন্ন, সুন্দর পালকযুক্ত, হাড়-মাংসে গঠিত দ্রুত বর্ধনশীল একপ্রকার বৃহদাকৃতির টার্কী (পেরুপাখী) উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। প্রয়োজনীয় জিন (Gene) পাবার জন্যে উৎপাদকেরা

চারটি পৃথক শ্রেণীর টার্কী নিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টা করেন। 13,000 পাখীর মধ্য থেকে এই উদ্দেশ্যে মাত্র 90টিকে বেছে নেওয়া হয় এবং পাঁচ বছরের চেষ্টার ফলে এই নূতন টার্কীর উৎপাদন সম্ভব হয়।

বিজ্ঞান ও গ্রামবাংলা

সূর্যেন্দুবিকাশ কর*

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল। কোন সাময়িক পত্রিকার জীবনে পঁচিশ বৎসর খুব কম সময় নহে। যে দেশে বহু সাহিত্য পত্রিকা অকালেই বিনষ্ট হওয়ার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নিছক একটি বিজ্ঞান পত্রিকা হইয়াও এতদিন প্রাণবন্ত আছে—ইহাতে আমাদের গৌরব বোধ করিবার অধিকার আছে। প্রথম বর্ষের স্মৃতি আজো মনে জাগরূক আছে। প্রথম সংখ্যাটি হাতে পাইয়া বিস্ময়বোধ করিয়াছিলাম। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্র, তাহাও আবার বাংলা ভাষায়—ইহা সারা ভারতে সে যুগে একটি অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্বেও বাংলা ভাষায় দুই-একটি ঐরূপ পত্রিকা যে প্রকাশিত হয় নাই তাহা নহে, তবে তাহাদের আয়ু ছিল সীমিত। তাই আরম্ভেই অনেকের সন্দেহ ছিল, এই শিশুটি বাঁচিবে তো? সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটাইয়া শিশুটি শুধু বাঁচিয়া বড় হইয়া উঠে নাই, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রচারের মৌলিক দাবীকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে—তাহাকে বিশ্বাস ও সম্ভাব্যতার দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সাক্ষ্য থাকিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার যে আদর্শ অটুট রাখিয়াছে, আজ রজত জয়ন্তী বর্ষে তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। সেই আদর্শ হইল বিজ্ঞানের তথ্যগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপিত করা। ছাত্রেরা যাহাতে বিজ্ঞান-মনা হইতে পারে, বিজ্ঞানের হাতে-কলমে পরীক্ষায় আগ্রহান্বিত হয়, তাহার পটভূমি রচনা করা। সেই আদর্শ যে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' লেখকগণ বহু আয়াসে অজস্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করিয়া বাংলা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। হয়তো সেই সব পরিভাষা সর্বসম্মত হয় নাই, তবু আজ কোন পরিভাষা সঙ্কলকের পক্ষে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রবন্ধগুলি মূল আকর হইবে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের এমন কোন বিষয় নাই, যাহা এই পত্রিকায় আলোচিত হয় নাই। এই পত্রিকার মধ্য দিয়া বহু নবীন লেখক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তবু একটি প্রশ্ন আমাদের শঙ্কিত করে, তাহা হইল বিজ্ঞানের সহিত সমাজের সুস্থ সম্পর্ক কি এই দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে? গ্রামবাংলার যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানের স্পর্শ তাহাদের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহাদের কাছে বিজ্ঞানকে কি আমরা পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারি যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই বিষয়ে প্রচেষ্টা করিয়াছে মাত্র—পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ইহার কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সমাজ যে বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে চায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বিজ্ঞানী ও সমাজের মধ্যে যোগাযোগের ফাঁক (Communication gap) দুস্তর বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বাধার কারণ হইল—

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

(1) বিজ্ঞানীরা নিজেদের বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জনকেই গৌরবের বিষয় মনে করেন। শিল্পীরা যেমন তাঁহাদের শিল্পকলার চর্চার দ্বারা নিজেদের সহিত সমাজকেও আনন্দ দান করিয়া থাকেন—বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে তাহার অভাব দেখা যায়।

(2) শুধু আত্মনিমগ্ন বিজ্ঞান-চর্চার দ্বারা যে সমাজের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, বিজ্ঞানীদের এই ধারণা নির্ভুল নহে।

(3) বাস্তব জগৎ হইতে বিমুখ থাকিয়া বিজ্ঞানীরা সমাজের বহুমুখী সমস্যা (যাহা দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ) ছোট করিয়া দেখিয়া থাকেন।

(4) তাছাড়া আমাদের সমাজে বাংলা ভাষা বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যম হইবে কিনা, এই সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এখনও সন্দিগ্ধ।

এই শেষোক্ত কারণে সরকারী নীতি নির্ধারণও নিঃসন্দেহ নহে। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বৎসরেও মাতৃভাষা যে বিজ্ঞান-শিক্ষার বাহন হইবে, এই রকম বলিষ্ঠ মৌলিক নীতি সরকার গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার ফলে গ্রাম-বাংলার সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে নাই। 'ইংরেজী অথবা বাংলা' এই লইয়া দ্বিধার অন্ত নাই। স্কুল-কলেজ হইতে ইংরেজী শিক্ষার পাঠ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে—যে সামান্য ইংরেজী সাহিত্যের সিলেবাস এখনও বর্তমান, তাহাতে ইংরেজীতেও উপযুক্ত শিক্ষা হয় না। ফলে আমাদের বিজ্ঞানের শিক্ষা-ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইবে—এই মৌলিক নীতি যতদিন না সঠিকভাবে ও দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করা হয়, ততদিন বিজ্ঞান ও সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্ভব হইবে না।

বিজ্ঞান শুধু শিক্ষা বা প্রচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেই চলে না। সারা পৃথিবীতে সমাজের কল্যাণে বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর অবদান, তাহা অস্বীকার করিয়া কোন সভ্যতা বাঁচিতে পারে না। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাধারণতঃ শহরকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর বহু কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে—তাহা গ্রামবাংলার মানুষকে শহরমুখী করিয়াছে। কিন্তু গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে নাই। যে দেশে অধিকাংশ অধিবাসী গ্রামে থাকে—তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারণ দুরঅস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গবেষণাগার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই গ্রামবাংলার আত্মিক জগতে বিজ্ঞান বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই।

1972 খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের একটি আলোচনা-চক্রে অধ্যাপক পি. কে. বোস দেশের বেকার-সমস্যা সমাধানের একটি চিত্তাকর্ষক পরিকল্পনার আভাস দিয়াছিলেন। অধ্যাপক বোস একজন সংখ্যা-বিজ্ঞানী। পরিকল্পনা ক্ষেত্রে তাঁহার মতামত মূল্যবান সন্দেহ নাই। তাঁহার মতে, গ্রামবাংলায় বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান ও গ্রামের উন্নতিসাধনই বর্তমান সমস্যার অন্যতম সমাধান। ভূমিসংস্কার, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা, সেচ, পথ-ঘাট, বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি না করিতে পারিলে আমাদের সঠিক পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইবে না। শহরে অনবরত নূতন কর্মখালিতে গ্রামের লোক প্রলুব্ধ হইবে। ইহাতে গ্রাম যেমন হতশ্রী হইয়া পড়িবে, শহরেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিবে না। বিগত পঁচিশ বৎসরে আমাদের পরিকল্পনার এই ভুলই কুফলের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সব পরিকল্পনায় কি গ্রাম, কি শহর কেহই উপকৃত হয় নাই। বেকার-সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি গ্রাম পরিকল্পনায় 2000 কোটি টাকা বিনিয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ গৃহীত হইলে অতীতের কিছু ত্রুটি সংশোধিত হইবে সন্দেহ নাই। গত পঁচিশ বৎসরে গ্রাম

বাংলার বিজ্ঞানের প্রয়োগ অতি অল্পই হইয়াছে। গ্রামে যে সব বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে উপযুক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে।

বিজ্ঞান ও গ্রামবাংলার একমাত্র সংযোগ-সেতু প্রস্তুত করিয়াছে ট্র্যানজিস্টর রেডিও। রেডিও মারফৎ কৃষি বিষয়ক আলোচনা গ্রামবাংলার কৃষক সাধারণের কাছে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি-পদ্ধতির স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছে। ইহা সামান্য প্রচেষ্টা হইলেও যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, উন্নততর বীজ প্রভৃতির ব্যবহার কৃষকদের নিকট ক্রমশঃ আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতেছে। অতএব গত পঁচিশ বৎসরে গ্রাম-বাংলার উন্নয়নের প্রতি সরকারী প্রচেষ্টা আদৌ ছিল না—এই কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যে ভাবে কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন হইয়াছে, পশ্চিম বাংলায় তাহা হয় নাই। কৃষিবিপ্লব পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। সরকারী স্বীকৃতিতেই প্রকাশ, এই ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ বহু পশ্চাতে রহিয়াছে। বর্তমান পরিকল্পনায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ-শক্তি পৌঁছাইয়া দিতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাহা যত শীঘ্র সাফল্য লাভ করে, ততই মঙ্গল। গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সম্পূর্ণ হইলে শুধু কৃষির জন্য জলসেচ নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও গ্রাম বাংলার বেকার-সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

শহর ও গ্রাম যেন একটি গাড়ীর দুইটি চাকা। একটি চাকা অচল হইলে যেমন গাড়ী চলে না, তেমনি গ্রামগুলিকে অবহেলিত রাখিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিও সম্ভব নয়। তাই গ্রাম ও শহরের জীবনযাপনের ব্যাপারে সাম্য প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ, ক্ষুদ্র শিল্প পরিকল্পনা, কৃষিউন্নয়ন প্রভৃতির কথা আগেই বলিয়াছি। গ্রাম ও শহরের পণ্যদ্রব্যের বাজার আরও কাছাকাছি আনা প্রয়োজন। সেই জন্য রাস্তাঘাট একান্তই অপরিহার্য। রাজ্য সরকারের বিবৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, পশ্চিম বঙ্গে পাকা সড়কেরও অপ্রতুলতা রহিয়াছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে রাস্তাঘাটের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বর্তমান পরিকল্পনায় এই দিকটিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলিতে গেলে—চিত্রটি আরও ভয়াবহ মনে হইবে। গ্রামাঞ্চলে কোথায়ও দশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের মধ্যে একজন হাতুড়ে চিকিৎসকও পাইবার সম্ভাবনা নাই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিকল্পনাগুলি এত মন্থর গতিতে রূপায়িত হইতেছে যে, তাহা অবহেলারই সামিল। এরূপ দেখা যায় যে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য টেণ্ডার পর্যন্ত ডাকা হইয়াছে, কিন্তু এস্টিমেটের স্বল্পতার জন্য টেণ্ডার কেহ দেয় নাই। সরকারী বিভাগ স্বয়ং এই সব কাজ না করিলে সুদূর গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ কোন দিন আসিবে না। যে সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টায় সারা ভারতে মৃত্যুর হার 1921 খৃষ্টাব্দে 35·0% হইতে কমিয়া 1971 খৃষ্টাব্দে 14% হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। জন্মের হারও প্রায় 10% কমিয়াছে। তবু ভারতের জনসংখ্যা এখন সারা পৃথিবীর প্রায় 14%। গ্রামাঞ্চলেও এই জনস্ফীতি বিপুল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল ভূমিসংস্কারের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। গ্রামের অর্থনীতিকে কৃষি হইতে অন্যত্র সরাইতে হইবে। আবার গ্রামবাসীদের শহরমুখী করা হইলে সমস্যা আরও বাড়িবে। তাই গ্রামাঞ্চলেই উপযুক্ত শিল্পব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে গ্রামাঞ্চলের বেকার মানুষ সকলেই কৃষিনির্ভর না হইয়া রুজিরোজগারের বিকল্প পথ পাইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য

নহে, তাহা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে। দেশ যতই সমৃদ্ধ হয়, বিজ্ঞান ও সমাজের ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়িয়া ওঠে। গ্রামবাংলার কোটি কোটি জনসাধারণকে অবনত রাখিয়া বিজ্ঞান-প্রচার বাতুলতা মাত্র। বিজ্ঞান-প্রচার সেই সমাজেই সম্ভব—যে সমাজে মানুষ বিজ্ঞানের প্রযুক্তিতে উন্নততর জীবনযাপনের আস্বাদ পাইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর বিগত পঁচিশ বৎসরে সারা ভারতে উন্নয়ন প্রকল্পের অধিকাংশই শহরের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এখন প্রয়োজন হইয়াছে গ্রামবাংলার জন্য উন্নয়ন প্রকল্প। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারীর সমাধান প্রভৃতি গ্রাম-বাংলার আশু সমস্যাগুলির নিরসন করিতে পারিলে বিজ্ঞান ও সমাজের মধ্যে হৃদ্যতা গড়িয়া উঠিবে। সেদিন বিজ্ঞানের বাণী সাধারণ মানুষের মর্মস্থলে নূতন স্পন্দন আনিয়া দিবে।

বিজ্ঞানের সেই বাণীর ভাষা মাতৃভাষায় হওয়া প্রয়োজন, এই কথা আগেই বলিয়াছি। যে ভাষায় সাহিত্য, কাব্য, নাটক বাঙালীর প্রাণে সাড়া জাগায়, যে ভাষার সঙ্গীত গ্রামবাংলার মাঠঘাট পুলকিত করে, সেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে হইবে। এই দেশে বহু বিজ্ঞানীর মধ্যে এই ধারণাই প্রবল যে, বাংলা ভাষায় উচ্চতম বিজ্ঞান-গবেষণার ফলাফল প্রকাশ দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব। চিকিৎসাবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজীর বিকল্প বাংলা বই লিখন সম্ভব নহে। দুরূহ হইতে পারে, কিন্তু অসম্ভব বলিতে পারি না। জাপানী ভাষা ও লিপি যথেষ্ট জটিল। সেই ভাষায় যখন দুরূহতম বিজ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করা যায়, তখন বাংলায় বাধা কোথায়? জাপান বরং উন্নত দেশ, কিন্তু চীনের মত উন্নতিকামী দেশও চীনা ভাষায় বিজ্ঞান পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছে। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান—এই স্লোগানটি আজ আর কোন সঙ্কীর্ণতাবাদের বুলি নহে। গ্রামপ্রধান দেশে বিজ্ঞানীদের সহিত মানুষের যোগসাধন করিতে হইলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার দুরূহ পথটিই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে হয়তো যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইবে। গত পঁচিশ বৎসরে যে দোলায়মান নীতির দ্বারা মাতৃভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবহেলিত হইয়াছে—তাহার কুফল হইতে অন্ততঃ ভবিষ্যৎ সন্তানেরা রক্ষা পাইবে, এই কথা বিবেচনা করিলে সময়ের প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দিবে না। অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগর ক্ষেত্রে ইংরেজী থাকিলে ক্ষতি নাই।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা সফল হইলে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত হইতে পারিবেন এবং সেই সম্পর্কে মতামতও গড়িয়া উঠিবে। তখন দেশে প্রয়োজন-মাফিক (Need oriented) গবেষণা-প্রকল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। তাহার ফল দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করিবে। সম্প্রতি ইতিহাসের অধ্যাপক এসপসিটো (Esposito) চীনের বিজ্ঞান-চর্চা (Science & Public Affairs, Jan, 1972, p 37) নামক প্রবন্ধে একটি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। কাহিনীটি এই—চীনের একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে উৎপাদিত বাঁধাকপি কেন রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইনস্টিটিউট অব বোটানির বিজ্ঞানীদের কাছে কয়েকজন চাষী আবেদন পাঠান। ইনস্টিটিউটের কতিপয় সদস্য মনে করেন যে, গবেষণা-বিজ্ঞানীদের পক্ষে এই বিষয়টি তুচ্ছ—ইহাতে কালক্ষেপ করা উচিত হইবে না। কিন্তু পরে তাঁহাদের বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, এইরূপ মত ভ্রান্ত এবং বাঁধাকপির রোগের কারণ অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে গবেষণার উপযুক্ত বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই প্রবন্ধে অবশ্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ব্যাহত করিয়া চীনে এই রকম প্রয়োজন-মাফিক গবেষণার গুরুত্ব দিবার প্রবণতা দেখা

গিয়াছিল কিছুদিন। কিন্তু প্রয়োজনমাফিক গবেষণা-প্রকল্প ও মৌলিক গবেষণা-প্রকল্প পাশাপাশি থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিতে পারে না। চীন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও প্রয়োজনমাফিক গবেষণার তাগিদ বর্তমান যুগে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য উন্নত দেশগুলি তাহাদের নিজেদের জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইয়া বহির্দেশের বাজার দখল করিবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ করিয়া চলিয়াছে।

এই দেশে প্রাথমিক প্রয়োজন, দেশের উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা। সেই প্রচেষ্টা যে এই দেশে বিজ্ঞানীরা করিয়াছেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। গত পঁচিশ বৎসরে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা দেশের শিল্প উৎপাদনে বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিপুল প্রচেষ্টার খুব কম অংশই গ্রামের জনগণের উন্নতি-সাধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। কৃষি উৎপাদনে 'সবুজ বিপ্লব' সুরু হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু কৃষি-ব্যবস্থার গভীর ও অগভীর নলকূপ প্রসঙ্গে কোন অঞ্চলে ভূ-নিম্নে জলের পরিমাণ সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেচ-ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয় নাই। ফলে ভবিষ্যতে কোন অঞ্চল যদি জলহীন হইয়া পড়ে, তাহা নির্ধারণ করিবার অবকাশ নাই। আমাদের বিজ্ঞানীদের এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাহাছাড়া পশু ও গো-পালন, হাঁস-মুরগী পালন প্রভৃতি গ্রামভিত্তিক জীবিকার সম্প্রসারণেও বিজ্ঞানীদের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। কীটনাশক ঔষধের যে যথেচ্ছ প্রয়োগ চলিতেছে, তাহাতে জলাশয় কতটুকু দূষিত হইতে পারে বা মৎস্য চাষে কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা হয় নাই। গ্রামবাংলার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সরকার ও বিজ্ঞানীদের সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্তমান বিভিন্ন দেশে 'সৌর শক্তি'র ব্যবহারিক প্রয়োগ একটি মৌলিক গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। শহরাঞ্চলে বৃহদাকার নিউক্লিয় চুল্লী (Nuclear reactor) শক্তির উৎস হইলেও গ্রামাঞ্চলে সৌর তাপজনিত শক্তিই ব্যবহারযোগ্য হইতে পারে। এই দেশে তাই সৌর শক্তি সম্পর্কে গবেষণা গ্রামীণ জনসাধারণের কল্যাণকর হওয়া সম্ভব। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির প্রয়োজনে আরও বহু সমস্যা সমাধানের অপেক্ষা রাখে। কার্যতঃ সরকারকে এই সব বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে।

এইরূপ গ্রামকেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত বিজ্ঞানীদের উদ্যোগও যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। চিন্তায় ও কাজে গ্রাম উন্নয়নের সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দিতে পারিলে বিজ্ঞানীরা সারা দেশের বিজ্ঞান-ক্ষেত্রটিকে সম্প্রসারিত করিতে পারিবেন। বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র আজ যতটা সঙ্কুচিত মনে হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা থাকিবে না। এই কারণে মৌল বিজ্ঞানের কাজ হয়তো আপাততঃ কিছুটা ব্যাহত হইবে—কিন্তু ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সেই সামান্য অসুবিধা মানিয়া লইতে হইবে। কোন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেই ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিজ্ঞানী ও সমাজের মধ্যে যোগাযোগের ফাঁক (Communication gap) সাধ্যমত হ্রাস করিতে পারিলে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারিবে।

দারচিনির কথা

বলাইচাঁদ কুণ্ডু

ভারতীয় নানাবিধ মুখরোচক রান্নাতে গরম-মশলার আবশ্যকতা খুব বেশী। আর সেই গরম-মশলার প্রধান উপকরণ দারচিনি। তরকারী, ঝোল প্রভৃতি সুগন্ধি ও সুস্বাদু করবার জন্যে দারচিনি সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। এজন্যে বিভিন্ন প্রকার মশলাজাতীয় দ্রব্যাদির মধ্যে দারচিনির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দারচিনি নাম কোথা থেকে চালু হয়েছে, তা ঠিক জানা যায় না। খৃঃ পূর্ব 2700 সাল থেকে চীনারা এক রকম মূল্যবান সুগন্ধি ছালের কথা জানতো, সেটা খুব সম্ভব দারচিনি। ভারতবর্ষের নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থে চীনদেশ থেকে আনীত এই গাছের ছালের বিবরণ ত্বচ বা গুড়ত্বচ, (মিষ্ট-ত্বক্) নামে বিবৃত আছে। Gracia de Orta নামে এক পর্তুগীজ লেখক 1563 সালে মালাবার ও সিংহলের দারচিনি শিল্প সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিখেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, বহুদিন থেকে চীনা বণিকেরা তাদের পণ্যদ্রব্যের বদলে সিংহল ও মালাবার থেকে এই সুগন্ধি ছাল খুব কম মূল্যে কিনে নিয়ে পারশ্য ও আরবের সমুদ্র বন্দরসমূহে নিয়ে যেত। এই সুগন্ধি ছাল যে চীন দেশেও পাওয়া যায়—এই কথা Gracia de Orta কোথাও উল্লেখ করেন নি।

মালাবারে দারচিনিকে 'কালফা' বলা হতো। আরব বণিকগণ 'কালফা' শব্দকে বিকৃত করে—কিরফা (Qirfa) করেছিল। আরবীয় ও পারসিক ভাষায় 'কিরফা' মানে Cinnamon বা দারচিনি। আরব ও পারসিক বণিকগণ দারচিনির বিবরণ দিতে বলতো—'কিরফাদ-উদ্-দারসিনি'; পারসিক ভাষায় 'দার' (dar) শব্দের অর্থ বৃক্ষ বা কাষ্ঠ—অর্থাৎ যে ছাল বা বস্তুকে Cinnamon বা দারচিনি বলা হয়—তা চীনদেশে জাত বৃক্ষ বা কাষ্ঠ ('দারচিনি') থেকে প্রাপ্ত 'কারফা'। সংক্ষেপে একে শুধু 'দারসিনি'ও বলা হতো। এই 'দারসিনি' থেকে দারচিনি, ডালচিনি বা দালচিনি—এই সব প্রচলিত শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পরে একে সংস্কৃত ভাবাপন্ন করবার জন্যে 'দারুচিনি' (দারু=কাষ্ঠ) শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে।

দারচিনি সিনামোমাম জেলানিকাম (Cinnamomum zeylanicum) নামক এক রকম গাছের ছাল থেকে পাওয়া যায়। সিংহল দেশের জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল এবং ব্রহ্মদেশের জঙ্গলেও এদের কিছু পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। ত্রিশিরাযুক্ত ঘন সবুজ পত্রময় চিরসবুজ গাছগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের নগরসন্নিহিত প্রমোদ কাননসমূহে শোভাবর্ধক বৃক্ষ হিসাবে এই গাছ অনেক রোপিত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার মশলার জন্যে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের আরো অনেকগুলি দেশ বিখ্যাত। প্রায় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খৃষ্টাব্দ থেকে ইউরোপের অনেক দেশ থেকে মশলার সন্ধানে বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ ওলন্দাজ ও ডাচ, পরে ইংরেজ জাতি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিয়েছিল।

সিংহল দ্বীপের জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন দারচিনি গাছের ছাল থেকে দারচিনি প্রচুর পাওয়া যেত। দশম থেকে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন দেশীয় বণিকেরা তাদের পণ্যদ্রব্যের বদলে

সিংহল থেকে দারচিনি নিয়ে যেত। তারপর চতুর্দশ-পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে মুর নামক একদল মুসলমান বণিক সিংহল থেকে দারচিনি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে প্রভূত অর্থশালী হয়েছিল। তৎকালে ওলন্দাজেরাও খুবই ক্ষমতাশালী ছিল এবং ভারত মহাসমুদ্রের এদিক-ওদিকে তাদের অনেক জাহাজ রাখতো। এরা এই সব মুসলমান বণিকদের মসলা বোঝাই জাহাজ প্রায়ই লুটপাট করতো। ইউরোপের বাজারে দারচিনির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় ক্রমে দারচিনির প্রতি তাদের লোভ খুব বেড়ে যায়। 1501 খৃষ্টাব্দে ডম লুরেন্সো নামক একজন ওলন্দাজ বণিক সিংহলের এক রাজার সঙ্গে মসলা, বিশেষতঃ দারচিনি সম্বন্ধে এক বাণিজ্যিক চুক্তি করে। যদিও এই প্রথম চুক্তি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি, তথাপি পরে অন্যান্য ওলন্দাজ বণিকেরা এসে এখানে নানাবিধ বাণিজ্য চুক্তি করে ও সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করে। ওলন্দাজেরা দারচিনির ব্যবসায় ভালভাবে করবার চেষ্টা করেছিল। সিংহলের নিম্নশ্রেণীর একদল লোককে তারা ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতো ও তাদের দিয়ে বন থেকে নিয়মিতভাবে গাছের ডাল সংগ্রহ করে ছাল ছাড়িয়ে দারচিনি তৈরি করবার ব্যবস্থা করতো। 1536 সাল থেকে তারা নিয়মিতভাবে পাশ্চাত্য দেশসমূহে দারচিনি রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো।

ওলন্দাজদের পরে ডাচরা বাণিজ্যিক সূত্রে এসে সিংহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিষ্ঠুর অত্যাচারী ওলন্দাজদের অধীনে সিংহলীরা অস্থির হয়ে উঠেছিল। সহানুভূতিশীল ডাচরা সিংহলীয়দের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করতো। তারাও ফলাও করে দারচিনির ব্যবসায় সুরু করে। বন্য গাছগুলি থেকে প্রাপ্ত দারচিনির সরবরাহ ক্রমে ক্রমে কমে আসায় ডাচরা সর্বপ্রথম 1767 সালে দারচিনি গাছের চাষ প্রবর্তন করে ও দারচিনির ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে তাদের আয়ত্তে আসে। তখনকার দিনে Amsterdam দারচিনি ব্যবসায়ের আন্তর্জাতিক বাজার ছিল। তারপর ইংরেজেরা সিংহল অধিকার করবার পর দারচিনির ব্যবসায় পুরাপুরি ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং দারচিনির আন্তর্জাতিক বাজার Amsterdam থেকে London-এ আসে। বস্তুতঃ দারচিনি ও তার বাণিজ্য সিংহলের জাতীয় জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের কারণ হয়েছিল।

ভারতবর্ষে দারচিনি গাছ পাওয়া গেলেও এর বাণিজ্য বিদেশে বিস্তৃত হয় নি। ভারতে উৎপন্ন বেশীর ভাগ দারচিনি বন্য গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তা প্রায়ই নিম্নমানের। ইদানীং দক্ষিণ ভারতে দারচিনির চাষ হচ্ছে, তবে পরিমাণে অল্প। এই দারচিনিও সিংহলে উৎপন্ন দারচিনির মত উন্নত মানের হয় না। সিংহল এখনও সারা পৃথিবীতে দারচিনি সরবরাহ করছে।

দারচিনি গাছ (Cinnamomum zeylanicum) Lauraccae পরিবারভুক্ত। Cinnamomum জাতিতে প্রায় 250 প্রকার প্রজাতি আছে। তাদের মধ্যে একমাত্র Cinnamomum zeylanicum থেকেই আসল দারচিনি পাওয়া যায়। অবশ্য অন্য দু-এক প্রকার প্রজাতির গাছের ছাল থেকেও দারচিনি পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব দারচিনি আসল দারচিনির মত উন্নত শ্রেণীর নয়। তাছাড়া আরও অনেক প্রজাতির গাছের ছাল অনেকটা দারচিনির মত দেখতে হলেও তেমন সুগন্ধি হয় না। এই সব ছাল আসল দারচিনির সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। তেজপাতা Cinnamomum জাতির এক প্রজাতি। এর নাম C. tamala। কর্পূর গাছও (Cinnamomum camphora) এই জাতির অন্তর্গত।

দারচিনি গাছ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাধারণতঃ 8 থেকে 10 মিটার দীর্ঘ হয়, তবে সিংহলের

জঙ্গলে 20 থেকে 22 মিটার দীর্ঘ গাছ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। গাছের পাতাগুলি ত্রিশিরা-যুক্ত, লম্বাকৃতি, 10-18 সেণ্টিমিটার লম্বা ও 2·5 থেকে 5 সেণ্টিমিটার চওড়া হয়। পাতাগুলি চামড়ার মত মোটা; পুষ্ট পাতার উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজ। কাণ্ডের প্রতিটি পর্বে দুটি করে পাতা পরস্পর বিপরীত দিকে সংযুক্ত থাকে (1নং চিত্র)। পাতা পিষ্ট করলে মসলার মত সুগন্ধ পাওয়া যায়। ফুল সাধারণতঃ ছোট ও ছড়ানো গুচ্ছে সজ্জিত থাকে। ফুলের গন্ধ ভাল নয়। ফল কালচে লাল, ডিম্বাকৃতি, বেরীজাতীয়, 1 থেকে 2·5 সেণ্টিমিটার লম্বা হয় এবং ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ফোটে ও মে-অগাষ্ট মাসে ফল পাকে।

পল্লব ও কাণ্ডের ছাল মসৃণ ও ফ্যাকাশে রঙের। পরিণত শাখার ছাল—বাদামী রঙের ও খস্‌খসে। ছালের আকৃতি ও গুণানুসারে সিংহলে দারচিনির গাছকে পাঁচটি শাখাতে (Race) বিভক্ত করা হয়। দক্ষিণ ভারতেও পাতার গুণানুসারে (যথা: মিষ্ট স্বাদবিশিষ্ট পাতা, স্বাদহীন পাতা, ঝাল পাতা ও তিক্ত পাতা) চারটি শাখায় ভাগ করা হয়।

1নং চিত্র—দারচিনি গাছের পত্র ও পুষ্পবিন্যাসসহ ছোট শাখা।

দারচিনির চাষ—পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বহু বছর ধরে সিংহলে বন্য গাছ থেকে দারচিনি আহরণ করা হয়ে আসছে, কিন্তু তাথেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো যাচ্ছে না। এজন্যে দারচিনির চাষ বিশেষভাবে করা হচ্ছে। সিংহল ছাড়া, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও দারচিনির চাষের প্রবর্তন হয়েছে। এখন প্রায় চাষ-করা গাছ থেকেই প্রধানতঃ দারচিনি উৎপন্ন হচ্ছে। সিংহলে সমুদ্র থেকে 300-500 মিটার উঁচু সাধারণতঃ সাদা বালুকাময় জমিতে দারচিনি গাছের চাষ হয়। যে সব জায়গায় 2000-2500 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় ও 80-85 ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকে, সেই

সব জায়গাতেই এই গাছের চাষ ভাল হয়। অবশ্য দারচিনি গাছ বিভিন্ন ধরণের গ্রীষ্মকালীন পরিবেশ ও বিভিন্ন প্রকার মাটিতেও—যেমন, ল্যাটেরাইট মাটি বা শক্ত মাটিতে জন্মাতে পারে; কিন্তু তাতে গাছের ছালের গুণের পার্থক্য বটে

সাধারণতঃ বীজ থেকে গাছ তৈরি করা হয়। ভাল জাতের গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা আবশ্যক। পাকা ফলগুলি ছায়াতে গাদা করে রাখা হয়, তাতে ফলের শাঁসের অংশ কালো হয়ে পচতে থাকে। তখন মাড়াই করে ধুয়ে বীজ আলাদা করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। গুলি 8 থেকে 12 মাসের মধ্যে মাঠে লাগাবার উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ বর্ষার আগে বা বর্ষার সময় এগুলি তুলে বসানো হয়।

সরাসরি মাঠে বসালে বীজগুলি বর্ষাকালে 230 সেন্টিমিটার অন্তর অন্তর বসানো হয়। এক একর জমিতে সাধারণতঃ প্রায় 3500 গর্ত করে ছায়াতে শুষ্ক বীজগুলি তাড়াতাড়ি লাগাতে হয়।

চাষের জমিতে গোবর ও আগাছা পচানো সারের ব্যবস্থা করতে হয়। ভাল ফলন পেতে হলে নিম্নোক্তভাবে সারের ব্যবস্থা করতে হয়—অ্যামোনিয়াম সালফেট, নাইট্রেট 1 ভাগ, রক
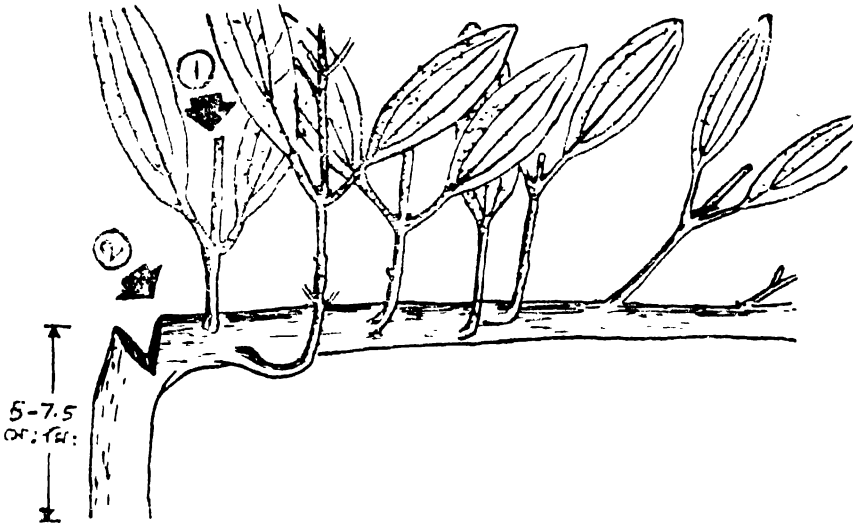
2নং চিত্র—অনেক নূতন কাণ্ড উৎপন্ন করবার জন্যে (1) দু-বছরের চারাগাছ বাঁকিয়ে, (2) ছুরি দিয়ে কাটবার সিংহলী পদ্ধতি।

বীজতলায় বীজ থেকে গাছ তৈরি করে পরে উপযুক্ত জায়গায় রোপণ করা যেতে পারে। বীজতলায় উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা করা দরকার ও অনাবৃষ্টির সময় জলসেচ আবশ্যক। বীজতলায় বসালে প্রায় 20-22 সেন্টিমিটার পর পর বীজগুলি সারিতে লাগাতে হয়। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়। চারা গাছ- ফস্‌ফেট 2 ভাগ ও পটাশ মিউরেট 1 ভাগ একত্রে মিশিয়ে একর প্রতি 50 কিলোগ্রাম বছরে দু-বার প্রয়োগ করতে হয়।

গাছ লাগাবার 2 বা তিন বছর পরে গাছগুলিকে নানাভাবে ছেঁটে দিতে হয়, যাতে প্রত্যেক গাছ থেকে অনেকগুলি শাখা বের হতে পারে। একটি চারাগাছ থেকে অনেকগুলি গাছ পাবার

জন্তে সিংহলীরা এক রকম উপায় গ্রহণ করে থাকেন। মাটির উপর 5 থেকে 7·5 সেন্টিমিটার উপরে গাছটি 2নং চিত্রের মত কেটে মাটিতে নুইয়ে মাটি চাপা দিতে হয়। এই অবস্থায় রাখলে যে সব নূতন কাণ্ড বের হবে, সেগুলিকে গাছ হিসাবে পরে যত্ন করে বড় করা হয়।

ছেঁটে দেবার পর শাখাগুলির দু-বছরের মত বয়স হলে তাদের বল্কল স্তর গঠিত হয়। ছালের রং বাদামী রঙের হলে শাখাগুলি কাটবার উপযুক্ত হয়। শাখা কাটবার দু-তিন মাস আগে ছোট ছোট ডালগুলি ছেঁটে দিতে হয়। এই সময় এই শাখাগুলি 2 থেকে 3 মিটার লম্বা ও 1 থেকে 5 সেন্টিমিটার প্রস্থে হয়। বর্ষার সময় বা বর্ষার আগে ঐগুলি কাটা হয়।

ডাল ফেলে দিয়ে শক্ত এক টুকরা কাঠি দিয়ে শাখাগুলি ঘষতে হয়, যাতে ছালগুলি আলগা হয়ে যায়। পর্বগুলির ছাল আলগা হয় না; সেগুলি ছুরি দিয়ে গোল করে কেটে দিতে হয়। তারপর ডালগুলি লম্বালম্বিভাবে ছুরি দিয়ে চিরে দিতে হয়। তখন ভিতরের কাঠের অংশ থেকে ছালগুলি খুলে আসে। সাধারণতঃ ছাল ছাড়াবার সময় পিতল বা তামার ছুরি ব্যবহৃত হয়। ষ্টীলের ছুরি ব্যবহার করলে ট্যানিনের সঙ্গে লোহা মিশে ছালের রং খারাপ হয়ে যায়।

লম্বা লম্বা ছালগুলি বাণ্ডিল বেঁধে নারকেল ছোব্‌ড়া জড়িয়ে 24 ঘণ্টা ফেলে রাখতে হয়। ফলে গেঁজে উঠে ছালের বাইরের দিকের স্তর আল্‌গা হয়ে যায়। তারপর বাঁকানো তামা বা
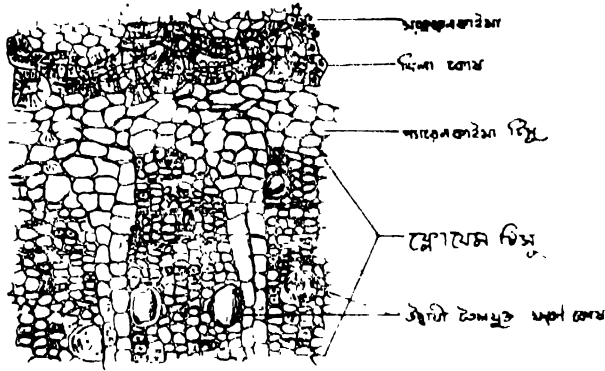
3নং চিত্র—দারচিনির ছালের প্রস্থচ্ছেদ। কাণ্ডের কাষ্ঠাংশ (Xylem), ছালের উপর বহিস্ত্বক (Epidermis) ও সবুজ কণাযুক্ত অধস্ত্বক দেখানো হয় নি। ফ্লোয়েমের অন্তর্বর্তী স্থানে মজ্জারশ্মি (Medullary ray) দেখা যাচ্ছে।

অনুপযুক্ত ডালগুলি কাটা হয় না, পরে কাটবার জন্তে রেখে দেওয়া হয়। 8 মাস অন্তর ডাল কাটা সম্ভব। ডালগুলি সব সময় বাঁকাভাবে V-এর আকারে কাটা হয়। এর ফলে কাটা জায়গার পাশ থেকে নতুন শাখা গজাতে থাকে।

কাটা শাখা থেকে পাতা ও ছোট ছোট

পিতলের ছুরি দিয়ে ছালের বহিস্ত্বক (Epidermis) ও সবুজ কণাযুক্ত বহিস্তর (Cortex) চেঁচে ফেলা হয়। বাকী অংশ যা থাকে, তা প্রধানতঃ শিলাকোষ (Stone cell) ও কিছু স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma) ও প্যারেনকাইমা এবং গাছের ফ্লোয়েমের (Phloem) অংশ। এই ফ্লোয়েমে

উদ্বায়ী তৈলযুক্ত অধিক ক্ষরণকোষ (Secretory cell) থাকে (3নং চিত্র)। এই উদ্বায়ী তৈল থাকায় দারচিনির সুগন্ধ হয় ও তৈলের কম-বেশীর উপর খানিকটা দারচিনির গুণ নির্ভর করে।

ছালগুলি ছাড়াবার পর ক্রমশঃ শুকিয়ে কিছুটা ছোট হয়ে আসে ও পরে দারচিনির আকার ধারণ করে। নরম থাকবার সময় ওগুলিকে হাতে করে পাকিয়ে গোল করে দিয়ে চাটাই বা মাদুর
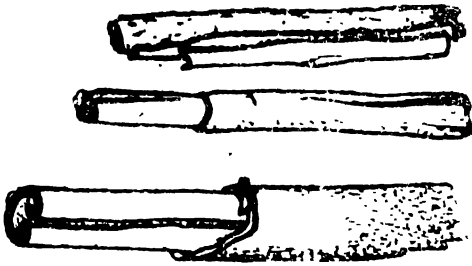
4নং চিত্র
নলাকৃতি দারচিনি—একটি নলের মধ্যে আর একটি নল ঢোকানো হয়েছে।

পেতে ছায়াতে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হয়। এক-একটি ছালের অংশ শুকিয়ে নলের মত হয়। নলের মত পাকানো একটি দারচিনির মধ্যে আর একটি দারচিনি ঢুকিয়ে দিয়ে (4নং চিত্র) এক মিটারের মত লম্বা কাঠি তৈরি করা হয়। এটি করা হয় কাজের সুবিধার জন্যে। শুকাতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে এবং এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে করে সামান্য চাপ দিয়ে নিয়মিত পাকিয়ে দিতে হয়। তা না করলে দারচিনির কাঠিগুলি ফুলে ওঠে ও ফেটে যায়। ঠিকমত শুকিয়ে গেলে দারচিনি তৈরি হলো। তখন সেগুলি গুণানুসারে তিন-চার ভাগে ভাগ করে বাজারে পাঠানো হয়। অনেক সময় গন্ধকের ধোঁয়া দিয়ে এগুলিকে কিছুটা সাদা করে নেওয়া হয়। বাজারে পাঠাবার সময় কাঠিগুলি দিয়ে প্রায় 15 কিলো ওজনের আঁটি বাঁধা হয়।

বড় গাছের ছাল থেকেও দারচিনি তৈরি হয়। তাদের ছাল মোটা হওয়ায় সেগুলি নলের মত করা যায় না। সেগুলি বাজারে 'চিপ্স' নামে চলে এবং তার দরও অনেক কম।

গাছ লাগাবার 3-4 বছর পরে একর প্রতি 25 থেকে 30 কিলোগ্রাম ভাল দারচিনি পাওয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং 10 বছরের মত গাছ থেকে 75-100 কিলোগ্র্যাম দারচিনি পাওয়া যায়।

রান্নার ব্যাপারে ব্যাপক ব্যবহার ছাড়া দারচিনি ওষুধ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এটি কষায় (Astringent) সন্দীপক, ক্ষুধাবর্ধক এবং বিবমিষা ও বমন বন্ধ করে। দারচিনির গুঁড়া চকোলেট, লজেন্স, দাঁতের মাজন, সাবান, গন্ধদ্রব্য ও ধূনা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

দারচিনির ছালে 0·5-1% উদ্বায়ী তেল থাকে। পাতা থেকেও অপেক্ষাকৃত কম দামের উদ্বায়ী তেল (1%) পাওয়া যায়। দারচিনি গাছের শিকড় থেকে প্রায় 3%-এর মত তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল দারচিনি তৈল বা পাতার তৈল থেকে আলাদা। বীজ থেকে প্রায় 33% অনুদ্বায়ী (Fixed) তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল নানাবিধ কাজে, বিশেষতঃ বাতি তৈরির কাজে লাগে।

আলোকশক্তি উৎপাদনের ইতিবৃত্ত

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আদি যুগে মানুষ যখন পাথরের সঙ্গে পাথর ঠুকে কিংবা কাঠের সঙ্গে কাঠ ঘষে প্রথম আগুন জ্বালাবার প্রণালী আবিষ্কার করলো, সেদিন থেকে সুরু হলো মানব-সভ্যতার অভ্যুদয়। এতে বন্য পশুর আক্রমণ এবং শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হলো গুহাবাসী বর্বর মানুষের। শুষ্ক গাছপালার সরু ডাল ও পাতা জ্বালিয়ে শীতের রাত্রে তারা তাদের বাসস্থান, গুহা-গহ্বর গরম করতে শিখলো, আগুনের ভয়ে হিংস্র জন্তু গেল দূরে পালিয়ে। প্রায় বারো হাজার বছর পূর্বে সরু শুষ্ক কাঠ, বাঁশের কঞ্চি বা প্যাঁকাটির মাথায় আগুন দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে আলোক উৎপাদনের প্রথা পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলন ছিল।

উদ্ভিজ্জ তৈলের বাতি

পরবর্তী কালে আলোক উৎপাদনের জন্যে নানাবিধ উদ্ভিজ্জ তৈলের ব্যবহার হলো তুলা ও অন্যবিধ তন্তুর সল্‌তের সাহায্যে। পাথর ও পোড়ামাটির প্রদীপ ছিল তৈলাধার। ফরাসী দেশের লা মুঁসিয়েরে প্রায় দশ হাজার বছর আগে (8000 B. C.) পাথরের প্রদীপের এবং মেসোপটেমিয়ায় পোড়ামাটির প্রদীপের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। জলপাই এবং বাদামের তৈলের ব্যবহার হতো এসব প্রদীপে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে (2700 B. C.) মিশর এবং পারস্য দেশে তামা এবং কাঁসার প্রদীপ ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক চীন ও ভারতবর্ষে এই জাতীয় প্রদীপের ব্যবহার ছিল। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীতে এই প্রকার তৈলের প্রদীপের ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত হয়ে ওঠে গৃহকর্মের প্রয়োজনে। রোমক সভ্যতার প্রারম্ভে পোড়া-মাটি ও পোড়ামাটির উপর স্বচ্ছ কাচের আবরণ-দেওয়া বহুমুখী প্রদীপের ব্যবহার সুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে কাঁসা ও লোহার বিচিত্র গঠনের প্রদীপের ব্যবহার প্রচলিত হয়। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমে পশুশৃঙ্গে নির্মিত চুঙ্গীরূপী ল্যাম্পের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব ল্যাম্পের চুঙ্গীর ঊর্ধ্বভাগের ঢাক্‌নায় বায়ু চলাচলের জন্যে বহু ছিদ্র করা হতো। এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ তৈলের ল্যাম্প সমসাময়িক ইহুদী ও গ্রীক জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। আফ্রিকায় আদিম-নিবাসীদের মধ্যে মাটির পাত্রে তৈলগর্ভ বাদাম জ্বালাবার ব্যবহার ছিল।

খনিজ তৈলের বাতি

বৃদ্ধ প্লিনির লেখায় পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দে আড্রেয়াতিক সাগরের তীরবর্তী প্রদেশে খনিজ তৈলের ল্যাম্পের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। 14-17শ শতাব্দীতে এসব খনিজ তৈলের ল্যাম্প নির্মাণের বহু উন্নতি হয় গৃহকর্মে ব্যবহারের উপযোগী করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পেট্রোলিয়াম বা অন্যান্য খনিজ তৈলের আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার ফলে 180°C থেকে 320°C-এর মধ্যে সংগৃহীত কেরোসিন নামক তৈলাংশ প্রচুর পরিমাণে প্রথম উৎপন্ন হয়। বৈদ্যুতিক বাতির আবির্ভাবের পূর্বে ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট আলোকিত করবার জন্যে এই কেরোসিন তৈলেরই বহুল প্রচলন ছিল। কেরোসিন তৈল হচ্ছে বহুবিধ হাইড্রো-

কার্বনের মিশ্রণ, যথা—n-ওডিকেন ($C_{12}H_{26}$), অ্যালকিল বেনজিন ($R\text{-}C_6H_5$) ন্যাপথালিন এবং ন্যাপথালিনসঞ্জাত পদার্থ ইত্যাদি।

মোমবাতি

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মোমবাতির ব্যবহার সুরু হয়। মোমবাতি প্রস্তুত করা হচ্ছে সম্ভবতঃ মানব-সভ্যতার একটি প্রাচীনতম শিল্প। নানাবিধ তৈলগর্ভ বাদাম পরস্পর সংলগ্ন করে গাছের সরু ডগার মত বাতি তৈরি করা হতো, মোমবাতির মত বেশীক্ষণব্যাপী আলোক পাবার উদ্দেশ্যে। গ্রীস এবং রোমে পাটের দড়িতে পীচ অথবা মোম জড়িয়ে বাতি ব্যবহারের প্রচলন ছিল খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। কিন্তু ফিনিশিয়ানরাই মোমের বাতির ব্যবহার প্রথম প্রচলন করে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে—এরূপ কিংবদন্তী আছে। 16-18শ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মোমের বাতিই ছিল সাধারণ বাড়ীঘর আলোকিত করবার একমাত্র প্রধান উপায়। খৃষ্টীয় সভ্যতার ইতিহাসে উপাসনাগৃহে বা ধর্মসংক্রান্ত উৎসবাদিতে সাধারণতঃ মোম (Wax) থেকে নির্মিত বাতির ব্যবহার একপ্রকার বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। জলাজমিতে জাত রাস (Rush) জাতীয় চারাগাছের মজ্জা চর্বিতে ডুবিয়ে নিয়ে মোমবাতি হিসাবে প্রথম ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী কালে কাঠের কাঠি চর্বি বা মৌমাছির মোমে ডুবিয়ে ঐরূপ বাতি তৈরি হতো। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিমিমাছের চর্বি (Spermaceti) এই জাতীয় বাতি তৈরির কাজে প্রচলিত হয়। এই জাতীয় বাতির শিখা অপেক্ষাকৃত স্থির এবং স্বচ্ছ। এই কারণে তা কৃত্রিম আলোকশক্তির মান এবং একক হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী ছিল। এক মোমবাতির আলোকশক্তির পরিমাণ হচ্ছে $\frac{1}{6}$ পাউণ্ড ওজনের এমন একটি বিশুদ্ধ স্পার্মাসেটি বাতির শিখার আলো, যা ঘণ্টায় 120 গ্র্যাম হিসাবে জ্বলতে থাকে। খৃষ্টীয় 1823 অব্দে গরু, ভেড়া প্রভৃতি পশুর চর্বি থেকে উৎপন্ন স্টিয়ারিন (Stearin) এবং 1850 অব্দে খনিজ তৈল থেকে পাতন প্রক্রিয়ায় সঞ্জাত প্যারাফিনের (Paraffin) মোমবাতির প্রচলন সুরু হয়।

গ্যাসের বাতি

প্রাচীন মিশর ও ইরানের দলিলপত্রে ঐসব অঞ্চলের বহু স্থানে মাটির ফাটল থেকে উদ্ভূত জ্বালানী গ্যাসের খবর পাওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ববর্তী কালে চীনদেশে আলোক উৎপাদনের জন্যে এই জাতীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রচলন ছিল। প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণতঃ মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6) এবং উচ্চস্তরের হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। তৈলের খনি থেকেই এদের উৎপত্তি। এই সব প্রাকৃতিক গ্যাস 1500-1600 ফুট তলায় ভূগর্ভস্থ লবণের স্তর থেকে বাঁশের নল দিয়ে ভূপৃষ্ঠে পরিচালিত করে লবণের খনি ও বাড়ীঘর আলোকিত করা হতো। 1664 খৃষ্টাব্দে জন ক্লেটন (John Clayton) ল্যাঙ্কাশায়ারে ভূগর্ভে কয়লার খনির নিকট প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন এবং অনতিকাল পরে কয়লা থেকে অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ার (Destructive distillation) সাহায্যে গ্যাস প্রস্তুতের সন্তোষজনক প্রণালীর বর্ণনা করেন। 1784 খৃষ্টাব্দে জ্যাঁ পিয়ের (Jan Peare) কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাস আলোক উৎপাদনের জন্যে প্রথম ব্যবহার করেন। ইংল্যাণ্ডের কর্নওয়াল প্রদেশে উইলিয়াম মারডোর (William Mardoua) 1792 খৃষ্টাব্দে কয়লা থেকে উৎপন্ন গ্যাস আলোকের জন্যে বিস্তৃতভাবে ব্যবহার প্রবর্তন করেন এবং 1798 খৃষ্টাব্দে তিনি বার্মিংহামের নিকটস্থ একটি কারখানা ও বহু দোকান-পাট গ্যাসের আলোকে আলোকিত করেন।

লণ্ডন শহরে গ্যাসবাতি আলোকের প্রথম ব্যবস্থা হয় 1807 খৃষ্টাব্দে জার্মান দেশীয় এফ. এ. উইণ্ডসরের (F. A. Windsor) পরিচালনায়। ঐ সময়ে এই জাতীয় গ্যাসবাতির ব্যবহারের বিরুদ্ধে সাধারণের মধ্যে একটি কুসংস্কার ছিল। তা সত্ত্বেও উইণ্ডসরকে গ্যাসের আলোকবাতি প্রবর্তনের প্রথম পুরোহিত হিসাবে গণ্য করা হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরের রাস্তা-ঘাট গ্যাসের আলোকে আলোকিত করা হয় 1818 খৃষ্টাব্দে। প্রায় ঐ সময়েই আমেরিকার নিউইয়র্কে গ্যাসের আলোক ব্যবহার সুরু হয়। খনিজ কয়লা থেকে অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়; যথা—অ্যামোনিয়া, জল, আলকাত্‌রা এবং কোক। আলকাত্‌রা থেকে অন্তর্ধূম পাতন প্রক্রিয়ায় বহু জৈব রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হচ্ছে। বাজারে যে সব ন্যাপথালিন বিক্রী হয়, তাও ঐসব পদার্থের মধ্যে একটি। বিবিধ ঔষধি, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদির উপাদান আসে এই আলকাত্‌রা পাতন প্রক্রিয়া থেকে। কয়লার গ্যাসে সাধারণতঃ হাইড্রোজেন ($H_2-50\%$), মিথেন ($CH_4-30\%$), কার্বন মনোক্সাইড ($CO-8\%$), ইথিলিন ($C_2H_4-8\%$), নাইট্রোজেন ($N_2-5\%$), কার্বন ডাই-অক্সাইড ($CO_2-2\%$), অক্সিজেন ($O_2-2\%$)। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দাহ্য নয়।

বর্তমানে অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাসের নাম কারও অজানা নয়। রাস্তাঘাটে, শোভা-যাত্রায় ও উৎসবে গ্যাসের আলো হিসাবে এর বহুল ব্যবহার চলছে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে ($Ca\ C_2$) জল দিলেই অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়, ($CaC_2+2H_2O=Ca(OH)_2+C_2H_2$)।

1836 খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী ময়সাঁ (Henry Moissan) যদিও এই গ্যাস আবিষ্কার করেন, এর ব্যবহার কিন্তু সুরু হয়েছিল 1892 খৃষ্টাব্দে। 1909 খৃষ্টাব্দে আমেরিকার 290টি শহর এই গ্যাসের বাতিতে আলোকিত করা হয়েছিল। কোক এবং চুনাপাথর বৈদ্যুতিক চুল্লীতে 2500°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ক্যাল-সিয়াম কার্বাইড ($CaO+3C=CaC_2+CO$) তৈরি হয়। গ্যাসের আলোকশক্তি প্রবলভাবে বাড়ানো হয়—ঐ আলোর বাতির উপর থোরিয়াম ডাই-অক্সাইডঘটিত তুলা বা কৃত্রিম রেশমের মুকুট পরিয়ে (Gas mantle)। 1885 খৃষ্টাব্দে ফন ওয়েলস্‌বাক্‌ (Von Welsbach) পরীক্ষায় দেখলেন যে, গ্যাসবাতির শিখার উপর (কয়লার গ্যাস, অ্যাসিটিলিন গ্যাস, পেট্রল গ্যাস, কেরোসিন গ্যাস) শতকরা 99 ভাগ থোরিয়াম ডাই-অক্সাইড (ThO_2) এবং এক ভাগ সিরিয়াম ডাই-অক্সাইড (CeO_2) ঘটিত মুকুটের ব্যবহারে আলোকশক্তি সবচেয়ে বেশী প্রবল হয়। এই সব মুকুট তৈরির জন্যে তুলা, রামী বা কৃত্রিম রেশমের তন্তুর জালির মুকুটবিশিষ্ট বাঁধনী পদার্থসহ উপরিউক্ত পরিমাণে থোরিয়াম নাইট্রেট {$(Th(NO_3)_4$} ও সিরিয়াম নাইট্রেটের {$Ce(NO_3)_4$} জলীয় দ্রবে সিক্ত করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। পরে ওকে আগুনে পোড়ালে থোরিয়াম ডাই-অক্সাইড ও সিরিয়াম ডাই-অক্সাইডের একটি কঙ্কাল-মুকুট তৈরি হয়। এই মুকুটকে কলোডিয়ামে ডুবিয়ে মজবুত করা হয়। থোরিয়াম নাইট্রেট ও সিরিয়াম নাইট্রেট উত্তাপে ভেঙ্গে থোরিয়াম ডাই-অক্সাইড ও সিরিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়। কিছুকাল আগেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বছরে ঐ জাতীয় দশ কোটি গ্যাস মুকুটের (Gas mantle) বিক্রী বাজারে চলতি ছিল।

বৈদ্যুতিক বাতি

1650 খৃষ্টাব্দে অটোভন গেরিক (Ottovon Garrick) পরীক্ষায় দেখলেন যে, বৈদ্যুতিক

শক্তির প্রবাহে আলোকের উৎপত্তি ঘটতে পারে। আকাশে যে বিজলী দেখতে পাই, তার আলো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহে সৃষ্টি হয়। তিনি দেখলেন যে, যখন একটি গন্ধকের গোলা হাতের চাপের মধ্যে বেগে ঘোরানো হয়, তখন তাথেকে একটি উজ্জল আলো বেরুতে থাকে। 1706 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস হোক্স্বি (Francis Hochshoby) একটি কাচের বর্তুলাকার পাত্রকে বায়ুশূন্য করে হাতের চাপের মধ্যে বেগে ঘুরিয়ে প্রথমে বৈদ্যুতিক আলোর সৃষ্টি করেন। বৃটিশ বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি (Humphrey Davy) 1802 খৃষ্টাব্দে পরীক্ষায় দেখলেন যে, প্ল্যাটিনাম বা অন্যবিধ ধাতুর সরু পাতের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত করলে সেগুলি উত্তপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। 1809 অব্দে পাশাপাশি দুটি কার্বন দণ্ডের ভিতর দিয়ে 2000 বিদ্যুৎ-কোষ সম্বলিত ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালিত করলে ঐ দণ্ড দুটির সম্মুখীন প্রান্তের মধ্যে একটি অত্যুজ্জল বক্র আলোক শিখার (Arc light) সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় আর্ক ল্যাম্প এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহে উত্তপ্ত ধাতুর তার থেকে দীপ্তিশীল বৈদ্যুতিক বাতি (Incandescent lamp) তৈরির ক্রমোন্নতি দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈদ্যুতিক আর্ক বাতি জাহাজে এবং বাতিঘরে বহুদূর প্রসারী সন্ধানী আলোক (Search light) হিসাবে ব্যবহার সুরু হয়। এই ক্ষেত্রে দুটি কার্বন দণ্ডের সামনে বা চতুর্দিকে শক্তিশালী লেন্স বসানো থাকে। আর্ক ল্যাম্পের অনেক প্রকারভেদ আছে: (1) মৃদু আলোকের আর্ক বাতি—এক্ষেত্রে দুটি নীরেট কার্বন দণ্ড তড়িদ্দ্বার (Electrode) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কার্বন দণ্ডগুলি উত্তপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। এই অবস্থায় কোন আলোক শিখার সৃষ্টি হয় না, (2) আলোক শিখাযুক্ত আর্ক বাতি, এই সব বাতিতে তড়িদ্দ্বার হিসাবে ব্যবহৃত কার্বন দণ্ডে বিশিষ্ট ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে এবং এই দুটি দণ্ডের মধ্যে একটি অত্যুজ্জল বক্র আলোকশিখা তৈরি হয়; (3) অতি তীব্র আলোক শিখাযুক্ত আর্ক বাতি—এক্ষেত্রে বেশীর ভাগ আলো দুটি কার্বন তড়িদ্দ্বারের মধ্যবর্তী বাষ্পীভূত কার্বন কণিকা থেকে উৎপন্ন হয়। তীব্র আলোক শিখার আর্ক-ল্যাম্প থেকে আলোকের ঔজ্জল্যের তীব্রতা প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে 13 লক্ষ মোমবাতির আলোকের ঔজ্জল্যের সমান বা অধিক হয়। মৃদু আলোকের আর্ক বাতি ব্যবহার হয় সিনেমার ছবি দেখাবার জন্যে, আলোকচিত্র তৈরি (Photoengraving illumination), বেগুনীপারের আলোর ব্যবহার (Ultra-violet irradiation) এবং রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি কাজে। আলোক শিখাযুক্ত আর্ক বাতির ব্যবহার হয় দিবালোকের মত আলোক উৎপাদনের জন্যে। এক্ষেত্রে কার্বন তড়িদ্দ্বারে যে সিরিয়াম ধাতুঘটিত পদার্থ থাকে, তাথেকেই এই জাতীয় আলোকের সৃষ্টি হয়।

1820 খৃষ্টাব্দে দোলা রু (Dola Rue) একটি গ্লাসের মোটা নির্বাত নলের ভিতর প্ল্যাটিনাম তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত করে দীপ্তিশীল বৈদ্যুতিক বাতি (Incandescent lamp) নির্মাণের প্রথম চেষ্টা করেন। বৈদ্যুতিক প্রবাহে উত্তপ্ত প্ল্যাটিনাম তারের কুণ্ডলী প্রদীপ্ত হয়ে আলোক বিকিরণ করে। মার্কিন বিজ্ঞানী এডিসন (Edison) (1847-1931) ব্যবহারের উপযোগী এক শত ওয়াট শক্তিসম্পন্ন কার্বনতন্তুর সাহায্যে দীপ্তিশীল বৈদ্যুতিক বাতির প্রথম প্রচলন করেন। এ-থেকে 600 ঘন্টাকালব্যাপী আলো পাওয়া যেত। অনতিকাল পরে এই জাতীয় দীপ্তিশীল বাতির বহু উন্নতি ঘটে। কার্বনতন্তুর পরিবর্তে টাংস্টেন (Tungsten) ধাতুতন্তুর ব্যবহার চলতি হয়। কারণ টাংস্টেন ধাতু সহজে গলে না বা বাষ্পীভূত

হয় না। এই কারণে এর ব্যবহারে বাতির দীপ্তির আয়ুষ্কাল অনেক বেড়ে যায়। বর্তমানে
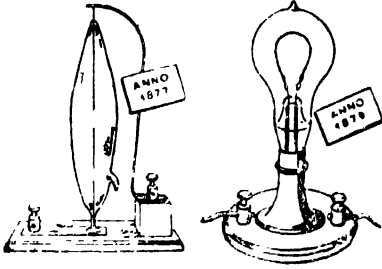
1নং চিত্র
বামদিকে—1877 খৃষ্টাব্দে সোয়ান উদ্ভাবিত কার্বন-তন্তুর প্রথম ভাস্বর-দীপ। ডানদিকে—1879 খৃষ্টাব্দে এডিসন উদ্ভাবিত কার্বনতন্তুর প্রথম ভাস্বর-দীপ।
[ছবি ফিলিপস ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে]

দুই প্রকার দীপ্তিশীল বাতির ব্যবহার চলছে। এই সব বাতিতে বর্তুলাকার কাচের আধারের (Bulb) অভ্যন্তরে টাংস্টেন তন্তুর কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হয়। এই সব কাচের আধার বায়ুশূন্য থাকে অথবা অল্প চাপের কোন বিশিষ্ট নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভর্তি থাকে। বর্তমানে টাংস্টেন তন্তুর দীপ্তিশীল বাতিতে শতকরা 83 ভাগ আর্গন ও 12 ভাগ নাইট্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। এর ফলে উত্তাপে টাংস্টেন ধাতুর বাষ্পীভূত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। অপর পক্ষে বায়ুশূন্য বাতিগুলি কিছুকাল ব্যবহারের পর কাচের গায়ে বাষ্পীভূত টাংস্টেন ধাতুর একটি কালো আস্তরণ ক্রমে ক্রমে জমতে থাকে, তাতে বাতির দীপ্তি কমে যায়।

বিশিষ্ট গ্যাস কিম্বা ধাতব বাষ্পের ভিতর বৈদ্যুতিক ক্ষরণের (Electric discharge) প্রভাবে অতি উজ্জ্বল আলোকের উৎপত্তি ঘটে। এথেকেই পারদ বাষ্পের (Mercury vapour lamp), সোডিয়াম বাষ্পের (Sodium vapour lamp), নিয়ন গ্যাসের (Neon lamp) আর্গন (Argon lamp) এবং জিনন গ্যাসের (Xenon lamp) দীপ্তিশীল বাতির নির্মাণ ও বহুল প্রচলন দেখা দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রঙীন কাচের নল ব্যবহার করে বিভিন্ন রঙের আলোর সৃষ্টি করা হয়। এই সব নলের আভ্যন্তরীণ প্রতিপ্রভ (Fluorescence) পদার্থের আস্তরণ দিয়ে আলোকের দীপ্তি বহু গুণে বাড়ানো যায়। নলের দুই প্রান্তে দুটি ধাতব তড়িদ্দ্বার সংলগ্ন থাকে। ঐ দুটির মধ্যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণের ফলে আভ্যন্তরীণ গ্যাস বা বাষ্প প্রদীপ্ত হয়ে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করে।

প্রতিপ্রভ দীপ্তিশীল বাতি
(Fluorescent lamp)

এই জাতীয় বাতিতে কোন প্রতিপ্রভ পদার্থের আস্তরণ থেকে সাধারণতঃ বেগুনীপারের (Ultra-violet) আলোক-রশ্মির সম্পাতের ফলে দৃশ্যমান উজ্জ্বল আলোক-রশ্মির সৃষ্টি হয়। একটি মোটা কাচের নলের আভ্যন্তরীণ গাত্রে প্রতিপ্রভ পদার্থের (ক্যালসিয়াম ফ্লুরাইড—CaF_2, বেরিলিয়াম ও সিরিয়াম ধাতুঘটিত পদার্থ ইত্যাদি) আস্তরণ দেওয়া থাকে এবং এর দুই প্রান্তে ইলেকট্রন বিকিরণকারী প্রলেপযুক্ত দুটি টাংস্টেন ধাতুর তড়িদ্দ্বার সংলগ্ন করা হয়। নলের অভ্যন্তরে অল্প পরিমাণ আর্গন গ্যাসের সঙ্গে পারদ বাষ্প ভর্তি করা হয়। দুই তড়িদ্দ্বারের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পারদ বাষ্পের সাহায্যে পরিচালিত হয়। পারদ বাষ্প থেকে বিকিরিত বেগুনীপারের আলোকরশ্মি প্রতিপ্রভ আস্তরণে পতিত হবার ফলে তাথেকে দৃশ্যমান উজ্জ্বল আলোকের সৃষ্টি হয়। এই আলোক সাধারণতঃ দিবালোকের মত উজ্জ্বল ও বর্ণহীন। এই সব বাতিতে বৈদ্যুতিক শক্তির শোষণ অপেক্ষাকৃত কম। দীপ্তিশীল বৈদ্যুতিক বাতির আলোক প্রদায়ক শক্তি থেকে এই সব প্রতিপ্রভ বাতির আলোক প্রদায়ক শক্তি প্রতি ওয়াটে তিন-চারগুণ বেশী; যদিও ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত কম।

অনুপ্রভ আলোক (Phosphorescence)

এমন সব রাসায়নিক পদার্থ আছে, যেগুলি
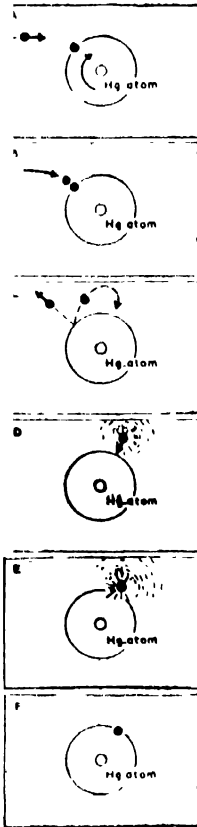
2নং চিত্র

মোক্ষণ প্রক্রিয়ার কালক্রমিক পর্যায় A থেকে F : Hg=পারদ [ছবি—ফিলিপস ইণ্ডিয়ার সৌজন্যে]

দিবালোক থেকে বিশিষ্ট আলোকশক্তি শোষণ করে নিজের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখে এবং অন্ধকারে সেই শক্তি বিকিরণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অবিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম সালফাইড (CaS) ও বেরিয়াম সালফাইড (BaS)-এর উল্লেখ করা যায়। রাত্রিবেলা অন্ধকারে জোনাকী পোকা যে আলো দেয় এবং কুচা চিংড়ির খোলা থেকে যে আলো বেরোয়, তারও কারণ হচ্ছে—তাদের মধ্যে এই জাতীয় অনুপ্রভশীল পদার্থের অস্তিত্ব। অনেক হাতঘড়ির কাঁটা এবং সংখ্যার উপর ঐ জাতীয় অনুপ্রভ পদার্থের প্রলেপ থাকে, ফলে অন্ধকারে সময় দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে এমন শক্তিশালী—অনুপ্রভশীল পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে, যা দিয়ে ঘরবাড়ী রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিনা ব্যয়ে এবং বিনা পরিশ্রমে আলোকিত করা যাবে। অ্যালুমিনিয়াম বা অন্য কোন ধাতব পাত্ কিম্বা তাদের ফাঁপা বলের গায়ে এই সব পদার্থের প্রলেপ দিয়ে রাস্তাঘাটে উঁচু স্তম্ভের উপর ঝুলিয়ে রাখলে এরা দিবালোকে আলোক শোষণ ও সঞ্চিত করে রাত্রির অন্ধকারে তার বিকিরণে চতুর্দিক আলোকিত করবে। ঘরের ভিতর দেয়ালের কোন সুবিধামত জায়গায় প্লাষ্টারের উপর এই সব পদার্থের প্রলেপ দিলে রাত্রিবেলা ঐ ঘর আলোকিত হয়ে উঠবে। এই সব প্রতিপ্রভ ও অনুপ্রভ আলোককে এই কারণে শীতল আলো (Cold light) বলা হয়।

বিভিন্ন আলোক বাতি থেকে বিকিরিত আলোকশক্তির তুলনামূলক তালিকা

আলোক বাতি	প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মোমবাতির আলোকের এককের সংখ্যায়	প্রতি ওয়াটে লুমেন আলোকশক্তির একক	দীপ্তিশক্তির ব্যবহারিক (Luminosity efficiency মূল্যায়ন (শতকরা)
সূর্য	923×10^{3}		16
মোমবাতি	3·5	0·1	
কেরোসিন শিখা	9·0	0·3	

আলোক বাতি	প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মোমবাতির আলোকের এককের সংখ্যায়	প্রতি ওয়াটে লুমেন আলোর শক্তির একক	দীপ্তিশক্তির ব্যবহারিক (Luminosity efficiency মূল্যায়ন (শতকরা)
কয়লার গ্যাসের শিখা	2·7		
অ্যাসিটিলিন শিখা	40	0·7	
গ্যাসের ওয়েলস বা মুকুট	31		
কার্বন আর্ক	92×10^3	7	1·1
পারদবাষ্পের আর্ক	8×10^3	12·7	2·0
কার্বন তন্তুর দীপ্তিশীল বাতি	340	2·6	0·42
টাংস্টেন ধাতুর তারের বাতি	1334	10	1·6
টাংস্টেন (নির্বাত) ধাতুর তারের বাতি (গ্যাস 500 ওয়াট)	7,500	19·8	3·2

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে কোন জড়পরমাণুর কেন্দ্রের বহিঃপ্রদেশস্থ ইলেকট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে উন্নয়ন ও প্রত্যাবর্তনের ফলে আলোক-শক্তির বিকিরণ ঘটে। প্রচণ্ড তাপে কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে ইলেকট্রনের এই কক্ষচ্যুতি সম্পন্ন হয়। আমরা যে মোমবাতি, কেরোসিন বা গ্যাসের শিখা থেকে আলোক পাই, তার উৎপত্তি ঘটে ঐ সব শিখার ভিতর কার্বন পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতি থেকে। এই সব শিখায় বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে গ্যাসের অণুর রাসায়নিক সংযোগে যে প্রজ্বলন ঘটে এবং তার ফলে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপে প্রথমতঃ গ্যাসের অণু থেকে কিছু কার্বন কণিকা শিখার অভ্যন্তরে বিমুক্ত হয়। তাপের প্রভাবে ঐসব কার্বনকণিকার পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতি থেকে আলোকশক্তির বিকিরণ ঘটে। এইরূপে দীপ্তিশীল বৈদ্যুতিক বাতিতে তাপের প্রভাবে ধাতব তন্তুর পরমাণু থেকেও আলোকশক্তির সৃষ্টি হয়। গ্যাসের মুকুটে থোরিয়াম ধাতুর পরমাণু এই প্রক্রিয়ায় আলোকের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে তোলে।

"* * * জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চকমাত্র

—বঙ্কিমচন্দ্র

আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান

অসীমা চট্টোপাধ্যায়*

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ভারতবর্ষ একদিন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল। এমন একদিন ছিল যখন ভেষজের ক্ষেত্রে ভারত যে কেবল স্বয়ম্ভরই ছিল তা নয়, পৃথিবীর পণ্যের বাজারেও ছিল ভারতের ভেষজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্য। পরবর্তী কালে পরাধীন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দ্রুতগতির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে অক্ষম হওয়ায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে নি। যে ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি একদিন সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার আসন পেয়েছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করে তাকে যুগোপযোগী করতে না পারায় তার সার্বজনীনতা উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ভেষজ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আদৌ থেমে যায় নি। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ এই উন্নতির সম্যক অংশীদার হতে আজও পারে নি।

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সত্য, কিন্তু জাতীয় সম্পদের অসম বন্টনের ফলে এখনও সমাজজীবনে বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে। শ্রমের তুলনায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ক্ষয়-রোগাক্রান্ত জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সমগ্র জাতিকে এক চরম অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় 80 ভাগ লোক কোন না কোন যকৃতের রোগ, বাত, আল্সার, কোলাইটিস অথবা ক্রনিক অ্যামিবায়োসিসে (আমাশয়ে) ভুগছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরের হাত থেকে গ্রামগুলি এখনও নিষ্কৃতি পায় নি। কলেরা, বসন্ত আজও মহামারীরূপে দেখা দেয়। তাছাড়া মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া, ডায়াবেটিস, নানা ধরণের হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার এবং নানা ভাইরাসজনিত দুরারোগ্য ব্যাধি সাধারণ ব্যাধিতে পর্যবসিত হয়েছে।

এই সব রোগ নিরাময়ে আমরা প্রধানতঃ সংশ্লেষণজাত ঔষধ ব্যবহার করে থাকি। শিল্পায়নে অনগ্রসরতার জন্যে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ভারতকে ঐসব ঔষধ আমদানী করতে হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির একপেশে চিন্তাধারার ফলে রোগ নিরাময়ে ভেষজের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হতে বসেছে এবং এখনও যে সমস্ত ভেষজ আমরা ব্যবহার করি, তারও একটা বৃহৎ অংশ কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আমাদের আমদানী করতে হচ্ছে, যদিও এই সব ভেষজ নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় কাচামাল যথেষ্টই আমাদের আছে।

ভারতবর্ষ আজ এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই মুহূর্তে আমাদের এক আত্ম-নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা দরকার। তাই বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় কমিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। রোগ-নিরাময়ের কৃত্রিম সংশ্লেষণজাত ঔষধের একচেটিয়া প্রয়োগের পরিবর্তে ভেষজের ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের আংশিক সমাধান করা যায় এবং ভারতবর্ষের বিস্তৃত বনরাজি, লতা-গুল্ম ও বৃক্ষাদি আমাদের এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে যে সমস্ত কৃত্রিম ঔষধ রোগ-নিরাময়ে অভাবনীয় বিস্ময়

* রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্টি করেছে, সেগুলির আবিষ্কারের মূলে রয়েছে ভেষজ-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই বনৌষধির প্রচলন নতুন কৃত্রিম ঔষধ আবিষ্কারের পথ খুলে দেবে—এরূপ ধারণা মোটেই অযৌক্তিক নয়। যে সব ক্ষেত্রে ভেষজ আজও আবিষ্কৃত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রে অবশ্যই কৃত্রিম ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এবং সেই সব কৃত্রিম ঔষধ যাতে আমাদের দেশেই তৈরি করা যায়, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। সৌভাগ্য বশতঃ এই বিষয়ে আমরা কিছুটা সফল হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পেনিসিলিন, ক্লোরাম্ফেনিকল, ভিটামিন-এ, নিয়াসিন, নিয়াসিন অ্যামাইড, ইনসুলিন, কর্টিকোস্টেরয়েড শ্রেণীর প্রেড্‌নিসোন, প্রেড্‌নিসোলোন, কর্টিসোন, হাইড্রোকর্টিসোন, মিথাইলটেষ্টোষ্টেরোন, আইসোনিকটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড এবং পেথেডিন প্রভৃতি কৃত্রিম ঔষধ বর্তমানে বিদেশ থেকে খুব সামান্যই আমদানী করতে হচ্ছে।

বহু গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, অনেক কৃত্রিম ঔষধ সাময়িকভাবে অপূর্ব ফলদায়ক হলেও একই রোগীর উপর অধিককাল প্রয়োগের ফলে রোগী রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে অনেক ভেষজ-দ্রব্য কৃত্রিম ঔষধের তুলনায় সাময়িকভাবে কম ক্রিয়াশীল হলেও দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক সময়ে আমাদের দেশে সিঙ্কোনার চাষ ব্যাপকভাবে করা হতো এবং সেই সিঙ্কোনা বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতাম। পরবর্তী কালে নতুন নতুন সংশ্লেষণজাত ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক সিঙ্কোনার কদর কমিয়েছে সত্য, কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধকের তুলনায় সিঙ্কোনার উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সিঙ্কোনার ব্যাপক চাষের এক বিরাট সম্ভাবনাও রয়েছে। তাছাড়া কোন কোন কৃত্রিম ঔষধ, যথা—গন্ধকজাতীয় কৃত্রিম ঔষধ, অধিক ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে তীব্র-বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ভেষজ-দ্রব্যের সাধারণতঃ এরূপ কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না এবং আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি পুরাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এমন বিস্ময়কর ভেষজের সন্ধান দিয়েছে, যার সমকক্ষ কোন কৃত্রিম ঔষধ আজও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি।

এই ব্যাপারে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-পদ্ধতির পুনরুত্থানের জন্যে নানাবিধ চেষ্টা করছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দপ্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের উৎসাহ দেবার জন্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করছেন। শহরে আয়ুর্বেদের ব্যবহার বিশেষভাবে না হলেও গ্রামে গ্রামে আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা-পদ্ধতি যে সাদরে গৃহীত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ গ্রামে এখনও অল্পস্বল্প পরিমাণে ভেষজের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই কারণে পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গ্রামে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের সুযোগ দেবার মনস্থ করেছেন। এই ভাবেই আবার আমাদের প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে চারটি আঞ্চলিক আয়ুর্বেদ গবেষণাগার স্থাপন করেছেন। কলকাতা, ভুবনেশ্বর, যোগীন্দর নগর ও জয়পুরে এই আঞ্চলিক গবেষণাগারগুলি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া পাতিয়ালা ও কেরালায় দুটি কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সর্বপ্রথম কর্তব্য সর্বপ্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে থেকে ব্যবহৃত ঔষধের মূল্যমান নির্ধারণ করা এবং অতি পুরাতন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে

যুগোপযোগী করা। ভেষজ-দ্রব্যের মূল্যমান নির্ধারণের জন্যে প্রয়োজন—আয়ুর্বেদজ্ঞ জৈবরাসায়নিক, উদ্ভিদ ও শারীর-বিজ্ঞানী এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এক সুসংগঠিত সংস্থা গড়ে তোলা। এরূপ ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমেই ভেষজ-বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। ভেষজ-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিভার উন্মেষে এই পরিকল্পনা বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এই প্রকল্পের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ একদিকে যেমন চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে ও দেশীয় ভেষজ রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে, তেমনি জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের কর্মসংস্থান করতে সক্ষম হতে পারে। লেখিকার মতে, দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের পরামর্শে কৃষি, শিল্প বা ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত ঔষধের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন ও তাদের প্রসারের চেষ্টা করেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যা ও বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হওয়া সম্ভব।

রাস্তার দুর্ঘটনায় উদ্ধারকার্যের জন্যে প্রসারণক্ষম এয়ার ব্যাগ

রাস্তায় কেউ ভারী যানবাহনের তলায় চাপা পড়লে প্রায় আড়াই ইঞ্চি পুরু রাবারের পাতে মোড়া নিউপ্রিন/নাইলনের শক্ত থলের (Air Bag) সাহায্যে কিভাবে তাকে উদ্ধার করা যায়, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে। চুপ্‌সে থাকা এয়ার ব্যাগ সুবিধা-

মত স্থানে বসিয়ে এয়ার পাইপের সাহায্যে সংনমিত বাতাস (Compressed air) ঢুকিয়ে অথবা মোটর গাড়ীর এক্সজষ্ট পাইপের সঙ্গে জুড়ে ব্যাগটিকে প্রসারিত করে উপরের চাপ কমিয়ে দিয়ে চাপা-পড়া ব্যক্তিকে অনায়াসে বের করে আনা যায়।
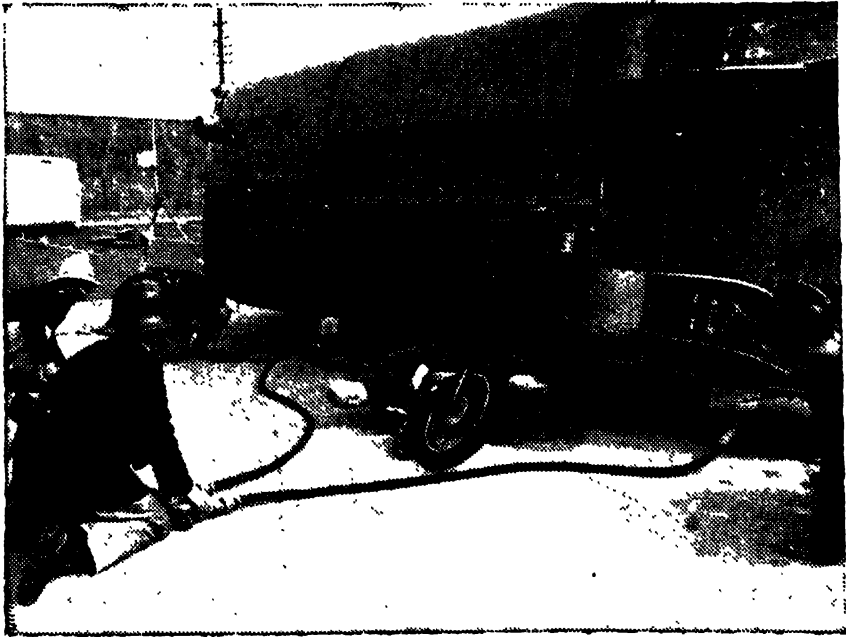
পশ্চিম বঙ্গের জনস্বাস্থ্য

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে তদানীন্তন বাংলার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক আয়োজিত স্বাস্থ্য-সেবামূলক সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশই বড় বড় শহর ও পৌরসভার এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা ছড়িয়ে দিতে পারে, এমন সঙ্কল্প বা সম্বল তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের ছিল না।

1947 সালে 15ই অগাষ্ট স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকারের নীতির মধ্যে দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষভাবে স্বাস্থ্য-সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে দিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। 1951-52 সাল থেকে প্রবর্তিত পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মাধ্যমে, বিশেষভাবে রোগ প্রতিরোধ-মূলক ও প্রতিকারমূলক উভয়বিধ ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগ রাজধানী শহর থেকে আরম্ভ করে গ্রাম পর্যন্ত সর্বস্থলে ব্যাপক স্বাস্থ্য-সেবামূলক সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্যে এগিয়ে যায়।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, যক্ষ্মা ও কলেরার মত মারাত্মক ব্যাধিসমূহ বাগে আনা ও নির্মূল করবার জন্যে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয় ম্যালেরিয়া দূরীকরণ কর্মসূচীর ফলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রায় তিরোহিত হয়েছে বলা যায়। 1948 সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 3·6 জন; 1969 সালে সে হার নেমে আসে প্রতি হাজারে 0·001 জন। 1947 সালে বসন্ত রোগে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 0·57 জন; ব্যাপক টিকাদানের ফলে 1970 সালে সে হার নেমে গিয়ে প্রতি হাজারে 0·003 জন হয়

যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ দূরীভূত করবার জন্যে 53টি চেষ্ট ক্লিনিক কাম ডোমিসিলিয়ারী সার্ভিসের সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং 16টি বি. সি জি. টিকাদানের দল কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় হাসপাতালসমূহের বহির্বিভাগ ও বেসরকারী বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিনামূল্যে যক্ষ্মা রোগ প্রতিকারক ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা আছে। 1961 সালে বুকের যক্ষ্মারোগে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 0·1 জন; তা হ্রাস পেয়ে 1970 সালে হয়েছে প্রতি হাজারে 0·07 জন।

কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্যে বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত গৌরীপুর কুষ্ঠ উপনিবেশে 530 জন রোগীকে পৃথক রাখা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সরকারী ও বেসরকারী মোট 105টি কুষ্ঠচিকিৎসা কেন্দ্র চালু আছে।

পানীয় জলের মাধ্যমে কলেরা ও আমাশয় সংক্রান্ত নানা রোগের সংক্রমণ হয়। সে জন্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের খাতিরে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে গ্রামাঞ্চলে এরূপ নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না বলা যায়। পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহের জন্যে বহু সংখ্যক নলকূপ বসানো ও কূপ খননের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে এরূপ মোট 1,09,000টি নিরাপদ পানীয় জলের উৎস পশ্চিম বঙ্গের গ্রামাঞ্চলে সচল অবস্থায় পানীয় জল সরবরাহ করছে।

এই রাজ্যে মোট 88টি পৌর সংস্থার মধ্যে কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলার মধ্যে 55টি ও তার বাইরের এলাকায় 33টি অবস্থিত। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলায় 13টি ও তার বাইরে 5টি মোট 18টি পৌরসংস্থায় পানীয় জল সরবরাহের আবশ্যক কর্মসূচী রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছে। 37টি ক্ষেত্রে বর্তমান জল সরবরাহের ব্যবস্থা বিবর্ধনের কর্মসূচীও রূপায়িত করা হয়েছে। রাজ্যের কয়লাখনি এলাকাতে 7·73 কোটি টাকার পানীয় জল সরবরাহের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, 1961 সালে আমাশয় সংক্রান্ত সকল প্রকার রোগে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 0·3 জন। তা হ্রাস পেয়ে 1970 সালে প্রতি হাজারে 0·09 জন হয়।

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বিভিন্ন হাসপাতালে মোট 17500 শয্যা ছিল। জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-সমূহ সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং নূতন নূতন হাসপাতাল, যেমন—520 শয্যাবিশিষ্ট কল্যাণীতে জওহরলাল নেহেরু স্মারক হাসপাতাল, ধুবুলিয়াতে 1000 শয্যার যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কলকাতায় গোবরায় 110 শয্যার একটি মানসিক হাসপাতাল এবং বেলেঘাটায় একটি সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতাল খোলা হয়েছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন ব্লক স্তরে প্রতি কেন্দ্রে 10 থেকে 50টি শয্যার 286টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং 2 থেকে 10টি শয্যার 521টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 6000 এবং সুদূর পল্লীর অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত এলাকার জনসাধারণের জন্যে আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিকল্পনাটি স্বাধীনতা লাভের পর সম্পূর্ণরূপে সরকারের নবতম প্রচেষ্টা। এভাবে হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে 40,000 হয়; তন্মধ্যে সরকারী হাস-পাতালে শয্যার সংখ্যা 26,500টি। পশ্চিম বঙ্গে প্রতি হাজার লোকের জন্যে শয্যার সংখ্যা 0·9টি এবং সারা ভারতে এই সংখ্যা 0·53টি। তাছাড়া জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হাসপাতালের উন্নয়ন ও পরিচালনার সাহায্যে সরকার উদার হস্তে আর্থিক মঞ্জুরীদানের ব্যবস্থা করেছে। এরূপ প্রায় 250টি হাসপাতাল সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে।

স্বাধীনতা লাভের সময়ে মাত্র কলকাতায় 1টি সরকারী ও 1টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ছিল। বর্তমানে 7টি মেডিক্যাল কলেজ চলছে, পাঁচটি সরকারী কলেজের মধ্যে চারটি কলকাতায়, একটি বাঁকুড়ায় এবং অবশিষ্ট দুটির মধ্যে একটি উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এবং অপরটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। এই সাতটি মেডিক্যাল কলেজে এম. বি. বি. এস. পড়বার জন্যে মোট 755টি আসন আছে। দাঁতের বিষয়ে বিশেষ চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. ডি. এস ডিগ্রী কোর্সের জন্যে কলকাতায় একটি ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-সেবাদানের জন্যে আয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রাপ্ত নার্স, ইন্সপেক্টর, হেলথ্ ইন্সপেক্টর, ফার্মাসিষ্ট, লেবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং বেসিক হেলথ ওয়ারকারের সেবা আবশ্যক এবং সে জন্যে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীন ভেষজ নির্মাণে

উচ্চ শিক্ষাদানের জন্যে বি. ফার্ম ডিগ্রী কোর্সের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভেষজের মান অক্ষুন্ন রাখা, ভেজাল ভেষজের উৎপাদন প্রভৃতি ব্যাপারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্যে ডিরেক্টরেট অব ড্রাগ কন্ট্রোল এবং ড্রাগ কন্ট্রোল ও রিসার্চ লেবরেটরী নামে দুটি পৃথক সংস্থা প্রচলিত হয়েছে।

আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ এবং হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারকল্পে এই দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দানের জন্যে পশ্চিম বঙ্গ আয়ুর্বেদিক সিস্টেম অব মেডিসিন অ্যাক্ট, 1961 এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক সিস্টেম অব মেডিসিন অ্যাক্ট 1963, দুটি আইন প্রচলিত হয়েছে। 1964 সালে কলকাতায় একটি রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সীমিত সংখ্যক ছেলেমেয়ে থাকলে পরিবারের কল্যাণ হয়—এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যস্তরে ষ্টেট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিং বোর্ড, জেলায় জেলায় অনুরূপ 18টি জেলা বোর্ড, শহরাঞ্চলে 104টি আরবান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিং সেন্টার এবং ব্লক স্তরে 304টি ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্ল্যানিং সেন্টারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় যে, 1961 সালের লোক গণনানুসারে এই রাজ্যের জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে 3·28 জন ও 1971 সালের লোক গণনায় হ্রাস পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে 2·72 জন।

আরও লক্ষণীয় যে, 1961 সালে মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 6·6 জন, 1970 সালের চূড়ান্ত হিসাবাধীন মৃত্যুহার দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে 5·3 জন।

ভারতের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকল্পে মুদালিয়র কমিটির সুপারিশ প্রতি হাজার লোকের জন্যে ডাক্তার 0·29 জন, নার্স 0·2 জন, হাসপাতালের শয্যা একটি থাকা উচিত। এই মানদণ্ডে কয়েকটি উন্নত দেশ/রাষ্ট্র, ভারত ও পশ্চিম বঙ্গের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা নিম্নের ছকে সূচিত করা হচ্ছে।

ছক :—প্রতি হাজার লোকের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার আভাস

দেশ/রাষ্ট্রের নাম	শয্যাসংখ্যা	ডাক্তার	নার্স	মিড্ওয়াইফ
পশ্চিম জার্মেনী	10	1·67	2	0·15
জাপান	10	1·11	2·5	0·43
যুক্তরাজ্য	10	2·00	3·3	1·09
সোভিয়েট রাশিয়া	10	1·43	5·00	0·003
যুক্তরাষ্ট্র	10	+1·00	2·5	0·48+
অষ্ট্রেলিয়া	10	1·67	—	—
ফ্রান্স	10	1·11	2·5	0·17
সিংহল	3 3	0·24	0·29	0·02
ভারত (1968)	0·53	0·21	0·10	0·10
পশ্চিম বঙ্গ	0·88	0·58	0·15	0·11

+(সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত)

স্পষ্টতঃ, পশ্চিম বঙ্গ মুদালিয়র কমিটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অনেক অগ্রসর। তবে ছকে নির্দেশিত অন্যান্য দেশ/রাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম বঙ্গ আরও অনেক উন্নতির অপেক্ষাধীন। [তথ্য ও পরিসংখ্যান পঃ বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

সীমার মাঝে অসীম—আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম

রমাতোষ সরকার*

বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনেক সময়ে মানুষকে প্রকৃতির অনুকারক বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁদের মতে মানুষের সৃষ্টিশীল বা উদ্ভাবনশীল ক্রিয়াকর্মের পিছনে ঐ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা একটা বড় বড় প্রেরণা বা শক্তি; শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি সবই কিছু না কিছু পরিমাণে প্রকৃতির অনুকৃতি।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম মানুষের মনের ঐ চিরন্তন অনুকরণ-স্পৃহার এক পরম বিস্ময়কর প্রকাশ। অবশ্য অনুকরণ প্রবৃত্তিটাই সব নয়, তার সঙ্গে অন্য প্রবৃত্তিরও যোগ আছে—যেমন উল্লিখিত অন্য সব ক্ষেত্রগুলিতে, তেমনি প্ল্যানেটেরিয়ামের ক্ষেত্রেও।

প্রকৃতির রাজ্য সীমাহীন, সীমাহীন তার বৈচিত্র্য; ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ নানা বস্তুর সম্ভারে তা পরিপূর্ণ। বিস্ময়-রোমাঞ্চ-ভয়-আনন্দ উদ্রেককারী সে-সকল প্রকৃতিভুক্ত বস্তু যুগ যুগ ধরে মানুষকে নানাভাবেই নাড়া দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে অবারিত, আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশের একটি সবিশেষ স্থান আছে, আছে একটি অনস্বীকার্য একান্ত বৈশিষ্ট্য। উত্তুঙ্গ তুষারাবৃত পর্বতমালা, উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলরাশি প্রভৃতির সঙ্গে সকল মানুষের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না, সে-সকল বস্তুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবশ বিস্ময়ে নির্বাক হওয়ার সুযোগ সকল মানুষের জন্যে নয়—পৃথিবীর অনেক মানুষের কাছে তা দুর্লভ বিলাসিতার মত। কিন্তু আকাশ সর্বব্যাপী, আকাশ সর্বসাধারণের, আকাশের আবেদন সর্বজনীন। ধরিত্রী বোধ হয় আজ পর্যন্ত এমন একজনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহভার বহন করে নি, যে-মানুষ জীবনের কোন না কোন সময়ে মাথার উপরের মুক্ত আকাশের রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়েছে, বিহ্বল না হয়েছে, জীবনের অন্য সব চিন্তার কথা সাময়িকভাবে সম্পূর্ণতঃ বিস্মৃত না হয়েছে। তাই যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর তাবৎ মানুষের মনে যে-বিস্ময়, যে-কৌতূহল, যে-অনির্বচনীয় অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, তার পুঞ্জীভূত পরিমাণের বিচারে আকাশ বোধ হয় প্রকৃতির যাদুঘরে সর্বগরিষ্ঠ।

স্বাভাবিকভাবেই আকাশ যেমন যুগ যুগ ধরে মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে আলোড়িত করেছে, তেমনি উদ্দীপিত করেছে মানুষের শিল্পীসত্তাকে—মানবমনের সেই অংশকে, যে-অংশ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকৃতির পরিচয় পেয়েই তৃপ্ত হয় না, চায় তার অনুকরণে স্বহস্তে স্বকীয় সৃষ্টি করতে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের ঐ দ্বৈত সত্তা থেকেই তো একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি গড়ে উঠেছে শিল্পসাহিত্যাদি ললিতকলা—যেমন উৎপত্তি হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের, তেমনি গড়ে উঠেছে প্ল্যানেটেরিয়াম। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্ল্যানেটেরিয়াম তাই শুধু যে বিষয়বস্তুতে পরস্পরের কাছাকাছি তাই নয়, জন্মসূত্রেই তারা জড়িত, হয়তো জন্মলগ্নেও সমসাময়িক। কারণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রাচীনতম শাখা, আকাশের প্রতিকৃতি সৃষ্টি করবার চেষ্টাও তেমনি মানুষের তাবৎ শিল্প-প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম প্রাচীনতম। পুরাকালের পর্বতগুহাগাত্রে তার নানা সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে—রয়েছে সূর্য-

* বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, কলকাতা-16

চন্দ্র-তারকাখচিত কৃত্রিম আকাশকে রূপদানের নানা প্রচেষ্টার নিদর্শন। আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিগ্যার এক চমকপ্রদ, অত্যাশ্চর্য অবদান, কিন্তু এই সৃষ্টির পিছনে যে-সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস আছে, সে-ইতিহাসের জন্ম প্রাচীন গুহামধ্যে, উল্লিখিত আদিম অঙ্কনপ্রয়াসে।

চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত আকাশকে কৃত্রিম রূপদানের অজ্ঞাত পরিচয় আদিম কতকগুলি অঙ্কন-প্রচেষ্টার কথা বাদ দিলে, ঐতিহাসিকদের বিচারে যে-প্রচেষ্টাগুলি প্রাচীনতম বলে স্বীকৃত হয়েছে, সেগুলি প্রাচীন গ্রীক জাতির কীর্তি। এগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন গ্রীক জ্যোতিবিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক পণ্ডিতেরা মনে করতেন যে, আকাশের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, আকাশ প্রকৃতপক্ষে সমতল এবং অমিত শক্তিধর এক 'টাইটান' বা 'হারকিউলিস' তার বাহক। প্রাপ্ত সুপ্রাচীন গ্রীক পুরাকীর্তিগুলিতে তাই দেখা যায়—একটি পেশীবহুল মানুষের স্কন্ধোপরি স্থাপিত তারকাচিহ্নিত, আয়তাকার, সমতল একটি প্রস্তরফলক। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আনাকসিমানদার প্রথম গোলকাকৃতি আকাশ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা করেন এবং সেই ধারণার ফলস্বরূপ নভোগোলক (বা সেলেশ্চিয়াল গ্লোব)-এর সৃষ্টি হয়। খৃষ্টপূর্ব যুগের এই ধরণের গোলকের সবচেয়ে সুন্দর নিদর্শনটি পাওয়া গেছে রোমে, দর্শনীয় বস্তু হিসাবে 'ফারনেসে প্রাসাদে' সংরক্ষিত হওয়ার জন্যে এটি সংগ্রহশালার পরিভাষায় সাধারণতঃ 'ফারনেসে অ্যাটলাস' নামে পরিচিত। এই জাতীয় গোলকেরই পরবর্তী উন্নততর সংস্করণে গোলকটিকে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাসের চারপাশে ঘোরানোর ব্যবস্থা থাকত, আর তার ফলে আকাশে জ্যোতিষ্কসমূহের পশ্চিমাভিমুখী আপাত গতি এবং তাদের উদয়াস্তের ঘটনা সহজে অনুধাবন করা যেত। এই পর্যায়ে সাফল্যের পরাকাষ্ঠা অর্জন করেন প্রাচীন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্ আর্কিমিদিস। এঁকেই কেউ কেউ প্ল্যানেটেরিয়ামের আদি স্রষ্টা বলে আখ্যাত হবার যোগ্য বলে মনে করে থাকেন। আর্কিমিদিসের নভোগোলকে দিনরাত্রির প্রহরে প্রহরে জ্যোতিষ্কদের যে সাধারণ গতি আছে, সে-গতি ছাড়াও চন্দ্র-সূর্যের বিশেষ বিশেষ গতি, গ্রহণ প্রভৃতি জটিল জ্যোতিষিক ঘটনাবলীও প্রত্যক্ষ করা যেত। সম্পূর্ণ গোলকটিতে বা গোলকের বিশেষ বিশেষ অংশে প্রয়োজনমত গতি সঞ্চারের জন্যে আর্কিমিদিস সুকৌশলে জলশক্তি ব্যবহার করতেন।

মধ্যযুগে আরবদের কিছু কিছু প্রচেষ্টার কথাও ইতিহাসপৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। আরবদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে অষ্টম শতাব্দীতে সীরিয়ার দামাস্কাসে একটি রাজপ্রাসাদের অর্ধ-গোলকাকৃতি ছাদের গায়ে আকাশের অনুকরণে জ্যোতিষ্কের প্রতিকৃতি স্থাপনা করা। এক হিসাবে এ-প্রচেষ্টাটিকে আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের দূর কিন্তু প্রত্যক্ষ পূর্ব-সংস্করণ বলা চলে। কারণ, যদিও এ-গোলকে আকাশের অনুকৃতি ছিল স্থূল ও প্রাথমিক পর্যায়ের আর আকাশ ছিল নিশ্চল, অপরিবর্তনশীল, কিন্তু এক্ষেত্রে জ্যোতিষ্ক স্থাপনা ছিল গোলকের অন্তর্গাত্রে—বহির্গাত্রে নয়।

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আবার মুখর করে তুলেছে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের গোটর্প শহরে নির্মিত একটি নভোগোলক। 'গোটর্প গ্লোব' নামে পরিচিত 4·6 মিটার (বা 15 ফুট) ব্যাসবিশিষ্ট এই গোলকটির অক্ষরেখা থেকে 10 জন মানুষ বসবার উপযোগী একটি চৌকি ঝোলানো ছিল। গোলকটিকে অক্ষরেখার চারপাশে দর্শকরাই ইচ্ছামত ঘোরাতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও জ্যোতিষ্ক-সংস্থাপন করা হয় গোলকের অন্তর্গাত্রে।

আর্কিমিদিসের গোলকটির কথা বাদ দিলে উল্লিখিত প্রচেষ্টাগুলি সবই মোটামুটিভাবে কাঠামো-গত বা আধারগত উৎকর্ষের ক্রমবিকাশ। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যান্ত্রিক কলা-কৌশলগত ক্রমোন্নতি সুরু হয়। ঐ শতকেই বৃটেনে জর্জ গ্রাহাম একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, পরে আর্ল অফ ওরেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় জন রাওলে যার প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ঐ যন্ত্রে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের ভূমিকায় ছোট-বড় অনেকগুলি গোলক ব্যবহার করা হয়; যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গোলকগুলিকে একই সঙ্গে নানাবিধ গতিযুক্ত করা যেত। সাধারণতঃ ওরেরী (Orrery) নামে পরিচিত ঐ জাতীয় যন্ত্র এখনও বিজ্ঞান-শিক্ষণের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত নয়। এ-যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীসহ গ্রহগুলির গতি, চন্দ্রের গতি, হেলানো অক্ষরেখার চারপাশে পৃথিবীর নিজস্ব গতি এবং ঐ গতিগুলি থেকে উদ্ভূত যাবতীয় জ্যোতিষিক ঘটনা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। বিংশ শতাব্দীর সুখ্যাত কোপার্নিকান প্ল্যানেটেরিয়াম যান্ত্রিক বিচারে ওরেরীরই সমগোত্র

ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে কোপার্নিকান প্ল্যানে-টেরিয়ামের পূর্বগামী আর একটি প্রচেষ্টার কথা এপ্রসঙ্গে অবশ্য উল্লেখের দাবী রাখে। এ প্রচেষ্টার ফলে 1913 সালে আমেরিকায় 4·6 মিটার (বা 15 ফুট) ব্যাসের একটি বৃহৎ গোলক নির্মিত হয়। 'অ্যাটউড গ্নোব' নামে অভিহিত এ-গোলকটি কতকাংশ গোটর্প গোলকের মত, কিন্তু এটি ছিল সচ্ছিদ্র। সযত্ন হিসাবমত সঠিক মাপের, সঠিকভাবে সংস্থাপিত ছিদ্রগুলি ছিল বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের প্রতিনিধি। গোলকের ভিতরে অন্ধকার আর বাইরে আলোময় পরিবেশ সৃষ্টি করে গোলকটিকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে ধীরে ধীরে সমবেগে ঘোরানো হতো। ভিতরে উপবিষ্ট দর্শকের চোখে আকাশের অনুকৃতি হিসাবে ব্যাপারটি মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল আর আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের পূর্বসংস্করণগুলির মধ্যে কাঠামো বা গঠনের দিক থেকে এটাই ছিল সর্বোন্নত।

যান্ত্রিক কলা-কৌশলের দিক থেকে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে কোপার্নিকান প্ল্যানেটেরিয়াম। 1920 সালে মুনিখ শহরে স্থাপিত এই প্ল্যানে-টেরিয়াম মূলতঃ বৃত্তাকার দেয়ালবেষ্টিত একটি কক্ষ, যার ছাদ থেকে ঝোলানো বিভিন্ন বৈদ্যুতিক আলো সৌরজগতের বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের প্রতিভূ। এ-প্ল্যানেটোরিয়াম নিপুণ, সূক্ষ্ম কৌশলে, তারকাচিত্রিত দেয়ালের পটভূমিতে গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির যাবতীয় গতিবিধি নিখুঁতভাবে প্রদর্শনক্ষম।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম বলতে বোঝায় প্রক্ষেপ-নির্ভর প্ল্যানেটেরিয়াম। এই প্ল্যানেটেরিয়াম পূর্ববর্তী সকল প্রয়াস থেকে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র, এই প্ল্যানেটেরিয়াম কৃত্রিম আকাশ রচনার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক চিন্তার ফল। ঘটনার সুরু হয় 1919 সালে জার্মেনীতে। ঐ বছরে বিশ্ববিখ্যাত লেন্স-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কার্ল ৎসাইস-এর তদানীন্তন অধ্যক্ষ বাউয়েরস্ফেল্ড এক সম্পূর্ণ অভিনব পন্থার পরিকল্পনা করেন। তাঁকে অবশ্য পূর্ববর্তী কয়েক বছর ধরে সর্বপ্রকারে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেন হাইডেলবার্গের বাডেন মানমন্দিরের ম্যাক্স ভোলফ্ ও মুনিখের ডয়েৎসে মিউজিয়ামের অসকার ফন্ মিলার। অতঃপর গভীর প্রত্যাশা ও তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে কাজ সুরু হয়ে যায়। কয়েক বছর পরে অসাধারণ যত্ন, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়—মানুষের হাজার হাজার বছরের স্বপ্ন অতীব সন্তোষজনকভাবে বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করে।

1923 সালে নির্মিত প্রথম আধুনিক প্ল্যানে-টেরিয়াম সীমাবদ্ধ এক অঞ্চলের আকাশকে নিখুঁত কৃত্রিম রূপদান করেছিল। পরে ভিলিগার প্রমুখ গবেষকেরা মূল কৌশলটিকে সম্প্রসারিত করেছেন। আধুনিক সার্বভৌম (Universal)

প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলের আকাশ রচনা করতে পারে

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম হচ্ছে গম্বুজাকৃতি ছাদযুক্ত একটি বৃত্তাকার কক্ষ আর তার মধ্যে বসানো আশ্চর্য ক্ষমতাশালী একটি প্রক্ষেপক যন্ত্র বা প্রজেক্টর এখানে মহাকাশ ও তার বিচিত্র ঘটনাবলীর প্রায় অবিকল প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করা যায়। কক্ষের মধ্যে স্থাপিত আসনে বসে দর্শক এখানে স্বল্প অবকাশের মধ্যে কৃত্রিম আকাশে (অর্থাৎ অর্ধ-গোলকাকৃতি ছাদের পটভূমিতে)
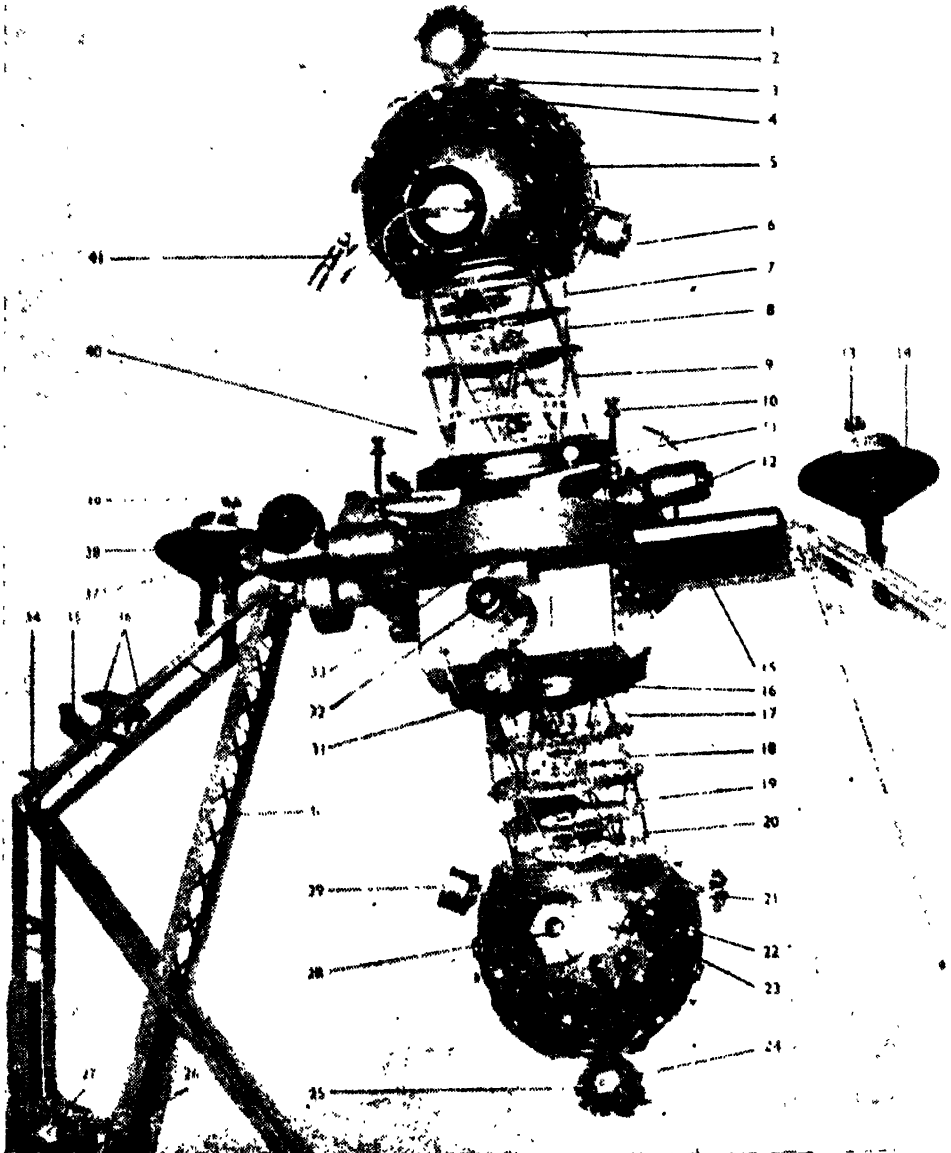
ৎসাইস সার্বভৌম (Universal) প্ল্যানেটেরিয়াম

1—15টি প্রক্ষেপক সংবলিত গোলক, যার সাহায্যে আকাশের প্রধান প্রধান মণ্ডলগুলির নাম ও অয়নচলনের গতিবৃত্ত রেখা নির্দেশ করা যায় (উঃ গোলার্ধের জন্যে, 2—1-এর প্রক্ষেপকের স্বয়ংক্রিয়

ঢাক্‌না, 3—5-এর প্রক্ষেপকের স্বয়ংক্রিয় ঢাকনা, 4—বাতাস চলাচলের পথ, 5—16টি প্রক্ষেপক সংবলিত গোলক, যা প্রায় 4000 তারকার প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে (উঃ গোঃ), 6—ছায়াপথ, প্রক্ষেপক (উঃ গোঃ), 7—শনিগ্রহের জন্য দুটি প্রক্ষেপক, 8—সূর্যের জন্যে 4টি প্রক্ষেপক, 9—চন্দ্রের জন্যে দুটি প্রক্ষেপক, 10—জ্যোতির্বিজ্ঞানী-কল্পিত কয়েকটি নভোবৃত্তের প্রক্ষেপকের যন্ত্রাংশ, 11—অয়ন-চলনের গতি সঞ্চালক যন্ত্রাংশের ঢাক্‌না (উঃ গোঃ), 12—তারিখ নির্দেশক প্রক্ষেপক, 13—10-এর অনুরূপ (অপর একটি বৃত্তের জন্যে), 14—কৃত্রিম আকাশে আলোক সৃষ্টিকারী যন্ত্র, 15—ভূপৃষ্ঠে অক্ষাংশ-পরিবর্তন অনুসারে আকাশে পরিবর্তন সৃষ্টিকারী যন্ত্রাংশের ঢাক্‌না, 16—11-এর অনুরূপ (দঃ গোঃ), 17—বুধগ্রহের জন্যে দুটি প্রক্ষেপক, 18—শুক্রগ্রহের জন্যে 2টি প্রক্ষেপক, 19—মঙ্গলগ্রহের জন্যে 2টি প্রক্ষেপক, 20—বৃহস্পতিগ্রহের জন্য 2টি প্রক্ষেপক, 21—বার্ষিক লম্বন (Annual Parallax) ও আলোর অপেরণ (Aberration of light)-এর জন্যে আকাশে তারকার অল্প স্থান পরিবর্তন নির্দেশক প্রক্ষেপক (বিশেষ তারকা লুব্ধকের ক্ষেত্রে) 22—অস্থির প্রভার (Variable) তারকা মীরা (বা ওমেগো সেটি)-র প্রক্ষেপক, 23—5-এর অনুরূপ (দঃ গোঃ), 24—1-এর অনুরূপ (দঃ গোঃ), 25—মণ্ডলের নাম—প্রক্ষেপকের আলোক-কোটর (Bulb-Socket), 26—নভোমধ্যরেখার জন্যে 2টি প্রক্ষেপক (দঃ গোঃ), 27—26-এর অনুরূপ (উঃ গোঃ), 28—তারকা প্রক্ষেপকের আলোক কোটর, 29—ছায়াপথ প্রক্ষেপক (দঃ গোঃ), 30—তারবাহী কাঠামো, 31—6টি প্রক্ষেপক সংবলিত গোলক, যার সাহায্যে ক্রান্তিবৃত্ত, নভোবিষুবরেখা প্রভৃতি নির্দেশিত হয় (উঃ গোঃ), 32—আকাশে পৃথিবীর বার্ষিক গতিজনিত পরিবর্তন সৃষ্টিকারক যন্ত্র, 33—আকাশে পৃথিবীর দৈনিক গতিজনিত পরিবর্তন সৃষ্টিকারক যন্ত্রাংশের ঢাক্‌না, 34—দিকচক্ররেখার আলোক সৃষ্টিকারী যন্ত্র (নীলাভ), 35—স্পুৎনিক 1-এর প্রক্ষেপক, 36—34-এর অনুরূপ (রক্তিমাভ), 37—অক্ষাংশ নির্দেশক, 38—14-এর অনুরূপ, 39—10-এর অনুরূপ (অপর একটি বৃত্তের জন্যে), 40—10-এর অনুরূপ, 41—অস্থির প্রভার তারকা প্রক্ষেপক।

সূর্যের (আপাত) গতি, দিন-রাত্রির অনুবর্তন, স্থান-কাল-ভেদে আকাশের পরিবর্তন, অয়ন-চলন (Precession of the Equinoxes), চন্দ্র-গ্রহ-তারা প্রভৃতির আনাগোনা, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ, সূর্যের চারদিকে গ্রহের আবর্তন, উল্কাপাত, ধূমকেতুর আকস্মিক আবির্ভাব-অন্তর্ধান প্রভৃতি যাবতীয় জ্যোতিষিক ঘটনা সহজেই নিরীক্ষণ এবং অনুধাবন করতে পারেন।

সর্বাধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামে আবার শুধু দূর আকাশের ঘটনাই নয়, সঞ্চরমান মেঘমালা, মেরু-জ্যোতি (Aurora) প্রভৃতি নিকট আকাশের ঘটনাবলীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর শুধু প্রাকৃতিক জ্যোতিষ্কই নয়, গ্রহণ করা হয়েছে স্পুৎনিক-1 প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জ্যোতিষ্ককেও।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী কোন পরিচালক সুইচ, রেগুলেটার প্রভৃতির সাহায্যে প্রক্ষেপক যন্ত্রটিকে নানাভাবে চালিত করেন এবং ইচ্ছামত দ্রুত অথবা মন্থর (কিন্তু সমানুপাতিক) বেগে নানা ঘটনা সংঘটিত করে তার ধারাবিবরণী বা ব্যাখ্যা দেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যাপ্রসঙ্গে জ্ঞানলাভ করবার এবং চিত্ত-বিনোদন করবার এ-এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায়—যেন একই আধারে রঙ্গালয় ও বিদ্যালয়।

শিক্ষার্থী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষে আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম অশেষ সহায়ক। এমন অনেক জ্যোতিষিক ঘটনা আছে, কথায় বা ছবির মাধ্যমে যার ব্যাখ্যা কিছুতেই সহজবোধ্য হয় না; আকাশে এমন কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, যা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায় না, কোন কোন ঘটনা আবার ঘটে দীর্ঘকালের ব্যবধানে। কিন্তু আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের কাছে স্থান-কালঘটিত কোন বাধাই বাধা নয়। কয়েক সেকেণ্ড নয়তো কয়েক মিনিট নয়তো বা

ঊর্ধ্বপক্ষে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর যে-কোন জায়গা থেকে দৃষ্ট যে-কোন জ্যোতিবিক ঘটনা আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম কক্ষে বসে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

প্রকৃত আকাশের শোভা উপভোগের পথে আধুনিক মানুষের অন্য বাধাও আছে, যেমন—শহর জনপদের অত্যুজ্জ্বল কৃত্রিম আলো, কল-কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি। এই বাধাগুলি মানুষেরই সৃষ্টি, আর মানুষ-সৃষ্ট প্ল্যানেটেরিয়ামই সে বাধা পরোক্ষভাবে অপসারিত করেছে। গল্প আছে, বড় শহরবাসী বন্ধুর সাদর আমন্ত্রণে শহরে এসে কয়েক দিন কাটিয়ে শহর জীবনের নানা অভিনব, চমকপ্রদ, চোখ-ধাঁধানো রূপ দেখে হীনমন্যতাপীড়িত গ্রাম্য বন্ধু প্রথমে তুলনা-মূলক চিন্তায় খুব অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। পরে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে জোরের সঙ্গে তারস্বরে তোলে আকাশের শোভার কথা, বলে—সেখানে গ্রামের কাছে শহরের নিদারুণ পরাজয় অনস্বীকার্য। কিন্তু হায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুর সহগামী হয়ে ঐ শহরের প্ল্যানে-টেরিয়াম পরিদর্শন করে তাকে তার অস্বস্তি-বোধ ফিরে পেতে হলো।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের প্রাণকেন্দ্র তার প্রক্ষেপক যন্ত্র-সমষ্টি। এখানে একটি অর্ধ-গোলক থাকে, কিন্তু তার ভূমিকা গৌণ। এখানে নানাবিধ জ্যোতিষ্কের অবিকল প্রতিকৃতি সৃষ্টি করা হয় আলোকরশ্মি প্রক্ষেপের মাধ্যমে। এখানে আবর্তিত হয় গোলক নয়, ডাম্বেলাকৃতির মূল প্রক্ষেপক যন্ত্রটি। শুধু আবর্তনই অবশ্য নয়, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক শক্তির মাধ্যমে এখানে মূল প্রক্ষেপক যন্ত্রটিকে অন্যান্য নানা প্রকার গতি প্রদানও করা যায়, আর তদনুযায়ী কৃত্রিম আকাশের পটভূমিতে নানা জ্যোতিবিক ঘটনার প্রতিফলন ঘটে।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়ামের নির্মাণ-প্রণালী একান্ত জটিল এবং অত্যন্ত শ্রম ও ব্যয়-সাপেক্ষ। এখনও পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌম প্ল্যানেটেরিয়ামের সংখ্যা পঞ্চাশের মত, তার মধ্যে একটি আছে ভারতবর্ষে। এটি কলকাতায় 1962 সালে স্থাপিত হয়। 23 মিটার (বা 75·5 ফুট) ব্যাসের গম্বুজযুক্ত এ প্ল্যানেটেরিয়ামটি পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম। বৃহত্তর ব্যাস-বিশিষ্ট প্ল্যানেটেরিয়াম পৃথিবীতে একটিই আছে—মস্কোয়, সেটির ব্যাস 25 মিটার (বা 82 ফুট)।

শতাধিক লেন্সযুক্ত, 29000 যন্ত্রাংশ সংবলিত, অসংখ্য সুইচ, গিয়ার, রিওষ্ট্যাট, রিলে প্রভৃতির দ্বারা চালিত আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম প্রক্ষেপক যন্ত্র আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি। এ-যন্ত্র কতদূর সফল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু জানেন, এই যন্ত্রসৃষ্ট আকাশ যে-অনুভূতির সঞ্চার করে সে অনুভূতি আসল আকাশ-অনুপ্রাণিত বিস্ময়-ভয়-নিঃসঙ্গতা-অকিঞ্চিৎকরতা বৈরাগ্যমিশ্রিত বিচিত্র অনুভূতিরই সগোত্র।

পুষ্টি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

নীলরতন ধর*

ক্ষুধা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন সহচর। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে যদি আমরা অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের বহুমূত্র বা বাত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। পক্ষান্তরে আমাদের খাদ্য যদি উপযুক্ত পরিমাণ বা সুষম না হয়, তা হলে অপুষ্টি ও নানা রোগে আমাদের ভুগতে হবে। এই কারণে মানুষের প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে যথোপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ।

মানবসভ্যতার আদিকালে খাদ্য সংগ্রহ করা ছিল বেশ কঠিন। বর্তমান সময়েও জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে বিশ্বের খাদ্যপরিস্থিতি প্রত্যেকের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল যেমন খাদ্য, আমাদের আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও তেমনি খাদ্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন জাতি, বিশেষতঃ বৃহত্তর জাতি, মানুষের প্রাচীনতম শত্রু ক্ষুধাকে কখনও জয় করতে পারে নি। অনাহারের সকল পর্যায়ে মানুষকে দেখেছেন এমন একজন সৈনিকের মতে—মানুষ যদি এক দিনের জন্যে খেতে না পায়, তাহলে সে মিথ্যা কথা বলবে; দু-দিন খেতে না পেলে চুরি করবে আর যদি তিন দিন অনাহারে থাকে, তাহলে হত্যা করবে।

খাদ্য কোন ভেষজ নয় এবং কোন রাসায়নিক ফরমুলার ভিত্তিতে কারো জন্যে খাদ্য বরাদ্দ করা হয় না। তবে খাদ্যের অভাবে বা উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন না করলে যে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে বা স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ ঘটতে পারে, তা সকলের জানা দরকার।

পুষ্টি-বিজ্ঞান

প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী ল্যাভোসিয়ের (Lavoisier) 1781 সালে পুষ্টি-বিজ্ঞানের প্রবর্তন করে বলেন, জীবনধারণ হচ্ছে রাসায়নিক প্রক্রিয়া। পরীক্ষার সাহায্যে তিনি দেখান, দহনক্রিয়া হচ্ছে দাহ্য বস্তু ও বায়ুর অক্সিজেনের মধ্যে একটি রাসায়নিক রূপান্তর। তিনি আরও বলেন, কাঠ প্রজ্বলিত হয়ে যেমন আমাদের শক্তি সরবরাহ করে, তেমনি আমাদের দেহের অভ্যন্তরে 37° ডিগ্রী তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য মৃদু গতিতে দগ্ধ হয়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজের শক্তি সরবরাহ করে। তিনি আরও প্রমাণ করেন, ক্যালোরিমিটারে অক্সিজেনের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্য দগ্ধ হয়ে যে পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, মানুষের দেহেও সেই সমপরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়।

ল্যাভোসিয়ের, ল্যাপলাস এবং লিবিগ প্রমাণ করেন যে, দহনকার্যের জন্যে কি পরিমাণ অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেটা নির্ভর করে খাদ্যদ্রব্যের রাসায়নিক সংযুতির উপর।

ইউরোপীয়েরা পুষ্টি-বিজ্ঞানে প্রাণিজ প্রোটিনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। এর প্রধান কারণ—তাঁরা মাছ, মাংস, ডিম এবং পনীর প্রচুর পরিমাণে আহার করেন। ইউরোপের অধিকাংশ শহরে প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবহার হচ্ছে 110-120 গ্রাম প্রতি দিন প্রতি জনে। পক্ষান্তরে, দরিদ্রতর দেশগুলিতে জনপ্রতি দৈনন্দিন প্রোটিনের ব্যবহার এর তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে ভারত, শ্রীলঙ্কা (সিংহল)

---

*শীলা ধর ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ

ও পাকিস্তানে জন প্রতি দৈনন্দিন প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবহার হচ্ছে 5-7 গ্র্যাম।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকে পৃথিবীর 320 কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র 50-60 কোটি মানুষ প্রাণিজ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পায় না এবং অপুষ্টিতে ভোগে—এই বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য

তাছাড়া, অসম খাদ্য অর্থাৎ খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন অপ্রতুল খাদ্য প্রায়শঃ আহার করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গবাদিপশুর অভাবের ফলে দুধের সরবরাহ কম হয়ে থাকে। অথচ দুধ হচ্ছে ভিটামিন ও সহজে আত্তীকৃত খনিজ পদার্থ-সমৃদ্ধ খাদ্য। দুধ, কড্‌লিভার তেল এবং অন্যান্য মাছের তেল ভিটামিন A ও D-তে সমৃদ্ধ। এজন্যে এই জিনিষগুলি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে চোখের ব্যাধি প্রতিরোধ করা যায় ও যথোপযুক্ত অস্থি গঠনে সাহায্য করে। চালের তুলনায় গম অনেক উন্নততর খাদ্য, কারণ গম হচ্ছে প্রোটিন, খনিজ পদার্থ এবং B শ্রেণীর ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এই কারণে সারা বিশ্বে মানুষের খাদ্যতালিকায় গমই প্রধান কার্বোহাইড্রেট উপকরণ হওয়া উচিত। লেখকের মতে অনুন্নত দেশগুলিতে গম, আলু এবং অন্যান্য সব্‌জি, অল্প পরিমাণ দুধ এবং কিছু পরিমাণ কাঁচা শাক-সব্‌জি ও কলা দিয়ে সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য বজায় রাখা যায়।

সাম্প্রতিক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বিত্তবান ব্যক্তিরা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত অফিসে ও ঘর-বাড়িতে বাস করেন, কোন প্রকার শরীরচর্চা না করে এবং প্রচুর পরিমাণে ডিম, মাছ, মাংস সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করে 63-64 বয়সকালের মধ্যে থম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই ঘটনার প্রধান কারণ হচ্ছে—মাছ, মাংস, ডিমে বিদ্যমান সম্পৃক্ত স্নেহপদার্থ কোলেস্টেরলও বহন করে এবং জমে গিয়ে ধমনী ও শিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রায় 50 বছর আগে ধনী লোকেরা অসম্পৃক্ত স্নেহজাত অ্যাসিড সমৃদ্ধ তেল ব্যবহার করতেন না। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের ধনী লোকেরাও মার্গারিন ও অন্যান্য তেলজাত দ্রব্য গ্রহণ করছেন।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে বহুমূত্র হচ্ছে আর একটি প্রধান ব্যাধি। অত্যধিক আহার, বিশেষতঃ কার্বোহাইড্রেট আহার এবং তার ফলে অগ্ন্যাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই ব্যাধি ঘটে থাকে।

সারা বিশ্বে সমীক্ষা করে দেখা গেছে, বিত্তবান লোকদের মধ্যে বহুমূত্রের প্রাদুর্ভাব বেশী। আশা করা যায়, পৃথিবীতে খাদ্যাভাবের দরুণ এই ব্যাধির প্রকোপ কমে আসবে।

মশলা বা মাছ ইত্যাদির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ চাল আত্তীকরণ করলে এবং খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনসমৃদ্ধ শাক-সব্‌জি গ্রহণ না করলে দেহে অ্যাসিডের সৃষ্টি হয় এবং প্রোটিনের দ্বারা গঠিত দেহকোষ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হয়ে এই অ্যাসিড দ্রবীভূত হয় এবং তার ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এই দেশে চালভোজীদের মধ্যে এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রে প্রতিকার হচ্ছে অধিক পরিমাণে দুধ ও শাক-সব্‌জি আহার।

উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ গ্রহণ না করলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ হতে পারে না বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। ভারতের মত নিরামিষভোজীদের দেশে দৈনন্দিন এক লিটার পরিমাণ দুধ গ্রহণ করে এটা পূরণ করা হয়ে থাকে। এক লিটার দুধে 35 গ্র্যাম পরিমাণ প্রাণিজ প্রোটিন বর্তমান থাকে, যা

খাদ্য-তালিকা

দেশ	জনসংখ্যা মিলিয়নে	ক্যালোরি	মোট প্রোটিন গ্র্যামে	প্রাণিজ প্রোটিন গ্র্যামে	চর্বি গ্র্যামে
1. ভারত	520	1,620	42·9	56	22·6
2. সিংহল	7·94	1,880	46	10	33
3. ফিলিপাইন্স্	21·04	1,960	42·6	9·6	26·8
4. জাপান	84·9	1,970	57·9	11·8	16·5
5. পাকিস্তান	80	2,020	52	11	...
6. হণ্ডুরাস	1·37	2,030	57	18	53·7
7. চীন	700	2,050	56	11	33
8. পেরু	8·51	2,080	54·4	12·2	36·3
9. পর্তুগাল	8·5	2 110	66	22	...
10. ভেনেজুয়েলা	5 1	2,280	58·6	21·2	45
11 চিলি	5·8	2,340	71·2	23·9	47·8
12. ব্রেজিল	53·4	2,350	59·4	17·1	45.7
13. মিশর	20·81	2,360	70·1	11·4	35·2
14. দক্ষিণ রোডেশিয়া	2·2	2,450	75·7	16	52·6
15. পূর্ব জার্মেনী	20	2,460	72	19	...
16. পশ্চিম জার্মেনী	50·5	2,765	75·8	36·9	100·8
17. গ্রীস	7·94	2,495	76·8	17·1	64·6
18. ইটালী	46·8	2,510	78	20·5	57·1
19. তুরস্ক	21·4	2,550	81·2	13·1	41·7
20. অষ্ট্রিয়া	6·93	2,660	77·7	35·7	87·8
21. দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন	12·9	2 705	73·4	25·9	59·9
22. পোল্যাণ্ড	24	2,710	79	23	...
23. যুগোশ্লাভিয়া	16·4	2,710	86	20	59
24. ফ্রান্স	43·45	2,780	94·2	43·5	88·1
25. উরুগুয়ে	2·4	2,904	98·8	67	126.2
26. বেলজিয়াম-লুক্সেমবার্গ ইকনমিক ইউনিয়ন	9	2,930	85·8	39·4	101·6
27. ক্যানাডা	14·3	3,007	90·4	54·4	123·5
28. ইউ. এস. এস. আর	265	3,020	97	25	...
29. নরওয়ে	3·31	3,060	96·6	53 9	125·3
30. যুক্তরাজ্য	50·4	3,080	85·3	43·4	123·1
31. সুইডেন	7·16	3,090	93	59	127
32. আর্জেন্টিনা	17·6	3,110	98·4	63·1	107·1
33. ইউ. এস. এ	225	3,117	90·1	60·7	135
34. সুইজারল্যাণ্ড	4·83	3,180	95·9	52	113·5
35. ডেনমার্ক	4·32	3,225	91	51	140
36. অষ্ট্রেলিয়া	8·54	3,290	94·8	62·5	122·1
37. নিউজীল্যাণ্ড	1 95	3,380	102·9	69·4	148·7
38. আয়ারল্যাণ্ড	2·96	3,480	96·3	48·5	117.6

স্বাস্থ্য অটুট রাখবার পক্ষে পর্যাপ্ত। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, দুধ, কাঁচা শাক-সব্‌জি, মূলা ও কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়ার ফলে ভারতে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য বজায় থাকে। কিন্তু বর্তমানে দুধের অভাবে এই অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এজন্যে শিল্পোন্নত দেশগুলি থেকে বহুল পরিমাণে গুঁড়া দুধ (প্রাণিজ প্রোটিনে সমৃদ্ধ) কিনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ও হাসপাতালে রোগীদের সরবরাহ করা উচিত। দুধ, গুঁড়া দুধ এবং ডিম ছাড়া এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার এবং তাথেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

প্রোটিনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

বিজ্ঞানীরা বলেন, দেহকোষের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে গতিতে তারা কোন না কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদন করে ; যেমন— পেশীকোষের দ্বারা প্রোটিন সংশ্লেষণের গতি যকৃৎ-কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণ গতির তুলনায় অনেক কম।

জীবন্ত কোষের গঠন ও তার কার্যকারিতায় প্রোটিনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন-ক্রিয়ায় কোষের রাসায়নিক কার্য সম্পাদনের অধিকাংশ পর্যায়ের সঙ্গে এটি জড়িত। আমরা এখন জানতে পেরেছি, বহু এনজাইম এবং হর্মোন বা অক্সিজেন-বাহক হচ্ছে প্রোটিন। দেহের কোন গুরুত্বপূর্ণ শারীরতাত্ত্বিক কাজই প্রোটিন ছাড়া কদাচিৎ সম্পাদিত হতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য শারীরতত্ত্ববিদেরা সর্বদা খাদ্যের উপকরণ হিসাবে প্রোটিনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কিন্তু সরলতম আহার্য, যা দেহের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারে, তা হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিনের সংমিশ্রণে গঠিত খাদ্যদ্রব্য

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও খাদ্যসমস্যা

1966 সালের সেপ্টেম্বরে এবারডিনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মৃত্তিকা-বিজ্ঞান সম্মেলনে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা 320 কোটির তুলনায় এই শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা দাঁড়াবে 600 কোটি। সেই সঙ্গে এটাও প্রকাশ যে, বিভিন্ন জাতির খাদ্যমান থেকে দেখা যায়, বেশীর ভাগ মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে এবং উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীরাই কেবল যথোপযুক্ত খাদ্য পায়। এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বর্তমান শতাব্দীতে 80 কোটি মানুষ অনাহারের ফলে মৃত্যুর কবলে পড়তে পারে।

খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্যে আমাদের কঠিন পরিশ্রম করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বাস্থ্যকর এমন খাদ্য প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবন করতে হবে, যা সহজলভ্য অথচ খুব বেশী ব্যয়বহুল নয়—এমন উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত করা যাবে।

[মূল ইংরেজী প্রবন্ধের সারাংশ অনুবাদ]

কলকাতায় ভাগীরথীর দ্বিতীয় সেতু

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর অধিকাংশ মহানগরী নদীর কূলে অবস্থিত। সময়ের সঙ্গে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও শিল্পপ্রসারের ফলে শহরের সীমানা ক্রমশঃ বেড়েই চলে ও নদীর দুই পারে নগরী প্রসারিত হতে থাকে ও পরস্পর সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয়। কথায় বলে একা নদী বিশ ক্রোশ। সেই নদী পার হবার জন্যে সেতু নির্মাণ ও শহর সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান দ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের জন্যে কম করে বাইশটি যান চলাচলের সেতু এবং তাছাড়া পাতাল রেল ও দ্রুতগতিশীল যানের জন্যে নদীতলে সুড়ঙ্গ আছে। সেতুগুলির মধ্যে উত্তারের (Span) মাপকাঠিতে প্রধান হলো হাডসন নদীর উপর ওয়াশিংটন সেতু (উত্তার 3500'5 ফুট ও নির্মাণকাল 1903 খৃষ্টাব্দ), ট্রাইবারো সেতু (1380'-0", 1935 খৃঃ), হেলগেট সেতু (1916'-0", 1907 খৃষ্টাব্দ), কুইনস্‌বারো সেতু (1182'-0"; 1903 খৃঃ), উইলিয়ামস্‌বার্গ সেতু (1600'-0", 1933 খৃঃ) ম্যানহাটান সেতু (1470'-0"; 1910 খৃঃ), ব্রুকলীন সেতু (1595-5'; 1883 খৃঃ), ভেরোনা নেরোস্‌ সেতু (4260'-0", 1964 খৃঃ)। একথা বলবার উদ্দেশ্য হলো যে, এতগুলি এত বড় বড় সেতু এত অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি মহান নগরীতে গঠিত হয়েছে, যার নির্মাণব্যয় কত অধিক, যেখানে 1500'-0" উত্তারের হুগলী নদীর উপর নতুন সেতুটির নির্মাণ-ব্যয় পড়বে আনুমানিক 29 কোটি টাকা। বৃহত্তর লণ্ডন মহানগরীতে টেমস নদীর উপর কম করে পঁচিশটি সেতু, রোম মহানগরীতে টাইবার নদীর উপর ন্যূনাধিক ছাব্বিশটি সেতু, আর প্যারিস মহানগরীতে শীন নদীর উপর কম করে তিরিশটি সেতু বিদ্যমান। তবে টেমস, টাইবার কি শীন তেমন প্রশস্ত নদী নয় সত্য। বহু জ্যায়ের টেমস নদীর উপর সেতু নির্মাণের ব্যয় দীর্ঘ উত্তারের সেতুর তুলনায় অল্প।

কলকাতায় বর্তমানে যে 'নতুন হাওড়া সেতু'টি বিদ্যমান, সেটি প্রসারণী ও ঝুলনের সমন্বয়ে গঠিত, যার নদীবক্ষে প্রসারণী বাহু 468 ফুট করে আর ঝুলন অংশটি 564 ফুট। নতুন হাওড়া সেতু বা রবীন্দ্র সেতু নির্মাণান্তে ভাবা গিয়েছিল যে, বহু দিন আর নতুন সেতুর দরকার হবে না। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় রবীন্দ্র সেতু নির্মাণ শেষ হয়। পনেরো বছর যেতে না যেতেই এর পরিবাহী ক্ষমতা অতিক্রান্ত হওয়ায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যেমন—অফিসে আসা যাওয়ার সময় লরী চলবে না; হাতঠেলা গাড়ী চলবে না ; ছাগল, ভেড়া, গরু ভিড়ের সময় নিয়ে যেতে পারবে না ইত্যাদি। যার ফলে আজকাল আর তেমন ভিড় হয় না সেতুর উপর, কিন্তু সেতুতে ওঠবার মুখে আজও ভিড় হয়।

হাওড়ায় প্রথম ভাসা পুলের পরিকল্পনার কথা ভাবা হয় যখন হাওড়ায় রেল লাইন পাতা (1855—1856) সুরু। এরপর এলো সিপাহী বিদ্রোহ 1857 খৃষ্টাব্দে। 1868 খৃষ্টাব্দে এই পরিকল্পনা পুনরুজ্জীবিত হয়, 1871 খৃষ্টাব্দে হাওড়া সেতুর আইন পাশ হয় ও 1874 সালে £ 220,000 ব্যয়ে 1528 ফুট উত্তারের এই কাঠের সেতুটি নির্মিত হয়। এতে 48 ফুট চওড়া পথের দু-ধারে 7 ফুট চওড়া ফুটপাত ছিল। মাঝখানের কিয়দংশ জাহাজ চলাচলের জন্যে বিশেষতঃ রাত্রি-

বেলায় খোলা হতো। এটি বর্তমান রবীন্দ্র সেতুর দক্ষিণে হাওড়া ষ্টেশন ও হ্যারিসন রোডের সঙ্গে এক সরল রেখায় যুক্ত ছিল বলা যেতে পারে। আগে এই ভাসা পুলে 'টোল' আদায় হতো, পরে তা বন্ধ হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, নতুন রবীন্দ্র সেতু এটি রেল চলাচলের জন্যে 1200 ফুট উত্তারের। এটির নির্মাণকার্য শেষ হয় 1886 খৃষ্টাব্দে 22শে ডিসেম্বর। দ্বিতীয়টি হলো বিবেকানন্দ সেতু। আগে একে বালি ব্রীজ বা উইলিংডন সেতু বলা হতো। এতে দু-সার ট্রেন ও দু-পাশে যান চলা-

দ্বিতীয় হুগলী সেতু
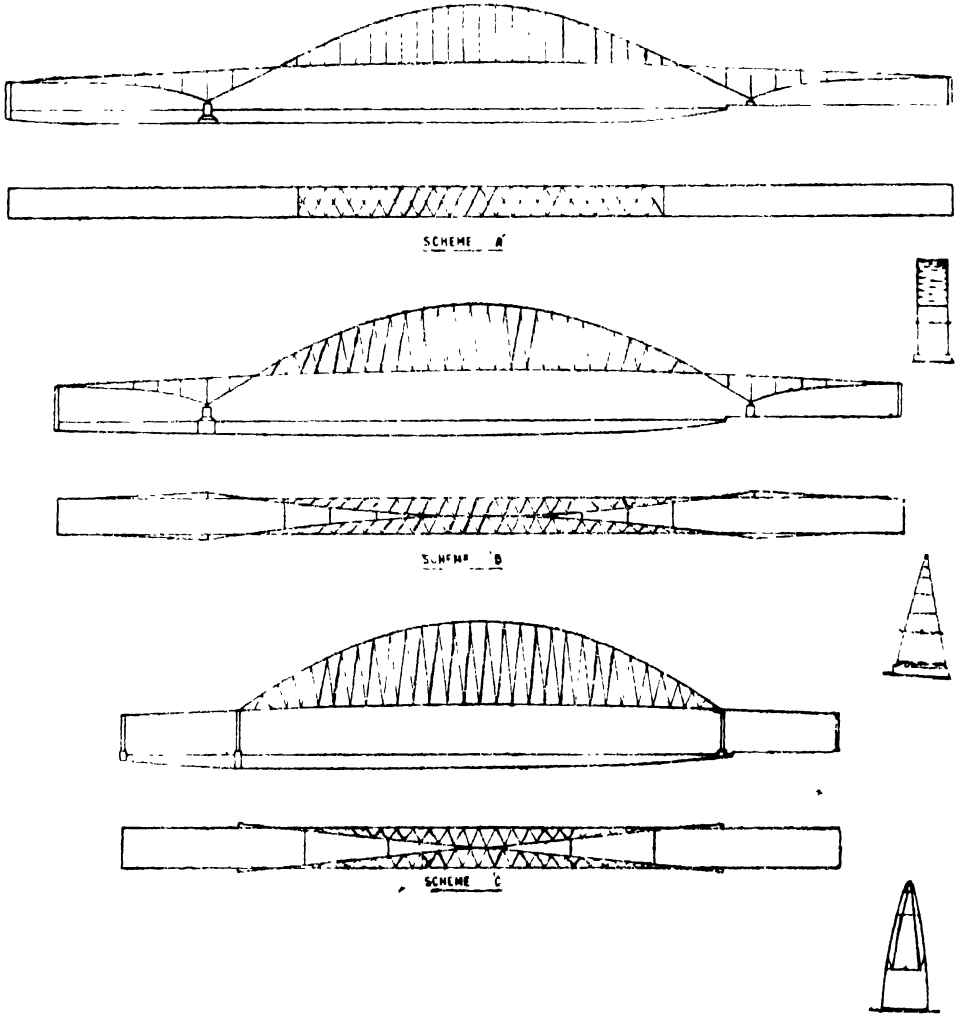
হওয়ায় এটিকে কাছাকাছি অন্য কোথাও কাজে না লাগিয়ে বিক্রী করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে বৃহত্তর কলকাতায় (C.M.D অঞ্চলে) তিনটি সেতু। প্রথমটি হলো হুগলীর 'জুবিলী সেতু', চলের রাস্তা ও দু-ধারে ফুটপাথ রয়েছে। এটিতে শুল্ক আদায় করা হয়। এখন পথচারীদের কাছে শুল্ক আদায় বন্ধ হয়েছে।

বর্তমানে তৃতীয় সেতুটিতে (রবীন্দ্র সেতু)

গত পনেরো বছর ভিড়ের জন্যে যান চলাচলের অত্যন্ত বিলম্ব হতো ও লোকের অসুবিধার অন্ত ছিল না। কলকাতার অনেক লোককে নানা সময়ে সন্ধ্যায় বহু দূরপাল্লার ট্রেন ফেল করতে হয়েছে। অকারণ শত শত গাড়ীর পেট্রোল পোড়াতে হয়েছে। তার উপর রয়েছে উদ্বিগ্নতা, মানসিক যন্ত্রণাভোগ, যার মূল্যায়ন অর্থ দিয়ে করা সম্ভব নয়। হাওড়া উন্নয়ন সংস্থা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচী রূপায়ণ ছাড়াও হাওড়া সেতুর এক বিকল্প সেতু নির্মাণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে 1959 সালে বর্তমান রবীন্দ্র সেতুর উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের যান চলাচলের মান নির্ণয় করা হয়। এর মধ্যে ছিল বাস, লরী, ট্রাম, ট্রেলারযুক্ত লরী, প্রাইভেট মোটর, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, সাইকেল রিক্সা, সাইকেল ভ্যান, গো-মহিষ যান, মানুষে-ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি। এর ফলে দেখা যায় যে, বর্তমান সেতুর যান ও জন চলাচল সঙ্কুলান ক্ষমতা অতিক্রান্ত হওয়ায় নতুন সেতুর প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। বিংশ শতাব্দীর সপ্তদশকে C.M P.O স্থাপনের পর এবিষয়ে আমেরিকা থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে আরও বিশদ সমীক্ষা ও বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেতু নির্মাণের দায়িত্ব হুগলী 'ব্রীজ কমিশনারে'র। এতদিন কলকাতা পোর্ট কমিশনারই 'ব্রীজ কমিশনারের'ই কাজ করছিলেন। এবার দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর জন্যে যুক্তফ্রন্টের আমলে নতুন করে ব্রীজ কমিশনার গড়া হয়। এর সভাপতি হলেন বহু পরিচিত C. P. I কর্মী মণি সান্যাল।

1961 সালের 30শে নভেম্বর CMPO-এর নির্দেশ অনুসারে পোর্ট কমিশনারের কনসালটেন্ট, রেণ্ডেল, পামার ও ট্রিটন কোম্পানীকে বলা হলো নিম্নলিখিত শর্তে একটি প্রতিবেদন পাঠাতে, যার শর্তগুলি হলো এইরূপ :—

The most suitable location for a crossing and the type of facility (i.e. bridge or tunnel) is to be agreed with the Traffic and Transportation Consultants on the basis of data collected in traffic surveys at the time of the initiation of the work.

Due allowances is to be made for the projected volume of trans-river traffic in determining the required traffic capacity of the facility.

Estimates are to be prepared for construction, maintenance and operating costs for the facility.

1962 সালের জুন মাসে ঐ কোম্পানী সবুজ মলাটে বাঁধা একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পাঠান, যাতে ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তরে না দক্ষিণে সেতুটি হবে কিনা, সেতুটি উচ্চস্থিত সেতু হবে, না মাটির সঙ্গে অনুভূমিক হবে—তার আলোচনা আছে। সেতু কি আকৃতির হলে ভাল হয়, তার বিশ্লেষণ (তিনটি চিত্র সংযুক্ত), সুড়ঙ্গ হলেই বা কি হতো। তাছাড়া এতে আছে নদীতলের মাটির প্রকৃতি, hydraulic model নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল, সেতুর পাটাতনের উপর নানা বেগের ঝঞ্ঝার প্রভাব, মরচে-প্রতিরোধক নানা উপাদানের পরীক্ষা প্রভৃতি। বৃহৎ জাহাজ যাতায়াতের জন্যে নদীবক্ষে যেন কোন নদীস্তম্ভ নির্মিত না হয়, জলপৃষ্ঠ থেকে অন্যূন 125 ফুট ব্যবধান থাকে ও 1100 ফুট ব্যবধান দুই তীরস্তম্ভের মধ্যে থাকলেই চলবে। দীর্ঘ উত্তারের সেতুর আকৃতি মনোনয়নে নিম্নলিখিত পদ্ধতির বিষয় আলোচিত হয়েছে। দীর্ঘ উত্তারের সেতু সাধারণতঃ নিম্নলিখিত আকৃতির হয়—

1. ঝুলন সেতু
2. প্রসারণী সেতু
3. ধনুকাকৃতি সেতু বা খিলানাকৃতি সেতু

উপদেষ্টাদের মতে, ঝুলন সেতু গড়ের মাঠের

পরিপ্রেক্ষিতে বেমানান দেখাবে ও ঝুলন সেতুর ইস্পাতের তারের দড়া নদীর পাড়ে আটকাবার ব্যবস্থা অতি ব্যয়সাধ্য। এঁরা প্রসারণী সেতু সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন, যেমন—এই আমার বন্ধু দেশাই সাহেব এক আলোচনায় আমায় বলেন, যেহেতু 1500 ফুট উত্তারের সেতু হচ্ছে তখন নতুনটি বর্তমানের হুবহু নকল করলে অযথা ব্যয় ও সময় নষ্ট হয় না। যাই হোক
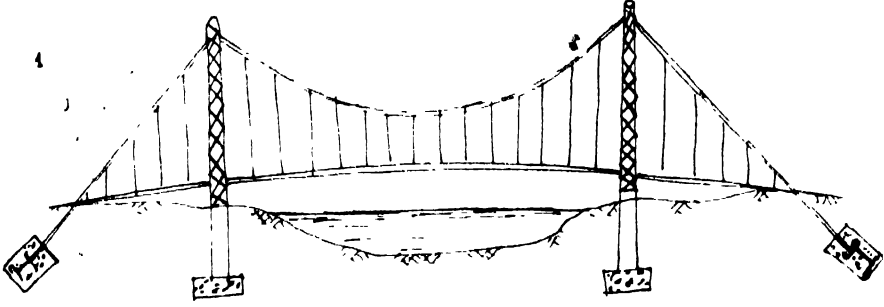
ঝুলন সেতু

প্রসারণী সেতু

ইস্পাতের রজ্জুর টানাদেওয়া বাক্স গার্ডার
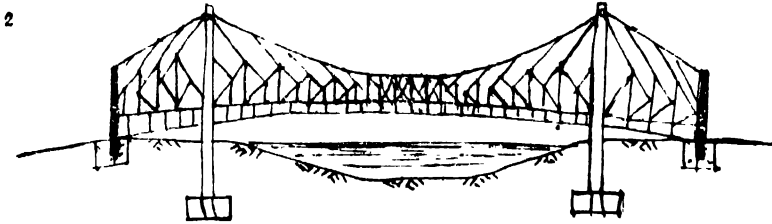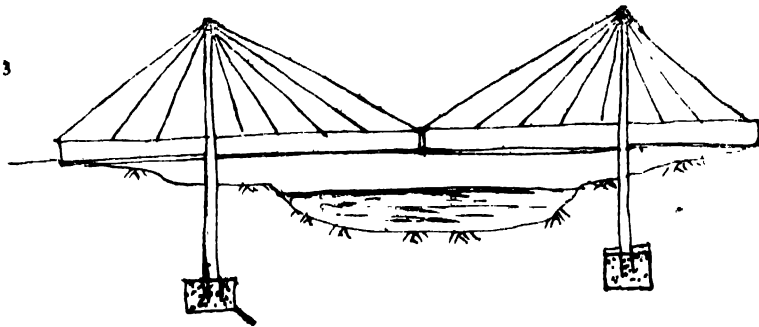
রকম সেতুতে অসংখ্য ইস্পাতের সেকসান লাগবে, যার খরচে প্রতিরোধক ব্যবস্থা ও উপযুক্ত মেরামতি ব্যবস্থা রাখা বর্তমানে দুঃসাধ্য এবং দেখতেও সুন্দর নয়। এরাই বর্তমান রবীন্দ্র সেতুর পরিকল্পক। উপদেষ্টাগণ ধনুকাকৃতি সেতুর স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করেন। তবে তাঁরা বলেন যে, খিলান সেতুর দুই তীরে ভূমিতে চাপ নেবার সাধারণ ক্ষমতা কলকাতার নরম মাটিতে নেই। তবে তার

ব্যতিক্রম করা যায় ধনুকাকৃতি সেতুকে জ্যা যুক্ত করলে, অর্থাৎ যাকে বলা হয় Tied Arch। এর ধরণ নানা রকমের হতে পারে যেমন

1. রাস্তার পাটাতন ধনুপৃষ্ঠ থেকে উল্লম্ব ইস্পাতের তারের দড়া দিয়ে ঝোলানো ও তার অবস্থিতি খিলান সুরু হবার কিছু উঁচুতে।

2. রাস্তার পাটাতন খিলানপৃষ্ঠের এক একটি বিন্দু থেকে ইস্পাতের মোটা রজ্জু দিয়ে তির্যকভাবে ঝোলানো।

3. উপরের মতই—তবে এর খিলানের সূত্রপাত জলের বহু উপর থেকে।

তৃতীয় পরিকল্পনাটিই প্রথমে গ্রাহ্য হয়। এর প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে কেন, হাইকোর্টের কাছে নয় কেন? উচ্চ কি নিম্ন লেভেলের হবে কেন — প্রভৃতি মহা জটিল তর্কের আবার উদ্ভব হয়। হাইকোর্টের কাছের জেটিতে কটাই বা জাহাজ ভেড়ে? অধিকাংশ জেটির গুদাম নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে; তবে হাই-কোর্টের কাছে এক উত্তারের সেতু না করে নদীর জলে বহু নদীস্তম্ভ লাগিয়ে সেতু তৈরি করতে অর্ধেকেরও কম খরচ হতো। সুড়ঙ্গের বিপক্ষে উপদেষ্টাদের যুক্তি বেশ জোরালো নয়, কারণ তাঁদের মতে এতে খরচ পড়বে দ্বিগুণ, নরম মাটিতে সুড়ঙ্গ খোঁড়াও দুঃসাধ্য ইত্যাদি।

প্রসারণী সেতু (প্রথম শ্রেণীর)

প্রসারণী সেতু (দ্বিতীয় শ্রেণীর)

পর বিশ্ব টেণ্ডার ডাকা হয়। তাতে বলা হয় যে, উপদেষ্টাদের প্রদর্শিত নক্সা অনুযায়ী অথবা নিজস্ব নতুন কোন পরিকল্পনার টেণ্ডারও তাঁরা দিতে পারেন।

রেণ্ডেল. পামার ও ট্রিটন যে Tied Arch সেতুর পরিকল্পনা ও আনুমানিক ব্যয় নির্ণয় করে-ছিলেন তা হলো :—

মূল সেতু নির্মাণ ব্যয়	406·4	লক্ষ টাকা
হাওড়ার দিকের সংযোগী অংশ	334·9	„
কলকাতার দিকের সংযোগী অংশ	455·9	„
	1197·2	„

এছাড়া জমির দাম, উপদেষ্টা, মোট ইঞ্জি-নিয়ারের প্রাপ্য ও আইনসংক্রান্ত ব্যয় এর মধ্যে ধরা নেই।

টেণ্ডার ডাকবার পর সেতুর স্থান নির্দেশ— সকল তর্কের অবসান করে সেতু নির্মিত হওয়া স্থির হলো প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে ও তা উচ্চস্থিত হবে।

1969 সালের রাজ্য সরকারের হুগলী ব্রীজ রিভার আইন পাশ হয় ও ঐ আইনানুসারে 1970 সালে হুগলী সেতু কমিশনার গঠিত হয়। অবশেষে টেণ্ডার বিশ্লেষণ ও বিচার করে স্থির হয় যে, সেতুর আকৃতি হবে Cable Stayed Rivetted Box Girder, যার অর্থ হলো যান ও যাত্রীবাহী পাটাতনটি হবে রিভেট মারা বাক্স গার্ডার। তাকে ধরে থাকবে তীরস্তম্ভের শিখর থেকে ইস্পাতের তারের রজ্জুরাশি। দুটি প্রতিষ্ঠান অনুরূপ ধরণের পরিকল্পনা দেয়। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টস ইণ্ডিয়া লিমিটেড—এটি ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান। এর সঙ্গে সংযুক্ত W. S. Atkins (P) Ltd. এঁদের উপদেষ্টা এঁরা

সেতুর এক পরিকল্পনা দিলেন যে, তীরস্তম্ভের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে ইস্পাতের রজ্জুর টানায় ঐ বাক্স গার্ডারের পাটাতনকে যথাস্থানে রাখা হবে। আর ভাগীরথী ব্রিজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানী (যা গ্যামন ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও ব্রেথওয়েট, বার্ন ও জেসপ কোম্পানীর যৌথ প্রতিষ্ঠান) এক অনুরূপ পরিকল্পনা দেন, যাতে ইস্পাতের তারের রজ্জুর টানা তীরস্তম্ভের শিখরদেশ থেকে বাক্স গার্ডারের বিভিন্ন স্থানে দেওয়া হবে। ব্রেথওয়েট, বার্ন ও জেসপ বর্তমান রবীন্দ্র সেতুটির নির্মাণপর্বে যুক্ত ছিলেন ও সেতুর বহু কাজ করেছেন। তাই নদীর উপরের মূল সেতুটির নির্মাণ ভার দেওয়া হয় ভাগীরথী ব্রিজ কনষ্ট্রাকশন কোম্পানীকে। ব্রিজ কমিশনার সমস্ত কাজই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস ইণ্ডিয়া লিমিটেডকে দেবার মনস্থ করেন। সরকারের সুপারিশে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস ইণ্ডিয়াকে দুই তীরের গঠন কাজের ভার ও BBCC-কে মূল সেতুটির গঠনের ভার দেওয়া হয়। সেই সুপারিশ অনুযায়ী কাজ বন্টন করা হয়েছে। মূল সেতুটির মুখ্য উত্তার হলো 455 মিটার (1500 ফুট), মোট দৈর্ঘ্য 819 মিটার (2700 ফুট) অর্থাৎ তীরের দিকে যেখানে টানা শেষ হয়েছে, সেই পর্যন্ত। সেতুর তলদেশ নদীর সর্বোচ্চ জলমাত্রা থেকে 34·3 মিটার (113′-0″) এবং তীরস্তম্ভের পাদদেশ থেকে 29·7 মিটার (98′-0″)—কেন না, সেতুর পথধারী পাটতন সেতুর মধ্যদেশ থেকে দুই তীরে ঢালে নেমে এসেছে। দুই তীরস্তম্ভের উচ্চতা 109·2 মিটার (360′-0″)। এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রসারণী বাহুটি তীরস্তম্ভের উচ্চতার দ্বিগুণ। এর বাক্স গার্ডারের গভীরতা হলো তিন মিটার। এই বাক্স গার্ডার তৈরি হবে রিভেট মেরে মেরে—ওয়েল্ডিং করে নয়। নতুন সেতুর পরিকল্পনা নিলাম, কিন্তু উন্নততর পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করলাম না। এই বাক্স গার্ডারের দুই পার্শ্বে 2·3 মিটার (7′-6″) করে চওড়া পায়ে চলবার পথ। তারে গায়ে 10·9 মিটার চওড়া যান চলাচলের পথ ও মাঝখানে 3·03 মিটার মধ্যক স্থান দ্বিমুখী যান চলাচলের বিভাজক হিসাবে রাখা হয়েছে। প্রতিদিকে তিন সারি করে যান চলাচল করতে পারবে। সেতুতে ওঠবার ঢাল 25 ভাগে এক ভাগ। এর নির্মাণকাল পাঁচ বছর নির্দেশ করা হয়েছে। এর আনুমানিক ব্যয় পড়বে 28 কোটি টাকা। জমি সংগ্রহের কাজে খেসারতি দিতে হবে আরও চার কোটি টাকা। হাওড়ার অংশটি 6নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটের কাছ থেকে সেতু সুরু হয়ে শিবপুর মহাশশ্মানের উপর দিয়ে হাওড়া দীনবন্ধু কলেজের উত্তরে মাটির সঙ্গে মিশবে। মূল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সেতুর সংযোজন পথের উপর দিয়ে যাবে। হাওড়ার দিকে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যে, গাড়ীর শুল্ক যাবার ও আসবার সময় আদায় করা হবে।

যে নতুন ধরণের সেতু নির্মিত হবে, তা পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম। এই রকম Cable stayed সেতু জার্মেনীতে ইস্পাতের বদলে রিএনফোর্সড্ কংক্রীটের করা হয়েছে। তবে তার উত্তার এর চেয়ে ঢের কম। যখন রবীন্দ্র সেতু নির্মিত হয়, তার বহু আগে বহু ভুলভ্রান্তির খেসারত দিয়ে রবীন্দ্র সেতুর চেয়ে বেশী উত্তারের সেতু পৃথিবীর নানা স্থানে তৈরি হয়েছিল। সেগুলি হলো—

1. ফার্থ অব ফোর্থের সেতু—1700 উত্তার ও নির্মাণকাল 1890।

2. ক্যানাডার কুইবেক সেতু—1800 উত্তার ও নির্মাণকাল 1917

এর পরে যদিও নিউ অরলিন্স্ সেতু নির্মিত হয়, যার উত্তার 1575 ফুট, নির্মাণকাল (1955-58)।

এই নতুন সেতুর পরিকল্পনায় কলকাতা

মহানগরী হবে পথিকৃৎ। যদি কিছু ভুলত্রুটি কোথাও থাকে, তা বইতে ও সইতে হবে হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনারকে। রবীন্দ্র সেতুর অনুরূপ কুইবেক সেতু নির্মাণে দু-দু-বার ব্যর্থতার মূল্য দিতে হয়েছিল। অবশেষে কুইবেক সেতু দীর্ঘতম প্রসারণী সেতু হিসাবে পরিচিত হয়। আজও তা সেন্ট লরেন্স নদীর উপর বিদ্যমান। অধুনা প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল, বায়ু-সুড়ঙ্গের পরীক্ষা প্রভৃতির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ব্যর্থতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, তবে বর্তমানে কর্মীদের কাজের প্রতি নিষ্ঠার মান কিছু শিথিল হয়েছে। গুরু দায়িত্বের উপলব্ধি ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা কম।

কাজ সুরু করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেতুর ভিত্তির শিলান্যাস করেছেন। বর্ষার পরই কাজ সুরু হবে।

স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সরল ও সুলভ সংস্করণ

ছয় বছর পূর্বের প্রচলিত স্টিরিওস্ক্যান (Stereoscan) নামক বিরাট আকারের বিশ্ববিখ্যাত স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের পরিবর্তে একটি বৃটিশ কোম্পানী Stereoscan 600 নামক অধিকতর সরল ও সুলভ মূল্যের একপ্রকার স্ক্যানিং ইলেকট্রন

মাইক্রস্কোপ তৈরি করেছেন। এই যন্ত্রটি যথোপযুক্তভাবে স্থাপন করা খুবই সহজ এবং পূর্বোক্ত যন্ত্রের চেয়ে এর কর্মক্ষমতাও বেশী। এর ভ্যাকুয়াম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং পরীক্ষামূলক বস্তুর ছবিটিও পরীক্ষকের সম্মুখে টেলিভিসনের পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা প্রসারে বিজ্ঞান পরিষদের ভূমিকা

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়*

একথা অবশ্যই স্বীকার্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় মিশনারীরাই এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার গোড়াপত্তন করেছিলেন। 1814 সালে উইলিয়াম কেরী এবং হ্যারিংটন দু-জনে পৃথকভাবে এদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুপরিকল্পিতভাবে আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজে (পরবর্তী কালে এই কলেজ পরিণত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে)। 1817 সালে প্রধানতঃ ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজে বিজ্ঞান-চর্চা আরম্ভ হবার পর থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনারও সূত্রপাত হয়। প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনা সুরু হয়েছিল। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। শ্রীরামপুর মিশন 1818 সালে প্রকাশিত তাঁদের 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকায় সর্বপ্রথম বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা সুরু করেন। তা-ছাড়া বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা ও ছাপার কাজে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা নানাভাবে সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, উইলিয়াম ইয়েট্‌স্‌, কার্শুসন, ফেলিক্স কেরী, পিয়ার্সন, জন ম্যাকে প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদেশীয়দের মধ্যে বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি বাংলায় একখানি ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে। ইউরোপীয় মিশনারীদের কৃত্রিম ভাষার আড়ষ্টতা দূর করে তিনি সরল ও সরস বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে বিজ্ঞান-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক যুগে আরও কয়েকজন মনীষী জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন, দেশ ও জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য এবং সর্বজনবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করতে না পারলে দেশবাসীকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা সকলে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

বাংলার যুগপ্রবর্তক সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (কার্তিক 1289) 'বঙ্গে বিজ্ঞান' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: 'যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?

* দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং, কলকাতা-29

সমাজে তাহাদের বৈজ্ঞানিক শক্তিই বা কতটুকু হইবে?...তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের নানা কথা প্রচারিত হতে থাকে এবং নানা লেখক এই কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।

এরপর বাংলা ভাষায় দেশের সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তিনি মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে ও বিজ্ঞান-চর্চা না করলে এদেশের মানুষকে প্রকৃত বিজ্ঞানমুখী করে তোলা অসম্ভব এবং দেশের প্রগতিও ত্বরান্বিত হবে না।

দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি নিজে যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন, তেমনি সমধর্মী বিজ্ঞান-সেবীদের কাছেও তিনি একান্ত আবেদন জানিয়েছিলেন—'বৈজ্ঞানিকেরা যাহা অর্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী।...যাহা কিছু তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকেরা) আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্বাচন করিলে চলিবে না।... সাধারণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের নিজের ভাষা ছাড়িয়া সাধারণের বোধ্য ভাষায় কথা কহিতে হইবে।'

এদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে রামেন্দ্রসুন্দর যে একান্ত প্রত্যাশা জানিয়েছিলেন—'সাধারণের সামনে এসে সাধারণের বোধ্য ভাষায় তাঁরা বিজ্ঞানের কথা প্রচার করুন'—সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পরবর্তী কালে তাঁদের পথে অনুবর্তী হয়েছিলেন জগদানন্দ রায়, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, রাজশেখর বসু, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, প্রিয়দারঞ্জন রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানসেবীরা।

কিন্তু এ সবই ছিল ব্যক্তিগত প্রয়াস মাত্র। কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস তখনও হয় নি। 1945 সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসবার পর 1947 সালে এসম্পর্কে প্রয়াস সুরু হয়। সে প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করে 1948 সালে জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

এই বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাস হচ্ছে—অধ্যাপক বসু যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, তখন তাঁর তত্ত্বাবধানে 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। কিন্তু 1945 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করে চলে আসেন, তখন এই পত্রিকাটি উঠে যাবার উপক্রম হয়। তাই তিনি কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন—কলকাতা থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারেন কিনা। এর উত্তরে ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী বলেন—'শুধু পত্রিকা প্রকাশ করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

আমাদের প্রয়োজন—একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের, যা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশন বা ফরাসী অ্যাকাডেমির আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে।...আপনি যদি আমাদের পুরোভাগে থাকেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের স্বপ্নকে রূপ দেবার প্রাথমিক চেষ্টায় সফল হবো।'

1947 সালের 18ই অক্টোবর বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে বিজ্ঞানানুরাগীদের এক সভায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করা হয়। পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সমর্থনে 1948 সালের 25শে জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়।

বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে আবেদন পত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল, তাতে বলা হয়—"বর্তমান জগতে জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে, অথচ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদীক্ষা এমনভাবে চালিত হচ্ছে না, যাতে আমরা আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্ভার জীবনের দৈনন্দিন কাজে সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করতে পারি। এর প্রধান অন্তরায় ছিল বিদেশী ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। এই নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে এই প্রধান বাধা দূর করে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের বহুল প্রচার ও প্রসারের দ্বারা তাঁদের সহজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বিজ্ঞানীদেরই।

18ই অক্টোবর (1947) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় এই প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনা করবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করে প্রকাশ করা। তৃতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশ করা। চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যকে সর্বপ্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা। পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্যে ও তার পথের বাধাবিপত্তি দূর করবার জন্যে বাৎসরিক সম্মিলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।"

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করে প্রতিষ্ঠাকালে বিজ্ঞান পরিষদের যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তাতে ছিলেন কর্মসচিব ডক্টর সুবোধনাথ বাগচী, যুগ্মসচিব শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত এবং সদস্যবর্গের মধ্যে ছিলেন ডক্টর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমল গোস্বামী ও শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়।

যে সব উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। পরিষদের মুখপত্ররূপে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা 1948 সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 25 বৎসর যাবৎ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, কিছুকাল পরে তাঁর সঙ্গে সহযোগী সম্পাদক ছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং তারপর একমাত্র সম্পাদক হন শ্রীভট্টাচার্য। বর্তমানে

পত্রিকার সম্পাদনা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হয়েছে—যার প্রধান সম্পাদকরূপে আছেন শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা প্রচারের জন্যে যে সব সাময়িক পত্র-পত্রিকা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ছাড়া কোন পত্র-পত্রিকাই এত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বাংলা ভাষাভাষী প্রায় সকল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর রচনা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়ে থাকে। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বসুর অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু পরলোকগত অতুলচন্দ্র গুপ্ত একবার তাঁকে বলেছিলেন—'যেদিন দেখবো বাংলা ভাষায় মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণার নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেদিন তোমাদের বাংলায় বিজ্ঞান-চর্চা সার্থক হবে।' শ্রীগুপ্তের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 1960 সালে রাজশেখর বসুর স্মৃতি সংখ্যারূপে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, যাতে শুধু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক আলোচনা মুখ্যতঃ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে সেই সঙ্গে জটিল ও দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা এবং মৌলিক গবেষণা কাজের প্রতিবেদনও মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের নিজস্ব মুদ্রণ বিভাগ না থাকা সত্ত্বেও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রথমাবধি প্রতি মাসে যথা-নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ এভাবে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে যে কম কৃতিত্বের কথা নয়—এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় একাধিক বিজ্ঞান পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বর্তমানে 'বিজ্ঞানী', 'গবেষণা', 'পরিসংখ্যান', 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া সাময়িক পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে সাপ্তাহিক 'দেশ' ও 'অমৃত' পত্রিকায় স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বিভাগ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। এক সময় দৈনিক 'লোকসেবক' পত্রিকার সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞানের কথা' বিভাগটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, এখন পত্রিকাটি প্রচলিত নেই। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষও বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা', 'সাময়িক বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ' এবং অন্যান্য আসরে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে আলোচনা প্রচার করে থাকেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ ছাত্র-সম্প্রদায়ও মাঝে মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছে, যদিও তাদের কোনটি বেশী দিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নি। এসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মূলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রয়াস যে অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদ প্রথমাবধি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে লোক-রঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা করে আসছে। গোড়ার দিকে পরিষদের সারস্বত সংঘের মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। বর্তমানে বিজ্ঞান পরিষদের প্রতি বছর 'রাজশেখর বসু স্মারক-বক্তৃতা'র আয়োজন করে থাকেন—তাতে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব বিষয় সংক্রান্ত

লোকরঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাছাড়া পরিষদের উদ্যোগে আরও দু-একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তরুণ বিজ্ঞানানুরাগীদের মধ্যে যথেষ্ট প্রেরণা সঞ্চার করেছে। তারই ফলে দেখি—বহরমপুরের 'বিজ্ঞান সংস্থা', 'গবেষণা' পত্রিকাগোষ্ঠী, গোবরডাঙা যুব বিজ্ঞান সংস্থা, সোদপুরের সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ, হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝে মাঝে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে লোকরঞ্জক বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্রের আয়োজন করে থাকে।

দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগিয়ে তোলবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রদর্শনী। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদও তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই বিষয়টির উপর সব সময় গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় একসময় যে 'করে দেখ' বিভাগটি প্রকাশিত হতো, তাতে ছেলেমেয়েরা নিজেরা কিভাবে নানা বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি করতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যেতো। এই বিভাগটি একসময় তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এই অনুপ্রেরণার ফলেই প্রায় 20 বছর আগে বিডন পার্কে (বর্তমান রবীন্দ্র কানন) পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতায় কিশোর কল্যাণ পরিষদের কিশোর বিজ্ঞানীরা তাদের হাতে তৈরি বৈজ্ঞানিক মডেলগুলি দেখিয়ে সর্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করেছিল। এই কিশোর বিজ্ঞানীরা গ্রীষ্মের ছুটিতে কয়েকবার গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞানের নানা চিত্তাকর্ষক মডেল দেখিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। 1964 সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব এবং 1968 সালে লেডি অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সায়েন্স ফর চিলড্রেন, বিড়লা শিল্প বিজ্ঞান সংগ্রহশালা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন প্রভৃতি সংস্থা এবং বিজ্ঞান পরিষদের 'হাতে-কলমে' বিভাগ এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল-কলেজে আজকাল নানা উপলক্ষে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা, তার সব কিছু এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নি। তবে 25 বছরের জীবনে বিজ্ঞান পরিষদ যে বাংলায় বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং নানাভাবে এই বিষয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের সংবাদপত্র-মহল এবং আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ভূমিকার গুরুত্ব এখনও যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন না। তাঁদের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা যে দেশের সাধারণ মানুষের মনে বিজ্ঞান-চেতনা জাগ্রত করতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রয়াসের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—তা বলাই বাহুল্য।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

রজত জয়ন্তী সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : নবম-দশম সংখ্যা
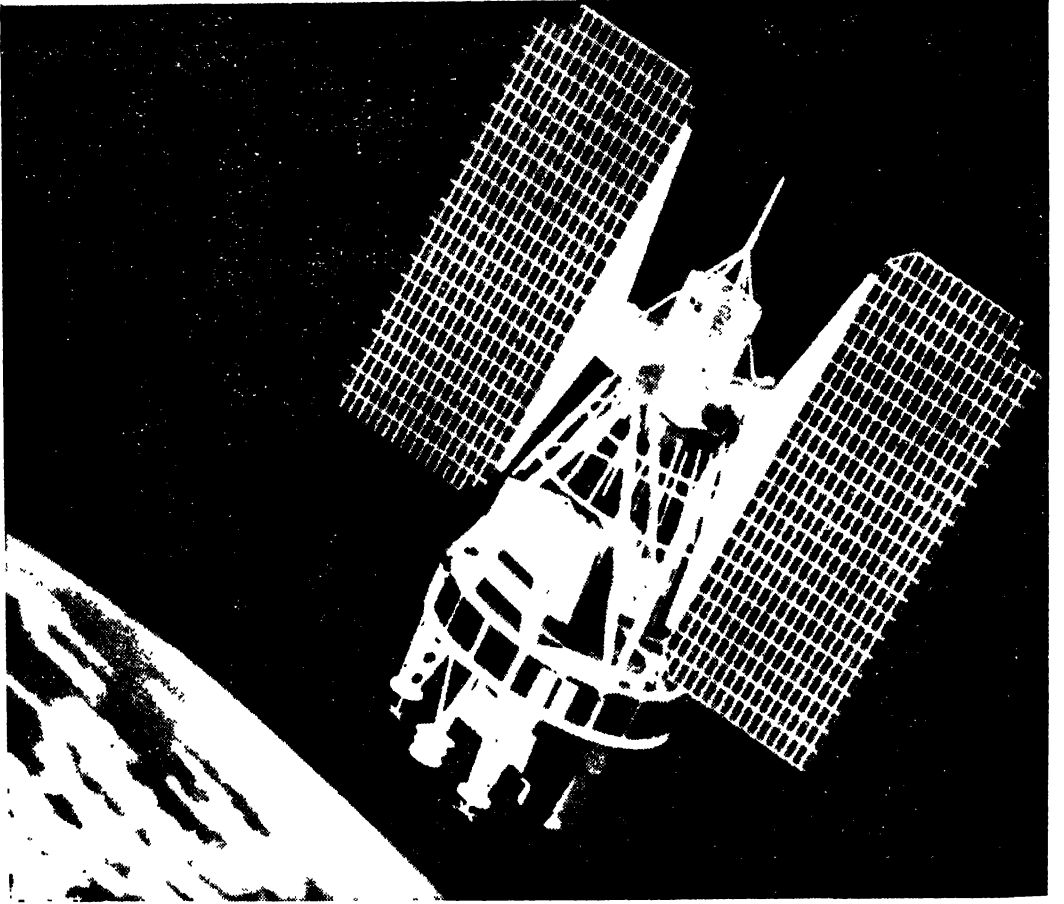
পৃথিবীর প্রথম সম্পদ-সন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ (শিল্পীর দৃষ্টিতে)

গত 23শে জুলাই আমেরিকা থেকে পৃথিবীর প্রথম সম্পদ-সন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহের ভর 891 কিলোগ্রাম। পৃথিবীর কৃষি ও অরণ্যসম্পদ, ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, ভূমির ব্যবহার, উদ্‌বিদ্যা, সমুদ্র ও আবহাওয়া প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ এবং আলোকচিত্র গ্রহণের উপযোগী যন্ত্রাদি এই উপগ্রহে রয়েছে। ঐসব যন্ত্রপাতি সৌর-কোষের দ্বারা চালিত হয়। সৌর-কোষ সৌরকিরণকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করে। সৌর-কোষগুলি কৃত্রিম উপগ্রহের দু-পাশে প্রশস্ত প্যানেলের উপর স্থাপিত।

ট্র্যানসিস্টর

ট্র্যানসিস্টর (Transistor) আধুনিক ইলেকট্রনিক্স-বিজ্ঞানে একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। যে সব কাজ থার্মায়নিক ভাল্‌ভের সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাদের মধ্যে অনেক কাজই ট্র্যানসিস্টরের সাহায্যে খুব কম খরচে ও সুষ্ঠুভাবে করা যায়। ট্র্যানসিস্টরের মূলে রয়েছে জার্মেনিয়াম (Germanium) ও সিলিকন (Silicon) নামে দুটি সেমিকণ্ডাক্টরের (Semi-conductor) কৃস্ট্যালে। এই দুই কৃস্ট্যালে বিশুদ্ধ অবস্থায় কখনও কখনও ফস্‌ফরাস (Phosphorus), অ্যান্টিমনি (Antimony), আর্সেনিক (Arsenic) প্রভৃতি এবং কখনও কখনও বোরন (Boron), অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium), ইণ্ডিয়াম (Indium) প্রভৃতি অতি অল্প পরিমাণে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত করা হয়। এভাবে খাদযুক্ত দুটি বিপরীত ধর্মী সেমিকণ্ডাক্টর প্রস্তুত করা যায়। এদের একটিকে বলা হয় এন-টাইপ (n-type) ও অন্যটির নাম পি-টাইপ (p-type) কৃস্ট্যাল।

প্রথমেই বলে রাখি, ট্র্যানসিস্টরের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দিক থেকে ট্র্যানসিস্টর সম্পর্কে আলোচনাই এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

ট্র্যানসিস্টর সাধারণতঃ দু-রকমের—যেমন বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর (Point contact transistor) ও জাংসন ট্র্যানসিস্টর (Junction transistor)। 1948 সনে বেল টেলিফোন গবেষণাগারে (Bell Telephones Laboratories) বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন বার্ডীন (John Bardeen) ও ওয়াল্টার ব্র্যাটেন (Walter Brattain) সর্বপ্রথম বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর উদ্ভাবন করেন। পরে 1949 সনে ঐ গবেষণাগারেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী উইলিয়াম শক্‌লে (William Schockley) জাংসন ট্র্যানসিস্টরের সূচনা করেন। বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর সাধারণতঃ এন-টাইপ জার্মেনিয়ামের একক (Single) কৃস্ট্যালের ছোট একটি খণ্ড দিয়ে তৈরি। কৃস্ট্যাল খণ্ডটির উপরের সমতলে টাংস্টেন (Tungsten) ধাতুর দুটি তড়িদ্দার খুব কাছাকাছি বসানো থাকে। প্রত্যেকটি তড়িদ্দারের অগ্রভাগ খুব সূক্ষ্ম করা হয় এবং এই সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কৃস্ট্যালের উপরিতল স্পর্শ করে থাকে। তড়িদ্দার দুটির একটিকে বলা হয় এমিটার (Emitter) আর অন্যটিকে বলা হয় কালেক্টর (Collector)। কৃস্ট্যালটি বেস (Base) বা ভূমিকার কাজে করে। দ্বি-পদী জাংসন ট্র্যানসিস্টরে এন ও পি-টাইপ কৃস্ট্যাল পাশাপাশি জোড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। দ্বি-পদী জাংসন ট্র্যানসিস্টরের দু-পাশে দুটি তড়িদ্দার থাকে। ত্রি-পদী জাংসন (Junction triode) ট্র্যানসিস্টর এন-পি-এন অথবা পি-এন-পি—এই ক্রমিক পর্যায়ে সংযুক্ত পি ও এন-টাইপ কৃস্ট্যাল দিয়ে গঠিত। ত্রি-পদী জাংসন ট্র্যানসিস্টরের বহির্ভাগে অবস্থিত কৃস্ট্যাল দুটির সঙ্গে দুটি তড়িদ্দার সংযুক্ত থাকে। এই দুটি তড়িদ্দারের একটি এমিটার ও অন্যটি কালেক্টরের কাজ করে—

মধ্যস্থ কৃস্ট্যালটিকে করা হয় বেস (Base) বা ভূমিকা। 1952 সনে ওয়ালেস (Wallace), শিমফ্ (Schimpf) ও ডেক্‌টেন (Dechten) চতুষ্পদী জাংসন (Junction tetrode) ট্র্যানসিস্টরের প্রবর্তন করেন। এই সব ট্র্যানসিস্টর কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে—তার আলোচনা এখানে করবো না—শুধু এদের প্রয়োগের কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

সাধারণতঃ বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর রেক্টিফায়ার (Rectifier) ও বিবর্ধকের কাজ করে। বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে সে জন্যে ডিটেক্টর (Detector) ও বিবর্ধকরূপে এর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। আবার অবস্থাবিশেষে একে বৈদ্যুতিক স্পন্দন-উৎপাদকের কাজেও প্রয়োগ করা যায়। বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর যখন বৈদ্যুতিক স্পন্দন-উৎপাদকরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচলের পথে ঋণাত্মক রোধের (Negative resistance) সৃষ্টি করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে এমন কৌশল বা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে বৈদ্যুতিক বিভবের বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বর্ধিত না হয়ে কমে যায়। এই বিশেষত্বের জন্যেই এরূপ ব্যবস্থায় বিন্দুস্পর্শী ট্র্যানসিস্টর বৈদ্যুতিক স্পন্দন উৎপাদন করতে পারে। দ্বি-পদী জাংসন ট্র্যানসিস্টর কেবল রেক্টিফায়ার বা ডিটেক্টরের কাজে ব্যবহার করা হয়। ত্রি পদী ও চতুষ্পদী জাংসন ট্র্যানসিস্টর প্রধানতঃ বিবর্ধকের কাজে লাগে। বিশেষ ব্যবস্থায় এদের রেক্টিফায়ার বা বৈদ্যুতিক স্পন্দন-উৎপাদক হিসাবেও প্রয়োগ করা সম্ভব।

ট্র্যানসিস্টর আয়তনে খুবই ছোট। সে জন্যে থার্মায়নিক ভাল্‌ভ দিয়ে তৈরি ইলেক-ট্রনিক যন্ত্রের তুলনায় ট্র্যানসিস্টর দিয়ে তৈরি যন্ত্র আয়তনে বেশ ছোট করা যায়। কর্মক্ষমতা এক রেখে এবং ট্র্যানসিস্টর যন্ত্রের আয়তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ, যেমন—কন্‌ডেন্‌সার (Condenser), ট্র্যান্সফর্মার (Transformer) প্রভৃতির আয়তনও ছোট করা সম্ভব হয়েছে। ভাল্‌ভের যন্ত্রে বৈদ্যুতিক বিভব লাগে বেশী—শক্তি-ক্ষয়ও অনেক। সে তুলনায় ট্র্যানসিস্টরে শক্তিক্ষয় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এর কারণ ট্র্যানসিস্টর-যন্ত্র অত্যন্ত কম ভোল্টের ব্যাটারী দিয়ে চালানো সম্ভব। ট্র্যানসিস্টরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব আছে। এর স্থায়িত্ব বা জীবনকাল ভাল্‌ভের তুলনায় অনেক বেশী।

সবশেষে বলতে হয় যে, থার্মায়নিক ভাল্‌ভের এমন অনেক প্রয়োগ আছে, যা এখন পর্যন্ত ট্র্যানসিস্টর দিয়ে করা সম্ভব নয়। সে জন্যে বহু ক্ষেত্রে ট্র্যানসিস্টরের ব্যবহার সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে থার্মায়নিক ভাল্‌ভের ব্যবহার অব্যাহত থাকবে, সন্দেহ নেই।

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর*

* বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

পারদর্শিতার পরীক্ষা

আমরা এখন এক ধরণের বীজগণিতের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব এবং তারপর এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করবো। ঐ সব প্রশ্নের মধ্যে যতগুলির সঠিক উত্তর তুমি দিতে পারবে, সেই অনুযায়ী গাণিতিক যুক্তির প্রয়োগে তোমার পারদর্শিতা সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

এই বীজগণিতের নাম প্রস্তাবনার বীজগণিত (Algebra of Propositions)। এর উপাদান হলো উক্তি (Statement)। উক্তির উদাহরণ: 1) তুমি এখন একটি পত্রিকা পড়ছো, 2) কলকাতা হচ্ছে একটি গণ্ডগ্রাম, ইত্যাদি। p, q, r, এই ধরণের এক একটি অক্ষর দিয়ে এক একটি উক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। উক্তির মূল ধর্ম হলো যে, তা হয় সত্য হবে, নয় অসত্য হবে। তুমি কি ভাবছো?—এরকম বাক্য কোন উক্তি নয়, কারণ এটা সত্যও নয়, অসত্যও নয়। কোন উক্তির সত্যতা বা অসত্যতাকে তার সত্যতা মান (Truth value) বলা হয়।

অনেকগুলি ছোট ছোট উক্তি বা সরল উক্তির সমন্বয়ে যৌগিক উক্তি গঠিত হয়। ঐ সরল উক্তিগুলির সত্যতা মান এবং সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যৌগিক উক্তির সত্যতা মান। সমন্বয়ের প্রক্রিয়াগুলি নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

ক) সংযুক্তি (Conjunction)—দুটি উক্তিকে 'এবং' শব্দের দ্বারা যুক্ত করে যৌগিক উক্তি গঠন করলে তাকে সংযুক্তি বলা হয়। ঐ দুটি উক্তিকে যদি p ও q বলা হয়, তাহলে সংযুক্তিটির প্রতীক হবে $p \wedge q$। ধরা যাক, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা', এই উক্তিটিকে p বলা হলো; 'বিজ্ঞান-পত্রিকা পড়ে বুদ্ধিমান লোকে', এই উক্তিটিকে বলা হলো q। তাহলে $p \wedge q$ লিখলে বোঝানো হবে—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা এবং বিজ্ঞান-পত্রিকা পড়ে বুদ্ধিমান লোকে।' এটা লক্ষণীয় যে, p ও q-এর প্রত্যেকটি যদি সত্য হয়, তবেই $p \wedge q$ সত্য হবে। p ও q-এর সত্যতা মানের উপর নির্ভর করে $p \wedge q$-এর সত্যতা মান কি হবে, তা একটি সারণীর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়:

p	q	p∧q
স	স	স
স	অ	অ
অ	স	অ
অ	অ	অ

এই রকম সারণীকে সত্যতা সারণী (Truth table) বলা হয়। এতে সত্যকে সংক্ষেপে স এবং অসত্যকে অ লেখা হয়েছে।

খ) বিযুক্তি (Disjunction)—দুটি উক্তিকে 'বা' শব্দের দ্বারা যুক্ত করে যৌগিক উক্তি গঠন করলে তাকে বিযুক্তি বলা হয়। p ও q-এর বিযুক্তির প্রতীক হলো $p \vee q$। এক্ষেত্রে p ও q-এর প্রত্যেকটি অসত্য হলে তবেই কেবল $p \vee q$ অসত্য হয়। সুতরাং আমরা সারণী আকারে লিখতে পারি:

p	q	$p \vee q$
স	স	স
স	অ	স
অ	স	স
অ	অ	অ

গ) অস্বীকার (Negation)—কোন উক্তির শেষে 'না' বা 'নয়' বসিয়ে অথবা উক্তিটির আগে 'এটা অসত্য যে' যোগ করে তার অস্বীকার গঠিত হয়। 'আমি লেখাপড়া করতে ভালবাসি', এই উক্তির অস্বীকার হবে—'আমি লেখাপড়া করতে ভালবাসি না।' p-এর অস্বীকার $\sim p$ প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, কোন উক্তির অস্বীকারের সত্যতা মান সব সময়ই মূল উক্তির সত্যতা মানের বিপরীত।

p	$\sim p$
স	অ
অ	স

ঘ) সাপেক্ষ (Conditional)—দুটি উক্তির মধ্যে প্রথমটির গোড়ায় 'যদি' এবং দ্বিতীয়টির গোড়ায় 'তাহলে' যোগ করে যৌগিক উক্তি গঠন করলে তাকে সাপেক্ষ উক্তি বলা হয়। এর প্রতীক হলো $p \rightarrow q$। এখানে ধরা হয় যে, p সত্য ও q অসত্য হলে তবেই কেবল $p \rightarrow q$ অসত্য হবে অর্থাৎ কোন সত্য উক্তি কখনো কোন অসত্য উক্তিকে নির্দেশ করতে পারে না।

p	q	$p \rightarrow q$
স	স	স
স	অ	অ
অ	স	স
অ	অ	স

ঙ) দ্বিসাপেক্ষ (Biconditional)—দুটি উক্তির প্রত্যেকটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল হয়, এমনভাবে ঐ দুটির সমন্বয় করে যৌগিক উক্তি গঠন করলে তাকে দ্বিসাপেক্ষ উক্তি বলে। এই উক্তি গঠনের জন্যে প্রথম সরল উক্তিটির গোড়ায় 'যদি এবং কেবলমাত্র যদি' শব্দগুলি

যোগ করতে হয় এবং দ্বিতীয় সরল উক্তির গোড়ায় যোগ করতে হয় 'তাহলে'। দ্বিসাপেক্ষ উক্তির প্রতীক হলো $p \leftarrow\rightarrow q$। এক্ষেত্রে p ও q-এর সত্যতা মান এক রকম হলে তবেই তা $p \leftarrow\rightarrow q$-এর সত্যতা সূচিত করবে।

p	q	$p \leftarrow\rightarrow q$
স	স	স
স	অ	অ
অ	স	অ
অ	অ	স

দু-ধরণের যৌগিক উক্তি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটিকে বলা হয় পুনরুক্তি (Tautology), অন্যটিকে বিরোধোক্তি (Contradiction)। কোন যৌগিক উক্তির গঠন যদি এমন হয় যে, তার মধ্যকার সরল উক্তিগুলি সত্য বা অসত্য, যাই হোক, যৌগিক উক্তিটি সব সময়ই সত্য, তাহলে তাকে পুনরুক্তি বলে ; আর যৌগিক উক্তিটি যদি সব সময়ই অসত্য হয়, তবে তাকে বলা হয় বিরোধোক্তি। উদাহরণ হিসাবে $p \vee \sim p$ হচ্ছে একটি পুনরুক্তি। 'এখন বৃষ্টি পড়ছে', এই উক্তিটি যদি p দিয়ে বোঝানো হয়, তাহলে $p \vee \sim p$ বোঝাবে : 'এখন বৃষ্টি পড়ছে বা এখন বৃষ্টি পড়ছে না'। বুঝতেই পারছো, এই যৌগিক উক্তিটি সব সময়ই সত্য, কারণ বৃষ্টি পড়া বা না পড়া ছাড়া আর তো কোন সম্ভাবনা নেই। $p \vee \sim p$ যে একটি পুনরুক্তি, নীচের সারণী থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$
স	অ	স
অ	স	স

বিরোধোক্তির একটি উদাহরণ হলো $p \wedge \sim p$।

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
স	অ	অ
অ	স	অ

এইবার প্রশ্নের পালা।

1. ধরে নেওয়া যাক

p ≡ এটা বর্ষাকাল,

q ≡ প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে,

r ≡ রাস্তায় জল জমে যায়।

এখন p, q ও r ব্যবহার করে নিম্নলিখিত উক্তিগুলিকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করো। (দরকার মত ( ) চিহ্ন ব্যবহার করতে পারো, যেমন হয়তো $(p \wedge q) \rightarrow r$)।

ক) যদি এটা বর্ষাকাল, তাহলে প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে এবং রাস্তায় জল জমে যায়।

খ) যদি এবং কেবলমাত্র যদি প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে, তাহলে রাস্তায় জল জমে যায়।

গ) এটা অসত্য যে, রাস্তায় জল জমে যায় না।

ঘ) যদি এটা বর্ষাকাল নয়, তাহলে প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে না।

ঙ) যদি এটা বর্ষাকাল বা প্রায়ই বৃষ্টি পড়ে, তাহলে রাস্তায় জল জমে যায়।

2. ধরা যাক p সত্য ও q অসত্য। এইবার নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সত্য বা অসত্য বলতে হবে।

ক) $\sim(p \wedge q)$

খ) $(p \vee q) \rightarrow q$

গ) $\sim p \leftrightarrow q$

ঘ) $\sim \sim q \rightarrow (p \wedge q)$

ঙ) $\sim(p \leftrightarrow q)$

3. নিম্নলিখিত সূত্রগুলি (DeMorgan's Laws) প্রমাণ করো।

ক) $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$

খ) $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$

4. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি পুনরুক্তি এবং কোন্‌গুলি বিরোধোক্তি ?

ক) $p \wedge \sim p$

খ) $\sim(p \vee \sim p)$

গ) $\sim \sim p \leftrightarrow p$

ঘ) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

ঙ) $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$

(উত্তরের জন্যে 634নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

শান্তিনিকেতনে এক বন্ধু এসে বললেন, "শুধু মানুষদের দোষ দেওয়া কেন? প্রকৃতির মধ্যেই যা জিঘাংসা—দেখলে শিউরে উঠতে হয়! চোখের সামনে দেখলাম, বুগানভিলিয়া লতায় জাল বুনে সাদা-কালো নক্সাকাটা মাথাওয়ালা মাকড়সা পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি জালে যা আটকাচ্ছে, তাকেই ধরে চুষে খেয়ে ফেলছে! এমন সময় একটা হল্‌দে-কালো বোলতা এসে ওর পিঠের উপর বসলো। মাকড়সাটা বোধ হয় হকচকিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারলো না। বোলতা তার ধারালো মুখ দিয়ে কুট কুট করে মাকড়সার আটটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়ে সুপুরির মত শরীরটাকে দিব্যি তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল! বীভৎস আর কাকে বলে!"

প্রথমটা সকলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর মনে পড়লো ঐ মরণ-যজ্ঞের পাশে-পাশেই বাঁচবার কি আকুল সাধনা। আমাদের পাশের বাড়ীতে কয়েক বছর কবি অন্নদাশঙ্কর রায় সপরিবারে থাকতেন। ওঁরা লোক বড় ভাল। বাড়ীর চারদিকে জন্তু-জানোয়ারের হাট। তাও কিছু নামকরা বিদেশ থেকে আমদানী করা শৌখীন জানোয়ার নয়, তবু তাদের আদর কত। ঘরে-বাইরে সাদা, কালো, পাটকিলে, পাঁচমিশালি পাতি-বেড়াল গিজগিজ করছে। ঘেরাটোপ দেওয়া খাচায় রুগ্ন পায়রা। চেয়ারে মুরগি বসা। নেড়ি কুকুরদের দু-বেলা ডেকে এনে খাওয়ানো হতো। দেখে দেখে মানবসমাজের উপর আস্থা জন্মালো! মাসকাবারে একবার করে শান্তিনিকেতনে যেতাম। সারা মাস তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। কিন্তু সব দিন তো আর একভাবে যায় না! কয়েক বছর এভাবে কাটবার পর কবি হঠাৎ ওখানকার বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এই কয়েক বছরে ওঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। চলে আসাতে বেশ বড় একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হতে লাগলো।

পরের বার শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি দরজার বাইরে তালা ঝুলছে, চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। ফটক হাঁ করে খোলা, গরু-ছাগল ঢুকে গাছ খাচ্ছে। মনে পড়লো, একবার দেখেছিলাম কোন এক ফাঁকে ওঁদের বাড়ীতে চারটে গাধা ঢুকে ফুলের চারা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কবি বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। গাছ খাওয়া দেখে ব্যাকুল হয়ে এক ছড়া করবাফুল ছিঁড়ে নিয়ে ওদের গায়ে মৃদু ঝাপ্‌টা দিতে লাগলেন। ওরা অবশ্য ভ্রুক্ষেপও করলো না, যতক্ষণ না ওঁদের বাড়ীর চাকর ডাণ্ডা নিয়ে হৈ-হৈ করে তেড়ে এলো। যে নেড়ি কুকুরগুলি বাড়ীর সামনের মাঠে অন্য জানোয়ার নামলেই মহা সোরগোল তুলতো, আজ ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় তাদের কাউকে দেখা গেল না। কোথায় গেল পায়রা, মুরগী, বেড়াল-কুল?

তাদের দেখা না পেয়ে মন বড়ই খারাপ ছিল। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রাঁধবার লোক একটা ভাঙ্গা পেয়ালা এনে বললো, "বেড়ালে ভেঙেছে।" আনন্দে লাফিয়ে ওঠলাম, "কোথায় বেড়াল ?" সে বললো, "তাড়া দিলেও সাড়া দেয় না।" এর আগেও বেড়াল এসে ডোঙার ঢাকনি ভেঙ্গেছিল। সন্দেশের বাক্স মাটিতে ফেলে কতক খেয়ে, কতক খাবলে-খিমচে, বাকী ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সেগুলি নেড়ি কুকুরেরা প্রসাদ পেয়েছিল। সে সব সুখের দিনের কথা কেবলি মনে পড়তে লাগলো।

রাতে চোখে ঘুম এল না। কেবলি মনে হতে লাগলো কোথায় যেন করুণ সুরে বেড়াল কাঁদছে। থাকতে না পেরে দু-একবার দরজা খুলে দেখেও এলাম। কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম তবে কি যারা ও-বাড়িতে অত সুখে ছিল, তাদের কথা ভেবে ভেবে ঐ রকম কল্পনা করছি।

সকালে উঠে বাড়ীর লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম কেউ কোন ডাক শোনে নি। মালী বললো একটা দুষ্টু হুলো নাকি মুখুজ্জেদের মুরগীর ডিম ও বাচ্চার লোভে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, কিন্তু জাল দিয়ে ঘেরা ঘরে ঢুকতে পারে না, ও তারি হতাশার ডাক! রাঁধবার লোক বললো, "হ্যাঁ, ঠিক ও-ই পেয়ালাও ভেঙেছে।"

সারা দিন নানান কাজে কেটে গেল। রাতে যেই না চারদিক নিঝুম হয়ে এলো, অমনি শোনলাম বেড়াল কাঁদছে। পরদিন অনিচ্ছুক লোকজনদের দিয়ে আঁতিপাতি বেড়াল খোঁজালাম। কোথাও কিছু নেই। মালীরা একটু ভড়কে গেছে দেখলাম। বার বার বলতে লাগলো, "কি জানি, ওনারা তো নানান রূপ ধারণ করে—শুনেছি। ভয় লাগে। একটা পূজা-টুজা লাগালে হয় না ?"

সে রাতেও বেড়ালের কাতর ডাকে ঘুম হলো না। সকালে উঠেই আর সইতে না পেরে খালি বাড়ীর পশ্চিমে ইন্দ্রাণীদের বাড়ী গেলাম। "হ্যাঁরে, তোরা রাতে বেড়ালের ডাক শুনতে পাস ?"

ইন্দ্রাণী হাতে চাঁদ পেল, "তুমিও শোন নাকি ? আজ চার দিন আমি ঘুমাতে পারি না, আর ছেলেরা বলে নাকি আমার মনের ভুল! কি করা যায়, মাসিমা ?" জিজ্ঞাসা করলাম, "ও-বাড়ীর চাবি কোথায় ?" "সুধাকান্ত দাদার কাছে।"

তখুনি চিরকুট লিখে মালীকে পাঠালাম তাঁর কাছে। মালীর সঙ্গে রিকশ চেপে চাবি হাতে রুগ্ন সুধাকান্ত দাদা নিজেই এলেন। বললেন, "তোমরা কি খেপলে নাকি? পাঁচ দিন হলো আমি নিজে এসে ঘরদোর খুলে ওঁদের জিনিষপত্র খালাস করেছি। তারপর খালি ঘর ভাল করে পরীক্ষা করে, তবে তালা দিয়েছি। একটা কুটো কি তেলাপোকা নেই ও-বাড়ীতে। তবু তোমাদের মনের শান্তির জন্যে ঘর খুলে দিচ্ছি।"

সদর দরজার চাবি খোলা হলো। চারদিক শুন-শান, খাঁ-খাঁ করছে ঘর, একটা

টিকটিকি পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। সুধাকান্ত দাদা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই। তোমরা ভুল শুনতে সুরু করেছ।"

চলেই যেতেন হয়তো, আমরা চেপে ধরলাম, "একবার রান্না বাড়ীটা দেখা যাক। ওর আলাদা তালা।" সুধাকান্ত দাদা বোধ করি একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "এ তো আচ্ছা গেরো! বলছি একেবারে শূন্য ঘর, তিন মাস খোলা হয় নি। মালী, খুলেই দেখা।"

ঝনাৎ করে তালা খুললো। এক মুহূর্ত সব চুপচাপ। ঘরের জানালা এঁটে বন্ধ, ভিতরটা ভাল দেখাও যাচ্ছিল না। তারপরেই হঁ-য়া-য়া-ও! স্যাঁৎ করে একটা সাদা গোলা তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়া! আমরা হাসবো না কাঁদবো ভেবে পেলাম না। মন থেকে দশমণি বোঝা নেমে গেল।

সুধাকান্ত দাদা বললেন, "দেখলে! তেজ তো কম নয়! পাঁচ দিন জলস্পর্শ করে নি, তবু কাবু হবার নাম নেই! ভাবছি ঢুকলো কি করে? এ-ঘর তো তিন মাস বন্ধ।"

সবাই মিলে পর্যবেক্ষণ করলাম। রান্না বাড়ীর পাশেই বড় শিরীষ গাছ। তারি একটা ডাল রান্নাঘরের কাছাকাছি পৌঁচেছে। অভ্যাসমত খাবারের আশায় বেড়াল নিশ্চয় ঐ ডাল থেকে এক লাফে স্কাইলাইটে, আবার সেখান থেকে এক লাফে নীচে। কোথাও কিচ্ছু নেই। বেরোবারও পথ নেই। সম্বল শুধু ম্যাও ডাক। দিনের বেলায় অন্যান্য শব্দের মধ্যে শোনা যায় না, রাতে কানে যায়। পুরুষেরা কেউ শুনতে পায় না। কারণ ঘুমালে তারা কালা-বোবা হয়ে যায়। এ-ও প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের আরেক পাঠ।

লীলা মজুমদার

বকখালির খাঁড়িতে

কিশোর বয়সের তিনটি প্রকৃতি-পড়ুয়া গত বড়দিনের এক সকালে বকখালিতে জমা হয়েছিল—সেখানে খাঁড়ির ধারে জল, মাটি, মাছ আর পাখী দেখবে বলে। জায়গাটি ফ্রেজারগঞ্জের মাইল তিনেক পূবে সমুদ্রের ধারে। আমি তাদের সঙ্গী ছিলাম।

আমরা খাঁড়ির পশ্চিম তীরে আমাদের 'ঘাঁটি' বানালাম। প্রকৃতি-পড়ুয়া তিনটি তাদের কাজ বুঝে নিলো:

এক। অশোক চক্রবর্তী দেখবে কি কি পাখী বকখালির খাঁড়ির ধারেকাছে রয়েছে।

দুই। অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখবে জেলেদের নৌকার গড়ন, জালের রকমফের আর তাদের ধরা মাছ।

তিন। গৌতম ভট্টাচার্য দেখবে বালি, হাওয়া আর সমুদ্রের জল কেমন করে গড়ছে সমুদ্রতীর।

অশোক তন্ন তন্ন করে খুঁজে বকখালির খাঁড়িতে একটি বকও পেল না। খাঁড়ির পূব-পশ্চিমে এক ঘণ্টা হেঁটে সে চার জাতের পাখীর খোঁজ নিয়ে এলো—(ক) গাং চিল (Blackheaded Gull), (খ) উল্টাঠোঁটি (Avocet) আর (গ) দুই জাতের কাদাখোঁচা (Common Sandpiper ও Common Snipe)। অশোকের মনে প্রশ্ন ছিল দুটি :

এক। গাংচিলগুলি জেলে নৌকার ধারেকাছে ঝাঁক বেঁধে খাঁড়ির জলে বসে আছে—জেলেদের দেখে সহজে উড়ে যাচ্ছে না, অথচ আমরা কাছাকাছি গেলে উড়ে যাচ্ছে কেন?

দুই। কাদাখোঁচা আর উল্টাঠোঁটি পাখীগুলি খাঁড়ির ভিতর ঢুকছে না, সমুদ্র-তীরে ছোট ছোট ঢেউ যেখানে ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানেই ছুটাছুটি করছে। কেন?

নিজের কাজে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে অঞ্জন এসে বললে—এখানে জেলেদের নৌকাগুলির তলা হাড়ি-কড়ার তলার মত উত্তল। জালের দৈর্ঘ্য খুব, কিন্তু প্রস্থ বেশী নয়। হাঙ্গরজাতীয় যে মাছ তারা শুকাতে দিয়েছে, তাদের সবারই পাখ্না ও লেজ দেহের তুলনায় বেশ বড়। তার প্রশ্ন—এই নৌকা আর এই জাল দিয়ে জেলেরা এই মাছ কি করে ধরে?

গৌতম ভেবেছিল সমুদ্রের রং হবে নীল। এখানে সে দেখলো ঘোলা জল—যতদূর চোখ যায়। খুব চওড়া, সামান্য গড়ানে শক্ত রূপালী বালুবেলা ধরে সমুদ্রের ভিতর দিকে বেশ কিছুটা হেঁটে সে বুঝে নিয়েছিল, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা আর নদীর বয়ে আনা পলি গড়ে তুলেছে এমন ধারা একটি সমুদ্রতীর। এই তীরে বালিকণা যেমন রয়েছে, এঁটেল মাটিও জুড়ে রয়েছে অনেক জায়গা। সেই জায়গাটুকু বাদে যেখানেই বালিকণা সেখানেই সমুদ্রতীর ঢেউ কিংবা হাওয়ায় কেমন করে যে কুঁকড়ে ওঠে, এই রহস্য সে বুঝতে পারে নি।

ঠিক হয়েছিল, দু-ঘণ্টা কাজ করবার পর আমরা সবাই আবার ঘাঁটিতে ফিরে যাব। তারপর প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো। তারপর সবাই মিলে উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করবো সেই প্রশ্নগুলির, যার সামনে এই কিশোর প্রকৃতি-পড়ুয়ারা থমকে দাঁড়াবে। কথামত কাজ সুরু হলো।

অশোকের প্রশ্নের উত্তর পেতে দেরী হলো না আমাদের। জেলে নৌকার চারপাশে খাঁড়ির বুকে শ'খানেক গাংচিলের ভীড়। জেলেরা মাছ শুকাতে দেবার আগে পেট চিরে সব কিছু বের করে ফেলে দিচ্ছে জলে। তা ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে গাংচিলগুলি। গাংচিলগুলির নজর মাছের দিকে নয় বলে জেলেরাও তাদের তাড়াতে ব্যস্ত নয়। সহজে খাবার পাচ্ছে, তাড়া খাচ্ছে না, তাই গাংচিলেরাও জেলেদের ভয় পাচ্ছে না, কাছ ছেড়ে যাচ্ছে না। জেলেদের সঙ্গে আমাদের পোষাকে, কথার শব্দে আর চলাফেরায় যে হেরফের, হয়তো সেগুলি গাংচিলের নজর এড়ায় নি। তাই আমরা এগুতেই ভয়ে তারা পিছিয়ে গেছে।

গাংচিলের জ্যান্ত খাবার না হলেও চলে, কিন্তু কাদাখোঁচা আর উল্টাঠোঁটিদের

চলে না। সমুদ্রের গুড়ি-গুড়ি ঢেউ যেখানে ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানেই জলের পোকা, শামুক, কাঁকড়ার পিছনে ছুটছে ওরা। যে খাবার তারা পায় সমুদ্রের ধারে, তা পায় না খাঁড়ির ভিতরে, যেখানে জেলেদের নৌকা বাঁধা। মাঝে মাঝে দু-একটি কাদাখোঁচা খাঁড়ির ভিতর উড়ে আসছে—জলের ধারে বসছে। কিছু খাবার না পেয়ে যাচ্ছে ফের সমুদ্রের ধারে।

অঞ্জনের প্রশ্নগুলি নিয়ে জেলেদের সঙ্গে আলোচনা করেই উত্তর পেলাম। একজন বললেন, নৌকাগুলির তলা কড়ার মত হওয়ায় এই সুবিধা যে, অল্প জলেও ভেসে চলতে পারে। এদের কাছে রয়েছে ঘেরা জাল। ভাঁটার টানে ওরা সমুদ্রের মাঝে যতদূর পারে চলে যায়। তারপর জোয়ার এলে জাল ছড়িয়ে ভাসতে ভাসতে ফিরে আসে (উল্টো ব্যাপারও ঘটে কখনো কখনো)। জালের নীচে ভার থাকে বলে সেটি টান টান হয়ে থাকে জলের তলায়। উপরে তাকে ভাসিয়ে রাখে জালে বাঁধা ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রা। জালের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যেতে গেলেই জালের ফাঁকের চেয়ে বড় বড় মাছেরা আট্‌কা পড়ে—কান্‌কো, লেজ কিংবা পাখ্‌নায় বেঁধে গিয়ে। তারপর ডাঙ্গার ধারে এসে দু-দিক থেকে জাল টেনে মাছ তুলে আনে জেলেরা। ছোট ফাঁকওয়ালা জাল দিয়ে এভাবে ছোট ছোট মাছের ঝাঁকও ওরা ধরে। দিনের পর দিন সমুদ্রে থেকে থেকে ওরা ঠিক বুঝতে পারে, মাছের ঝাঁক কোথায় কখন যাচ্ছে। তাই জাল ফেলে ভেসে থাকা কখনো বিফলে যায় না।

আমরা ঘরমুখো হলাম গৌতমের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে। ভাঁটায় জল তখন অনেক নেবে গেছে। বেশ চওড়া হয়েছে সমুদ্রতীর। বালির বুকে রয়ে গেছে ছোট ঢেউয়ের মিহি দাগ। কেমন করে এমন হয়, তা বুঝতে আমাদের সামান্য সময় লাগলো।

এখানকার ঢেউ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে না, ধীরে ধীরে পুকুরের শান্ত ঢেউয়ের মত আসে যায়। তাই ছোট বালিকণাগুলির ধাক্কায় ধাক্কায় একটি জায়গায় তার চেয়ে বড় কণার পিছনে জমে যাচ্ছে। হাওয়ায় বয়ে-আনা বালিকণা যেগুলি জলে পড়েই ডুবে যাচ্ছে, তারাও জমছে গিয়ে মোটা কণার পিছনে ঢেউয়ের ধাক্কায়। জলের নীচে এক মিনিট হাত পেতে থেকেই বুঝতে পারলাম, কি পরিমাণ বালি এসে পড়ছে। ভাঁটায় জল একটু পিছিয়ে যাচ্ছে আর ভিজা বালির তীরে ফুটে উঠছে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার উঁচু বালির ঢেউ—জলের দিক থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে ডাঙ্গার দিকে একটির পর একটি। দেখে মনে হয় বালির ঢেউ। ঠিক একই কাণ্ড ঘটছে বালিয়াড়ির গায়ে হাওয়ার বেগে। বালিকণা বয়ে-আনা হাওয়া যেখানে বাধা পাচ্ছে, সেখানেই আগে মোটা বালি ঝরে পড়ছে—তার পিছু মিহি কণাগুলি। মোটা দানার বালি, মিহিদানার বালি আর মৃদু হাওয়া—তিনে মিলে বালিয়াড়ির গায়ে পড়ছে বালির ঢেউ। এঁটেল মাটির গায়ে এমন কারিকুরি দেখলাম না। না হাওয়া না জল, কেউ তার গায়ে বালির ঢেউ বানাতে পারছে না। এঁটেল মাটির কণা অতি মিহি—তারা জুড়ে রয়েছে খুব ঘন হয়ে। গৌতমের জিজ্ঞাসার জবাব পেতেই আমরা ঘরমুখো হলাম।

জীবন সর্দার

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. (ক) $p \rightarrow (q \wedge r)$

   (খ) $q \leftrightarrow r$

   (গ) $\sim\sim r$

   (ঘ) $\sim p \rightarrow \sim q$

   (ঙ) $(p \vee q) \rightarrow r$

2. (ক) সত্য

   (খ) অসত্য

   (গ) সত্য

   (ঘ) সত্য

   (ঙ) সত্য

[সংযুক্তি, বিযুক্তি প্রভৃতির জন্যে যে সত্যতা সারণীগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি ব্যবহার করে সহজেই উত্তর জানতে পারা যায়। মনে রাখতে হবে, p : সত্য, q : অসত্য।

(ক) $p \wedge q$: অসত্য ; সুতরাং $\sim (p \wedge q)$: সত্য।

(খ) $p \vee q$: সত্য ; সুতরাং $(p \vee q) \rightarrow q$: অসত্য।

(গ) $\sim p$: অসত্য ; সুতরাং $\sim p \leftrightarrow q$: সত্য।

(ঘ) $\sim q$: সত্য, সেজন্যে $\sim\sim q$: অসত্য ; আবার $p \wedge q$: অসত্য ; সুতরাং $\sim\sim q \rightarrow (p \wedge q)$; সত্য।

(ঙ) $p \leftrightarrow q$: অসত্য ; সুতরাং $\sim (p \leftrightarrow q)$: সত্য।]

3.

p	q	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \vee \sim q$
স	স	স	অ	অ	অ	অ
স	অ	অ	স	অ	স	স
অ	স	অ	স	স	অ	স
অ	অ	অ	স	স	স	স

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, $\sim(p \wedge q)$ এবং $\sim p \vee \sim q$-এর সত্যতার মান সব সম্ভাব্য ক্ষেত্রেই একই রকম। সুতরাং $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$।

(খ)

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
স	স	স	অ	অ	অ	অ
স	অ	স	অ	অ	স	অ
অ	স	স	অ	স	অ	অ
অ	অ	অ	স	স	স	স

উপরের সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, $\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$ ।

4. ক) বিরোধোক্তি

খ) বিরোধোক্তি

গ) পুনরুক্তি

ঘ) পুনরুক্তি

ঙ) পুনরুক্তি

[সত্যতা সারণী থেকে উক্তিগুলির প্রকৃতি বোঝা যায়—

ক)

p	$\sim p$	$p \wedge \sim p$
স	অ	অ
অ	স	অ

খ)

p	$\sim p$	$p \vee \sim p$	$\sim(p \vee \sim p)$
স	অ	স	অ
অ	স	স	অ

গ)

p	$\sim p$	$\sim\sim p$	$\sim\sim p \leftrightarrow p$
স	অ	স	স
অ	স	অ	স

ঘ)

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$
স	স	স	স	স
স	অ	অ	স	স
অ	স	অ	স	স
অ	অ	অ	অ	স

ঙ)

p	q	$p \leftrightarrow q$	$q \leftrightarrow p$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$
স	স	স	স	স
স	অ	অ	অ	স
অ	স	অ	অ	স
অ	অ	স	স	স]

করে দেখ

বাড়ীতে মেইন লাইন থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে রেডিও বাজাবার সময় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ত্রুটিযুক্ত টিউব লাইট, পাখা, মোটর ইত্যাদি চলবার জন্যে রেডিওতে শ্রুতিকটু শব্দের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ত্রুটিযুক্ত যন্ত্রের যান্ত্রিক গোলযোগ বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তরঙ্গের আকারে বৈদ্যুতিক লাইনের মধ্য দিয়ে রেডিওতে প্রবেশ করে। এই জাতীয় কম্পনের কম্পনাঙ্কের বেশীর ভাগই মিডিয়াম ওয়েভের কম্পনাঙ্কের মানের কাছাকাছি হয়ে থাকে। মিডিয়াম ওয়েভ চলবার সময় এই কম্পনই শ্রুতিকটু শব্দের সৃষ্টি করে। রেডিওতে এদের প্রবেশ বন্ধ করতে পারলেই শ্রুতিকটু শব্দ হবে না। কেমন করে তা বন্ধ করা যায়, এখানে তা আলোচনা করবো।

এই ব্যবস্থায় সোজাসুজি মেইন লাইন থেকে তড়িৎ-প্রবাহ রেডিওতে না নিয়ে আবেশক (Inductor) ও ধারক (Condenser) সমন্বয়ে তৈরি বর্তনীর মাধ্যমে রেডিওতে লওয়া হয়। নীচের চিত্রে বর্তনীর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
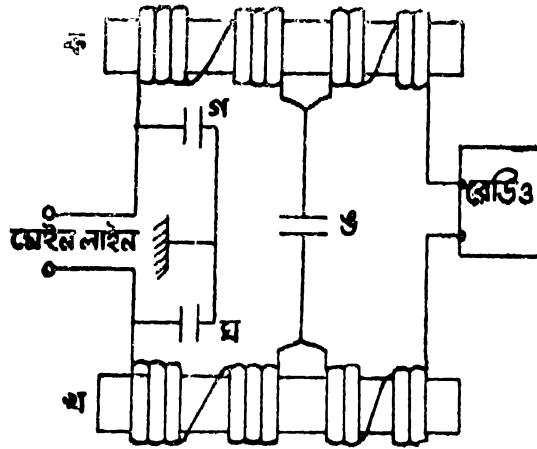
চিত্রে 'ক' এবং 'খ' হচ্ছে দুটি 2 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট এবং 12 সে.মি. লম্বা কাঠের চোঙ, যাদের উপর চারটি স্তরে বিভক্ত এনামেল করা 30 বা 32 গেজের তামার তার একই দিকে জড়ানো আছে। প্রত্যেক স্তরে 80 পাক তার আছে। এইগুলি আবেশকের কাজ করে। এদের এক দিকের দুই প্রান্ত মেইন লাইনের দুটি তারের সঙ্গে যুক্ত। এদের অপর দুটি প্রান্ত রেডিওর সঙ্গে যুক্ত। 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' তিনটি ধারক, যাদের মান ·02 মাইক্রো-ফ্যারাড। 'গ' ও 'ঘ' ধারকের সংযোগের মধ্যবর্তী অংশ মাটির সঙ্গে যুক্ত এবং 'ঙ' ধারকটি আবেশক দুটির মধ্যবর্তী অংশের সঙ্গে যুক্ত।

ইলেকট্রনিক্সে উপরিউক্ত ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে Low Pass Filter ; কারণ অপেক্ষাকৃত কম কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ এর মধ্য দিয়ে ভালভাবে যেতে পারে, কিন্তু বেশী কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ-প্রবাহ তা পারে না। মেইন লাইন থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে অবাঞ্ছিত কম্পন (যাদের কম্পনাঙ্ক মিডিয়াম ওয়েভের কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে) বর্তনীর ধারকের তুলনায় আবেশককে বেশী বাধা পাওয়ায় ধারক দিয়ে মাটিতে চলে যায়। 'ক' এবং 'খ' চিহ্নিত স্থানে প্রবাহের দশা পরস্পর বিপরীতমুখী হওয়ায় আবেশকের মধ্য দিয়ে যদিও অল্প কিছু অবাঞ্ছিত কম্পন এসে যায়, তা ও ধারক নষ্ট করে দেয়। সুতরাং অবাঞ্ছিত কম্পন রেডিওতে পৌঁছায় না। মেইন লাইনের নিজস্ব তড়িৎ-প্রবাহ কিন্তু রেডিওতে ঠিকই পৌঁছায়। এই তড়িৎ-প্রবাহ যদি পরিবর্তী হয়, তবে এর কম্পনাঙ্ক খুব কম হওয়ায় আলোচ্য বর্তনীর ধারকগুলি যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে এবং এই প্রবাহ আবেশকের মধ্য দিয়ে সহজেই রেডিওতে চলে যেতে পারে। আর সমপ্রবাহী তড়িতের ক্ষেত্রে ধারক পথ বন্ধ করে দেয় বলে তা মাটিতে যেতেই পারে না, অন্যদিকে আবেশকে বাধা না পেয়ে রেডিওতে সোজা চলে যায়। অবাঞ্ছিত কম্পনের কম্পনাঙ্ক খুব বেশী হলে (শর্ট ওয়েভের কাছাকাছি) এই বর্তনীর দ্বারা তা বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন।

মহুয়া দে

জলচালিত মোটর গাড়ী

আজকের দিনে যানবাহন ও কলকারখানায় জ্বালানী যোগানো একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্বসমস্যা। বিশ্বের খনিজ তৈল ও পাথুরে কয়লার সঞ্চয় দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে— যার জন্যে বিকল্প হিসাবে সৌরশক্তি, পারমাণবিক শক্তি ও জল-বিদ্যুৎ শক্তিকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলছে। তার উপর আবার আছে দৈনিক কোটি কোটি টন জ্বালানী পোড়বার দরুণ বিশেষ করে শহর ও শিল্পাঞ্চলে জলবায়ু দূষিত হবার সমস্যা। বর্তমান হারে জলবায়ু দূষিত হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমগ্র সাগর-মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডল আবর্জনা ও বিষাক্ত বাষ্পে কলুষিত হয়ে পড়বে ও মনুষ্য-বাসের অনুপযোগী হয়ে দাঁড়াবে বলে বহু বিজ্ঞানী আশঙ্কা করছেন।

এরই আংশিক প্রতিবিধানে যানবাহনে পেট্রল ও ডিজেল তেলের বদলে বিকল্প শক্তি-উৎসের সন্ধান চলছে, যা জ্বালানীর সমস্যা মেটাবে এবং আবহাওয়াকেও বিষিয়ে তুলবে না। এমনি একটি মোটর গাড়ী সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী ইউল ব্রাউন

(Yull Brown)। এই নবাবিষ্কৃত গাড়ীটি পেট্রলের বদলে মাত্র 10 গ্যালন্ জলের সাহায্যে সারা বছর চলবে।

ব্রাউনের প্রস্তুত এই মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনটি চলবে—জলের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিয়ে জলের মৌল উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প বিশ্লিষ্ট করে হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে। এই উভয় বাষ্পকে তখন একটি বিশেষ কার্বুরেটর বা মিশ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে সিলিণ্ডারের মধ্যে চালান করা হয়। সেখানে ঐ মিশ্রিত বিস্ফোরক বাষ্পকে সাধারণ মোটর ইঞ্জিনের মতই তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফুরিত করে শক্তি উৎপাদন করা হয় গাড়ী চালাবার জন্যে।

ব্রাউন একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার। তিনি এযাবৎ যদিও তার জলচালিত মোটর গাড়ীকে মাত্র স্বল্প দূরত্বে চালাতে সক্ষম হয়েছেন, তথাপি তিনি আশা করেন—তাঁর 1952 মডেলের পূর্বে তেলচালিত এবং অধুনা জলচালিত ইঞ্জিনের উপর নির্ভরশীল সিডান গাড়ীটি সারা বছর মাত্র দশ গ্যালন জলের সাহায্যেই চলতে পারবে।

গাড়ীটির অন্য সুবিধার মধ্যে আছে এর নামমাত্র বিদ্যুৎ খরচ। মাত্র 12 ভোল্টের দুটি ব্যাটারী—যা সপ্তাহে মাত্র একদিন 'চার্জ' করলেই যথেষ্ট। তার সাহায্যেই চলবে ইঞ্জিনের তড়িৎ-বিশ্লেষণের কাজ। এই ব্যাটারী দুটিকে সুবিধামত রেখে দেওয়া যাবে গাড়ীর পিছনের প্রকোষ্ঠে।

ব্রাউনের মতে, এখন থেকে প্রতিটি পেট্রল বা ডিজেল চালিত মোটর গাড়ীতেই মাত্র 2,400 থেকে 3,200 টাকা দামের বিকল্প সরঞ্জাম বসিয়ে সেগুলিকে জলশক্তিতে চালানো সম্ভব হবে এবং এই সরঞ্জাম ব্যাপক হারে উৎপাদন ও কেনা-বেচা চলবে।

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

জানবার কথা

পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণীর অস্তিত্বের কথা জানা গেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বৃহদাকৃতির প্রাণী হলো নীল তিমি। বৃহদাকৃতির প্রাণী হলেও অতি ক্ষুদ্রাকৃতির জীব উদরসাৎ করেই এরা জীবনধারণ করে। তিমিকে মাছ বলা হলেও আসলে কিন্তু এরা মাছ নয়। এরা বাচ্চা প্রসব করে এবং বাচ্চাগুলি মাতৃস্তন্য পান করেই বড় হয়। নীল তিমি 132 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

—মনিদীপা নাগ, বৈদ্যবাটী।

প্রশ্ন 2. মহাকাশে ওজনশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয় কি ভাবে?

—সন্দীপচন্দ্র বেরা, গোপীনাথ মৌলিক, হাবড়া, 24-পরগণা।

উত্তর 1. জ্যামিতিশাস্ত্রে এমন কতকগুলি তথ্য আছে, যেগুলিকে আমরা প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে মেনে নিই। এই সকল তথ্যকে আমরা অন্যান্য উপপাদ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। এই তথ্যগুলিকে বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ। প্রখ্যাত জ্যামিতিবিদ্ ইউক্লিড জ্যামিতিশাস্ত্রে এরূপ পাঁচটি তথ্যকে স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর স্বতঃসিদ্ধগুলি হলো—

(1) সকল সমকোণ পরস্পর সমান।

(2) দুটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে একটি এবং কেবলমাত্র একটি সরলরেখা টানা যায়।

(3) যে কোন নির্দিষ্ট সরলরেখাকে যে কোন দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত করা যায়।

(4) যে কোনও বিন্দুকে কেন্দ্র করে কেন্দ্র থেকে যে কোনও দূরত্বে বৃত্ত অঙ্কন করা সম্ভব।

(5) যদি দুটি সরলরেখাকে অপর একটি সরলরেখা ছেদ করে, তাহলে ছেদকের যে পার্শ্বের অন্তর্ভুক্ত কোণদ্বয়ের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ছোট, সরলরেখা দুটি সে পার্শ্বে মিলিত হবে।

এই শেষেরটিকে বলা হয় ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধ। এই স্বতঃসিদ্ধটির রূপ আপাতদৃষ্টিতে প্রায় উপপাদ্যের মত। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রায় দু-হাজার বছর যাবৎ বহু জ্যামিতিবিদ্ ও গণিতবিদ্ এই স্বতঃসিদ্ধটি প্রমাণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তবে তাঁরা এই স্বতঃসিদ্ধের পরিবর্তে নতুন স্বতঃসিদ্ধের উপস্থাপনা করে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির উপপাদ্যগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ক্রমরক্ষণশীলতা ধর্মের অক্ষুণ্নতা বজায় রাখবার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে তাঁদের গবেষণালব্ধ কিছু ফল নন্-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি উদ্ভাবনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

উত্তর 2. আমরা যে শরীরের ওজন অনুভব করি, এর মূলে রয়েছে ভূপৃষ্ঠের প্রতিক্রিয়া। যখন কোন ব্যক্তি বিমানযোগে ভ্রমণ করেন, বিমানের কেবিনের তলার

প্রতিক্রিয়ার ফলেই সে নিজ দেহের ওজন অনুভব করে। m-ভরসম্পন্ন ব্যক্তিটির উপর কার্যকরী বল হলো পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী বল P_1 ও বিমানের কেবিনের তলের প্রতিক্রিয়া বল P_2। এরা পরস্পর বিপরীতমুখী বলে ব্যক্তিটির উপর মোট লব্ধি বল হলো $P_1 - P_2$। বিমানটি যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r-দূরত্বে v বেগে পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে, তবে বিমানের ভিতর ব্যক্তিটির ত্বরণ হবে v^2/r

$$\text{অর্থাৎ} \quad \frac{P_1 - P_2}{m} = \frac{v^2}{r}$$

ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে যাওয়া যায়, অভিকর্ষজ ত্বরণের মানও ততই কমতে থাকে। যদি বিমানের উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান g_1 হয় তবে,

$$P_1 = mg_1$$

$$\text{এখন} \quad \frac{v^2}{r} = \frac{P_1}{m} = g_1 \text{ হলে,}$$

অর্থাৎ v-এর মান যদি এমন লওয়া হয় যে P_2-এর মান শূন্য হয়, তাহলে ব্যক্তিটি মহাশূন্যে ওজনশূন্যতা অনুভব করবে।

গণনা করে দেখানো যায়, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 200 মাইল উপরে মহাকাশযানের বেগ যদি ঘণ্টায় প্রায় 17,000 মাইল হয়, তবে ঐ মহাকাশযানের আরোহী মহাশূন্যে ওজন-শূন্যতা অনুভব করবে।

শ্যামসুন্দর দে*

*ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | নভেম্বর, 1972 | একাদশ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও জনকল্যাণ

আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের সহযোগিতা ছাড়া সামগ্রিক জনকল্যাণ অসম্ভব। তাই আজ সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই জনকল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি আধুনিক জ্ঞানকে জনকল্যাণের কাজে লাগাবার জন্যে সম্প্রতি এক বিস্তারিত কর্মসূচী রচনা করেছেন। কয়েক বছর যাবৎ আমরা লক্ষ্য করছি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে এই বিষয়টির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন।

জাতীয় কমিটি যে কর্মসূচী রচনা করেছেন, তা বর্তমানে খসড়া স্তরে রয়েছে। আভাস পাওয়া গেছে, পঞ্চম যোজনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে সামাজিক কল্যাণে নিয়োগের জন্যে পরিকল্পনাকারীরা বিশেষ যত্নবান। আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের হাতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান যে জাতি, সে সহজেই যে কোন কঠিন সমস্যা মীমাংসা করতে সমর্থ। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় সরকার ঘোষণা করেছেন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে এই প্রাচীন দেশের রূপান্তর সাধনই তাঁদের লক্ষ্য। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা আশানুরূপ নয়। এর কারণ বিজ্ঞানের খাতে সরকার এখনও যা বিনিয়োগ করছেন, তা যৎসামান্য বলাই চলে—মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা 0·5 ভাগ মাত্র। এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয়বরাদ্দ নিতান্তই অপ্রতুল। বৃটেন প্রভৃতি উন্নত দেশে শতকরা 2·5 ভাগ এখনও গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হয়।

আমাদের নতুন পরিকল্পনায় নাকি স্থির

হয়েছে, জাতীয় উৎপাদনের শতকরা এক ভাগ এর পর বিজ্ঞানের খাতে বিনিয়োগ করা হবে। পঞ্চম যোজনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ 2500 কোটি টাকা। সেদিক থেকে বিচার করলে বিজ্ঞানের খাতে অর্থ বিনিযোগের পরিমাণ আশাব্যঞ্জক। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন বা প্রয়োগে টাকার অঙ্ক একমাত্র বিবেচ্য নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রকুশলী, আনুষঙ্গিক সংগঠন ও অন্যান্য উদ্যোগ-আয়োজন।

আমাদের দেশে সুশিক্ষিত ও দক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের অভাব নেই বরং অনেক শিক্ষিত যন্ত্রকুশলী উপযুক্ত কাজের অভাবে বেকার হয়ে রয়েছেন। আর ঠিকমত সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে বেশ কিছু উদীয়মান বিজ্ঞানী বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। এদেশে সাংগঠনিক ত্রুটির কথা তো সকলেরই জানা। আর গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রে মসীজীবীতে পরিণত হন। নৈরাশ্যের ফলে কেউ দেশত্যাগ করেন, কেউ বা আত্মঘাতীও হন। এই সব বিশৃঙ্খলার ফলে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ যেটুকু জনসাধারণ পেতে পারতেন, তাও সর্বক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্র বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানী ও গবেষণাগার দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নপ্রায়। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা যেসব বিষয়ে গবেষণা করেন, তা মূলতঃ তত্ত্বগত ও বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণে লাগতে পারে, এমন সব বিষয়ে গবেষণা হয়ই না বলতে গেলে।

আজ আমাদের দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। আজ সারা দেশ জুড়ে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ সুরু হয়েছে, তা থেকে তাঁদের দূরে থাকলে চলবে না। শুধু সরকারী গবেষণাগার নয়, বেসরকারী শিল্প-সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও এই ব্যাপারে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্প-সংস্থার কর্তৃপক্ষ গবেষণার কাজে অর্থ বিনিয়োগকে নিতান্ত 'বাজে খরচ' বলে মনে করেন। এই মনোভাবের আজ পরিবর্তন ঘটাতে হবে। বৃটেন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গবেষণার একটা বিরাট ভার সেখানকার শিল্প-সংস্থাগুলি বহন করে এবং তার ফলে জনসাধারণ প্রভূত উপকৃত হয়ে থাকেন। আমাদের দেশে যে সব কাঁচামাল পাওয়া যায়, তাই দিয়ে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। এদেশে এমন সব গাছ-গাছড়া আছে, যা থেকে মূল্যবান ভেষজ প্রস্তুতের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। এই বিষয়ে গবেষণা এখনও আশানুরূপ হয় নি। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ঘরবাড়ী তৈরি—জনজীবনের সর্বত্র আজ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের ডাক পড়েছে। সেই ডাকে তাঁরা কি সাড়া দেবেন না? তাঁরা যে আত্মসুখে গজদন্ত-মিনারে বাস করেন না, দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদের যোগ্য পরিচয় দিতে পারেন—তার উপযুক্ত সময় আজ সমুপস্থিত।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি : পরিচয়, প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ

শ্রীদেবব্রত নাগ ও শ্রীজগৎজীবন ঘোষ*

প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ঐতিহাসিকদের মতে; মানুষের আক্রমণাত্মক (Aggressive) মনোবৃত্তি জন্মগত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এর স্বপক্ষে অনেক তথ্য দিয়েছে। উন্নত ধরণের তড়িদ্দ্বারের প্রয়োগ, মস্তিষ্কের গঠন-প্রকৃতি, স্নায়ুকোষের বিন্যাস ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রাণীর বিভিন্ন স্বভাবের মূলে মস্তিষ্কের গঠন-প্রকৃতি-গুলির সক্রিয়তা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আক্রমণাত্মক স্বভাব (Aggressive behaviour) যদিও মানুষের আদিম এবং জন্মগত ধর্ম, তবু মানুষ শান্তিতেই বেঁচে থাকতে চায়। মানুষের মধ্যে তবে কেন এই জঙ্গী মনোভাব? হয়তো সমস্ত প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করবার প্রবণতা মানুষের আক্রমণাত্মক স্বভাবের কারণ। অন্য প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করলে তফাৎ যা ধরা পড়ে, তা হলো মানুষের আক্রমণাত্মক স্বভাব বাঘ-ভালুকের মত বিক্ষিপ্ত নয়, বরং সহায়ক হয়েছে। ফলে কেবল ধ্বংসাত্মক পথে পরিচালিত না হয়ে গঠনমূলক আবিষ্কারের দিকেই মানুষের গতি নির্ধারিত হয়েছে। তবু আক্রমণাত্মক স্বভাব বর্তমান পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা বলা চলে। তাই আজ বিভিন্ন দেশে আক্রমণাত্মক স্বভাবের মূল কারণগুলি খুঁজে পাবার জোর চেষ্টা চলেছে এবং একাজে বিশেষ করে ইঁদুর, কুকুর, বেড়াল, বাঁদর, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের উপর পরীক্ষা করে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। এই প্রবন্ধে তারই বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষই বড় শিকারী

বেঁচে থাকবার জন্যে অতীতে মানুষকে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা মানুষের সমাজ-জীবন, ভাষা, বুদ্ধি, আশা-আকাঙ্খার কথা ভাবতে শিখিয়েছে; যদিও শিকারী মানুষের প্রথম দিককার উদ্দেশ্য একটিই ছিল—খাদ্য যোগাড় করা। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের (Archeologists) নথিপত্র থেকে যা জানা গেছে, তা হলো: হাজার হাজার বছর মানুষ কেবলমাত্র বড় বড় জীবজন্তু হত্যা করে খেয়ে বেঁচে ছিল। অস্ত্রশস্ত্র যদিও তখন কিছুই ছিল না, তবু পুরুষ মানুষের মধ্যে একত্র হয়ে বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তা ছিল, যা তৎকালীন অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। সুতরাং তখন থেকেই একসঙ্গে কোন কিছু করবার প্রয়োজনীয়তা মানুষের স্বভাবে স্থান পেয়েছিল। মানুষের মধ্যে আবার শক্তিশালী যারা, তারাই বেঁচে গেল। এ তো গেল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মত। দেহভিত্তিক পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হিংস্র আক্রমণাত্মক স্বভাবের মূলে কাজ করে। এই অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির আকৃতি বানরের দেহের তুলনায় যত বড়, তা মানুষের ক্ষেত্রে বানরের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির এক তৃতীয়াংশ হবে। মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরি করে জানা গেছে, মানুষের মস্তিষ্কে কতকগুলি association area, যেমন—কোন কিছু মনে রাখা, পরিকল্পনা করা, কোন কাজকে বাধা দেওয়া, ভাষা প্রকাশ করা ইত্যাদির গঠন-প্রকৃতিগুলি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বানর,

* প্রাণরসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি থেকে মানুষের মস্তিষ্কে ঐ সব গঠন-প্রকৃতিগুলি অনেক বেশী উন্নত।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে শিকার করবার প্রবণতা মানুষকে বানর কিংবা শিম্পাঞ্জি থেকে অনেক বেশী উন্নত করতে সাহায্য করেছে। বানর, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি যদিও চোখে খুব ভাল দেখতে পায়, কিন্তু ঐ গাছের উপর থেকে খুব কাছাকাছি স্থানগুলি ছাড়া ওদের বেশী একটা এগিয়ে যেতে দেখা যায় না। ওরা মাত্র তিন-চার বর্গমাইলের মধ্যে কাজকর্ম, চলাফেরা এবং অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ রাখে। কিন্তু মানুষ দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক অজানা রহস্যের সন্ধানে। এই ঔৎসুক্য এবং স্বনির্ভরতা অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে। প্রথম দিককার জীবনযাত্রার ছবি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যা সংগ্রহ করেছেন, তা হলো মানুষ ছোট ছোট দলে বাস করতো। ওদের মধ্যে পুরুষেরাই বেশী বড় ধরণের শিকার করতো আর মেয়েরা সাধারণতঃ বাদাম, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করতো। শেষে সবাই মিলে ঐ সংগৃহীত খাদ্য ভাগ করে খেত। সুতরাং বড় বড় পশু শিকারের প্রবণতা, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাজের ভাগাভাগি তখন থেকেই দেখা দিয়েছিল।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ হলো, মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রী-ঋতুর সময় পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে মেলামেশা যেমন খুব প্রকট থাকে, অন্য সময় তেমনটি থাকে না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে সারা বছরই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক প্রায় একই রকম থাকে। ফলে মানুষের পক্ষে একমাত্র ছোট ছোট পরিবার করে থাকা সম্ভব হয়েছে।

পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, শিকারকে জীবন-যাত্রার অংশ হিসাবে যেদিন থেকে মানুষ গ্রহণ করেছে, সেদিন থেকেই গঠনমূলক কাজ, রুগ্ন এবং ক্ষত ব্যক্তির সেবা করা ইত্যাদির অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সুরু করেছে। শিকার করতে গিয়ে মানুষ যখন ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তখনই গাছ-গাছড়া দিয়ে ক্ষতের চিকিৎসা করবার চেষ্টা করেছে। অনেক সময় আরোগ্যলাভ করেছে, কিন্তু অবহেলায় মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং দলবদ্ধ-ভাবে, সেবাযত্নের মাধ্যমে এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার প্রবণতা মানুষকে ভবিষ্যতে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে।

মানুষের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক হলো, ভাষার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জন করা। কোন বিশেষ জায়গার পরিচয় ও বর্ণনা একমাত্র ভাষার মাধ্যমেই সহজে হওয়া সম্ভব। অতীতে মানুষ এবং মানুষের কাছাকাছি অন্য প্রাণীরা নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করতো শুধু ধ্বনি এবং হাত-পা নাড়বার মাধ্যমে। এমন কি—বানর, হনুমান এবং মানুষ তখনও আবেগ, উত্তেজনার অনুভূতি প্রকাশ করতো কোন না কোন ভাবে। এখন জানা গেছে, এই সব ভাব প্রকাশের মূলে গুরু-মস্তিষ্ক স্তর (Cerebral cortex) বাদে মস্তিষ্কের limbic অংশটি বেশী দায়ী। বিবর্তনের ধারায় মানুষের মস্তিষ্কে একটি নতুন স্থান সুগঠিত হলো। তা হলো বস্তুবিষয়কে নামকরণ করা—যদিও কোন কিছুর নাম দিতে হলে প্রথমে ভাল করে জিনিষটিকে দেখে নেবার প্রয়োজন আছে। মানুষের মধ্যে যারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায় না—তাদের ক্ষেত্রেও মস্তিষ্কের দৃষ্টি-সম্পর্কিত স্থানটি বিশেষ সুগঠিত। কোন কিছুর নামকরণের জন্যে দৃষ্টিসম্পর্কিত স্থানটি মস্তিষ্কের যে স্থানে আছে, তার সঙ্গে মস্তিষ্কের ধ্বনি উচ্চা-রণের মূলে যে স্থানটি রয়েছে, তার যোগাযোগ আছে। মস্তিষ্কের এই দুটি অংশ যৌথভাবে মানুষের কথাবার্তা বলবার মূলে কাজ করছে। একদল পর্যবেক্ষকের মতে, inferior parietal lobule নামক স্থানটি বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে

সংযোগ রক্ষা করে। কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের অনুভূতিকে ভাষার মাধ্যমে রূপদান করে। অন্যান্য প্রাণীদের গুরু-মস্তিষ্ক স্তরে ঐ অংশটির অভাব দেখা গেছে। ফলে শিম্পাঞ্জি মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও অনেক চেষ্টা করেও শিম্পাঞ্জিকে কোন কিছুর নাম শেখানো সম্ভব হয় নি।

তাই দেখা যাচ্ছে, শিকার মানুষকে কেবল যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গেছে তা নয়, মানুষের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, যেমন—আত্মরক্ষার জন্যে বাসস্থান এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, উদ্ভাবন, সামাজিক সচেতনতা অর্থাৎ একসঙ্গে থাকবার প্রবণতা, ভাষার মাধ্যমে ভাব-ভঙ্গী, বিষয়বস্তু ইত্যাদি প্রকাশ করা। সুতরাং অন্যান্য প্রাণীদের মত কোন একটি স্থান বেছে নিয়ে থাকার চেয়ে মানুষ বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ-ভাবে মানিয়ে নিতে চেয়েছে।

শিকার তৃণভোজী প্রাণীজগতের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। ইতিহাস বলে এককালে মানুষ এবং অন্য প্রাণীরা বন্ধুভাবে একে অন্যের ক্ষতি না করে একই ডোবার জল পান করতো, কিন্তু বিবর্তনের ধারায় মানুষকে এত আক্রমণাত্মক করে তুললো যে, পৃথিবীর সবচেয়ে লড়িয়ে প্রাণীকেও দখলে আনতে সক্ষম হলো। মানুষ কিন্তু অন্য প্রাণীদের এই ধোকাই দিয়েছে যে, মানুষ তাদের চেয়ে বেশী আক্রমণাত্মক। ফলে অন্য প্রাণীরা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে ভয় করতে শিখলো। তাই দেখা যাচ্ছে, সবদিক দিয়েই মানুষ নিজেকে আক্রমণাত্মক প্রমাণিত করলো।

প্রাণীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব

অনেকে মনে করেন, আজকের দিনের যুদ্ধ হলো বিভিন্ন মার্জিত রুচি এবং নিয়মকানুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব—মানুষের আক্রমণাত্মক স্বভাব যুদ্ধের জন্যে দায়ী নয়। অপর একদল পর্যবেক্ষকের মতে, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত মুষ্টিমেয় দু-একজনের উপর নির্ভর করে। ফলে যুদ্ধের সিদ্ধান্তের জন্যে মানুষের জৈবিক স্বভাব অনেকটাই নির্ভর করছে। তাই শুধু সামাজিক কাঠামোই যুদ্ধের জন্যে দায়ী ভাবলে ভুল হবে—যুদ্ধের নায়কেরাও যে যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী, তা অস্বীকার করা যাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান আক্রমণাত্মক স্বভাব সম্পর্কে সচেতন হবার অনেক আগে থেকেই ঐ স্বভাব প্রাণীদের মধ্যে ছিল। পুরুষ এবং স্ত্রীর আক্র-মণাত্মক স্বভাবের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্যের মূলে প্রধানতঃ testosterone নামক পুরুষের প্রধান যৌনউত্তেজক রস (Hormone) দায়ী। পর্যবেক্ষকেরা দেখিয়েছেন যে, আক্রমণাত্মক স্বভাবের সৃষ্টি হবার জন্যে testosterone প্রথমে মস্তিষ্কের hypothalamus এবং genital-এর গঠন-প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে পুরুষের রাগী মেজাজ এবং শক্তিশালী পেশী দুটই ভালভাবে তৈরি হয়—যদিও ঐ সব স্বভাবের প্রকাশ সাধারণতঃ নির্ভর করছে মানুষের ক্ষেত্রে অনেকটা পরিবেশের উপর। স্ত্রী-বাঁদরকে testosterone প্রয়োগ করে পুরুষ-বাঁদরের মত রাগী মেজাজের করা সম্ভব হয়েছে। ওরা যে সাধারণ পুরুষ বাঁদরগুলিকে কুপোকাৎ করে দিতে পারে, তাও দেখা গেছে। যদিও testos-terone দেওয়া হয় নি, এমন স্ত্রী-বাঁদর পুরুষ-বাঁদরের উপর ঐ সব পরিচয় দিতে গেলে জব্দ হয়ে যায়।

পরিবেশ যে কতটা আক্রমণাত্মক স্বভাব প্রকাশের জন্যে দায়ী, তার দৃষ্টান্তহিসেবে উল্লেখ করা যায় Dr. Delgado-র তড়িৎসম্পর্কিত পরীক্ষার বিষয়। জোয়ান বাঁদরের মস্তিষ্কে তড়িদ্বার প্রয়োগ করে উত্তেজিত করলে বাঁদরটি দলের অন্যান্য বাঁদরকে আক্রমণ করে, কিন্তু একটি রুগ্ন বাঁদরের মস্তিষ্কে ঐ ভাবে তড়িৎ পাঠিয়ে

উত্তেজিত করলে বাঁদরটি ভয়ে খাঁচার এক কোণে বসে রাগ হজম করে।

একই স্বভাবের একদল বাঁদর আবার অন্য স্বভাবের আর একদল বাঁদরকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না—বিশেষ করে আহারের সময়। মনে হয় প্রাণীদের মধ্যে এই জন্যেই স্থানের সীমারেখা মোটামুটি ঠিক থাকে। একই দলের জোয়ান বাঁদর আবার অন্যদের উপর যথেষ্ট মস্তানী চালিয়ে যায়। জোয়ান হবার দরুণ সবাই তাকে দলের সেরা বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু কোন কারণে যখন সে দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন দলের অন্য বাঁদরের স্বভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরা যদিও দাঁত, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির ব্যবহার করে বেঁচে আছে এবং ঐ সব অঙ্গের মাধ্যমে হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক স্বভাবের পরিচয় দেয়, তথাপি মানুষ নিজেদের মধ্যে যতটা খেয়োখেয়ী করে, অন্য প্রাণীরা তেমনটি করে না।

মস্তিষ্কে তড়িদ্দ্বারের প্রয়োগ

আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার উন্নতি বিশেষ করে কারিগরী বিদ্যার উন্নতি ও প্রয়োগ, মস্তিষ্কের বহু জটিল রহস্য সমাধানের পথ খুলে দিয়েছে। এই ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো Yale বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr Jose M. R Delgado-র তড়িৎসম্পর্কিত পরীক্ষা। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে তড়িৎ পাঠিয়ে প্রাণীদের স্বভাব, আচার-ব্যবহারে কতটা পরিবর্তন হয়, তা অনেকটা জানা গেছে। chemitrodes এবং dialytrodes নামক তড়িদ্দ্বার সাধারণ মস্তিষ্কে প্রয়োগ করে নানারকম দেহভিত্তিক পরিবর্তনের কারণ জানা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে মস্তিষ্কের রাসায়নিক এবং তড়িৎঘটিত পরিবর্তনগুলি ঐ তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে জানবার ফলে স্নায়ুকোষের জটিল বাঁধনগুলি কিভাবে চিন্তা, ভাব এবং চালচলনের মূলে কাজ করছে, তা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে কাজে লাগাবার চেষ্টাও চলছে।

তড়িদ্দ্বারের পরিচয়

chemitrodes বা রাসায়নিক তড়িদ্দ্বার এবং dialytrodes বা ঝিল্লীবিশ্লেষক তড়িদ্দ্বার দেখতে অনেকটা একরকম হলেও ওদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। মূলতঃ এগুলি এক জোড়া সমকেন্দ্রিক সূক্ষ্ম নল দিয়ে তৈরি। দুটি নলের একটি রাসায়নিক পদার্থের প্রবেশ পথ এবং অপরটি নির্গমন পথ হিসাবে কাজ করে। chemitrodes সাধারণতঃ মরচে ধরে না, এমন ইস্পাত কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এমন ধাতু দিয়ে তৈরি। dialytrodes কিন্তু এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যে, কোন স্থানে প্রবেশ করিয়ে দিলে সেখানে যে ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তার কিছু কিছু ঝিল্লী-বিশ্লেষণ হয়ে ঐ দ্বারে জমা হয়। এগুলি ব্যবহার করে মস্তিষ্কের খুব ছোট জায়গাতেও কি ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন হচ্ছে, তা জানা সম্ভব হয়েছে। যেহেতু নলগুলি এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি যে, একবার মাথার খুলির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেও বহু দিন অক্ষত অবস্থায় রাখা যায়। সে জন্যে একই প্রাণীর মস্তিষ্কে বিশেষ কোন স্থানে নানা অবস্থায় কি ধরণের রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা জানা সহজ হয়েছে।

তড়িদ্দ্বারের প্রয়োগ

chemitrodes এবং dialytrodes ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য হলো limbic system এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য স্থান, যেগুলি মানুষের আবেগ (Emotion) এবং আচার-ব্যবহারের ভাবা বহন করছে, সে স্থানগুলি উত্তেজিত করলে অ্যামিনো অ্যাসিড

এবং ক্যাটিকল নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলির সংশ্লেষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। বারবিটিউরেট (Barbiturate) নামক যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহকে কিংবা দেহের কোন অংশকে অবসন্ন করে দেয়, তাদের ঐ নলগুলির সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন বিশেষ স্থানে, যেমন বাঁদরের hippocampus কিংবা amygdala-তে প্রয়োগ করে দীর্ঘস্থায়ী অবসাদ (Depression) সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। Caudate nucleus নামক স্থানটি উত্তেজিত করলে আক্রমণাত্মক হিংস্র স্বভাবকে প্রশমিত করা যায়। অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ এবং ঘুমের কারণগুলিকে বাধা না দিয়েই হিংস্রতাকে প্রশমিত করা যায়। জানা আছে chlordiazepoxide hydrochloride নামক রাসায়নিক পদার্থটি দেহকোষে প্রয়োগ করলে হিংস্র স্বভাবের বাঁদরকে শান্ত করে দেওয়া যায়, যেমন না কি করা যায় caudate nucleus নামক স্থানটিকে উত্তেজিত করে। আরও জানা গেছে, central grey নামক স্থানটিকে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে যে আক্রমণাত্মক স্বভাব সৃষ্টি করা যায়—chlordiazepoxide hydrochloride প্রয়োগ করলে ঐ স্বভাব প্রশমিত হয়ে যায়। Dialytrodes মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে তড়িৎ কিংবা ভেষজ প্রয়োগ করে যে ধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তা dialytrodes-এর সাহায্যে সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে দেখবার কাজ সবে সুরু হয়েছে। অবসাদ (Depression) এবং উত্তেজিত অবস্থায় (Mania) স্নায়ুকোষ প্রান্ত থেকে যে ধরণের রাসায়নিক পদার্থ (বায়োজেনিক অ্যামিন, নরঅ্যাড্রিনালিন) নির্গত হয়, তাদের গুণগত (Quality) এবং পরিমাণগত (Quantity) পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্য করা গেছে।

আচার-ব্যবহার—স্নায়ুকোষ স্তরে

প্রাণীদের স্বভাবের সঙ্গে মস্তিষ্ক কতটা যুক্ত, তা জানবার জন্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন স্তরে স্নায়ুকোষগুলির মধ্যে পার্থক্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পেতে হবে। এই ব্যাপারে খুব সূক্ষ্ম তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে একটি সচেতন প্রাণীর স্বভাবে যে সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত তথ্য জানা গেলে বিকৃত মস্তিষ্ক কি ভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তার সমাধান করা সম্ভব হবে। এমন কি, মস্তিষ্কের আরও উন্নতি করা হয়তো সম্ভব হবে। তবে এটা ঠিক যে, বাঁদর কিংবা অন্য প্রাণীর মস্তিষ্কে তড়িদ্দ্বার প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে এমন সব সমস্যা এসে যেন হাজির না হয়, যা পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। এই কারণে আজকাল উন্নত তড়িদ্দ্বার যন্ত্র মস্তিষ্কে বসিয়ে দিয়ে দূর থেকে রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ফলে বাঁদর কিংবা অন্য প্রাণী এই অবস্থায় যথেষ্ট ঘুরে বেড়াতে পারে। মানুষ, বাঁদর প্রভৃতি সর্বোচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে স্তুপাকৃতি তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা হলো—শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-প্রকৃতিতে মৃদু তড়িৎ পাঠিয়ে দেখা গেছে, বিশেষ বিশেষ স্বভাবের জন্যে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ গঠন-প্রকৃতি কাজ করছে। কিন্তু যদি রাসায়নিক ঔষধ দেহকোষে প্রবেশ করানো যায়, তবে বিশেষ লক্ষণগুলি ছাড়াও আরও অনেক লক্ষণ দেখা যায়। নিউমেক্সিকোর Alamogordo নামক কৃত্রিম দ্বীপে বহু শিম্পাঞ্জির বাস। 1969 সালে ওখানকার শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে আধুনিক কম্পিউটার যন্ত্র ব্যবহার করে মস্তিষ্কের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে। একটি নিকটবর্তী কেন্দ্রে Steimoceiver নামক কম্পিউটার যন্ত্র এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, যন্ত্রটি শিম্পাঞ্জির

মস্তিষ্কের সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে দুই জোড়া সূক্ষ্ম তার প্রথমেই কৌশলে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এক জোড়া তার মস্তিষ্কে তড়িৎসম্পর্কিত যে সব পরিবর্তন ঘটে, তা সংগ্রহ করে কম্পিউটার যন্ত্রে সেই খবর পাঠিয়ে দিতে পারে আর অপর এক জোড়া তার মস্তিষ্কের এমন জায়গায় প্রবেশ করিয়ে রাখা হয়েছে, যেখানে উত্তেজিত করলে শিম্পাঞ্জি চঞ্চল হয়ে ওঠে। এইভাবে একটি হিংস্র শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে কম্পিউটার যন্ত্রের ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-প্রকৃতি (Caudate nucleus) দু-সপ্তাহ ক্রমাগত মৃদু তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে হিংস্র শিম্পাঞ্জিও খুব শান্ত হয়ে যায়।

এখন জানা যাচ্ছে যে, মস্তিষ্কে তড়িদ্দ্বারের প্রয়োগ ও তার সাফল্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হতে পারে। শারীরবিশারদেরা মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ গঠন-প্রকৃতি গোলমেলে স্বভাবের জন্যে দায়ী, তা প্রথমে মৃদু তড়িৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে জেনে নেন। তারপর ঐ স্থানগুলিতে আবার তড়িৎ পাঠিয়ে সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। আজকাল কিছু কিছু লোককে এই প্রণালীর সাহায্যে সাধারণ জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, মানসিক উদ্বেগ, বিরক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ে জানবার জন্যে মনোবিজ্ঞানীরা তড়িদ্দ্বার ব্যবহার করে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। উচ্ছ্বাস এবং তার প্রকাশের মূলে মস্তিষ্কের যে সব গঠন-প্রকৃতি কাজ করছে, তাদের বাছাই করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে বিজ্ঞানের এই ধরণের সাফল্য মানুষকে আরও সভ্য করে তুলবে। Delgado-র মতে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে প্রাণীদের স্বভাবের মূলে যে সব গঠন-প্রকৃতি কাজ করে, তা অনেক আগে থেকেই ঐ সব স্বভাবের পরিচয় বহন করে। কেবল ঐ সব স্থানের বিভিন্ন অবস্থা, যেমন—উত্তেজনা কিংবা অনুত্তেজনা প্রাণীদের স্বভাব ব্যক্ত করে।

বিভিন্ন আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি

বিজ্ঞানী Hess (1932) লক্ষ্য করেছিলেন, মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ধূসর স্নায়ুকোষ সমষ্টিতে (Central grey) তড়িৎ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে বেড়াল আত্মরক্ষার ভঙ্গী করে—যেন কুকুরে তাড়া করেছে। বেড়ালের চোখ ছানাবড়া, কান খাড়া, গোঁ গোঁ আওয়াজ—ইত্যাদি সুরু হয়ে যায়। ঐ একই ধরণের রক্ষাত্মক স্বভাবের পরিচয় উল্লেখ করেছেন আরও অনেক পর্যবেক্ষক। বেড়াল এবং বাঁদরের ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মস্তিষ্কের amygdala. posteroventral nucleus of the thalamus, tectal area, central grey এবং আরও অন্যান্য গঠন-প্রকৃতিকে উত্তেজিত করে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতির আক্রমণাত্মক স্বভাব সৃষ্টি করা যায়। এমন কি, তড়িৎ পাঠিয়ে একটি প্রাণীকে অন্য প্রাণীর উপর আক্রমণ করতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে।

একটি পরীক্ষায় বাচ্চা বেড়ালকে বড় বেড়ালের সঙ্গে রেখে দিয়ে দেখা গেছে—দু-জনের মধ্যে বেশ ভাব গড়ে ওঠে, কিন্তু ছোট বেড়ালটির মস্তিষ্কের midbrain অঞ্চলটি তড়িৎ পাঠিয়ে উত্তেজিত করবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটি গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে এবং থাবা উঁচিয়ে বড় বেড়ালটিকে আক্রমণ করে। যতক্ষণ ঐ অবস্থায় তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয়, ততক্ষণ ছোট বেড়ালটি বড়টিকে আক্রমণ করতে থাকে, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ছোট বেড়ালটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। এই পরীক্ষাগুলি সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী হবার ফলে বেড়াল দুটির কোনটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বার বার তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে বড় বেড়ালটির মধ্যে

সন্দেহের ভাব দেখা দেয়, ফলে দুটি বেড়ালের মধ্যে তখন প্রচণ্ড লড়াই সুরু হয়ে যায়। অনেকগুলি বেড়ালের মধ্যে যখন ঐ রকম পরীক্ষা করা হলো, তখন দেখা গেল দলের একটি বেড়ালের mid brain অঞ্চলটি উত্তেজিত করলে বেড়ালটি থাবা উচিয়ে অন্যান্য বেড়ালকে আক্রমণ সুরু করে দেয়, যদিও ঐ অবস্থায় দলের বড় জোয়ান বেড়ালগুলিকে সে এড়িয়ে চলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে আক্রমণাত্মক স্বভাব সৃষ্টি করলেও যথেষ্ট বুদ্ধির সঙ্গেই ঐ আক্রমণ পরিচালিত হয়ে থাকে। এই ধরণের আক্রমণাত্মক স্বভাব সৃষ্টি, প্রাণীর নিজস্ব স্বভাব, চালচলন এবং পরিবেশ সম্পর্কে নিজের অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

একই রকম পরীক্ষা একদল বাঁদরের উপর করে দেখা গেছে—বাঁদরের মস্তিষ্কের posteroventral nucleus of the thalamus কিংবা central grey matter-কে রেডিও মারফৎ উত্তেজিত করলে বাঁদরের স্বভাবে আক্রমণাত্মক ভাব ফুটে উঠে এবং বাঁদরটি সহকারী অন্য বাঁদরদের আক্রমণ করতে সুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরণের উত্তেজনার ফলে বাঁদরটি নিজেকেই আঘাত করতে থাকে। হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, আঁচড় কাটে ইত্যাদি। মস্তিষ্কের এই ধরণের উত্তেজনার ফলে একটি মা বাঁদর এবং তার বাচ্চার মধ্যে যে সম্পর্ক, তা কিন্তু কোন অবস্থাতেই নষ্ট করা যায় না। তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ স্থান উত্তেজিত করলে বড় বাঁদরটির মধ্যে আক্রমণাত্মক স্বভাব জেগে উঠলেও, ছোট বাঁদরটির যাতে কোন রকম ক্ষতি না হয়, সে বিষয়ে বড় বাঁদরটি যথেষ্ট সচেতন থাকে।

মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ গঠন-প্রকৃতি উত্তেজিতই হয় তা নয়, অনেক গঠন-প্রকৃতির অনুত্তেজিত অবস্থাও ঐ সব স্বভাবের জন্যে দায়ী। বিশেষ করে যে সব আচার-আচরণ সামাজিক নয় এবং প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকারক, সেগুলির জন্যে মস্তিষ্কের যে সব গঠন-প্রকৃতি কাজ করে, তা দমিত হয়ে থাকে। শিশুদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করা হয় কোন কিছু বার বার দেখিয়ে বা বার বার শুনিয়ে এবং তাদের শেখানো হয় কোন্‌টা গ্রহণযোগ্য এবং কোন্‌টা নয় ইত্যাদি। সুতরাং এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, মস্তিষ্কে হয়তো এমন কতকগুলি অনুত্তেজক স্থান আছে, যা শিশু অবস্থা থেকেই মানুষের গ্রহণযোগ্য নয় প্রবৃত্তিগুলিকে সচেতন করে তোলে।

অনেক পর্যবেক্ষক পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে মস্তিষ্কের কোন কোন স্থান উত্তেজিত করলে আক্রমণাত্মক স্বভাব সৃষ্টি না হয়ে শান্ত স্বভাব সৃষ্টি হয়। আক্রমণাত্মক মেজাজের বাঁদর, ষাঁড় প্রভৃতির basalganglia নামক স্থানটিতে তড়িৎ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে ঐ মেজাজী প্রাণীগুলি শান্ত হয়ে যায়। সাধারণতঃ বাঁদরের মুখের সামনে হঠাৎ হাত বাড়ালে সে ক্ষেপে হাতকে আক্রমণ করে, কিন্তু মস্তিষ্কের caudate nucleus স্থানটি তড়িৎ-প্রবাহ পাঠিয়ে উত্তেজিত করলে বাঁদর এত শান্ত এবং ঠাণ্ডা মেজাজের হয় যে, তখন হাত দিয়ে আদর করলেও আর আক্রমণ করে না। এই ঘটনাটিকে কাজে লাগিয়ে অনেক বাঁদরের মধ্যে প্রথমে একটি বাঁদরের স্বভাবে ঠাণ্ডা শান্ত সহযোগিতার মেজাজ সৃষ্টি করে দলের অন্যান্য বাঁদরগুলিকেও ঐ স্বভাব অনুসরণ করতে বাধ্য করা সম্ভব হয়েছে।

আক্রমণাত্মক স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ

কোন বিশেষ স্বভাবের মূলে যে সব সময়

উপসংহার

মানুষ যে জন্মগত হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক

স্বভাবের—একথা স্বীকার অনেকেই করেন না। কিন্তু যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের ধারণাকে সমর্থন করেছে। শোষণ, খুন, ষাঁড়ের সঙ্গে যুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, এবং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যুদ্ধ প্রভৃতি সবই মানুষের হিংস্র এবং আক্রমণাত্মক স্বভাবের পরিচয়।

বর্তমান যুগে সামাজিক বিবর্তন জৈবিক বিবর্তনের উপর যে ভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তাতে ভবিষ্যৎ মানুষের এই ব্যাপারে সচেতন হবার প্রয়োজন আছে। একথা ভাবা অনুচিত হবে না যে, ভবিষ্যৎ মানুষের জৈবিক বিবর্তন মানুষকেই স্থির করতে হবে। অনেকে মনে করেন, প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন হলে হয়তো মানুষের কপালে দুঃখই বেশী দেখা দেবে, কিন্তু সামাজিক পরিবেশ যে চেহারা নিয়েছে, তা প্রাকৃতিক বিবর্তনকে বিপথে চালিত করবে না কি? আর একটি প্রশ্ন হলো—ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে কি? মানুষের স্বভাবের উপর সবকিছু ছেড়ে দিলে যুদ্ধ হয়তো কখনই এড়ানো সম্ভব হবে না—কারণ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সাধারণতঃ দু-একজনের মতামতের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সেক্ষেত্রে সামাজিক রায়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তবে মানুষের মনের প্রকাশ দমিয়ে রাখা কখনই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পরিণামে এর ফল খারাপই হতে পারে। তাই মানুষের দূষিত স্বভাবগুলি যদি সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করা যায়, তবে আক্রমণাত্মক স্বভাব থেকে আরও অনেক বেশী সুফল আশা করা যেতে পারে।

মস্তিষ্ক-আধারে হিংসা, ঘৃণা, ভালবাসা, ক্রোধ ইত্যাদি মনের প্রকাশ উপলব্ধি করা গেলেও ঐ সব স্বভাবের সূক্ষ্ম গঠন-প্রকৃতি সহজে চোখে ধরা দেয় না। স্নায়ু-রসায়নবিদ্‌দের ধারণা—এমন দিন আসবে, যেদিন মনের বেড়াজাল ভেদ করে বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে মনের সূক্ষ্ম সূতাগুলি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। মস্তিষ্কের রহস্য-সন্ধানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যৌথ প্রয়োগ এই পথে সফলতা আনবে সন্দেহ নেই।

ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ*

সুভাষচন্দ্র পালিত

ভারত স্বাধীন হবার পর ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নেহেরু 1958 সালে লোকসভায় ভারতের বিজ্ঞান নীতি ঘোষণা করে বলেন, "The Government of India have decided that the aims of their scientific policy will be to foster, promote and sustain, by all appropriate means, the cultivation of science and scientific research in all its aspects, pure, applied and educational." ভারতের বহুবিধ সমস্যার সমাধান ও সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্বন্ধে বলেন, "It is science alone that can solve that problem of hunger and poverty, of insanitation and illiteracy, of superstition and deadening custom and tradition, of vast resources running to waste, of a rich country inhabited by starving people. At every turn we have to seek its aid. The future belongs to science and those who make friends with science." নেহেরুর ঘোষিত বিজ্ঞান নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক গ্রহণ করেছেন ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নে তাই ভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যাকে মানুষের উন্নতির কাজে লাগানো। এই উদ্দেশ্য নিয়েই 1950 সনে দুটি জাতীয় গবেষণাগার—'জাতীয় রাসায়নিক গবেষণাগার' আর 'জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে 30টি জাতীয় গবেষণা কেন্দ্র আর সমধর্মী প্রতিষ্ঠানে তিন হাজার গবেষক বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন। স্থির হয়েছে চতুর্থ পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার খাতে 272·4 কোটি টাকা খরচ করা হবে। স্বাধীনতা লাভ করবার পর থেকেই ভারত সরকারের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, বিদ্যুৎশক্তি, যোগাযোগ ও পরিবহন সম্পর্কে সত্যকারের সমস্যাগুলি সমাধান করবার উপযোগী কর্মদক্ষ একদল বিজ্ঞানী ও কর্মী তৈরি হয়েছেন। গত 11 বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ভারতের ব্যয় 27 কোটি টাকা থেকে পাঁচ গুণেরও বেশী বেড়ে 1969 সনে 136 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের বৈজ্ঞানিক জনশক্তিও সাড়ে তিন গুণ বেড়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে দশ লক্ষাধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তি রয়েছেন। এর মধ্যে 54% বিজ্ঞানী, 35% ইঞ্জিনিয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্যা-বিশারদ এবং 11% চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। 1950 সনে এদের সংখ্যা ছিল 188000।

বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন

রাশিয়ার বিপ্লবের পর লেনিন দুটি জিনিসের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন—শিক্ষা ও বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন। বিপ্লবের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে

* বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে পরিষদ পরিচালিত 'অমরেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি পাঠাগার' কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত।

বর্তমান রাশিয়ার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লেনিনের দূরদৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতকে শিল্পোন্নত হতে হলে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন বাড়াতে হবে। অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ অত্যন্ত কম। 1951 সালে ঘন্টাপিছু 17.78 কিলোওয়াট থেকে 1968 সনে দাঁড়িয়েছে 71.00 কিলোওয়াট—মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন 1951 সনে 24 লক্ষ কিলোওয়াট থেকে বর্তমানে 132 লক্ষ কিলোওয়াটে দাঁড়িয়েছে। পাঁচটি আঞ্চলিক 'পাওয়ার গ্রীড'-এর শক্তিকে একটি জাতীয় পাওয়ার গ্রীডে (National Power Grid) সংযুক্ত করে পরে তা ভারতের চারদিকে সুষ্ঠুভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগামী দশ বছরে ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে হবে 4 কোটি 20 লক্ষ মেগাওয়াট। জলপ্রবাহ ও কয়লার মিলিত শক্তি দিয়ে ঐ চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। তাই ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়া গত্যন্তর নেই। 1969 সালের অক্টোবর মাসে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে ভারতের প্রথম পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে। আরও দুটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রাজস্থানের রাণা প্রতাপসাগরে ও মাদ্রাজের কল্পকমে তৈরি হচ্ছে। তাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে প্রায় 14শত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে তৈরি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করে বর্তমানে থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম তৈরি করে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই থোরিয়াম ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে। এই গবেষণা সফল হলে ভারতে বিদ্যুতের দাম ইউনিট পিছু 4 পয়সা কমে যাবে।

সৌরশক্তির প্রয়োগ

ভারতীয় ঋষিরা সূর্যের বন্দনা করেছেন। পারসীকরা সূর্যের উপাসক। সভ্যতার উষালগ্নেই আদিম মানুষ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতো ভয়ে, বিস্ময়ে, আতঙ্কে, শ্রদ্ধায়। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকও সেই দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখছে সূর্যকে—সূর্য পৃথিবীর প্রাণ, সব শক্তির, সব খাদ্যবস্তুর উৎস। ভারতের বেশীর ভাগ অংশই, বর্ষার কয়েক মাস ছাড়া, সারা দিন অফুরন্ত সূর্যরশ্মি পায়—অবশ্য পৃথিবী অন্যান্য আটটি (সম্প্রতি দশম গ্রহটির কথা শোনা যাচ্ছে) সৌর গ্রহের সঙ্গে একত্রে সমস্ত সৌর শক্তির 12 কোটি ভাগের যে মাত্র 1 ভাগ পায়, এটা হলো তারই কিছু অংশ। সৌর শক্তিকে সরাসরি তাপে রূপান্তরিত করে মানুষের ব্যবহারের বহুবিধ সামগ্রী তৈরি করা সম্ভব। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই বিষয়ে গবেষণা করছেন এবং কিছুটা সফলও হয়েছেন। নতুন দিল্লীস্থ National Physical Laboratory সৌর শক্তির দ্বারা চালিত Solar Cooker, Stills এবং Heater নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বর্তমানে Solar Refrigerator ও গ্রামে ব্যবহারের উপযোগী Solar Power Plants তৈরির প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই জল। ভারতকে ঘিরে রয়েছে সমুদ্র। সূর্যকিরণ স্থলভাগের উপর যতটা পতিত হয়, জলভাগের উপর পতিত হয় তার চেয়ে বহুগুণ বেশী। ভারতের বৈজ্ঞানিকেরা এই Solar Thermal Energy-কে ভারতের উন্নয়নে ব্যবহার করবার চেষ্টা করতে পারেন। এই বিষয়ে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলেছেন, তার প্রমাণ Solar Energy নিয়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানী Farrington Daniels, তাঁর 'Direct use of the Sun's Energy' এবং D. S. Halacy, তাঁর 'Coming Age of Solar Energy' পুস্তকে দেখিয়েছেন সৌর

শক্তি কত বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন Boiling Kettle, Baking Ovens, Heat Storage, Water Heater, Agricultural and Industrial Drying, Solar Space Heating Systems, Solar Furnaces, Heat Engines, Photovoltaic Cells ইত্যাদি।

বায়ুশক্তির ব্যবহার

সৌর শক্তির পর ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেশের উন্নয়নের জন্যে যে সস্তা শক্তি ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন, তা হলো বায়ুশক্তি (Wind Power)। অবশ্য সূর্যের তাপের ফলেই বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে এই বায়ু-প্রবাহ যথেষ্ট শক্তিশালী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যদি ঘণ্টায় 30 মাইল বেগে বায়ু-প্রবাহ একটা প্রমাণ আকারের ক্রিকেট পীচের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে সেই বায়ু-প্রবাহকে 800 h. p. শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। অনুমান করা হয়, পৃথিবী যে পরিমাণ সৌর শক্তি পেয়ে থাকে, বায়ুশক্তি তার মাত্র শতকরা 2 ভাগ হলেও, তা 150 কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, তার সমতুল্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি বায়ুশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন ডেনমার্কে 3000 Industrial windmill থেকে গড়ে 30 kw করে প্রায় 100000 kw শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। আবার বাড়ীর ছাদে নির্মিত ছোট ছোট windmill থেকে আরও বাড়তি 100000 kw শক্তি উৎপন্ন হয়। ভারতে পশ্চিম ঘাট পর্বতমালায় পালাঘাট নামে একটি 20 মাইল দীর্ঘ ফাঁক (Gap) আছে। এখানে প্রায় 3000 বর্গমাইল এলাকায় যে বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তা কাজে লাগাতে পারা যায়, যদি প্রতি বর্গমাইলে 4টি windmill হিসাবে 12000 windmill বসানো যায়। তবে এদের সাহায্যে মোট যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে, তাতে 150টি গ্রামের 500টি বাড়ীতে দৈনিক 6 ঘণ্টা হিসাবে 40 watt-এর 5টি করে বাতি এক মাস ধরে জ্বালানো যায়। ঘণ্টায় 15 মাইল বেগে ছুটেযাওয়া বায়ু-প্রবাহে যদি 50 কিলোওয়াট সম্পন্ন windmill বসানো যায়, তবে 100000 kwh শক্তি উৎপন্ন করা যায়, যা পাম্পের সাহায্যে জল তোলা, কাঠ চেরাই, শস্য ভাঙ্গা, আলো জ্বালানো, সেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মানুষ অনেক কাল আগেই সমুদ্রের স্রোতকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু সমুদ্রের যে অবিরাম ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে, সে ঢেউকে কাজে লাগাবার চেষ্টা এতদিন করে নি। সম্প্রতি যে সব দেশ এই বিষয়ে নজর দিয়েছে, ফ্রান্স তাদের মধ্যে শীর্ষে। ফ্রান্স এই বিষয়ে গবেষণা করে ইতিমধ্যেই আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করেছে। ভারত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ—মাইলের পর মাইল তার সমুদ্রোপকূল রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউকে টারবাইনের সাহায্যে শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারলে সমুদ্রবেষ্টিত রাজ্যগুলি সস্তায় শক্তি পেতে পারে।

ভারতের খনিজ পদার্থ

ভারতে খনিজ পদার্থের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। কয়লা, আকরিক লোহা, ও ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে বেশ উঁচুতে। সারা ভারতে কি কি ধরণের ও কি পরিমাণ লৌহেতর (Non-ferrous) খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে, তার বৈজ্ঞানিক সুষ্ঠু সমীক্ষা ও অনুসন্ধান হয় নি। বর্তমানে বিজ্ঞানকে এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হচ্ছে। আমেরিকার সহযোগিতায় বিদ্যুচ্চুম্বকীয় যন্ত্রের সাহায্যে "Operation

Hardrock" নামে Aerial Mineral Survey পরিচালিত হচ্ছে। এটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত ও যন্ত্রে সজ্জিত বিমানের সাহায্যে প্রথমে আকাশ থেকে বিদ্যুচ্চু-ম্বকীয় পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ, দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্দিষ্ট ভূমি পরীক্ষা এবং তৃতীয় পর্যায়ে মাটি খননের দ্বারা চূড়ান্ত পরীক্ষা। এই উদ্দেশ্যে দিল্লীর নিকট ফরিদাবাদে একটি বিশেষ গবেষণাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলা, বিহার, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রথম পর্যায়ের অনুসন্ধানে আশাতীত সাফল্য লাভ করা গেছে।

কৃষি-বিজ্ঞান

1970 সনে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন আমেরিকার কৃষি-বিজ্ঞানী Norman Ernest Borlaug। চির ঘাটতির দেশ ভারত সবুজ বিপ্লব সফল করে খাদ্যশস্যে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, উপরন্তু খাদ্য-শস্য রপ্তানীকারক দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে Borlaug-এর যুগান্ত-কারী সফল গবেষণার ফলে। তিনি ভারতে এসে ভারতের কৃষি-বিজ্ঞানীদের হাতে-কলমে উন্নত ফলনশীল বীজ সৃষ্টি করবার কাজে তালিম দিয়ে গেছেন। ব্যাপক সেচ-ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত সার এবং অধিক ফলনশীল গবেষণালব্ধ সঙ্কর শস্য-বীজ সৃষ্টি এবং একই ভূমিতে একাধিক ফসলের ফলে ভারত বর্তমানে প্রায় 11 কোটি টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সমীক্ষায় জানা গেছে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় 44 লক্ষ টন খাদ্যশস্য অপচয় হয়। ভারতে খাদ্যশস্য অপচয় সম্পর্কে তদন্তের জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাদের রিপোর্টে প্রকাশ ভারতে উৎপন্ন বা আমদানীকৃত খাদ্যের 10% পরিবহনকালে বা রাখবার অব্যবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়, প্রায় 9 লক্ষ টন চাল ও 2·75 লক্ষ টন গম ইঁদুরের খাদ্য হয় এবং পাখী ও পোকার পেটে যায় 10·78 লক্ষ টন চাল এবং 3·84 লক্ষ টন গম। পরিবহনকালে এবং ধান ঝাড়াইয়ের উঠানে নষ্ট হয় 16·69 লক্ষ টন চাল এবং 1·26 লক্ষ টন গম। এই ক্ষতির একটি বড় অংশ পরিহার করা সম্ভব উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাদ্য সংরক্ষণে ও ধান মিলিং করবার ফলে। U. N. O-এর সহযোগিতায় ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে হাপরে National Grain Storage Institute স্থাপন করেছেন। ভারতে ব্যবহৃত ধান ভাঙবার যন্ত্র অত্যন্ত পুরাতন ধাঁচের। খড়্গপুরস্থ I.I.T. প্রতিষ্ঠানে আধুনিক Rice Milling Plant-এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে পুরনো পদ্ধতিতে যেখানে 100 কেজি ধান থেকে 60 হতে 65 কেজির মতন চাল উৎপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে উন্নততর যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা শুকানো ও ভাঙানো হলে এই হার শতকরা 6 ভাগ থেকে 8 ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। খড়্গপুরের I.I.T-তে Agricultural Engineering Department এক স্বল্পকালীন Rice Processing Engineering পাঠক্রম চালু করেছে। আসামের এক যন্ত্রবিদ্ এক উন্নত ধরণের আধুনিক Rice Milling Plant তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অধিক ফসল উৎপাদনের পক্ষে সার একান্ত অপরিহার্য। সার উৎপাদনেও ভারত সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে একর প্রতি সারের ব্যবহার শোচনীয়রূপে কম। ভারতে জৈব সার-রূপে গোবর উৎকৃষ্ট। জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে এই সহজলভ্য সার অপচয় করা হচ্ছে। বলা হয় সিন্ধ্রি কারটিলাইজার ফ্যাক্টরিতে যে পরিমাণ সার উৎপন্ন হয়, কেবলমাত্র জ্বালানীরূপে গোবর পুড়িয়ে তার প্রায় 12 গুণ সার অপচয় করা হচ্ছে; অর্থাৎ গোবর ঘুটেতে রূপান্তরিত করবার ফলে ভারতে প্রায় 20 কোটি খামারের

সার নষ্ট হয়ে যায় প্রতি বছর। অথচ ধানবাদস্থ Central Fuel Research Institute এবং হায়দ্রাবাদস্থ Regional Research Laboratories নির্ধূম জ্বালানী উৎপাদনে সফল হয়েছেন। তাছাড়া হুগলিস্থ গ্রামসেবক শিক্ষণ কেন্দ্র স্বল্প মূল্যে Cowdung Gas Plant নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে 4 বা 5 cuft. গোবর থেকে 120 থেকে 130 cuft গ্যাস উৎপন্ন করা যায় এবং সেই গোবরও পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সারে পরিণত হয়। অবশ্য খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। স্বল্পমূল্যে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন না করলে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়। হায়দ্রাবাদের National Institute of Nutrition এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ

জাপান, বাঙলাদেশ, ভারত প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দেশ ঘূর্ণিবাত্যার দ্বারা প্রতি বছরই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহাকাশ অভিযান আরম্ভ হবার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া বেশ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভারতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া নিখুঁত হলে ভারতের প্রায় বাৎসরিক 600 কোটি টাকা বেঁচে যাবে। ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ও মহাকাশ গবেষণা কমিটির পূর্বতন চেয়ারম্যান স্বর্গত ডক্টর বিক্রম সরাভাই কয়েক বছর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের Times পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বলেছিলেন—ভারত অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় "Space Meteorology"-এর গোড়াপত্তন করেছে এবং ভারতীয় কৃষকদের যদি 3 থেকে 10 দিন পূর্বেই আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাষ জানানো যায়, তাহলে তারা তাদের কৃষিকার্য সেইভাবে অদল-বদল করলে মোট কৃষি উৎপাদনের অন্ততঃ শতকরা 5 ভাগ বাঁচানো যেতে পারে, ফলে প্রায় 80 কোটি ডলার সমমূল্যের সাশ্রয় হবে প্রতি বছর। ত্রিবান্দ্রমের কাছে পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখায় অবস্থিত থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ ঘাটি থেকে রোহিণী-70 এবং রোহিণী-75 নামে দু-ধরণের রকেট সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ প্রযুক্তি কেন্দ্রের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারেরা উৎক্ষেপণ করেছেন।

World Meteorological Organization (WMO) সাইক্লোন আক্রান্ত দেশগুলিতে সুষ্ঠু-ভাবে সাইক্লোন, প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা সম্বন্ধে সঠিক পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব করে তুলতে সেই দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করছে। ব্যাঙ্গা-লোরস্থ ভারত ইলেকট্রনিক্স ইতিমধ্যেই এই উদ্দেশ্যে Coastal Radar যন্ত্র নির্মাণ সুরু করে দিয়েছে। 10 cm. তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমন্বিত শক্তিশালী প্রথম রেডারটি বিশাখাপত্তনমে স্থাপন করা হয়েছে। আরও এরূপ সাতটি 'Cyclone-detecting Radar' মাদ্রাজ, কলিকাতা, ভুবনেশ্বর, বোম্বে ও গোয়ার সমুদ্রতীরে স্থাপন করা হবে। 3 cm. তরঙ্গদৈর্ঘ্যসমন্বিত 10টি storm-detecting Radar ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করা হয়েছে। এই রেডারগুলির সক্রিয় সীমা 400 কিঃ মিঃ; সেজন্য এদের দ্বারা 24 ঘন্টার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব নয়। 1960 সাল থেকে কৃত্রিম আবহ-উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা করছে এবং প্রায় 1500 কিঃ মিঃ উচ্চতা থেকে টেলিভিসন মারফৎ সাইক্লোনের ছবি প্রেরণ করে চলেছে। বোম্বে, নতুন দিল্লী, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় এই ছবি গ্রহণ করবার বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রতি বছর মার্চ মাসে যে সব দেশে বিশ্ব আবহ দিবস (World Meteorological Day) পালন করা হয়, ভারত তাদের অন্যতম। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এবাবদে প্রায় 3 কোটি 50 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে বলে স্থির হয়েছে। বিশ্বব্যাপী আবহ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ভারতও

সহযোগী এবং ভারতে আন্তর্জাতিক আবহ তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপিত হবে। গত বছর বোম্বেতে Indian Space Research Organization-এর আমন্ত্রণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 12 জন বিজ্ঞানী International Council of Scientific Union ও World Meteorological Organization পরিচালিত Global Atmospheric Research Programme (GARP) চালু করবার জন্যে চারদিন-ব্যাপী একটি কনফারেন্সে মিলিত হয়েছিলেন। আগামী 1974 সনে GARP চালু হবে। বিশেষ যন্ত্রসজ্জিত 20টি বিমান ও 25টি জাহাজ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এবং স্থাপন করা হবে 4টি Geo-Stationary উপগ্রহ, 6টি Polar Orbiting উপগ্রহ এবং অনেকগুলি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এতে এক উল্লেখযোগ্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন। ভারতীয় বাজেট যে "a gamble in rain"—এই অপবাদ এবার হয়তো দূর হবে।

পুনার নিকট আরভিতে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংবাদ আদান-প্রদানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ভারতে আর সব রাজ্যে টেলিভিসান প্রবর্তনে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভূত সাহায্য করবে। অন্যান্য দেশকে ব্যাপকভাবে টেলিভিসান মারফৎ অনুষ্ঠান প্রচার করতে যত ব্যয় করতে হয়েছে—ভারতকে অত ব্যয় করতে হবে না, যদিও ভারত বিরাট দেশ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা

চীনের পরে ভারতের জনসংখ্যাই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম। পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমিত রাখবার চেষ্টা চলছে। Indian Agricultural Research Institute-এর ডিরেক্টর শ্রী এম. এস. স্বামীনাথন বলেন—ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে ভারতীয় শিশুদের যদি পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত এখন থেকেই না করা হয়, তবে আশঙ্কা করা হয় দুই দশক বাদে ভারত ব্যাপক হারে "intellectual dwarfing" বিপদের সম্মুখীন হবে। কারণ জীব-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, মানব শিশুর মস্তিষ্ক 4 বছরের মধ্যেই পূর্ণ ওজনের বা বিকাশের 80% থেকে 90% সমাপ্ত হয়ে যায়। সে কারণে প্রথম 4 বছরের মধ্যে যদি শিশুর মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনীয় পুষ্টি বা খাদ্য না পায়, তবে তা আর কোন দিনও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারবে না। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, সেই শিশুদের যদি স্বল্পমূল্যে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার সুবন্দোবস্ত না করা যায়, তবে ভারতে উন্নয়নের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষিত ও দক্ষ সব ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মিলিত চেষ্টায় এটা সম্ভব। গুজরাটের তৈল শোধনাগারে 'crude oil' থেকে প্রায় 70% প্রোটিন পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের সহযোগিতায় আরও গবেষণা চলছে।

জনসংখ্যার কথায় আসছে বাসগৃহেরও সমস্যা। শুধু সুষম পুষ্টিকর আহারই নয়, বাস-যোগ্য আশ্রয়ও মানুষের দরকার। ভারতের শহরগুলিতে প্রায় এক কোটি লোকের বাসযোগ্য কোন বাড়ী নেই এবং ভারতের বিশাল পল্লী অঞ্চলে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ লোকের নেই উপযুক্ত বাসস্থান। এটি সরকারী হিসাব। এই হিসাব তৈরি করেছেন গৃহ-দপ্তরের ওয়ার্কিং গ্রুপ, এবং চতুর্থ যোজনার জন্যে তা তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারের কিছুটা স্থায়ী এবং বাসযোগ্য একটা বাড়ী থাকা দরকার। এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই এই হিসাব করা হয়েছে এবং এই হিসাবে কাঁচা বাড়ী ও ভেঙে পড়া বাড়ীও ধরা হয়েছে। বর্তমানে ভারতের এক কোটি ইউনিটেরও বেশী বাসস্থান আবশ্যক

এবং তা তৈরি করতে খরচ পড়বে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকারও বেশী। বর্তমানে যে গতিতে বাড়ী নির্মাণ করা চলছে, তাতে এই শতাব্দীর মধ্যেও ভারতের গৃহ-সমস্যার সুরাহা হবে না। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করছেন কি করে স্বল্পমূল্যে স্থায়ী বাসযোগ্য গৃহ নির্মাণ করা যায়। কলকাতার CMPO পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা যেটাতে Prefabricated housing project পরিকল্পনা করেছেন। স্বল্পমূল্যে অল্প সময়ের মধ্যে যাতে বাড়ী তৈরি করা যায়, তার জন্যে 'Ucopan' (Universal concrete panel) পদ্ধতিতে বহু তলাবিশিষ্ট গৃহ-নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিবিধ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা প্রশংসনীয় কাজ করে চলেছেন।

পারমাণবিক বিচ্ছুরণ শক্তিসম্পন্ন নানা রকম কাঁচা-মাল ও তৈরি জিনিস, যেমন গামা ইররেডিশান ইউনিট, রেডিও আইসোটোপ, রেডিয়েশান যন্ত্রপাতি ভারতের নিজ প্রয়োজনই মেটাচ্ছে না, বিদেশে রপ্তানী করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে। টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চের বৈজ্ঞানিকেরা 65 লক্ষ টাকায় উটাকামণ্ডে 530 মিটার লম্বা পিরিচের আকৃতির একটি রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন। এর সাহায্যে মহাজগতের বেতার-তরঙ্গ ও মহাকাশসংক্রান্ত নানা তথ্য জানা যাবে।

বর্তমান জগতে দুরূহ ও জটিল হিসাব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নির্ভুলভাবে করবার জন্যে ব্যাপকভাবে গণকযন্ত্র বা কম্পিউটার ব্যবহার সুরু হয়েছে। কম্পিউটারের সাহায্যেই মহাকাশ অভিযান এবং চাঁদে যন্ত্র ও মানুষ নামানো সম্ভব হয়েছে। ভারতেও কম্পিউটার যুগের আরম্ভ হয়েছে—শিল্প-বাণিজ্যে, গবেষণায় কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, অ্যাপোলো অভিযানে ব্যবহৃত সেকেণ্ডে 10 লক্ষ হিসাব করতে সক্ষম System-360 কম্পিউটারের নির্মাতা IBM ভারতেও এই কম্পিউটার নির্মাণ করবার প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে করেছে।

অন্ধ্রপ্রদেশের Singareni Collieries ও ধানবাদের Central Fuel Research Institute কয়লা থেকে অপরিশুদ্ধ তৈল নিষ্কাশনে সফল হয়েছেন। Singareni 'solvent refining' করে chemicals, low ash coat ও liquid fuel তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরির প্রস্তাব করেছেন। CFRI উচ্চ sulpher Assam কয়লা থেকে 'Hydrogenation' পদ্ধতিতে তেল বের করতে সক্ষম হয়েছে। ভুবনেশ্বরের Regional Research Institute নাক্সভূমিকা বীজ থেকে 'ultrasonic energy' ব্যবহার করে brucine, strychnine প্রভৃতি alkaloid নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়েছেন। utrosonic energy প্রয়োগের আরও কয়েকটা সরঞ্জাম এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করছে, যার মধ্যে আছে Universal ultrosonic generator। কানপুরের প্রতিরক্ষা গবেষণাগার মানুষের মাথার চুল থেকে অতি উৎকৃষ্ট উল তৈরির উন্নততর পদ্ধতি বের করেছেন। সরকারীভাবে জানানো হয়েছে—ঐ পদ্ধতিতে দিনে 100 কিলোগ্রাম উল উৎপাদন করতে হলে যন্ত্রপাতি কেনা ইত্যাদির জন্যে খরচ পড়বে প্রায় 27 লক্ষ টাকা। ভারতে এখন এই ধরণের উৎকৃষ্ট উল তৈরি হয় না, বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এশিয়ায় ভারতই প্রথম কৃত্রিম কর্নিয়া বা চোখের মণি তৈরি করতে পেরেছে। প্লাস্টিকের তৈরি প্রথম কৃত্রিম চোখের মণি গত 28শে এপ্রিল (1971) 25 বছর বয়স্ক এক দৃষ্টিহীন যুবকের চক্ষুকোটরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে চক্ষুরোগের

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

রাস্তাঘাট দেশের স্নায়ুজাল। ভারতের মতন বিরাট দেশের পক্ষে ভাল রাস্তা অপরিহার্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাল আদান-প্রদান, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের জন্যে, সহজে পচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাজারে প্রেরণের জন্যে সর্বঋতুতে উপযোগী পাকা রাস্তার যোগাযোগ দরকার। Indian Road Transport Development Association-এর সভাপতির মতে, এবাবদ ভারত সরকার যে শুল্ক আদায় করেন, তার পরিমাণ খুব কম করেও 650 কোটি টাকা, কিন্তু এই শুল্কের মাত্র 32% নাকি রাস্তা সংস্কারে ও নির্মাণের জন্যে ব্যয় করা হচ্ছে। তাঁর হিসাব মত রাস্তাঘাটের খারাপ অবস্থার জন্যে দেশের বছরে প্রায় 170 কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে। সহজলভ্য উপাদান ব্যবহার করে কিভাবে পাকা ভাল রাস্তা তৈরি করা যায়—তার জন্যে Central Building Research Institute, Central Road Research Institute এবং Cement Research Institute-এর বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে হাজার হাজার মণ fly-ash উৎপন্ন হয়, যা অপসারণ করতে কেন্দ্রগুলিকে মোটা টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু Power Economy Committee দেখেছেন উপরিউক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান fly ash থেকে সিমেন্ট, রাস্তা নির্মাণে prefab blocks ও bricks, glass, soil stabilization, sealing of oil wells প্রভৃতি ব্যবহার করবার পদ্ধতি বের করেছেন অথচ fly-ash সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

উপসংহার

ভারত অনগ্রসর কিন্তু উন্নয়নকামী দেশ। প্রায় দু-শ' বছর ধরে ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতীয়দের আত্মবিকাশের সুযোগ-সুবিধা ছিল অতি সীমিত ও সামান্য। ইংরেজ শাসকেরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ছিল, যা কুশল মসীজীবী সৃষ্টির পক্ষে ছিল যত অনুকূল, উদ্ভাবন ক্ষমতাসম্পন্ন সফল ও সার্থক বিজ্ঞানী, গবেষক, কারিগরী বিদ্যাবিশারদ প্রভৃতি সৃষ্টির পক্ষে ছিল তত প্রতিকূল। অথচ প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগে বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল ব্যাপক। তার ভিত্তি ছিল ধর্ম। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত, কারিগরী-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের শাখায় প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। Lin Yutang তাঁর, "The Wisdom of India" গ্রন্থে লিখেছেন, "India was China's teachar in religion and imaginative literature, and the world's teacher in trigonometry, quadratic equations, grammar, phonetics,...chess as well as in philosophy." Will Durant তাঁর 'The History of civilization' গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডে, 'Our Oriental Heritage'-এ 'Hindu Science' শীর্ষক অংশে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার একটা সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকেই আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত এবং দুটি বিশ্ব যুদ্ধ কারিগরীবিদ্যাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতকে পাশ্চাত্য দেশের কাছ থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ নিতে হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ভূতপর্ব চেয়ারম্যান স্বর্গত ডক্টর বিক্রম সারাভাই 1971 সালের ডিসেম্বর মাসে 'Indian Geophysical Union'-এর সভাপতির অভিভাষণে 'Space Age Science' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর নিজের কথায়, "National

benefit from an application of operational remote sensing techniques to agriculture, oceanography, geology, hydrology, geography, and cartology could be large. Repetitive aerial surveys during the vegetative growth and harvest times of a crop could provide reliable inventories of the size of the harvest. Remote sensing from orbiting satellites promised to extend such predictive techniques to very large areas and many crops like rice, wheat and maize. Use of multispectral (including infrared) imagery was expected to be of great help in the identification of crops and timber species, in the analysis of crops vigour, in the early detection of crop disease and other forms of crop stress due to deficient water supply." তিনি জানান ভারতের কেরল প্রদেশে এক লক্ষ একরবিশিষ্ট নারিকেল আবাদে Blight রোগ ধরবার জন্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরা সাফল্যের সঙ্গে এই 'remote-sensing' পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় এই বিষয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

ভারতের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ তখনই সম্ভব ও সার্থক হবে, যখন দক্ষ, কুশলী দেশহিতব্রতী বিজ্ঞানী ও গবেষকের সৃষ্টি হবে। ইংরেজ বিজ্ঞানী Thomas Huxley বিজ্ঞান-চর্চায় সরকারী অর্থানুকূল্যের সাহায্য চেয়ে 1900 খৃঃ বলেছিলেন, "If the Nation could purchase a potential Watt, Davy or a Faraday at the cost of a hundred thousand pounds, it would be dirt cheap." বিজ্ঞান-চর্চা এবং বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রতি ভারত সরকার মনোযোগ দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞানীদেরও একটা দায় ও কর্তব্য আছে। 1969 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের মূল সভাপতির অভিভাষণে ডক্টর এ. সি. যোশী যে অমূল্য কথাগুলি বলেছিলেন, তারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি।

"...Nations that are prosperous are also scientifically advanced and those which are indigent are backward in the pursuit of science. Scientific progress will come to a standstill if scientists abandon their quest for truth for its own sake and choose to become glorified technicians solely dedicated to the task of producing useful things. It is well to recognize that in a backward country the man of science cannot afford to be exclusively a starry-eyed idealist working steadfastly for the expansion of man's knowledge. In India he must get down from his Ivory Tower of abstract thinking to the solid earth. It is imperative that he shoule be aware of his social responsibilities and seek to marry research and technology with a view to promoting the well-being of the common man...For without aid from science the foundations of economic development cannot be laid nor an imposing edifice built on them."

নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রার সন্ধানে

হীরেন্দ্রকুমার পাল*

উত্তাপ চলাচলের ব্যাপারে তাপমাত্রার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে এই যে, উত্তাপ সব সময়েই গরম থেকে ঠাণ্ডার দিকে প্রবাহিত হয়। উষ্ণতা অনুভূতিগ্রাহ্য হলেও শুধু অনুভূতি দিয়ে তার সঠিক পরিমাপ করা যায় না; কোন কোন স্থলে নিরাপদও নয়। বিশেষ করে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নির্ভুল পরিমাপেরই একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য পরিমাপের যেমন, তাপমাত্রার ও তেমনি নানাবিধ মাপকাঠি —যাকে স্কেল বলে—প্রচলিত আছে। যেটি সাধারণ কাজের জন্যে বহুল ব্যবহৃত, তা হচ্ছে সেন্টিগ্রেড স্কেল। এই স্কেল অনুযায়ী স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (760 মি. মি. পারদ) গলন্ত বিশুদ্ধ বরফের তাপমাত্রাকে শূন্য ডিগ্রী (0°C) সে. গ্রে. এবং ফুটন্ত জল থেকে উত্থিত তাপমাত্রাকে এক শত ডিগ্রী (100°C) সে. গ্রে. ধরা হয়। এই দুই নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ব্যবধানকে এক শত সমান ভাগে বিভক্ত করে 1°C তাপমাত্রার ব্যবধান পাই। তাপমাত্রার স্কেলকে এই শূন্যাঙ্কের নীচে এবং 100°C-র উর্ধ্বেও সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

ঠাণ্ডায় সাধারণতঃ বস্তুর সঙ্কোচন ঘটে। গ্যাসও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। দেখা গেছে, নির্দিষ্ট চাপের অধীন প্রত্যেক ডিগ্রী সে. গ্রে. তাপমাত্রা কমাবার জন্যে যে হারে গ্যাসের আয়তন কমে, তা হচ্ছে 0°C-তে তার আয়তনের প্রায় 273 ভাগের এক ভাগ। এই নিয়মটি একটানা প্রযোজ্য হলে, গ্যাসকে এমন একটা তাপমাত্রায় নিয়ে আসা সম্ভব, যেখানে তার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আয়তন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই! একটু হিসাব করলেই পাওয়া যাবে, এই তাপমাত্রাটি প্রায় −273°c, অর্থাৎ গলন্ত বরফের তাপমাত্রার 2 3° নীচে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, উক্ত নিয়মটি —যা 'চার্লস-এর নিয়ম' বলে খ্যাত,—একটানা প্রয়োগের পথে প্রবল অন্তরায় আছে। কেন না, পরিচিত যাবতীয় গ্যাসই ঐ তাপমাত্রায় পৌঁছবার অল্পবিস্তর পূর্বেই তরলীভূত হয়ে গ্যাসীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে। তবু কোন আদর্শ, নিখুঁৎ ও স্থায়ী গ্যাসের কল্পনা করে তাকে এই নিয়মের একটানা আওতায় আনতে আপত্তি থাকতে পারে না। যেহেতু, শূন্যের চেয়ে কম কোন আয়তন চিন্তা করা যায় না, সেহেতু −273°c-র নীচেও কোন তাপমাত্রার অস্তিত্ব ধারণাতীত, অর্থাৎ, এই হলো বিশ্বের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

−273°c-কে কোন স্কেলের শূন্যাঙ্ক এবং তার প্রত্যেক ডিগ্রীকে সেন্টিগ্রেড স্কেলের এক ডিগ্রীর সমান ধরে অন্য একটি মাপকাঠি তৈরি করা যেতে পারে এবং করলে সুবিধাই হয়, কেন না এতে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক তাপমাত্রার কোন বালাই থাকে না। নতুন মাপকাটিকে বলা হবে নিখুঁৎ গ্যাস-স্কেল।

লর্ড কেলভিন কিন্তু উষ্ণতা পরিমাপের জন্যে আর এক রকম স্কেল-এর প্রবর্তন করেছেন— যাকে তাঁরই নামানুসারে কেলভিন-স্কেল বলা হয়। তাপগতি-বিজ্ঞান (Thermodynamics)-ভিত্তিক এই স্কেলের সঙ্গে নিখুঁৎ গ্যাস-স্কেলের কোন প্রভেদ যে নেই, এটা দেখানো চলে। দেখানো চলে, ঐ গ্যাস-স্কেলের শূন্যাঙ্ক (0°C) কেলভিন-স্কেলেরও শূন্যাঙ্ক (0°K)। অতএব 0°K-র

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

নীচেও কোনও উষ্ণতা নেই বা থাকতে পারে না।

কেলভিন-স্কেলকেই কেন্দ্র করে আমাদের এই আলোচনা। এই স্কেলের মূলগত তত্ত্বানুধাবন করতে হলে, তাপগতি-বিজ্ঞানের অঙ্গনে প্রবেশ করতে হবে। এই বিজ্ঞানটির ইমারত যে তিনটি নিয়মসূত্র বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রথমটির ভিৎ গড়ে ওঠে বিজ্ঞানী জুলের (Joule) এক অনবদ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে। উত্তাপ যে শক্তির নানা বিকল্প রূপের অন্যতম, সে কথা বিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই জানতেন। তাঁরা জানতেন, উত্তাপ এবং 'যান্ত্রিক কার্য'-রূপী শক্তির মধ্যে পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। কিন্তু যে কথাটি জুলের পূর্বসূরীদের অজানা ছিল, সেটা হলো শক্তির এই উভয় প্রকাশের মধ্যে আছে যে গাণিতিক সম্পর্ক। প্রভূত গবেষণা ও অক্লান্ত সাধনার ফলে জুলই সর্বপ্রথম সে সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন। তিনি দেখালেন যে, ওটা একটা সমানুপাতের সম্পর্ক; অর্থাৎ যদি W আর্গ যান্ত্রিক কার্যের বিনিময়ে Q ক্যালরি উত্তাপ উৎপন্ন হয়, অথবা ঘটে এর বিপরীত ক্রিয়া, তা হলে $W \propto Q$। সুতরাং $W = J. Q.$, যেখানে J = এক ধ্রুব সংখ্যা, যাকে উত্তাপের যান্ত্রিক তুল্যাঙ্ক বা জুলের ধ্রুবক বলে। হাতে-কলমে পরীক্ষা থেকে এই তুল্যাঙ্কের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়েছে,—$J = 4.2 \times 10^7$ আর্গ / ক্যালরি।

তাপগতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রের কাজ হলো, জুলের গবেষণালব্ধ ফলকে আশ্রয় করে উত্তাপ ও শক্তির সমন্বয় সাধন করা। ধরা যাক, কোন বিচ্ছিন্ন পরিমণ্ডলে (System) dQ উত্তাপ প্রদানের ফলে তার আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির (যেমন হয়ে থাকে উষ্ণতা বৃদ্ধি হেতু) পরিমাণ হলো dU এবং সম্পাদিত যান্ত্রিক কার্যের পরিমাণ dW, তা হলে শক্তি-সংরক্ষণ-নীতি অনুসারে,

$$dQ = dU + dW \cdots \quad \cdots (1)$$

এই সমীকরণে বিধৃত হয়েছে, তাপগতি-বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র। সূত্রটি উত্তাপ থেকে শুধু যান্ত্রিক কার্য লাভের সম্ভাব্যতা ও তার পরিমাপ সম্বন্ধেই ইঙ্গিত দেয়। আর যে বিশেষ অবস্থাধীন এই 'কার্য' আদায় আদৌ সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তার হদিস পাওয়া যাবে তাপগতি-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র থেকে।

দ্বিতীয় সূত্রটি নানা ভাবে ব্যক্ত করা চলে। তন্মধ্যে ক্লাউসিয়াসের (Clausius) বয়ান এইরূপ—"কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পক্ষেই বাইরের কোন সাহায্য ব্যতীত, উত্তাপকে এক বস্তু থেকে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্তুতে প্রেরণ করা সম্ভব নয়; অর্থাৎ, উত্তাপ আপনা থেকেই কম উষ্ণ অঞ্চল থেকে বেশী উষ্ণ অঞ্চলে যেতে পারে না।" কেলভিনের নিজের ভাষায় বলতে গেলে—"নির্জীব জড় মাধ্যমের সাহায্যে পদার্থের কোন অংশবিশেষকে পারিপার্শ্বিক শীতলতম পদার্থগুলির তুলনায় অধিকতর শীতল করে কোন যান্ত্রিক কার্য লাভ করা অসম্ভব।" বস্তুতঃ, উভয় উক্তির মর্মার্থ অভিন্ন। মোদ্দা কথা এই যে, উত্তাপ থেকে যান্ত্রিক কার্য পেতে হলে, তাকে তার স্বাভাবিক খাতে, অর্থাৎ গরম থেকে ঠাণ্ডার দিকে চলবার সুযোগ এবং স্বাধীনতা দিতে হবে। এরূপ ব্যবস্থাপনায় দুটি জিনিস অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একটি উত্তাপের উৎস (Source) এবং অন্যটি উত্তাপ-গ্রাহক (Sink)। এগুলিকে অতঃপর আমরা যথাক্রমে তাপকুণ্ড ও হিমকুণ্ড নামে অভিহিত করবো। প্রথমটির তাপমাত্রা দ্বিতীয়টির চেয়ে অবশ্যই বেশী বলে উত্তাপের গতি তাপকুণ্ড থেকে হিমকুণ্ডের দিকে হতে পারবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কার্যতঃ কোন এঞ্জিন তাপকুণ্ড থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ সংগ্রহ করবে, তার সবটাই কি যান্ত্রিক কার্য সম্পাদনের জন্যে লভ্য হবে? এর উত্তর নেতিবাচক। সংগৃহীত উত্তাপের একটা অংশ অতি অবশ্য হিমকুণ্ডে উৎসর্গ করে যা উদ্বৃত্ত থাকবে, শুধু তাই যান্ত্রিক কার্যের জন্যে

প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এই ব্যাপারে এটাই শেষ কথা নয়।

কার্নো বলেন, যদি কার্যরত বস্তুকে একটি কর্ম-চক্র (Cycle of operation) ঘুরিয়ে আনা হয়; অর্থাৎ নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুনরায় তার প্রাথমিক দশায় (যেমন, চাপ, আয়তন এবং তাপমাত্রায়) ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, তবেই উত্তাপ এবং উদ্ভূত কার্যের মধ্যে কোন সার্থক সমন্বয়ের কথা চিন্তা করা যায়। কারণ, এমতাবস্থায় সমীকরণ (1)-এ $dU=O$ এবং $dQ=dW$। যে চক্র কার্নোর ভাবনায় প্রতিফলিত ছিল, তার আভাস 'চাপ-আয়তন নির্দেশক-চিত্রে' (P-v indicator diagram) দেখা যায় একটি চতুর্ভুজের সাহায্যে, যার বিপরীত বাহুযুগল দুটি করে সমোষ্ণ-রেখা (Isothermal) এবং স্থিরতাপ-রেখা (Adiabatic) দ্বারা অঙ্কিত। এক সমোষ্ণ-রেখায় ভ্রমণকালে কার্যরত বস্তু তাপকুণ্ড থেকে যে উত্তাপ আহরণ করবে, তারই কিছুটা অন্য সমোষ্ণ-রেখায় ভ্রমণকালে হিমকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। এই হলো কার্যোদ্ধারের পদ্ধতি ও শর্ত।

উক্ত কার্যকরী বস্তুসমন্বিত এঞ্জিনের দক্ষতা (Efficiency) বিচার হয়, কার্নো-চক্রে প্রলব্ধ কার্যের এবং তাপকুণ্ড থেকে আহৃত উত্তাপের অনুপাত দিয়ে। অতএব যদি ঐ কার্য এবং উত্তাপের পরিমাণ হয়, যথাক্রমে W এবং Q, তা হলে দক্ষতা $=W/Q$। আবার, যদি হিমকুণ্ডে প্রদত্ত উত্তাপের পরিমাণ হয় Q', তা হলে $W=Q-Q'$, সুতরাং দক্ষতা $=(Q-Q')/Q$। স্পষ্টতঃ, এই অঙ্কটা সব সময়েই এককের চেয়ে কম। কার্নো আরো দেখিয়েছেন যে, এঞ্জিনকে উল্টা দিকেও চালাতে পারলে এই দক্ষতার মাত্রা হবে সর্বাধিক। অধিকন্তু উভয় দিকে চলনক্ষম (Reversible) সকল এঞ্জিনেরই দক্ষতা হবে সমান, যার পরিমাণ নির্ভর করবে কেবল-মাত্র তাপকুণ্ড ও হিমকুণ্ডের নির্দিষ্ট তাপমাত্রার উপর; অন্য কিছুর উপরই নয়। এর ফলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, উভয়মুখী এঞ্জিনের জন্যে উপরিউক্ত সংগৃহীত উত্তাপ Q নির্ভর করবে শুধু তাপকুণ্ডের এবং প্রদত্ত উত্তাপ Q' শুধু হিমকুণ্ডের তাপমাত্রার উপর। এছাড়া গত্যন্তর নেই। তাপমাত্রা দুটিকে, যে কোন মাপকাঠিতে যথাক্রমে θ এবং θ' দ্বারা সূচিত করলে গণিতের ভাষায় লেখা যায়, $Q=C.f(\theta)$ এবং $Q'=C.f(\theta')$। এখানে $C=$ ধ্রুবক; আরো লক্ষণীয় যে, যখন তাপমাত্রা বেশী তখন সংশ্লিষ্ট উত্তাপও বেশী।

এরূপ অনুধ্যানের ভিতর দিয়েই কেলভিন তাপমাত্রার এক নতুন স্কেল সম্পর্কে আলোক প্রাপ্ত হন। উষ্ণতার নতুন মান হিসাবে তিনি ধরে নিলেন $f(\theta)=T$। কাজেই উভয়মুখী এঞ্জিনের জন্যে $Q/Q'=f(\theta)/f(\theta')=T/T'$ এবং

দক্ষতা $$\frac{Q-Q'}{Q}=\frac{Cf(\theta)-Cf(\theta')}{Cf(\theta)}=\frac{f(\theta)-f(\theta')}{f(\theta)}=\frac{T-T'}{T} \quad (2)$$

যদি $T'=0$ হয়, তা হলে $Q'=0$ এবং দক্ষতা $=1$

এই পটভূমিতে কেলভিন-স্কেলে শূন্যাঙ্কের যে সংজ্ঞা নির্গলিত হয়ে আসে, তা এইরূপ: হিমকুণ্ড যে উষ্ণতায় থাকলে কোন উভয়মুখী এঞ্জিন তাপকুণ্ডলব্ধ সমুদয় উত্তাপকে যান্ত্রিক কার্যে পরিণত করে পরিপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী হতে পারবে, সেটাই হলো 'শূন্য ডিগ্রী কেলভিন' (0°K)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নিখুঁৎ গ্যাস-স্কেলের সঙ্গে এই স্কেলের কোন পার্থক্য নেই। তাই অনুরূপভাবে এই স্কেলকেও চিহ্নিত করা চলে। নয়া স্কেলের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে তাপমাত্রা কোন বস্তু বিশেষের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না এবং সে অর্থে পরমও (Absolute) বটে।

আপাতদৃষ্টিতে কেলভিন-স্কেলে শূন্যাঙ্কের নীচে; অর্থাৎ, নেগেটিভ কোন তাপমাত্রার অস্তিত্ব বিশ্বে নেই বলেই মনে হয়। যেহেতু, তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় T′ = – ve, তা হলে সমীকরণ (2) অনুসারে উত্তাপমুখী এঞ্জিনের দক্ষতা এককের বেশী হয়ে যাবে, যার মানে, প্রলব্ধ কার্যের পরিমাণ হবে সংগৃহীত উত্তাপের তুল্যাঙ্কেরও বেশী। ওটা কিন্তু মোটেই সম্ভব নয়—শক্তি-সংরক্ষণ নীতি লঙ্ঘন না করে।

তবু আজ এই অসম্ভবের অন্বেষণেই বিপুল উদ্যমে যাত্রা সুরু হয়েছে বিজ্ঞানীদের। যে যুক্তির ভরসায় তাঁরা এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছেন, তা সম্যক উপলব্ধির জন্যে তাপগতি-বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষ ফলপ্রসূ ধারণার অবতারণা এখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এখানে এনট্রপির (Entropy) প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। এনট্রপি আসলে কি? উত্তাপ চলাচলের ব্যাপারে আনুষঙ্গিক তাপমাত্রাও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। T°K-তে কোন বিচ্ছিন্ন পরিমণ্ডলের ভিতরে যদি Q-পরিমাণ উত্তাপ অনুপ্রবেশ করে, তা হলে আমরা বলি—পরিমণ্ডলের এনট্রপি বাড়লো Q / T; আর যদি ঐ তাপমাত্রায় Q-পরিমাণ উত্তাপ পরিমণ্ডল ছেড়ে চলে যায়, তা হলে তার এনট্রপি কমলো Q / T। কিন্তু উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণতঃ তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিও জড়িত থাকে। কাজেই কোন বিশেষ অবস্থা A থেকে অবস্থান্তর B-তে পরিমণ্ডলের পরিক্রমা ঘটলে সংশ্লিষ্ট উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তাপমাত্রার সাহায্যে এনট্রপির পরিবর্তন সাধারণভাবে $\int_A^B dQ/T$—এই গাণিতিক সঙ্কেত দিয়ে লিপিবদ্ধ করা যায়। যে সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অথবা ব্যবস্থাতে উত্তাপের চলাচল বা হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, অর্থাৎ $dQ = 0$, সেগুলিকে বলা হয় স্থিরোত্তাপ (Adiabatic) স্পষ্টতঃ সে সকল ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থা সম-এনট্রপিও। (Isentropic) বটে। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বে বিকিরণ (Radiation), পরিবহন (Conduction) এবং পরিচলন (Convection) নামক একমুখী (Irreversible) ক্রিয়ার মাধ্যমেই উত্তাপ বিনিময় হয়ে থাকে। একমুখী এজন্যে যে, এসব ক্রিয়াতে উত্তাপের গতি সব সময়েই উচ্চ থেকে নিম্ন তাপমাত্রার দিকে। এই কারণে বিশ্বের এনট্রপি-সমষ্টি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এবং বৈজ্ঞানিক অর্থে 'কার্য' সম্পাদনের জন্যে লভ্য শক্তির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাগত এরূপ উত্তাপ বিনিময়ের ফলে একদা সর্বত্র তাপমাত্রার সমতা এসে যাবে এবং তৎসহ এনট্রপি শীর্ষমাত্রায় উন্নীত হবে। সেদিন বিশ্বের বড়ই দুর্দিন, কেন না সেদিন কোন এঞ্জিনের পক্ষেই উত্তাপ থেকে যান্ত্রিক কার্যোদ্ধার আর সম্ভবপর হবে না। অথচ যান্ত্রিক কার্যের মধ্যেই তো নিহিত রয়েছে আমাদের সভ্যতার আসল চাবিকাঠি।

পরিসংখ্যানবিদেরা কিন্তু এনট্রপিকে দেখে থাকেন অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। গ্যাসের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বোল্‌ৎস্‌মান (Boltzman) এনট্রপির একটা সুন্দর, চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। গ্যাসের গতিক-তত্ত্বে (Kinetic theory) কল্পনা করা হয় যে, তার অণুগুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়ায় সারাক্ষণ। বোল্‌ৎস্‌মান বলেন, এনট্রপি এই বিশৃঙ্খলারই (Disorder) একটা পরিমাপ এবং নামান্তর। কেন না, গ্যাসাণুগুলির মধ্যে উত্তাপের স্বাভাবিক আদান-প্রদানের ফলে বিশৃঙ্খলা যেমন বাড়ে, তেমন বাড়ে তার এনট্রপিও। বিশৃঙ্খলার মত এনট্রপিও একটা সামগ্রিক ব্যাপার। একটি মাত্র অণুর পরিপ্রেক্ষিতে বিশৃঙ্খলার কোন মানেই হয় না; এনট্রপিরও তাই। সুসংহত, সারিবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে যেমন ওটা হয়ে যায়

এক এলোমেলো জনতাবিশেষ, ঠিক সেইরূপ অবাধ উত্তাপ বিনিময়ের ফলেও অণুগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। শৃঙ্খলার অভাবে সমাজে সুষ্ঠু কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়; অনুরূপভাবে কোন পরিমণ্ডলের এনট্রপি বাড়লেও তার কার্যকরী শক্তির অপহ্নব ঘটে।

এবার আমরা ফিরে আসতে পারি আলোচ্য ঋণাত্মক কেলভিন তাপমাত্রা প্রসঙ্গে। মনে রাখতে হবে, তাপমাত্রা হচ্ছে স্বেচ্ছা-নির্বাচিত কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে একটা সংখ্যাবিশেষ। কার্নো-চক্রের পটভূমিতে পূর্বোক্ত কেলভিন-প্রদত্ত তাপমাত্রার সংজ্ঞানুযায়ী বলা যায় $T/T' = Q/Q'$। অতএব স্বেচ্ছামূলকভাবে T এবং T' এদের যে কোন একটিকে ঋণাত্মক সংখ্যা বলে ধরে নিলে অন্যটিও ঋণাত্মক সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু তাপমাত্রা ধনাত্মক (+) অথবা ঋণাত্মক (−) যেরূপ সংখ্যার দ্বারাই অভিব্যক্ত হোক না কেন, যেহেতু উত্তাপের নিম্নতম মান হলো 0 (শূন্য), সেহেতু কেলভিন তাপমাত্রার নিম্নতম সীমানাও হবে 0 (শূন্য)—যা ইতিপূর্বে 'পরম শূন্য' বলে আখ্যাত হয়েছে। এমতাবস্থায়, কেলভিন-স্কেলে ঋণাত্মক তাপমাত্রার আদৌ কোন অর্থ থাকলেও তা কখনই এই নয় যে, ঐ তাপমাত্রা পরম শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে শীতল।

তা হলে নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রার যথার্থ তাৎপর্য কি হতে পারে? সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হলে তাপগতীয় ব্যাপারে বহুল চিহ্নিত নিখুঁৎ গ্যাস অথবা কোন কৃষ্ট্যালের চিত্রটি স্মরণ করাই সুবিধাজনক। এদের আভ্যন্তর শক্তি-স্তর (Energy-level) অসংখ্য। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরমাণুগুলি ক্রম-বর্ধমান সংখ্যায় আপন আপন স্তর থেকে উর্ধ্বতর স্তরে আরোহণ করে চলে, যার অর্থ হলো অধিকতর শক্তির আমদানী ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধি। তৎসহ এনট্রপিরও বৃদ্ধি। তাপ-গতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনা ধনাত্মক (+) তাপমাত্রারই ইঙ্গিতবহ। ঋণাত্মক (−) তাপমাত্রা কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন শক্তি বৃদ্ধি ও এনট্রপি-হ্রাস সহাবস্থান করবে। কিন্তু শক্তিস্তরের সংখ্যা অগণিত বলে, এটা যে সম্ভাব্যের পাল্লায় পড়ে না, তা সহজেই বোধগম্য।

বিষয়টিকে আর একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যায়। পরিসংখ্যান-তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে, যদি কোন দুই শক্তি স্তরের নীচুটির শক্তি-মাত্রা হয় E_1 এবং উঁচুটির E_2 ও তাদের বাসিন্দা-সংখ্যা (Population) যথাক্রমে N_1 এবং N_2 হয়, তাহলে,

$$N_2/N_1 = e^{-(E_2 - E_1)/KT} \ldots\ldots (3),$$

যেখানে T=কেলভিন তাপমাত্রা এবং K= বোল্‌ৎস্‌মান ধ্রুবক।

এই সমীকরণের শিক্ষা এই যে, যদি তাপমাত্রা T ধনাত্মক হয়, তবে যে স্তরে শক্তি বেশী, সেই স্তরে বাসিন্দা-সংখ্যা হবে কম। এই সংখ্যা বাড়তে পারে তাপমাত্রার বৃদ্ধি হলে। স্তর অসংখ্য থাকায় উষ্ণতা-বৃদ্ধির কারণে পরমাণুগুলির নীচু থেকে উঁচু স্তরে প্রেরিত হবার পথে কোন বাধা নেই। তথাপি এটা কখনও সম্ভব নয় যে, নীচু স্তরে উঁচু স্তরের চেয়ে কম বাসিন্দা থাকবে। শুধু তাপমাত্রা অসীম হলেই বিভিন্ন স্তরে সংখ্যা-সাম্য ঘটতে পাবে। কিন্তু তার জন্যে তো প্রয়োজন অসীম শক্তির জোগান।

সমীকরণ (3)-এর আলোকে ঋণাত্মক তাপমাত্রার জন্যে আবশ্যিক সর্ত হলো $N_2 > N_1$; অর্থাৎ ব্যবস্থা এমন হওয়া চাই, যাতে নিম্নতর শক্তিস্তরের তুলনায় উচ্চতর শক্তিস্তরে বাসিন্দা-সংখ্যা হয় বেশী। কিন্তু সে জন্যে চাই যে পরিমাণ শক্তি, তা হবে অসীমের চেয়েও বেশী! উদ্ভট কল্পনা। অতএব অসংখ্য শক্তিস্তরওয়ালা পরি-

মণ্ডলের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক তাপমাত্রা অর্জনের দুরাশা বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু যদি এমন একটা ব্যাপার সম্ভব হয় যে, কোন পরিমণ্ডলে শক্তিস্তরের সংখ্যা যথেষ্ট সীমিত, তবে কি সে ক্ষেত্রে উক্ত মন্তব্যের ব্যত্যয় হতে পারে? তর্কের খাতিরে মনে করা যাক, কোন পরিমণ্ডলে রয়েছে দুটি মাত্র শক্তিস্তর, আর তাদের বাসিন্দা-সংখ্যা সর্বসমেত N। স্তর দুটিতে শক্তির মান 0 (শূন্য) এবং E (এখানে E=একটা পারমাণবিক ধ্রুবক, যা বহিঃস্থ ক্ষেত্র-নির্ভর নয়)। তা হলে যখন পরিমণ্ডলটির শক্তিমাত্রা শূন্যের কোঠায়, তখন বুঝতে হবে যে, N অর্থাৎ সবকয়টি পরমাণুই গিয়ে নীচের স্তরে ভীড় করেছে। সুতরাং বিশৃঙ্খলা মোটেই নেই এবং তখনকার এনট্রপির মাত্রা 0 (শূন্য)। স্তর দুটি সমভাবে অধ্যুষিত হলে আভ্যন্তর শক্তির মাত্রা হবে NE/2 এবং তখন বিশৃঙ্খলা সর্বাধিক এবং এনট্রপির মাত্রাও চূড়ান্ত। আবার যখন সবকয়টি পরমাণুই উপরের স্তরে অবস্থিত থাকবে, তখন পরিমণ্ডলের শক্তির পরিমাণ হবে NE, অর্থাৎ বৃহত্তম; বিশৃঙ্খলা ন্যূনতম এবং এনট্রপি পুনরায় 0 (শূন্য)।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে দেখতে পাই, আভ্যন্তর শক্তি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ এনট্রপি বাড়তে থাকে এবং বৃহত্তম মাত্রায় উন্নীত হয়ে পরে পুনরায় কমতে সুরু করে। সুতরাং পূর্ববর্ণিত যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবশ্যই বলা চলে যে, তাপমাত্রা প্রথমার্ধে ধনাত্মক (+) এবং দ্বিতীয়ার্ধে ঋণাত্মক (−)। কিন্তু শক্তি-বৃদ্ধির মানে তো এখানে উষ্ণতারও বৃদ্ধি এবং বৃহত্তম এনট্রপির বেলায় সে উষ্ণতা তাত্ত্বিকভাবে অসীমের পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। এরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তা এই যে, বৃহত্তমের পরবর্তী ক্ষীয়মান এনট্রপির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণাত্মক তাপমাত্রাগুলি হবে অসীমের চেয়েও অধিক উষ্ণ! বলা বাহুল্য, এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আপত্তি থাকলে কেলভিনস্কেলের মূল সংজ্ঞাকেই অস্বীকার করা হয়।

অতএব নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রা সম্পর্কে তত্ত্বের দিক থেকে এই যে ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখা দিয়েছে, তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে এমন একটা পরিমণ্ডল খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে শক্তিস্তরের সংখ্যা হবে পরিসীমিত এবং স্বল্প। সৌভাগ্যবশতঃ লিথিয়াম ফ্লুওরাইড নামক একটি কৃষ্ট্যালের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার প্রত্যেক লিথিয়াম-আয়ন-কেন্দ্রীনে আছে একটি করে ন্যূনতম শক্তির স্তর। বহিঃস্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এই স্তরটি মাত্র চারটি আন্তঃকেন্দ্রীন স্তরে বিশ্লিষ্ট হয়। এখন প্রয়োজন, যেমন করেই হোক, স্তরগুলির মধ্যে এমন ভাবে বাসিন্দা-বণ্টন রীতির অদলবদল ঘটাতে হবে, যেন উচ্চস্তরে অব্যবহিত নিম্নস্তরের চেয়ে অধিকতর পরমাণু স্থান পেতে পারে। অন্যান্য অবশ্য পালনীয় শর্তগুলি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত রূপ:

(1) কেন্দ্রীন ভিতরে অতি দ্রুত সাম্যাবস্থা প্রবর্তন,

(2) কৃষ্ট্যাল-জাফ্রির (Lattice) তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার সমান এবং তার উত্তাপ ধারণের ক্ষমতা (Heat capacity) বেশী,

(3) কেন্দ্রীন ও জাফ্রির মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠায় যেন বেশ কিছু সময় লাগে,

যাতে কেন্দ্রীনের উপর পরীক্ষা নিষ্পন্ন হওয়ার কালে সেটা প্রকারান্তরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। অধিকন্তু আদি-পর্বে আবশ্যক নিরীক্ষাধীন বস্তুটির প্রচণ্ড (1°K-রও নীচে) হিমায়নও।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে হিমায়ন-ক্রিয়া দুরূহ হলেও খুব অনতিক্রম্য সমস্যা কিছু নয়। হিমায়ন-প্রচেষ্টার ক্রমোন্নতির বিচিত্র কাহিনী বলতে গেলে শতাব্দীকালের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে গ্যাস-তরলীকরণের অক্লান্ত প্রয়াসও। 1908

সম্ভাব্যতা সমান। কিন্তু প্রথমটির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের সংখ্যাধিক্য রয়েছে বলে মোটামুটি শক্তির শোষণই পরিলক্ষিত হওয়া উচিত এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়েওছিল। বলা বাহুল্য, এমনটি কেন্দ্রীনের তখনকার তাপমাত্রা যে ধনাত্মক (+) তাই নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় ধাপে খুব ধীর গতিতে অথচ উভয়মুখী স্থিরোত্তাপ ব্যবস্থায় 6300·oe ক্ষেত্রটিকে অপসারিত করা হলো, আর ক্রষ্ট্যাল থাকলো শুধু কুণ্ডলীর নিজস্ব 100-oe ক্ষেত্রে। ততক্ষণ অবশ্য তত্ত্বের বিধান অনুযায়ী সমান্তরাল সমবর্তন অপরিবর্তিতই থেকে গেল, কিন্তু তাপমাত্রা নেমে এলো 5°K-তে। 100-oe-এ অবস্থিত চুম্বকধর্মী, লাটিমরূপী লিথিয়াম-কেন্দ্রীনের আবর্তন-কাল প্রায় 1 মাইক্রোসেকেণ্ড (10^{-6}sec); কিন্তু ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক-পরিবর্তন ঘটে আরো দ্রুত—এক মাইক্রোসেকেণ্ডেরও এক পঞ্চমাংশ সময়ের মধ্যে। এরূপ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীন-চুম্বকগুলি পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রকে সমদশায় অনুসরণ করতে পারে না বলে অবশিষ্ট সামান্য ক্ষেত্রাভিমুখী সমবর্তন (যেহেতু নিম্নতর শক্তিস্তরেই কেন্দ্রীনসংখ্যা বেশী) বিপরীত সমবর্তনে রূপান্তরিত হয় এবং তজ্জন্যে প্রকারান্তরে উচ্চতর শক্তিস্তরে নিম্নতরের তুলনায় অধিকতর কেন্দ্রীনের সমাবেশ বাস্তব করে তুলে। এর ফলেই তাপমাত্রা নেগেটিভ (−10°K) হয়ে পড়ে।

তৃতীয় ধাপে −6300-oe, অর্থাৎ বিপরীতমুখী প্রাথমিক ক্ষেত্রের অধীনে পুনরায় স্থিরোত্তাপ চুম্বকায়ন। সেজন্যে তাপমাত্রার আরো অবনতি ঘটলো, −10°K থেকে −400°K অবধি। সর্বশেষ ধাপে ক্রষ্ট্যাল-জাফ্রির সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ তাপমাত্রা চূড়ান্ত পর্যায়ে (−∞তে) নেমে এসে পুনরায় প্রাথমিক +300°K-তে উঠে গেল। এস্থলে লক্ষণীয় যে, তাপমাত্রার দিক দিয়ে −∞ এবং +∞-র মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

উপরিউক্ত পরীক্ষায় কেন্দ্রীন উপমণ্ডলটি (Sub-system) যে অন্ততঃ মিনিট দুই ধরে নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রায় অধিষ্ঠিত ছিল, তা গ্রাহক-যন্ত্রে বেশ ভালরূপেই ধরা পড়েছিল অতিরিক্ত শক্তি-নিঃসরণসূচক জোরালো সংকেতের ভিতর দিয়ে। স্পষ্টতঃ যে দুটি বিশেষ যোগাযোগের উপর এই অতীব দুরূহ পরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করছে, সেগুলি হলো, (1) চৌম্বক-ক্ষেত্রের দিক পরিবর্তনে যে সময় লাগে, তা কেন্দ্রীন-লাটিমের ঘূরপাক-কালের তুলনায় অনেক কম এবং (2) ক্রষ্ট্যালকে পূর্বাবস্থানে ফিরিয়ে আনতে যে সময় লাগে, তা কেন্দ্রীন ও জাফ্রির মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কম।

আধুনিক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার এই নেগেটিভ তাপমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ দিন ধরে গড়ে ওঠা পুরাতন তাপগতি-বিজ্ঞান যে এক অভাবনীয় নতুন মোড় নিতে বাধ্য হবে, এটুকু বোঝা যাচ্ছে। যদিও এর কোন কোন অংশ ঠিক আগের মতনই থাকবে, তথাপি অন্যান্য অংশের কিছু কিছু রদবদল বা আমূল সংস্কার যে একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্থলে ধরা যাক, উভয়মুখী কার্নো-চক্রে তাপকুণ্ড (−50°K) থেকে Q উত্তাপ নির্গত হলো এবং Q′-উত্তাপ হিমকুণ্ডে (−100°K) প্রবেশ করলো। তা হলে কেলভিন স্কেলের সংজ্ঞানুসারে $Q/Q' = -50/-100 = 1/2 \therefore Q' = 2Q$। অর্থাৎ তাপকুণ্ড থেকে আগত উত্তাপের দ্বিগুণ হবে হিমকুণ্ডের প্রাপ্য। এমতাবস্থায়, এঞ্জিনের পক্ষে যান্ত্রিক কার্য সম্পাদন করাতো দূরের কথা, উত্তাপের ঘাটতি পূরণের জন্যে, শক্তি-সংরক্ষণ-নীতি মোতাবেক এঞ্জিনের উপরই বাইরে থেকে 'কার্য' জোগান দেওয়া দরকার। তাতে লাভটা হলো কি? উত্তাপকে উঁচু তাপমাত্রা (−50°K) থেকে নীচু তাপমাত্রায় (−100°K) প্রেরণই উদ্দেশ্য হলে, এত তোড়জোড় না করে Q উত্তাপকে

তার স্বাভাবিক ধারায় চলতে দিলেই হতো। কিন্তু যদি উভয়মুখী এঞ্জিনের সহায়তায় যান্ত্রিক কার্য আদায়ই অভিপ্রেত হয়, তবে ঐ Q´-উত্তাপকে হিমকুণ্ড থেকে নিষ্কাশিত করে তার একটা অংশ Q-কে তাপকুণ্ডে অর্পণ করতে হবে! এরূপ প্রক্রিয়াতেই অবশিষ্ট উত্তাপ (Q´–Q) যান্ত্রিক কার্য সম্পাদনের জন্যে লভ্য হবে। তখন কিন্তু মজাটা হবে এই যে, তাপকুণ্ডের আর কোন প্রয়োজনই থাকবে না; কেন না, ঐ Q উত্তাপ স্বাভাবিক নিয়মেই পুনরায় তাপকুণ্ডের উঁচু তাপমাত্রা থেকে হিমকুণ্ডের নীচু তাপমাত্রায় ফিরে আসবে। অতএব মোট ফল দাঁড়ালো এই যে, (Q´–Q) উত্তাপ যেন কেবল হিমকুণ্ড থেকে নির্গত হবার, অর্থাৎ শীতল বস্তু ক্রমাগত আরো শীতল হবার ফলেই যান্ত্রিক কার্য সংসাধিত হলো। বলা বাহুল্য ওটা প্রচলিত তাপগতি-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিয়ম-সূত্রের পরিপন্থী।

যতদূর জানা গেছে, সাম্প্রতিককালে নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা শুধু লেসার (Laser) এবং মেসার (Maser)-এর ক্ষেত্রেই হয়েছে। তবে অনাগত কালের এঞ্জিনিয়ার সম্প্রদায় হয়তো এঞ্জিন এবং হিমায়ন যন্ত্রের যাবতীয় কাজকর্ম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেগেটিভ কেলভিন তাপমাত্রায়ই চালাবেন। কিন্তু তখন তাঁদের পেশাটি এক প্রহসনের ব্যাপার হয়ে উঠবে না তো?

অবলোহিত নক্ষত্র

শ্রীবৈদ্যনাথ বসু*

সাধারণতঃ নক্ষত্র বলতে কি বোঝায় আমরা জানি। আকাশের গায়ে খচিত বড়, ছোট, মাঝারি নানা আকারের এবং লাল, হলদে, সাদা প্রভৃতি নানা বর্ণের যে জ্যোতিষ্ক মিট্‌মিট্‌ করে জলছে, এদেরই আমরা সাধারণভাবে বলি নক্ষত্র। একথাও আমাদের জানা আছে যে, প্রতিটি নক্ষত্রই একটি সুবিপুল পরিমাণ শক্তির উৎস। এই শক্তি প্রধানতঃ তাপ ও আলোরূপে নক্ষত্র দেহ থেকে মহাকাশে অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের সূর্যও এরূপ একটি নক্ষত্র। সৌরদেহ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে নির্গত শক্তির পরিমাণ 4×10^{33} আর্গ (erg)। অতএব, বিপুল পরিমাণ তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির (Electro-magnetic energy) উৎস, উজ্জল জ্যোতিষ্কদেরই আমরা সাধারণভাবে বলি নক্ষত্র। এখন যদি আমরা বিশেষ অর্থে, বিপুল পরিমাণ তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির উৎস মাত্রকেই (উজ্জল বা অনুজ্জল) নক্ষত্র হিসাবে গণ্য করি, তাহলে এক্স-রে নক্ষত্র (X-ray star), অবলোহিত নক্ষত্র (Infrared star), বেতার নক্ষত্র (Radio star) ইত্যাদি নানা শ্রেণীর নক্ষত্রের ধারণা করতে পারি। এখানে আমরা অবলোহিত নক্ষত্রের আবিষ্কার এবং এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

অবলোহিত রশ্মি তাপধর্মী, আলোকধর্মী নয়; অর্থাৎ এই রশ্মির বিকিরণে তাপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তা আলোর মত খালি চোখে ধরা দেয় না। গত কয়েক বছর যাবৎ জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা সমগ্র আকাশে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে বেশ কয়েকটি অবলোহিত নক্ষত্র খুঁজে

* গণিত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

পেয়েছেন। এদের প্রতিটির ক্ষেত্রে, সমগ্র বিকীর্ণ শক্তির শতকরা প্রায় 80 ভাগ বা তারও বেশী নির্গত হয় অবলোহিত রশ্মি হিসাবে। বাকী মাত্র 20 ভাগ বা আরও কম নির্গত হয় আলোসহ অন্যান্য তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক রয়েছে, যাদের অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দূরবীণেও কোন সাধারণ নক্ষত্ররূপে সনাক্ত করা যায় নি। অর্থাৎ, দৃশ্য-তরঙ্গে এদের বিচ্ছুরিত শক্তির পরিমাণ এত কম যে, বর্তমান অতিকায় দূরবীণগুলিতেও তা ধরা পড়ে না। কয়েকটি অবলোহিত নক্ষত্রকে অবশ্য অতি অনুজ্জ্বল (faint) সাধারণ নক্ষত্ররূপে সনাক্ত করা হয়েছে। খালি চোখে সবচেয়ে যে অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি দেখা যায়, তাদের চেয়ে এই অবলোহিত নক্ষত্রগুলি 10,000 গুণ বা আরও বেশী অনুজ্জ্বল।

অবলোহিত নক্ষত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী উঠে-পড়ে লেগে গেছেন আরও নতুন নতুন অবলোহিত নক্ষত্রের সন্ধানে এবং আবিষ্কৃত নক্ষত্রগুলির ভৌত ধর্মের (Physical properties) বিষয়ে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে। এদের মধ্যে আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যালটেকের (California Institute of Technology) জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি-ভাবে জানা গেছে যে, সাধারণ নক্ষত্রের ক্রম-বিবর্তনের (Evolution) একেবারে আদিম স্তরে তারা অবলোহিত নক্ষত্ররূপে কিছুকাল (কয়েক লক্ষ বা কয়েক নিযুত বছর) অতিবাহিত করতে পারে। মহাজাগতিক গ্যাস (Interstellar gas) মহাকর্ষীয় আকর্ষণে (Gravitational attraction) ক্রমশঃ ঘনীভূত হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে, তারপর এই গ্যাসরাশি আর নিজেকে পূর্বাবস্থায় ধরে রাখতে পারে না। মহাকর্ষীয় ভাঙনের (Gravitational collapse) ফলে সমগ্র গ্যাসরাশি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। এই খণ্ডিত গ্যাসপিণ্ডগুলির মধ্যে যেগুলির ঘনত্ব বেশ বেশী থাকে, সেগুলি আরও সঙ্কোচনের ফলে নক্ষত্রের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় (Protostars)। মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনের (Gravitational contraction) ফলে এগুলি ক্রমশঃই ক্ষুদ্রাকার প্রাপ্ত হয় এবং ভিতরের চাপ ও তাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তাপ বাড়তে বাড়তে এগুলি এক সময় আলোর উৎসরূপে প্রতিভাত হয়। এভাবেই বিশাল গ্যাসরাশির মধ্যে নতুন নক্ষত্রদের জন্ম হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর বিশ্বাস, নতুন নক্ষত্ররা সর্বদাই বিশাল গ্যাসরাশির জঠরে দলে দলে জন্মায়, একা জন্মাতে পারে না। এই বিশ্বাসের পিছনে অবশ্য পর্যবেক্ষণযোগ্য প্রমাণ রয়েছে।

নক্ষত্রের উজ্জ্বলতাপ্রাপ্তির পূর্বাবস্থায় (Protostar) স্বাভাবিকভাবেই আয়তন খুব বড় হবে এবং দেহের তাপমাত্রা হবে কম। এই অবস্থায় নক্ষত্র দেহ থেকে তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি বিকীর্ণ হবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গে; অর্থাৎ এই অবস্থায় এরা অবলোহিত নক্ষত্ররূপে যন্ত্রে ধরা পড়বে, কিন্তু আলোর উৎস নয় বলে এদের চোখে দেখা যাবে না। R Monocerotis এরকম একটি অবলোহিত নক্ষত্র। এই নক্ষত্রটি বিপুল পরিমাণ, সূর্য থেকে প্রায় হাজার গুণ বেশী শক্তির উৎস। কিন্তু এই শক্তির প্রায় সবটাই বিকিরণ হয় 2μ থেকে 20μ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ($1\mu = 10^4$ Å); অর্থাৎ পুরাপুরিই বর্ণালীর অবলোহিত সীমার মধ্যে (Infrared region of the spectrum)। সর্বাধিক বিকিরণ হয় 4μ-এর কাছাকাছি। অতএব প্ল্যাঙ্কের (Planck) সূত্রানুযায়ী এর তাপমাত্রা হওয়া উচিৎ 750°K সৌরদেহের তাপমাত্রা প্রায় 6,000°K, এবং এর সর্বাধিক বিকিরণ হয় প্রায় 0.55μ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। 1নং চিত্রে সূর্য এবং R Monocerotis-এর

শক্তির বর্ণালী (Energy spectrum) তুলনামূলকভাবে দেখানো হয়েছে। এখন দেখা যাক, R Monocerotis-এর আয়তন কিরূপ হতে পারে। নক্ষত্রের চরম ঔজ্জ্বল্য L (Absolute

1নং চিত্র : সূর্য এবং R Monocerotis-এর শক্তির চিত্রাঙ্কলেখ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য μ এককে দেখানো হয়েছে।

luminosity), ব্যাসার্ধ R এবং দেহের তাপমাত্রা T-এর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে $L=4\pi\sigma R^2 T^4$, যেখানে σ একটি ধ্রুবক। আগেই বলা হয়েছে, R Monocerotis-এর চরম ঔজ্জ্বল্য সূর্যের চরম ঔজ্জ্বল্যের প্রায় হাজার গুণ বেশী। এখন উপরিউক্ত সূত্রে এদের তাপমাত্রা যথাক্রমে 750°K এবং 6,000°K ধরলে আমরা দেখতে পাই, R Monocerotis-এর ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় দু-হাজার গুণ বেশী। R Monocerotis ছাড়া আরও কয়েকটি সমধর্মী অবলোহিত নক্ষত্র পাওয়া গেছে। এরা নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তনের একেবারে আদিম অবস্থার উদাহরণ; অর্থাৎ এরা হচ্ছে সাধারণ অর্থে নক্ষত্ররূপ প্রাপ্তিরও পূর্বাবস্থা।

কিছু কিছু অবলোহিত নক্ষত্রকে আবার অতিশয় রক্তিম বর্ণ ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনশীল (Variable) এক বিশেষ শ্রেণীর নক্ষত্ররূপে সনাক্ত করা হয়েছে। Mira নামে একটি নক্ষত্রকে এই শ্রেণীর নক্ষত্রদের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হয় এবং এই নক্ষত্রদের বলা হয় Mira শ্রেণীভুক্ত ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনশীল নক্ষত্র (Mira type of variable stars)। এই নক্ষত্রদের ঔজ্জ্বল্য একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ওঠানামা করে। এই নির্দিষ্ট সময় এই জাতীয় বিভিন্ন নক্ষত্রের বেলায় বিভিন্ন। সাধারণতঃ এই সময় 150 থেকে 500 দিন; কোন কোন নক্ষত্রের বেলায় আরও বেশী। Mira-র ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনকাল (Period of variation) 330 দিন। এই জাতীয় নক্ষত্রের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ঔজ্জ্বল্যের অনুপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় 10 থেকে 100। এদের গড় চরম ঔজ্জ্বল্য (Average absolute

luminosity) সূর্যের চরম ঔজ্জ্বল্যের প্রায় 250 গুণ বা তারও কিছু বেশী। অর্থাৎ, এদের দেহ থেকে নির্গত শক্তির মোট পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 10^{36} আর্গ। এর মধ্যে শতকরা প্রায় 80 ভাগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 8×10^{35} আর্গ বেরোয় অবলোহিত রশ্মিরূপে। সর্বাধিক উজ্জ্বল অবস্থায় Mira নক্ষত্রের দেহের তাপমাত্রা 2600°K এবং সর্বনিম্ন ঔজ্জ্বল্যে তাপমাত্রা 1900°K। 2নং চিত্রে Mira নক্ষত্রের সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন ঔজ্জ্বল্যে শক্তির চিত্রাঙ্কলেখ (Energy curve) দেখানো হয়েছে। ঔজ্জ্বল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের বর্ণালীরও (Spectrum) প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। আবার, যেহেতু এদের দেহের তাপমাত্রা সূর্যের তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক কম এবং চরম ঔজ্জ্বল্য বহু গুণ বেশী, এদের আয়তন অবশ্যই সূর্য থেকে বহু গুণ বেশী হবে। Mira নক্ষত্রের ব্যাস সূর্যের ব্যাসের প্রায় 460 গুণ বেশী। আয়তনে এবং শক্তির উৎপাদনে বিশাল, রক্তিম বর্ণ, এইসব নক্ষত্রকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় লাল দানব (Red giant) বলা হয়। বিভিন্ন জাতীয় লাল দানবদের মধ্যে Mira জাতীয় নক্ষত্রেরা একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত।

Mira শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের মধ্যে Mira দৃশ্য আলোয় যথেষ্ট উজ্জ্বল। কিন্তু এই শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের মধ্যে কিছু এমন নক্ষত্রও আছে, যেগুলি Mira অপেক্ষা আরও অনেক বেশী লাল, অতএব অনেক কম উত্তপ্ত। এদের ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনকাল (Period of variation) অনেক বেশী, সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত আরও বেশী এবং দৃশ্য আলোয় আরও অনেক কম উজ্জ্বল। এদের আয়তনও অনেক বেশী। এই নক্ষত্রদের বিকীর্ণ শক্তির প্রায় সবটাই বেরোয় অবলোহিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। TX Camelopardalis (TX Cam) এরূপ একটি নক্ষত্র। এর ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তনকাল 557·4 দিন। দেহের তাপমাত্রা প্রায় 1200°K। TX Cam-এর সমধর্মী আরও বেশ কিছু নক্ষত্র পাওয়া গেছে।
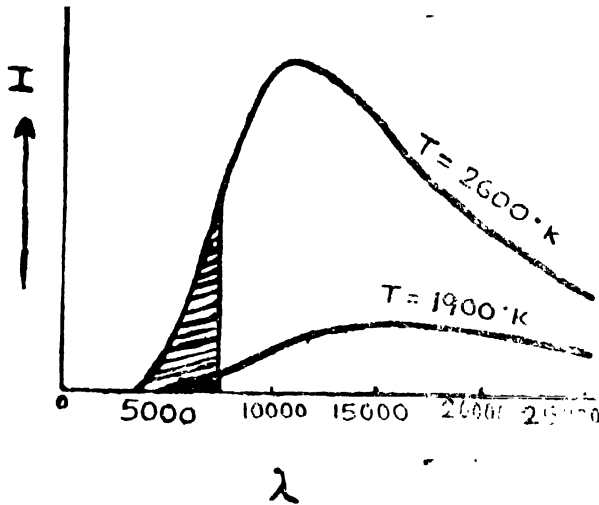
2নং চিত্র: সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন ঔজ্জ্বল্যে Mira নক্ষত্রের শক্তির চিত্রাঙ্কলেখ। বাঁ-দিকের রেখাঙ্কিত অংশটুকু দৃশ্য-তরঙ্গে শক্তির পরিমাপ সূচিত করে।

এখন দেখা যাক, অবলোহিত নক্ষত্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা কি তথ্য জানতে পেরেছেন। আমরা দেখেছি, এদের দেহের

তাপমাত্রা সাধারণ নক্ষত্রের তুলনায় অনেক কম। নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, এদের বহিরাবরণের উপাদান অণু (Molecule) ও পরমাণুসকল (Atoms) যে পরিমাণ তাপ-জনিত উত্তেজনা (Excitation) পাবে, তদনুযায়ী এদের বর্ণালীর প্রকৃতি নিরূপিত হবে। অব-লোহিত নক্ষত্রের দেহের তাপমাত্রা কম হওয়ায় অণু-পরমাণুরা অপেক্ষাকৃত অল্পই উত্তেজনা পায়। কাজেই যে সকল অণু বা পরমাণু অল্প উত্তেজনায়ই উত্তেজিত (Excited) হয়ে ওঠে, অবলোহিত নক্ষত্রের বর্ণালীতে তারাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাবে। আণবিক ও পারমাণবিক গঠনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে আমরা জানি যে, অল্প উত্তেজনায় প্রথম উত্তেজিত হয় অণুরা। উত্তেজনা আরও বাড়ালে পরমাণুরাও ক্রমে ক্রমে উত্তেজিত হতে থাকে। কাজেই অবলোহিত নক্ষত্রের বর্ণালীতে আণবিক রেখাসমষ্টির (Molecular bands) বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। টাইটেনিয়াম অক্সাইড (TiO), ভেনাডিয়াম অক্সাইড (VO), আণবিক হাইড্রোজেন (H_2) এবং জলকণা (H_2O) প্রভৃতি অণুর রেখাসমষ্টি (Bands) বর্ণালীতে পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে টাইটেনিয়াম-অক্সাইডজনিত রেখাসমষ্টিই সবচেয়ে প্রবল। কম উত্তপ্ত রক্তিমাভ নক্ষত্রদের বর্ণালীতে এই অণুটির রেখাসমষ্টির অস্তিত্ব একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু অবলোহিত নক্ষত্র ছাড়া অপর কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে জলকণার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি, কখনও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, অধিকতর উত্তেজনাময় পরিবেশে জল-কণার অস্তিত্ব থাকা আপাতঃদৃষ্টিতে সম্ভব নয়।

শক্তিশালী আণবিক রেখাসমষ্টি ছাড়াও অব-লোহিত নক্ষত্রের বর্ণালীতে কিছু কিছু পারমাণবিক রেখাও (Atomic lines) সনাক্ত করা হয়েছে। স্পষ্টতঃই, যে সকল পারমাণবিক রেখা অতি অল্প উত্তেজনায়ই উত্তেজিত হয়, এই বর্ণালীতে তাদের অস্তিত্বই সম্ভব। এই হিসাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ (Neutral) টাইটেনিয়াম (TiI), ম্যাগনেসিয়াম (MgI) প্রভৃতি পারমাণবিক রেখার অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। কিন্তু কোন কোন অবলোহিত নক্ষত্রের বর্ণালীতে আয়নিত (Ionized) ক্যালসিয়াম (Ca II) এবং আয়নিত ষ্ট্রনসিয়ামের (Sr II) রেখার অস্তিত্ব সনাক্ত করা হয়েছে। এই ব্যাপারটা বেশ বিস্ময়কর। কারণ, এত কম তাপমাত্রায় বা উত্তেজনায় কোন পরমাণুর আয়নিত হবার কথা নয়। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত সব রেখা বা রেখাসমষ্টিই নক্ষত্রের বহিরাবরণের গ্যাসের দ্বারা তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির বিশোষণ (Absorption) থেকে উদ্ভূত। কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণুর পাশেন সিরিজের (Paschen series) Pr রেখাটি একটি তড়িৎ-চৌম্বক শক্তির নিক্ষেপণ (Emission) থেকে উদ্ভূত বেশ তীব্র (Strong) রেখারূপে কোন কোন অবলোহিত নক্ষত্রের বর্ণালীতে দেখা গেছে। আবার আমরা জানি, এই রেখাটির অস্তিত্ব Mira শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের বর্ণালীর একটি সাধারণ নিয়ম। এথেকেও প্রমাণিত হয় যে, Mira শ্রেণীভুক্ত নক্ষত্রদের সঙ্গে অবলোহিত নক্ষত্রদের একটা সুস্পষ্ট ভৌত যোগসূত্র রয়েছে।

অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা অবলোহিত নক্ষত্রদের সম্বন্ধে আরও বহু তথ্য জানতে পারবেন বলে আশা করা যায়। এরা বিপুল পরিমাণ অবলোহিত শক্তির উৎস, তাই জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা এদের বলেছেন অবলোহিত নক্ষত্র (Infrared star)। অনুসন্ধানের কাজ চলছে। ক্রমেই আরও বেশী সংখ্যক অবলোহিত নক্ষত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং তাদের ভৌত ধর্ম নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণা চলছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, নক্ষত্র ছাড়াও অন্যান্য কিছু কিছু মহাজাগতিক বস্তুও হয়তো বিপুল পরিমাণে অবলোহিত শক্তি

উৎপাদন করে চলেছে। সমগ্র আকাশে অবলোহিত শক্তির উৎসগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। এদের নিয়ে গবেষণার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে নতুন দিক খুলে গেছে, তাকে বলা হচ্ছে অবলোহিত জ্যোতির্বিজ্ঞান (Infrared Astronomy)।

পর্যাবৃত্তি

গোপাল রায়*

পর্যাবৃত্তি (Periodicity) মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত প্রাথমিক গুণগুলির অন্যতম। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে সুরু করে অণু-পরমাণুর গড়ন এবং পৃথিবীর যাবতীয় জৈব পদার্থ ও প্রাণীর জীবন এর দ্বারা এত গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত যে, অনেক সময় এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই আমরা সচেতন থাকি না। বস্তুতঃ অপর্যাবৃত্ত (Non-periodic) বিশ্বের গড়ন ও তার ভিতরকার জীবনযাত্রা কল্পনায় আনাও সহজ নয়। এখানে পৃথিবী নিয়মিতভাবে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, চন্দ্র ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, সুনির্দিষ্ট তাদের পর্যায়কাল (Period)। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ঘোরে আরও কোন বৃহৎ বস্তুর আবেষ্টনে। পৃথিবী ঘোরে নিজের অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে; তাতে সাগর, মরুভূমি, নদী, বন, লোকালয়, তুষার-ঢাকা মেরু ও প্রান্তরে দিন ও রাত্রি নিখুঁত নিয়মে যাতায়াত করে। আর ওখানকার প্রায় সব জীবজন্তু, গাছপালা ও পশুপাখীর জীবনে আনে আলো ও অন্ধকারের প্রভাব—আহার-অন্বেষণ ও বিশ্রাম, জাগরণ ও নিদ্রা আলো জ্বালানোর বিদ্যা আয়ত্ত করবার পর থেকে মানুষ রাত্রির কিছু অংশেও দিনের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। এটুকু কৃত্রিমতা বাদ দিলে মানুষের জীবনেও পৃথিবীর এই আলো-আঁধারের আহ্নিক-চক্রের প্রভাব খুবই সুস্পষ্ট।

স্পষ্টভাবে দেখা যাবে বার্ষিক-চক্রের প্রভাবও। পৃথিবীর মেরুরেখা তার কক্ষতলের সঙ্গে $23\frac{1}{2}°$ ডিগ্রী কোণে হেলে আছে। শুধু এটুকুর জন্যেই উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছে পর্যায়ক্রমে আসে শীত ও গ্রীষ্ম; তারপর মেরু থেকে যতই বিষুবরেখার দিকে এগোনো যাবে, ততই দুই ঋতুর মধ্যবর্তী সময়ে বৈচিত্র্য আরও স্পষ্ট হবে এবং ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠবে ছয় ঋতু। সারা বছর ধরে এতে তালে তালে প্রকৃতির সাজ বদলায়; পাতা ঝরে, আবার নতুন কিশলয় ফোটে, কত নতুন আগাছা জন্মে আর মরে। দিন ও রাত্রির সময়কাল নির্দিষ্ট নিয়মে বাড়ে ও কমে; এতে সূর্যকিরণ শোষণের পরিমাণ বদলায় আর ঝাঁকে ঝাঁকে মৌসুমী ফুল ফোটে। অনেক কীট-পতঙ্গ আর প্রাণীর বংশবৃদ্ধিও বিশেষ ঋতুর জন্যে অপেক্ষা করে। চন্দ্র ও পৃথিবীর যৌথ আবর্তনে খেলে জোয়ার-ভাঁটা; এতে সমুদ্রতীরের অনেক কীট ও কাঁকড়ার জীবনে সৃষ্টি করে এক বিশেষ কর্মচক্র। এরা জোয়ারের সঙ্গে ক্রমেই উপরের দিকে উঠতে থাকে আর ভাঁটার সঙ্গে নীচে নেমে যায়। বিশ্বের এই দোলনধর্মিতা কিছু কিছু প্রাণীর জীবনে আনে আরও বিস্তৃত পরিবর্তন। পর্যায়কালের কোন একটি সময় তাদের বাসভূমি হয়ে ওঠে দুঃসহ। আছে অনেক রকমের ভ্রাম্যমান মাছ ও যাযাবর

* ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ, পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, চণ্ডীগড়

পাখী। তারা সমুদ্র থেকে সমুদ্রে অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। বিজ্ঞানীরা মাছ, গিরগিটি, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণী এবং ওয়ার্বলার, ব্ল্যাকক্যাপ, বুনোহাঁস, কাক, স্টারলিং প্রভৃতি পাখীদের নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। জীবন-সংগ্রামে বাঁচবার তাগিদ এত বড় একটা প্রয়োজন যে, অস্বচ্ছ সংবিৎ পাখীরাও এই দূর-যাত্রায় দিক্ ভুল করে না। পৃথিবীর এই ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি তাদের শারীরযন্ত্র। বিশেষ ঋতু সমাগমের সুরুতেই তাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর নীল খোলা-আকাশে মেলে ধরা এই ডানার উপর সূর্যের অবস্থান ও দিনের দৈর্ঘ্য থেকে তারা সময় ও ঋতু টের পায় (বিজ্ঞানী Braemer-এর মত)। অনেক মাছ ও পাখী এইভাবে সূর্যের সাহায্যে দূরদেশে চলে যায়। বিজ্ঞানী Hamilton দেখিয়েছেন, অনেক পাখী রাতেও ভ্রমণ করে। Sauer প্ল্যানেটেরিয়ামের নকল আকাশের নীচে এই পাখীদের উড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন; তিনি মনে করেন হয়তো এরা তারার অবস্থান থেকেও দিক্ নির্ণয় করতে পারে। জীবন-সংগ্রামে অনেক হার-জিৎ এবং ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে এই প্রাণীদের জীবনের ঘণ্টাগুলি আবর্তিত পৃথিবীর ঘণ্টার সঙ্গে নির্ভুলভাবে একতালে বাজে।

শুধুমাত্র প্রাণীদেহের মধ্যেই দেখা যাবে কত রকমের পর্যাবৃত্তি। অলস-গমনে পায়ের ছন্দ, পাখীর ডানার ঝাপট, তৃণভোজী প্রাণীদের রোমন্থন, ত্বকের কম্পন, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদ্‌স্পন্দন, হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন কক্ষে ভাল্‌ভ্‌গুলির পর্যায়ক্রমে খুলে যাওয়া ও বন্ধ হওয়া, যৌন-চক্র, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার অনুভূতি প্রভৃতি অনেক নমুনা দেখানো যেতে পারে। এগুলির পর্যায়কাল সুনির্দিষ্ট নয়, যদিচ একটা ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা আছে। কাজের গতির সঙ্গে তা বাড়ে অথবা কমে। শারীরযন্ত্রের এই দোলনগুলি সম্ভবতঃ শরীর রক্ষার নিয়মেই স্বয়ংজাত; বিশ্বের অন্য কোন দোলনের সঙ্গে তা সমলয়ে চলছে কিনা জানা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে একমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যায় যৌন-চক্রের বেলায়, মানুষের ক্ষেত্রে যা চান্দ্রমাসের ব্যবধানকে মেনে চলে।

বস্তুজগৎ ছেড়ে মনোজগতে এলে এই দোলনের প্রভাব আরও বিমূর্ত হয়ে দাঁড়ায়। কবিতার ছন্দ অথবা গানের তাল কোন একটি নিগূঢ় কারণে তৃপ্তি দেয়। এই দোলন হঠাৎ খাপছাড়া হয়ে পড়লে তেমনি রহস্যময় কোন কারণে মনের মধ্যে একটা সহজাত বিতৃষ্ণার বোধ জাগে। নিয়মমাফিক স্পন্দিত বিশ্বে সম্ভবতঃ অনিয়মের স্পন্দন সয় না। তাই কবি ও শিল্পীরাও তাদের সৃষ্টির মধ্যে একটা ছন্দ সৃষ্টি করেন এবং এই ছন্দ যদি বিশ্বের ছন্দের সঙ্গে সমলয়ে চলে, তবে বিশ্বের গতিই সেগুলিকে চিরকাল সবল রাখে। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, এর মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। রামায়ণ-মহাভারত পড়বার সময় এটা আরও ভালভাবে বোঝা যায়। এই মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের মতই অচঞ্চল, নিরঙ্কুশ ও আসক্তিহীন। কোন বিশেষ ভাল লাগায় তা থমকে দাঁড়ায় না, দুঃখে ভেঙে পড়ে গতিকে কোথাও শিথিল করে না, কোন উত্তেজনা নেই, উদ্বেগ নেই; তাই এর বিশাল পটভূমিতে অসংখ্য চরিত্রের টানা-পোড়েনে ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বের খণ্ডাংশের যে ছবি ফুটে ওঠে, তার ছন্দ মহাসাগরের ঢেউয়ের মত—সুদূরব্যাপ্ত, প্রশান্ত ও অমোঘ।

কোন ব্যক্তি অথবা সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, কোন জাতি অথবা সভ্যতার উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, বিলুপ্তি সবই চলে পর্যাবৃত্তির নিয়মে। রবীন্দ্রনাথের একটা গানে আছে: 'নাচে নাচে রম্য তালে নাচে/তপন-তারা নাচে, নদী-সমুদ্র

নাচে/জন্ম-মরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে···।' কি দার্শনিক, কি কবি, কি শিল্পী অথবা বিজ্ঞানী সকলেই কোন না কোন দিক দিয়ে বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই ছন্দকে অনুভব করেছেন।

এই পর্যাবৃত্তির উৎস কি? বিশ্ব কেন ছন্দোময়? বরং প্রথমেই মনে হয় বিশ্বের মধ্যে এই পর্যাবৃত্তির অনুপস্থিতিই ছিল কাম্য। বিশ্বের যা প্রাণরস, যা জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা হলো এর বৈচিত্র্য এবং অজানা ভবিষ্যতের আকর্ষণ। ভবিষ্যৎকে যদি আগেই পুরাপুরি সঠিক জানা যেত, তবে জীবনযাপন হতো জ্যামিতিক গঠনের মত নিষ্প্রাণ। পর্যাবৃত্তির জন্যে দিন ও রাত্রি, গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত চিরকাল একই নিয়মে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে! এতে মোট বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা অনেকখানি কমেছে। যদিচ সঠিকভাবে দেখতে গেলে পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ দেশ-কালের একই রেখায় দু-বার আবর্তন করছে না। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহের সংসার নিয়েও গতিশীল। প্রথম গতিটি হলো Hercules তারা-মণ্ডলের দিকে, সেকেণ্ডে প্রায় 19 কিলোমিটার বেগে। দ্বিতীয়টি হলো সূর্য যে ছায়াপথের অংশ তারই আবর্তন গতি। চক্রাকার এই ঘূর্ণন একবার শেষ হতেই লাগে 20 কোটি বছর, এখন সূর্য চলেছে Cygnus (রাজহংস) তারা-পুঞ্জের দিকে সেকেণ্ডে প্রায় 240 কিলোমিটার বেগে। এ ছাড়াও মহাকাশে আছে আরও অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxy); তাদের সঙ্গে সূর্যের ছায়াপথেরও আছে এক আপেক্ষিক গতি, কিন্তু সে যে কোন্ দিকে আর কি বিশাল গতিবেগে—তার পরিমাপ সম্ভব হয় নি। কিন্তু মহাকাশে বস্তুর তুলনায় শূন্যতার পরিসর এত বেশী যে, সূর্যের এই চিরনতুন আকাশ-ভ্রমণ পার্থিব জীবনে প্রায় কোন বৈচিত্র্য আনে না।

কিন্তু তা বলে চির-অনির্দেশ্য বৈচিত্র্যের জন্যে অপর্যাবৃত্ত বিশ্ব খুব সুখের হতো না। এ রকম একটা পৃথিবীর কল্পনা করা যাক। পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে একবার $365\frac{1}{4}$ দিনে ঘুরে এল; দ্বিতীয় বার কতদিনে ঘুরবে কারো জানা নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রথম দিন-রাতটি ফুরোল, দ্বিতীয় দিনটি কত ঘণ্টায় ফুরোবে—সেটা রইল অজানা। সেখানকার এক গোলার্ধের মানুষেরা নৈশ আহার সেরে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু তারা জানে না কখন ভোর হবে, অন্য গোলার্ধের মানুষরা ক্ষেতে, মাঠে, কলকারখানায় কাজ করছে, তবু দুপুরের রোদের তেজ কমে না, কে জানে কখন সন্ধ্যা হবে। চাষীরা অনির্দিষ্ট-কাল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তবু গ্রীষ্মের পর বর্ষার স্থিরতা নেই, কেউ জানে না হেমন্তের মুচমুচে পাকা ফসলের উপর ফের বড় বড় ফোঁটায় ধান-ঝরানো বৃষ্টি ঝরবে কিনা; গাছেরা ফুল ফোটাবার, ফল-পাকাবার এবং পাখীরা বাসা বাঁধাবার, ডিম-ফোটানোর সময় চিনবে না, মৌচাকের মধু শেষ হবে, মৌমাছির শীতকাল তবু ফুরাবে না। পৃথিবীটা এমনিতেই প্রাণ-ধারণের পক্ষে যথেষ্ট প্রতিকূল, সুতরাং এমনি একটি পৃথিবী হতো আরও অনিশ্চিত অপ্রতি-রোধ্য বিঘ্নসমাকীর্ণ। এক্ষেত্রে পর্যাবৃত্তি একটা আশীর্বাদ। ঘন কুয়াসার মধ্যে মাত্র কয়েক হাত যেমন দৃষ্টি চলে, তেমনি পর্যাবৃত্তির জন্যে অদূর ভবিষ্যতের একটা মোটামুটি ছবি আমরা দেখতে পাই। সে ছবি সম্পূর্ণ নয়, নির্ভুলও নয়, তাই অনিশ্চিত রহস্যময়তার স্বাদও মারা যায় না। প্রকৃতির ব্যবস্থা নিখুঁত; পর্যাবৃত্তি জীবনে প্রতি-কূলতা কমিয়েছে, অথচ সৃষ্টির গূঢ় রসের হানি হতে দেয় নি।

পর্যাবৃত্তির উৎস-অনুসন্ধানের আগে বিশ্বের আর একটি মৌলিক গুণের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তা হলো এর প্রকাশমুখীতা। প্রাথমিক বস্তুকণা (Elementary particles) থেকে সুরু করে বিশ্বের অণু-পরমাণু, বড়-ছোট, মূর্ত ও বিমূর্ত

প্রতিটি কণাই অথবা কণাসমষ্টিই প্রকাশমুখী। প্রকাশমুখীতাকে পরোক্ষভাবে বলা যায় যুগপৎ বৃহত্তম দেশ ও দীর্ঘতম কাল অধিকারের প্রচেষ্টা।

মানুষের সমাজের দিকে তাকালে এ কথা খুব স্পষ্ট করেই বোঝা যায়। মানুষ ধন-সম্পদ, খ্যাতি প্রতিপত্তি চায়, এ হলো নিজের প্রভাবকে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। দেশ থেকে মহাদেশ এবং তা থেকে ক্রমে পৃথিবীতে মানুষ এভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে; এই আত্মবিস্তৃতিকে আবার সে যথা সম্ভব দীর্ঘকাল স্থায়ী করবারও চেষ্টা করে। এই হলো যথাসম্ভব বৃহত্তম দেশ ও দীর্ঘতম কাল অধিকারের চেষ্টার অর্থ। এই প্রবণতা শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; সমষ্টিগতভাবেও এই চেষ্টা চলে। এই জন্যে এক সমাজ, জাতি অথবা সভ্যতা অন্য সমাজ, জাতি অথবা সভ্যতাকে আঘাত করবার, গ্রাস করবার ও বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করে। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেবে। প্রকাশমুখী অংং বিস্তৃতি চায়; তাই জীবজন্তু গাছপালা ও পশু-পাখীও এই প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। এমনকি জীবনের যে প্রাথমিক রূপ এককোষী প্রাণীর মধ্যে প্রকাশ পায়, সেখানেও এই মৌলিক গুণটি দেখা যাবে। বিজ্ঞানীরা জীবনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—এ হলো জৈব অণুর বিশেষ এক সমষ্টি, যা পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে জৈব-কণা শুষে নিয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং যা নিজের স্ব-রূপ আর একটি তৈরি করতে পারে। এই বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে আছে বৃহত্তম দেশ অধিকারের এবং অনুরূপ জীবকোষ সৃষ্টির মধ্যে আছে দীর্ঘতম কাল অধিকারের প্রচেষ্টা (এ ক্ষেত্রে শোপেনহাওয়ারের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল)। অবশ্য দেশবিস্তার ও কালবিস্তার জীবকোষটির বিশেষ গড়ন এবং চারপাশের অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং তা সম্পূর্ণরূপে ভৌতিক নিয়ম-বন্ধন মেনে চলে। তবুও প্রতিটি জীবকোষই, তা এককোষী অথবা বহুকোষী, সরল অথবা জটিল যাই হোক না কেন, বিশ্বের এই মৌলিক প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

জীবকোষ সৃষ্টির মূল উৎপাদন হলো প্রোটিন এবং তারও মূল উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিড। প্রাণসৃষ্টির আগে পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন (H_2) এবং জলীয় বাষ্প। এগুলির ক্রমাগত সংযোগ ও বিয়োগে এবং আদিম পৃথিবীর সেই আগ্নেয়গিরি, উল্কা ও বিদ্যুতের দহনে যে অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হতে পারে, সেটা Dr. Stanley Miller পরীক্ষাগারে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে আছে দুটি গ্রুপ; একটা অ্যামিনো গ্রুপ (NH_2) এবং অন্যটা কার্বক্সিল গ্রুপ (COOH)। তাই দুটি গ্রুপ শিকলের মত পর পর জুড়ে যেতে পারে। এই বিশেষ সুবিধাটুকু থাকায় এবং বৃদ্ধির দিকে প্রকৃতির একটা প্রবণতা থাকায় অ্যামিনো অ্যাসিডের যে দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি হয়, তাই হলো জীবকোষের মূল উপাদান প্রোটিন।

প্রাণ-বিজ্ঞান (Life Soience) জীবকোষের জীবনের মধ্যে আর কোন অলৌকিকতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং একটা কথা মানতে হয়; এককোষী জীবের মধ্যে বৃহত্তম দেশ ও দীর্ঘতম কাল অধিকারের যে চেষ্টা দেখা গিয়েছিল, সেটা নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমে সেই সব জৈব ও অজৈব পরমাণুর মধ্যেও দেখা যাবে, যাদের সমন্বয়ে প্রাথমিক জীবকোষটির সৃষ্টি।

এর অর্থ হলো সমস্ত রকমের পরমাণু এবং তাদের উপাদান প্রাথমিক বস্তুকণার মধ্যেও এই বৃহত্তম দেশ ও দীর্ঘতম কাল অধিকারের চেষ্টা দেখা যাবে। যে কোন পরমাণুর কথা ধরা যাক—যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু। এখানে নিউক্লিয়াসের

চারপাশে আছে একটা ইলেকট্রন-গোলক (Electron-shell)। ইলেকট্রনের ভর আছে এবং সেটা যে ঘুরছে এ রকমও মনে করা হয়। এই পরমাণুর আকার যে রকমই হোক একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন পাশাপাশি জুড়ে দেবার চেয়ে এভাবে অনেক বেশী দেশবিস্তৃতি সম্ভব হয়েছে। কারণ ইলেকট্রন অথবা প্রোটনের ব্যাসার্ধ প্রায় 10^{-15} মিটার এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন গোলকের ব্যাসার্ধ প্রায় $0{\cdot}53 \times 10^{-10}$ মিটার। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই গোলকের অভ্যন্তরে আর কোন ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সম্ভবে না, কারণ গ্রহণযোগ্য আর কোন শক্তিমাত্রা নেই। প্রশ্ন করা যেতে পারে, তবে ব্যাসার্ধ যথাসম্ভব বেশী হলো না কেন (অর্থাৎ n=principal quantum numberটি খুব বড় হলো না কেন)? ব্যাসার্ধ যত বেশী হবে, ইলেকট্রন ও প্রোটনের মধ্যে বন্ধন শক্তি (Binding Energy$=e^2/2r$ erg ; e=ইলেকট্রনের আধান r=ব্যাসার্ধ) তত কমে যাবে এবং পরমাণুটি সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়বে ; অর্থাৎ পরমাণুর স্থিতিকাল কমে যাবে।

বৃহত্তর পরমাণুর (Heavy atom) গঠনের দিকে তাকালে বোঝা যায়, ইলেকট্রনের কক্ষপথ যেখানে উপবৃত্তের রূপ নিয়েছে, সেখানে নিউ-ক্লিয়াসকে একটি নাভিকেন্দ্রে (focus) রেখে ইলেকট্রনটি ঘুরছে ; কারণ এতে বন্ধনশক্তি বাড়ে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের এটি একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যে, সমগ্র শক্তি অথবা বন্ধনশক্তির বিচারে (কারণ Total energy=—Binding Energy) বৃহত্তম পরমাণু গঠনে প্রকৃতি নির্ধারিত পরিকল্পনা (Angular momentum quantum number এবং magnetic moment quantum number-এর বন্টন) সম্পূর্ণ নিখুঁত।

শেষ পর্যায়ে আসে প্রাথমিক বস্তুকণার (Elementary particles) কথা। এগুলির ধারণাই আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের সবচেয়ে দুরূহ অংশ। এদের ভর আছে, আধান আছে, বুদ্বুদ আধারে এদের গমনপথ দেখা যায়, তবু এদের ভরবেগ, শক্তি, অবস্থান-বিন্দু ও কালের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে একটা অনির্দেশ্যতা কাজ করে। গণিতজ্ঞ এগুলিকে তাই প্রকাশ করেন সামান্য কম্পাঙ্ক ব্যবধানের (Frequency-difference) অসংখ্য সাইন-ওয়েভ দিয়ে। এই সাইন-ওয়েভগুলির সামগ্রিক-সংযোগে কোটি-রেখায় (ordinate) ψ এর মান দেশ ও কালের কোন একটি সঙ্কীর্ণ সীমায় বেশ বেড়ে যায় এবং অসীমের দিকে এই মান ক্রমাগত কমে যেতে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় যে, দেশ অথবা কাল নির্দেশ (X or t) ভুজ রেখাকে (X-axis) তা কোথাও ছেদ করে না ; অর্থাৎ দেশ ও কালের কোন বিন্দুতে সে তার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে সীমিত করে না। এই ψ হলো ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থানের সূচক এবং পদার্থবিদেরা বলেন যদিও দেশ-কালের কোন একটি বিন্দুতে ইলেক-ট্রনটিকে পাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক, তবুও এথেকে অসীম দূরত্বে গেলেও সম্ভাবনা শূন্য নয়—যদিও তা খুবই কম। ইলেকট্রনটিকে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা যদি সর্ব দেশকালে সমান হতো তবে তা হতো সর্বব্যাপী কোন কিছু—তার সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য থাকত না। যে অনন্ত শূন্যে ইলেকট্রনটির অবস্থান, সেখানে কোন বাধা নেই, তাই তাদের অবস্থানের অনির্দেশ্যতা অসীম পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

প্রাথমিক বস্তুকণার ধর্ম যদি এই হয়, তবে ফুরিয়ারের ইন্টেগ্রাল দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, এই অতি ক্ষুদ্র বস্তু কণাগুলির মধ্যে একটা তরঙ্গ-ধর্ম প্রকাশ পাবে ; এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নিরূপিত হবে বস্তুকণার ভর, গতিবেগ ও প্ল্যাঙ্কসের ধ্রুবকের (h) দ্বারা। এই প্রমাণ সম্পূর্ণ গাণিতিক এবং এর ব্যাখ্যার উপযোগী উদাহরণ খুঁজে পাওয়া ভার। শুধু এইটুকু

বলা যায়, যে পর্যাবৃত্তির প্রকাশ দেখা গিয়েছিল গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবীর জাতি-সভ্যতার চালচলনে, যার নানান প্রয়োগ আছে জৈব ও অজৈব প্রাণী ও বস্তুর গড়নে, তার অস্তিত্ব প্রাথমিক বস্তুকণার মধ্যেও প্রতীয়মান। এটা প্রকৃতির সমধর্মিতার পরিচায়ক। এথেকে আরও একটা কথা মনে হয়, পর্যাবৃত্তি সম্ভবতঃ বিশ্বের প্রকাশমুখীতা থেকে জাত।

আগেই বলা হয়েছে, পর্যাবৃত্তি প্রাণী-জগতকে একটা ন্যূনতম দূরদৃষ্টি দিয়েছে; সম্পূর্ণ অন্ধকার ভবিষ্যতের অন্ততঃ কিছুটা অংশে অস্বচ্ছ হলেও আলো ফেলেছে। এতে জীবন-যাত্রা হয়েছে অনেক সুগম।

জীব-জগতের দিকে তাকালে এর আরও কয়েকটা সহজ উদাহরণ চোখে পড়বে। এক-কোষী অথবা বহুকোষী প্রাণী যাই হোক না কেন, শরীরের পক্ষে সহনযোগ্য কোন সময়ের ব্যবধানে যদি পুষ্টি, শ্রান্তি ও বিশ্রাম নিয়মিত ঘটানো যায়, তবে কোষগুলি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার আয়ুষ্কালও বাড়ে।

আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম দিকে দৈনিক করণীয় কাজগুলি একটা কঠিন শৃঙ্খলায় বেঁধে দেওয়া হয়। দেখা গেছে, শরীর ও মনের উপর এই নিয়মিত অভ্যাসের দোলন ধারণা-শক্তিকে খুব বাড়িয়ে দেয় এবং মনের আধার বৃহৎ শক্তিও অনুভূতি গ্রহণের উপযোগী হয়। কবিতার ছন্দ অথবা গানের তাল সম্ভবতঃ এই কারণে ভাল লাগে। সুসম লয় মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকাশমুখীতাকে তৃপ্ত করে এবং লয়হীনতা তাকে আঘাত করে।

পর্যাবৃত্তি প্রকাশমুখীতার সহায়ক—এই জন্যে প্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি ভাঙ্গা ও গড়া, ধ্বংস ও সৃষ্টি মধ্য দিয়ে সামগ্রিক উন্নতি ঘটতে থাকে। আর সামগ্রিক উন্নতি যে ঘটে, তার সাক্ষী দেবে বিবর্তনবাদ।

অবেদনের কথা

সমীরকুমার ঘোষ*

রূপকথার গল্পের মত বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের গল্পই আমাদের জানা আছে। সেই সব আবিষ্কারের মধ্যে অনেকগুলিই ঘটেছে আকস্মিক-ভাবে, আবার কোন কোন আবিষ্কার হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে, এমনি এক আবিষ্কারের কথাই এখানে আলোচনা করব।

বহু প্রাচীনকালে মানুষের দেহে যখন কোন অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতো, তখন মানুষকে অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হতো প্রথমতঃ, তখনকার দিনে, এখনকার মত শল্যচিকিৎসার তেমন সুব্যবস্থা ছিল না। এর উপর মানুষকেও ভোগ করতে হতো অশেষ যন্ত্রণা, এমনও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কখন কখন টেবিলের সঙ্গে বেঁধে রেখেও মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার করা হতো। এই ব্যবস্থায় রোগীর দুর্ভোগের সীমা যে কোথায় উঠত, তা সহজেই অনুমেয়। সেজন্যে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের এক বিরাট চিন্তা ছিল যে, এমন কোন জিনিষ কি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, যা অস্ত্রোপচারকালে মানুষের চরম যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে। ইতিহাসে পাওয়া যে, খৃষ্টপূর্ব 3000 বছর আগে, চীনাদের মধ্যে আফিং প্রয়োগ করে যন্ত্রণা উপশম করবার পদ্ধতি প্রচলিত

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

ছিল, আবার পেরুর কোন কোন অঞ্চলে কোকো-পাতা চিবিয়ে জিব অসাড় করে ফেলবার পদ্ধতির কথাও জানা যায়। এইভাবে শরীরের কোন অংশকে যে বস্তুর সাহায্যে অবশ করে ফেলা যায়, তাকে বলে অ্যানাস্থেসিয়া বা অবেদন। এই অ্যানাস্থেসিয়া নামটি দেন বিজ্ঞানী অলিভার হোম্‌স। 1772 সালে বিজ্ঞানী প্রিষ্টলে যখন প্রথম নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস তৈরি করেন, তখন সেই গ্যাসের ধর্ম হিসাবে দেখা গেল যে. ঐ গ্যাস সহজেই মানুষের মধ্যে হাসির উদ্রেক করে। অতিরিক্ত মাত্রায় ঐ গ্যাসের আস্বাদ নিলে শরীরও ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসে। 1799 সালে বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভী প্রথম এবং পরে 1845 সালে হোরেস ওয়েলস নামে এক দাঁতের ডাক্তার বোষ্টন শহরে দাঁত তোলবার কাজে এই গ্যাসকে অবেদন হিসাবে ব্যবহার করেন। বলতে গেলে, এই নাইট্রাস অক্সাইডই বোধ হয় সার্থক অবেদন হিসাবে প্রথম। পরের বছর অর্থাৎ 1846 সালে উইলিয়াম মর্টন নামে আর একজন ডাক্তার, ঐ একই শহরে এক রোগীর টিউমার অস্ত্রোপচারকালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই গ্যাস ব্যবহার করেন। এর ঠিক পরেই 1847 সালে সার জেমস সিম্পসন, অবেদন হিসাবে ক্লোরোফর্মের প্রচলন করেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই সব বিজ্ঞানীদের আগে 1842 সালে 30শে মার্চ ক্রফোর্ড লং নামে এক বিজ্ঞানী অস্ত্রো-পচারের কাজে অবেদন হিসাবে ইথার সার্থক-ভাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তিনি আত্মপ্রচারের পক্ষপাতী না হওয়ায় তাঁর এই সাফল্যের কথা জনসাধারণ জানতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, 1881 সাল থেকেই অস্ত্রোপচারের কাজে অবেদন বা অ্যানাস্থেসিয়ার নিয়মিত ও সার্থক ব্যবহার সুরু হয়েছে।

অ্যানাস্থেসিওলজি বা অবেদনবিদ্যার মূল লক্ষ্য হলো স্নায়ুমণ্ডলীর স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে অস্ত্রোপচারের কাজ সম্পন্ন করতে দেওয়া আর দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রোপচারকালে রোগীকে ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই কাজগুলি করা হয় অবেদন প্রয়োগ করে, রোগীকে অচৈতন্য করে ফেলে। বিশিষ্ট গুণসমন্বিত ঔষধ প্রয়োগের ফলে বিষক্রিয়ায় স্নায়ুমণ্ডলীর শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা প্রবাহের অনুভূতিশক্তি যখন সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়, তখন ব্যবহৃত সেই অবেদনকে বলে স্নায়ুশাখার অবেদন বা চলতি কথায় লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া। এই ধরণের অবেদনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যদিও রোগী তার দেহে কোথায় কিভাবে অস্ত্রোপচার হচ্ছে দেখতে পায়, তবুও অবেদনপ্রযুক্ত শরীরের সেই বিশেষ অংশে কোন অনুভূতিবোধ না থাকায় সে কোন যন্ত্রণার অনুভূতি পায় না। কিন্তু আরো এক ধরণের অবেদন প্রয়োগের প্রথা আছে, যাতে প্রযুক্ত ঔষধ মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করে সারা দেহে অসাড়ত্বভাব এনে দেয়। ফলে রোগীর পক্ষে তার দেহে কোথায় কি ঘটছে, তা দেখবার বা বোঝবার মত শক্তিও তার থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় দেহের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তৃত হয়ে অচেতন অবস্থা আসে বলে এই অবেদনকে জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া বা সাধারণ অবেদন বলে।

লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া হিসাবে 1883 সালে প্রথম কোকেন চক্ষু অপারেশনের কাজে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে কোকো গাছের পাতা থেকে আহরিত এক ধরণের রস থেকেই এই কোকেন তৈরী। এই ধরণের অবেদন ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো এই যে, এর ব্যবহারে মানুষ অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে পড়ে। সেজন্যে কোকেনের পরিবর্তে আজকাল প্রোকেনের যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে, যেটি ঐ দোষমুক্ত, দাঁত তোলবার কাজে অবেদন হিসাবে

এই প্রোকেনের ব্যবহার আজকাল ব্যাপক হারে দেখা যায়।

সাধারণ অবেদন হিসাবে বহু প্রকার জিনিষের প্রচলন আছে। ক্লোরোফর্ম, ইথার থেকে সুরু করে আধুনিক কালে নানা ধরণের অবেদন আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক অবেদনেরই তার নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা আছে। ক্লোরোফর্ম অবেদনহিসাবে বেশ শক্তিশালী হলেও হৃদ্‌যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আবার ইথার, ক্লোরোফর্ম অপেক্ষা কম ক্ষতিকারক হলেও যেহেতু সেটা দাহ্য পদার্থ, সেজন্যে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছভাবে ইথার ব্যবহারের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে, হামফ্রে ব্যবহৃত সেই পুরাতন নাইট্রাস অক্সাইডই বোধ হয় অবেদন হিসাবে আদর্শ। প্রকৃতপক্ষে, আদর্শ অবেদন খোঁজবার পালা আজও শেষ হয় নি। লিভারপুলের জনৈক ডাক্তার—নাম Dr. Minnit, সাফল্যের সঙ্গে এক অবেদন ব্যবহার করেন, যা বাতাসে শতকরা 45 ভাগ নাইট্রাস অক্সাইডের সংমিশ্রণে তৈরী। আবিষ্কারকের নামানুসারে এই অবেদনের নাম রাখা হয় Minnit Gas। এ ছাড়া বরফের সাহায্যেও শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে ঠাণ্ডা করে, অবেদনের কাজ চালানো যেতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, নেপোলিয়ানের সৈন্যবাহিনী যখন রাশিয়ার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার জন্যে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়, তখন আহত সৈনিকদের দেহে অস্ত্রোপচার খুব সহজেই করা সম্ভব হয়েছিল। আজও কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বৃদ্ধদের, এইভাবে অবেদন হিসাবে ঠাণ্ডা প্রয়োগ-পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে।

জীবদেহে এই অবেদনের কাজ ঠিক চলে কিভাবে, এ সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল হওয়া হয়তো স্বাভাবিক। মানুষের শরীরে অবেদন ঠিক কিভাবে কাজ করে, সে সম্বন্ধে নানারকম মতবাদ প্রচলিত আছে। 1901 সালে ওভারটোন প্রথম এ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেন। তাঁর মতে অবেদন প্রয়োগের পরেই সেটা মানুষের মস্তিষ্কে গিয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আরো বহু রকম তত্ত্ব অবশ্য আছে এ সম্বন্ধে। তবে, একেবারে আধুনিক মতবাদ হলো যে, মানুষের মস্তিষ্কে যে জারণ (Oxidation) পদ্ধতি হয়, অবেদন তাতে অংশ গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন স্নায়ুতে মস্তিষ্ক থেকে যে প্রেরণা যায়, তাতে ব্যাঘাত ঘটায়। যেহেতু ঐ জারণ পদ্ধতির সাহায্যেই মস্তিষ্ক প্রেরণা পাঠাতে একমাত্র সক্ষম, সুতরাং মস্তিষ্কে যদি অক্সিজেন পাঠানো কোনক্রমে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া যায়, তবে খুব শীঘ্রই অচেতনতা দেখা দেবে। সেজন্যে আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী, অবেদন শরীরে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কে অক্সিজেন প্রেরণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র শরীরে অচেতনতা এনে দেয়। অবশ্য বিভিন্ন অবেদনের প্রকারভেদে, স্নায়ুর উপর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ভাবে হয়। ক্লোরোফর্ম, ইথারজাতীয় অবেদন সোজাসুজি প্রশ্বাসবায়ুর সঙ্গে ফুস্‌ফুসে গিয়ে রক্তের সঙ্গে স্নায়ুকেন্দ্রে উপস্থিত হয় এবং প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। আবার বিভিন্ন প্রকারের ন অবেদন, যা জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে শরীরে প্রবেশ করানো হয়, সেগুলি রক্তের সঙ্গে সোজাসুজি স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে কাজ করে। যে ভাবেই হোক, স্নায়ুকেন্দ্রে এসে অবেদনকারক ঔষধগুলি স্নায়ুর সূক্ষ্ম কার্যকারিতা—যেমন, চিন্তাশক্তি, বেদনাবোধ ইত্যাদি ব্যাহত করে। তবে মৌলিক জীবনরক্ষার প্রয়োজনে স্নায়ুকেন্দ্র যে সব কাজ করে, সেগুলি অবশ্য অব্যাহত থাকে। এমনও কয়েক ধরণের অবেদনকারক ঔষধ আছে, যার দ্বারা মানসিক ক্রিয়া, অনুভূতি ক্রিয়া, মাংসপেশীর আকুঞ্চনক্রিয়া এবং পরিবর্ত (Reflex) প্রভৃতি রুদ্ধ করে রাখা যায়। অস্ত্রোপচারকালে বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ে যাতে এই সবকয়টি কাজই

পাওয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অবেদন প্রয়োগের সময়ে রোগীর দেহের অনেকগুলি জিনিষের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, রোগীর সহনশীলতা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ অবেদন প্রয়োগে রোগীর দেহে কোন প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, অবেদন প্রয়োগে রোগীর দেহের উত্তাপ ও রক্তের চাপও বৃদ্ধি পায়। সেজন্তে অস্ত্রোপচারকালে রোগীর দেহের উত্তাপ 98° ডিগ্রী ফারেনহাইট থেকে নামিয়ে সাধারণতঃ 86° ডিগ্রী ফারেনহাইটে রাখা হয়। আবার যাতে রোগীর দেহ থেকে বেশী রক্তক্ষরণ না হয়, সেজন্য তার রক্তের চাপও কমানো হয়। দেখা গেছে যে, রোগীর দেহের উত্তাপ কমিয়ে আনলে অবেদন প্রয়োগে তার অচেতনতা আনা খুবই সহজসাধ্য হয়। অবশ্য দেহের উত্তাপ কমিয়ে আনবার একটা নিম্ন সীমা নিশ্চয়ই আছে। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে 82° ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে দেহের উত্তাপ কমিয়ে আনলে বিপদ দেখা দিতে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে 77° ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উত্তাপ সহজেই নামানো যেতে পারে।

অবেদন সম্পর্কে এত জটিল আলোচনান্তে একটা কথা অবশ্যই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষাও অবেদন প্রয়োগকারীকে যে অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং কুশলী হতে হবে, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। চিকিৎসকের সব সাফল্য নির্ভর করে তাঁর সহযোগী অবেদন প্রয়োগকারীর জ্ঞান ও দৃঢ়তার উপর। ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত সমুদ্রে জাহাজের ক্যাপ্টেনের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রয়োজন অভিজ্ঞ ও দৃঢ়চেতা চালকের। একে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে অচল—এ কথা তো আর অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানে গ্রাম-সমীক্ষা ও তার মূল্যায়ন

রেবতীমোহন সরকার*

গ্রামীণ জীবনযাত্রা প্রণালীর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞান সামগ্রিকভাবে উপজাতি জীবনধারার বিভিন্ন মুখী আলোচনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই বহু দিন ধরে নৃ-বিজ্ঞান অধ্যয়নের বিষয়বস্তু মূলতঃ উপজাতি জনজীবনের প্রেক্ষাপটে বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের সুরুতেই কতিপয় নৃ-বিজ্ঞানী চিরাচরিত উপজাতি জীবনধারার বিচার-বিশ্লেষণ পরিত্যাগ করে গ্রামীণ সমাজের রীতি-নীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর আলোকপাতে সচেষ্ট হলেন। এই সময় থেকেই ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানের অধ্যয়নের চত্বরে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। ভারতে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রাম-সমীক্ষার প্ররোচনা অবশ্য এসেছিল প্রধানতঃ আমেরিকা এবং ইউরোপের বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ গ্রাম-সমীক্ষার কাজের মাধ্যমে। এই বিষয়ে পিকি (Peake) রচিত ইংল্যাণ্ডের গ্রাম (1922), হার্সকোভিটসের (Her-

* নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা-9

skovits) হাইতির গ্রাম (1937), এরেন্সবার্গের (Arensberg) আয়ারল্যাণ্ডের গ্রাম (1940), রবার্ট রেডফিল্ড (Robert Redfield) ও অস্কার লিউইসের (Oscar Lewis) মেক্সিকোর গ্রাম (1940), রেমণ্ড ফার্থের (Raymond Firth) মালয়স্থিত মৎস্যজীবীদের গ্রাম (1946), জন এমব্রির (John Embree) জাপানের গ্রাম (1946) প্রভৃতি সমীক্ষার বিবরণগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কালক্রমে গ্রামীণ জীবন-ধারা এবং বিকাশ ও বৃদ্ধির সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণের প্রতি পৃথিবীখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। এঁদের অনেকেই ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রামগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনালেখ্য আলোচনায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামে নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা সুরু হয়ে গেল। মরিস অপলারের (Morris Opler) নেতৃত্বে গঠিত গবেষকদল 1950-51 খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশের সেনাপুর গ্রামের জীবনধারার এক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করলেন এবং তারপর থেকেই ভারতের নানা স্থানের ছোট বড় গ্রামকে কেন্দ্র করে গবেষণা কার্য সুরু হলো। সেই কর্মযজ্ঞে ভারতীয় এবং আমেরিকান নৃ-বিজ্ঞানিগণ সমভাবে আত্ম-নিয়োগ করলেন। 1955 খৃষ্টাব্দ নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক ভারতীয় গ্রাম-সমীক্ষার এক স্মরণীয় বছর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ এই সময় এস, সি, দুবে কর্তৃক Indian village, এম, এন, শ্রীনিবাস সম্পাদিত India's village এবং ম্যাকিম ম্যারিয়ট (Mckim Marriott) সম্পাদিত Village India পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত পুস্তকে অধ্যাপক দুবে দাক্ষিণাত্যের সমীরপেট নামক গ্রামের জীবনযাত্রার এক তথ্যপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত করেন, যা ভারতীয় গ্রাম-সমীক্ষার ইতিহাসে এক বিশেষ দিশারী হিসাবে পরিগণিত। তাঁর মতে ভারতের কোন গ্রামই স্বশাসিত এবং স্বয়ন্তর নয়, কারণ বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগুলি এক একটি অংশ হিসাবে কাজ করে। কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র একটি বিশেষ গ্রাম্য গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেই পরিগণিত হয় না—তার পরিচয় জাতি, ধর্ম, প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রূপ লাভ করে। অপরদিকে অধ্যাপক শ্রীনিবাস সম্পাদিত পুস্তকটি পাঁচ জন আমেরিকান, পাঁচ জন বৃটিশ এবং তিন জন ভারতীয় পণ্ডিতের বিভিন্ন গ্রামে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধের সঙ্কলন। পুস্তক হিসাবে প্রকাশের পূর্বে এগুলি 1951 খৃঃ থেকে 1954 খৃষ্টাব্দের মধ্যে Economic Weekly পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ম্যাকিম ম্যারিয়ট সম্পাদিত পুস্তকে একজন ব্যতীত (ভারতীয়) সকল লেখকই আমেরিকার অধিবাসী। এঁরা বিভিন্ন সময়ে একা অথবা দলগতভাবে ভারতের বিভিন্ন গ্রামে গবেষণাকার্য পরিচালনা করে গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার নানা দিকের প্রতি আলোকসম্পাত করেন

উপরিউক্ত পুস্তকগুলি ছাড়াও ভারতীয় গ্রাম-সমীক্ষার কিছু কিছু বিবরণী অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই সুরু হয়েছিল, যদিও সামগ্রিকভাবে নৃ-বিজ্ঞান-ভিত্তিক আলোচনা এতে প্রাধান্য লাভ করে নি। 1871 খৃঃ প্রকাশিত সার হেনরি মেন (Sir Henry Maine) রচিত Village Communities in the East and West নামক পুস্তকটি গ্রাম-সমীক্ষার ইতিহাসে পথিকৃৎ হিসাবে পরিগণিত। এর পর 1874 খৃঃ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে কর্তৃক রচিত 'গোবিন্দ সামন্ত' অথবা 'বাংলার কৃষক জীবন' (Bengal Peasant Life) শীর্ষক পুস্তকটি এই বিষয়ে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি বর্ধমান জেলাস্থিত কাঞ্চনপুর গ্রামের জীবনধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। উত্তরপাড়ার তদানীন্তন জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জির ঘোষিত পুরস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই পুস্তক রচিত হয় এবং বিচারক-

গণ কর্তৃক আলোচ্য পুস্তকটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। 1896 খৃঃ ব্যাডেন পাওয়েল (Baden Powell) প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Village Communities in India। এতে গ্রাম সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করা হয়। তবে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ জীবনের কোন আলোচনা এতে স্থান পায় নি। ভারতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র-গবেষণার ভিত্তিতে 1930 খৃঃ প্রকাশিত এবং ওয়াইজার (Wiser) কর্তৃক রচিত Behind mud walls পুস্তক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1936 খৃঃ তাঁর রচিত The Hindu Jajmani System নামক পুস্তকে উত্তর প্রদেশের করিমপুর গ্রামের 24টি জাতি, গোষ্ঠীর পারস্পরিক কর্ম ও পারিশ্রমিক, দান-গ্রহণের এক অতি সুন্দর ব্যবস্থার সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রূপলাভ করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণা কার্যের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, এই যজমানি প্রথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামগুলিতে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার এক বিশেষ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে। অবশ্য ওয়াইজারের পূর্বে কয়েকজন গবেষক, যেমন রিজ্‌লে (Risley), ক্রুক (Crooke), ইবেটসন (Ibetson), নেহেরু (Nehru) ভারতীয় গ্রামে যজমানি ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন; তবে মূলতঃ তাঁরা যজমান বলতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মক্কেল-গণকে (Brahmani clientele) বুঝিয়েছেন। ওয়াইজারের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশী নৃ-বিজ্ঞানিগণ তাঁদের সারা ভারতের বিভিন্ন গ্রাম-সমীক্ষায় এই যজমানি প্রথার অস্তিত্বই শুধু নয়, কিভাবে এই যজমানি অর্থনীতি গ্রামীণ সামাজিক-ধর্মীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করেছে, তার উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক 1955 খৃষ্টাব্দের পরে আলোচ্য বিষয়ের উপর যে দুটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, তার প্রথমটির লেখক অস্কার লিউইস এবং দ্বিতীয়টির রচয়িতা ডি, এন, মজুমদার। দুটিই 1958 খৃঃ প্রকাশিত হয়। আমেরিকান সমাজ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিউইস মেক্সিকোস্থিত একাধিক গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালীর দীর্ঘ দিনব্যাপী গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তার সেই অভিজ্ঞতার পশ্চাৎপটে দিল্লীর সন্নিকটস্থ রামপুর গ্রামের উপর এক তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি ওয়াইজার প্রদর্শিত গ্রামীণ জীবনে যজমানী প্রথার বহুমুখী প্রভাবের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। অপরদিকে অধ্যাপক মজুমদার লক্ষ্ণৌয়ের সন্নিকটস্থ মোহানা গ্রামের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক, নেতৃত্ব, দলাদলি, অর্থনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সেই বছরই বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানী এফ, সি, বেলি (Bailey) ওড়িষার গ্রাম বিশিপাড়ায় জাতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রন্থে ওড়িষার গ্রাম-জীবনের নানা বিষয় পরিস্ফুট হয়। অপর একজন বৃটিশ নৃ-বিজ্ঞানী এ,সি, মায়ের (Mayer) মালোয়া-স্থিত রামখেরি গ্রামের জাতি এবং আত্মীয়তা বিষয়ে আলোচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনের উপর বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠীর প্রভাব এবং প্রতি-পত্তির বিষয় সুচারুভাবে এই আলোচনায় রূপ লাভ করে। মালোয়ার গ্রামে এই কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে কে, এস, মাথুর এই স্থানের পটলড গ্রামের জাতি এবং আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে এক গবেষণা-কার্য পরিচালনা করেন। পটলডের সমাজ-জীবন কি ভাবে এবং কত ভাবে হিন্দু আচার-আচরণের বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয় তাঁর আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

1958 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু পশ্চিম বাংলার ['দে]শের বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয়ে

একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর মতে, এখানের গ্রামের স্বরূপ দুটি—বিক্ষেপিত এবং গুচ্ছবদ্ধ। অধিবাসীদের প্রকৃতি এবং পেশা অনুযায়ী গ্রামগুলির বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। কোন গ্রাম কৃষক গোষ্ঠী অধ্যুষিত, কোন গ্রামে দেখা যায় শিল্পী গোষ্ঠীর প্রাচুর্য। কোন গ্রাম সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে, আবার কোনটি বা বিশেষ দেব মন্দিরকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর গ্রামীণ ধর্মীয় জীবনের প্রাণ-প্রাচুর্যের নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন রূপী গ্রামগুলি কিভাবে সাপ্তাহিক হাট এবং মেলার মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্কাবদ্ধ, তা তিনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। কিভাবে বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারা এগুলির উপর প্রতিক্রিয়া হেনেছে, তা তাঁর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 1963 খৃঃ থেকে 1968 খৃষ্টাব্দের মধ্যে Man In India পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচটি প্রবন্ধে প্রবোধকুমার ভৌমিক মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন জাতি-উপজাতি ও সম্প্রদায়অধ্যুষিত ডহরপুর, বেজদা, মীরপুর গ্রামের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি বিষয়ে জাতি-উপজাতি ও সম্প্রদায়গুলির ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয়ে আলোকপাত করেন। মেদিনীপুর জেলার অপর একটি গ্রাম রঞ্জনার জীবনধারার বিবরণ পুস্তকাকারে গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 1964 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পশ্চিম বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলের গ্রামজীবন সম্পর্কে আলোচনায় র‍্যাল্ফ নিকোলাস (Ralph Nicholas) প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেন। গ্রামীণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ভাবধারার উপর ভৌগোলিক পরি-পরিবেশের প্রভাবের কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিম বাংলার গ্রামে জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই এবং প্রাচীন নেতৃত্বের প্রকৃতি বিষয়ে আর, চৌধুরী তাঁর দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। গ্রামে জাতি ও শ্রেণীভিত্তিক দল-উপদলের সংঘাত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে বীরভূম জেলার একটি গ্রামে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে রেবতীমোহন সরকার প্রত্যক্ষ গবেষণাভিত্তিক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। শ্যামল সেনগুপ্ত রচিত একটি প্রবন্ধে মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি-দের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ধারণার বিষয়গুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে আলোচনা করা হয়।

দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলাস্থিত একটি গ্রামের বিভিন্ন জাতি ও প্রাচীন রাজনীতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোচনা করেন সিবার্ট-সেন (Sivertsen)। 1963 খৃঃ এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 1966 খৃষ্টাব্দে আঁদ্রে বেতে (Andre Betoille) এই জেলারই অপর একটি গ্রামে জাতি, শ্রেণী ও ক্ষমতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং প্রাচীন সমাজ ও অর্থনীতিতে এগুলির প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা আলোচনা করেন। 1964 খৃষ্টাব্দে একটি জাপানী বৈজ্ঞানিকদল কর্তৃক ভারতের দুই প্রান্তের—যেমন গুজরাট ও পশ্চিম বাংলা—কয়েকটি গ্রামের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবযাত্রার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। জাপানস্থিত Institute of Economic Affairs থেকে এই গবেষণা-কার্য পরিচালিত হয়। প্রাচীন অর্থ-নীতি, পরিবার ও আত্মীয়তা এবং গ্রাম সংগঠনের ঐতিহ্যগত রূপ এবং বর্তমান পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো হয়। 1967 খৃঃ ছোটনাগপুরের উপজাতি গ্রামের সমাজ-বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভারতের গ্রাম-জীবন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শ্রীনিকেতনস্থিত Agro-Economic Research Centre-এর কার্যাবলীর কথা এই বিষয়ে উল্লেখ-যোগ্য। শান্তিনিকেতনের পার্শ্ববর্তী এলাকায়

গ্রামসমূহের সমাজ ও অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর সমীক্ষার এই গবেষণা সংস্থাটি বহু দিন পূর্বেই আত্মনিয়োগ করেছিল। Indian Statistical Institute-এর আনুকূল্যে এখানের অনেক গ্রাম-সমীক্ষা বিবরণীর পুনঃসমীক্ষা চালানো হয়। এগুলির মধ্যে 1960 খৃঃ প্রকাশিত The Eavirons of Tagore বোলপুরের নিকটবর্তী 170টি গ্রামের পুনঃসমীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। 1961 খৃঃ প্রকাশিত Then and Now শীর্ষক পুস্তকটিও এরূপ একটি পুনঃসমীক্ষার বিবরণী। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে রচিত এবং 1874 খৃঃ প্রকাশিত গ্রাম বিবরণীর (Bengal Peasant Life) উপর এই সংস্থার পরিচালনায় 1933 এবং 1958 খৃষ্টাব্দে দু-বার সমীক্ষা চালানো হয় এবং গ্রাম-জীবনে বিভিন্নমুখী পরিবর্তনের ধারার প্রতি আলোকপাত করা হয়। এছাড়া ভারত সরকারের লোকগণনা বিভাগের পরিচালনায় এবং যোগ্য নৃ-বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় আট শত গ্রাম-সমীক্ষা হয়েছে। যদিও একটি বিশেষ ছাঁচে ঢেলে এই সমীক্ষার কাজ সমাধা হয়েছে, তবুও অল্পবিস্তর-নৃতাত্ত্বিক সূত্রের প্রয়োগ এগুলিকে বৈজ্ঞানিক পশ্চাৎ-পটদানে সাহায্য করেছে।

এই সব নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রাম-সমীক্ষার মাধ্যমে ভারতের গ্রামের আভ্যন্তরীণ রূপটি উদ্ভাসিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি মণ্ডলে গ্রামের চেহারা ভিন্নরূপী। ভারতের গ্রাম কেবলমাত্র প্রশাসনিক অথবা কর আদায়ী সংস্থা হিসাবে পরিগণিত হয় না—এগুলি দেশীয় রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থার প্রাথমিক সংস্থা। স্মরণাতীত কাল থেকে গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধারা বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়, এই ঐতিহ্যের ধারাকে উদ্‌ঘাটিত করবার কাজে নৃ-বিজ্ঞানীর গ্রাম-সমীক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতির এই ভেদাভেদ কেবলমাত্র অস্পৃশ্যতারূপী কু-সংস্কারাচ্ছন্ন এক মতবাদেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়—সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই জাতিপ্রথা বিশেষভাবে চিহ্নিত। জাতিভিত্তিক কৌলিক বৃত্তিগুলির উদ্ভব ও বিস্তৃতি এবং সেই সব বৃত্তির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে প্রতিটি গ্রাম এক একটি অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই জমির পরিমাণের উপরই ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক মূল্যমান কেন্দ্রীভূত। এছাড়া গ্রামের বিভিন্ন পালা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামের বিভিন্নমুখী ভাবধারাকে একত্রিত করতে সহায়তা করেছে।

ভারতের গ্রাম-জীবনের সনাতন প্রথা কিন্তু আজ পরিবর্তনের ভরা জোয়ারে ভেসে চলেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে ত্বরিত শিল্পযোজন মানুষের গতিকে শহরাভিমুখী করেছে এবং নগদ পয়সার লেনদেন দেশের অর্থনীতিকে এক ভিন্ন রূপ দান করেছে। কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের যে মূল্যমান স্থির হয়েছিল, শিল্পভিত্তিক ব্যবস্থা-পনায় সেগুলি খুব স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হলো। দেখা দিল নতুন এক জীবনবোধ। গ্রাম আস্তে আস্তে জনহীন হতে লাগল—বহু ঐতিহ্য-মণ্ডিত গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ল। এমতা-বস্থায় দেশের জাতীয় সরকার গ্রামীণ জীবনযাত্রার উন্নতিকল্পে বিশেষ নজর দিলেন। বিভিন্ন সময়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামগুলির জরাজীর্ণ রূপের পরিবর্তনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হলো। 1952 খৃষ্টাব্দের 2রা অক্টোবর সারা দেশব্যাপী সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত এই বিষয়ে এক উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত। এছাড়া আরও বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামগুলির উন্নতির জন্যে চেষ্টা চলতে লাগল—সুরু হলো বিভিন্ন চিন্তার রূপায়ণ। বর্তমানের সবুজ বিপ্লবের কথাও এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। দেশের খাদ্যাভাব মোচনে গ্রামগুলির অবদান অপরিমেয়, তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। দিকে দিকে কাজ সুরু হলো এবং অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ জীবন-ধারায় আমূল পরিবর্তনের সূচনা হলো। নৃ-বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানে সেই পরিবর্তিত ভাবধারার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 1958 খৃঃ এস, সি, দুবে কর্তৃক India's Changing Village নামক পুস্তকে উত্তর প্রদেশের কয়েকটি গ্রামে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবর্তিত জীবনধারার প্রতি আলোক-সম্পাত করা হয়।

গ্রামীণ জীবনযাত্রার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচয়িতাদের জনজীবনের অন্তর্নিহিত মূল সুরটির উপলব্ধি থাকা বাঞ্ছনীয়, নচেৎ সেই সব পরিকল্পনা রূপায়ণে বিঘ্ন ঘটবারই সম্ভাবনা। অনেক সময় প্রশাসকমণ্ডলী গ্রামীণ জীবনধারা সম্যক অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে নৃ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামজীবনের বিবরণীর শরণাপন্ন হন। আবার অধিকাংশ সময়ে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ত্বরিত গ্রাম-সমীক্ষা সুরু হয় এবং ক্ষণপরেই পরিকল্পনা রচিত হতে থাকে। এই সকল গ্রাম-সমীক্ষার কাজ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই এগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি রচিত হয় না। অপর দিকে নৃ-বিজ্ঞানিগণ কর্তৃক গ্রাম-সমীক্ষা দীর্ঘ সময় ধরে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা লাভ করে। খুবই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে প্রাচীন উন্নয়ন পরি-কল্পনা রচনায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম-সমীক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নৃ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। প্রথম দল মনে করেন নৃ-বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ প্রাচীন জীবনের বিবরণী তাঁদের কর্মকাণ্ডে প্রয়োগযোগ্য নয়, কারণ এগুলি অত্যধিক তত্ত্বমূলক। অপর দিকে নৃ-বিজ্ঞানীদের ধারণায় প্রশাসনিক ব্যক্তিদের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় এবং জীবনযাত্রার উন্নতিবিষয়ক কর্মে বহু অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়; কাজেই তাঁদের বিচারে সেগুলি বর্জনীয়। এমতবস্থার অবসান অচিরেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এটি কেবল মাত্র নৃ-বিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সম্ভব। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, নৃ-বিজ্ঞানিগণ অধিকাংশ সময়েই তাঁদের গ্রাম-সমীক্ষার আলোচনায় দুরূহ শব্দ-সমষ্টি এবং মতবাদের আমদানী করে থাকেন, যেগুলি সাধারণ পেশাদার সমাজকর্মীদের প্রবেশ পথে দুরধিগম্য ব্যূহ রচনা করে। দেশ-ব্যাপী সবুজ বিপ্লবের মহান যজ্ঞে নৃ-বিজ্ঞানীদের এই ফলিত অনুসন্ধানাবলীর ফলাফলের একটা অপরিহার্য প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং নৃ-বিজ্ঞানীদেরই এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। কেবলমাত্র অনুসন্ধানের জন্যেই অনুসন্ধান না চালিয়ে, কিভাবে তাঁদের প্রদর্শিত পথ সাধারণ সমাজকর্মীদের অধিগম্য হয় এবং গ্রামীণ সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে কিভাবে তাঁদের গবেষণার ফলাফল সহজেই কাজে লাগানো যেতে পারে—তার জন্যে গ্রাম-সমীক্ষায় রত নৃ-বিজ্ঞানীদেরই সচেষ্ট হবার সময় এসেছে।

নিউট্রন ও প্রোটন কণার কাঠামো সন্ধানে

সন্তোষকুমার ঘোড়ই*

পরমাণুর অন্দর মহলের খবর দিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। ধাতব পাতলা পাত দিয়ে আল্ফা কণার বিক্ষেপণ লক্ষ্য করেই তিনি বলেছিলেন, পরমাণু কোন সমজাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি নয়। তার কাঠামো হলো সৌরজগতের মত—একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত ভারী নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে অতি ক্ষুদ্র ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাগুলির আবর্তন। পরবর্তীকালের বিজ্ঞানিগণ আরও শক্তিশালী কণা ব্যবহার করে বিক্ষেপণ পরীক্ষা চালিয়ে ধরলো নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন ও তার শরিক আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণাকে। এতদিন পর্যন্ত প্রোটন ও নিউট্রন এই দুই কণাকে নিউক্লিয় মৌল কণা হিসাবে ধরা হতো; অর্থাৎ যাদের সমসত্ত্বতা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম বা কাঠামো নেই। কিন্তু বর্তমানে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর সেন্টারে (S.L.A.C.) প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা দুই মাইল লম্বা অ্যাক্সিলারেটরে সৃষ্ট খুব বেশী শক্তির (প্রায় 21 Gev)‡ ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে; কণাগুলির অন্দর মহলের যৌগিক কাঠামোর সন্ধান দিচ্ছে। মোটামুটি অনুসন্ধানে বলা হয়েছে, প্রোটন বা নিউট্রন আর মৌল কণা নয়—এদের কাঠামো বিন্দুবৎ সব উপাদান দিয়ে গড়া—আপাততঃ যাদের নামকরণ করা হয়েছে 'পার্টন'।

কাঠামো জানবার চাবিকাঠি

বিক্ষেপণ পরীক্ষাই হলো সব কিছুর কাঠামো সন্ধানের চাবিকাঠি। এখন ইলেকট্রন বিক্ষেপণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ইলেকট্রন বিক্ষেপণ দু-রকম হতে পারে।

1. স্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ—এই বিক্ষেপণে আপাতিত কণার দ্বারা সংঘর্ষিত হওয়ার পর পরীক্ষাধীন বস্তুকণার আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। ঘটনাটা খানিকটা একটা মার্বেল রেখে, আর একটা মার্বেল বা মার্বেলজাতীয় বস্তু দিয়ে আঘাত করবার মত—যাতে আঘাত খাওয়ার পর ঠিক্‌রে পড়া মার্বেলটির আভ্যন্তরীণ গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না। এই পদ্ধতিতে সংঘর্ষের আগে ও পরে শক্তি ও ভর-বেগ অপরিবর্তনীয় থাকে।

2. অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ—এই বিক্ষেপণে পরীক্ষাধীন বস্তুকণা বিয়োজিত হয়ে নতুন কণায় পরিণত হতে পারে কিংবা কিছুটা আপতিত শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত অবস্থায় থাকতে পারে; অর্থাৎ বস্তুকণাটির নিজস্ব ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে এই ক্ষেত্রে সংঘর্ষের আগে ও পরে শক্তি বা ভর-বেগ অপরিবর্তনীয় থাকে না।

উভয় প্রকার বিক্ষেপণই পরীক্ষাধীন বস্তুকণার কাঠামো জানবার সহায়ক। ইলেকট্রন বিক্ষেপণ সমস্যা খুব জটিল। আল্ফা কণার

‡1 Gev (Giga electron-volt) $= 10^9$ ইলেকট্রন-ভোল্ট; এক ভোল্ট তড়িৎ বিভব পার্থক্যে একটি ইলেকট্রন এক প্রান্তবিন্দু থেকে অন্য প্রান্তবিন্দুতে পৌঁছতে যতটা পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে, তাকে বলা হয় এক ইলেকট্রন ভোল্ট, 1 ই. ভো. $= 1.601 \times 10^{-12}$ আর্গ।

* পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

ক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাদারফোর্ডের সমীকরণ ইলেকট্রন বিক্ষেপণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় না। কারণ এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের ও আঘাত পাওয়া প্রোটনের বেগের পরিমাণ এত বেশী যে, নিউটনের গতি-সূত্র খাটে না। তাই আপেক্ষিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করে আপতিত ও পরীক্ষাধীন বস্তুকণার আচরণ ও তরঙ্গ-প্রকৃতি জানতে হয় এবং তা থেকেই বস্তুটির কাঠামো সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

ইলেকট্রনকে উচ্চ শক্তিমাত্রায় (প্রায় 21Gev) তোলবার জন্যে আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ডে দু-মাইল লম্বা লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর ব্যবহার করা হয়েছে। ষ্ট্যানফোর্ডে অ্যাক্সিলারেটর সেন্টারে দু-মাইল লম্বা একটি বায়ুশূন্য পাইপের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন পাঠানো হয়। এই পাইপ বরাবর 245টি ক্লিস্ট্রন টিউব (Klystron Tube) লাগানো থাকে, যেগুলি ইলেকট্রনের যাত্রাপথে তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি জোগায়। এই দু-মাইল যাত্রায় ইলেকট্রনের শক্তি ক্রমবর্ধিত হয় এবং এই ইলেকট্রন রশ্মিকে নির্দিষ্ট গতিপথে রাখবার জন্যে প্রতি এক-শ' মিটার দূরত্বে একটি করে চৌম্বক লেন্স বসানো থাকে। দু-মাইল যাত্রার শেষে শক্তিশালী ইলেকট্রন রশ্মিকে তরল হাইড্রোজেন বা তরল ডয়টেরিয়ামের (ভারী হাইড্রোজেন) মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বিক্ষেপণ লক্ষ্য করা হয়। যেহেতু হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসে শুধু একটিমাত্র প্রোটন আছে, সেহেতু এরূপ বিক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাধীন বস্তু একটি প্রোটন কণার কাজ করে। আবার একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন একযোগে যে বিক্ষেপণ দেয়, তা ডয়টেরিয়াম থেকে বিক্ষেপণ হিসেবে মনে করা যায়। কারণ, ডয়টেরিয়াম নিউক্লিয়াস একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত। এই ইলেকট্রন বিক্ষেপণ পরীক্ষায় যাতে পরীক্ষাধীন তরলের তাপমাত্রা তথা ঘনত্বের পরিবর্তন না ঘটে, সেদিকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। 1নং চিত্রে ইলেকট্রন বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

বিক্ষেপণ পরীক্ষায় দেখা গেছে, 10 Gev শক্তি-মাত্রায় ইলেকট্রন রশ্মি স্থির প্রোটন কণাতে আঘাত

1নং চিত্র

ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ প্রক্রিয়া

P—ইলেকট্রনের প্রাথমিক ভরবেগ, P′— ইলেকট্রনের শেষ পর্যায়ের ভরবেগ, $q-2\sqrt{pp'}\,\sin\theta/_2$, ইলেকট্রনের বিক্ষেপণ কোণ।

করলে স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক দু-প্রকার বিক্ষেপণ পাওয়া যায়। বিক্ষেপিত ইলেকট্রনগুলিকে চুম্বকীয় বর্ণালীমাপক যন্ত্র (Mag. Spectrometer) দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষালব্ধ বিক্ষেপণ-বর্ণালী থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ যা থেকে ঘটে, তার আভ্যন্তরীণ গঠন নিউক্লীয় কণার চেয়ে অনেক ছোট। পরীক্ষালব্ধ বিক্ষেপণের ফলাফলকে, বিশেষ করে অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণের পরীক্ষালব্ধ ফলকে তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা চলছে। যার ফলে আপাতত সৃষ্টি হয়েছে পার্টন-মডেল, যা নিউক্লীয় কণার (প্রোটন বা নিউট্রনের) কাঠামোর মোটামুটি তত্ত্বগত সন্ধান দেয়।

পার্টন-মডেল (Parton-Model)

ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্নোলজির অধ্যাপক রিচার্ড পি. ফেইনম্যান হলেন এই

মডেলের স্রষ্টিকর্তা। তাঁর মতে, প্রোটন ও নিউট্রন কণা যে সব অজানা বিন্দুবৎ সত্ত্বা দিয়ে তৈরী—তাদের নাম হলো পার্টন এবং পার্টনগুলিই খুব বেশী শক্তিমাত্রার ইলেকট্রনকে অস্থিতিস্থাপকভাবে বিক্ষেপিত করে। নিউক্লিয়াসে আজ পর্যন্ত যত মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, পার্টন তাদের থেকে স্বতন্ত্র; যদিও এর ভৌত ধর্ম এখনও অজ্ঞাত। তবে দেখা গেছে যে, পার্টনগুলির সঙ্গে অনুমানসিদ্ধ কোয়ার্ক (Quark) কণার সাদৃশ্য কল্পনা করলে, অস্থিতিস্থাপক ইলেকট্রন বিক্ষেপণ তত্ত্বগতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

অনুমানসিদ্ধ কোয়ার্ক কণার তড়িতাধান হলো $+\frac{2}{3}$ বা $-\frac{1}{3}$ (অ্যাণ্টিকোয়ার্কের ক্ষেত্রে $-\frac{2}{3}$ বা $+\frac{1}{3}$) এবং একটি কোয়ার্কের ভর প্রোটনের ভরের প্রায় ত্রিশ গুণ। এই কোয়ার্ক কণার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী গেলম্যান ও জর্জ জুইগ। অবশ্য তাঁরা আলাদাভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাঁদের মতে একটি কোয়ার্ক ও একটি অ্যাণ্টিকোয়ার্ক দিয়ে একটি মেসন কণা তৈরি করা সম্ভব। তা ছাড়া নিউক্লীয় কণা বা ঐ ধরণের কোন কণা, যেমন—বেরিয়ন প্রভৃতি, তিনটি কোয়ার্ক কণা দিয়ে গঠিত। অতএব নিউক্লীয় কণা—একটি প্রোটন ও তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। কিন্তু আবার তত্ত্বগতভাবে দেখানো হয়েছে যে, একটি কোয়ার্কের ভর একটি প্রোটনের ভরের চেয়ে প্রায় ত্রিশ গুণ বেশী। তাহলে তিনটি কোয়ার্ক কি করে একটি প্রোটন গঠন করে? উত্তরে বলা যায়, তিনটি কোয়ার্ক যখন একত্রে মিলিত হয়, তখন প্রচুর পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়, ফলে কোয়ার্কগুলির ভর কমে যায় (আইনস্টাইনের শক্তি-ভর-তুল্যতা সূত্রানুযায়ী $E=mc^2$; E-শক্তিমাত্রা, m-ভর, c-আলোর বেগ)। এভাবে তিনটি কোয়ার্ক একত্রে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি প্রোটনের ভরের সমান হয়ে দাঁড়ায়। 2নং চিত্রে উপরের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রোটন যে তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত, তাদের বন্ধনী-শক্তি আজ পর্যন্ত জানা সমস্ত শক্তির চেয়ে
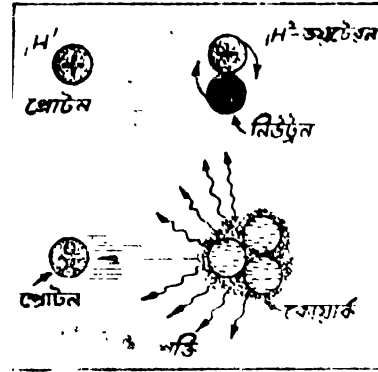
2নং চিত্র

বেশী। তাই প্রোটন ভেঙে বেশী ভরের কোয়ার্ক পেতে গেলে প্রচণ্ড শক্তির দরকার (কারণ এই শক্তির কিছু অংশ ভরে রূপান্তরিত হবে)। এই পরিমাণ শক্তি এখনও বিজ্ঞানীদের হাতে আসে নি। তাই কোয়ার্ক-ধারণার বাস্তবতা এখনও প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া আজ পর্যন্ত এরূপ ভগ্নাংশীয় তড়িতাধানযুক্ত কোন বাস্তব কণার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তা সত্ত্বেও, অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণে পাওয়া নিউক্লীয় কণার ধর্মগুলির মোটামুটি ব্যাখ্যা তত্ত্বগত দিক দিয়ে পেতে গেলে নিউক্লীয় কণাগুলিকে (প্রোটন বা নিউট্রন) অনুমানসিদ্ধ কোয়ার্ক কণার মত পার্টন কণা দিয়ে গঠিত বলে মনে করতে হবে।

স্ট্যানফোর্ডে পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রোটন ও নিউট্রন থেকে অস্থিতিস্থাপক বিক্ষেপণ সম্পূর্ণ আলাদা। ইলেকট্রন বিক্ষেপণ পরীক্ষায় ভর-বেগ পরিবর্তনের বর্গ ও বিক্ষেপণের আগে ও পরে ইলেকট্রনের শক্তিমাত্রার প্রভেদের অনুপাতকে পরিবর্তক হিসাবে ধরা হয়। বিক্ষেপণ কোণের

বিস্তৃত পরিসরে ইলেকট্রনের প্রাথমিক ও শেষ পর্যায়ের শক্তির নানা পর্যবেক্ষণকে উপরিউক্ত পরিবর্তকের অপেক্ষক হিসাবে গ্রহণ করে লেখ-চিত্র অঙ্কন করলে তা একটি রেখা-চিত্র দান করে (প্রোটনের জন্যে একটি এবং নিউট্রনের জন্যে একটি)। স্থিতিবিস্থায় (Kinematics) এরূপ রেখাচিত্র সাধারণতঃ কোন বস্তুর মধ্যস্থিত বিন্দুবৎ সব কণা থেকে বিক্ষেপণের ফলে পাওয়া যায়। তাই এক্ষেত্রে ধারণা করা যেতে পারে যে, খুব বেশী শক্তির ইলেকট্রন কোন নিউক্লীয় কণার (প্রোটন বা নিউট্রন) মধ্যস্থিত বিন্দুবৎ সব সত্ত্বা থেকে বিক্ষেপিত হচ্ছে। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে পার্টন। এই প্রসঙ্গে নিউট্রন ও প্রোটন কণার আলাদা ধরণের বিক্ষেপণের কারণ সম্বন্ধেও গুণগতভাবে বলা হয়েছে। প্রোটন বা নিউট্রন যে তিনটি পার্টনের (কোয়ার্ক-সদৃশ) দ্বারা গঠিত, তাদের আলাদা আলাদা বিন্যাসের দরুণ নিউট্রন ও প্রোটন কণার ক্ষেত্রে আলাদা ধরণের বিক্ষেপণ পরিলক্ষিত হয়। নিউক্লীয় কণার মধ্যে পার্টনগুলি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, কোন একটি পার্টনের নিজস্ব ধর্মের সঠিক সন্ধান পাওয়া খুবই দুরূহ।

যখন ধারণা-করা কোন মডেল দিয়ে পরীক্ষা-লব্ধ ফলগুলির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়, তখনই সেই মডেলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাধারণতঃ যদি কোন মডেলের বা তত্ত্বের আঙ্কিক জটিলতাকে অতিক্রম করা না যায় কিংবা তত্ত্বগত ফলাফলের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সামঞ্জস্য না পাওয়া যায়, তখনই সেই মডেল বা তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়। আবার নতুন মডেল খাড়া করতে হয়। ইলেকট্রন বিক্ষেপণ পরীক্ষার ফলাফলগুলি গুণগত-ভাবে পার্টন মডেল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, কিন্তু পরিমাণাত্মক দিক দিয়ে এই মডেল ততটা গ্রহণ-যোগ্য নয়। তাই এর ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত আজকের পৃথিবীতে নিউক্লীয় শক্তিকে নানাভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই শক্তি-সৃষ্টির প্রকৃত কারণ বিজ্ঞানীদের কাছে সুস্পষ্ট নয়। নিউক্লীয় কণার (প্রোটন ও নিউট্রন) প্রকৃত কাঠামো জানা গেলে হয়তো এর প্রকৃত উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ছোট আবিষ্কারের মূল্যও কম নয়

বিশেষ জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একটি বিশেষ থলি তৈরি করেন আমেরিকার চিকিৎসক ও অধ্যাপক ডক্টর ফোলকার্ট. ও. বেলজার। সানফ্র্যান্সিসকোতে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তির বৃক্কটি কেটে বের করে নিয়ে থলিটির মধ্যে তিনি সযত্নে রাখলেন। এর আগেই থলিটিতে 41 থেকে 50 ডিগ্রি ফারেনহাইটের তাপমাত্রা সর্বক্ষণ বজায় রাখবার জন্যে একটি ব্যাটারি-চালিত যন্ত্র বসানো হয়েছিল। তাপ বজায় রাখা ছাড়াও অক্সিজেন ভরপুর রক্তরস বৃক্কটির মধ্যে চলাচলের ব্যবস্থাও যন্ত্রটিতে ছিল। থলিটি দেখতে সাধারণ মালবাহী থলির মতই, ওজন মাত্র 12 কিলোগ্রাম, কিন্তু একটি বৃক্ককে সজীব ও তাজা রাখতে পারে 72 ঘণ্টা পর্যন্ত।

ডক্টর বেলজার 1971 সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন এই ধরণের একটি থলির মধ্যে বৃক্কটি নিয়ে বিমানে চড়ে সানফ্র্যান্সিসকো থেকে হল্যাণ্ডের লাইডেনে পৌঁছন। ডক্টর

বেলজারের সযত্নে নিয়ে আসা বৃক্কটি একটি 41 বছর বয়স্ক ওলন্দাজ রোগীর দেহে বসিয়ে দেওয়া হলো। বৃক্কটি সম্পূর্ণ তাজা ছিল।

একটি প্রাণরক্ষার পবিত্রতম কাজে সহায় হলেও এইসব ঘটনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে খুবই সাধারণ। এইসব ঘটনার কোন চমক নেই। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরাট সব আবিষ্কারের মাঝে মাঝে এই ধরণের ঘটনা অনেক ঘটে যায়। এই সব ঘটনা বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে হয়তো বোঝাই সম্ভব নয়। আবার এই সব ঘটনার ক্ষেত্রও এত ব্যাপক নয় যে, তা বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অথচ, এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনা বহু লোকের জীবনে আশীর্বাদ বহন করে আনে।

72 ঘণ্টার বিমানযাত্রায় বৃক্ক তাজা থাকে। পৃথিবীর যে সব হাসপাতালে বৃক্ক অপসারণ ও সংস্থাপনের ব্যবস্থা আছে, সেই সব হাসপাতালেই এই বৃক্ক প্রেরণ করা চলতে পারে। সানফ্র্যান্সিসকোর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্যবিদ্যার অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক ডক্টর ফোলকার্ট. ও. বেলজার এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেই সেদিন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

অন্য দিকে শ্রবণশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্যে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা কানের রোগজীর্ণ অংশের পরিবর্তন সাধন সম্ভব করেছেন। ওকলাহোমার সেন্ট ফ্র্যান্সিস হাসপাতালের ডক্টর রজার ই ওয়ারস বলেছেন, গত তিন বছরে তিনি মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে নেওয়া 164টি কর্ণপটহ এমন সব রোগীর কানে সংস্থাপন করেছেন, যারা আদৌ শুনতে পায় না বা যাদের শ্রবণশক্তি খুব দুর্বল।

থাইরয়েড গ্রন্থিতে খুব কম হলেও কখনও কখনও এক ধরণের ক্যান্সার রোগ হয়। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী ক্যালসিটনিন নামক হর্মোন নিঃসৃত করে। এই রোগটির নাম মেডুলারি কার্সিনোমা। ম্যাসাচুসেট্‌সের টাফ্‌ট্‌স স্কুল অব মেডিসিন (মেডফোর্ড)-এর ডক্টর কেনেথ মেলভিন এবং ডক্টর হ্যারী মিলার, আর হারভার্ড স্কুল অব মেডিসিন (কেম্ব্রিজ)-এর ডক্টর আমেন তাসজিয়ান, জুনিয়র, রোগীর রক্তে ক্যালসিটনিন হর্মোনের পরিমাপ করবার এক যন্ত্র বের করে এই ধরনের ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করেছেন।

গনোরিয়া রোগ নির্ণয়ে আগে লেবোরেটরির সাহায্য অত্যাবশ্যক ছিল। এখন ফিলাডেলফিয়ার একটি ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠান স্মিথ ক্লিনে অ্যাণ্ড ফ্রেঞ্চ লেবোরেটরিজ এক নতুন পরীক্ষার ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে। নতুন ব্যবস্থায় সরাসরি রোগীর দেহে পরীক্ষা চালানো যায়, লেবোরেটরির প্রত্যাশায় দেরী করতে হয় না।

অ্যালাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার প্রসবযন্ত্রণা-কাতর মেয়েদের কোন সঙ্কট দেখা দিলেই সতর্ক-সঙ্কেত দেয়। ম্যাডিসনে উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীদের এক্স-রে চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ করা হয় কম্পিউটারের সাহায্যে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনার চমক নেই বটে, কিন্তু এগুলি সামগ্রিকভাবে রোগার্ত মানুষের জীবনে আনে কল্যাণ ও নিরাময়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1972

রজত জয়ন্তী বর্ষ : একাদশ সংখ্যা

রোদ ও আলো পরিমাপ করবার অভিনব পদ্ধতি

বাড়ী তৈরির নক্সা থেকে বাড়ীটি কতটা আলো, রোদ, ছায়া ও উত্তাপ পাবে, তা সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করবার জন্যে ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের সহায়তায় লণ্ডনের এক বিজ্ঞানী জর্জ উডফোর্ড (ছবিতে দেখা যাচ্ছে) 'Sunscan' নামে এক অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রটি স্থপতি ও গৃহনির্মাণকারী কোম্পানীসমূহের খুব কাজে লাগবে। কারণ এই যন্ত্রের সাহায্যে বাড়ী তৈরির স্থান পরিদর্শন না করেই বাড়ীতে ছায়া, আলো, রোদ কতটা পাওয়া যাবে—তা হিসাব করা যাবে।

যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি—পর্যবেক্ষকের ইচ্ছানুসারে যে কোন ঋতুতে, দিনের যে কোন সময়ে, যে কোন দ্রাঘিমায় অবস্থিত সূর্যের আলোর মত একটা কৃত্রিম আলো নক্সার উপর প্রক্ষেপ করা হয়। এর দ্বারা বাড়ীটি কতটা আলো, রোদ, ছায়া ও উত্তাপ পাবে—তা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এর জন্যে বাড়ীটির আর কোন নমুনার প্রয়োজন হবে না।

ডারুইনের ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রা

ডারুইনের নাম বিবর্তন বা অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কিত 'Origin of Species' ডারুইনের যুগান্তকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনার পিছনে আছে তাঁর দীর্ঘ পাঁচ বছরের সমুদ্র-ভ্রমণে আহৃত তত্ত্ব, প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতা। 1831 সালের 27শে জানুয়ারী থেকে 1836 সালের 2রা অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ বছর যাবৎ H. M. S. Beagle নামক জাহাজে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে ডারুইন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেন। এই সমুদ্রাভিযান ডারুইনের জীবনের মোড় তথা পৃথিবীর চিন্তাধারার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

লণ্ডনের ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয় জরীপের উদ্দেশ্যে সরকারী সমুদ্রাভিযানে যাত্রা করবেন—সঙ্গে একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীকে নিয়ে যেতে চান। কেম্ব্রিজের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ পিককের উপর এই বিজ্ঞানী নির্বাচনের ভার পড়ে। তিনি আবার হেনস্লো নামে আর একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীকে চিঠি লিখলেন। হেনস্লো ডারুইনের নাম প্রস্তাব করে পাঠালেন। ডারুইন প্রথম এই প্রস্তাব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। অবশ্য পরে আবার তিনি এই নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। আধ ডজনেরও বেশী চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় এই বীগল জাহাজের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী নিয়োগের ব্যাপারে, যেগুলি এখন ঐতিহাসিক দলিল হয়ে আছে।

ডারুইন তখন 22 বছরের যুবক, সবেমাত্র বি. এ. পাশ করে ধর্মযাজকের পেশার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন (ডারুইনের পিতা প্রথমে তাঁকে ডাক্তারী পড়বার জন্যে এডিনবরায় পাঠান, কিন্তু ডাক্তারীবিদ্যায় তাঁর মন নেই দেখে ডারুইনকে ধর্মযাজক হবার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এডিনবরা থেকে কেম্ব্রিজে নিয়ে আসেন)। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বি. এ. পাশও করলেন বটে, কিন্তু ধর্মযাজক হবার প্রতি ঝোঁক না দিয়ে কীট-পতঙ্গ, গাছ-গাছড়া, ভূতত্ত্ব ইত্যাদির দিকেই ঝুঁকে পড়লেন এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী হেনস্লো, ভূতত্ত্ববিদ সেজ্‌উইক প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা সুরু করলেন। আর তাঁদের সঙ্গে এখানে-ওখানে গিয়ে বিচিত্র দ্রব্যাদি সংগ্রহে মেতে উঠলেন।

এই অবস্থায় 1831 সালের 24শে অগাষ্ট হেনস্লোর কাছ থেকে ডারুইন একটি চিঠি পান, যা থেকে ডারুইন জানতে পারেন ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ের নেতৃত্বাধীনে বীগল জাহাজের সমুদ্রাভিযানে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে তার নাম সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছে। হেনস্লো আরো লিখেছেন যে, ডারুইন যেন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। হেনস্লো ইতিপূর্বে জর্জ পিককের কাছ থেকে এক চিঠি পান এবং তাথেকেই এই সমুদ্রাভিযান সম্পর্কে জানতে পারেন। এই সমুদ্রযাত্রায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানী নির্বাচিত করবার দায়িত্ব পিককের উপর

ন্যস্ত হয়েছে। লিটনার্ড জেনিন্স নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী আছে, তাঁকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে হেনস্লোর পরিচিত কোন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর নাম তিনি যেন পিককের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন। হেনস্লো ডারুইনের নাম সুপারিশ করে পাঠালেন। হেনস্লোর চিঠি পেয়ে পিকক ডারুইনকে এই মর্মে জানিয়ে দিলেন যে, ডারুইন যেন তার নিয়ম-মাফিক সম্মতিসূচক পত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন।

ডারুইন প্রথমে এই প্রস্তাব তাঁর পিতার অমতের জন্যে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি এই সমুদ্রযাত্রা সমর্থন করেন, তাহলে অবশ্য ডারুইনের পিতা তাকে যেতে দিতে রাজী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে জসিয়া ওয়েজ উড নামে ডারুইনের এক সুবিবেচক আত্মীয় এই সমুদ্রযাত্রাকে মনেপ্রাণে সমর্থন করেন। ওয়েজ উড উপযাচক হয়ে ডারুইনের যাবার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন, ফলে ডারুইনের পিতা ডারুইনকে সমুদ্রযাত্রায় অনুমতি দেন।

কিন্তু এবার যাবার ব্যাপারে বাধা এলো স্বয়ং ফিজ্‌রয়ের (জাহাজের ক্যাপ্টেন) কাছ থেকে। এর একটি হলো রাজনৈতিক আর অন্যটি হলো করোটির বিচারবিষয়ক (Phrenological) আপত্তি। ফিজ্‌রয় জানতে পারলেন যে, ডারুইন হচ্ছেন উদারনৈতিক দলের (Liberal) আদর্শে বিশ্বাসী এবং তিনি নিজে সংরক্ষণশীল (Tory) দলের; সুতরাং দুই বিরুদ্ধ মতবাদীর একসঙ্গে কাটানো সম্ভব নয়। দ্বিতীয় কারণটি হলো—নাসিকার গঠন দেখে সেই ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করবার বিদ্যার (Phrenology) চর্চা ফিজ্‌রয় করতেন এবং ডারুইনের নাসিকার গঠন বিশ্লেষণ করে ফিজ্‌রয়ের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, এহেন নাসিকার অধিকারী কখন দৃঢ়চেতা হতে পারে না এবং সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারে না। সুতরাং সমুদ্রাভিযানে ডারুইনকে মনোয়ন করবার ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় উড নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ডারুইনের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—তিনি আবার ফিজ্‌রয়ের বন্ধু। উডের সুপারিশেই শেষ পর্যন্ত ডারুইন বীগলের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে মনোনীত হন, তবে চাকুরিটি ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

সব কিছু ঠিক হওয়া সত্ত্বেও বীগলের সমুদ্রযাত্রা কিছুতেই কার্যকর হচ্ছিল না। এবার বাদ সাধলো প্রকৃতি স্বয়ং। দু-দু-বার যাত্রা করেও (10ই এবং 21শে ডিসেম্বর) দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্যে সমুদ্রাভিযান স্থগিত রাখতে হলো।

অবশেষে 1831 সালের 27শে ডিসেম্বর বীগল জাহাজে করে ডারুইনের ঐতিহাসিক সমুদ্রাভিযান সুরু হলো। এই সমুদ্রযাত্রায় গিয়েছিলেন বলেই ডারুইন তাঁর যুগান্তকারী অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। অথচ ঘটনাপরম্পরায় মনে হয়েছিল যে, সমুদ্রযাত্রায় ডারুইনের না যাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশী। তাছাড়া তিনি ছিলেন তিন নম্বর প্রার্থী। প্রথম প্রার্থী ছিলেন

লিওনার্ড জেনিন্‌স—যিনি যাবার জন্যে তৈরি হয়েও শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করেন। দু-নম্বর প্রার্থী ছিলেন স্বয়ং হেনস্লো, শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন না।

এই সমুদ্রাভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের নিকটবর্তী ভূভাগ এবং দ্বীপপুঞ্জগুলির জরিপ করা। তাছাড়া ক্যাপ্টেন কিং-এর নেতৃত্বে 1826 থেকে 1830 সাল পর্যন্ত যে সমুদ্রাভিযান হয়েছিল, তাতে প্যাটাগোনিয়া এবং টিয়েরা ডেল ফুয়েগোর জরিপের কাজ অসমাপ্ত ছিল; সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করাও এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেই অভিযানে ক্যাপ্টেন ফিজ্‌রয়ও অন্যতম সদস্য ছিলেন। ঐ সময় তিনি টিয়েরা ডেল ফুয়েগো থেকে তিনজন আদিম অধিবাসীকে (জেমি বাটন, ফুয়েগিয়া বাস্কেট এবং ইয়র্ক মিনষ্টার) সুসভ্য করবার উদ্দেশ্যে লণ্ডনে নিয়ে আসেন। এই তিন জনকে লণ্ডন থেকে তাদের স্বদেশে নিয়ে যাওয়াও এই অভিযানের একটি উদ্দেশ্য ছিল।

বিগল জাহাজটির ওজন ছিল 242 টন। এই জাহাজ করেই ফিজ্‌রয় এর আগে পাঁচ বছরের এক সমুদ্রাভিযান করে এসেছেন। প্রয়োজনীয় মেরামতের পর ঐটিকেই আবার নিয়ে যাওয়া ঠিক করলেন তিনি। দ্বিতীয় বার সমুদ্রাভিযানের জন্যে বীগলকে সর্বতোভাবে উপযোগী করে তোলা হলো। জাহাজের পাল, মাস্তুল, খুঁটি, নৌকা, ডিঙ্গি প্রভৃতি সব কিছুই উৎকৃষ্ট ধরণের—গোটা জাহাজটি মূল্যবান মেহগিনি কাঠের তৈরি এবং এতে 24টি উচ্চমানের সময়-নিরূপক ঘটিকাযন্ত্র (Chronometer) নেওয়া হয়েছিল। এই সমুদ্রাভিযানে সর্বমোট 60 জন নাবিক অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ বছরের এই সমুদ্রাভিযানে ডারুইন পোর্টো প্রায়া, রিও-ডি-জেনেরিও, বাহিয়াব্লাঙ্কা, বুয়েনস আয়ার্স, টিয়েরা ডেল ফুয়েগো, চিলি, পেরু, গ্যালাপেগো, অষ্ট্রেলিয়া, তাহিতী, কীলিং দ্বীপ, মরিসাস ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন; তন্মধ্যে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো, গ্যালাপেগো এবং কীলিং দ্বীপের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সম্পর্কে তিনি Voyage of the Beagle নামক একটি প্রামাণ্য পুস্তকও লিখে গেছেন।

ফুয়েগোর অধিবাসীরা এক অসভ্য বর্বর জাতি। এরা উলঙ্গ থাকে এবং এদের স্থায়ী ঘর-বাড়ী নেই, গাছের ডালপালা দিয়ে একটা অস্থায়ী আস্তানা তৈরি করে। এই আদিম অধিবাসীদের দেখে ডারুইনের মনে প্রশ্ন জাগে যে, মানুষের পূর্বপুরুষ কি এদের মতই ছিল? পূর্ববর্তী অভিযানের সময় জেমি বাটন, ফুয়েগিয়া বাস্কেট, ইয়র্ক মিনষ্টার নামে ফুয়েগোর যে তিন জন আদিম অধিবাসীকে লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুসভ্য করে তোলবার জন্যে—দীর্ঘ দিন পর এই জাহাজে করে সেই তিন জনকে তাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আনা হয়। সেই তিন জন আদিম অধিবাসীর কি অবস্থা হয়, তা দেখবার জন্যে সকলেই উৎসুক। এর একটা নৃতাত্ত্বিক দিকও ছিল। লণ্ডনে এরা মোটামুটি সভ্য হয়ে উঠেছে—পুরনো পরিবেশে এরা মানিয়ে চলতে পারবে কিনা তাও দেখবার বিষয় ছিল। জেমির মা তাকে দেখে চিনতে

পারলো বটে, তবে কোন আবেগ বা দরদ ছিল না। এসবের ধারও ওরা ধারে না, বেঁচে থাকবার তাগিদটাই ওদের বড়। এদের জন্যে ঘরবাড়ী তৈরি করে দেওয়া হলো, কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই সবকিছুই লোপাট হয়ে গেল এবং ফুয়েগোর অধিবাসী এই কয়েক জন যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

গ্যালাপেগো দ্বীপপুঞ্জে ডারুইন প্রজাতির উৎপত্তির একটি গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেন, যা 'Origin of Species' পুস্তকে তিনি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই দ্বীপপুঞ্জে তিনি একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন যে, একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দ্বীপের প্রাণীগুলি বিভিন্ন ধরণের। তাঁর মতে, বিভিন্ন অবস্থা বা বিচ্ছিন্নতা (Isolation) নূতন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কীলিং দ্বীপের অভিযানে ডারুইন প্রবাল দ্বীপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন এবং কেমন করে তা তৈরি হয়, তাও বিশ্লেষণ করেছেন।

সামুদ্রিক পীড়া (Sea-sickness) সম্পর্কে ডারুইনের খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কারণ তিনি এই পীড়ায় ভয়ঙ্করভাবে ভুগেছেন। তাঁর পরবর্তী জীবনে অবিরত অসুস্থতা এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের মূলে ছিল তাঁর এই সামুদ্রিক পীড়ার কুফল।

সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সমুদ্রে কাটিয়ে 1836 সনের 2রা অক্টোবর বীগল জাহাজ লণ্ডনের সমুদ্রোপকূলে নোঙর করে। এই পাঁচ বছর ডারুইন বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং প্রজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রচুর মালমশলা সংগ্রহ করেন, যার উপর তিনি তাঁর অভিব্যক্তি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বীগলের অভিযান যেমন অভিব্যক্তি মতবাদের প্রস্তুতি পর্ব, তেমনি বিজ্ঞানী হিসাবে ডারুইনের প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও প্রস্তুতি পর্ব।

রমেন দেবনাথ*

* প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, টি. ডি. বি. কলেজ, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

পারদর্শিতার পরীক্ষা

পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হলো। যতগুলি প্রশ্নের উত্তর তোমার সঠিক হবে, সেই অনুযায়ী পদার্থবিদ্যায় তোমার পারদর্শিতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

1. এমন কোন উপায় বলতে পারো, যাতে বরফ ব্যবহার করে আগুন জ্বালানো যায়?

2. কোন ডিম সিদ্ধ হয়েছে কিনা, সেটাকে না ফাটিয়ে কি ভাবে তা বোঝা যেতে পারে?

3. আকাশ দিয়ে কোন বিমান উড়ে যাওয়ার সময় তাই থেকে একটি ভারী বস্তু ফেলে দিলে সেটা কি উল্লম্বভাবে (Vertically) নীচে নেমে আসবে?

4. একটি আধুলিকে চোখের সামনে রেখে তাই দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদকে ঢেকে দিতে গেলে চোখ থেকে আধুলিটির সর্বাধিক দূরত্ব কত হতে পারে?

[আধুলির ব্যাস = 2·4 সে.মি.; চাঁদের দৃশ্য কোণ (Angle of vision) = $\frac{1}{2}°$]

5. কোন্‌টির গতি দ্রুততর: একটা রাইফেলের বুলেট, নাকি রাইফেল ছোঁড়বার শব্দ?

(উত্তরের জন্যে 699নং পৃষ্ঠা দেখ)

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত ও জয়ন্ত বসু*

* সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1.: বিপরীত বস্তু এবং বিপরীত ব্রহ্মাণ্ড কি?

তন্ময় চক্রবর্তী, কলিকাতা-29

প্রশ্ন 2.: 'এরালডাইট' জাতীয় আঠায় কি থাকে?

তুহিনা ঘোষ, টুটুল ঘোষ, কলিকাতা-3

উত্তর 1.: আমরা জানি, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু সাধারণতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাদের দ্বারা গঠিত। প্রোটন ধনাত্মক তড়িতাধানবিশিষ্ট, ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িতাধানবিশিষ্ট এবং নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। এই তিন কণার

প্রত্যেকেরই একটি করে প্রতি-কণা বা বিপরীত কণা আছে। ইলেকট্রনের বিপরীত কণার নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। বিজ্ঞানী অ্যাণ্ডারসন পরীক্ষার সাহায্যে এই বিপরীত কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। পজিট্রন ইলেকট্রনের সমান মানের বিপরীত আধানবিশিষ্ট। এ ছাড়া পজিট্রনের অন্যান্য ধর্ম ইলেকট্রনেরই মত। প্রোটনের বিপরীত কণা প্রোটনের সমান মানের বিপরীত আধানযুক্ত অর্থাৎ ঋণাত্মক আধানযুক্ত। একে বলা হয় প্রতি-প্রোটন বা বিপরীত প্রোটন। প্রতি-প্রোটনের অন্যান্য ধর্ম প্রোটনেরই মত। একইভাবে নিউট্রনের বিপরীত কণাকে প্রতি-নিউট্রন বলা হয়। নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হওয়ায় প্রতি-নিউট্রনের ধর্ম একটু জটিল।

এই সব প্রতি-কণা বা বিপরীত কণা দিয়ে তৈরি কণাকে বলা হয় প্রতি-পরমাণু এবং প্রতি-পরমাণু দিয়ে তৈরি বস্তুকে বলা হয় প্রতি-বস্তু। প্রতি-পরমাণুর কেন্দ্রীনে থাকে প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রন এবং এদের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় পজিট্রন কণিকাসমূহ।

বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র প্রতি বস্তুর কল্পনা করেছেন। এদের অস্তিত্বের সঠিক পরীক্ষা-লব্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। তবে তত্ত্বগতভাবে এদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

বিভিন্ন বস্তু দিয়ে তৈরি সব কিছু নিয়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হয়েছে। তেমনি প্রতি-বস্তু দিয়ে তৈরি যে জগতের কল্পনা আমরা করতে পারি, তাকে বলবো বিপরীত ব্রহ্মাণ্ড বা প্রতি-ব্রহ্মাণ্ড।

উত্তর 2. : এরালডাইট জাতীয় পদার্থের রাসায়নিক নাম অ্যাপোক্সি রেজিন। কয়লা, তেল প্রভৃতি পদার্থের বিভিন্ন বিশ্লেষণে পাওয়া মাধ্যমিক রাসায়নিক পদার্থ থেকেই এই অ্যাপোক্সি রেজিন তৈরি হয়। মাধ্যমিক পদার্থ—যাদের বিক্রিয়ায় অ্যাপোক্সি রেজিন তৈরি হয়, তাদের রাসায়নিক নাম অ্যাপক্লোরোহাইড্রিন এবং বিস্‌ফেনল-A। অ্যাপোক্সি রেজিন হচ্ছে তরল পদার্থ। এর সঙ্গে শক্তকারক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে আঠার কাজে লাগানো হয়। শক্তকারক পদার্থ তরল অ্যাপোক্সি রেজিনকে কয়েক ঘণ্টা পরে শক্ত পদার্থে পরিণত করে। বিভিন্ন বস্তুকে পরস্পরের মধ্যে জোড়া লাগাবার ক্ষেত্রে অ্যাপোক্সি রেজিন বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে, গৃহস্থালীর কাজে এর প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঠার বাক্সে দুটি টিউব থাকে। একটিতে থাকে অ্যাপোক্সি রেজিন ও অন্যটিতে শক্তকারক পদার্থ। সাধারণতঃ এই দুটি টিউব থেকে সমপরিমাণ পদার্থ নিয়ে শক্ত আঠা তৈরি করা হয়।

শ্যামসুন্দর দে*

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স ; বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9

উত্তর

(পারদর্শিতার পরীক্ষা)

1. পরিষ্কার জলের বরফ দিয়ে উত্তল লেন্স তৈরি করে সেই লেন্সকে আতশী কাচের (Burning glass) মত ব্যবহার করা যায়; ঐ লেন্সের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে আগুন জ্বালানো যেতে পারে।

2. ডিমটিকে কোন মসৃণ জায়গায় রেখে সেটিকে দু-পাশে দু-আঙুল দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে দিতে হবে—যদি সেটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে এবং সজোরে পাক খেতে থাকে, তবে বুঝতে হবে ডিমটি সিদ্ধ হয়েছে; ডিমটি কাঁচা থাকলে সেটা সামান্য ঘুরেই থেমে যাবে।

[ডিমটি কাঁচা থাকলে তার ভিতরের অংশ মোটামুটি তরল অবস্থায় থাকে। ডিমটাকে ঘুরিয়ে দিলে তার শক্ত খোলায় প্রথমতঃ গতি সঞ্চারিত হয় এবং ডিমটা ঘুরতে থাকে, কিন্তু তার সান্দ্র (Viscous) তরল অংশ স্থিতি-জাড্যের জন্যে ঐ গতিতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ডিমটা সামান্য ঘুরেই থেমে যায়। অপর পক্ষে, ডিম সিদ্ধ হলে তার ভিতরের অংশ জমে গিয়ে সম্পূর্ণ ডিমটা একটি কঠিন বস্তুর মত কাজ করে। সেজন্যে এ ক্ষেত্রে ডিমটির ঘূর্ণনে ভিতর থেকে কোন বাধা আসে না।]

3. না।

[বস্তুটি বিমান থেকে যখন ফেলা হলো, তখন গতি-জাড্যের ফলে বিমানের গতিবেগ বস্তুটিতে সঞ্চারিত হবে। ঐ গতিবেগ এবং অভিকর্ষজনিত ত্বরণের সম্মিলিত ফলে বস্তুটি পরাবৃত্তাকার পথে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসবে।]

4. 2 মিটার 76 সেন্টিমিটার।

[আধুলিটিকে যে দূরত্বে রাখলে তার দৃশ্য কোণ চাঁদের দৃশ্য কোণের সমান হবে, সেই দূরত্ব পর্যন্ত আধুলিটি চাঁদকে ঢেকে রাখবে। ঐ দূরত্ব r হলে এটা সহজেই দেখানো যায় যে, 2·4 সে.মি./r = $\frac{1}{2}\pi/180$ বা r ≈ 2 মি 76 সে.মি.]

5. রাইফেলের বুলেট।

[আধুনিক রাইফেলের বুলেটের গতি শব্দের গতির প্রায় তিন গুণ। বুলেটের গতি অবশ্য শেষের দিকে মন্থর হয়ে আসে, তবে তার গতিপথের অধিকাংশ অংশেই তার গতি হলো সেকেণ্ডে প্রায় 900 মিটার; বায়ুতে শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে মোটামুটি 340 মিটার। সুতরাং বুঝতে পারছো, তোমার দিকে তাক করা কোন রাইফেল যদি একবার ছোঁড়া হয় এবং সেই ছোঁড়বার শব্দ যদি তুমি অক্ষত দেহে শুনতে পাও, তাহলে ঐ রাইফেলের বুলেট খাওয়ার তোমার কোন ভয় নেই—সেই বুলেট আগেই তোমাকে পেরিয়ে চলে গেছে।]

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক দুঃখহরণ চক্রবর্তী

বিশিষ্ট রসায়নবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী তাঁর কলকাতার বাসভবনে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত 24 সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 70 বছর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন।

অধ্যাপক দুঃখহরণ চক্রবর্তী

1903 সালের 18ই জানুয়ারী কলকাতায় শ্রী চক্রবর্তীর জন্ম। তিনি বরাবরই কৃতী ছাত্র। 1920 সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। 1926 সালে তিনি বিশুদ্ধ রসায়নশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে এম. এস-সি ডিগ্রী এবং 1934 সালে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। 1949 সালে তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। 1934-50 সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগের লেক্‌চারার ছিলেন। তারপর চার বছর স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান কাউন্সিলের সচিব ছিলেন। 1954 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হন। 1961 সালে তিনি রসায়ন বিভাগের ঘোষ অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং 1969 সালে রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টির ডীন হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন।

ডক্টর চক্রবর্তী 1958 সালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান গবেষণা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স, সায়েন্স ফর চিলড্রেন ইত্যাদি বহু বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এক সময় পরিষদের সারস্বত সংঘের সভাপতি ছিলেন।

ডক্টর চক্রবর্তী বেঞ্জো পাইরোন-এর সংশ্লেষণ এবং ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদের সক্রিয় উপাদান সংক্রান্ত শতাধিক গবেষণা-পত্রের রচয়িতা এবং 'রঞ্জকদ্রব্য' নামে একটি পুস্তকও রচনা করেন।

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ও মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুরাগী অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু গত 15ই অক্টোবর কলকাতার একটি নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রায় দেড় বছরকাল তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 72 বছর।

1901 সালের 22শে জানুয়ারী নির্মলকুমারের জন্ম হয়। 1919 সালে অনার্সসহ বি. এস-সি পাস করবার পর 1922 সালে তিনি কিছুকালের জন্যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। 1925 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি

অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু

নৃতত্ত্বে এম. এস-সি পাস করেন। 1929 ও 1930 —এই দু-বছর তিনি এখনকার নৃতত্ত্ব বিভাগে গবেষক-ছাত্র ছিলেন। সেই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হয়। নির্মল কুমার বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর 1938 থেকে '42 সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী লেকচারার হিসাবে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার মাঝে মাঝে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করেছেন এবং এজন্যে কারাবরণও করেছেন। 1946 সালে নোয়াখালিতে যখন মহাত্মা গান্ধী দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা সফর করেন, অধ্যাপক বসু তখন তাঁর সচিবরূপে কাজ করেন।

পরবর্তী বছরগুলিতে অধ্যাপক বসু শিক্ষার নানা শাখায় কর্মরত ছিলেন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে নৃতত্ত্ব বিভাগের রীডাররূপে তিনি কিছুকাল কাজ করেন। 1959 থেকে 1964 সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নৃতত্ত্ব সমীক্ষার অধিকর্তা ছিলেন। 1966 সাল থেকে 1969 সাল পর্যন্ত তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের তপশীলী ও খণ্ডজাতিসমূহের কমিশনার ছিলেন। তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক অধ্যাপক এবং ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষার উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক বসু নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি, ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থা, ভারতীয় ভৌগোলিক সংস্থা, ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণা কেন্দ্র, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, কিশোর কল্যাণ পরিষদ প্রভৃতি বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি দেশের সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন।

লেখক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। বেশ কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর 'My days with Gandhiji' বইটি এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অসামান্য দলিল বলে স্বীকৃত। তিনি 'Man in India' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন।

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত গত 20শে অক্টোবর 84 বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন।

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

1889 সালের 23শে মার্চ হালিশহরে নলিনীরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। 1911 সালে কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী ডিগ্রী লাভ করবার পর 1914 সালে তিনি এম. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে জীবন সুরু করে পরবর্তী প্রায় 60 বছর তিনি কৃতী চিকিৎসক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি রোগী দেখেছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা নিয়ে, বিশেষ করে 'করোনারি থ্রম্বসিস' সম্পর্কে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ আছে।

কৃতী চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও ডাঃ সেনগুপ্ত কখনও বিদেশে যান নি এবং কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণ করেন নি। তিনি ভারতীয় চিকিৎসক অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখা ও রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি বক্তৃতা, নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি বক্তৃতা এবং নীলরতন সরকার শতবার্ষিকী বক্তৃতা তিনি প্রদান করেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অনুশীলন সমিতির সদস্য ছিলেন।

ডাঃ সেনগুপ্ত অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার সভাপতি ছিলেন। ভারত ও তার বাইরে এই সভার প্রায় চার শত শাখা রয়েছে। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষা, বিশেষ করে বিজ্ঞান-শিক্ষার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। লেখক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং একাধিক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

বিবিধ

1972 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

এই বছর (1972) শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে যৌথভাবে নিউ ইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর গেরাল্ড এডেলম্যান এবং ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর রোডনি পোর্টারকে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে তিন জন মার্কিন বিজ্ঞানী ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর লিও কুপার, পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জন শ্রিফার এবং ইলিনয়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জন বার্ডিন।

রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তিন জন মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথের ডক্টর ক্রিশ্চিয়ান আনফিন-সেন এবং রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর স্ট্যানফোর্ড মুর এবং ডক্টর উইলিয়াম ষ্টীন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, 1972

পরিষদ ভবন

29 সেপ্টেম্বর, 72
শুক্রবার 6টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই চতুর্বিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 32 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সহঃসভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

1. কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া গত 1971-72 সালের জন্য পরিষদের বিবিধ কাজ-কর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি প্রারম্ভে বলেন যে, গত জুলাই মাসে পরিষদের চতুর্বিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্য-বিবরণীতে আলোচ্য বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটিভাবে 1971-72 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। (উক্ত বিবরণী জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার অগাষ্ট '72 সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ, বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এবং হাতে-কলমে বিভাগ পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মধারা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে পরিষদে কাজকর্মের মানোন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তিনি সেই সকল উল্লেখ করেন।

2. হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়-বরাদ্দ

গত 1971-72 সালের পরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও উদ্বর্ত পত্র (ব্যালান্স সিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বর্ত পত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতির কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত বর্তমান 1972-73 সালের জন্য পরিষদের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ বা বাজেটপত্র সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়-বরাদ্দ পত্র উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

3. কার্যকরী সমিতি গঠন

1972-73 সালের জন্য পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও সাধারণ সদস্যের মনোনয়নপত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন এবং সভ্যগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী পরিষদের নূতন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে ও সাধারণ সদস্যরূপে নিম্নলিখিত সভ্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়।

কার্যকরী সমিতি

কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডলী

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সহঃসভাপতি—শ্রীঅজিতকুমার সাহা
শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত

সহঃ সভাপতি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামসুন্দর দে

সাধারণ সদস্য

1. শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
2. শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
3. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
4. শ্রীদেবাশীষ ঘোষ
5. শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
6. শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত
7. শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল
8. শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
9. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
10. শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল
11. শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
12. শ্রীসমীরকুমার ঘোষ
13. শ্রীসুনীলকুমার সিংহ
14. শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
15. শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

4. হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের 1972-73 সালের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিবার জন্য হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) রূপে পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর নাম প্রস্তাবিত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়।

5. অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

1. শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
2. শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
3. শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ
4. শ্রীমহাদেব দত্ত
5. শ্রীসুনীলকুমার সিংহ

6. সভাপতির ভাষণ

পরিষদের সহঃসভাপতি এবং অধিবেশনের সভাপতি ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারের মত গঠনমূলক কাজের সবিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন। দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের গুরুত্ব আজ আর কোন বিতর্কের অবকাশ রাখে না। সর্বশেষে তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সামগ্রিক কর্মপ্রচেষ্টায় সকল সভ্যের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

স্বাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র	স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ
সভাপতি	কর্মসচিব
চতুর্বিংশ বার্ষিক	বঙ্গীয়
সাধারণ অধিবেশন	বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর

স্বাঃ অনাদিনাথ দাঁ
স্বাঃ রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
স্বাঃ দিলীপকুমার ঘোষ
স্বাঃ মহাদেব দত্ত
স্বাঃ সুনীলকুমার সিংহ

প্রধান সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।
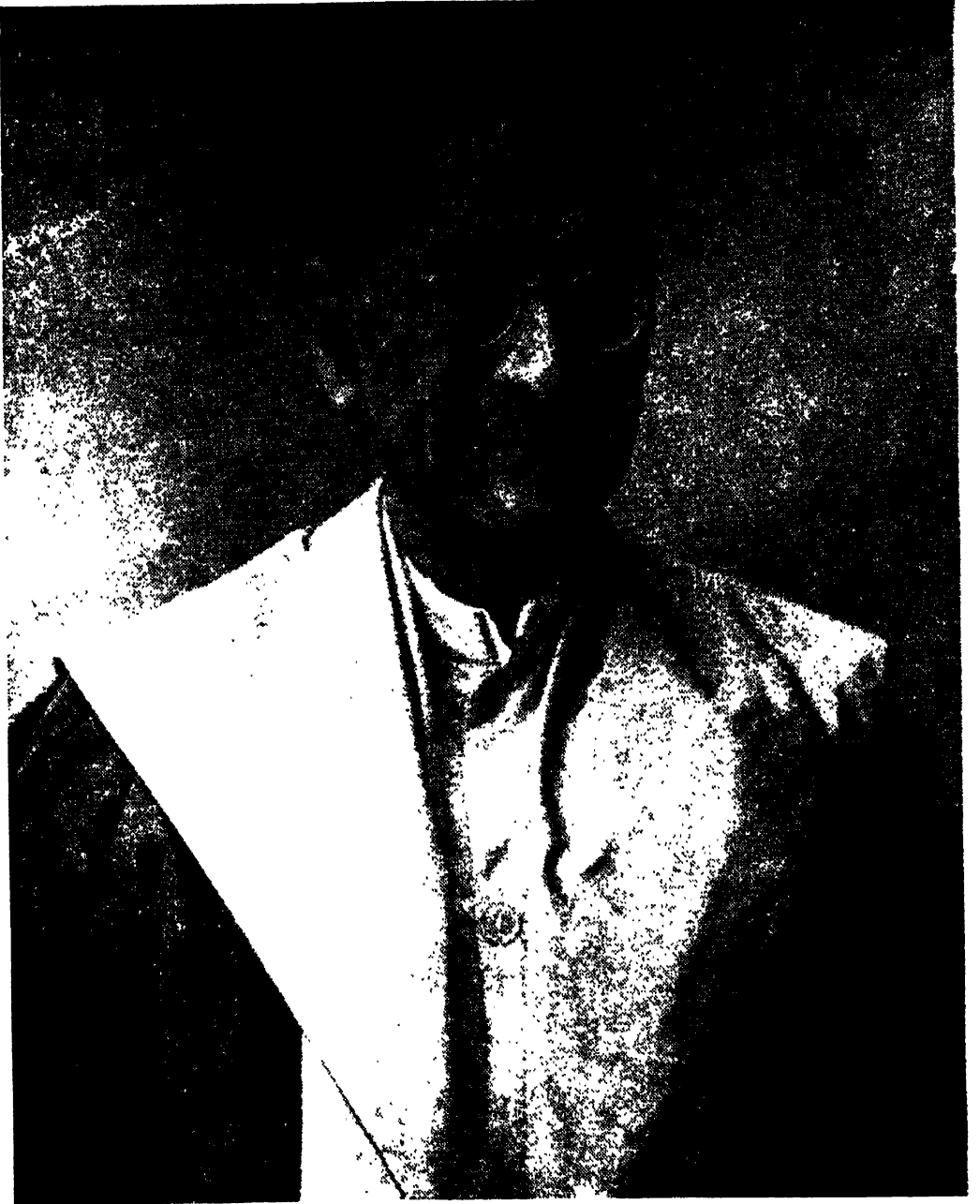
অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

জন্ম : 29শে জুন, 1893 মৃত্যু : 28শে জুন, 1972

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি-সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রজত জয়ন্তী বর্ষ | ডিসেম্বর, 1972 | দ্বাদশ সংখ্যা

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র স্মরণে

বিশ্ববিশ্রুত পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গত 28শে জুন পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে ভারতে বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কোন দিনই পূর্ণ হইবার নহে। অধ্যাপক মহলানবিশ ছিলেন ভারতে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। কলিকাতায় অবস্থিত ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। স্বাধীন ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আদি পর্বে তাঁহার অমূল্য সহযোগিতার কথা ভারতবাসী চিরদিন সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতির বহু ক্ষেত্রেই তাঁহার অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও প্রশান্তচন্দ্র একটি স্মরণীয় নাম। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বিশ্বভারতীর সহিত তাঁহার অন্তরের যোগ ছিল। সুদীর্ঘকাল বিশ্বভারতীর মূল সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব তিনি বহন করিয়া-ছিলেন। কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি সমাজ-তত্ত্ব—কত বিষয়েই না তাঁহার বিচিত্র রচনাসম্ভার আমাদের চিন্তা ও কল্পনা প্রস্ফুরিত করিয়াছে—আজ সেই উৎসমুখ চিরতরে রুদ্ধ।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহিত অধ্যাপক মহলানবিশের নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক ছিল। 1961 সালে অনুষ্ঠিত পরিষদের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে তাঁহার সভাপতির ভাষণ বিজ্ঞানানুরাগীদের যথেষ্ট প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্বের ও সাধনার কয়েকটি দিকে আলোকপাত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। আশা করি—ইহার দ্বারা প্রশান্তচন্দ্র সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইবে এবং তাঁহারা আরও বিস্তৃতভাবে পরলোকগত বিজ্ঞানীর জীবনী ও কর্মসাধনার বিষয় আলোচনায় অধিকতর উদ্যোগী হইবেন।

‘জ্ঞান ও বিজ্ঞানে’র বর্তমান সংখ্যাটি আমরা এই মহান বিজ্ঞানীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করিলাম।

[1963 সালে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং তাঁর পত্নী শ্রীনির্মলকুমারী (রাণী) মহলানবিশ আট মাস বিদেশে ছিলেন। সে সময়েই শ্রীনির্মলকুমারী মহলানবিশ এই চিঠি মহলানবিশ পরিবারের পুরোনো বন্ধু পরলোকগত (ডাঃ) জীবনময় রায়কে লেখেন। —স. ম.]

পুরোনো চিঠি

শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়

হোটেল সাচার, ভিয়েনা।
12 জুলাই 1963

জীবনবাবু,

37 বছর পরে এসেছি আবার ভিয়েনায়। প্রথম যখন আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 1926 সালে সেও এসেছিলাম এই জুলাই মাসেরই গোড়ার দিকে। সেবারে ট্রেনে এসেছিলাম সুইট্জারল্যাণ্ড থেকে 'থাল্ভিল্' বলে একটা স্টেশনে গাড়ী ধরে এবং একরাত ইন্সব্রুক্-এ কাটিয়ে; আর এবারে এসেছি জেনিভা থেকে প্লেনে উঠে জুরিক-এ প্লেন বদল করে সোজা ভিয়েনায়। সেবারেও রাত্রে এসে পৌঁছেছিলাম এবারেও তাই। শুধু সেবারে যা সময় লেগেছিল তাতে এখন য়ুরোপ থেকে কলকাতা ফিরে যেতেও কম সময় লাগে। পৃথিবীটা আছে সেই একই, শুধু জীবনের গতির তাল বদল হয়ে গেছে, তাইতে চেহারাও সম্পূর্ণ বদল।

সেবারে ছিলাম হোটেল ব্রিস্টলে, এবারে উঠেছি হোটেল সাচারে (Hotel Sacher)। এটা খুবই বনেদী হোটেল এবং দু শ' বছরের পুরোনো। ব্রিস্টলটা তখন হঠাৎ বড় মানুষদের মন খুশি করে দেবার কায়দায় তৈরি হয়েছিল, তাই সেখানে উঠে কবির মন খুশি হয় নি। তাঁর বইর প্রকাশকরা ঘর ঠিক করেছিল, তাই সবচেয়ে ঝকমকে জায়গাটাই ভাবলো কবির যোগ্য হবে। ঘরে ঢুকেই তো রবীন্দ্রনাথের চক্ষুস্থির; ওঁকে বললেন "ওহে প্রশান্ত, এখানে তো বিশেষ সুবিধে হবে না। প্রিন্স দ্বারকানাথের নাতী হলেও তাঁর টাকার শূন্য থলিটাই যে নাতীর জন্যে রেখে গেছেন। এই ঘরের দাম দিতে গিয়ে যে আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে"? কাল সেই পুরোনো স্মৃতির টানে ব্রিস্টলের ভিতরে ঢুকে একবার চোখ বুলিয়ে এলাম। কোথায় তার জাঁকজমক, কোথায়ই বা তার চোখ ধাঁধানো বসবার ঘর, খাবার ঘর? সেই সব ঘর কেটে ছোট করে দিয়ে রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান বসিয়ে দিয়েছে। সেই জমিদারীর বনেদীয়ানার নকল আর নেই। এখন সবাই যে ব্যবসাদার, কিসে বেশী টাকা আসে সেই দিকেই নজর।

হোটেল মার্গারেট
মার্গারেট আইল্যাণ্ড
বুডাপেস্ট। 16ই জুলাই 1963

সেদিন ভিয়েনা ছেড়ে এক ঘণ্টা পরেই বুডাপেস্টে এসে পড়েছি। 37 বছর আগে ট্রেনে এসেছিলাম। স্টেশনে লোকে লোকারণ্য কবিকে দেখবার জন্যে। লর্ড মেয়র নিজে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সদলে অভ্যর্থনা করবেন বলে। আর এবারে এয়ার পোর্টে হাঙ্গেরীয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের দুজন অ্যাকাডেমিসীয়ান ও একজন মহিলা দোভাষী একগোছা ফুল নিয়ে

দাঁড়িয়ে—আমরা দুজনে অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্টের নিমন্ত্রণে এসেছি ওঁদের বিজ্ঞান পরিষদের অতিথি হয়ে। এ আর এক রকমের পরিবেশ ও অভ্যর্থনা, ফুলটা আমার হাতেই এলো—"পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য"।

যাঁরা অভ্যর্থনা করলেন তাঁরা একজন ফিজিসিস্ট ও আর একজন ম্যাথামেটিশিয়ান। দুজনেই ইংরিজি বলেন এবং দুজনেই সায়ান্স কংগ্রেসের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন 1962 সালের জানুয়ারীতে এবং দুজনেই আমাদের ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের অতিথি-রূপে আমার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়েছিলেন। বিদেশে চেনা মুখের হাসি দেখে মন খুশি হল। প্লেনেই স্যাণ্ডুইচ খাইয়ে দিয়েছিল তাই আর অত বেলায় লাঞ্চ খেতে বসতে হোলো না।

সেবারে ছিলাম সেন্ট গেলার্ট হোটেলে ড্যানুব নদীর ধারে, এবারে উঠেছি নদীর ভিতরেই মার্গারেট আইল্যাণ্ডের বিরাট বাগানের মধ্যে একটা প্রাসাদতুল্য হোটেলে। দুখানা ঘর দিয়েছে একেবারে বাগানের উপরেই। একটা বসবার ও একটা শোবার। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলে মনে হয় কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এত নিরালা। বারান্দায় দাঁড়ালে শুধু পাখীর ডাক আর চোখ জুড়োনো বাগানখানা। যাকে বলে সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা।

বাড়ী এসেই ঘরে জিনিষপত্র রেখে নীচে বাগানের মধ্যে রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসা হোলো এই কদিনের প্রোগ্রাম ঠিক করতে—সঙ্গে অতি উপাদেয় ফল ও মিষ্টি দিয়ে আমাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা।

খানিক পরে আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী এসে জানালেন যে, রাষ্ট্রদূত সহরের বাইরে রয়েছেন, তাই তাঁরা জেনিভা ও ভিয়েনা থেকে নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও এয়ার পোর্টে গাড়ী পাঠাতে পারেন নি, কারণ গাড়ী অ্যাম্‌ব্যাসাডরের সঙ্গে বাইরে চলে গিয়েছে। বললাম "তাতে ক্ষতি হয় নি, আমাদের যাঁরা ডেকে এনেছেন তাঁরা দুখানা গাড়ী, লোক সবই পাঠিয়েছিলেন, কোনোই অসুবিধা হয় নি।" আপনাকে তো আগেও বলেছি যে এসব দেশে অতিথি হয়ে আসা মানে জামাই-আদরে অভ্যর্থনা। কাস্টাম্‌স্ থেকে আরম্ভ করে সকলেই সেলাম করে টুপি খুলে পথ ছেড়ে দেয়।

একটু পরেই আমাদের অ্যাকাডেমীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং সেইখানেই চায়ের নেমন্তন্ন। অ্যাকাডেমীর প্রাসাদতুল্য বাড়ীখানা একেবারে ড্যানুব নদীর ধারে—সত্যিকারের নদী যাকে বলে, আমাদের গঙ্গার মত চওড়া, য়ুরোপের অন্য দেশের নালার মত নদী নয়—। সেই কত কালের পুরোনো স্টাইলে সাজানো অনেক পুরোনো পুরোনো ছবি ও মূর্তি। যখন থেকে এই প্রতিষ্ঠান গড়েছিল তখনকার সময় থেকে সব স্বনামধন্য মেম্বারদের ছবি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে হলে (Hall) পৌঁছতেই দেখি একটা মূর্তি, নীচে "কোরাণী" লেখা। 1926 সালে ব্যারণ কোরাণী নামে সারা য়ুরোপের মধ্যে বিখ্যাত ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেছিলেন; তাইতে নামটা দেখে আমার কৌতূহল হোলো। প্রশ্ন করে জানলাম আমার ডাক্তারেরই বাবা। ইনিও একজন অতি বড় স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন এবং অ্যাকাডেমীর সভ্য।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর পার হয়ে শেষকালে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে সকলে থামলাম। দুয়োরে টোকা দিতেই সৌম্যমূর্তি, লম্বা ছিপছিপে, কাঁচা-পাকা চুল ও গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন। ইনিই প্রেসিডেন্ট রুসনিয়াক। অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে কাছে নিয়ে বসিয়ে নানা কথা সুরু হোলো। প্রথমেই প্রশ্ন আমরা আরামের ঘর পেয়েছি কিনা। তারপরে নানারকম প্রচুর ফল ও মিষ্টিতে

সামনের বড় টেবিলটা ভরে গেলো। ভদ্রলোক ইংরিজি বলতে পারেন তাই দোভাষীর সাহায্য নিয়ে কথা বলতে পারায় খুব আরাম লাগলো।

প্রেসিডেন্ট একদিন পরেই ছুটিতে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন বলে আমরা ক্লান্ত হয়ে আসা সত্ত্বেও সেই দিনই বিকেলে আমাদের ডেকেছেন বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আমার স্বামী তো একটুও সময় নষ্ট না করে প্রথম থেকেই কাজের কথা সুরু করলেন—বক্তব্য এই যে কেন হাঙ্গেরী এসেছেন, এ দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। বর্তমান জগতে সব দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই আইডিয়া ও কাজের আদান-প্রদান না হলে যে আর কোনো উপায় নেই, সেটা ওঁর আন্তরিক বিশ্বাস। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া (Under-developed) দেশগুলোর খুবই প্রয়োজন এগিয়ে যাওয়া (Developed) দেশগুলোর কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া। এইসব দেশগুলো তাড়াতাড়ি উন্নতি না করতে পারলে সারা পৃথিবীরই তাতে বিপদ আছে। সাধারণত সকলের মত হচ্ছে যে আগে লেখাপড়া শিখুক, আর্থিক উন্নতি হোক, তার পরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা আসবে। আমার মতে সবচেয়ে আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার আয়োজন করা, তার পরে অন্য কথা; কারণ টাকা থাকলে দু-বছরের মধ্যেই বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কিনে Consumer goods তৈরি করা যায়। Heavy industry দাঁড় করাতে দশ পনেরো বছর লাগে এবং ইঞ্জিনীয়ার, সায়ান্টিস্ট তৈরি করতে বিশ বছর কেটে যাবে এবং তিরিশ বছরের আগে রিসার্চের base তৈরি করা যাবে না। অতএব একটুও সময় নষ্ট না করে যেটুকু resource হাতে আছে, যে কয়টি লোক তৈরী আছে তাদের নিয়েই রিসার্চের গোড়াপত্তন করতে হবে। দেশে সায়েন্সের মন তৈরি না হলে পরিষ্কার লোকে প্রব্লেমগুলো দেখতে পাবে না এবং সেই জন্যেই চোখ বাঁধা বলদের মতো ঘুরে মরবে, কিন্তু কোনো দিকে এগোনো সম্ভব হবে না। ইণ্ডাস্ট্রীগুলো গড়বে কি করে যদি সেটা চালাবার লোক না থাকে? ইণ্ডাস্ট্রী না গড়লে আর্থিক উন্নতি কী করে হবে? বেকার সমস্যা কি করে ঘুচবে? বিজ্ঞান ছাড়া কৃষির উন্নতি কি করে হবে? ফসল ঐ জমিতেই কি করে বেশী ফলানো যায় তা লোকে জানবে কি করে?

লোকে বলে আগে কৃষির উন্নতি করো, তারপরে ইণ্ডাস্ট্রী হবে। কথাটা এত হাস্যকর,—ঠিক যেন বলা যে, আগে ডান পাটা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাও বাঁ পাটা তুলে রেখে—কিছুদিন পরে বাঁ পাটা মাটিতে ফেলে হেঁটো। ইণ্ডাস্ট্রী ছাড়া fertilizer তৈরি করবে কি করে? সেটা বানাবার যন্ত্রপাতি পাবে কোথায়? steel না হলে কি দিয়ে যন্ত্র বানাবে? যন্ত্র যারা বানাতে পারবে সেই মানুষগুলোকে কি করে গড়বে? হাতে-কলমে কাজ করেই তো তাদের শিখতে হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনি তো জানেনই যে এই প্রসঙ্গ একবার উঠলে ওঁর কথার উৎস কি রকম খুলে যায়।

প্রেসিডেন্ট খুব মন দিয়ে ওঁর কথা শুনলেন। তারপরে আপনার বন্ধু বললেন একটা কথা খুব নতুন, লোকে এখনও এটা ভাবছে না। আমার মতে Statistics একটা নিউ টেকনলজি; একথা হৃদয়ঙ্গম করবার সময় এসেছে। এটা শুধু ম্যাথামেটিক্সও নয়, কিম্বা ইকনমিক্সও নয়। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ যেমন প্রচুর ম্যাথামেটিক্স ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু তাকে তো ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টে ভরে দেওয়া যায় না; ডাক্তারী শিখতে হলে যেমন কেমিস্ট্রী, ফিজিক্স, বটানী সব কিছুই শিখতে হয়, কিন্তু তাই বলে তো তাকে এই সব subject-এর মধ্যে ঠেলে দেওয়া চলে না। ঠিক তেমনি স্ট্যাটিস্টিক্সও

একেবারে নতুন একটা টেকনলজি এটা মেনে নিতে হবে এবং বিজ্ঞানের সব শাখাতেই একে দিয়েই তার মূল্য যাচাই করতে হবে—এটা কিন্তু এখনও বেশী লোক স্বীকার করতে চাচ্ছে না। আমি Indian Statistical Institute-এ এইটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি। সেই জন্যে আমাদের ওখানে বিজ্ঞানের নানা শাখার কাজ সুরু হয়েছে। কোনো কোনো বিভাগে ইতিমধ্যেই খুব ভালো ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই কারণেই আমি দেশ-বিদেশের সব বিজ্ঞানীদের ডেকে আনি, যাতে ছেলেরা যারা রিসার্চ করছে তারা উৎসাহ পায় এবং নানা নতুন বিষয়ে কাজ সুরু হতে পারে। য়্যাকাডেমীর কর্তার কাছে আজ আমার আবেদন যে, এদেশে যে সব বিষয়ে ভালো কাজ হচ্ছে, সেই বিষয়ের লোকেরা যদি ইনস্টিটিউটে গিয়ে 4-5 মাস থেকে নতুন বীজ বপন করে দিয়ে আসতে পারে য়্যাকাডেমীর চেষ্টায়, তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে। প্রেসিডেন্ট নিজে যদি যান অল্প দিনের জন্যে হলেও, আমরা খুবই খুশি ও কৃতার্থ হবো।

তিনি বললেন—দেখি, আমার তো খুবই যাবার ইচ্ছে আছে, তবে কবে সময় করে উঠতে পারবো কে জানে?

এই রকম সব কথা হতে হতে কথা উঠল যে, আমি 37 বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন ব্যারণ কোরাণীর রুগী হয়ে চার সপ্তাহ এখানকার একটা নার্সিং হোমে ছিলাম।

কোরাণীর কথা শুনেই ভদ্রলোকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন "আমি কোরাণীর য়্যাসিস্টেন হয়ে বারো বছর তাঁর ক্লিনিকে কাজ করেছিলাম এবং সেই ক্লিনিকে আমিই তাঁর জায়গা নিই তিনি চলে যাবার পরে। তিনি আমাকে পিতৃস্নেহে লালন করেছিলেন। ওরকম দেবতুল্য মানুষ আর দেখা যায় না। ওরকম strong principle ও সৎ ডাক্তার, এত বিচক্ষণ চিকিৎসক কিন্তু একেবারে নিরহঙ্কার মাটির মানুষ, তেমনি সহৃদয়।"

এইতেই বুঝলাম যে উনিও একজন বড় ডাক্তার। কোরাণী আমাদের এত ভালোবেসে-ছিলেন; তাঁর জন্যেই কবিকে দেশের জাহাজে তুলে দিয়ে গ্রীক থেকে আবার আমরা বুডাপেস্ট ফিরে আসি কোরাণীকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে। সেই সময় চার সপ্তাহ যখন নার্সিং হোমে ছিলাম তখন আমার এই ডাক্তার প্রায় প্রতি দিনই আমাদের হয় কন্‌সার্ট, নয় অপেরা বা এই রকম একটা কিছুই নিয়ে যেতেন। সেই সময়েই আমাদের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এমন কি বন্ধুত্বও হয়েছিলো। ব্যারণ কোরাণী তাঁর বাড়ীতে আমাদের জন্যে বেশ বড় একটা ডিনার পার্টি দেন তাঁর সব বাছা বাছা বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে।

ব্যারণ ভাইসের পরিবারের সঙ্গে কোরাণীর জন্যেই আলাপ হয়েছিল। এদের মতো ধনীলোক হাঙ্গেরীতে কমই ছিলো। সমস্ত লোহার কারখানা, রেলওয়ে ইত্যাদি এই পরিবারেরই ছিলো। এরা য়িহুদী, হিটলারের আমলে সব ফেলে দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকাতে এখন বসবাস করছে। এদেরই অবিবাহিত ছোট মেয়ে এডিথ ভাইস (Edith Wiss) আমার চেয়ে একটু বড়, আমাকে খুব ভালোবেসেছিল। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, 1929-এ আমার অসুখের সময় 12 বোতল টোকাই (Wine) এদেশ থেকে উপহার পাঠায়, একটু করে খেলে শরীর ভালো হবে বলে; কারণ এ দেশের ডাক্তাররা দুর্বল শরীর সারাবার জন্যে টোকাই খাওয়ায়। তাই নিয়ে আপনারা আমাকে খুব ঠাট্টা করেছিলেন। এই এডিথ-এর সঙ্গে দেখা 1948 সালে সুইটজারল্যাণ্ডে—বিশ বছর

পরে পরস্পরের সঙ্গে দেখা, কিন্তু মনে হোলো যেন কাল-পরশু'ও কথা বলেছি, এমনই অপরিবর্তিত বন্ধুত্ব। তারপর থেকে প্রত্যেক বছরেই যখন আমেরিকা যাই এডিথ-এর সঙ্গে নিউইয়র্কে দেখা হয়। এবারে বুডাপেস্টে এসে কেবলি তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়ছে। তার কাছেই প্রথম খবর পেয়েছিলাম যে কোরাণী মৃত্যুর সময়ে খুব কষ্ট পেয়ে গেছেন এবং তাঁর মেয়ে খুবই কষ্টে আছে হাঙ্গারীতে। হিটলারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কোরাণীর মেয়ে বাবাকে একটা 'সেলারে'র মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি জানতেও পারেন নি নাৎসী সৈন্যরা সহর দখল করে নিয়েছে। যতবার কামানের আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন মেয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেছে "আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে প্রতিরোধ করবার জন্যে কামান নিয়ে যুদ্ধ করছে।"

কোরাণীর প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের দুজনকেই প্রেসিডেন্ট রুস্‌নিয়াকের খুব কাছে এনেছিল। এক মুহূর্তে অনুভব করলাম যে, উনিও আমাদের আপন লোক। আর আমি কোরাণীর রুগী হয়ে তাঁর চিকিৎসায় বুডাপেস্টে ছিলাম শুনে ওঁরও যেন আমাদের প্রতি একটা বিশেষ মমতা জেগে উঠলো বলে অনুভব করলাম। কবির খুব ভক্ত কাউকে দেখলে কিম্বা আমার বাবার ভক্ত কাউকে দেখলে যেমন—আমারও তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়।

সেদিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা আমরা অ্যাকাডেমীতে কাটিয়ে বাড়ী ফিরি। প্রেসিডেন্ট নিজে ঘুরে ঘুরে অ্যাকাডেমীর সব ঘর ইত্যাদি দেখালেন। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে—জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ড্যান্যুব নদীর উপরে সূর্যের রক্তরাঙা ছায়া পড়েছে দেখলাম। বাড়ীটা একেবারে নদীর উপরে। সামনে নদীর ওপারে পাহাড়ের উপরে রাজবাড়ী; তার পাশেই বহু প্রাচীন গীর্জা, ওটাকে করোনেশন চার্চ বলে, কারণ সব রাজারাই ওখানে গিয়ে প্রথম মুকুট মাথায় দিতো। নদীর ওপারের নাম 'বুডা', আর এপার হোলো পেস্ট—এই দুইয়ে মিলিয়ে বুডাপেস্ট সহর। অনেকগুলো সাঁকো দিয়ে এপারে ওপারে বন্ধন। সূর্যাস্তের মায়ালোকে সমস্ত 'বুডা'টা রঙীন হয়ে উঠলো—একেবারে "রঙে রঙে রঙীন আকাশ"—মুগ্ধ হয়ে সবাই জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। কি অপূর্ব যে সহরের sky line সে আর কি বলবো।

17. 7. 63

কাল আমরা আমাদের পুরোনো গেলার্ট হোটেলটাও দেখে এলাম যেখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 1926 সালে আমরা ছিলাম। যুদ্ধের সময় এটা গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল—সে সময়কার ছবি একটা বিলিতি পত্রিকাতে দেখেছিলাম। এখন দেখলাম সেটাকে আবার সারিয়েসুরিয়ে নিয়ে নতুন করে হোটেল চালু করেছে। সেই বাইরে আকাশের নিচে বসে লোকেরা খাচ্ছে আর সঙ্গে জীপ্‌সী মিউজিক শুনছে। হাঙ্গেরীতে এই ওপ্‌ন্ এয়ার রেস্তোরাঁতে খেতে খেতে জীপ্‌সী মিউজিক শোনাটা এদের একটা নিজস্ব ঐতিহ্য। পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করে বুকে মোচড় দিয়ে উঠলো। সব পুরোনো আস্তরণের উপরে নতুনের রাজত্ব।

হোটেলের ভিতরে ঢুকলাম। এন্ট্রান্স হলের 'ডোম'টা (Dome) সেই গোলই রয়েছে কিন্তু ভিতরের চেহারা একেবারে মার্কিনি ছাঁদে মডার্ন। সেই সোনালী কারুকার্যখচিত ছাদের বদলে সাদা ঘষা কাঁচের আস্তরণের পিছনে আলো দিয়ে ঘরটা আলো করেছে—মাঝখান দিয়ে আর চোখ-ঝল্‌সানো ঝাড় লণ্ঠন টাঙানো নেই। রিসেপশন ডেস্কটাও ঐ রকম সাদা মার্কিনী ধরণ। অ্যাকাডেমী থেকে দেওয়া আমাদের

যিনি দোভাষী তিনি একটা পাশের ছোট ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালেন, উদ্দেশ্য একটু জিরীয়ে যাওয়া। এই মহিলাটির স্বামী এখানকার একজন খ্যাতিমান অস্ত্র-চিকিৎসক—ইনিও ব্যারণ কোয়াণীর ছাত্র ছিলেন এবং খুবই কোয়াণী ভক্ত। মহিলা নিজেও খুব শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির মানুষ, 5।6টা ভাষা জানেন এবং বুদ্ধিতে কৌতুকে উজ্জ্বল। যদিও বয়স বেশী নয় তবু 17 আর 14 বছরের দুই ছেলের মা

কাল ওখানে বসে বসে খুবই খোলাখুলিভাবে ওঁর সঙ্গে বর্তমান হাঙ্গারীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার কথা-বার্তা হোলো। ওদের দেশ সম্বন্ধে আমাদের সব প্রশ্নেরই খুবই সোজাভাবে উত্তর দিলেন কোনো রকম রাখাঢাকা না করে। বললেন 1956র গৃহযুদ্ধের পরে অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে। সে সময়কার যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তাঁর অবিবেচনা ও rigidity-র ফলেই ঐ রকম অসন্তোষ জেগেছিল। অল্প ক'দিনের জন্যে যিনি প্রধান মন্ত্রী হলেন তিনি মানুষটি খুব ভালো হলেও একটু দুর্বল প্রকৃতির জন্যে ক্ষমতা হাতে পেয়েও রাখতে পারলেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করলো অপর পক্ষ এবং পরে প্রাণদণ্ড হোলো। সেটা খুবই দুঃখের, তাঁর আজ বেঁচে থাকা উচিৎ ছিলো; দেশের পক্ষে সেটা ভালো হতো। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী সে সময়ে কারাবাসে ছিলেন এবং আগের সরকারের হাতে খুবই নির্যাতিত হয়েছিলেন। ইনি মন্ত্রী হবার পরে দেশে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছে; প্রচুর স্বাধীনতা সব কথা আলোচনা করবার। সারা-ক্ষণই ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয় না কেউ আড়ি পেতে শুনছে কিনা।

বাজারে জিনিষপত্রের অভাব নেই এবং দাম খুবই যুক্তিসঙ্গত। ইনি খুব যোগ্যতার সঙ্গে এবং বুদ্ধিপূর্বক রাজ্য চালাচ্ছেন—দেশ প্রতি দিনই প্রাচুর্যের রাস্তায় অগ্রসর হচ্ছে। এখন আর বাজারে সব জিনিষের জন্যে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। চেকোশ্লোভাকিয়ায় থেকে আমাদের এখন প্রতি দিনের ব্যবহার্য জিনিষ অনেক বেশী—আমি সম্প্রতি গিয়ে দেখে এসেছি। তারা এখনও দেখলাম সব জিনিষের জন্যেই দোকানের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে।" কথাটা খুবই ঠিক—কাল আমরা একবার বাজার দেখতে বেরিয়েছিলাম। দেখলাম দোকানে প্রচুর জিনিষ। জুতো ইত্যাদির দাম প্রাগের তুলনায় অনেক কম। এমন কি লণ্ডন, সুইট্জার-ল্যাণ্ডের চেয়েও অনেক সস্তা। অবস্থা যে সত্যিই উন্নতির দিকে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এবারে একটু অন্য গল্প করি। আমরা শুক্রবার এসেছিলাম। শনিবারই সকাল 10টার সময় এখান থেকে 100 মাইল দূরে ব্যালাটন ফ্যুরেডে (Balaton Füred) মোটরে যাওয়া হোলো। য়্যাকাডেমীর কর্তাই আমাদের শনি-রবিবারে এই ছুটি ভোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। সঙ্গে এবারে অন্য দোভাষী, কারণ আগের জন, সপ্তাহান্তে দুদিন স্বামীর সঙ্গে কাটাবেন বলে আমাদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে গেলেন না।

মিসেস গ্যাবোর (Gabor)ই প্রথম দিন এয়ার পোর্টে আমাদের অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং বেশ ভালো ইংরিজি জানা য়িহুদী বর্ষিয়সী মহিলা।

10টায় হোটেল থেকে রওনা হয়ে মাইল কুড়ি পরে একটা জায়গায় থামা হলো। সহরটার নাম হচ্ছে Mortonvasar। এখানে Baron Brunsvig-এর প্রকাণ্ড বাগান ও প্রাসাদ। এই Brunsvig পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে বীঠ্‌-হোভেন প্রেমে পড়েছিলেন। সেই কাউন্টেসের টানে তিনি অনেকবার এই প্রাসাদে এসে থেকেছেন এবং এই কাউন্টেসের জন্যেই তিনি অনেক মিউজিক রচনা করেছিলেন। সেই প্রাসাদ এখন বীঠ্‌হোভেন-এর জন্যে লোকে দেখতে যায়।

দুখানা ঘর এখন তাঁর মূর্তি, ছবি ও তাঁর রচনার প্রথম পাণ্ডুলিপি যা দু-চারখানা পেয়েছে তাই দিয়ে সাজিয়ে মিউজিয়াম করে রেখেছে। বাগানটা নন্দন কাননের মতো সুন্দর ও প্রচণ্ড বিরাট তার পরিধি। এটা এখন সরকারী এগ্রিকাল্‌চার রিসার্চ ইনস্টিটিউট—যারা এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সকলেই এই বাগানের মধ্যে নিজেদের বাসা পেয়েছে, তাই খুব আরামে কাজ করছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কি আনন্দে ছুটে বেড়াচ্ছে কি বলবো। ঠিক মনে হয় যেন বটানিক্যাল গার্ডেন-এ এসেছি—সহরের মাঝখানে হলেও সহরের কোনো কোলাহল এখানে এসে পৌঁছয় না।

মিউজিয়ামের মধ্যে কাউন্টেসের যে পিয়ানোটা বীঠ্‌হোভেন বাজাতেন সেটাও সাজানো রয়েছে। প্রতি বছর গরমের সময় মিউজিক ফেস্টিভ্যাল হয় এবং দূর দূর থেকে লোকে আসে বীঠ্‌হোভেনের মিউজিক শুনতে। এবারেও দেখলাম সহরের নানা জায়গায় পোস্টার লাগানো এক খণ্ড করে বীঠ্‌হোভেনের ছবি দিয়ে ফেস্টিভ্যালের তারিখ লেখা। visitor's book-এ নাম সই করতে করতে মনে হোলো এখন এত হৈ-চৈ যাকে নিয়ে সেই আর্টিস্ট দারিদ্র ও কষ্টের মধ্যে মারা গিয়েছিলেন। শেষ জীবনটা কী দুঃখের। কালা হয়ে গিয়েও, তার পরেও যে লোক কত গ্রেট মিউজিক রচনা করে নিয়েছেন, সেই সময় তিনি দেশের ও সমাজের কাছ থেকে কোনো সম্মানই পান নি শুনেছি; কিন্তু এখন তাঁকে নিয়ে এত হৈ-চে, যাকে বলে "থাকতে দিলো না ভাত কাপড় মরলে পরে দান সাগর।"

বীঠ্‌হোভেনের পালা সাঙ্গ করে আবার চললাম আর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের স্মৃতির টানে ব্যালাটন ফ্যুরেড্‌, 1926 সালে কবির সঙ্গে যেখানে ছিলাম। পৌঁছতে বেলা 2টো বেজে গেলো। সেবারে কবির অসুখ হয়ে পড়ায় ব্যালাটন লেকের ধারে একটা স্বাস্থ্যনিবাসের কর্তা কবিকে আমন্ত্রণ করে আনেন তাঁর ওখানে রবীন্দ্রনাথকে রেখে তাঁর শরীর ভালো করে দেবেন বলে। এ অঞ্চলে অনেক মিনারেল জলের উৎস আছে রাজগীরের মতো। এই স্বাস্থ্য-নিবাসের নিচের তলায় এই রকম একটা উৎস ছিলো—সেখানে রুগীদের স্নান দেওয়া হয়।

আমরা বালাটন পৌঁছে প্রথমে একটা হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। কারণ শুনলাম ব্যালাটন হ্রদের এপারে যে দিকে আমরা 1926 সালে কবির সঙ্গে ছিলাম সেখানে আমাদের জন্যে জায়গা পাওয়া যায় নি। হ্রদের ওপারে একটা হোটেলে আস্তানা হয়েছে। এপারের সব দেখাশোনা শেষ করে মোটরসুদ্ধ্‌ ফেরী জাহাজে চড়ে আমরা রাত্রের আগে নিজেদের হোটেলে চলে যাবো।

এইবার সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি খুঁজে বেড়াবার পালা। সেবারে কবিকে দিয়ে এরা একটা গাছ পুঁতিয়েছিল; তিনি সেই উপলক্ষ্যে 4 লাইন বাংলা ও তার ইংরিজি তর্জমা করে কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর হাতের মাটি গাছের গোড়ায় পড়বার পরে আমাদের হাত দিয়েও গাছে মাটি দেওয়ানো হয়েছিল। এই সব ছবি আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এখানকার লোকেরা দেখে খুশি হবে বলে, কারণ যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় এদের পুরোনো জিনিষ তো কিছুই রক্ষা পায় নি, কাজেই এই সব ছবিই বা এরা পাবে কোথায়?

আমরা লেকের ধারে গিয়ে সেই গাছ খুঁজে বের করলাম। এখন দেখি সেই শিশু গাছ একটা বিরাট মোটা মহীরুহ হয়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে পথিকদের ছায়া দিচ্ছে। নীচে কবির আবক্ষ মূর্তি একটা পাথরের স্তম্ভের উপরে বসানো, তার গায়ে কবির 4 লাইন ইংরিজি ও বাংলা কবিতা এবং বৃক্ষরোপণের তারিখ, সন সব খোদাই করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে

এসে শরীর ভালো করে গিয়েছিলেন। সেই কথা স্মরণে রাখবার জন্যে এই বৃক্ষ রোপণের আয়োজন করা হয়েছিল, সেটাও পথচারীকে জানাবার জন্যে পাথরে লেখা হয়েছে।

শুনলাম এদেশে শুধু পাথরের স্তম্ভটাই করেছিল; কিন্তু কয়েক বছর আগে ভারত সরকার এই মূর্তি এদের উপহার দেওয়ায় এখন সেটা এরা স্তম্ভের উপরে বসিয়ে দিয়েছে। এটা যে কি বিশ্রী একটা মূর্তি আপনাকে কি বলবো। কে যে আর্টিস্ট তা জানি না কিন্তু তাঁর হাতের কাজের সঙ্গে কবির চেহারার কোনোই সাদৃশ্য তো নেই, তাঁর মুখের ভাবের সঙ্গে আরো অমিল। একটা খিটখিটে রুগ্ন, শীর্ণকায় বুড়ো, মনটা যার সর্বদাই দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে, কিম্বা শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির এমন একটা মুখের ভাব—এই নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! আমি যাকেই কবির ছবি দেখালাম সকলেই বললো "এ কী চমৎকার সুপুরুষ, কিন্তু মূর্তিটা কেন এ রকম?" কে করেছে ভগবান জানেন, কিন্তু বিদেশে ঐ জিনিষ উপহার পাঠিয়ে কবির স্মৃতি রক্ষার কোনো মানে হয় না। এর চেয়ে কিছু না থাকলেও ভালো ছিলো।

গাছটা দেখে আমরা গেলাম সেই বাড়ীটার সন্ধানে। গিয়ে দেখি সেটা এখন আর প্রাইভেট স্যানাটোরিয়াম নেই, এখন সরকারী দুটি হাঁস-পাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো, বছর পঞ্চাশ বয়স হবে, মুখখানা বেশ সৌম্য। প্রফেসর তাকে বললেন—এইখানে 1926 সালে আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কয়েক-দিন থেকে গিয়েছিলাম, তাই এসেছি আবার দেখতে। শুনেই "মেয়েটি বললো" আমি জানি কবি এসেছিলেন। তাঁর যে সেক্রেটারী ছিল সে কোথায়? তাকেও আমার মনে আছে। বললাম আমরা দুজনেই তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তাঁর সব দেখাশোনা করতাম, তাছাড়া একজন অস্ট্রিয়ান মেয়ে সঙ্গে ছিল বাইরের কাজ-কর্ম করবার জন্যে। মেয়েটি এতক্ষণে ভরসা পেয়ে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। বললো "আমার তোমাদের দুজনকেই খুব মনে আছে। আমার তখন 13 বছর বয়স; আমার মাসী কবির ঘরের কাজ-কর্ম করতেন। আমার তোমাদের সম্বন্ধে এত অসম্ভব কৌতূহল ছিল যে যখনই মাসী ঘরে আসতেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘরে আসতাম তোমাদের দেখবার জন্যে। আমার সেই aunt মারা গিয়েছেন। কবি যাবার সময় তাঁর নিজের হাতে সই করে একটা ফটো তাকে দিয়ে যান এবং তুমিও তোমাদের দুজনের একসঙ্গে তোলা একটা ছবি সই করে দিয়ে গিয়েছিলে। তাছাড়া আমার আন্টকে একটা স্কার্ফও দেওয়া হয়েছিল।"

আমি বললাম সে স্কার্ফটা আমিই দিয়েছিলাম। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার হাতখানা জড়িয়ে ধরে বললো সেইসব জিনিষগুলো আমি আমার aunt-এর কাছ থেকে পেয়েছি। তোমরা যদি একটু অপেক্ষা করো তাহলে আমি এখনি সেসব জিনিষ নিয়ে এসে তোমাদের দেখাতে পারি বলেই ছুটে চলে গেলো।

আমরা উপরে বসবার ঘরে গিয়ে তার আগেই বসেছিলাম। মেয়েটি এই হাঁসপাতালের কাল্‌চারাল প্রোগ্রামের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। এইসব সমাজতন্ত্রী দেশগুলোতে সব হাসপাতালেই রুগীদের মনোরঞ্জন করবার ব্যবস্থা থাকে। ভালো ভালো কনসার্ট ইত্যাদি মাঝে মাঝে এদের জন্যে করা হয়। আমরা এদিক-ওদিক চেয়ে লাইব্রেরী, ছবি ইত্যাদি দেখছি, মেয়েটি হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো, হাতে দুখানা ছবি। একখানা কবির বড়ো ছবি নিজে হাতে সই করা, তারিখ নভেম্বর মাস 1926 সাল। আর আমার সই করা একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি আমাদের দুজনের—উনি চেয়ারে বসে আর

আমি পাশে দাঁড়িয়ে। এ ছবির কোনো কপিও আমার কাছে নেই। বার্লিনে একজন পাঞ্জাবী ফটোগ্রাফার হোটেলে এসে তুলেছিল নিজের দোকানে সাজিয়ে রাখবে বলে; সে দয়া করে এক কপি উপহার দিয়েছিল আমাদের। আমার বিশ্বাস সেই পরিচারিকা আমার কাছে ছবি চাওয়ায় অন্য আর কিছু হাতে না থাকায় সেই ছবিখানাই আমি সই করে দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কী যত্নের সঙ্গে এই 37 বছর দুখানা ছবি ওরা রেখেছে। সত্যিই হৃদয়কে স্পর্শ করলো এই শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে। এই পরিচারিকাটির কথা আমি আমার "কবির সঙ্গে য়ুরোপে" বইখানাতে উল্লেখ করেছি। এত সুন্দর ছিল দেখতে যে প্রতি দিন যখন খাবারের ট্রেখানা নিয়ে ঘরে ঢুকতো আমরা তিনজনেই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখতাম। ও ঘর থেকে চলে গেলে কবি প্রতি দিনই বলতেন "ওর দাসী না হয়ে রাণী হওয়া উচিত ছিলো। অমন সুন্দর ছিপছিপে গড়ন, কেমন লম্বা; সোজা হয়ে রাণীর মতো হাঁটে। অত অসামান্য রূপ যার সে কেন দাসী হবে রাণী না হয়ে?" ঐ 13 বছরের ছোট মেয়েটি যেমন আমাদের দেখবার লোভে বারে বারে ঘরে আসার সুযোগ খুঁজতো আমরাও তেমনি তার মাসীকে দেখবার জন্যে সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতাম।

মেয়েটি ঘুরে ঘুরে সব ঘরগুলো দেখালো। যে ঘরে কবি ছিলেন ও তার পাশেই আমাদের ঘর, সব চিনতে পারলাম। কিন্তু এখন অনেক অদল-বদল হয়ে গিয়েছে। বাইরে জানলার নীচে আর বড় বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছে ভরা প্রকাণ্ড বাগানটা আর নেই। সেই জায়গায় হাঁসপাতালের কর্মীদের বাসস্থান হয়েছে। সেই 37 বছর আগেকার সব কটা দিন যেন এক ঝলকে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়লো "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।"

নীচে নেবে এসে গাড়ীতে উঠতে যাবো অমনি লোকের ভিড়ে ঘিরে ধরলো—'সই চাই'। কবির সঙ্গে আমরা এসেছিলাম 37 বছর আগে এই কথাটা বিদ্যুতের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং ছেলে বুড়ো সকলে ছুটে গিয়ে একটা করে কবির গাছের ছবির পোষ্ট কার্ড কিনে এনেছে আমাদের সই নেবে বলে। কয়েকটি বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে বললেন—আমরা রবীন্দ্রনাথের লেখার খুব ভক্ত, আমাদের সকলেরই ঘরে ঘরে তাঁর বই আছে, কাজেই তোমাদের অটোগ্রাফ পেলে খুব খুশি হব। শেষকালে ভিড়ের হাত এড়িয়ে কোনো মতে গাড়ীতে চড়ে বসতেই চালক হুড়মুড় করে গাড়ী চালিয়ে দিল; বললো তা না হলে আর ফেরী জাহাজ ধরা যাবে না। এবারে ব্যালাটন ফ্যুরেডে জায়গা না পেয়ে ব্যালাটন ফো্র্ডভারে (Balaton fordvar) রইলাম। এই হোটেলটাও একেবারে লেকের উপরেই। ব্যালাটনে দুদিন কাটিয়ে রবিবার রাত্রেই বুডাপেস্টে এসে পৌঁছলাম। সোমবার থেকে শুক্রবার একেবারে যাকে বলে একটানা নিরবচ্ছিন্ন প্রোগ্রাম।

সোমবার সকালেই ওঁর সঙ্গে গেলাম সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল আপিসে। সেখানে বেলা 1টা পর্যন্ত ওঁর নানা কাজের আলোচনা—কি করে হাঙ্গারী ও ভারতবর্ষের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা স্থাপিত হতে পারে যাতে দুটো দেশেরই উপকার হবে। "দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে" পলিসি আর কি।

তারপরে যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি প্রস্তাব করলেন যে আমরা যদি তাঁর অতিথি হয়ে লাঞ্চ খেয়ে যাই। সামনেই একটা রেস্তোরাঁ আছে সেইখানে গিয়ে খাওয়া হোলো। ঠিক তারপর থেকেই আমার মরণদশা। খাবারের

শেষ অঙ্কে খুব ভালো পাকা খরমুজা অথবা আইসক্রীম কোন্‌টা খাবো জিজ্ঞাসা করায় স্বভাবতই ফলটা সম্বন্ধেই লোভ দেখালাম। গরমের মধ্যে ঐ রকম ঠাণ্ডা করে রাখা মিষ্টি খরমুজাটা খেতে খুবই ভালো লাগলো। কিন্তু সেই দিন রাত থেকেই আমার পৈটিক গোলোযোগ সুরু। বোধ হয় ফলটা অনেকক্ষণ কাটা ছিল, তাইতে মাছি বসে কোনো ইন্‌ফেকৃশন লেগেছে। প্রথম রাতটা গ্রাহ্য করলাম না। মঙ্গলবার সারা দিনও কমবার দিকে না গিয়ে বেড়েই চলল। বুধবারও সকালে তাই। বেগতিক দেখে সাল্‌ফাগুইনোডিন সুরু করলাম। সেদিন সকালে বেরোনো, বাড়ী ফিরে সাড়ে তিনটের সময় আবার য়্যাকাডেমীতে ওঁর বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এবং ওঁর ল্যাজ ধরে আমারও বক্তৃতা ঐ একই জায়গায় এবং একই বিষয়ে। কাজেই নিরুপায় হয়ে গেলাম বক্তৃতা দিতে। দুজনেরই বলা সকলে খুব পছন্দ করেছিল। আমাদের রাষ্ট্রদূত মিষ্টার প্যাটেল এবং দূতাবাসের আর এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।

বক্তৃতার পরেই আমাদের জন্যে মিঃ প্যাটেলের বাড়ীতে য়্যাকাডেমীর অনেক বিশিষ্ট সভ্যদের ডেকে একটা প্রীতি সম্মিলনের ব্যবস্থা। য়্যাকা-ডেমীর ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ লিগেট (Liget) বক্তৃতাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। যাঁরা শুনতে এসেছিলেন সকলেই ইংরিজি বোঝেন কাজেই দোভাষীর মাধ্যমে বলতে হোলো না বলে বলবার সময় কোনো ব্যাঘাত অনুভব করলাম না। হয়ে গেলে সকলেই এসে আনন্দ জানালো, কারণ হাঙ্গারীতে রবীন্দ্রনাথকে ওরা সত্যিই ভালোবাসে ; তাঁর অনেক বই ওদের ভাষাতে তর্জমা হয়েছে, তাই তাঁর লেখার সঙ্গে ওদের খুবই পরিচয় আছে।

ওখানকার পালা শেষ করে আবার মিঃ প্যাটেলের বাড়ী পার্টি। মনে রাখবেন খেয়ে আছি সকাল থেকে শুধু একটু ঘোল। ওখানে সবাই খুব ভালো ভালো খাবার খেলো আর আমি শুক্‌নো মুখে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম—কিন্তু খাবার উপায় নেই, সেদিন অসুখ বেশী। ভয়ে ক্রমাগত সারিডন খেয়ে জ্বর নাবিয়ে রেখেছি। দিনে 8টা সাল্‌ফা আর 2টো সারিডন—কি করবো ? মুখ তো রক্ষা করা চাই ? বাড়ী ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হোলো।

আমাদের জন্যে নতুন আর একটি দোভাষী দেওয়া হয়েছিল সোমবার 15ই জুলাই থেকে। এঁর স্বামী ডাঃ কোরাণীর ছাত্র ছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে যখন মিঃ প্যাটেলের বাড়ী দেখা হোলো সহজেই মনে হোলো বিশেষ বন্ধু যেন। যারাই কোরাণীকে শ্রদ্ধা করে তারাই আমার বন্ধু। বললাম "যদি পারো ব্যারণ কোরাণীর একটা ছবি আমাকে দিও।" ভদ্রলোক বললেন "আমি খুব চেষ্টা করবো দিতে। যদি এখন না পারি তোমার দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবো নিশ্চয়ই।"

বুধবার য়্যামব্যাসাডরের নেমন্তন্নর পরে বৃহস্পতিবার প্রফেসরের আবার স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল আপিসে দেড় ঘন্টা আলাপ আলোচনা, তারপর প্রফেসর লিগেটির ইনস্টিটিউটে 11টা থেকে 1টা 15 মিঃ পর্যন্ত বক্তৃতা, আলোচনা ইত্যাদি। আর আগের দিনও ম্যাথামেটিক্যাল ইনস্টিটিউটেও বক্তৃতা ও পরে দেড় ঘন্টা ধরে প্রশ্নোত্তরের পালা। বৃহস্পতিবার 2টোতে বাড়ী ফিরে খেয়ে উঠেই আবার চারটের সময় ওঁর বক্তৃতা য়্যাকাডেমীতে—বিষয় হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোতে বিজ্ঞানের বনিয়াদ খাড়া না করলে অবস্থার উন্নতি করা অসম্ভব। সেদিন আপনার বন্ধুর বলা সত্যিই খুব ভালো হয়েছিল, কারণ এইটাই তো আজকাল ওঁর সর্বক্ষণ মাথায় ঘুরছে, ওঁর কাছে প্রায় 'রামায়ণ' হয়ে উঠেছে বললেই হয়। আমাদের রাষ্ট্রদূত সেদিনও এসে-ছিলেন বক্তৃতা শুনতে।

বক্তৃতার পরে এতক্ষণ ধরে প্রশ্নোত্তর চললো যে ওখান থেকে বেরোতে 6টা বেজে গেলো। তার পরে রাত 8টায় বুডার দিকে পাহাড়ের চূড়ায় একটা হোটেলে আমাদের জন্যে অ্যাকাডেমীর বিদায় ভোজের আয়োজন।

এদেশে এখন খুবই গরম, কলকাতার মতো বললেই হয়, তাই হোটেলের খোলা চাতালে আকাশের নীচে বসে খাওয়ার কল্পনাটা খুবই উপযুক্ত হয়েছিল। এইসব আনুষ্ঠানিক ভোজগুলো কি রকম ঢিমে তালে চলে তাতো জানেনই। পর দিন আমরা ভিয়েনা রওনা হবো, কাজেই ইচ্ছা ছিল যদি 10½টার মধ্যে বাড়ী ফেরা যায়। কিন্তু as usual সেই রাত প্রায় বারোটা বাজলো বাড়ী ফিরতে। আমার তো কিছু খাবার জো নেই, শুধু চেয়ে চেয়ে এদিক-ওদিক দেখা আর মাঝে মাঝে শুকনো রুটি ছিঁড়ে মুখে দেওয়া। মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বাড়ী গিয়ে শোবো। যাক, সব দুঃখেরই পার আছে, অবশেষে ডিনার সাঙ্গ হোলো।

এদিনেও অ্যাকাডেমীর ভাইস প্রেসিডেন্টই ডিনারের নিমন্ত্রণ কর্তা হয়ে প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতির দোষ কাটালেন। প্রেসিডেন্ট প্রথম দিনই আমাদের সঙ্গে দেখা করে চা খাইয়ে পর দিন বিদেশে চলে গেছেন। আগেই চলে যাবার কথা ছিলো কিন্তু আমাদের জন্যেই শুধু যাওয়া পিছিয়ে দিয়ে সহরে বসেছিলেন।

বিদায় নেবার সময় সকলেই আপনার বন্ধুকে বললো—"আবার শীগ্‌গীরই তোমাদের এদেশে ফিরে আসতে হবে; আমরা দেখবো যাতে সে ব্যবস্থা হয়। মোট কথা আপনার কাছে বলতে দোষ নেই যে ওরা খুবই মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছে ওঁর নানা দিকে কিছু দেবার ক্ষমতা আছে দেখে। উনি যে শুধুই স্ট্যাটিস্টিশিয়ান নন সেটা ওদের পক্ষে একটা আবিষ্কার। বিবিধ বিষয়ের ইনস্টিটিউটে ওঁকে দিয়ে বক্তৃতা দিইয়েছে; সব জায়গাতেই উনি তাদের কিছু নতুন আইডিয়া দিতে পেরেছেন। এতটা বোধ হয় ওরা আশা করে নি। মোট কথা ওরা আমাদের জন্যে যেটা খরচ করেছে তার থেকে অনেক বেশীই ফিরে পেয়েছে, এ সম্বন্ধে ওদের মনে আর কোনো দ্বিধা নেই; তাই সর্বত্রই এত সমাদর। এত আরামের হোটেলটাতে রেখেছিল কিন্তু কপালের দোষে তার আরামটা ভোগ করবার সময় পেলাম না। সব সময়েই যেন ঘোড়ায় চড়ে থাকতে হয়েছিল।

শুক্রবার 19শে সকালে জিনিষপত্র গুছিয়ে 10টায় বেরোলাম সহরটাকে আর একবার দেখে নিতে। 37 বছর আগে বুডাপেস্টে যে লিগেট স্যানাটোরিয়ামে ছিলাম প্রায় এক মাস কোরাণীর চিকিৎসাতে, সেই বাড়ীটা দেখে এলাম, তাছাড়া উনি এদিক-ওদিকে একটু ছবি তুলে বেড়ালেন। তারপর অ্যামব্যাসাডর মিঃ প্যাটেলের বাড়ীতে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাওয়া হোলো—এটা না করলে নিতান্তই খারাপ দেখাতো। তার পরে হুড়মুড় করে বাড়ী ফিরে আমি একটু দই ভাত আর উনি পুরো লাঞ্চ খেয়ে দৌড়লাম Airport, সঙ্গে মিসেস রুবিয়ানী—পৌঁছতে 1 ঘণ্টা লাগে। সেখানে গিয়ে দেখি অ্যাকাডেমীর বন্ধু-বান্ধবরা সবাই এসেছেন ফুলটুল নিয়ে। প্লেন ছাড়ার কথা 2¼টাতে কিন্তু সেদিন 40 মিনিট লেট।

ওখান থেকে ভিয়েনা পৌঁছতে মোটে 50 মিনিট লাগে। পৌঁছে দেখি এদেশের ফরেন মিনিস্টার ক্রাইস্কি (Craisky) তাঁর গাড়ী ও লোক পাঠিয়েছেন আমাদের জন্যে। যিনি নিতে এসেছেন মিঃ জীবার্টি (Giberty) তিনি আমাদের আম্রপালিতে এবারে ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েক দিন কাটিয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া ইনি ক্রোনির ফাউণ্ডেশন (Kronir Foundation)-এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং ক্রাইস্কি তার

চেয়ারম্যান। এদেরই কনফারেন্সে প্রফেসর গত বছর জুলাই মাসে ভিয়েনা এসেছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানই যে একটা অর্গানাইজিং কমিটি করেছে তার মধ্যে আপনার বন্ধুকেও নিয়েছে। গত বছর উনি কন্‌ফারেন্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটা খুবই বেশী রকম appreciated হয়েছিল এবং সেই চিন্তাধারা অনুসরণ করেই এরা ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করবে ভাবছে। অনুন্নত দেশগুলোকে সাহায্য করবার আইডিয়া এই ফাউণ্ডেশনের। সেই সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাবার জন্যেই এবারে ভিয়েনাতে ওঁর ডাক পড়েছিল।

প্রায় 4টেতে আমরা পৌঁছলাম। জীবার্ট বললেন ক্রাইস্কির আপিসে 5টায় দেখা করবার সময় স্থির হয়েছে। Air India থেকেও পাঠিয়েছিল আমাদের জন্যে। মানে "সোনার খাটে গা আর রূপোর খাটে পা।" আমি বললাম আমার স্বামীকে যে তোমরা দুজনে কাজের কথা বলতে বলতে যাও ফরেন মিনিস্টারের গাড়ীতে; আমি এয়ার ইণ্ডিয়ার গাড়ীতেই যাবো ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করতে করতে। ছেলেটি খুব ভালো আর খুব ঐতিহ্যসম্পন্ন মানুষ। এবারেও সেই একই হোটেল। এবারে আমরা ক্রোনিয়-ফাউণ্ডেশনের অতিথিরূপে এসেছি কাজেই ঘরখানা আরো বেশী রাজকীয়।

তাড়াতাড়ি করে মুখ ধুয়ে গেলাম এদের পররাষ্ট্র দপ্তরের আপিসে। সেই পুরোনো হ্যাপস্‌বুর্গদের রাজপ্রাসাদ। সে সময়েও এইটাই ওদেরও ফরেন আপিস ছিল। যে ঘরে গিয়ে বসলাম সেই ঘরেই 1936 সালে হিটলারের লোক তখনকার ফরেন মিনিস্টারকে খুন করে ভিয়েনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। সব ঘরদোরের সঙ্গে কতকালের কতো ষড়যন্ত্রের ইতিহাস জড়ানো। ঘরে মারিয়া টেরেসার বড় বড় অয়েল পেন্টিং ও পাথরের মূর্তি। মহিলার সত্যিই প্রতিপত্তি ছিলো সেকালে। যাই হোক ঘরে গিয়ে বসবার একটু পরেই ভিতরের ঘর থেকে ডাক এলো। স্বয়ং পররাষ্ট্র মন্ত্রী অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালেন। আমি বললাম "I am always a gate crasher. Wherever my husband goes I go with him." (আমি সর্বদাই রবাহুত হয়ে যেখানেই আমার স্বামী যান সেখানেই আমি তাঁর সঙ্গ ধরে উপস্থিত হই।) হেসে ক্রাইস্কি বললেন "You are quite welcome. I am glad you take interest in his talks."

(তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। দেখে খুশি হলাম যে তুমি তোমার স্বামীর আলাপ-আলোচনা শুনতে আগ্রহ বোধ করো।)

তারপরেই ওঁদের কাজের কথা সুরু হোলো। পরের কন্‌ফারেন্সে কি রকম agenda হলে ভালো হয় ইত্যাদি। তার খানিক পরেই ক্রাইস্কি বললেন আমার মাথায় অনেক রকম প্ল্যান এসেছে; একটু অবকাশের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। কাল শনিবার বিকেল 5টায় যদি তোমরা আমার বাড়ীতে আসো তাহলে একটু আরাম করে ধীরেসুস্থে কথাবার্তা বলতে পারি। তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন যদি তোমার আমাদের কথাবার্তা শুনতে বিরক্ত না লাগে তাহলে কাল তোমাকেও আমন্ত্রণ করছি তোমার স্বামীর সঙ্গে।

ভদ্রলোকের বয়স বোধ হয় এখন 51 হবে। খুব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা চেহারায় এবং অতি সুপুরুষ। কথা বলবার ধরণও খুব attractive, থেমে থেমে ইংরিজি বলা কিন্তু ভাষাটার উপরে রীতি মতো দখল আছে।

ওখান থেকে খুব কাছেই একটা অতি মনোরম পার্ক আছে, সেইখানে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম। জীবার্টও আমাদের সঙ্গে গিয়ে বাগানে বসলেন। এই পার্কটা এক সময়ে প্রাসাদের ভিতরকারই বাগান ছিলো। এখন সেখানে

3-4টে রেস্তোরাঁ এবং অপূর্ব গোলাপের বাগান করা হয়েছে। এর আগের বারেও ওখানে বসে কতো দিন সন্ধেবেলা আইসক্রীম খেয়ে গিয়েছি, সেই সব কথা মনে পড়লো। শরীরটা একে খারাপ তার উপরে সেদিন প্লেন থেকে নেবেই ওখানে যেতে হয়েছে—কাজেই তখন ক্ষিদেতে ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। নইলে আরো খানিকক্ষণ বসতে পারলে ভালো লাগতো। ওখান থেকে হোটেলটা এত কাছে যে ট্যাক্সি নেওয়া মানায় না, অথচ এতটুকু হাঁটতেও আমার পা টলমল্ করতে লাগলো। জীবার্টি কিছুই টের পাচ্ছেন না তাই উৎসাহ করে পুরোনো প্রাসাদ গীর্জে, সব দেখাতে আগ্রহ। অবশেষে আর না পেরে বলতে হোলো এবারে ফেরা যাক, আজ বড় বেশী ক্লান্ত লাগছে।

বাড়ী এসে পোষাক বদল না করে সেই পথের কাপড়েই খাবার ঘরে চলে গেলাম। এই হোটেলে যত বড় বড় রাজা, প্রিন্স, লর্ডরা এসে থাকে; আজকাল কোটিপতি মার্কিনদেরও হুড়াছড়ি। তারা সকলেই সেজেগুজে খাবার ঘরে গিয়ে বসেছে। আমি আর উনি কেবল "হংস মধ্যে বক যথা।" ওঁকে বললাম সেই সকালবেলা বুডাপেস্টে চুল আঁচড়ে কাপড় পরেছিলাম, তারপর সারা দিন গেছে, এতখানি রাস্তা প্লেনে এসেছি সবই ঠিক, কিন্তু যে যা ভাবে ভাবুক বয়ে গেছে, আমি একেবারে না খেয়ে আর উপরে উঠতে পারবো না। দেখলাম এ বিষয়ে উনিও একমত।

ক্রাইস্কির কাছে শুনে এসেছিলাম যে আমেরিকার ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন আসবেন পর দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বুডাপেস্টে আমরা থাকতেই সপরিবারে ট্যুরিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রে দেখি আমাদের টেবিলের অদূরেই তিনিও সপরিবার খেতে বসেছেন। বেচারার কোথায় গেছে আজ মার্কিন দেশের জাঁকজমকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে ঘোরা; আজ একজন নগণ্য ট্যুরিস্ট হয়ে ঘুরতে হচ্ছে।

পর দিন শনিবারও অসুখ রীতিমত চলছে। সাল্ফা বড়ি দিনে 8টা করে খেয়েই চলেছি, তবু কোনো তারতম্য নেই। খাওয়া সেই দুবেলা ঘোল আর এদের কড়্‌কড়ে শক্ত ভাত।

যাই হোক, বিকেল $4\frac{1}{2}$টেতে মিঃ জীবার্টি গাড়ী নিয়ে এসে হাজির ক্রাইস্কির বাড়ী যাবার জন্যে। সেখানে ঠিক 5টায় পৌঁছলাম। সহরের একটু বাইরে বেশ সুন্দর বাগানওয়ালা ছোট দোতলা বাড়ী। এইটাই সরকারী বাসস্থান পররাষ্ট্র মন্ত্রীর। উপরের প্রশস্ত ঘরে চাকর নিয়ে এলো। তার একটু পরেই ভদ্রলোক ঘরে এলেন। নিজে ঘুরে ঘুরে নিজের পড়বার ঘরে পুরোনো ছবি ইত্যাদি দেখালেন। খুবই সহৃদয় অভ্যর্থনা। প্রায় $2\frac{1}{2}$ ঘণ্টা ওঁদের কথাবার্তা চললো। বললেন সেপ্টেম্বরের 5।6 তারিখে একটা ছোট পরামর্শ কমিটির মিটিং করতে চাই, সে সময় কি মিষ্টার মহলানবিশের আসা সম্ভব? প্রফেসর বললেন—জানি না পারবো কিনা, কারণ আমার অক্টোবার মিটিং অগাষ্টের শেষ পর্যন্ত চলবে; তারপরে আরো নানা জায়গায় এন্-গেজমেন্ট আছে, কাজেই আমি এখনি কিছু বলতে পারছি না। যাই হোক, আমার যা বলবার তা লিখে জানাতে পারবো। ক্রাইস্কি বললেন "গতবারে তুমি যে পেপার দিয়েছিলে তার থেকে আইডিয়া নিয়েই আমার প্রোগ্রাম করছি, তাই তুমি থাকতে পারলে ভালো হয় এই স্টীয়ারিং কমিটিতে।"

ইতিমধ্যে বারে বারে নানা রকম ফলের রস ও খাদ্যদ্রব্য আসতে লাগলো। আমি চেয়ে চেয়ে অন্যদের খাওয়া দেখলাম। একটু পরে মিসেস ক্রাইস্কিই ঘরে এলেন। স্বামী আলাপ করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন—তুমি তো মহলা-নবিশকে আগেই দেখেছিলে—ইনি ওঁর স্ত্রী।

ভদ্রমহিলা একটু হেসে স্বামীর পাশে গিয়ে সোফায় বসে কখনও নিজের মনে সিগারেট খাচ্ছেন, কখনও ফলের রস খাচ্ছেন, কখনও জুতোটা খুলে সোফার উপরে গা এলিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু মুখে একটাও কথা নেই, কিংবা যেসব আলোচনা হচ্ছে তাতেও কোনো মন নেই। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল বেজার "গেলে বাঁচি" মনোভাব নিয়ে বসে আছেন। আমার একটু অস্বাভাবিক মনে হলে ওর আচরণ, ওরকম ছটফট করাটা। 2½ ঘণ্টা পরে 7½টায় আমরা যখন উঠলাম তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মন্ত্রীমশাই জীবার্টিকে বললেন—আমার গাড়ী দরজায় তৈরি আছে, আড়াই ঘণ্টার আগে আমার গাড়ীর দরকার নেই। এঁদের তুমি একটু বেড়িয়ে নিয়ে তারপর হোটেলে ফেরৎ দিও।

জীবার্টি নিয়ে গেলেন আমাদের পাহাড়ের চূড়ায়, একটা রেস্তোরাঁতে। সেখান থেকে সমস্ত ভিয়েনা সহরটা চোখে পড়ে চওড়া ড্যান্যুবের পারে। বেশ রাত পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে 9½টায় হোটেলে ফিরে খেয়েদেয়ে শুতে শুতে রাত 11½টা।

পর দিন রবিবার। খুব কুঁড়েমি করে সারা সকাল ঘরেই কাটানো গেল। এখন এখানে আইঢাই—প্রায় 90°F—95°F তাপমাত্রা চলেছে। খেয়ে দেয়ে 2টোতে যেই ঘরে ফিরেছি জীবার্টি ফোন করলেন যে ক্রাইস্কি বলে পাঠিয়েছেন যে তোমাদের সেমারিং (Semmering) বেড়িয়ে আনতে, তাই আমি ট্যাক্সি নিয়েই এসেছি।

আমার বেজায় রাগ হয়েছে, কারণ শরীরটা তখন আরো বেশী খারাপ লাগছে, তাই সাল-ফার সঙ্গে এন্টারোভায়াফরম খরেছি। রেগে উঠলাম দেখে উনি জীবার্টিকে বললেন আমার স্ত্রীর শরীর ভালো নেই, এইমাত্র খেয়ে উঠেছে, একটু বিশ্রাম না করে যেতে পারবে না। আমরা কি সওয়া তিনটেতে গেলে হয়? বললেন হ্যাঁ, আমি তাহলে সওয়া তিনটেতে আবার গাড়ী নিয়ে আসবো।

1926 সালে কবিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেমারিং-এ। এখান থেকে 60 মাইল দূরে আলপস্ পাহাড়ের উপরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ছিলো; সেটাকে তখনই হোটেলে পরিণত করা হয়। কবির বইয়ের প্রকাশকরা গাড়ীতে করে আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেখবার যোগ্য বটে সারাটা পথ। কাজেই লোভ ছাড়া গেলো না—গেলাম 3টা 15 মিনিটে। পৌঁছতে 1 ঘণ্টা 45 মিনিট লাগলো। সমস্ত রাস্তাটা খুব সুন্দর তেলের মতো করে তৈরী। সেদিন রবিবার ক্রমাগত মোটর চলেছে—সকলেরই সেই এক গন্তব্য স্থান। পথে যেতে যেতে অনেক পুরোনো শহর, পুরোনো গীর্জা, পুরোনো প্রাসাদ পার হলাম, সঙ্গে সঙ্গে নতুন কারখানা নতুন ঢঙে নতুন বসতি, তাও বাদ গেলো না। এঁকেবেঁকে পাহাড়ে পথ দিয়ে যখন গাড়ী উঠছে মনে হোলো যেন কালিম্পং চলেছি।

শীতের সময় এই সেমারিং-এ লোকে উইন্টার স্পোর্টস-এর জন্যে যায়। ঐ উত্তুঙ্গ পাহাড়ের চূড়ার উপর থেকে একেবারে খাড়া স্কী করে নেবে আসে। দেখলেই তো পিলে চমকে যায়। উপরে উঠে খালি 2 গ্লাস লেবুর সরবৎ খেয়ে আমাকে নেবে আসতে হোলো। ওঁরা দুজনে দিব্যি উপাদেয় কফি কেক্ দিয়ে ভিয়েনার বিখ্যাত কফি খেলেন।

ফিরবার সময় বুদ্ধি করে ড্রাইভারটা অন্য রাস্তা দিয়ে নাবিয়ে আনলো। এটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা নির্জন সরু পথ; প্রায় এদিক দিয়ে কেউ যায় না বলে মোটরের ভিড় নেই। খুব সুন্দর দেখতে। এখন গ্রীষ্মকাল, চারধারে নানা রঙের মেঠোফুল ফুটে আছে। থেকে থেকে চাষীদের এক একটা ছোট বাড়ী; তাদের ছোট্ট বাগানে প্রচুর ফুল ফুটিয়েছে। সন্ধেবেলা

বাড়ীর সবাই উঠোনের বেঞ্চিতে বসে কেউ তাস খেলছে, আবার বুড়ো-বুড়ী কোথাও ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। কোথাও ছোট ছেলে-মেয়ে তখনও খেলা সাঙ্গ করে নি। একটি কম বয়সী যুবতী মেয়ে আমাকে দেখে হাত নেড়ে সম্ভাষণ জানালো, আমিও রুমাল উড়িয়ে দিলাম।

120 মাইল মোটর যাত্রা সেরে রাত 9টায় হোটেলে পৌঁছে তার পরে খাওয়া। আর আমার খাওয়া মানে তো শুধু ঘোল আর ভাত। এত খাতির যত্ন করে এই হোটেলে রেখেছে, এখানকার রান্না ও খাবার বিখ্যাত। যা ইচ্ছে ফরমাস করলেই খেতে পারি, সব খরচ এরা দেবে এক পয়সাও আমাদের লাগবে না; কিন্তু "কপালে নাইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি ?"

রোজ টেবিলে খেতে খেতে উনি বলেন— রাণী, কি অসম্ভব ভালো রান্না যে কি বলবো। একটু খেয়ে দেখবে? নারে বাবা এ অসুখ নিয়ে খেলা চলে না। পর্শু থেকে এন্টারো-ভায়াফরম্ খেয়ে আজ সকালে প্রথম মনে হোলো একটু যেন ভালো লাগছে শরীর। কিন্তু এখনও নর্মালের বহু দূরে। যাই হোক কাল সকালে জেনিভা রওনা হতে হবে, তাই আজ সাহস করে লাঞ্চে একটু মুর্গীর রোস্ট আর দই খেয়েছি এবং এখন রাত্রে ডিনারে মুর্গীর রোস্ট আর আপেল বেক করিয়ে খেয়েছি। এদেশে এখন চমৎকার পীচ, পেয়ার্স্, স্ট্রবেরী, রাস্পবেরী আঙ্গুর, মেলন কিছুই আমার খাওয়া হোলো না। এই বিখ্যাত হোটেলের পেস্ট্রী, আইসক্রীমও পেটে পড়লো না। শুধু ঘোল খেয়ে বিদায় হলাম।

আজ বিকেলে এয়ার ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার মিঃ ঘোষ তাঁর ছোট মেয়েটিকে আর আমাদের দুজনকে নিয়ে মোটরে সমস্ত সহরটা খুব ভালো করে ঘুরে দেখালেন। ভিয়েনাটা সত্যিই অপূর্ব সুন্দর সহর, এর আর তুলনা নেই।

এইবার বিদায়ের পালা। কাল সকাল $10\frac{1}{2}$টায় এয়ার ইণ্ডিয়ার গাড়ী চড়ে এয়ার পোর্টে গিয়ে সুইস্ এয়ারপ্লেনে জেনিভা রওনা দেবো। দুপুর $1\frac{1}{4}$টায় পৌঁছবো, পর দিন সকাল 8টায় অর্থাৎ 24শে জুলাই সোজা এয়ার ইণ্ডিয়ার জেট প্লেনে নিউইয়র্ক পাড়ি। উনি লণ্ডন পর্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়ে প্লেন থেকে নেবে যাবেন; আমি একাই অতলান্তিক পার হয়ে চলে যাবো। তার পরে দিদির* আলিঙ্গন।

এইবারে হোটেলের কাগজও ফুরিয়েছে, আমার গল্পও শেষ। রাত 11টা বেজেছে; কাল সকাল 8টার মধ্যে সেজেগুজে তৈরি হতে হবে। উনি এখনও খুটুর খুটুর করে কিসব গোছগাছ করছেন। ওঁর উপরে ভার দিয়েছি এই রামপট আপনার হাতে পৌঁছে দিতে। ডাকে গেলে হয়তো ভারি চিঠি দেখে খুলবে। অতএব আপনি ওঁকে তাগিদ দিয়ে আশা করি চিঠিটা বের করে নিতে পারবেন। এ চিঠি আপনি না পেলে সত্যিই কষ্ট হবে। বহু পরিশ্রম করে লিখেছি অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও নিজের বিশ্রামের ব্যাঘাত করে। ইতি

(স্নেহের রাণী)

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

---

*মিসেস ওয়ালটার সুহার্টকে দিদি ডাকি। Dr. W. A. Shewhart, যাঁকে বলা হয় Father of Statistical Quality Control, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁদের বাড়ীটাই আমাদের আমেরিকার বাড়ী যেন।

রাশি-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

পূর্ণেন্দুকুমার বসু*

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাশি-বিজ্ঞানী ও ভারতবর্ষে রাশি-বিজ্ঞানের প্রবর্তক অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গত 28শে জুন 1972 বেলা 2-40 মিনিটে পরলোকগমন করেন। যদিও মাসাবধি কাল তিনি রোগ ভোগ করছিলেন তবুও তাঁর অগণিত ছাত্র ও গুণমুগ্ধদের নিকট তাঁর মৃত্যু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞানীদের অবদান পৃথিবীর কোন দেশের রাশি-বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা কম নয়। এই বিজ্ঞান-চর্চার মূল উৎসস্বরূপ ছিলেন অধ্যাপক মহলানবিশ। তিনি পঞ্চাশ বছর যাবৎ শুধু নিজেই গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন না, দেশের মেধাবী ছাত্রেরা যাতে গবেষণার সুযোগ পায়, তার সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। 1931 সালের 17ই ডিসেম্বর অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি সাধারণ সভা ডাকেন; এই সভায় ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 28শে এপ্রিল 1932 সালে এই সংস্থা সরকারীভাবে স্থাপিত হয়। ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান মন্দির পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। অধ্যাপক মহলানবিশের জীবনে এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

1893 সালে 29শে জুন অধ্যাপক মহলানবিশ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। মহলানবিশ পরিবার কলকাতায় সুপরিচিত ছিল। তাঁর পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনিই প্রথমে ঢাকা থেকে কলকাতায় আসেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর পিতা প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন। বহু দুস্থ পরিবারকে তিনি অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর জ্যেঠামহাশয় স্বনামধন্য অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ; তিনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তাঁর মাতুল ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন সরকার। মহলানবিশ পরিবারের সবাই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এই সমাজের উন্নতির জন্যে তাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেন।

অধ্যাপক মহলানবিশ 1912 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্সসহ B. Sc. পাশ করেন। তার পরের বছর 1913 সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপোজ পড়বার জন্যে রওনা হন। 1915 সালে Natural Science Tripos Part-II (Physics)-এর M. A. ডিগ্রী লাভ করেন। কেমব্রিজ ছাড়বার আগে তাঁর শিক্ষক W. H. Macavly তাঁকে Biometrika-র একটি খণ্ড এবং Biometrik Tables পড়তে দেন। এই পুস্তকগুলিই তাঁকে রাশি-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করে।

দেশে ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। 1923 সালে অধ্যাপক মহলানবিশ অধ্যক্ষ হেড়ম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মলকুমারীকে বিয়ে

* সিনেট হাউস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

করেন। 1922 সাল থেকে 1945 সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান এবং 1945 সাল থেকে 1948 সাল পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। ঐ কলেজে কাজ করবার সময় দুটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে তাঁর মন রাশি-বিজ্ঞানের দিকে আরো আকৃষ্ট হয়।

1917 সালে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি এই কাজে তরুণ অধ্যাপক মহলানবিশকে নেন। অধ্যাপক মহলানবিশ এই গবেষণায় রাশি-বিজ্ঞানের বিবিধ প্রণালী ব্যবহার করেন, যার ফলে নতুন বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আরো জোরদার হয়।

1922 সালে হাওয়া অফিসের ডিরেক্টর Sir Gilbert Walker অধ্যাপক মহলানবিশকে আবহাওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি সমস্যা রাশি-বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাধান করবার জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি কয়েক বছর ঐ সমস্যাগুলির উপর গবেষণা করেন এবং পরে তাঁর গবেষণা দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হিসাবে ছাপা হয়।

এই সময়েই উত্তর বঙ্গে প্রবল বন্যা হয়। বাংলা সরকার বন্যা প্রতিরোধ করবার জন্যে ইঞ্জিনিয়ারদের মত নেন। তাঁরা জানান বন্যার জল আটকানো প্রয়োজন। অধ্যাপক মহলানবিশ 50 বছরের বৃষ্টিপাতের রাশিতথ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলেন এবং বাংলা সরকারকে জানালেন যে, জল আটকানোর পরিবর্তে শীঘ্র নিষ্কাশনের প্রয়োজন। পরবর্তীকালে উড়িষ্যার বন্যারও সমাধানকল্পে তাঁর মতামত নেওয়া হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, অধ্যাপক মহলানবিশের মতানুযায়ী কাজ করা হয়েছিল।

পরপর কয়েকটি গুরুতর সমস্যা রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুযায়ী সমাধান করবার পর, রাশি-বিজ্ঞান অনুশীলন ও গবেষণা করবার দিকে অধ্যাপক মহলানবিশ বিশেষ ঝুঁকে পড়লেন। কয়েকজন ছাত্র ও বন্ধুর সাহায্যে রাশি-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত করলেন 1931 সালে।

গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হলো। কিন্তু আর্থিক অনটন খুবই ছিল। বাৎসরিক আয় মাত্র 2,500 টাকা। গবেষণা কেন্দ্রে 75 টাকার বেশী মাইনে কোন কর্মী পেতেন না। কেন্দ্রের সমুদয় খরচ অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর উপার্জিত টাকা থেকে দিতেন। এইভাবে প্রায় 5/6 বছর চলে। টাকা না থাকলেও গবেষণা কেন্দ্র প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। সকাল 9টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত গবেষণা কেন্দ্র খোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রেরা নতুন বিজ্ঞানকে স্বাগত জানালো। তারা দলে দলে এসে অধ্যাপক মহলানবিশের স্বপ্ন সার্থক করলো। অধ্যাপক তরুণ গবেষকদের নিয়ে এক বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সূচনা করলেন। অনতিবিলম্বে এই কেন্দ্র ভারতবর্ষের একমাত্র রাশি-বিজ্ঞানের 'গবেষণা সংস্থা' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মী, ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকেরা প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার ল্যাবোরেটোরীতে ভিড় করতে লাগলো। অধ্যাপক মহলানবিশ ছিলেন কাজের পাগল। তাঁরই উৎসাহে গড়ে উঠলো এক বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী, যাঁরা সবাই ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মহলানবিশ নৃতত্ত্বের একটি বিশেষ শাখায় কিছু দিন গবেষণা করেন। এই গবেষণা থেকেই তাঁর 'Mahalanobis Distance Function' বা 'D^2 Statistics'-এর উদ্ভব হয়। তাঁর কাজের সূত্র ধরেই বর্তমানের Multivariate Analysis-এর কাজ আরম্ভ হয়।

1935 সাল থেকেই রাশি-বিজ্ঞান মন্দিরে সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে নানা রকমের সমস্যার সমাধানের জন্যে অনুরোধ আসতে আরম্ভ করে।

গবেষণা কেন্দ্রের কর্মীরা যথাযথভাবে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন। 1937 সালে বাংলা সরকার সারা বাংলাদেশের পাট চাষের জমির পরিমাণ এবং মোট পাটের পরিমাণ কত হওয়া সম্ভব, তা জানতে চান, চাষের অব্যবহিত পরেই। কারণ বাজারে পাট আসবার আগেই যদি জানা যায় পাটের পরিমাণ কত হবে, তাহলে সরকারের পক্ষে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সহজ হয়। অধ্যাপক মহলানবিশকে এই কাজের ভার দেওয়া হয়। সারা পৃথিবীতে এত বড় কাজ এর আগে আর করা হয় নি। তিনি নতুন কাজের পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন এবং তার সাহায্যে পাটের আধুনিক ফসলের পরিমাণ জানালেন। এই পদ্ধতি এখন 'Large Scale Sample Survey' নামে প্রচলিত। অধ্যাপক মহলানবিশের ফলিত রাশি-বিজ্ঞানে এই অবদানে সর্বজনস্বীকৃত।

1938 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কলকাতায় তাঁদের 25 বছর পূর্তি উৎসব পালন করেন, একই সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশ প্রথম ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান সম্মেলন আহ্বান করেন। মূল সভাপতি হিসাবে এলেন কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের R. A. Fisher। তিনি রাশি-বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণার মান দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন। Multivariate Distribution, Design of Experiments এবং Statistical Inference প্রভৃতি বিষয়ে গবেষকদের কাজ ঐ সম্মেলনে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

1941 সালে অধ্যাপক মহলানবিশের চেষ্টায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশি-বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয় এবং তিনিই প্রথম বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব নেন। 1945 সাল পর্যন্ত তিনি প্রধান অধ্যাপকরূপে ছিলেন। এর পরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশি-বিজ্ঞান পড়ানো হয়। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা না থাকলে হয়তো আরো 10 বছর অপেক্ষা করতে হতো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে 1941 সালে লোক-গণনার (Census) কাজ হয়। কিন্তু অনিশ্চিত অবস্থার জন্যে কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মহলানবিশকে অনুরোধ করা হয় লোকগণনার পত্রগুলি পুনরায় বিশ্লেষণ করবার জন্যে। অংশকচয়ন পদ্ধতি অনুযায়ী তিনি কতগুলি পত্র বেছে নেন এবং তার থেকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে লোকগণনা সম্পর্কিত অনেকগুলি নির্ভরযোগ্য রাশিতত্ত্ব দেন।

1943 সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান সংস্থার তরফ থেকে অধ্যাপক মহলা-নবিশ এর কারণ অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। অনুসন্ধানের পর তাঁর রিপোর্টে তিনি লেখেন খাদ্য ঘাটতির জন্যে দুর্ভিক্ষ হয় নি, সরকারী আমলাদের কর্তব্য অবহেলার জন্যে বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়। 'Bengal Famine Enquiry Report' তদানীন্তন কালে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে।

1944 সালে অধ্যাপক মহলানবিশকে অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় Weldon Prize এবং Medal দেন। 1945 সালে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

1950 সাল থেকে অধ্যাপক মহলানবিশ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি অনেক সংস্থার সভাপতি বা সহ-সভাপতি ছিলেন। 1947 সাল থেকে 1951 সাল পর্যন্ত তিনি U. N. Sampling Sub-Commission-এর প্রধান ছিলেন। ভারতবর্ষে পরিকল্পনার কাজের জন্যে নির্ভরযোগ্য রাশিতত্ত্বের অভাব লক্ষ্য করে তিনি জাতীয় অংশকচয়ন সমীক্ষার (National Sample Survey) প্রবর্তন করেন। ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান মন্দির তাঁর তত্ত্বাবধানে এই কাজের ভার নেয়। এখনও পর্যন্ত এই কাজ চলছে। দ্বিতীয় পঞ্চ-

বার্ষিক পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করবার ব্যাপারে ভারত সরকার অধ্যাপক মহলানবিশের সাহায্য নেন। 1955 সালে তিনি পরিকল্পনার কাঠামো সরকারকে দেন। সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেবার সময় অধ্যাপক মহলানবিশের কাঠামো অনেক পরিমাণে গ্রহণ করেন।

1957 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। 1958 সালে সোভিয়েট অ্যাকাডেমি তাঁকে বৈদেশিক সভ্য মনোনীত করেন। 1959 সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত Kings' College-এর ফেলো নির্বাচিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রাশি-বিজ্ঞানের জন্যে কোন ভিন্ন শাখা ছিল না। অধ্যাপক মহলানবিশের চেষ্টায় 1942 সালে রাশি-বিজ্ঞান ও অঙ্ক যৌথ শাখা হিসাবে কংগ্রেসে স্থান পায়। তিনি এই শাখার প্রথম সভাপতি হন। 1947 সালে রাশি-বিজ্ঞানকে একক শাখা হিসাবে গণ্য করা হয়। অধ্যাপক মহলানবিশ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। দুটি বিভিন্ন শাখার সভাপতি এবং মূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে তিনি নির্বাচিত হন। তা ছাড়া কংগ্রেসের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। 1957 সালে তিনি আন্তর্জাতিক রাশি-বিজ্ঞান সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি জাতীয় বৈজ্ঞানিক সংস্থারও ফেলো ছিলেন।

1959 সালে ভারতীয় সংসদ ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান মন্দিরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেন। এর ফলে এই সংস্থা ডিগ্রী দেবার অধিকারী হলেন। পরবর্তী বছরে অধ্যাপক মহলানবিশ B. Stat. ও M. Stat. পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। 1932 সালে যার পত্তন হয়েছিল, 1959 সালে তা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করলো। অধ্যাপক মহলানবিশ ও তাঁর সহযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হলো দীর্ঘ 27 বছর পরে।

অধ্যাপক মহলানবিশ সরকারী রাশিতথ্য যাতে নির্ভরযোগ্য হয়, তার জন্যে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে রাশি-বিজ্ঞান সংস্থা স্থাপন করবার জন্যে ভারত সরকারকে সুপারিশ করেন। তিনি কেন্দ্রে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরামর্শদাতা মনোনীত হন। ভারত সরকার অধ্যাপক মহলানবিশের সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে রাশি-বিজ্ঞান সংস্থা গড়ে ওঠে। বর্তমানে সরকারী রাশিতথ্য এই সংস্থাগুলি সংগ্রহ করে ও মুদ্রিত করে। তাঁর চেষ্টায় সারা দেশে রাশিতথ্যের তাৎপর্য সবাই উপলব্ধি করলো। তাঁর মৃত্যুর পর বিলাতের Times পত্রিকা লেখেন—

"His genius in statistics was perhaps more as an organiser and an initiator than as a contributor of new theory. He had the ability to see to the heart of a practical problem and to develop the enthusiasim of those whom he led."

অধ্যাপক মহলানবিশ মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখায় খুবই উৎসাহ দিতেন। রাশি-বিজ্ঞানের পরিভাষা কিছু কিছু নিজেই করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাশি-বিজ্ঞানের বই মাতৃভাষায় লেখা হোক।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর খুবই অনুরাগ ছিল। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। তিনি 10 বছর বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কবিকে গঠনমূলক কাজে ও বিশ্বভারতীর নানা কাজে সাহায্য করেন। কবি বহু বার কলকাতায় তাঁর বাড়ীতে আসেন। বিদেশে অনেক জায়গায় তিনি কবির সঙ্গে যান।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ দীর্ঘ 50 বছর রাশি-বিজ্ঞানের সেবা করে গেছেন এবং

স্থায়ীভাবে ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কর্তব্য হবে, যাতে তাঁর কীর্তি বজায় থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় রাশি-বিজ্ঞানীদের অবদান যাতে আরো ব্যাপকতর হয়।

অধ্যাপক মহলানবিশের কর্মবহুল জীবনের বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। গত 30 বছরের বেশী তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেটাই মূলধন করে এই প্রবন্ধ লিখলাম। ত্রুটি-বিচ্যুতি সবই আমার।

অধ্যাপক মহলানবিশের ভূবিদ্যা চিন্তা

সুপ্রিয় সেনগুপ্ত*

প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার ল্যাবোরেটোরীর একতলার বারান্দাটার পশ্চিম প্রান্তে কলেজের ভূবিদ্যা বিভাগ। আমাদের ছাত্রজীবনে ভূবিদ্যা বিভাগে ঢোকবার পথেই পদার্থবিদ্যা বিভাগ-সংলগ্ন দুটো ঘরেই ছিল Indian Statistical Institute-এর সদর দপ্তর। শুনেছি এই দুটো ঘরেই সংস্থার জন্ম। এর মধ্যে একটা ঘরে দরজার উপরে কাঠের ফলকে এখনও লেখা আছে অধ্যাপক পি. সি. মহলানবিশের নাম। ছাত্রজীবনে অধ্যাপককে আমরা দূর থেকেই দেখেছি। কাছে যাবার সুযোগ হয় নি। শুনতাম পাশের ঐ ঘর দুটোয় অনেক বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ্ গবেষণা করেন। কিন্তু তাঁদের কাজকর্মের সঙ্গে আমাদের ভূবিদ্যা পঠন, পাঠন বা গবেষণার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে সে সময়ে এ কথাটা কখনও মনে হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে ভূবিদ্যার কয়েকটা আলোচনায় পরিসংখ্যানের কথা কিছুটা এসে পড়ত বটে, তবে সেটা নেহাৎই মামুলি আলোচনা। পরিসংখ্যানবিদ্যার সঙ্গে ভূবিদ্যার অন্তরের যোগটা কোথায়, তার কিছুটা হদিস পেয়েছিলাম এর অনেক বছর পরে, অধ্যাপক মহলানবিশ মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে।

Indian Statistical Institute-এ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের সঙ্গে ভূবিদ্যারও স্থান হয়েছে জেনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। এই সময়ে একদিন অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগও হয়ে গেল। জীবনের অনেকটা সময়ই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনায় কাটিয়েছেন। আমি ভূ-পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে কিছু কাজ করেছি শুনে আগ্রহের সঙ্গে অনেক প্রশ্ন করলেন। তারপর ভূবিদ্যার সঙ্গে পরিসংখ্যানবিদ্যার যোগাযোগ সংক্রান্ত নানা সমস্যার কথাও বললেন। প্রশ্ন তুললেন ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির কাজে (Geological mapping) পরিসংখ্যানবিদ্যাকে কাজে লাগানো যায় কি না? সত্য কথা কি, এই ধরণের সমস্যা সম্পর্কে তখনও আমার মনে কোনও ধারণাই ছিল না।

Indian Statistical Institute-এ যোগদানের পরও, ভূবিদ্যা-গবেষণার গোড়ার দিকে, পরিসংখ্যান তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না। ভূবিদ্যার প্রচলিত রীতিতেই গবেষণা চলছিল। এই সময়ে নতুন নতুন ভূতাত্ত্বিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু তবুও ভরসা পাই নি। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করেছি—"এই গবেষণার সঙ্গে পরিসংখ্যান-

* ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-35

বিদ্যার যোগসূত্র কোথায়? আর এই সূত্রের সন্ধান না পেলে এই সংস্থায় ভূবিদ্যা গবেষণার মূল্যই বা কি হবে?" অধ্যাপকের মনে কিন্তু বরাবরই একটা স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের ব্যবহার নতুন কিছুর সন্ধান দেবে। গোড়ার দিকে এই বিষয়ে আমরা যখন কেবল অন্ধকার হাত্‌ড়ে ফিরছিলাম, তখন ওঁর এই প্রত্যয় আমাদের ভরসা দিয়েছে বটে কিন্তু বিস্মিতও কম করে নি। অধ্যাপকের এই বিশ্বাসের ভিত্তি কোথায় জানতে কৌতূহল হতো।

এক দিন সুযোগ পেয়ে অধ্যাপককেই প্রশ্নটা করে বসেছিলাম। প্রশ্নটা শুনে উনি বেশ উত্তেজিত হয়েই অনেকক্ষণ কথা বলে চললেন। যা বললেন তার মূল কথা হলো—এই বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যেখানে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে পরিসংখ্যানবিদ্যার চাবিকাঠিটির দরকার হবে না। কিন্তু পরিসংখ্যানবিদ্যার সার্থক প্রয়োগের আগে দরকার হবে প্রচুর তথ্য (Data), যা সোজাসোজি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ফলে বা গবেষণাগারের পরীক্ষা থেকে সংগৃহীত হয়েছে (Field or experimental data)। অনেক প্রাকৃতিক তথ্য, তা সে যে ধরণেরই হোক, সংগৃহীত হলে, সে তথ্যগুলি থেকে মূল তত্ত্বকে খুঁজে বের করতে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। আর এর থেকেই এমন সব সমস্যা আসবে, প্রচলিত পরিসংখ্যানবিদ্যায় যার কোনও সমাধান নেই। তখন পরিসংখ্যানবিদ্‌দের দায়িত্ব হবে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা। আর এখানেই ফলিত পরিসংখ্যানবিদ্যার চরম সার্থকতা। অধ্যাপক বলে চললেন—"তাই এই সংস্থায় তিন রকমের বিজ্ঞানীর স্থান আছে—(1) যাঁরা আপাতত পরিসংখ্যানতত্ত্বের উপর নির্ভর না করেই উচ্চমানের গবেষণার মাধ্যমে নিজের নিজের অধীত বিদ্যায় তথ্য সংগ্রহ করছেন, (2) যাঁরা এই তথ্যের উপর পরিসংখ্যানের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ করছেন, আর (3) যাঁরা এই তথ্যের ভিত্তিতে এমন সমস্যার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, প্রচলিত পরিসংখ্যানবিদ্যায় যার কোনও সমাধান নেই, যার সমাধানের জন্যে পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন।"

অধ্যাপকের চিন্তাধারা মনকে নাড়া দিয়েছিল, তবুও ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে যে এই ধরণের গবেষণা এদেশে করা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ ঘোচে নি মাঝে মাঝে অধ্যাপক মহলানবিশের D^2 পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখে উৎসাহ পেয়েছি, তবুও ভরসা পাই নি। শিলাবিদ্যা বা প্রত্ন-জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ঐ ধরণের কাজের জন্যে চাই প্রচুর তথ্য। প্রকৃতি থেকে এত তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ। মাঝে মাঝে বিদেশী পত্রিকার নানা প্রবন্ধে D^2 পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ দেখে উৎসাহের সঙ্গে অধ্যাপককে দেখিয়েছি। উনি নাড়াচাড়া করে বলেছেন—"D^2 পুরনো হয়ে গেছে। আরও নতুন কিছু করতে হবে।"

এর কিছু দিন পরে ভূবিদ্যা গবেষণায় আমরা এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হলাম, যাতে সত্যই নতুন কিছু করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

ভূ-বিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো বর্তমান পৃথিবীর মাটি, পাহাড়ের স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি অনুশীলন করে প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর চেহারাটি অনুমান করে অধুনাবিলুপ্ত সেই সুপ্রাচীন কালের ভূপ্রকৃতিটিকে আবার মানস চক্ষে পুনর্গঠিত করা। এই ভাবেই, শিলাস্তরের রেখা-বিন্যাস অনুসরণ করে একটি প্রাগৈতিহাসিক নদীর গতিপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করছিলাম। নদীপথে প্রবাহিত জলস্রোত নরম বালির উপর ঢেউ সৃষ্টি করে তার গতিপথের স্বাক্ষর রেখে যায়। আর বহু বছর আগেকার নরম বালুস্তর জমে যখন কঠিন শিলাস্তরে পরিণত হয়, তখন সেই ঢেউয়ের ছাপগুলিও অবিকৃত থাকে। তাই কালের গতিতে নদীটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও

প্রস্তরীভূত ঢেউয়ের ছাপ প্রাচীন নদীর গতিপথের সাক্ষ্য বহন করে।

আমাদের কাজে একটি সীমিত স্থানে কয়েক হাজার প্রস্তরীভূত ঢেউয়ের ছাপের দিক লক্ষ্য করে একটি অধুনাবিলুপ্ত প্রাচীন নদীর গতিপথের সন্ধান পাওয়া গেল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নানা প্রাকৃতিক কারণে সব ঢেউয়ের ছাপের দিক হুবহু এক হয় না। তাই কয়েক হাজার দিক নির্দেশক তথ্য (Directional data) থেকে সেই প্রাচীন নদীর মধ্যক গতিপথটি (Mean direction) বের করতে ও অন্যান্য বিশ্লেষণ করতে স্বাভাবতঃই পরিসংখ্যান বিদ্যার সাহায্য দরকার হয়ে পড়ল। সমস্যাটি আলোচনা করতে গিয়ে সহযোগী পরিসংখ্যানবিদ্‌দের কাছেই জানলাম যে, দিক-নির্দেশক তথ্যগুলির বেলায় পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রচলিত নিয়মগুলি পুরাপুরিভাবে খাটে না। এর একটা কারণ দিক-নির্দেশক তথ্যের আরম্ভ শূন্য ডিগ্রীতে (O°)। আর 360° পরিক্রমণের পর এর সমাপ্তিও হয় এই একই জায়গায়। মোট কথা, দিক-নির্দেশক যন্ত্রের (Compass) সাহায্যে সংগৃহীত কৌণিক তথ্যের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সরল রেখায় বিস্তৃত তথ্যের (Linearly distributed) বিশ্লেষণ পদ্ধতি থেকে অনেকাংশে ভিন্ন।

সমস্যাটির মৌলিকত্ব অধ্যাপককে আকৃষ্ট করেছিল। ক্রমে তাঁরই উৎসাহে Indian Statistical Institute-এর পরিসংখ্যানবিদেরা দিক-নির্দেশক তথ্যের সম্যক বিশ্লেষণের জন্যে নতুন নতুন নির্দেশ দিলেন। পরে এই ধরণের তথ্যের তুলনামূলক বিচার (Comparison and test of homogeneity) ও নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতিও (Method of sampling) বের হলো। পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ নতুন। ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে এই পদ্ধতিগুলির ব্যাপক ব্যবহার হবে আশা করা যায়।

এই গবেষণাটি চলবার সময় অধ্যাপক প্রায়ই ভূবিদ্যার তথ্য আহরণের রীতি-পদ্ধতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। অধ্যাপকের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই জানেন তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি কি রকম নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। বার বার বলতেন যে, প্রত্যেকটি তথ্য আলাদা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। তথ্য সংগ্রহের তারিখ ও সময়টিও লিখে রাখা প্রয়োজন। ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সংগ্রহের কালানুক্রম (Chronological order) তথ্য বিশ্লেষণে বিশেষ সাহায্য করে। তথ্যগুলিকে খুঁটিয়ে দেখলেই যে, তার থেকে অনেক কিছু বোঝা যায় এই বিষয়েও ওঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। প্রায়ই বিখ্যাত পরিসংখ্যানতাত্ত্বিক সার রোনাল্ড ফিশারের উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন—"পরিসংখ্যানবিদের প্রথম কর্তব্য হলো নানা দিক থেকে তথ্যগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা (To cross-examine the data)"।

অনেকেই মনে করেন যে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা কমে আসে। কিন্তু পরিণত বয়সেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহলানবিশ যে সব মৌলিক সমস্যার ইঙ্গিত দিতেন, তা দেখে মন বার বার শ্রদ্ধাবনত হয়েছে। শেষের দিকে উনি প্রায়ই ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরির কাজে পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রয়োগসংক্রান্ত একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন। সমস্যাটি জটিল। ওঁর সঙ্গে আমার ও আমার সহকর্মীদের আলোচনায় সমস্যাটি সম্পর্কে আমি যা বুঝেছি, তা আমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি।

ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর ত্বকের উপরকার শিলাবিন্যাসের রূপটিকে কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলা। ভূত্বকের সব অঞ্চলের প্রতিটি বিন্দু পরিভ্রমণ করে এই কাজটি করা সম্ভব নয়। তাই ভূবিদ্‌ বিশেষ কয়েকটি

যাত্রাপথ বেছে নিয়ে সেই যাত্রাপথের উপর শিলাবিন্যাসের চেহারাটি লিপিবদ্ধ করেন। বাকী অংশটিকে কিছুটা কল্পনা, কিছুটা নানা যুক্তি অনুসারে তৈরি করা হয়। প্রয়োজনমত ভূবিদ্ মাঝের অংশের স্থানবিশেষও পরীক্ষা করেন।

অধ্যাপকের মত হলো যে, সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি যাত্রাপথ বেছে নেবার কাজটি তথ্যসমষ্টি (Population) থেকে নমুনা (Sample) সংগ্রহের কাজের (Statistical sampling) সঙ্গে তুলনীয়। সুতরাং এই নমুনা সংগ্রহের কাজটি পরিসংখ্যানবিদ্যার সাহায্যে আরও সুষ্ঠুভাবে করা যায় কি না?

ধারণাটি মৌলিক ও এটি করা সম্ভব হলে সমস্ত প্রকারের মানচিত্র তৈরির কাজে পরিসংখ্যানবিদ্যার একটা বিশেষ অবদান থাকবে সন্দেহ নেই। তবে এখনও এই কাজটি করায় অনেক বাধা আছে। এই সম্পর্কে আলোচনা উঠলেই বার বার ওঁর সামনে এই কাজের বাস্তব অসুবিধাগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। বলেছি যে, ওঁর আশাটা হয়তো সমধর্মী বা সমোন্নতি রেখার মানচিত্র (Contour map) তৈরির কাজে সফল হতে পারে, কারণ এই ধরণের মানচিত্রে রেখাগুলি একটা ক্রমপরিবর্তনের (Continuous variation) নির্দেশ দেয়। এই ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহের একটা গাণিতিক পদ্ধতি বের করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু শিলাবিন্যাসের মানচিত্র তৈরি করবার কাজে গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের বাধা অনেক। শিলাস্তর নানা স্থানে নানা আকৃতিতে অবস্থান করে। চ্যুতি, ভাঁজ ও আরও নানা প্রাকৃতিক কারণে শিলাস্তরটি ব্যাহত বা বিকৃত হতে পারে এবং তা কোনও ধরাবাঁধা গাণিতিক নিয়মে হয় না। এই ক্ষেত্রে নমুনা সংগ্রহের গাণিতিক পদ্ধতিকে কি ভাবে কাজে লাগানো যাবে? অধ্যাপক পাণ্টা প্রশ্ন তুলেছেন, "সমোন্নতি বা সমধর্মী রেখা (Contour lines) ও শিলাস্তরের সীমারেখার মধ্যে (Rock-boundary) সত্যই কি কোনও পার্থক্য আছে?" বলেছেন—"কোনও নমুনাভিত্তিক বিশ্লেষণই নিখুঁত নয়। তা বলে কি নমুনা সংগ্রহের গাণিতিক পদ্ধতিকে নানা ধরণের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না?"

অধ্যাপক বলতেন যে, একটি বিশেষ স্থানে নানা ধরণের গতিপথ (Traverse) অনুসরণ করে বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানীর দ্বারা কয়েকটি পৃথক পৃথক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করতে হবে। এর থেকে মানচিত্রের শিলাস্তরের বিন্যাসটি ভূ-বিজ্ঞানীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী (Operator variation) ও তাঁর গতিপথের (Traverse) উপর কতটা নির্ভরশীল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর এই সূত্র ধরেই গাণিতিক নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতিটি বের হবে। অধ্যাপকের আগ্রহে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজও কিছুটা এগিয়েছিল। তবে সমস্যাটি সমাধানের মূল সূত্রটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে এই ধরণের সমস্যার সমাধান সত্যই কেউ করতে পারবেন কিনা জানি না। যদি পারেন, তবে সেই সমাধানের সূত্রটির সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশের নামটি যুক্ত করতে যেন না ভোলেন।

আমার বর্ণনা থেকে কেউ যেন এই ধারণা না করেন যে, অধ্যাপক মহলানবিশের সঙ্গে ভূবিদ্যার সম্পর্ক সুরু হয় Indian Statistical Institute-এ এই বিভাগটি খোলবার পর থেকে। ওঁর সঙ্গে ভূবিদ্যার যোগাযোগ অনেক দিনকার। ওঁর মুখেই শুনেছি যে, আসামের পাললিক শিলাস্তরে সঞ্চিত খনিজ পদার্থ বিশ্লেষণের কাজে পরিসংখ্যান তত্ত্বের ব্যবহার সম্পর্কে উনি ভূবিদ্‌দের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটা সম্ভবতঃ ত্রিশ দশকের গোড়ার দিককার ঘটনা। যতদূর জানি, এই সময়ে পৃথিবীর আর মাত্র একটি কি দুটি গবেষণা কেন্দ্রে ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানবিদ্যার ব্যবহারের

কথা ভাবা হচ্ছিল। পরে অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে মহলানবিশ-D² পদ্ধতির প্রয়োগ সুরু হয়। Mathematical Geology-র প্রামাণ্য গ্রন্থে ও দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের উল্লেখ আছে।

ভূবিদ্যা গবেষণার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগের জন্যেই বোধ হয় 1957 সালে যখন Indian Statistical Institute-এ ভূবিদ্যা গবেষণা বিভাগ খোলবার প্রস্তাব হয়, তখন তা উনি সানন্দে মেনে নিয়েছিন। এই ব্যাপারে যে সব বাধা ও আপত্তি এসেছিল, তা গ্রাহ্যও করেন নি। বার বার নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে সন্দেহবাদীদের সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন। পরে ওকে বলতে শুনেছি যে, এই বিষয়ে এদেশের লোকের সন্দেহের প্রধান কারণ হচ্ছে যে, আমরা পৃথিবীর অনেক অগ্রসরশীল দেশের আগেই ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান তত্ত্বের প্রয়োগের কথা ভেবেছি। তবুও আনন্দের কথা যে, অগ্রসরশীল দেশগুলি বরাবরই ভূবিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহলানবিশ ও Indian Statistical Institute-এর দানকে সসম্ভ্রমে স্বীকার করেছেন। তাই 1968 সালে প্রাগ সহরে আন্তর্জাতিক ভূবিদ্যা কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন Mathematical Geology-র জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা (International Association for Mathematical Geology) স্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন তাঁর সঙ্গে Indian Statistical Institute-এর নামটিকে যুক্ত করতেও তাঁরা ভোলেন নি।

শুধু গবেষণার বিষয় নয়, গবেষকদের কাজের পরিবেশ ও তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও অধ্যাপকের সজাগ দৃষ্টি ছিল। যে সময়কার কথা লিখছি, তখনও Indian Statistical Institute-এর বিজ্ঞান বিভাগের নতুন বাড়ীটি তৈরি হয় নি। ভূবিদ্যা বিভাগে স্থানাভাব ছিল। এই সময়ে অধ্যাপক প্রায়ই আমাদের সঙ্গে এসে বসতেন। মাঝে মাঝে শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশের (রাণীদি) কাছেও ডাক পড়ত। ওঁরা আমাদের কাজকর্ম, এমনকি ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিতেন। আর প্রায়ই নতুন বাড়ীর নক্সা-পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। এই ব্যাপারে অধ্যাপকের কয়েকটি মতামতের কথা না লিখে পারছি না। ওঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সব রকম নিয়মের বাঁধন থেকে বিজ্ঞান-কর্মীকে মুক্তি না দিলে তাঁকে দিয়ে নতুন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। বলতেন "বাড়ী ও ল্যাবোরেটোরীর পরিকল্পনাতেও চাই পূর্ণ স্বাধীনতা ও চিন্তার নমনীয়তা (Flexibility)। প্রত্যেক কর্মী তাঁর নিজের পছন্দ ও প্রয়োজনমত তাঁর কাজের জায়গায় পরিকল্পনা করবেন।" বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে যে নতুন কাজ করা যায় না, এই বিশ্বাসকে Indian Statistical Institute-এর সমস্ত বিভাগে সার্থক রূপ দেবার জন্যে ওঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। এই ব্যাপারে অনেক বাধা এসেছে। স্বাধীনতার অপব্যবহারও যে হয় নি, তা নয়। তবুও অনেক সময়েই মনে হয় যে, এই Institute-এ সার্থক মৌলিক গবেষণাগুলির পিছনে যে জিনিষটি বিশেষভাবে কাজ করেছে সেটি হলো স্বাধীনতার আশ্বাস।

বিজ্ঞান-কর্মীদের কাজে উৎসাহ দেবার মধ্যেও ওঁর একটা বিশেষত্ব ছিল। গতানুগতিক কাজ নয়, সম্পূর্ণ নতুন কিছু, যুগান্তকারী কিছু ("A major breakthrough") করতে হবে, অধ্যাপক প্রায়ই কর্মীদের সামনে এমন একটি আদর্শ তুলে ধরতেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে breakthrough কথাটি অবিশ্বাস্য শোনায়। কথাটির মধ্যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের একটা সুস্পষ্ট ছাপও আছে। তবুও মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যে, এই দেশে, যেখানে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে

করে বিজ্ঞান-কর্মীদের মনে নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কেই সন্দেহ এসে যাওয়াও অসম্ভব নয়, সেখানে এই রকম একটা আত্মপ্রত্যয়ের বাণীকে আদর্শ করে রাখবার প্রয়োজন আছে।

অধ্যাপকের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল ওঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। দেখা হতেই ওঁর শারীরিক কুশলতার প্রশ্ন করেছিলাম। রোগ-যন্ত্রণার কথা একেবারেই এড়িয়ে গিয়ে উনি বললেন—"তোমরা ভূবিদ্যায় পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রয়োগের উপর একটি বক্তৃতামালার আয়োজন করেছো দেখলাম। এটা ভাল, তবে বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি গতানুগতিক। আরও নতুন কিছু করবার চেষ্টা করো। Geogical mapping-এর সেই সমস্যাটির কথা মনে আছে তো? তার পর উনি ঐ মানচিত্র তৈরির সমস্যা সম্পর্কেই আরও দু-চার কথা বললেন। মৃত্যু যে আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে—এই আশঙ্কা তখনও আমাদের মনে ছিল না। তবুও সেদিন ওঁর সঙ্গে তর্ক করি নি। সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে 79 বছরের তরুণের নতুন কিছু করবার অদম্য উৎসাহ আর প্রকৃতির সমস্যাগুলি আরও একটু ভাল করে বুঝবার আকাঙ্খা, সেদিন আমার মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

নৃ-বিজ্ঞান ও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

কান্তি পাকড়াশী*

সম্প্রাত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী হয়ে গেছে। সেই 1921 সালে এই বিজ্ঞানের পড়াশোনা ও গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের নানা নামী ও উঠ্‌তি নৃ-বিজ্ঞানীরা এক সেমিনারে সমবেত হয়ে 'আজকের নৃ-বিজ্ঞান' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠসহ আকর্ষণীয় আলাপালোচনা করেছেন। এই বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় যে সব মূল্যবান গবেষণা হচ্ছে বা হয়েছে, সে সব বিষয় নিয়ে বহু তথ্য ও তত্ত্ব এই সেমিনারে পরিবেশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে গত 50 বছর ধরে নৃ-বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে, সে ইতিহাসের মূল্যায়ন যে পথেই করি না কেন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে চিরস্মরণে রেখেই করতে হবে।

নৃ-বিজ্ঞানে নানা ধরণের গবেষণা-অধ্যয়নের যে গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে নৃ-মিতিবিদ্যা (Anthropometry) এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কায়েম করেছে এই দেশে বহু দশক আগে থেকেই। এই অধিকার আজ বিশ্ব নৃ-বিজ্ঞান সভায় স্বীকৃত। নৃ-মিতি বিদ্যায় অধ্যাপক মহলানবিশের রাশি-বিজ্ঞানাশ্রয়ী অনন্য গবেষণা-অধ্যয়ন ঐ অধিকার দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল গত 1920 দশকের সুরু থেকেই। নৃ-মিতিবিদ্যাশ্রয়ী গবেষণায় অধ্যাপকের আকর্ষণীয় অবদান 1922 সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় যাদুঘরের দলিল পত্রিকার (Records) 23তম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছিল বৃহত্তর বিজ্ঞান সমাজের আশু প্রয়োজনে। অধ্যাপক মহলানবিশের সুদীর্ঘ গবেষক-শিক্ষক জীবনে তাঁর দু-শ'র উপর মৌলিক প্রবন্ধ বিজ্ঞানের নানা শাখায়

* ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইনস্টিটিউট, 203, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-35

যুগান্তকারী চিন্তা-ভাবনার জোয়ার এনেছে বার বার। গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি এই সত্যতা যে, নৃ-মিতিক অনুশীলনের মাধ্যমেই কিন্তু অধ্যাপক মহলানবিশের প্রথম গবেষণা-প্রবন্ধটি বিজ্ঞান-সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। আজ তাই ভারতীয় নৃ-মিতি বিদ্যায় অধ্যাপক মহলানবিশের পরিসংখ্যান-গত গবেষণা ইতিহাসের সুবর্ণ জয়ন্তী সশ্রদ্ধভাবে আবার স্মরণ করি। স্মরণ করি একই সঙ্গে তাঁর মত বিশ্ববিশ্রুত পরিসংখ্যানবিদের বহুমুখী প্রতিভার নানা পরিচয়। নৃ-মিতিক গবেষণায় এই দেশে অধ্যাপক মহলানবিশ একজন মৌলিক চিন্তাবিদ্ ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সকলের বরেণ্য হয়েই থাকবেন।

1925 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মহলান-বিশ যে গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সে প্রবন্ধটি ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ-স্বরূপ। 'বাংলার জাতি সংমিশ্রণের বিশ্লেষণ' (Analysis of race mixture in Bengal) শীর্ষক প্রবন্ধে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আর বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে অধ্যাপক মহলানবিশ দীর্ঘ নৃ-তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তা বোধ করি তাঁর মত সমাজ-সচেতন বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। 1927 সালে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের 23তম খণ্ডে অধ্যাপক মহলানবিশের এই অনবদ্য গবেষণা-প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। যে কোন নৃ-বিজ্ঞানী বা ছাত্রছাত্রীর কাছে এই প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি। কেন না এই প্রবন্ধে অধ্যাপক মহলানবিশ জাতি সংমিশ্রণের বিশ্লেষণে বাংলার অধিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য-গুলির পাশাপাশি শারীরিক (নৃ-মিতিক) বৈশিষ্ট্যগুলির সমান প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে।

1891 সালে সার হার্বার্ট রিসলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু জাতগোষ্ঠীর (Castes) লোকজন মাপজোখ করে এক বিস্তারিত পরি-সংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করেন। এই নৃ-মিতিক সংখ্যাতথ্যগুলিই অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর উপরিউক্ত গবেষণা-প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের ছটি বিশেষ জাতগোষ্ঠীর ও একটি মুসলমান গোষ্ঠীর দৈহিক মাপজোখের যে তথ্যগুলি সার রিসলে নথিভুক্ত করেছিলেন, সেগুলিই বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। উত্তর ভারতের নানা জাতগোষ্ঠীর নিজ নিজ নৃ-মিতিক বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি বাংলায় এই ছটি জাত-গোষ্ঠী ও একটি মুসলমান সম্প্রদায়গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলির কতখানি মিল বা অমিল দেখায়, সে বিষয়ে অধ্যাপক মহলানবিশ বিশেষ দৃষ্টি দেন। তাঁর নিজ সৃষ্ট এক জটিল পরিসংখ্যানাশ্রয়ী বিশ্লেষণ পদ্ধতির (D^2-Statistics) মাধ্যমেই তিনি নৃ-মিতিক সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলি পরীক্ষা করেন। এই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বাংলার ছটি জাতগোষ্ঠীর ও একটি ধর্মগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত লোকজন দৈহিক গঠনে ও গুণাগুণে উত্তর ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতগোষ্ঠীর লোকজনদের কত নিকটের বা দূরের, সে সমস্যার সমাধান করলেন অধ্যাপক মহলানবিশ। রাশি-বিজ্ঞানের সঙ্গে নৃ-মিতি-বিজ্ঞানের এক অনন্য সমন্বয় ঘটিয়ে মহলানবিশ ভারতীয় নৃ-বিজ্ঞানে যুগান্তকারী ঐতিহ্যের সূত্রপাত করলেন।

এই ঐতিহ্যের ধারায় ক্রমে ক্রমে আমরা পেলাম 1928 সালে আরেক গবেষণা-প্রবন্ধ। চীনদেশের অধিবাসীদের মাথার (Head) নৃ-মিতিক মাপজোখের উপর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করলেন অধ্যাপক মহলানবিশ। 1908-12 ও 1923-24 সালে রুশ বিজ্ঞানী শিরোকোগোরফ্ চীনদেশের 109J জনকে মাপজোখ করেছিলেন। এই সব মাপজোখের তথ্যাদিসহ 141 জন কোরীয় ও 81 জন মানচুদের উপর যে সব নৃ-মিতিক তথ্য ঐ রুশ

বিজ্ঞানীর কল্যাণে পাওয়া যায়, সে সব সংখ্যাতথ্য নিয়ে এক বিস্তারিত পরীক্ষা করেন অধ্যাপক মহলানবিশ। মোঙ্গোলীয় জাতির দৈহিক গঠন-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি চীনদেশের বিভিন্ন প্রদেশাঞ্চল ভেদে কেমন ভাবে নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিস্ফুট, সে বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন অধ্যাপক মহলানবিশ। Man in India শীর্ষক নৃ-বিজ্ঞানের জার্নালের 8ম খণ্ডে এই গবেষণার ফলাফলসহ বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রকাশিত হয়।

1928 সালেই Biometrika শীর্ষক জার্নালের 20তম খণ্ডে প্রকাশিত হয় অধ্যাপক মহলানবিশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। জীবন্ত মানুষের দৈহিক গঠন ও অন্যান্য গুণাগুণের প্রতিটি নৃ-মিতিক মাপজোখের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট সর্বজন-গ্রাহ্য মান (Standard) মেনে চলবার আশু প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়ে এই প্রবন্ধে অধ্যাপক মহলানবিশ আকর্ষণীয় আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরিসংখ্যানাশ্রয়ী যুক্তিতর্ক ও নির্দেশ এমনই জোরালোভাবে উপস্থিত যে, এই সব যুক্তিতর্ক ও নির্দেশ অবহেলা করে কোন নৃ-মিতিক পরীক্ষা বা সমীক্ষা চালানো সত্যই নিরর্থক হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে নৃ-বিজ্ঞানীরা ও বিশেষভাবে নৃ-মিতিক গবেষকরা এই প্রবন্ধ পাঠে প্রভূত উপকৃত হবে বলেই আমার স্থির বিশ্বাস।

নৃ-মিতিক গবেষণা ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহলানবিশের দ্বিতীয় বিশেষ অবদান 1930 সালে Biometrika শীর্ষক জার্নালের 22তম খণ্ডে প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে সুইডেন দেশের 46983 জন অধিবাসীর নৃ-মিতিক মাপজোখের তথ্যাদি রাশি-বিজ্ঞানগত পদ্ধতির মাধ্যমে নিখুঁত বিচার-বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক মহলানবিশ ঐ দেশের জাতিগত দৈহিক গঠন-গুণাগুণের এক সামগ্রিক রূপরেখা তুলে ধরেন। এই বিচার-বিশ্লেষণে সুইডিশ লোকজনদের তিনি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল গোষ্ঠী ও পেশা গোষ্ঠীতে শ্রেণী বিন্যাস করে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নৃ-মিতিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিসংখ্যানগত মূল্যায়ন করেন। এই মূল্যায়নের ফলে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দৈহিক মিল ও অমিল কি ধরণের ও কতটা—তা অধ্যাপক মহলানবিশ বিশেষভাবে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নৃ-মিতিবিদ্যায় এই বিশেষ গবেষণা বিশ্ববিজ্ঞানী-কাছে চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবে।

এরপর 1931 সালে। ইঙ্গ-ভারতীয়দের দৈহিক-গুণাগুণের যে নৃ-মিতিক গবেষণা অধ্যাপক মহলানবিশ 1922 সালেই সুরু করেছিলেন, সেই গবেষণার দ্বিতীয় কিস্তি ভারতীয় যাদুঘরের দলিল পত্রিকার (Records) 23তম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ফিরিঙ্গিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি ও কোন্ স্তরের, সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে ডক্টর এ্যানানডেল্ 1916-19 সালের মধ্যে নানা ধরণের নৃ-মিতিক মাপজোখ নিয়েছিলেন। এইসব মাপ-জোখের সংখ্যাতথ্যগুলি পরিসংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব নিয়ে অধ্যাপক মহলানবিশ তিন কিস্তিতে তিনটি প্রামাণ্য গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রথম কিস্তির প্রবন্ধে ইঙ্গ-ভারতীয় পুরুষদের দৈহিক উচ্চতা-গঠন (Stature), দ্বিতীয় প্রবন্ধে মাথার (Head) দৈর্ঘ্য-বৈশিষ্ট্য এবং তৃতীয় প্রবন্ধে সাত রকমের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যাপক মহলানবিশ অনুশীলন করেন। প্রতিটি প্রবন্ধই নৃ-মিতিক গবেষণার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে অবশ্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। 1940 সালে ভারতীয় যাদুঘরের দলিল পত্রিকার (Records) 23তম খণ্ডে তৃতীয় গবেষণা-প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

1930-1940 এই দশকের মধ্যে অধ্যাপক মহলানবিশের এমন আরো তিনটি গবেষণা-প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়, যেগুলির তীক্ষ্ণ প্রভাব একাধারে নৃ-বিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যানবিদদের উপর বেশ জোরালো ভাবেই পড়েছে। 1930 সালে বাংলার

এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের 26তম খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ—'On Tests and Measures of Group Divergence'। 1933 সালে 'সংখ্যা' শীর্ষক পরিসংখ্যান গবেষণার পত্রিকার 1ম খণ্ডে অধ্যাপক মহলানবিশের ত্রিশ পাতার দীর্ঘ যে প্রবন্ধটি ছাপা হয়, সেটি নৃ-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে নৃ-মিতিক গবেষকদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতি ও জাতগোষ্ঠীর যে সব নৃ-মিতিক মাপজোখ সার রিসলে 1891 সালে নথিভুক্ত করে গেছেন, সে সব মাপজোখের নির্ভুলতা যাচাই করে দেখবার মানসে অধ্যাপক মহলানবিশ এক পরিসংখ্যানগত গবেষণার প্রচেষ্টা করেন। এই গবেষণার দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফলাফল 1934 সালে 'সংখ্যা'-শীর্ষক গবেষণা-পত্রিকার (প্রথম খণ্ডে) ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে অধ্যাপক মহলানবিশ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিগোষ্ঠীদের উপর সার রিসলের নেওয়া নৃ-মিতিক মাপজোখগুলির পুনর্মূল্যায়ন করেন।

Calcutta Medical Journal-এর মে মাসের সংখ্যায় (1937) অধ্যাপক মহলানবিশ আরো দু-জন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে এক গবেষণা-প্রবন্ধ লেখেন। বাঙালী মহিলার বস্তিহাড়ের (Pelvic girdle) নৃ-মিতিক মাপজোখের সংখ্যাতথ্য নিয়ে এক পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়। ডক্টর পি. সি. দাস ও ডক্টর এন. কে. রায়চৌধুরী এই সব বিশেষ মাপজোখ নেন আর অধ্যাপক মহলানবিশ রাশি-বিজ্ঞানের নিজস্ব বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে এই মাপজোখের মূল্যায়ন করেন। 93টি কঙ্কালের বস্তিহাড়ের বিভিন্ন রকমের মাপজোখের গুরুত্ব পরীক্ষা করে প্রবন্ধ লেখকত্রয় এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বাঙালী মহিলার বস্তিহাড় পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর (আন্দামান দ্বীপবাসী উপজাতি আর অষ্ট্রেলীয়দের ছাড়া) মহিলাদের বস্তিহাড়ের চেয়ে গঠন-গুণাগুণে তুলনামূলকভাবে ছোট। এই গবেষণালব্ধ তথ্যাদি ও জ্ঞান ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ও অস্থিবিদ্যাবিশারদের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

1937 সালেই অধ্যাপক মহলানবিশ ও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই দুই বৈজ্ঞানিকের নামে 'সংখ্যা'-শীর্ষক পরিসংখ্যান পত্রিকার 3য় খণ্ডে এক বিশেষ নৃ-মিতিবিদ্যাবিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ ছাপা হয়। প্রবন্ধটি অবশ্য 1935 সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃ-বিজ্ঞান শাখায় পঠিত হয়েছিল। এই গবেষণা কাজে তাঁরা বাংলার কয়েকটি জাতগোষ্ঠী ও উপজাতিগোষ্ঠীর (Tribes) 156 জনের দৈহিক উচ্চতা-গঠন (Stature) ও পায়ের পাতার আকৃতিগত নৃ-মিতিক মাপজোখ পরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা-কালে এই দুই বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের গুণগত অন্তর্সম্পর্ক ও অনুবন্ধ (Correlation) কেমন ও কোন্ স্তরের, সেদিকে বিশেষ নজর রাখেন ও সেজন্যে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। তাঁদের গবেষণা থেকে এই সত্যতা জানা যায় যে (1) তুলনা-মূলকভাবে বাংলার উঁচু জাতগোষ্ঠীর (ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ) লোকজন দৈহিক উচ্চতা-গঠনে বেশী লম্বা, কিন্তু তাদের পায়ের পাতা লম্বা চওড়ায় ছোট আকারের। অন্যদিকে (2) সাঁওতাল উপজাতি-গোষ্ঠীর লোকজন দৈহিক-উচ্চতা গঠনে তুলনা-মূলকভাবে বেঁটে, যদিও তাদের পায়ের পাতা লম্বা-চওড়ায় বড় আকারের।

জীবন্ত মানুষের মুখমণ্ডলের নানা নৃ-মিতিক মাপজোখ অধিকতর নির্ভুলভাবে নেবার জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক মহলানবিশ এক নতুন যন্ত্র ও সে যন্ত্রের ব্যবহারিক কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেন। 1937 সালে 'সংখ্যা' শীর্ষক গবেষণা পত্রিকার 3য় খণ্ডে এই সম্পর্কে তাঁর নিজের হাতে পরীক্ষিত ও গবেষণা-কাজে প্রত্যক্ষ ব্যবহৃত এই

নতুন যন্ত্র ও পদ্ধতির এক চিত্তাকর্ষক বিবরণ ছাপা হয়েছে। যন্ত্র, যান্ত্রিক কৌশল ও যন্ত্রভিত্তিক সমীক্ষার যে আকর্ষণীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশদ বলবার চেষ্টা এখানে না করেই বলা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নৃ-মিতিক মাপ-জোখ নেবার জন্তে—অধিকতর আস্থা ও নির্ভুলতা-সহ—অধ্যাপক মহলানবিশ নিজস্ব মৌলিক চিন্তা-ভাবনার মূলধন নিয়ে যে যন্ত্র ও যন্ত্রভিত্তিক মাপজোখ নেবার পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন, তা সর্বৈবভাবে অভিনব। যন্ত্রটির নামকরণ করেছিলেন—Photographic Profiloscope।

1940 সালে অধ্যাপক মহলানবিশের একটি অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণা-চিন্তা প্রকাশ পায় 'সংখ্যা' শীর্ষক গবেষণা পত্রিকার 4র্থ খণ্ডে। গবেষণা-চিন্তার মূল বক্তব্যটি যে কোন নৃ-বিজ্ঞানী ও নৃ-মিতিবিদ্যা অনুরাগীর পক্ষে অবশ্য অনুসরণীয়। 1939 সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃ-বিজ্ঞান শাখায় ডক্টর ডি, এন, মজুমদারের সভাপতিত্বে 'নৃ-মিতিবিদ্যায় পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ' সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এই আলোচনা-চক্রে অধ্যাপক মহলানবিশ ও অন্যান্যরা যে সব বক্তব্য বলেন সেগুলিই সংখ্যা শীর্ষক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। নৃ-মিতিক গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপে একটা সর্বজনগ্রাহ্য মান (Standard) সব সময় মেনে চলবার জন্যে অতীতে (1928 সালে) অধ্যাপক মহলানবিশ যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, সেই সব যুক্তি-তর্ক আরো জোরালোভাবে ঐ আলোচনা-চক্রে উপস্থিত করেন। নৃ-মিতিক বিশ্লেষণে সঠিক ও উপযুক্ত মানের পরিসংখ্যানগত প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলেই অধ্যাপক মহলানবিশ রায় দেন। এই উদ্দেশ্য পূরণে তিনি নৃ-বিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সক্রিয়, নীবিড় ও দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতার উপর জোরালো দাবী রাখেন।

ডক্টর চামেলী বোসের সঙ্গে অধ্যাপক মহলানবিশ 1941 সালে বাংলার কতকগুলি জাতগোষ্ঠী ও উপজাতিগোষ্ঠীর নৃ-মিতিক বৈশিষ্ট্য-গুলির মধ্যে অন্তর্সম্পর্ক ও অনুবন্ধ নিয়ে এক বিস্তারিত গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'সংখ্যা' শীর্ষক গবেষণা পত্রিকার 5ম খণ্ডে। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের মধ্যে এই অনুবন্ধ ও অন্তর্সম্পর্কের এক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করবার সার্থক প্রচেষ্টা বোস-মহলানবীশের প্রবন্ধে মূর্ত হয়ে আছে। এই প্রবন্ধ পাঠে নৃ-বিজ্ঞানীরা যে প্রভূত উপকৃত হয়েছেন ও হবেন—তা বলাই বাহুল্য।

নৃ-বিজ্ঞানী ও পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীর যৌথ গবেষণা প্রচেষ্টার উজ্জ্বলতম এক নজির হিসাবে 1941 সালে উত্তরপ্রদেশেকৃত নৃ-মিতিক সমীক্ষাটি চিরস্মরণীয়। নৃ-বিজ্ঞানী ডক্টর ডি, এন, মজুমদারের নেতৃত্বাধীনে উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জাত ও উপজাতির মধ্যে 22টি গোষ্ঠীর 2113 জন পুরুষ ও 182 জন মহিলার নৃ-মিতিক মাপজোখ নেওয়া হয়। মাপ-জোখ নেবার সময় দৈহিক উচ্চতা-গঠন, ওজন, মুখমণ্ডলের নানা অংশ আর মাথার আকৃতি-গঠন ইত্যাদির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। মাপজোখ নেবার জন্যে যে নমুনা-সমীক্ষা করা হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে এক বিপুল নৃ-মিতিক সংখ্যাতথ্য বিজ্ঞানীদের পরীক্ষার জন্যে পাওয়া গেল। এই সব সংখ্যাতথ্যের উপযুক্ত পরি-সংখ্যানগত বিচার-বিশ্লেষণ করবার দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক মহলানবীশ ও ডক্টর সি. আর. রাও। গবেষণা-বিশ্লেষণের ফলাফল 1949 সালে 'সংখ্যা'-শীর্ষক পত্রিকার 9ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এক-শ' সাতাত্তর পাতার দীর্ঘ গবেষণা-প্রবন্ধটির মূল্য কতখানি, সে কথা আর আজ ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে না। সমীক্ষাকৃত গোষ্ঠীগুলির তথা উত্তরপ্রদেশের অধিবাসীদের নৃ-মিতিক অন্তর্সম্পর্ক কেমন ও কোন্ স্তরের সেটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে

মূল্যায়ন করতে হলে এই ধরণের জটিল কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় গবেষণা প্রচেষ্টার একান্ত প্রয়োজন ছিল। শুধুমাত্র নৃ-মিতিক মাপ-জোখের ভিত্তিতে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে শারীরিক মিল বা অমিল কতখানি, সেটা জোর করে বলা সম্ভব নয় আর তা বিজ্ঞানসম্মতও হতে পারে না। পরিসংখ্যানগত প্রযুক্তিবিদ্যার তীক্ষ্ণ প্রয়োগেই যে নৃ-মিতিক সাদৃশ্য বা প্রভেদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থির করা প্রয়োজন, তা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

মজুমদার, রাও ও মহলানবিশের গবেষণা-প্রবন্ধটি থেকে এই মূল সত্যতাগুলি জানা গেছে যে, (1) উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর লোকজনদের নৃ-মিতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাত-গোষ্ঠী ও উপজাতিগোষ্ঠীর লোকজনদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন; (2) ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি উপজাতিগোষ্ঠীর লোকজন প্রতিটি দৈহিক বৈশিষ্ট্যে কার্যতঃ বিপরীত গুণাগুণ প্রকাশ করে; (3) নৃ-মিতিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরি-প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণগোষ্ঠী আর উপজাতিগোষ্ঠীর লোকজন দুই মেরু শীর্ষে আর মধ্যবর্তী আসনটি দখল করেছে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন কারুশিল্পী-গোষ্ঠীর (Artisan groups) লোকজন। এই বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে আহির উপগোষ্ঠীর সভ্যেরা দৈহিক বৈশিষ্ট্যে যেমন ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে নিকটের, তেমনি কাহার উপগোষ্ঠীর লোকজনেরা ব্রাহ্মণদের থেকে সবচেয়ে দূরের সম্পর্ক নির্দেশ করে; (4) উত্তরপ্রদেশের ছত্রীজাতগোষ্ঠী ও মুসলমানগোষ্ঠীর লোকজনদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুব নিকট সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়, যদিও এই দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক (বৈবাহিক) সংযোগ নেই-ই। তাই বলা হয়েছে যে, এই দুই বিশেষ গোষ্ঠীর লোকজন নৃ-মিতিক দূরত্বে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী আর কারুশিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যবর্তী স্থান দখল করে আছে, যদিও কারুশিল্পী গোষ্ঠীর সঙ্গে কাহার গোষ্ঠী বা মুসলমানগোষ্ঠীর নিকটতর সম্পর্ক নৃ-মিতিকভাবে সুস্পষ্ট। বিস্তারিত আরো চিত্তাকর্ষক তথ্য গবেষণা রিপোর্টে পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক মহলানবিশের নৃ-মিতিক পরি-সংখ্যানাশ্রয়ী গবেষণার যে সব যুগান্তকারী চিন্তাভাবনার জোয়ার 1920 দশক থেকেই ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছিল, তার পূর্ণ রূপ দেওয়া কঠিন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্মসাধনার বিশেষ একদিকের রূপরেখামাত্রই এখানে দেওয়া গেল। আজকের বিশ্বে Biosocial research-এর যে তাগিদ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠেছে, তার প্রয়োজনীয়তা অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর গবেষক-জীবনে বহু দশক আগেই স্বীকার করে নিয়ে নানা গবেষণা করে গেছেন। নৃ-বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণা-চিন্তা ও কাজকর্ম চিরকালের সম্পদ হয়েই থাকবে। নৃ মিতিক সমীক্ষা বা গবেষণায় পরিসংখ্যানগত যুক্তিভাবনা আর প্রয়োগ-বিশ্লেষণ যে অত্যাবশ্যক, সে কথা বার বার অধ্যাপক মহলানবিশ জোরালো ভাবেই বলেছেন। নৃ-বিজ্ঞানী ও নৃ-মিতিবিদ্যা অনুরাগীরা যত আন্তরিকতার সঙ্গে মহলানবিশের মৌলিক চিন্তাভাবনা ও যুক্তিতর্কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে, ততই নৃ-মিতিক গবেষণার উৎকর্ষ বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নৃ-বিজ্ঞানী আর পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নূতন নূতন নৃ-মিতিক গবেষণা এই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে দেশবাসীর গৌরব আরো বাড়বে বৈ কমবে না!

[ব্রাহ্ম মন্দিরে অনুষ্ঠিত ৺প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের স্মৃতি-সভায় এই রচনাটি পঠিত হয়েছিল। —স. ম.]

স্মৃতিকথা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আজ সকাল থেকে শরীর অবসন্ন। কাল ডাক্তারের উপদেশ অবহেলা করে বের হয়েছিলাম। ব্যথার খোঁচায় সে সাহস কমে গিয়েছে। তবু আপনাদের সাদর আহ্বানের কথা স্মরণে উঠছে বারবার। তাই প্রিয় বন্ধু ৺প্রশান্তচন্দ্রের বিষয়ে কিছু লিখেছি—আশা করি সভায় উপস্থিত কেউ এটি পড়ে আমার প্রতিশ্রুতির ঋণমুক্ত করবেন আংশিকভাবে।

বয়সের বেশী তফাৎ নয়—প্রশান্তচন্দ্র 6/7 মাসের বড়, তবে আলাপ হয়েছিল যখন আমরা শিক্ষার অ্যাপ্রেন্টিসী শেষ করে কাজ সুরু করেছি—যা জীবনের প্রধান কাম্য বলে বেছে নেওয়া হলো। স্বদেশীয়ানার ভরা জোয়ার। আমাদের বছরে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলমার্ক পেল কৃতী ছাত্র বলে—প্রায় সকলেই ছুটে গেল—আচার্য জগদীশ বোস কিম্বা আচার্য রায়ের লেবরেটোরীতে আমরা সার আশুতোষকে ধরে বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর ক্লাসের আয়োজনে রাজী করালাম—যদিও তখন প্রথম মহাযুদ্ধে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির আমদানী প্রায় অসম্ভব—খুঁজে বের করলাম আমরা কোথায় দামী যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে—সার আশুতোষ আমাদের মুখ চেয়ে সে সব সংগ্রহ করে দিলেন—প্রভূত উৎসাহে যুবকেরা নতুন কাজে পা বাড়ালো।

প্রশান্তর একটু সুবিধা ছিল—যুদ্ধের মধ্যেই কেম্ব্রিজ থেকে জয়টীকা পরে ফিরে এসেছে—গণিত এবং ফিজিক্সে সে দেশেই অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করবে কিছু দিন, এই ভেবে দেশে এসেছিল—প্রেসিডেন্সিতে তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, বিদেশী কেউ আসছে না। সরকার তাকে বসিয়ে দিলেন প্রফেসর করে। এইখানেই নতুন অনেক কাজ প্রশান্তকে ব্যস্ত করে রাখলো। নতুন বিজ্ঞানের রীতি পড়ে প্রশান্ত মুগ্ধ—পরিসংখ্যান রীতি এদেশের অনেক সমস্যার ও বহু আলোচিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে পারে কিনা ভাবতে বসলো। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সে লেগে গেল। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের স্তর বিভাগ ও মনুর বর্ণসঙ্করের ভীতি থাকা সত্ত্বেও উচ্চ স্তরের বাঙালী মোটামুটি পরিসংখ্যান সূত্রমতে প্রায় একই জনস্তর থেকে আসছে মনে হলো তার। পরিসংখ্যানের নির্ণীত মতে, একই গোষ্ঠী ধরতে হবে এদের আদি পুরুষ। এর জন্যে অনেক মাপজোখ হলো—মাথার করোটির নানা বিশেষত্ব—হাত-পায়ের দৈর্ঘ্য আরও কত কি!

এদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স পড়ানো চলছে—আবার প্রথামত কিছুদিন বাদে আলিপুরের হাওয়া ঘরের প্রধান হয়েও কাজ করতে হলো। নতুন পরিসংখ্যান রীতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করা শিখতে মহলানবিশের কাছে অনেক কৃতী ছাত্র ছুটে গেল—সে সময় যাঁরা একত্র হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে পরিসংখ্যানশাস্ত্রের পুরোভাগে রয়েছেন—ভারতীয়দের এই কৃতিত্বের জন্যে প্রশান্তর প্রশস্তি গাইতে হয়। বিদেশী সরকারকে সে বুঝালো এর সারবত্তা—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে আগে বুঝতে

হবে বর্তমানে আমরা কিভাবে দুর্দশা বা তিমিরে আচ্ছন্ন আছি—তার জন্যে সারা দেশ ঘুরে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন চালানো এবং বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কি হয়, তার মোটামুটি ফল—এসব ব্যাপারে পরিসংখ্যান রীতিই প্রমাণ—এটি সে সরকারকে বুঝিয়ে নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলো।

আরম্ভ হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে—সুহরওয়ার্দীর আমলে—পরে নানা অদল-বদল হলো—দেশ স্বাধীন হলো—জওহরলাল এসে আশীর্বাদ করলেন এই প্রয়াসকে। মহলানবিশের অক্লান্ত পরিশ্রমে আম্র-পালির চারদিকে একটি প্রকাণ্ড শিক্ষা ও অনু-সন্ধান ক্ষেত্র গড়ে উঠলো—বটগাছের মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লো—তাথেকে নানা প্রদেশে নানা সংস্থা—আজ সারা ভারতে আই. এস. আই-এর শাখা-প্রশাখা বিরাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারেরও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে মহলানবিশের পরিকল্পনা অনুযায়ী যোজনা মন্দিরে যে বিশেষজ্ঞেরা বসে আছেন, তারই আশ্রয় ও পরামর্শ নিতে হচ্ছে।

আমি ও সাহা প্রথমে শুদ্ধ ফিজিক্স পড়াই। যুদ্ধ শেষ হয়েছে—এরই মধ্যে প্ল্যাঙ্ক—আইনস্টাইন—বর—যাঁদের নাম এখন প্রাতঃস্মরণীয় বলে ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে, তাঁদের নতুন প্রচার আপেক্ষিকতাবাদ বা সমষ্টিকণাবাদের সব শেষ কথা—যা যুদ্ধের মধ্যে লেখা হয়েছিল—তারই খবর আসতে সুরু হয়েছে মাত্র কয়েক বৎসর।

ডাঃ দেবেন বোস তখন অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে জার্মেনী থেকে ফিরে এসে 92, আপার সারকুলার রোডে কাজ সুরু করেছেন। আমি তার কাছে জার্মান শিখছি—আইনস্টাইনের নতুন নিবন্ধ আলোকের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে বক্রগতি নিয়ে যা লেখা ছিল তারই তর্জমা করছি। ডাঃ সাহা নিজেই জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন—তিনি সে সময়—আপেক্ষিকতাবাদের গণিতে যে শুদ্ধ রূপ দেওয়া হলো, মিন্‌কাউস্কির সেসব লেখা তর্জমা করলেন। প্রশান্তচন্দ্র ওই বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন—তিনিও একটি জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখলেন—আমাদের যৌথ প্রয়াসে রিলেটিভিটির উপর এক সেট নিবন্ধ একসঙ্গে করে পুস্তিকাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করলেন। বেশ কিছুদিন চলেছিল দেশ-বিদেশে। এখন বোধ হয় তা অপ্রাপ্য।

সাহা গেলেন এলাহাবাদ, আমি ঢাকায়। প্রশান্ত বহু দিন প্রফেসরী করে পরিপূর্ণ বয়সে অবসর গ্রহণ করলেন সরকারী কাজ থেকে—পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়াবার সুবন্দোবস্ত করে গেলেন—তারপর প্রায় বিশ বৎসর একনিষ্ঠভাবে সেবা করেছেন দেশমাতৃকার। তার স্থির বিশ্বাস ছিল পরিসংখ্যানের পরিমাপেই আমরা সব সমস্যার বাস্তব রূপ প্রণিধান করতে পারবো ও সেই সঙ্গেই ভাবতে পারবো দেশের করণীয় কি? দেশ-বিদেশে তার প্রতিভার স্বীকৃতি মিলেছে পৃথিবীর প্রায় দেশেই তিনি গিয়েছেন এবং বিশ্ব সংস্থা থেকে তার প্রজ্ঞার স্বীকৃতি মিলেছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রশান্তর ধ্যান ছিল পরিসংখ্যান। নার্সিং হোমে যাবার আগে আমি দেখা করতে গিয়েছি—নানা গোলমাল উঠেছে আই. এস. আই-র পরিচালনার ব্যাপারে—তবু সে সব কথা শেষ করে আমাকে দেখাতে চাইলেন—নতুন এক পদ্ধতিতে কি ভাবে অগ্রসর হলে সহজে আর্থিক অবস্থার তুলনা করা যায়—ভাল কি মন্দ বোঝা যায় কত সহজে। তখনও তিনি নিঃসন্দেহ নন—রোগশয্যায় শুয়ে চেয়েছেন কর্মীদের সহযোগিতা। পরে শুনেছি যা তিনি ভেবেছিলেন, তারই কথানুসারে যে ফলশ্রুতি পেয়েছেন তার সহকারীরা, তা শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

বিজ্ঞানের কথাই বেশী করে বলেছি। তবে প্রশান্ত যে বহু দিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিবিড়

সাহচর্য করেছিলেন তা তো সকলেই জানে। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশে গিয়েছেন। আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় গুরুদেবের পাশে প্রশান্ত। বিশ্ব ভারতীর গোড়াপত্তনে বহু বৎসর সেখানে কর্মসচিব—পরে রথীন্দ্রনাথের আমলে সরে এসেছিলেন—তবে চিরকাল দেশের কল্যাণকর সব কাজেই প্রশান্তর সহানুভূতি। প্রতিভার সামনে সে সব সময় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের সে একজন মহাভক্ত ছিল।

সমবয়সী কর্মীদের অনেকে তার সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। সাহাকে যে অর্থানুকূল্য করেছিলেন, তাতে তার বিদেশ যাত্রা সম্ভব হয়েছিল। রাজচন্দ্র বোস বা ৺সমর রায় তার হাতে গড়া মানুষ—আরও কত উদাহরণ সকলের মনে পড়বে।

জীবনের সায়াহ্নে প্রশান্তকে ভারতের বাইরে কাটাতে হতো অনেক মাস—তবে ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতি ছিল তার স্থির লক্ষ্য। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন—সেই সংস্থার অর্থসচিব হয়েছিলেন বহুকাল।

সরস্বতীর আরাধনা করা যায়—তবে প্রতিভার প্রকাশে নতুন রাস্তা তৈরি করে দেশের বহু লোকের কর্মপ্রচেষ্টার পথ করতে পারে—এইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে জীবনে? আমাদের বয়সী বিজ্ঞানীদের কথা ভাবতে গেলে ৺সাহা ও ৺মহলানবিশের মহান অবদানের কথা ওঠে ও ভাবলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়। আজ বাঙালী বা ভারতীয় পরিসংখ্যানে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে—আজ আই-এস-আই-র আসন বিশ্বের দরবারে প্রধান স্তরে। এশিয়ার মধ্যে কলকাতার আম্রপালির নাম সর্বজনবিদিত। যে মহাপুরুষ অসম্ভবকে এইভাবে সম্ভব করেছেন, তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা মাথা নত করছি।

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

দীপককুমার দাঁ

একদা বিশ্বখ্যাত পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী ও ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, সংক্ষেপে আই, এস, আই,) সভাপতি স্যার রোণাল্ড ফিশার একটি চিঠিতে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "বটগাছটি বড় হচ্ছে তো!" অধ্যাপক মহাশয় এর কি উত্তর দিয়েছিলেন সেটা জানি না; কিন্তু ইতিহাসের জ্বলন্ত সাক্ষী বিশ্বজোড়া খ্যাতির মধ্যগগনে 203, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সুবৃহৎ বটগাছটি যে আজ শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত, ফুলে-ফলে সম্পূর্ণ বিকশিত ও মঞ্জুরিত—সে কথা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে আজ অত্যন্ত স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জে. বি. এস. হলডেনের (যিনি এই প্রতিষ্ঠানে 1957 সালে যোগ দিয়েছিলেন) ভাষায়, "শুধু এই পৃথিবীতে নয়, এমনটি এই সৌরমণ্ডলেও নেই।" এই হলো আমাদের পরম গর্বের একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নাম—ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। রূপকার—অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

1932-এর 28শে এপ্রিল। ঐদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের একটি কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হলো স্যার আর. এন. মুখার্জীর সভাপতিত্বে। ঐ শুভক্ষণটি

খাতা-কলমে I. S. I-এর জন্মমুহূর্ত। তবে এরও আগে আরো কয়েকটি কথা বলবার আছে। প্রশান্তচন্দ্র 1913 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও গণিতে B. Sc. পাশ করে কেম্ব্রিজে যান উচ্চতর পড়াশুনার জন্যে। সেখান থেকে উচ্চতর পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতে ট্রাইপোজ নিয়ে ফিরে আসেন 1915 সালে। অঘটন ঘটলো ঠিক ওই ফেরবার পথে। ওঁর গৃহশিক্ষক ডাব্লিউ. এইচ. ম্যাকলে কার্ল পিয়ার্সন সম্পাদিত 'বায়োমেট্রিক জার্নাল' পত্রিকাটি দিলেন - শুধুই পড়বার জন্যে। শিক্ষক মহাশয় সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে প্রশান্তচন্দ্রের হৃদয়ে যে বীজটি বপন করেছিলেন, উত্তরকালে তারই ফসল ফলেছে পরিসংখ্যান বিদ্যার মহান আবিষ্কারে। দেশে ফিরে প্রশান্তচন্দ্র ঐগুলিকে আরও গভীরভাবে পড়তে সুরু করে দিলেন এবং এর ফলে তিনি পরিসংখ্যানবিদ্যা সম্বন্ধে উৎসাহী হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল— বিজ্ঞানের এই শাখার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগিয়ে মানব সমাজের উন্নতিবিধান, যেমন ঘটেছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার আবির্ভাবে। এই কাজে তিনি শুধু সফল হয়েছেন তা নয়, পরিসংখ্যানবিদ্যাকে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ভারতবর্ষের মর্যাদাকে সুদৃঢ় করেছেন। দেশ-বিদেশের পরিসংখ্যানবিদ্যার চর্চায় মহলানবিশ আজ শিরোনাম।

তাঁর অধ্যাপক জীবনের সুরু প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকেই। অধ্যাপনার ফাঁকেই চলতে থাকে পরিসংখ্যান সম্বন্ধে গভীর পড়াশুনা এবং গবেষণা। চারপাশে মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে ছোটখাটো একটি আখড়াও গড়ে তুললেন। নিজের বাড়ীর নিভৃত কক্ষে পরিসংখ্যানের বইপত্র জোগাড় করে একটি লাইব্রেরীও করে নিলেন। প্রথম থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল বলিষ্ঠ, সুবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক স্বভাবজাত প্রবণতা। পরিসংখ্যানকে তিনি কখনই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান নি—যেখানে খালি তথ্য এবং তত্ত্বের কচকাচতে পূর্ণ বা বিভিন্ন রাশির সমাহারে এক জটিল গাণিতিক পটভূমি ইত্যাদি। মূল লক্ষ্য—একে কাজে লাগিয়ে সমাজ জীবনকে আরো বিকশিত করে তোলা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারে দেশ থেকে দারিদ্র দূর করা।

অধ্যাপক মহলানবিশের সমগ্র জীবনের প্রতিটি কাজের নামমাত্র উল্লেখ করতে গেলেও, এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তা একান্তই অসম্ভব। সংক্ষেপে এর আভাষটুকুই তুলে ধরতে চেষ্টা করব।

(1) প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কর্মজীবনের সুরু প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে (1915-45) সাল; পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ (1945-48) এবং এ্যামেরিটাস প্রোফেসর পদ গ্রহণ।

1917 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আহ্বানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-ব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটিতে যোগ দেন। এই কাজে পরিসংখ্যানবিজ্ঞানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞান যাচাইয়ের নিমিত্ত এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পদ্ধতিটি হলো পরীক্ষণীয় সকল বিষয়ের সম্ভাব্য সকল রকমের প্রশ্ন একটি কম্পিউটারের মধ্যে গ্রথিত থাকবে। এ থেকে খুশীমত যে কোন ধরণের প্রশ্ন তৈরি করা সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থা ছাত্রদের ক্ষেত্রে যে কার্যকরী, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত। বহু বছর পরে আই. এস. আই-তে যে I. P. N. S. (Inter Penetrating Network of Samples) ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে, তা মহলানবিশের ঐ প্রাথমিক কাজেরই এক পরিণত ফল। এ ছাড়াও ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম পরিসংখ্যানবিদ্যার কোর্স চালু করেন 1941 সালে। তিনি এর বিভাগীয় প্রধান ছিলেন (1941-45) সাল পর্যন্ত।

(2) নৃতত্ত্ব ও পরিসংখ্যান—পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের বিশেষ যে শাখার তিনি স্রষ্টা, সেটি D² Statistics বা মহলানবিশ ডিস্ট্যান্স নামে খ্যাত। নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন, তা পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানে যুগান্তর ঘটিয়েছে। কাজের মূল বিষয় ছিল ভারতীয় ও ইংরেজ জাতির সংমিশ্রণের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান। তবে গোড়ার কথাটা আগে একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছে নাগপুরে। ওখানেই পরিচয় হলো তৎকালীন জুলজিক্যাল এবং অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর ডক্টর এন. আনন্দালের (Dr. N. Annandale) সঙ্গে। ডক্টর আনন্দালের কাজের বিষয় ছিল "Anthropometric measurements of Anglo-Indians (of mixed British and Indian Parentage) in Calcutta." উনি এই ধরণের কাজে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশান্তচন্দ্রকে বোঝালেন। পরামর্শমত কাজ সুরু হলো। প্রথম গবেষণা মূলক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ভারতীয় সংগ্রহশালার (Indian Musum) 1922 সালের বুলেটিনে; বিষয়—"The statistical analysis of Anglo-Indian stature"। পরে এই সম্বন্ধে প্রচুর মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হলো ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতির অভিভাষণটি, "Analysis of Race mixture in Bengal". এই কাজের দ্বারা বিজ্ঞানের শুধু যে নৃতত্ত্ব শাখাই পুষ্টিলাভ করেছে তাই নয়; আরও অনেক বিভাগ, যেমন, অর্থনীতি, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিও যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। "Multivariate analysis"-এর উপর ওই ইনস্টিটিউটের গবেষক-কর্মীবৃন্দও যথেষ্ট মূল্যবান কাজ করেছেন।

(3) আবহ গবেষক—নৃতত্ত্ববিদ্যায় পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মহলানবিশ যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতেই আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ভারতীয় মানমন্দির সমূহের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার গিলবার্ট ওয়াকর তাঁকে আবহ বিষয়ক কয়েকটি সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানান। 1923 সালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের 4Km উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলের যে স্তর রয়েছে, সেই বায়ুস্তরই আবহমণ্ডলের নানা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার জন্যে মূলতঃ দায়ী। সম্পূর্ণতঃই পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বহু বছর পরে জার্মেনীর বিজ্ঞানী Frauna Bayer পার্থিব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপরিউক্ত তত্ত্বের সত্যতা পুনঃপ্রমাণ করেন। 1922-26 সাল পর্যন্ত তিনি আলিপুরে আবহাওয়া-বিশারদের কাজও করেন।

(4) নদী পরিকল্পনা—(বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ ও সেচ ব্যবস্থা)—প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ স্যার রোণাল্ড ফিশারের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতাকে তিনিই প্রথম এদেশে কাজে লাগান। 1922 সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সেবার উত্তর বঙ্গে, এক ভয়ানক বন্যা হয়। সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি পাঠালেন সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্যে। তাঁরা মত প্রকাশ করলেন কয়েকটি "retarding basins" তৈরি করে অতিরিক্ত জল ধরে রাখবার জন্যে। এই ব্যবস্থা ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল। সরকার প্রশান্তচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্যে। উনি প্রথমেই বিগত 50 বছরের বৃষ্টিপাতের পুরা হিসাব সংগ্রহ করলেন এবং প্রতি বছর কি রকম বন্যা হয়েছে, তার খুঁটিনাটি তথ্যাদিও জোগাড় করলেন। পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, ঐ

"retarding basins" বন্যা নিয়ন্ত্রণে কোন কাজেই আসবে না। তিনি দেখালেন যে, বন্যার প্রকৃত কারণ হলো অতিরিক্ত জল নদীপথে ও রেলসেতুর মধ্য দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করতে পারছে না। সুতরাং সমাধানের পথ জলকে কত তাড়াতাড়ি এবং কত সহজে বের করে দেওয়া যায়—তা উদ্ভাবন করা। তাঁর সমাধানের সূত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়েছিল।

আই. এস. আই. প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিকাজের তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপক কাজকর্ম হয়। তাই উড়িষ্যার হীরাকুদ জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের বহুমুখী পরিকল্পনার রূপায়ণে এঁদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি খুব কাজে লেগেছিল। 1937 সালে তিনি তৎকালীন বাঙলা প্রাদেশিক সরকারের কাছে হুগলী-হাওড়া জলসেচ প্রকল্পের এক ব্যাপক পরিকল্পনা পেশ করেন। উদ্দেশ্য, দামোদরের উদ্বৃত্ত জলকে কাজে লাগিয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে যত বাঁধ, সেতু নির্মাণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কাজ হয়েছে, তার মূলে রয়েছে প্রশান্তচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের মৌলিক গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা। I.S.I.-তে বন্যা-গবেষণাগার (Flood Research) জন্যে পৃথক একটি বিভাগ গড়ে উঠেছে।

(5) নমুনা সমীক্ষা (Sample Survey)—জাতীয় জীবনে মহলানবিশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো "ব্যাপক নমুনা পদ্ধতির উদ্ভাবন। নিয়মিত এবং যথাযথভাবে কৃষিসামগ্রীর উপর তথ্য আহরণের কাজ তিনি সুরু করেন 1937 সাল থেকেই। 1941 সালে সমগ্র বাঙলা এবং বিহারের মোট পাটের উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করেন এবং 1943 সালের ভিতরই অন্যান্য প্রধান কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরিমাণও নির্ধারণ করেন। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজে তাঁকে যে ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছিল, তার যথাযথ বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহের সহজ পদ্ধতি নির্ণয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈজ্ঞানিক উপায় বের করে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দেন, তা পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের "Sample Survey"-এর অধ্যায়ে উজ্জ্বলভাবে লেখা থাকবে। আজকের পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানে "Theory and Practise of Large Scale Sample Survey"-এর জনক বলে তাঁকে অভিহিত করা হয়। 1937-50 সাল, এই দীর্ঘ সময় তিনি বাঙলা দেশের কৃষিপণ্য, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা (Socio-economic condition), জনসাধারণের আগ্রহবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তর তথ্যাদি তাঁর গবেষক-কর্মীর মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠি নির্ণয়ে এবং উন্নয়ন. পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণে নমুনা-সমীক্ষার যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে প্রশান্তচন্দ্রের পরামর্শ মতই জাতীয় নমুনা পর্ষদ গঠিত হয় 1950 সালে। উদ্দেশ্য—সমগ্র ভারত অর্থনৈতিক-সামাজিক মান নির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপক তথ্যাদির সংগ্রহ। তাই স্বাধীনতার পর দেশগঠনে যাঁদের অবদান প্রথম সারিতে পড়ে—মহলানবীশ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে।

(6) পরিকল্পনা কমিশন ও জাতীয় অর্থনীতি—1955 সালে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। দ্রুতহারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং (সম্ভব হলে!) 10 বছর সময়-সীমার মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানে পথ খুঁজে বের করবার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন 1954 সালে। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে দেশের উন্নতির জন্যে তিনি বহু আগে-থেকেই সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলেন। 1950 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির

ভাষণের বক্তব্যের শিরোনামাই ছিল" কেন পরিসংখ্যান ?" (Why Statistics ?)। এতে তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ করেন যে, দেশে বৃহৎ মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত ভারী শিল্প (Heavy industry) গড়ে তুললে জাতীয় আয় তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর আবিষ্কৃত 2 এবং 4 সেক্টর মডেল বা ইকনোমেট্রিক মডেল একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। দেশ-বিদেশের যে কোন ছাত্রকেই এই বিষয়টি পড়তে হয়। ওই ইকনোমেট্রিক মডেলের ভিত্তিতেই তিনি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রিপোর্ট তৈরি করেন। এছাড়াও জাতীয় অর্থনীতির বহু ক্ষেত্রেই তাঁর দান চিরস্মরণীয়।

(7) আই. এস. আই—প্রশান্তচন্দ্র আই. এস. আই. শুধু গড়েন নি, এতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও করেছেন শিল্পী ও দার্শনিক অভিব্যক্তিতে। ঘোষণা করেছেন, "বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার" সেই শাশ্বত বাণী, বা ঋষিদের "ভিন্নেষৈক্যস্য দর্শনম"-কেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই তিনি শুধু এর প্রতিষ্ঠাতা মাত্রই নন, এর যাবতীয় গৌরবের মূলে রয়েছে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মদক্ষতা। চট করে যেমন তিনি কাজের লোক বেছে নিতে পারতেন, তেমনি নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বহু সময়ই সারা রাত ধরে চলতো তাঁর গবেষণা, ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম। তিলে তিলে ভারতবর্ষের মাটিতে পরিসংখ্যান বিদ্যার যেমন নানা ফসল ফলিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, তেমনি সমগ্র বিশ্বের দরবারে বিজ্ঞানের এই শাখায় ভারতের মর্যাদাকেও সুপ্রতিষ্ঠি করেছেন। দেশ-বিদেশের বহু বিখ্যাত প্রতিভার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে।

1933 সালে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলতে ছিল একজন আংশিক সময়ের কম্পিউটার এবং মোট খরচ হয়েছিল 238 টাকা। 1967 সালের একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, কর্মীর সংখ্যা—2303 জন এবং মোট খরচ 172·61 লক্ষ টাকা। এর বিভিন্ন কাজের শাখাগুলি হল নিম্নরূপ :—(1) কুটিরশিল্প বিভাগ (কল্যাণশ্রী), (2) সাইকোমেট্রি, (3) সোসিওমেট্রি, (4) বায়োমেট্রি, (5) গণকযন্ত্র বিভাগ (হলরিথ ও উরাল গণক যন্ত্রসহ), (6) ডেমোগ্রাফি, (7) কোয়ালিটি কন্ট্রোল, (8) প্লানিং, (9) ইকোনমিক রিসার্চ, (10) জিওলজিক্যাল ষ্টাডি, (11) রিসার্চ ট্রেনিং স্কুল (বি. স্ট্যাট., এম. স্ট্যাট., পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী), (12) ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে, (13) অণুজীববিদ্যা এবং বন্যপ্রাণী, (14) ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ নামে একটি কারখানা, (15) ইনষ্টিটিউটের সংগ্রহশালা, (16) একা প্রেস ইত্যাদি। শত শত কর্মী এই সকল বিভাগে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করেছেন। 1968 সালে আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ওদেশের পরিসংখ্যান কর্মীর শতকরা 33 ভাগ ভারতীয়। জাতি সঙ্ঘের পরিসংখ্যান বিভাগেও ভারতীয় কর্মীর সংখ্যা বেশী।

তাই ভাবলে অবাক লাগে যে, স্ট্যাটিষ্টিক্স না পড়েই স্ট্যাটিষ্টিক্সে সবচেয়ে বেশী প্রতিভার স্বাক্ষর উনি রাখলেন কি ভাবে? ওঁর নিজের ভাষায় বলি, "বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোথায়, যাকে বলে ফরম্যাল এডুকেশন, সেভাবে স্ট্যাটিষ্টিক্স পড়ি নি। ফলে যেটুকু শিখেছি বা জেনেছি সেটা টেকস্ট বুক পড়ি নি বলেই সম্ভব হয়েছে। আমার মনে হয়েছে টেকস্ট বুক পড়লে নিজের উপর ভরসা কমে যায়। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের উপর এখনো কোন ট্রাডিশন গড়ে ওঠে নি। পুঁথিগত বিদ্যাটি চলেছে হাইআরকির মত। বিজ্ঞান-চর্চাও ঐভাবে চলেছে।" পরিষ্কার বোঝা যায়, স্বভাবেই রয়েছে একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, জীবনের অনেক বাধাবিঘ্নকেই তাই অতি সহজে অতিক্রম করেছেন। নিজে কাজ করেছেন,

যেমনি অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছেন। পরিসংখ্যানবিদ্যায় ভারতীয়েরা যে আত্ম-নির্ভরতা ও বিশিষ্টতা অর্জন করেছে, তার মূলে রয়েছে এই নিরলস বিজ্ঞানীর অসাধারণ দূরদৃষ্টি এবং কর্মতৎপরতা। অধ্যাপক মহলানবিশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে I. S. I.-এর ডিরেক্টর অধ্যাপক সি. আর. রাও (F. R. S) লিখেছেন, "An intellectual of the highest calibre, a stalwart among scientists, the beacon light of Indian Statistics, the founder and the guiding star of the Indian Statistical Institute, the architect of the earlier economic plans and an inspiring teacher, is gone. An active research worker till his death, he was a source of inspiration to the entire scientific community and his death is a great tragedy and an irreparable loss to the world."

অধ্যাপক মহলানবিশের জন্ম 29শে জুন, 1893 সালে 210 কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। দুই ভাই এবং চার বোনের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মল কুমারীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন 1923 সালের 27শে ফেব্রুয়ারী। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকায় তাঁর আরব্ধ চিন্তাভাবনায় মহলানবিশ যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সমাজ ও সাংস্কৃতিমূলক কাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। গত 28শে জুন, 1972 কলকাতার একটি নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর পরলোক গমনে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান যুগের একটি মহান অধ্যায়ের ছেদ ঘটল।

[এই প্রবন্ধ রচনায় সাপ্তাহিক অমৃত (7. 7. 72), দেশ (12. 6. 71 বিশ্ব বিজ্ঞান) এবং অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক সি. আর রাও-এর রচনা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি।
—লেখক]

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ স্মৃতি

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

যাঁর স্মৃতিকথা আমি লিখছি, তাঁর মৃত্যুতে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সার প্যাট্রিক ব্ল্যাকেট তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারীকে লিখেছেন—"The obituary in the Times this morning emphasises his very great achievents for India, and his great personal qualities as well as his outstanding scientific work. Prasanta was a great man"

আমার ভাগ্যক্রমে আমার কলেজের পাঠ শেষ হয়ে গেলে আমি তাঁর সংস্পর্শ লাভ করি, যার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার আজীবন সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। তাঁর মহামূল্য কর্মজীবন ও কীর্তিকলাপের কথা লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, সাধ্যায়ত্তও নয়। আমি শুধু আমার স্মৃতিভাণ্ড থেকে তাঁর যেটুকু সংস্পর্শ লাভ করি তারই কথা এখানে বিবৃত করবো। স্মৃতিকথা ব্যক্তিগত,—তাতে আমার নিজের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে এসে গেছে। ঢেকে দিতে পারি নি।

প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সংস্পর্শ নিকটের নয়, একটু দূরের। উভয়েই তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র, ব্যবধান দু-বছরের; 1912 অব্দের কথা। আমি পড়ি বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বৎসরে, তিনি সসম্মানে বি.এস-সি পাশ করেছেন।

ওই বছরের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির স্বকৃত অনুবাদ লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কর্তৃক সীমিত সংখ্যায় (740) প্রকাশিত হলো। মনে নেই কেমন করে সংবাদটা জানলাম। কতটুকুই বা তখন আমার রবীন্দ্র কাব্য ও রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে পরিচয়। কিশোর বয়সে 'হিতবাদী'র উপহার রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। পরে স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে পড়বার সময় "প্রবাসী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "গোরা" পড়বার উন্মাদনা। সেই সময়েই হাতে এসে গেল মোহিত সেন সম্পাদিত রবীন্দ্র কাব্য গ্রন্থাবলী, সমগ্র, আর 1910 অব্দে প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে "গীতাঞ্জলী"। গীতাঞ্জলী পাওয়ার আগে থাকতেই গীতাঞ্জলীর কয়েকটি গান শুনতে পেতাম শোভাবাজারের হরিৎকৃষ্ণ দেবের কিন্নরনিন্দিত কণ্ঠে। ইতিপূর্বে গ্রাম্য লোকেদের মুখে গাওয়া কবির "মায়ার খেলা" প্রভৃতির গানে মন সুধাসিঞ্চিত হয়েছে। সম্বল এইটুকু মাত্র। কিন্তু স্বয়ং কবিকৃত গীতাঞ্জলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে খবরে তারই এক কপি সংগ্রহ করবার চিন্তা মাথায় চড়ে বসল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন অধ্যাপক দশরত্নের সমাবেশ। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; গণিতে—সি, ই, কালিস ও ডি, এন, মল্লিক, শারীর-বিজ্ঞানে—সুবোধ মহলানবিশ, ইংরেজীতে—মনমোহন ঘোষ, পার্সিভ্যাল, ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ; ইতিহাসে জ্যাকেরিয়া, অর্থনীতিতে কয়াজী। তেমনি ছিল বিখ্যাত কলেজের ছাদের উপর নির্মিত মান-মন্দির। আর বিশেষ করে কলেজের লাইব্রেরী। এক মেটকাফ হলের "ইম্পিরীয়াল" লাইব্রেরী (অধুনা ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী) ভিন্ন অমন লাইব্রেরী আর কলকাতা শহরে ছিল না। কলেজের নীচের তলার পশ্চিম দিকের সমস্তটা টানা একটা হলে

সারি সারি আলমারিতে সাজানো থাকতো সেকালের হিসেবে অজস্র বই। লাইব্রেরীয়ানের কাছে একটা বিরাট চামড়া বাঁধানো খাতা থাকতো যাতে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা নতুন বই কেনবার প্রস্তাব লিখে দিতে পারে। বোধ হয় সাপ্তাহিক কি মাসিক লাইব্রেরী কমিটির বৈঠক বসতো ও এইসব প্রস্তাবাদি বিবেচনা করে নতুন নতুন বই আনানো মঞ্জুর হতো। ইংরেজী গীতাঞ্জলী প্রকাশের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে লাইব্রেরীর খাতায় আমি এক কপি ইংরেজী গীতাঞ্জলী আনাবার সুপারিশ লিখে দিলাম। ব্যাকুল আগ্রহে দিন কাটে, আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলো কিনা। হপ্তায় হপ্তায় লাইব্রেরীয়ানকে জিজ্ঞেস করে যাই। একদিন তিনি বললেন, আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে। খাতা খুলে দেখালেন প্রিন্সিপ্যাল জেমস আমার প্রস্তাবের পাশে লিখে দিয়েছেন, Passed by the Committee, Order a copy.

মাস দুই আড়াই কেটে গেল; একদিন লাইব্রেরীয়ানের কাছে জানলাম ইংরেজী গীতাঞ্জলী এসে গেছে ও সঙ্গে সঙ্গে সেটি একজন উপর ক্লাসের ছেলে পড়তে নিয়ে গেছে। লাইব্রেরীর বই নিয়ে বাড়ীতে পনেরো দিন রাখা চলতো। উপর ক্লাসের যে ছাত্রটি বইটি অধিকার করেছেন, জানলাম তাঁর নাম—প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। এমন করে বইটি আনিয়ে শেষে সেটি পরহস্তগত হলো! অক্ষম ক্রোধে ও ক্ষোভে আমার চোখ জ্বালা করতে লাগলো।

ছেলেবেলা একবার এক দোকান থেকে এক ঠোঙা খাবার কিনে পথে বেরিয়ে এলে এক চিল এসে ছোঁ মেরে খাবারের ঠোঙাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কিন্তু তার পায়ের নখে ঠোঙাটি ধরে রাখতে পারলো না। রাস্তার পড়ে যাওয়ায় খাবারগুলি ছিটকে পড়লো। দু-তিনটি রাস্তার কুকুর এসে খাবারগুলি উদরস্থ করলো। চোখের জল নিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম। এবারের মর্মপীড়াও সেই ছেলেবেলার চেয়ে কম হয় নি।

স্থির করলাম নিজেই এক কপি কিনবো। সেই সঙ্কল্প নিয়ে সাহেব পাড়ায় নিউম্যানের দোকানে গিয়ে শুনলাম ইণ্ডিয়া সোসাইটির মুদ্রিত বই মাত্র কয়েক সংখ্যা এসেছিল, নিঃশেষ হয়ে গেছে। ও বই আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু ম্যাক্‌মিলান কোং শীঘ্রই নতুন করে ছাপাচ্ছে। অর্ডার দিলে যথাসময়ে তারা আমাকে জানাবে এসে এক কপি কিনে নেবার জন্যে। এক কপির জন্যে অর্ডার দিয়ে আমি বাড়ী ফিরলাম। 1913-এর জুন মাসে নিউম্যান জানালো বই এসেছে। চিঠি পেয়েই গিয়ে এক কপি কিনে আনলাম; দাম চার টাকা চোদ্দ আনা। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা রোটেনস্টাইনের আঁকা কবির প্রতিকৃতি (স্কেচ) ও কবি ইয়েটসের বিখ্যাত ভূমিকাসমেত নীল কাপড়ের মলাটে বাঁধাই সোনার জলে বইয়ের ও গ্রন্থকারের নাম লেখা। ষাট বছর যাবৎ আমার বুককেসের শোভা বর্ধন করছে। বইটি পেয়ে আমার সব ক্ষোভ দূর হলো।

এর পাঁচ মাস পরে নভেম্বরে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ঘোষিত হলো।

এপর্যন্ত প্রশান্তচন্দ্রকে দেখি নি, চিনতাম না। একদিন একজন সহপাঠী দেখিয়ে দিলেন—ওই যাচ্ছেন প্রশান্তচন্দ্র, সসম্মানে বি, এস-সি পাশ করেছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিরাটকায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলেন। ছন্দিত পদক্ষেপে পাঞ্জাবী গায়ে, বাবরী কাটা চুল—আর যতদূর মনে পড়ে,—তালতলার চটি পায়ে। শোনলাম শীঘ্রই তিনি লণ্ডন যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষা পেতে। তাঁর প্রতি আমার যে একটা প্রতিকূল মনোভাব অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা বিলীন হয়ে একটা শ্রদ্ধার উন্মেষ হলো,—বিশেষ এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের

রচনা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন কত বেশী আগ্রহশীল আমার চেয়ে। আর বিলেত চলেছেন উচ্চ-শিক্ষার্থে—আমার তাঁর প্রতি সম্ভ্রম আরও গেলে বেড়ে।

(2)

1913-এর মাঝামাঝি প্রশান্তচন্দ্র বিলেত চলে গেলেন। 1914-র কেম্ব্রিজের গণিত ট্রাইপোজের আগু ও 1915 অব্দে পদার্থবিদ্যায় ট্রাইপোজের অন্ত্য পরীক্ষায় পাস ও উচ্চ স্থান অধিকার করে কিংস কলেজের (Kings College) গবেষণা বৃত্তি লাভ করলেন। স্থির হলো যে, কিছুদিনের জন্যে তিনি স্বদেশ বেড়িয়ে আসবেন ও ফিরে গিয়ে ক্যাভেনডিশ ল্যাবোরেটরিতে উইলসন-চেম্বার (Wilson-Chamber) আবিষ্কারক সি, টি, আর, উইলসন (C. T. R. Wilson)-নির্দিষ্ট গবেষণা করবেন।

দেশে ফিরে এসে কিন্তু প্রশান্তচন্দ্র আর কেম্ব্রিজে প্রত্যাবর্তন করলেন না। তখন চলেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব যুদ্ধের ডাকে বিলেত চলে গেছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র কলেজের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপকের পদ খালি। সাময়িকভাবে প্রশান্তচন্দ্র একটি অধ্যাপকের পদ পূরণ করলেন ও যুদ্ধশেষে স্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন। 1917 অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার পড়া ও পরীক্ষা শেষ হলে আমি প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে আমার প্রার্থনা জানালাম—আমি পদার্থ-বিজ্ঞানের আধুনিক কোন বিষয়ে গবেষণা করতে চাই, তাঁর উপদেশ প্রার্থী। আমি মিশ্র গণিতে স্নাতক বলে তিনি সাগ্রহে আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। প্রথমেই তিনি আমাকে পড়তে দিলেন কেম্ব্রিজে থাকাকালীন তাঁর সংগৃহীত কিংস কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনের তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেকচার নোটস; তার সঙ্গে পড়তে বললেন ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) তড়িৎ ও চুম্বক সম্বন্ধে রচিত বিশ্ববিদিত বই। আর একটি বই তিনি ওই সঙ্গে আমাকে উপহারস্বরূপ দিলেন। কার্ল-পিয়ার্সনের 'গ্রামার অফ সায়েন্স'—(Grammar of Science), শেষোক্ত বইটি দিলেন আমার গবেষণার সাহায্যার্থে নয়, বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা নতুন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। আর বললেন সেই বছর থেকে সুরু করে আগের পাঁচ বছরের 'নেচার' (Nature) পত্রিকাগুলি পড়ে মনোমত গবেষণার বিষয় খুঁজতে। নিজেও তিনি বিবেচনা করে আমার জন্যে একটা বিষয় নির্বাচন করবেন আশা দিলেন।

নির্বাচিত বিষয় হলো—আচার্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত স্বল্প দৈর্ঘ্যের (4-5 মিলিমিটার) বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ধাতুপাতে আপতিত করে দেখতে হবে তা থেকে কোন উপ-তরঙ্গ (Secondary waves) বিচ্ছুরিত হয় কি না। বিকিরণ মাত্রেই স্বচ্ছ অস্বচ্ছ ভেদে কোন বস্তুতে পতিত হলে বস্তু ভেদ করে নিঃসৃত হয় বা প্রতিফলিত হয় অথবা শোষিত হয়ে নিঃশেষিত বা উপ-রশ্মি রূপে বিচ্ছুরিত হয়। কিছুকাল আগে মোজলে (Moselay) আবিষ্কার করেছিলেন যে, এক্স-রে বর্তিকা থেকে নির্গত মিশ্র দৈর্ঘ্যের এক্স-রে ধাতু-পাতে আপতিত হলে ধাতুর মৌল ক্রমানুযায়ী বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের উপ-এক্স রশ্মি রেখাবলী নির্গত হয়। বিদ্যুৎ-তরঙ্গও বিকিরণ, অতএব বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়লে ধাতুপাত থেকে কি উপ-বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিঃসৃত হবে না? এই ছিল আমাদের নির্বাচিত গবেষণার বিষয়।

আমাদের একটা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। পরে সেটা জানতে পারলাম।

যা হোক, আমি প্রচণ্ড আগ্রহে নির্বাচিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলাম। প্রথম সমস্যা

জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপাদক ও গ্রাহক যন্ত্র তৈরি। যন্ত্রের বর্ণনা কোন বইয়ে ছিল না, কোথাও কিনতে বা কোন দেশ থেকে আনবার উপায় নেই মাত্র সম্প্রতি জার্মেনীর এক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত কারক এই যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছেড়েছেন। 1895 অব্দের Transactions of the Royal Society-র এক সংখ্যাতে ওই যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা ও ছবি পাওয়া গেল। তাই থেকে লেগে গেলাম যন্ত্রটি তৈরি করতে। তার পূর্বেই পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ পুরনো বাড়ী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে উঠে এসেছে বেকার ল্যাবোরেটরিতে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বহস্তে গড়া কারখানা (Workshop), যেখানে তিনি তাঁর বিশ্ববন্দিত যন্ত্রপাতি তৈরি করাতেন। সে কারখানার মিস্ত্রীটিও ছিল তাঁরই হাতে গড়া আলিগড়ের এক মুসলমান কারিগর। সেই মিস্ত্রীর সাহায্যে আমার প্ল্যান অনুযায়ী এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র তৈরি করালাম ও তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম কলেজের সংগ্রহ থেকে একটি সু-প্রভিভ গ্যালভানোমিটার। সব একত্রিত করে চালালে গ্যালভানোমিটার প্রতিফলিত আলোকের টিপ প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালিত হয়ে জানিয়ে দিল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বেশ ভালই উৎপন্ন হয়েছে ও গ্রাহক যন্ত্রটিও আশাতিরিক্ত সুসম্পন্ন হয়েছে। উৎফুল্ল হয়ে তাড়াতাড়ি মহলানবিশকে ডেকে এনে দেখালাম। তিনি চালিয়ে দেখে খুব তারিফ করলেন।

তখন আরম্ভ করলাম আসল পরীক্ষা; ধাতু-পাত নিয়ে তার উপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালিয়ে দেখা কোন উপ-তরঙ্গ ধরা যায় কিনা। কিন্তু যত চেষ্টা করলাম পরীক্ষণ ফল নাস্তিপ্রদ (Negative) হলো। বার বার করে নানাভাবে সাজিয়ে পরীক্ষণ চালালাম, কিছুতেই ফলপ্রদ হলো না।

একদিন এই রকম পরীক্ষণে নিবিষ্ট আছি, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আচার্য জগদীশচন্দ্র ঘরে ঢুকে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কলেজের কাজে অবসর নেবার পর তিনি কলেজের Emeritus Professor পদ অলঙ্কৃত করেন ও বেকার ল্যাবোরেটরির পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভাগের পশ্চিম অংশের কয়েকটি ঘর তাঁর স্বীয় গবেষণার জন্যে নির্দিষ্ট হয়। তাঁকে অভিবাদন করলে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কি গবেষণা আমি চালাচ্ছি ও কে আমায় উপদেশ দিচ্ছেন। সংক্ষেপে সব কথা জানালাম ও অধ্যাপক মহলানবিশের নাম করলাম। শুনে তিনি প্রথমে আমার তৈরী যন্ত্রট ভাল করে নেড়ে-চেড়ে তারপর ধাতুপাত সরিয়ে ফাঁকা চালিয়ে দেখে খুব খুসী হয়ে সরাসরি প্রশান্তচন্দ্রের ঘরে চলে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে মহলানবিশকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন,—"প্রশান্ত, প্রাথমিক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে উপ-তরঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ হয়। তা যদি হতো, তা হলে ইউরোপ, আমেরিকার কোথাও কোথাও ধুরন্ধর বিজ্ঞানীরা এতদিনে তা আবিষ্কার করতেন।" সে যা হোক তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্র স্বচেষ্টায় তাঁর যন্ত্রের এমন সুন্দর একটি নকল করেছে এতে তিনি খুব খুসী। আর গবেষণাটি চালিয়ে যেতে বললেন; কেন না, তাতে নিস্ফল হলেও তা এক নির্ধারিত তথ্যস্বরূপ হবে।

আর একদিন অধ্যাপক সি. ভি. রামন এসেও আমি কি কাজ করছি জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পরীক্ষণের বিফলতার কথা প্রকাশ না করে মোটামুটি সব বললাম। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। যে আবিষ্কারের জন্যে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, সে বিষয়ে বা আলোক সম্পর্কিত কোন গবেষণায় তিনি তখনও মনোনিবেশ করেন নি। তিনি তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত সায়েন্স কলেজের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন ও তাঁর গবেষণায়

বিষয় ছিল শব্দতরঙ্গ ও বেহালার তাঁতের স্পন্দন সম্পর্কিত। চলে যাবার সময় আমায় বলে গেলেন যে, আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে বেহালার তাঁতের স্পন্দন সম্পর্কিত Fourrier analysis-এর কিছু কাজ আমায় দিতে পারেন, যদি তাঁর অধীনে আমি কাজ করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য লাভ আমার ঘটে ওঠে নি।

একদিন আমার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথকে আমার গবেষণা প্রয়াস ও তার বিফলতার কথা জানালাম। তিনি তখন সায়েন্স কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রশিক্ষক (Lecturer)। তিনি সব শুনে মন্তব্য করলেন, এক্স রশ্মি যত শক্তিসম্পন্ন, জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তার লক্ষাংশও শক্তিসম্পন্ন নয়। ধাতুর পাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পড়লে তা থেকে উপ-বিদ্যুৎ তরঙ্গ বিচ্ছুরিত না হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক মহলানবিশের অনুমতি নিয়ে আমি আমার কাজে সমাপ্তি টানলাম।

আমাদের হয়েছিল গোড়ায় গলদ। 1913 অব্দে নীলস্ বোরের পরাণু (Atom) গঠন ও কোয়ান্টামভিত্তিক আলোক ও বিকিরণ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। পরাণুর কেন্দ্রীন বেষ্টন করে কক্ষে প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনগুলি K, L, M, N—প্রভৃতি কয়েকটি স্তরে স্থায়ী কোয়ান্টামবিশিষ্ট হয়ে বিরাজ করে। কোয়ান্টাম হলো সংঘটাত্মক পরিমাপ, action,—বেগভার (Momentum) ও সমাপ্ত পথের গুণফল। পদার্থে শক্তি সংযোগ হলে তার অণু-পরাণু উত্তেজিত হয়, ফলে ইলেকট্রনগুলি অতিরিক্ত কোয়ান্টাযুক্ত হয়ে স্থায়ী পর্যায় থেকে উর্ধ্বতন পর্যায়ে উত্থিত হয়, কিন্তু তাতে অবস্থান না করে উদ্বৃত্ত কোয়ান্টা পরিত্যাগ করে স্থায়ী পর্যায়ে অবতরণ করে। এই পরিত্যক্ত কোয়ান্টা আলোক ও বিকিরণরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। এক্স-রে নির্গমনের ক্ষেত্রে অতি প্রচণ্ড শক্তি কাজ করে, যেমন এক্স-রে বর্তিকা থেকে যে ইলেকট্রনগুলি ধাতুফলককে আঘাত করে, তারা অতি প্রচণ্ড বেগবান। সে আঘাতে পরাণুর নিম্ন স্তরের ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে নির্গত হয়ে যায়, আর উচ্চ স্তরের কোন ইলেকট্রন সেই খালি কক্ষ দখল করে। উচ্চ স্তরের ইলেকট্রনের কেন্দ্রীন বাঁধন নিম্ন স্তরের বাঁধনের চেয়ে অনেক দুর্বল। এই কক্ষচ্যুতি ব্যাপারে যে প্রচণ্ড শক্তি মুক্ত হয়, তাই এক্স-রেরূপে নিঃসৃত হয়। ধাতুগাত্রে এক্স-রে পতিত হলেও এই প্রচণ্ড শক্তিতে নিম্ন স্তরের ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে নতুন এক্স-রে উৎপাদন করে। বোর শুধু এই ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; অঙ্কের হিসাব করে পরীক্ষণ ফলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উৎপাদন ও সংলগ্ন শক্তি এ সকলের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। কিন্তু 1917 অব্দে বোরের পরাণু-গঠন ও বিকিরণ তত্ত্ব আমার আয়ত্তে আসে নি।

অধ্যাপক মহলানবিশও সম্ভবতঃ এ কথা তলিয়ে ভেবে দেখেন নি। কারণ তাঁর মন তখন অন্য বিষয়ে মশগুল ছিল, সে হলো পরিসংখ্যান চর্চা। পরে সে কথায় আসছি।

প্রশান্তচন্দ্র যে সময়ে দেশে ফিরে এলেন, সে সময়ে সার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত করবার সঙ্কল্প সফল হতে চলেছে। দ্বারভাঙ্গা মহারাজার মুক্ত হস্তের দানে এম-এ-তে আর্টস বিভাগ খোলা হয়েছে ও দ্বারভাঙা ভবন মাথা তুলে উঠেছে। তাঁরই আহ্বানে দানবীর যুগল সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের অসামান্য দানের কল্যাণে বিজ্ঞান অধ্যাপনা-কল্পে সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের বাড়ী তৈরি এগিয়ে চলেছে। সি. ভি. রামন পদার্থ-বিজ্ঞানে পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু জার্মেনীতে আটকে পড়ে আছেন। আনুমানিক 1916-17 অব্দে সার আশুতোষ সে কালের

অসামান্য মেধাবী সদ্য পাস করা সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও মেঘনাদ সাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞানের এম, এস-সি ক্লাসে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্যে নিযুক্ত করলেন। আরও দু-জন ওই সঙ্গে নিযুক্ত হয়েছিলেন—শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ শেঠ। মহলানবিশ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হলে তিনিও নির্বাচিত হলেন পদার্থবিদ্যা শিক্ষণের জন্যে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি জোগাড় করে নিয়মিত পড়ানো সুরু হতে বছরখানেক কেটে যায়।

1919 অব্দের শেষের দিকে বিজ্ঞান-জগতে এক যুগান্তকারী বার্তা প্রচারিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রয়াল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি আয়োজিত সে বছরের মে মাসে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ও ব্রেজিলে দৃষ্ট সর্বগ্রাসী সূর্যগ্রহণের সময় তারা-শোভিত আকাশের ফটো তোলবার ফলে আইনষ্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংবাদ প্রচারিত হবার পর কর্তৃপক্ষ মহলে শিক্ষার্থীদের বিশিষ্ট ও সার্বিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পড়াবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে কাজ সমাধার জন্যে অগ্রসর হলেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ ও প্রশান্তচন্দ্র।

এই তিন জন নবীন যুবক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শেখাবার দুরূহ সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন বটে ; কিন্তু তখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে ইংরেজীতে লেখা বা জার্মান ভাষা থেকে অনূদিত কোন বই প্রকাশিত হয় নি। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ স্থির করলেন যে, তাঁরা আইনষ্টাইন ও মিন্‌কোভিস্কির (Minkowski) আদি জার্মান প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করবেন। আইনষ্টাইনের বিশিষ্ট আপেক্ষিকতা ও মিন্‌কোভিস্কির আপেক্ষিকতা উপপাদ্যের (Principle of Relativity) অনুবাদ করলেন সাহা ও আইনষ্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার অনুবাদ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। 1920 অব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই অনুবাদ দুটি একত্র করে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের বাইশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা রচনা করেন প্রশান্তচন্দ্র। আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রাক্কালীন আলোকগতিঘটিত বিপর্যয়, বিদ্যুৎ-গণিতঘটিত বিসংশয়, আপেক্ষিকতার উদ্ভব ও পরিণতি প্রভৃতির আগাগোড়া কাহিনী তথ্য সম্বলিত করে সুচারুরূপে লেখা ভূমিকাটি এই বিষয়ে লেখা শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম।

(3)

1921 নাগাদ মহলানবিশ প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের ঊর্ধ্বতন অধ্যাপক পদে উন্নীত হন ও সেই সঙ্গে আলিপুর আবহ-মন্দিরের ডিরেক্টর পদে বহাল হন। আবহ-মন্দিরটি একটি মনোরম উদ্যান ভবন। নীচের তলায় পরীক্ষণাগার ও আপিস, উপর তলায় ডিরেক্টরের বাসস্থান। 1923 অব্দে প্রশান্তচন্দ্রের বিবাহ হয় প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কন্যা নির্মলকুমারীর (রাণী) সঙ্গে। আবাল্য প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন। বিবাহ অনুষ্ঠানে কবিবর উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রশান্তচন্দ্র সস্ত্রীক আলিপুর আবহ-ভবনে বাস করতে থাকেন।

1924 অব্দে একদিন প্রশান্তচন্দ্রের আমন্ত্রণে কবিগুরু আলিপুর আবহ-মন্দিরে উপস্থিত হলেন। বন্দোবস্ত হয়েছিল বিকেলে সেখানকার উদ্যান-প্রাঙ্গণে মাইক ও লাউড স্পিকারের সাহায্যে আকাশবাণীর মাধ্যমে কবি ভাষণ দেবেন। সে সময়ে সবে Erricson কোং "টেম্পল চেম্বার্সের" ছাদে কলকাতায় প্রথম আকাশবাণী কেন্দ্র স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু রেডিও মাধ্যমে জনসমাগমের কোন আসরে ভাষণ বা গান মহলানবিশ কর্তৃক এই প্রথম সম্পন্ন হয়। অনেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেখানে,—আমিও তার এক জন। মনে পড়ে কবিবর এই বলে আরম্ভ করলেন—বিজ্ঞানের শনৈশ্চর উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে

আমার যোগ ঘটিয়েছে যন্ত্রের ইন্দ্রজাল বিস্তার করে। সে দিনের রেডিও শোনবার পর আমার মাথায় চড়ে বসলো একটি গ্রাহক যন্ত্র তৈরি করতে হবে—Erricson প্রচারিত আকাশবাণীর গান-বাজনা শোনা যাবে। এ কথা বুঝতে আমার দেরী হয় নি যে, কলেজে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উৎপন্ন করেছিলাম, আকাশবাণী সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গেরই বৃহদায়তন। খোঁজাখুঁজি করে Thacker Spink-এর দোকানে রেডিও যন্ত্রের বই পেয়ে গেলাম। পড়ে দেখলাম, একটি কুণ্ডলীতে (Coil) একটি বিদ্যুৎ-সঞ্চয়নী (Condenser) লাগিয়ে তার প্রান্তে একটা সীসার আকরিক গ্যালেনার কেলাস (Galena crystal) বসিয়ে একটা সূক্ষ্ম তারের ডগা সংযুক্ত করে কানে শোনবার হেড-ফোন (Head-phone) লাগালেই একটা চলনসই গ্রাহক যন্ত্র তৈরি করা যায়। Erricson-এর কাছে গিয়ে একটা head phone কিনতে পেলাম। বেঙ্গল কেমিক্যালের মানিকতলার কারখানায় গিয়ে রাজশেখর বাবুকে (স্বনামধন্য রাজশেখর বসু) বলে একটা গ্যালেনা কেলাস নিয়ে এলাম। কুণ্ডলী ও বিদ্যুৎ-সঞ্চয়নী বানিয়ে গ্রাহক যন্ত্র সম্পূর্ণ করে আকাশবাণী ধরে বিমোহিত হলাম। বন্ধুবর্গকে দেখালাম, অধ্যাপক মহলানবিশকেও দেখালাম ও সকলেরই বাহবা পেলাম। মহলানবিশ বললেন তাঁর জন্যে একটা তৈরি করে দিতে। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁর অনুরোধ পূরণ করতে পারলাম না। তার অল্পদিন পরেই ক্রান্সযাত্রী হয়ে আমি সমুদ্রে পাড়ি দিলাম।

* * *

কিংস কলেজের বৃত্তি নিয়ে প্রশান্তচন্দ্র দেশে ফিরেছিলেন, আগেই বলেছি। যদি সেই বৃত্তি উদ্যাপন করতে কেম্ব্রিজে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক সি, টি, আর, উইলসনের নির্দেশে গবেষণা করতেন, তা হলে নিশ্চয় তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণায় কৃতিত্ব ও খ্যাতি লাভ করতেন। কিন্তু নিয়তি অন্তরালে বসে তার জন্যে অন্য জয়মালা রচনা করেছিল। পরিসংখ্যায়নের সোনার থালায় সে জয়মালা সাজিয়ে রেখে তাঁর হাতে ধরে দিল নিয়তি।

দেশে ফেরবার পূর্বে কেম্ব্রিজের এক শিক্ষক সে সময়ে সদ্য কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson) প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত Biometrica পত্রিকার দু-এক সংখ্যা প্রশান্তচন্দ্রকে পড়তে দেন। এই পত্রিকা ও পত্রিকার অন্তর্গত বিষয় তাঁর মন প্রচণ্ড রূপে আকর্ষণ করে ও তাঁর দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা ঘুরিয়ে দেয়। প্রাকৃতিক ও জাগতিক সংস্থানে, জীব, উদ্ভিদ ও মনুষ্য জগতে যেখানেই এক-দুইয়ের বদলে বহুর সমাবেশ ও যেখানে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বিধি-নিয়ম খাটে না, সেই সব সমাবেশের সমাধানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সংগঠন, বিচার ও প্রযুক্তি—বাইওমেটিকার এই লক্ষ্য। দেশে ফেরবার সময় প্রশান্তচন্দ্র কতকগুলি সংখ্যা বাইওমেট্রিকা সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন ও নিজের বাড়ীতেই দু-এক জন সহকারী নিযুক্ত করে পরিসংখ্যান চর্চা সুরু করে দেন। পরিসংখ্যানই তাঁর জীবনের ধ্যান ও সাধনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আমি যখন তাঁর কাছে গিয়ে গবেষণার জন্যে আবেদন জানাই তার অল্পকালের মধ্যেই তিনি বেকার ল্যাবোরেটরিতে মিশ্র গণিতের স্নাতক ছাত্র নিয়ে এক ক্ষুদ্র সংস্করণের পরিসংখ্যান কেন্দ্র স্থাপন করেন। বছর দুয়ের মধ্যেই জুওলজিক্যাল সার্ভের ডিরেক্টর ডক্টর আনাণ্ডেলের প্রেরণায় এই দেশের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের দৈহিক মাপজোখ সংঘটিত পরিসংখ্যায়নিক একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি তাঁর গবেষণামূলক প্রথম সন্দর্ভ।

এই রকম সামান্যভাবে যা সুরু হয়েছিল, মহলানবিশ আবহ-মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় সে পরিসংখ্যানবিদ্যা পুষ্টি লাভ করলো। আবহ

তথ্য ও গণনাদি পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান প্রয়োগের অন্যতম প্রশস্ত ক্ষেত্র, আর আবহ বিভাগ থেকে যে সব সারণী ও গণনা প্রকাশিত হতো, প্রশান্তচন্দ্র তাতে অনেক উন্নতিবিধান করলেন। এখানে কার্ল পিয়ার্সনের যে বইটি প্রশান্তচন্দ্র আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম :—

"Everything in the Universe occurs but once, there is no absolute sameness of repeatition....Our problem turns on how far a group or class of like, but not absolutely same, things which we term "causes" will be accompanied or followed by another group or class of like things we call effects * * *

Is this category (of caused & effects) anything but a conceptual limit to experience without any basis in perception beyond a Statistical approximation ?"

* * *

Mechanical science no more explains or accounts for the motion of a molecule or of a planet than biological science accounts for the growth of a cell. The difference between the two branches of science is rather quantitative than qualitative.

অধ্যাপক মহলানবিশের পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণাদি ও কার্যকলাপ সরকারের অগোচর রইলো না। 1922 অব্দের উত্তর বঙ্গের ভয়াবহ বন্যা ও পরে উড়িষ্যার বন্যাঘটিত ব্যাপক ধ্বংস নিবারণ ব্যবস্থায় নানাবিধ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বিষয়ে মহলানবিশের পরামর্শ চাইলেন সরকার। ভারতে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করলো।

যে সময়ের কথা বলছি তার নয়-দশ বছর পরে 1931 অব্দে মহলানবিশ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় বরানগরে ও অল্পকাল পরেই উপযুক্ত ছাপাখানার ব্যবস্থা করে তিনি "সংখ্যা" নাম দিয়ে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণা ও দেশের কৃষি, নদী, বন্যা, নানাবিধ শিল্প, জনগণ প্রভৃতি বিষয়ে পরিসংখ্যান প্রযুক্তির মুখপত্র প্রকাশিত করেন। বরানগরের ইনস্টিটিউট ভবন শুধু ভারতের নয় আন্তর্জাতিক গৌরব, সম্পদ ও সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মিলন ক্ষেত্র। "সংখ্যা" পত্রিকাটিও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। দেশ-বিদেশের ছাত্রেরা এখানে শিক্ষা পেয়ে ডিগ্রী লাভ করে; তেমনি গবেষণার সর্ববিধ সুযোগ পায়। মহলানবিশের অক্লান্ত চেষ্টায় এখানে যে 'কম্পিউটার' যন্ত্র বসানো হয়েছে, তা এদেশের প্রথমগুলির অন্যতম। এ-সব স্থাপিত ও সংঘটিত হয়েছে যেমন ভারত সরকারের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়, তেমনি অন্যান্য দেশের সাহায্য ও সহযোগিতাও কম নয়। রুশদেশের বদান্যতায় ইনস্টিটিউটে স্থাপিত হয়েছে এক সুগঠিত কারখানা। মহলানবিশ বার বার পৃথিবীর নানা দেশ পর্যটন করে এই সমস্ত সাহায্য ও সহযোগিতা সংগ্রহ করেছেন ও সকল দেশের বিজ্ঞানীদের সম্প্রীতি অর্জন করেছেন। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট মহলানবিশের কালজয়ী কীর্তি ও ভারতের গৌরব; বলতে গেলে তাঁর একক চেষ্টার ফলস্বরূপ। এর জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে তিলে তিলে নিঃশেষ করেছেন। মহলানবিশের মত একনিষ্ঠতা ও আত্মদান আমাদের দেশে সুলভ নয়।

আগেই বলেছি তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন। 1921 অব্দে যখন কবিগুরুর

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তন বিশ্বভারতী নামে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি প্রশান্তচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্ম সচিব পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্ব ভারতীর সংবিধান প্রণয়নে প্রশান্তচন্দ্র ছিলেন কবিগুরুর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। 1926 অব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ইটালী ভ্রমণে যান, তখন প্রশান্তচন্দ্র সস্ত্রীক সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

* * *

যদিও আমার গবেষণার নিষ্ফল সমাপ্তির পর মহলানবিশের সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলো, তবু পূর্বের স্নেহের সম্পর্ক কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। ইনস্টিটিউটের সকল অনুষ্ঠানেই আমি নিমন্ত্রিত হতাম। তাঁর সঙ্গে একত্র কাজের শেষ ডাক আসে 1967-68 অব্দে। ভারত সরকার এদেশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উন্নতিকল্পে 1955-56 অব্দে চণ্ডীগড়ে Central Scientific Organisation নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সংস্থার পরিচালক সংসদের একজন সদস্যরূপে সরকার কর্তৃক আমি মনোনীত হই। সংসদে আমার কার্যকালের শেষ বছরে (1967-68) প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষ থেকে অধ্যাপক মহলানবিশ সংসদের সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। এক বৎসর তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজ করি। অন্যান্য কাজের চাপে পরের বছরে তিনি সংসদের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

1945 অব্দে মহলানবিশ রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

এই বৎসরের মে মাসে অধ্যাপক মহলানবিশ অস্ত্রোপচারের জন্যে দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিং-হোমে চলে এলেন। খবর শুনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর শয্যাপাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরলেন। শীঘ্র সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন—এই আশা ও আশ্বাস জানিয়ে আমি চলে এলাম।

সেই শেষ দেখা। একটি একটি করে তাঁর সুস্পষ্ট কথা বলা ও মিষ্ট স্বর ভুলতে পারি না।

অধ্যাপক মহলানবিশ

সি রাধাকৃষ্ণ রাও*

অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গত 28 জুন 1972 কলকাতায় এক অস্ত্রোপচারের তিন সপ্তাহ পরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 79তম জন্মদিবসের ঠিক একদিন আগে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সক্রিয়ভাবে গবেষণায় রত ছিলেন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের (Indian Statistical Institute) অবৈতনিক সম্পাদক ও অধিকর্তারূপে দেখাশোনা করছিলেন এবং অবৈতনিক পরিসংখ্যান উপদেষ্টা-রূপে সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে পরি-সংখ্যানে যে মহলানবিশ যুগের সূচনা হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। বস্তুতঃ, এই যুগটি ভারতে পরিসংখ্যানের স্বর্ণযুগ বলে ভবিষ্যতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—যে সময় একটি নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল এবং মানব-কল্যাণে তা নিয়োজিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতে পরি-সংখ্যান-বিজ্ঞান কার্যতঃ অপরিচিত ছিল বলা চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিষয়ে কোন শিক্ষণ বা গবেষণার ব্যবস্থা ছিল না, পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না, এমন কি এই বিষয়ে কোন পত্রিকাও প্রকাশিত হতো না। প্রশাসনের একটা আনুষঙ্গিক হিসাবে সরকারী পরিসংখ্যান শুধু সংগৃহীত হতো। 40 বছর আগে ভারতে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কার্যকলাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যে ভারত বিশ্বের পরিসংখ্যান মানচিত্রে নিজের স্থান করে নেয়।

1931 সালে মহলানবিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টি-ক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চতর গবেষণা, শিক্ষণ ব্যবস্থা, ও ব্যাপক প্রকল্পকার্য সম্পাদনের জন্যে এর প্রতিষ্ঠা হয়। পরিসংখ্যান পত্রিকা 'সংখ্যা'র প্রকাশনা সুরু হয় 1933 সালে। ইচ্ছামাফিক নমুনা গ্রহণের (Random sam-pling) মাধ্যমে বিস্তৃত অঞ্চলে ফলনের জমি ও পরিমাণ নির্ধারণের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও বাংলাদেশে প্রযুক্ত হয় 1937 সালে। প্রথম ভারতীয় পরিসংখ্যান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1938 সালে। অধ্যাপক মহলানবিশের পরি-চালনায় পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ ব্যবস্থা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম চালু হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 1941 সালে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস দীর্ঘকাল যাবৎ পরিসংখ্যানকে একটি পৃথক বিজ্ঞান বিষয় বলে স্বীকার করে নি। 1942 সালে গণিত শাখার সঙ্গে পরিসংখ্যানকে যুক্ত করা হয় এবং 1945 সালে পরিসংখ্যানের জন্যে একটি পৃথক শাখা প্রবর্তিত হয়। অধ্যাপক মহলানবিশকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অবৈতনিক পরিসংখ্যান উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করে 1949 সালে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ইউনিট স্থাপন করেন। সরকারের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে দু-বছর পরে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা [Central Statistical Organisation (CSO)] গঠিত হয় এবং তারপর পরিসংখ্যান বিভাগের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 1950 সালে জাতীয় নিদর্শন সমীক্ষা

* ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা-35

(National Sample Survey) স্থাপিত হয়—সমগ্র দেশে নিদর্শন সমীক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনীতিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয় তথ্য ও জাতীয় আয়ের হিসাবনিকাশ করবার জন্যে। 1954 সালে প্রধান মন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশন জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন ও বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে মহলানবিশকে ইনস্টিটিউটে পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে আহ্বান জানান। 1959 সালে কেন্দ্রীয় আইন বলে ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদকে (ISI) গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সংস্থারূপে স্বীকার করা হয় এবং পরিসংখ্যান বিষয়ে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

স্বল্পকাল সময়ের মধ্যে এই সমস্ত কৃতিত্ব অর্জন মহলানবিশের অক্লান্ত চেষ্টা ও দূরদর্শিতা ছাড়া সম্ভব হতো না। বিদেশ থেকে ফিরে আসবার পর মহলানবিশ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন সুরু করেন। মহলানবিশের গোড়ার দিকের কার্যকলাপ সম্পর্কে আধুনিক পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের জনক পরলোকগত রোনাল্ড ফিশার বলেছিলেন :

'কর্মজীবনের সূচনায় মহলানবিশ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন, তবে একেবারে গতানুগতিক অধ্যাপক নন। শুধু নিজের কর্তব্য সম্পাদন ও ছাত্রদের পদার্থবিদ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যা (যা পরে পরমাণু-বোমা প্রস্তুতের পথ রচনা করেছিল) সম্পর্কে শিক্ষা দান করে ক্ষান্ত থাকতেন না, তিনি তাদের কাছে পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞান, প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞান ও যে সমাজে আমরা বাস করি সে সম্পর্কে জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি মনে করতেন (যেমন আমরা অনেকে ভেবে থাকি)—সরকারের অধিকাংশ ভুলভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি হচ্ছে অজ্ঞানতাপ্রসূত—যে জনসাধারণের তাঁরা সেবা করছেন তাদের সম্পর্কে অজ্ঞানতা এবং জনসাধারণের অজ্ঞানতা (যা দূর করবার জন্যে তাঁরা আগ্রহী)।"

অধ্যাপক মহলানবিশ আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। তাঁর যেসব সহকর্মী আলোচনায় বীতরাগ এবং যাঁরা প্রকৃত সমস্যার সমাধানে প্রচলিত সূত্র অনুসরণ করতে চাইতেন, তাঁদের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। কোন সমস্যা যথার্থভাবে চ্যালেঞ্জস্বরূপ মনে হলে সে বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবের দরুণ তিনি পিছিয়ে যেতেন না। তিনি বলতেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। তাঁর মতে সমাজে বিজ্ঞানের মূল্য সংস্কারমুক্ত মন এবং প্রচলিত ধারণা ও তত্ত্ব চ্যালেঞ্জ করবার ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্নিহিত।

মৌলিক চিন্তানায়ক হিসাবে অধ্যাপক মহলানবিশের যে কোন সমস্যাকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এবং সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে তিনি সমস্যার সমাধানে উপনীত হতে পারতেন। সাম্প্রতিককালে বোধ হয় আর কেউই তাঁর মত জ্ঞানের এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেন নি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অংশগ্রহণ এবং শিল্পোন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতা হিসাবে তাঁর যে খ্যাতি, সেটাকে একজন পেশাদারী অর্থনীতিবিদের হাতে সুপরীক্ষিত ও প্রমাণিত হাতিয়ারের কৃতিত্ব অপেক্ষা যুক্তিবাদী চিন্তাধারা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মৌল বিষয়ে গভীর জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই বলা চলে। ভারতের সমস্যাকে অধ্যাপক মহলানবিশ বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের সমস্যা হিসাবেই দেখতেন। তিনি মনে করতেন, পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রচলিত

চিন্তাধারা এই সমস্ত ব্যাধি যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে প্রতিকারের জন্যে ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয় নি। সে কারণে তিনি অর্থনীতিক পরিকল্পনায় বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এর জন্যে প্রয়োজন—উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং দেশে সর্বাধিক কল্যাণসাধনের জন্যে দেশের সম্পদগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো। যদিও তিনি অর্থনীতিতে পাঠ গ্রহণ করেন নি এবং আধুনিক অর্থনীতির তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না, তথাপি তিনি ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে একটি সরল গাণিতিক মডেল উদ্ভাবন করেন—যা মহলানবিশের 'দ্বি-বৃত্তকলা মডেল' (Two sector model) নামে অভিহিত। পরবর্তীকালে তিনি একটি চতুঃবৃত্তকলা মডেল উদ্ভাবন করেন—যাতে শিল্পোন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং যা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় ব্যবহৃত হয়েছিল। 1955 সালে মহলানবিশ পরিকল্পনা কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হন এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ চালিয়ে যান।

পরিকল্পনা সম্পর্কে মহলানবিশের দৃষ্টিভঙ্গী, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিনিয়োগ নীতি নির্ধারণে ব্যবহৃত তাঁর মৌল মডেল, শিল্পোন্নয়নের প্রতি তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ—এই সমস্ত বিষয় কোন কোন মহলে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকেরা সম্ভবতঃ অধ্যাপকের অবদানের সম্যক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। ভারতে পরিকল্পনা যখন অর্থনীতিবিদ্দের অস্পষ্ট ধারণা, রাজনীতিবিদদের মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য, বেসরকারী শিল্পপতিদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয় লক্ষ্য ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে পঙ্কিল হয়ে উঠেছিল, তখন মহলানবিশ পরিকল্পনায় নাটকীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মহলানবিশ কখনই দাবী করতেন না যে, তাঁর মডেল অর্থনীতি তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি অবদানবিশেষ। তিনি মনে করতেন, তাঁর তত্ত্ব হচ্ছে কল্পনাপ্রসূত কাঠামো—যা বাস্তব কার্যক্ষেত্রে এবং বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে দিশাহারা না হয়ে আলোচ্য পদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবার পক্ষে সহায়ক হবে।

বস্তুতঃ, একটি গাণিতিক মডেল প্রবর্তন করে মহলানবিশ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বিনিয়োগের সাধারণ পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত করবার প্রয়োজনীয়তা এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করেন। সমস্যার যথাযথ সমাধান সম্পাদন অপেক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা ও নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং অতীতের অভিজ্ঞতার অভাবে সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার পক্ষে গাণিতিক মডেল সহায়ক হয়েছিল। যাই হোক, দৃষ্টিভঙ্গীটি ছিল নতুন, যদিও কতকগুলি অর্থনীতিক সম্বন্ধ অগ্রাহ্য হয়েছিল এবং প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা শুধু একটা মোটামুটি সমাধান পাওয়া গিয়েছিল। ভারতে অর্থনীতিক পরিকল্পনায় নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তনের কৃতিত্ব হচ্ছে মহলানবিশের। অন্যান্য দেশে যখন গাণিতিক মডেলের সাহায্যে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ভারতে মহলানবিশ স্বাধীনভাবে অনুরূপ ধারা প্রবর্তন করেন।

একটা কথা প্রচলিত, অধিকাংশ বিজ্ঞানী তাঁর যৌবনকালেই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ করে থাকেন এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক ধারণার কেবল পূর্ণতর রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহলানবিশ এই দিক থেকে ছিলেন এক ব্যতিক্রম। সুদীর্ঘ গবেষক-জীবনে তিনি নতুন নতুন ধারণা ও হাতিয়ার গড়ে তুলেছিলেন—যা প্রামাণ্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহলানবিশ পরিসংখ্যানকে ব্যাপক অর্থে তথ্য সংগ্রহ, প্রথাপ্রকরণ, কর্মকাণ্ডের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মানুষের কর্ম-প্রয়াসের দক্ষতা বৃদ্ধির একটি নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন, পরিসংখ্যানের একটা উদ্দেশ্য আছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতিরূপে তিনি তাঁর "পরিসংখ্যান কেন?" ভাষণে এই ধারণা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভারতে বর্ণাশ্রম ও উপজাতির উৎপত্তি, ধান্য উৎপাদনের লক্ষ্য অনুযায়ী সেচব্যবস্থা, বাঁধের পরম উচ্চতা নির্ধারণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। ভারতে শিল্পপণ্যের মান উন্নয়নের জন্যে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান ও শিল্পপণ্যের মান উন্নয়ন আন্দোলন প্রসারের জন্যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটি পৃথক ইউনিট স্থাপন করেন।

পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনায় তাঁর মৌলিক অবদানের জন্যে অধ্যাপক মহলানবিশ স্বদেশে-বিদেশে বহু সম্মাননা লাভ করেন। তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো (1945), আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পরিমাপক সোসাইটির ফেলো (1951), রয়েল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির সম্মানীয় ফেলো (1954), পাকিস্তান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ফেলো (1952), আন্তর্জাতিক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের সম্মানীয় সভাপতি (1957), সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির বিদেশী সদস্য, আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো (1961) এবং বিশ্ব আর্টস ও সায়েন্স অ্যাকাডেমির ফেলো (1963) নির্বাচিত হন। এ ছাড়া বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। 1968 সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করেন।

বৈজ্ঞানিক দূত

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্যে মহলানবিশ ভারতের অপর যে কোন বিজ্ঞানী অপেক্ষা বেশী কাজ করেছিলেন। আধা-সরকারী বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে তিনি সমাজবাদী ও পশ্চিম দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন এবং বিজ্ঞানী বিনিময় ও গবেষণাকার্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরের সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশ্বের সর্বত্র থেকে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান এবং ভারতের গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলিতে স্বল্পকালীন পরিদর্শনে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। বহু বছর ধরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিশ্বের সর্বত্র থেকে আগত বিজ্ঞানীদের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এখানে সোভিয়েত রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় বৈজ্ঞানিক প্রকল্প চালু হয়েছে। যেসব বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নরবার্ট ভীনার, জে বি এস হলডেন, সার রোনাল্ড ফিশার, অ্যাকাডেমিশিয়ান এ এন কোল্‌মোগোরফ, অ্যাকাডেমিশিয়ান ইউ ভি লিনিক, অস্কার ল্যানেজ এবং নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী রাগ্‌নার ফ্রিশ।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে একটি সুন্দর সংগ্রহশালা আছে (ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র এখানেই আছে ডাইনোসরের ফসিল)। ভ্রূণতত্ত্ব, মানব প্রজননতত্ত্ব, শোণিততত্ত্ব, উদ্ভিদ-বিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এখানে সুসজ্জিত

বীক্ষণাগার আছে দেখে বিদেশী পরিদর্শকেরা বিস্মিত হয়ে যান। পরিসংখ্যান সংস্থায় বিজ্ঞানীদের ভূমিকা কি?—এই প্রশ্নের জবাব পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রচলিত পরিসংখ্যান পদ্ধতির উন্নতির জন্যে নতুন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করতে বা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে পরিসংখ্যানকে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উপর নির্ভর করতে হয়। এই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করে অধ্যাপক মহলানবিশ গাণিতিক পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানী ও সাধারণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরের গবেষণা-ইউনিট স্থাপন করেছিলেন। ইনস্টিটিউটের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এখানে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান সমন্বিত শিক্ষাক্রমের একটি অঙ্গ হিসাবে পরিসংখ্যানও শিক্ষা দেওয়া হয়।

জ্ঞান ও কর্ম

অধ্যাপক মহলানবিশের 79 বছরের জীবন হচ্ছে জ্ঞান, কর্ম ও কৃতিত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, পরিসংখ্যানের খ্যাতনামা পত্রিকা 'সংখ্যা'র সম্পাদক, বাস্তব সমস্যা সমাধানে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগের প্রবর্তক, ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রণালীর সংগঠক, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতা। এই সমস্ত কৃতিত্বের জন্যে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো ও সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সম্মানিত বিদেশী সদস্য-পদ সমেত শিক্ষাজগতের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন।

বিবিধ ও বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মের কতকগুলি গোঁড়ামি মেনে নিতে পারেন নি। তাই সেগুলির সংস্কার করতে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অপরদিকে দার্শনিক মন নিয়ে তিনি প্রাচীন জৈন অস্তি-নাস্তিমূলক ন্যায়শাস্ত্র অনুশীলনে প্রেরণা পেয়েছিলেন। আর তারই ফলে তিনি এই শাস্ত্রের সঙ্গে বাস্তবতার সম্ভাব্য ও পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিভঙ্গীর কিছুটা সামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছিলেন। কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশে শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী আজ পরিশীলিত হয়েছে। স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর নিজস্ব ধারণা ছিল এবং আই, এস, আই-এর প্রাঙ্গণে বাড়ীর নক্সা তৈরি করে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। তিনি একটি ছাপাখানা প্রবর্তন করেন। বর্তমানে এই ছাপাখানা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তক মুদ্রণে খ্যাতি অর্জন করেছে। এমন কি তিনি পরিসংখ্যান পরিষদের ব্যবস্থাপনায় 'ডেস্ক ক্যালকুলেটর' উদ্ভাবন ও নির্মাণের মত ব্যবসায়িক উদ্যোগে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর জীবনের শেষার্ধে ভারতে থাকাকালে দিল্লী ও কলকাতার মধ্যে ঘন ঘন এবং প্রায়ই বিদেশে মত বিনিময় করতেন। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি কেবল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতেন না, সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অ্যাকাডেমির সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিসংখ্যান পরিষদে উপহারস্বরূপ যন্ত্রপাতি দেবার ব্যবস্থা করতেন। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির মধ্যে যেমন ছিল কম্পিউটার ও ভারী মেশিনের যন্ত্রপাতি অপরদিকে তেমনি ছিল মুদ্রণ যন্ত্রপাতি।

তিনি কয়েকটি বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বেশীর ভাগ একই সময়ে। 1931 সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইণ্ডিয়ান

ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ও সম্পাদক-রূপে কাজ করে গেছেন। ইনস্টিটিউটের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা ও বিচার-বিবেচনা করতেন। এক এক সময় এত দীর্ঘ সময় আলোচনা চলতো যে, সহকর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। ইঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশ দিয়ে, ইনস্টিটিউটের পরিচালন ব্যবস্থায় আইনগত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে এবং বহিরাগত বিদেশী বিজ্ঞানীদের জন্যে কর্মসূচী প্রণয়নেও তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতেন। কখনও কখন ছোটখাটো ব্যাপারও তিনি খুঁটিয়ে দেখতেন এবং তার মধ্যে তাঁর প্রিয় বিড়ালকে আদর-যত্নও করতেন।

তিনি সারা জীবন ধরে মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে শক্তি-সমর্থ ছিলেন। এমন কি কলকাতার নার্সিং হোমে ভর্তি হবার পরও তিনি 'ফ্র্যাকটাইল গ্র্যাফিক্যাল অ্যানালিসিস' নামে যে নতুন পরিসংখ্যান হাতিয়ার গড়ে তুলেছেন, সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং তাঁর কতকগুলি জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুমান সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর তিন সপ্তাহ ধরে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যে সাহসিক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাতে চিকিৎসকেরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মহলানবিশের চরিত্রে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে অপারসীম কর্মক্ষমতার সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি তাঁর অবদান ও কৃতিত্বের দ্বারা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, কোন মহৎ কাজ করতে হলে চাই দৃঢ়চিত্ততা, নিজের বিশ্বাসের উপর আস্থা এবং অপরকে স্বমতে এনে কার্যটি সম্পাদন করা। মহলানবিশের মধ্যে এই তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর সম্পর্কে কারো কারো ধারণা হতে পারে, তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী ও সুকৌশলী এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য হতো না, তাঁদের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করতেন না। এই সমস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন গুণাবলী না থাকলে মহলানবিশের এতদিকে প্রতিভার বিকাশ ঘটতো না।

যে সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন সে সময়ে তাঁর মত বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কুড়ি সালের আগে পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান ভারতে একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং কার্যতঃ অজানা বিষয় ছিল। এই নতুন ক্ষেত্রে তাঁর মত একজন পথিকৃতের প্রয়োজন ছিল—যিনি তাঁর অদম্য সাহস ও অনমনীয়তার দ্বারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি অপসারিত করে বিজ্ঞান ও সমাজের উন্নতির জন্যে নতুন জ্ঞানভূমিতে বিচরণের পথ রচনা করেছিলেন।

জ্ঞানের প্রগতি ও সমাজের উন্নতিসাধনের জন্যে ভারতে সাংগঠনিক প্রচেষ্টার কোন ঐতিহ্য নেই। যেসব দেশে সে প্রচেষ্টা আছে—সেখানে ব্যক্তি হচ্ছে কার্য সম্পাদনের হাতিয়ারমাত্র। ভারতে এর বিপরীতটাই হচ্ছে সত্য। এখানে ব্যক্তিবিশেষই কার্যক্ষেত্রে প্রধান এবং সংগঠনকে তিনি হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করেন।

অধ্যাপক মহলানবিশের প্রয়াণে বর্তমান কালের একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে দেশ হারিয়েছে। তাঁর মত মানুষ শুধু এক পুরুষে নয়, কয়েক পুরুষের মধ্যে সম্ভবতঃ একবারই জন্মগ্রহণ করেন।

[মূল ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ]